الأحكام السلطانية للماوردي (الماوردي)

القسم: السياسة الشرعية والقضاء

الكتاب: الأحكام السلطانية

المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت 450هـ)

الناشر: دار الحديث - القاهرة

عدد الصفحات: 376

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

আল-আহকামুস সুলতানিয়া (আল-মাওয়ারদী)

বিভাগ: শারয়ী রাজনীতি ও বিচারব্যবস্থা

গ্রন্থ: আল-আহকামুস সুলতানিয়া

লেখক: আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবিব আল-বসরী আল-বাগদাদী, আল-মাওয়ারদী নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ৪৫০ হিজরি)

প্রকাশক: দারুল হাদিস - কায়রো

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৭৬

[গ্রন্থের পৃষ্ঠা নম্বর মুদ্রণ কপির অনুরূপ]

শামেলায় প্রকাশের তারিখ: ৮ যিলহজ ১৪৩১

مقدمات

مقدمة التحقيق

...

مقدمة التحقيق:

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} 1، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} 2، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} 3.

وبعد:

فلم يكن الإسلام في يومٍ من الأيَّام مجرَّد طقوس لا علاقة بواقع الناس وشئونهم الحياتية، ولعلَّ فهم أهل مكة من المشركين لذلك، ويقينهم بأنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم إنَّمَا يدعو بهذا الدين إلى منهج حياة متكاملٍ يمكن تلخيصه في كلمة واحدة هي: لا إله إلا الله.

تلك الكلمة التي تعلن التوحيد الخالص والعبودية الكاملة لله وحده، ونزعها عن أيّ أحد، أو أيّ شيء آخر، وترجع الإنسان إلى حكم واحد هو الخالق الحكيم، وتتبرَّأ من كل

---

1 آل عمران: 102.

2 النساء: 1.

3 الأحزاب: 70، 71.

وهذه المقدّمة تسمَّى "خطبة الحاجة" كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلّم أصحابه أن يقولوها بين يدي كلامهم.

والحديث أخرجه:

أبو داود في كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح 2/ 204 "2118"، والترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء في خطبة النكاح 2/ 355 "1107"، والنسائي في كتاب النكاح، باب: ما يستحب من الكلام عند النكاح 6/ 89، والطبراني في المعجم الكبير 10/ 121، 122 رقم "1008"، والحاكم في المستدرك 2/ 182، 183، وسكت هو والذهبي عنه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الخطبة في النكاح 7/ 146 جميعًا من حديث عبد الله بن مسعود.

ভূমিকা

সম্পাদকের ভূমিকা

...

সম্পাদকের ভূমিকা:

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের নফসের অনিষ্টতা এবং আমাদের মন্দ আমলসমূহ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। {হে মুমিনগণ! আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না} ১, {হে মানবকুল! তোমরা তোমাদের সেই রবের তাকওয়া অবলম্বন করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁদের উভয় থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক} ২, {হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে} ৩।

অতঃপর:

ইসলাম কোনো দিনই নিছক এমন কিছু আচার-সর্বস্ব বিষয়ের নাম ছিল না যার সাথে মানুষের বাস্তবতা ও জীবনযাত্রার কোনো সম্পর্ক নেই। সম্ভবত মক্কার মুশরিকদের এই বিষয়টি অনুধাবন করা এবং তাদের এই ধ্রুব বিশ্বাস যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দ্বীনের মাধ্যমে মূলত এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন যাকে একটি মাত্র বাক্যে সারসংক্ষেপ করা সম্ভব, আর তা হলো: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। এটি সেই কালিমা যা একনিষ্ঠ তাওহীদ ও একমাত্র আল্লাহর জন্য পূর্ণ দাসত্বের ঘোষণা দেয় এবং অন্য যে কারো বা যেকোনো বস্তু থেকে তা অস্বীকার করে। এটি মানুষকে একমাত্র বিচারক তথা প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার ফয়সালার দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং অন্য সবকিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে...

---

১. আলে ইমরান: ১০২।

২. আন-নিসা: ১।

৩. আল-আহযাব: ৭০, ৭১।

এই ভূমিকাটিকে 'খুতবাতুল হাজাহ' বলা হয়, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে তাঁদের আলোচনার প্রারম্ভে পাঠ করতে শিক্ষা দিতেন।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন:

আবু দাউদ, নিকাহ অধ্যায়, নিকাহর খুতবা অনুচ্ছেদ ২/ ২০৪ (২১১৮); তিরমিযী, নিকাহ অধ্যায়, নিকাহর খুতবা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ২/ ৩৫৫ (১১০৭); নাসাঈ, নিকাহ অধ্যায়, নিকাহর সময় যা বলা মুস্তাহাব অনুচ্ছেদ ৬/ ৮৯; তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর ১০/ ১২১, ১২২ নং (১০০৮); হাকেম, আল-মুস্তাদরাক ২/ ১৮২, ১৮৩ এবং তিনি ও যাহাবী এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, নিকাহ অধ্যায়, নিকাহর খুতবা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৭/ ১৪৬; সকলেই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস থেকে।

الأنداد والشركاء المزعومين.

ورغم أنَّ مسألة شمولية الإسلام وأنَّه منهج حياة كامل يعتبرها كثيرون قضية مسلَّمة، وثابتة بلا شكٍّ ولا مرية، نجد فريقًا آخر يحاول بشدة فصل الدين عن شئون الحياة، وبخاصَّة السياسية منها.

وفي ظلِّ هذا الخلاف كان لا بُدَّ من الرجوع إلى تراثنا الإسلامي الزاخر نستقي منه المبادئ، ونقف منه على المعالم؛ لنرى كيف أدلى السابقون من العلماء المسلمين بدلوهم في المسائل المتعلقة بنظم الحكم، وكيف حاولوا التنظير والتقنين لنظام الحكم في الإسلام من خلال بحثهم في كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن خلال استقرائهم لسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وتاريخ الخلفاء الراشدين من بعده.

غير أنَّه من المهمّ للباحث حتى يكون محايدًا ومنصفًا أن ينظر هذه المحاولات في سياقها الزماني والفترة التي أُلِّفَت فيها؛ لنرى إذا ما كانت تعبّر عن قيمةٍ في عصرها أم لا.

كما علينا أن ننظر إلى هذه المحاولات بحيادية تامَّة دون تحيّز أو تجنٍّ، ذلك أنَّ كثيرًا من الباحثين ينظرون إلى كلِّ ما هو قديم على أنَّه هو الصواب، حتى إنَّ كثيرًا من المحققين في عصرنا قد انحصر عملهم في الثناء على المصنِّف، وعلى أسلوبه وجودة تبويبه، ومحاولة التدليل على صدق كل ما يورده في كتابه.

بينما نرى فريقًا آخر من الذين يسمّون أنفسهم بدعاة الحداثة والتقدُّم يبذل جهده كله لتشويه كل ما هو قديم، ونعته بالتخلف والسطحية وعَدَم الملاءمة لعصرنا.

لذلك كان حرصنا على تحقيق كتاب الأحكام السلطانية للإمام الماوردي، والذي يعتبر كتابًا في الفقه يبحث في أحكام الإمامة العظمى والولاية وما يتعلَّق بهما، كما يمكن اعتباره من أوائل الكتب في نظم الحكم، إذا استثنينا كتاب العلَّامة ابن تيمية السياسة الشرعية.

عملي في الكتاب:

ويمكن تلخيص ما قمنا به من عملٍ في النقاط التالية:

أولا: أخذنا على أنفسنا أن يكون تناولنا للكتاب ودراستنا موضوعية، فما نراه متفقًا

কথিত সমকক্ষ ও অংশীদারগণ।

যদ্যপি ইসলামের ব্যাপকতা এবং এটি যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, এই বিষয়টি অনেকের কাছে একটি স্বীকৃত এবং সন্দেহাতীত ধ্রুব সত্য হিসেবে পরিগণিত, তবুও আমরা অপর একটি পক্ষকে দেখতে পাই যারা জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়াদি, বিশেষ করে রাজনৈতিক বিষয়সমূহ থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।

এই মতপার্থক্যের প্রেক্ষাপটে আমাদের সমৃদ্ধ ইসলামি ঐতিহ্যের দিকে ফিরে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল, যাতে আমরা সেখান থেকে মূলনীতিসমূহ আহরণ করতে পারি এবং এর নিদর্শনসমূহ অনুধাবন করতে পারি; যাতে আমরা দেখতে পাই যে, পূর্ববর্তী মুসলিম আলেমগণ শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়াবলিতে কীভাবে তাদের মতামত প্রদান করেছেন এবং মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহ এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সিরাত ও তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদীনের ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে ইসলামের শাসনব্যবস্থাকে তাত্ত্বিক ও আইনি রূপ দিতে তারা কীভাবে সচেষ্ট হয়েছেন।

তবে একজন গবেষকের জন্য নিরপেক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার স্বার্থে এই প্রচেষ্টাগুলোকে সেগুলোর সমকালীন প্রেক্ষাপট ও যে সময়ে তা রচিত হয়েছিল সেই সময়ের আলোকে বিচার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; যাতে আমরা দেখতে পাই যে, তা তৎকালীন সময়ে কোনো গুরুত্ব বহন করত কি না।

একইভাবে আমাদের উচিত এই প্রচেষ্টাগুলোকে কোনো প্রকার পক্ষপাত বা অবিচার ছাড়াই পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে দেখা। কারণ অনেক গবেষকই প্রাচীন যা কিছু আছে তাকেই সঠিক বলে মনে করেন; এমনকি বর্তমান যুগের অনেক গবেষকের কাজ কেবল গ্রন্থকারের প্রশংসা,

তাঁর রচনাশৈলী ও বিন্যাসের গুণগান এবং বইটিতে তিনি যা কিছু উল্লেখ করেছেন তার সত্যতা প্রমাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।
অন্যদিকে, আমরা এমন একদলকে দেখতে পাই যারা নিজেদের আধুনিকতা ও প্রগতির প্রবক্তা হিসেবে দাবি করে এবং প্রাচীন ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়, আর সেগুলোকে অনগ্রসরতা, অগভীরতা এবং বর্তমান যুগের জন্য অনুপযোগী হিসেবে আখ্যায়িত করে।
সে কারণেই ইমাম মাওয়ার্দীর ‘আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ’ গ্রন্থটি সম্পাদনা করার বিষয়ে আমরা আগ্রহী হয়েছিলাম, যা ফিকহ শাস্ত্রের একটি এমন গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত যেখানে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও শাসনব্যবস্থা এবং এ সংক্রান্ত বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যার ‘আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ’ গ্রন্থটিকে বাদ দিলে একে শাসনব্যবস্থার ওপর রচিত প্রাথমিক বইগুলোর অন্যতম ধরা যেতে পারে।
গ্রন্থে আমার কর্মপদ্ধতি:
আমাদের সম্পাদিত কাজগুলোকে নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোতে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:
প্রথমত: আমরা গ্রন্থটি উপস্থাপন এবং পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার অঙ্গীকার করেছি, ফলে যা আমাদের কাছে সংগতিপূর্ণ মনে হয়েছে...

(ص: 7)الأحكام السلطانية للماوردي

ومبادئ الإسلام وقواعده دلَّلْنَا عليه، وذكرنا الشواهد والنصوص لتأكيده، وما رأينا أنَّه مخالف لهذه المبادئ وتلك القواعد ذكرنا من النصوص ما يؤكِّد مخالفته.
ثانيًا: قمت بعمل ترجمة للمصنِّف.
ثالثًا: حرصت على تفصيل ما أجمله المصنِّف من مسائل وأحكام بالرجوع إلى كتب الفقه والأصول؛ لتتضح الصورة أكثر، وليستوثق من هذه الأحكام.

رابعًا: لاحظت أنَّ المصنِّف في كتابه كثيرًا ما يغفل مذهب الإمام أحمد في كثير من القضايا والأحكام، لذلك رأيت من الإنصاف أن أشير إلى أقوال الحنابلة في هامش الكتاب.

خامسًا: حرصت على تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب مع ذكر تعليقات المحدثين وحكمهم عليها، خاصَّة الحافظ ابن حجر، والزيلعي قديمًا، وفضيلة الشيخ الألباني حديثًا.

سادسًا: قمت كذلك بالترجمة لمعظم الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب.

سابعا: قمت بتبويب الكتاب، وذلك بوضع عناوين تعبِّر عن كل فصل من الفصول التي ذكرها المصنِّف.

وبعد، فأدعو الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب وتلك الدراسة، إنَّه وليّ ذلك ومولاه.

أحمد جاد

আমরা ইসলামের মূলনীতি ও বিধিবিধানের ওপর প্রমাণ পেশ করেছি এবং তা সুসংহত করতে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য ও দলীল উল্লেখ করেছি। আর যা কিছু এই মূলনীতি ও বিধিবিধানের পরিপন্থী বলে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়েছে, তার অসারতা প্রমাণে সংশ্লিষ্ট পাঠ্যসমূহ উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয়ত: আমি গ্রন্থকারের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রস্তুত করেছি।

তৃতীয়ত: গ্রন্থকার যেসকল মাসআলা ও আহকাম সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, ফিকহ ও উসূলে ফিকহের কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি প্রদানের মাধ্যমে আমি সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হয়েছি; যাতে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় এবং এই বিধানসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করা যায়।

চতুর্থত: আমি লক্ষ্য করেছি যে, গ্রন্থকার তাঁর কিতাবে বহু বিষয় ও বিধানের ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল-এর মাযহাবের কথা প্রায়ই উল্লেখ করেননি। তাই ন্যায়বিচারের দাবি স্বরূপ কিতাবের পাদটীকায় হাম্বলী মাযহাবের মতামতসমূহ উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেছি।

পঞ্চমত: কিতাবে বর্ণিত হাদীসসমূহের তাখরীজ (উৎস নির্দেশ) করার ব্যাপারে আমি যত্নবান হয়েছি এবং সেই সঙ্গে মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য ও হাদীসের মান সম্পর্কে তাঁদের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছি; বিশেষ করে পূর্বসূরীদের মধ্য থেকে হাফেয ইবনে হাজার ও যাইলায়ী এবং বর্তমান যুগের বিশিষ্ট শায়খ আলবানীর মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছি।
ষষ্ঠত: কিতাবে উল্লিখিত অধিকাংশ বরেণ্য ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও আমি প্রদান করেছি।
সপ্তমত: আমি কিতাবটিকে বিভিন্ন শিরোনামে বিন্যস্ত করেছি, যা গ্রন্থকার বর্ণিত প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলে।
পরিশেষে, আমি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই কিতাব ও গবেষণার মাধ্যমে সকলকে উপকৃত করেন। নিশ্চয়ই তিনি এর একমাত্র অভিভাবক ও অধিকর্তা।
আহমাদ জাদ

ترجمة المصنّف:
الإمام الماوردي [364هـ - 450هـ] [975م - 1058م]
نسبه ومولده:
هو علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن البصري، المعروف بالماورديّ نسبةً إلى بيع ماء الورد، أقضى قضاة عصره، من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة. وُلِدَ سنة 364هـ/ 975م في البصرة.
اجتهاده وطلبه للعلم:
وُلِدَ الماوردي في البصرة لأبٍ يعمل ببيع ماء الورد، فنسب إليه فقيل: "الماوردي".

ارتحل به أبوه إلى بغداد، وبها سمع الحديث، ثم لازم واستمع إلى أبي حامد الإسفراييني، كما حدَّث عن الحسن الجيلي.

عمل الماوردي بالتدريس في بغداد ثم بالبصرة، وعاد إلى بغداد مرة أخرى، كان يعلِّم الحديث وتفسير القرآن، لقِّبَ عام 429هـ بأقضى القضاة، وكانت مرتبته أدنى من قاضي القضاة، ثم بعد ذلك تولَّى منصب قاضي القضاة.

مكانته العلمية:

يعتبر الماوردي من أكبر فقهاء الشافعية، والذي ألَّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءًا.

وقد نال الماوردي حظوة كبيرة عند الخليفة المقتدر "المتولي بين سنتي 381 و422هـ"، وعند بني بويه، وربما توسَّطَ بينهم وبين الملوك وكبار الأمراء فيما يصلح به خللًا أو يزيل خلافًا.

وقد كان معاصرًا لخليفتين من أطول الخلفاء بقاءً في الحكم: الخليفة العباسي القادر بالله، ومن بعده ابنه القائم بأمر الله، الذي وصل الضعف به مبلغه حتى إنَّه قد خُطِبَ في عهده للخليفة الفاطمي على منابر بغداد.

وكان الماوردي ذا علاقات مع رجال الدولة العباسية، كما كان سفير العباسيين ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة، وبسبب علاقاته هذه يرجِّح البعض كثرة كتابته عمَّا يسمَّى بالفقه

গ্রন্থকারের পরিচিতি:

ইমাম আল-মাওয়ার্দি [৩৬৪ হি. - ৪৫০ হি.] [৯৭৫ খ্রি. - ১০৫৮ খ্রি.]

বংশপরিচয় ও জন্ম:

তিনি হলেন আলী বিন মুহাম্মদ বিন হাবিব, আবুল হাসান আল-বসরি, গোলাপজল বিক্রির পেশার সাথে সম্পৃক্ততার কারণে 'আল-মাওয়ার্দি' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের প্রধানতম বিচারপতি (আকদাল কুদাত), গবেষক আলিম এবং বহু কল্যাণকর গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ৩৬৪ হিজরি/৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর জ্ঞানসাধনা ও ইলম অর্জন:

আল-মাওয়ার্দি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোলাপজল বিক্রির ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর দিকে নিসবত করে তাঁকে "আল-মাওয়ার্দি" বলা হতো।

তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে বাগদাদে গমন করেন এবং সেখানে তিনি হাদিস শ্রবণ করেন। অতঃপর তিনি আবু হামিদ আল-ইসফরাইনি-র সান্নিধ্যে থেকে দীর্ঘকাল তাঁর নিকট পাঠ গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি হাসান আল-জিলি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আল-মাওয়ার্দি বাগদাদে এবং পরবর্তীতে বসরায় শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসেন। তিনি হাদিস ও কুরআনের তাফসির শিক্ষা দিতেন। ৪২৯ হিজরিতে তাঁকে 'আকদাল কুদাত' (প্রধানতম বিচারপতি) উপাধিতে ভূষিত করা হয়, যা ছিল 'কাদি উল-কুদাত' পদের ঠিক পরবর্তী পর্যায়ের একটি পদমর্যাদা। পরবর্তীকালে তিনি 'কাদি উল-কুদাত' (প্রধান বিচারপতি) পদে অধিষ্ঠিত হন।

তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদা:

আল-মাওয়ার্দিকে শাফেয়ী মাজহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ হিসেবে গণ্য করা হয়, যিনি শাফেয়ী ফিকহের ওপর বিশ খণ্ডেরও অধিক বিস্তৃত এক বিশাল বিশ্বকোষ রচনা করেছেন।

আল-মাওয়ার্দি খলিফা আল-কাদির বিল্লাহর (যিনি ৩৮১ থেকে ৪২২ হিজরি পর্যন্ত শাসনে ছিলেন) নিকট এবং বুওয়াইহি রাজবংশের কাছে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও উচ্চ মর্যাদাবান ছিলেন। অনেক সময় তিনি তাঁদের এবং বিভিন্ন রাজা ও উচ্চপদস্থ আমিরদের মধ্যে বিবাদ নিরসন বা ত্রুটি সংশোধনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন।

তিনি দীর্ঘতম শাসনকাল অতিবাহিতকারী দুজন খলিফার সমসাময়িক ছিলেন: আব্বাসীয় খলিফা আল-কাদির বিল্লাহ এবং তাঁর পুত্র আল-কায়িম বি-আমরিল্লাহ। আল-কায়িমের শাসনামলে কেন্দ্রীয় শাসন এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, বাগদাদের মিম্বরগুলোতে ফাতেমীয় খলিফার নামে খুতবা পাঠ করা হয়েছিল।

আল-মাওয়ার্দির সাথে আব্বাসীয় রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সুসম্পর্ক ছিল। তিনি বুওয়াইহি ও সেলজুকদের দরবারে আব্বাসীয়দের রাষ্ট্রদূত ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর এই গভীর রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণেই অনেকে মনে করেন যে, তিনি তথাকথিত রাজনৈতিক ফিকহ বা রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে অধিক লেখালেখি করেছেন।

السياسي، وقد اتُّهِمَ الماوردي بالاعتزال، ولكن انتصر له تلميذه الخطيب البغدادي فدافع عنه ودفع عنه الادِّعَاء، وقد كان مصنِّفًا قديرًا بارعًا، تدل كتبه المختلفة على مقدرةٍ في التفكير وبراعة في التعبير.

آثاره العلمية:

ترك الإمام الماوردي العديد من المصنَّفات في نظم الحكم وشئون السياسة، نذكر منها:

- أدب الدنيا والدين.
- الأحكام السلطانية.
- قانون الوزارة.

أما كتبه الأخرى فمنها:

- سياسة أعلام النبوة.
- كتاب الحاوي الكبير، في فقه الشافعية، في أكثر من عشرين جزءًا.
- كتاب نصيحة الملوك.
- كتاب قوانين الوزارة وسياسية الملك.
- كتاب التفسير.
- كتاب الإقناع، وهو مختصر كتاب الحاوي
- كتاب أدب القاضي.
- كتاب أعلام النبوة.
- كتاب تسهيل النظر.
- كتاب الأمثال والحكم في تفسير القرآن "النكت والعيون".

وقد نال الأخير عناية المفسرين المتأخِّرين ونقلوا عنه، كابن الجوزي في: زاد المسير، والقرطبي في تفسيره: الجامع لأحكام القرآن.

وفاته:

توفِّي الإمام في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سنة 450هـ، ودُفِنَ من الغدِ في مقبرة باب حرب، وكان قد بلغ 86 سنة، وصلَّى عليه الإمام الخطيب البغدادي.

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, আল-মাওয়ার্দিকে মুতাজিলা মতবাদের অনুসারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল; তবে তার ছাত্র খতিব আল-বাগদাদি তার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন, তার প্রতিরক্ষা করেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করেন। তিনি একজন অত্যন্ত দক্ষ ও প্রতিভাবান লেখক ছিলেন। তার বিভিন্ন গ্রন্থ প্রখর চিন্তাশক্তি এবং চমৎকার প্রকাশভঙ্গির পরিচয় দেয়।

তার ইলমি বা জ্ঞানতাত্ত্বিক অবদানসমূহ:

ইমাম আল-মাওয়ার্দি শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দীন।
- আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ।
- কানুনুল উইজারাহ।

তার অন্যান্য গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে:

- সিয়াসাতু আলামিন নুবুওয়াহ।
- কিতাবুল হাওয়িল কাবির: এটি শাফেয়ি ফিকহের ওপর রচিত, যা বিশ খণ্ডেরও অধিক।
- কিতাব নাসিহাতুল মুলুক।
- কিতাবু কাওয়ানিনিল উইজারাহ ওয়া সিয়াসাতিল মুলক।
- কিতাবুত তাফসির।
- কিতাবুল ইকনা: এটি কিতাবুল হওয়ি গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার।
- কিতাবু আদাবিল কাজি।
- কিতাবু আলামিন নুবুওয়াহ।
- কিতাবু তাসরিল নাজার।

- কুরআনের তাফসিরে কিতাবুল আমসাল ওয়াল হিকাম, যা "আন-নুকাত ওয়াল উয়ুন" নামে পরিচিত।
পরবর্তী যুগের মুফাসসিরগণ এই শেষোক্ত গ্রন্থটির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং এখান থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন, যেমন ইবনুল জাওজি তার 'জাদুল মাসির' গ্রন্থে এবং কুরতুবি তার তাফসির গ্রন্থ 'আল-জামি লি আহকামিল কুরআন'-এ।
মৃত্যু:
ইমাম ৪৫০ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিনে মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করেন এবং পরদিন তাকে 'বাব হারব' নামক গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর এবং ইমাম খতিব আল-বাগদাদি তার জানাজার নামাজ পড়ান।

(ص: 13)الأحكام السلطانية للماوردي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤلف:

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْضَحَ لَنَا مَعَالِمَ الدِّينِ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ، وَشَرَعَ لَنَا مِنَ الْأَحْكَامِ، وَفَصَّلَ لَنَا مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَا جَعَلَهُ عَلَى الدُّنْيَا حُكْمًا تَقَرَّرَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْخَلْقِ، وَثَبَتَتْ بِهِ قَوَاعِدُ الْحَقِّ، وَوَكَّلَ إِلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ مَا أَحْسَنَ فِيهِ التَّقْدِيرَ، وَأَحْكَمَ بِهِ التَّدْبِيرَ، فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَدَّرَ وَدَبَّرَ، وَصَلَوَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى رَسُولِهِ الَّذِي صَدَعَ بِأَمْرِهِ، وَقَامَ بِحَقِّهِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ.

وَلَمَّا كَانَتِ الْأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ بِوُلَاةِ الْأُمُورِ أَحَقَّ، وَكَانَ امْتِزَاجُهَا بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَصَفُّحِهَا مَعَ تَشَاغُلِهِمْ بِالسِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ، أَفْرَدْتُ لَهَا كِتَابًا امْتَثَلْتُ فِيهِ

أَمْرَ مَنْ لَزِمَتْ طَاعَتُهُ؛ لِيَعْلَمَ مَذَاهِبَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا لَهُ مِنْهَا فَيَسْتَوْفِيهِ، وَمَا عَلَيْهِ مِنْهَا فَيُوَفِّيهِ؛ تَوَخِّيًا لِلْعَدْلِ فِي تَنْفِيذِهِ وَقَضَائِهِ، وَتَحَرِّيًا لِلنَّصَفَةِ فِي أَخْذِهِ وَعَطَائِهِ، وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى حُسْنَ مَعُونَتِهِ، وَأَرْغَبُ إِلَيْهِ فِي تَوْفِيقِهِ وَهِدَايَتِهِ، وَهُوَ حَسْبِي وَكَفَى.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ نَدَبَ لِلْأُمَّةِ زَعِيمًا خَلَفَ بِهِ النُّبُوَّةَ، وَحَاطَ بِهِ الْمِلَّةَ، وَفَوَّضَ إِلَيْهِ السِّيَاسَةَ؛ لِيَصْدُرَ التَّدْبِيرُ عَنْ دِينٍ مَشْرُوعٍ، وَتَجْتَمِعَ الْكَلِمَةُ عَلَى رَأْيٍ مَتْبُوعٍ، فَكَانَتْ الْإِمَامَةُ أَصْلًا عَلَيْهِ اسْتَقَرَّتْ قَوَاعِدُ الْمِلَّةِ، وَانْتَظَمَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْأُمَّةِ حَتَّى اسْتَثْبَتَتْ بِهَا الْأُمُورُ الْعَامَّةُ، وَصَدَرَتْ عَنْهَا الْوِلَايَاتُ الْخَاصَّةُ، فَلَزِمَ تَقْدِيمُ حُكْمِهَا عَلَى كُلِّ حُكْمٍ سُلْطَانِيٍّ، وَوَجَبَ ذِكْرُ مَا اخْتَصَّ بِنَظَرِهَا عَلَى كُلِّ نَظَرٍ دِينِيٍّ؛ لِتَرْتِيبِ أَحْكَامِ الْوِلَايَاتِ عَلَى نَسَقٍ مُتَنَاسِبِ الْأَقْسَامِ، مُتَشَاكِلِ الْأَحْكَامِ.

وَالَّذِي تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكِتَابُ مِنْ الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْوِلَايَاتِ الدِّينِيَّةِ عِشْرُونَ بَابًا؛

فَالْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي عَقْدِ الْإِمَامَةِ.

وَالْبَابُ الثَّانِي: فِي تَقْلِيدِ الْوَزَارَةِ.

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।

লেখকের ভূমিকা:

এবং আমাদের নেতা মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার ও তাঁর সাথীদের ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক

শায়খ ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দি বলেছেন: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের নিকট দ্বীনের নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট করেছেন, সুস্পষ্ট কিতাবের মাধ্যমে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাদের জন্য বিধানসমূহ বিধিবদ্ধ করেছেন এবং হালাল ও হারামকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি জগতের জন্য এমন এক মানদণ্ড করেছেন যার দ্বারা সৃষ্টির কল্যাণ সুনিশ্চিত হয় এবং সত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; আর তিনি শাসনকর্তাদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যার নির্ধারণ তিনি অত্যন্ত উত্তমভাবে করেছেন এবং যার পরিচালনা তিনি সুদৃঢ় করেছেন। সুতরাং প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য সেই বিষয়ের ওপর যা তিনি নির্ধারণ ও পরিচালনা করেছেন। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসূলের ওপর যিনি তাঁর আদিষ্ট

বিষয় স্পষ্টভাবে প্রচার করেছেন এবং তাঁর প্রাপ্য হক যথাযথভাবে আদায় করেছেন, তিনি হলেন নবী মুহাম্মদ, এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীদের ওপর।

যেহেতু রাষ্ট্রীয় বিধানাবলি শাসনকর্তাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি উপযোগী, কিন্তু সাধারণ বিধানসমূহের সাথে এগুলোর সংমিশ্রণ থাকার কারণে এবং রাজনীতি ও প্রশাসনিক কার্যে লিপ্ত থাকার ফলে তাদের পক্ষে সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব হয় না, তাই আমি এই বিষয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছি। এতে আমি এমন একজনের নির্দেশ পালন করেছি যাঁর আনুগত্য করা অপরিহার্য; যাতে তিনি এই সংক্রান্ত বিষয়ে ফুকাহাগণের মাযহাবসমূহ জানতে পারেন এবং যা তাঁর প্রাপ্য তা যেন তিনি যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারেন এবং যা তাঁর ওপর কর্তব্য তা যেন তিনি পূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারেন। এটি করা হয়েছে তাঁর শাসন ও বিচারকার্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে। আর আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে তাঁর উত্তম সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকট তাওফীক ও হেদায়াত কামনা করছি। তিনি আমার জন্য যথেষ্ট ও সর্বোত্তম অভিভাবক।

অতঃপর:

নিশ্চয়ই আল্লাহ—তাঁর ক্ষমতা সুমহান—এই উম্মতের জন্য একজন নেতা নিযুক্ত করেছেন যার মাধ্যমে তিনি নবুওয়াতের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, এর দ্বারা মিল্লাতকে (দ্বীনকে) সুরক্ষা দিয়েছেন এবং রাজনীতি ও শাসন পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেছেন; যাতে শাসনকার্য শরীয়তসম্মত দ্বীনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং জনমত একটি অনুসরণীয় সিদ্ধান্তের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়। অতএব, ইমামত (নেতৃত্ব) হলো এমন একটি মূলভিত্তি যার ওপর মিল্লাতের নিয়মাবলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যার মাধ্যমে উম্মতের কল্যাণ সুসংবদ্ধ হয়েছে, ফলে এর মাধ্যমে সাধারণ বিষয়সমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর থেকেই বিশেষ প্রশাসনিক দায়িত্বসমূহ উৎসারিত হয়েছে। সুতরাং, প্রতিটি রাষ্ট্রীয় বিধানের ওপর ইমামতের বিধানকে অগ্রগণ্য করা অপরিহার্য এবং প্রতিটি ধর্মীয় আলোচনার ওপর এর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা বাধ্যতামূলক; যাতে প্রশাসনিক দায়িত্বসমূহের বিধানাবলিকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাসে ও সদৃশ বিধানে সাজানো সম্ভব হয়।

এই গ্রন্থটি রাষ্ট্রীয় বিধানাবলি এবং ধর্মীয় প্রশাসনিক দায়িত্বসমূহের যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে তা মোট বিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত;

প্রথম অধ্যায়: ইমামত বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: মন্ত্রিত্ব (ওজরাত) প্রদান প্রসঙ্গে।

(ص: 14)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالْبَابُ الثَّالِثُ: فِي تَقْلِيدِ الْإِمَارَةِ عَلَى الْبِلَادِ.

وَالْبَابُ الرَّابِعُ: فِي تَقْلِيدِ الْإِمَارَةِ عَلَى الْجِهَادِ.

وَالْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْوِلَايَةِ عَلَى الْمَصَالِحِ.

وَالْبَابُ السَّادِسُ: فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ.

وَالْبَابُ السَّابِعُ: فِي وِلَايَةِ الْمَظَالِمِ.

وَالْبَابُ الثَّامِنُ: فِي وِلَايَةِ النِّقَابَةِ عَلَى ذَوِي الْأَنْسَابِ.

وَالْبَابُ التَّاسِعُ: فِي الْوِلَايَةِ عَلَى إِمَامَةِ الصَّلَوَاتِ.

وَالْبَابُ الْعَاشِرُ: فِي الْوِلَايَةِ عَلَى الْحَجِّ.

وَالْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي وِلَايَةِ الصَّدَقَاتِ.

وَالْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ: فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ.

وَالْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ.

وَالْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِيمَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ مِنَ الْبِلَادِ.

وَالْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ.

وَالْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: فِي الْحِمَى وَالْأَرْفَاقِ.

وَالْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: فِي أَحْكَامِ الْإِقْطَاعِ.

وَالْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ: فِي وَضْعِ الدِّيوَانِ وَذِكْرِ أَحْكَامِهِ.

وَالْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي أَحْكَامِ الْجَرَائِمِ.

وَالْبَابُ الْعِشْرُونَ: فِي أَحْكَامِ الْحِسْبَةِ.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন জনপদের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রদান প্রসঙ্গে।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: জিহাদের সামরিক নেতৃত্ব প্রদান প্রসঙ্গে।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর দায়িত্বভার প্রসঙ্গে।
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: বিচার বিভাগের দায়িত্বভার প্রসঙ্গে।
সপ্তম পরিচ্ছেদ: মাজালিম (অন্যায় প্রতিকার) আদালতের দায়িত্বভার প্রসঙ্গে।
অষ্টম পরিচ্ছেদ: উচ্চবংশীয়দের বংশীয় নেতৃত্ব (নিকাবাত) নির্ধারণ প্রসঙ্গে।
নবম পরিচ্ছেদ: সালাতের ইমামত পরিচালনার দায়িত্বভার প্রসঙ্গে।
দশম পরিচ্ছেদ: হজের তত্ত্বাবধান প্রসঙ্গে।
একাদশ পরিচ্ছেদ: সদকা বা যাকাত আদায়ের দায়িত্বভার প্রসঙ্গে।
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: ফাই এবং গনীমত বণ্টনের বিধান প্রসঙ্গে।
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: জিযয়া এবং খরাজ নির্ধারণ প্রসঙ্গে।
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ: ভূখণ্ডের ভিন্নতার কারণে বিধি-বিধানের বিভিন্নতা প্রসঙ্গে।
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ: অনাবাদি জমি আবাদকরণ এবং পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে।
ষোড়শ পরিচ্ছেদ: সংরক্ষিত এলাকা এবং জন-উপযোগিতা প্রসঙ্গে।
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ: ইকতা বা ভূমি বরাদ্দের বিধান প্রসঙ্গে।
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ: দেওয়ান (রাষ্ট্রীয় দপ্তর) প্রতিষ্ঠা এবং এর বিধান প্রসঙ্গে।
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ: অপরাধ দণ্ডবিধির বিধান প্রসঙ্গে।
বিংশ পরিচ্ছেদ: হিসবাহ (জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা রক্ষা) সংক্রান্ত বিধান প্রসঙ্গে।

الباب الأول: في عقد الإمامة

مدخل

...

البَابُ الأَوَّلُ: فِي عَقدِ الإِمَامَةِ

الْإِمَامَةُ1: مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا، وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَقُومُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ شَذَّ عَنْهُمُ الْأَصَمُّ.

هَلْ الخِلَافَةُ وَاجِبَةٌ بِالشَّرْعِ أَمْ بِالْعَقْلِ؟

وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهَا2 هَلْ وَجَبَتْ بِالْعَقْلِ أَوْ بِالشَّرْعِ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: وَجَبَتْ بِالْعَقْلِ لِمَا فِي طِبَاعِ الْعُقَلَاءِ مِنَ التَّسْلِيمِ لِزَعِيمٍ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّظَالُمِ، وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ فِي التَّنَازُعِ وَالتَّخَاصُمِ، وَلَوْلَا الْوُلَاةُ لَكَانُوا فَوْضَى مُهْمَلِينَ، وَهَمَجًا مُضَاعِينَ، وَقَدْ قَالَ الْأَفْوَهُ الْأَوْدِيُّ3، وَهُوَ شَاعِرٌ جَاهِلِيٌّ "مِنَ الْبَسِيطِ":

لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ ... وَلَا سَرَاةٌ إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: بَلْ وَجَبَتْ بِالشَّرْعِ دُونَ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَقُومُ بِأُمُورٍ شَرْعِيَّةٍ قَدْ

---

1 قلت: والإمامة والخلافة مصطلحان مترادفان، وإن كان مصطلح الخلاقة أسبق، ومصطلح الإمامة أكثر ما يتردَّد عند الشيعة، والإمامية منهم خاصة، لكنَّ المعنى يكاد يكون واحدًا، وهو: رئاسة عامَّة في أمر الدين والدنيا، كما قال التفتازاني، أو: هي خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدِّين وحفظ حوزة الملَّة، يجب اتباعه على كافَّة الأمة، كما قال عضد الدين الإيجي في شرح المواقف، أو: هي خلافةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ رشيد رضا في كتابه الخلافة.

2 يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله: إنَّ أهل السنَّة والمعتزلة يرون أنَّ الخلافة واجب شرعي، ولكنَّهم يختلفون في أساس هذا الوجوب؛ فأهل السُّنَّة يرون أنَّ سند وجوب الخلافة هو الإجماع، أمَّا الرأي الآخرِ وغالب أنصاره من المعتزلة، فيرى أنَّ سند الوجوب هو العقل، وهناك طائفة من المعتزلة ترى أنَّ سند وجوب الخلافة شرعيّ وعقليّ في واقت واحد، ويرى الشيعة كذلك وجوب إقامة الحكومة الإسلامية. "فقه الخلافة وتطورها: ص 59".

3 الأفوه الأودي، هو صلاءة بن عمرو بن مالك، أبو ربيعة، من بني أود، من مذحج؛ شاعر يماني جاهلي، لقِّبَ بالأفوه لأنَّه كان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان، كان سيِّدَ قومه وقائدهم في حروبهم، وهو أحد الحكماء والشعراء في عصره.

প্রথম পরিচ্ছেদ: ইমামত (নেতৃত্ব) প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে

উপক্রমণিকা

…

প্রথম পরিচ্ছেদ: ইমামত প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে

ইমামত১: এটি মূলত দ্বীন সংরক্ষণ এবং পার্থিব বিষয়াবলি শাসনের ক্ষেত্রে নবুয়তের স্থলাভিষিক্ততা। উম্মতের মধ্যে যারা এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম, তাদের জন্য ইমামত বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ইজমা বা সর্বসম্মতি অনুযায়ী ওয়াজিব; যদিও আল-আসাম্ম এ ক্ষেত্রে উম্মতের বিপরীতে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

খিলাফত কি শরয়ি কারণে ওয়াজিব নাকি বুদ্ধিগত কারণে?

এর অপরিহার্যতা২ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যে, এটি কি বুদ্ধিগত কারণে ওয়াজিব নাকি শরয়ি কারণে? একদল বলেছেন: এটি বুদ্ধিগত কারণে ওয়াজিব; কারণ বুদ্ধিমানদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হলো এমন একজন নেতার বশ্যতা স্বীকার করা যিনি তাদেরকে পারস্পরিক জুলুম থেকে বিরত রাখবেন এবং বিবাদ ও ঝগড়ার মীমাংসা করবেন। যদি শাসক না থাকত, তবে মানুষ বিশৃঙ্খল ও লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ত এবং এক দিশেহারা ও অসভ্য জাতিতে পরিণত হতো। জাহেলি যুগের কবি আল-আফওয়াহ আল-আওদি৩ ‘বাসিত’ ছন্দে বলেছেন:

নেতৃত্বহীন বিশৃঙ্খল অবস্থায় মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় না … আর প্রকৃত কোনো নেতা থাকে না যখন মূর্খরা তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

অন্য একটি দল বলেছে: বরং এটি বুদ্ধিগত কারণে নয়, শরয়ি কারণেই ওয়াজিব; কারণ ইমাম এমন সব শরয়ি বিষয়াবলি আঞ্জাম দেন যা…

---

১ আমি বলছি: ইমামত ও খিলাফত পরিভাষা দুটি সমার্থক, যদিও খিলাফত পরিভাষাটির ব্যবহার প্রাচীনতর এবং ইমামত পরিভাষাটি শিয়াদের নিকট, বিশেষ করে ইমামিয়াদের নিকট অধিক প্রচলিত। তবে এর অর্থ প্রায় অভিন্ন, আর তা হলো: দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে সাধারণ নেতৃত্ব, যেমনটি তাফতাযানি বলেছেন; অথবা এটি হলো দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও মিল্লাতের সীমানা

রক্ষায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়া, যার অনুসরণ করা সকল উম্মতের ওপর ওয়াজিব, যেমনটি আদুদুদ্দিন আল-ইজি 'শারহুল মাওয়াকিফ'-এ বলেছেন; অথবা এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধিত্ব করা, যেমনটি শাইখ রশীদ রিদা তার 'আল-খিলাফাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

২ ডক্টর আবদুর রাজ্জাক আল-সানহুরি (রহ.) বলেন: আহলুস সুন্নাহ ও মুতাজিলাগণ মনে করেন যে খিলাফত একটি শরয়ি দায়িত্ব, তবে এই ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তির ক্ষেত্রে তারা দ্বিমত পোষণ করেন; আহলুস সুন্নাহর মতে খিলাফত ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো ইজমা। অন্যদিকে অন্য একটি মত—যার অধিকাংশ সমর্থক মুতাজিলা—মনে করে যে, এর দলিল হলো বুদ্ধি। মুতাজিলাদের একটি অংশ মনে করে খিলাফত একই সাথে শরয়ি এবং বুদ্ধিগত কারণে ওয়াজিব। শিয়াগণও ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব মনে করেন। (ফিকহুল খিলাফাহ ওয়া তাতাউয়ুরুহা: পৃ. ৫৯)।

৩ আল-আফওয়াহ আল-আওদি হলেন সালাআ বিন আমর বিন মালিক, আবু রাবিয়া, বনু আওদ ইবনে মাযহিজ গোত্রের। তিনি জাহেলি যুগের একজন ইয়ামানি কবি। তাকে 'আল-আফওয়াহ' বলা হতো কারণ তার ঠোঁট ছিল মোটা এবং দাঁতগুলো বেরিয়ে থাকত। তিনি তার গোত্রের সর্দার এবং যুদ্ধবিগ্রহে তাদের সেনাপতি ছিলেন। তিনি তার সময়ের অন্যতম প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ও কবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(ص: 16)الأحكام السلطانية للماوردي

كَانَ مُجَوَّزًا فِي الْعَقْلِ أَنْ لَا يَرِدَ التَّعَبُّدُ بِهَا، فَلَمْ يَكُنِ الْعَقْلُ مُوجِبًا لَهَا، وَإِنَّمَا أَوْجَبَ الْعَقْلُ أَنْ يَمْنَعَ كُلُّ وَاحِدٍ نَفْسَهُ مِنَ الْعُقَلَاءِ عَنِ التَّظَالُمِ وَالتَّقَاطُعِ، وَيَأْخُذَ بِمُقْتَضَى الْعَدْلِ فِي التَّنَاصُفِ وَالتَّوَاصُلِ، فَيَتَدَبَّرُ بِعَقْلِهِ لَا بِعَقْلِ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ جَاءَ الشَّرْعُ بِتَفْوِيضِ الْأُمُورِ إِلَى وَلِيِّهِ فِي الدِّينِ، قَالَ اللَّهُ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] .

فَفَرَضَ عَلَيْنَا طَاعَةَ أُولِي الْأَمْرِ فِينَا، وَهُمُ الْأَئِمَّةُ الْمُتَأَمِّرُونَ عَلَيْنَا1.

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {سَيَلِيكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ، فَيَلِيكُمُ الْبَرُّ بِبِرِّهِ، وَيَلِيكُمُ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ} 2.

---

1 إذن لا بُدَّ -وفي كل الأحوال- للأمَّة أن تختار من تنيطه في تطبيق أحكام وحدود شرع الله في الأرض بين الناس، وإمضاء أحكامه، بل إنَّ إقامة الإمام أو الخليفة واجب وجوب الشريعة ذاته، تطبيقًا للمبدأ القائل: ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب. "انظر: الإسلام وأوضاعنا السياسية: عبد القادر عودة، ص: 109، 110".

2 ضعيف: رواه الدارقطني في سننه، باب: صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه "2/ 5"، والطبراني في الأوسط "6/ 247"، وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن هشام بن عروة إلّا عبد الله بن محمد بن عروة، تفرَّد به إبراهيم بن المنذر، ولم يسند هشام بن عروة عن أبي صالح هذا، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد "5/ 218"، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو ضعيف جدًّا.

فائدة: يقول الدكتور السنهوري -رحمه الله تعالى: والحقيقة أنَّ النصوص التي تذكر في هذا المجال ليست قاطعة في وجوب الخلافة باعتبارها ذلك النوع من نظم الحكم الذي يتميز بالخصائص التي أشرنا إليها، بل إنَّها تلزم المسلمين بإيجاد حكومة ما دون تحديد نوع هذه الحكومة، وتوجب عليهم طاعة هولاء الحكَّام، ولكنَّنَا نرى أنَّ هذه النصوص وإن لم تكف بذاتها سندًا لوجوب الخلافة، فهي على الأقلِّ كافية لتكون سندًا للإجماع الذي أوجبها. "فقه الخلافة وتطورها: ص6، هامش: 1".

যুক্তির নিরিখে এটি সম্ভব ছিল যে এগুলোর মাধ্যমে ইবাদত সাব্যস্ত হবে না, তাই বুদ্ধি এগুলোকে আবশ্যক করেনি। বরং বুদ্ধি কেবল এটাই আবশ্যক করে যে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেন নিজেকে জুলুম ও পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ থেকে বিরত রাখে এবং ইনসাফ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার দাবি অনুযায়ী চলে। সে যেন নিজের বুদ্ধির মাধ্যমে বিষয়টি অনুধাবন করে, অন্যের বুদ্ধিতে নয়। কিন্তু শরয়ি বিধান বিষয়াদির ভার দ্বীনের অভিভাবকের ওপর অর্পণ করার নির্দেশ নিয়ে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলুল আমর (কর্তৃত্বশীল), তাদেরও।" [আন-নিসা: ৫৯]।

সুতরাং তিনি আমাদের ওপর আমাদের মধ্য থেকে উলুল আমরের আনুগত্য ফরজ করেছেন, আর তারা হলেন সেই সব ইমাম যারা আমাদের ওপর কর্তৃত্বশীল।১

হিশাম ইবনে উরওয়া আবু সালিহ থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমার পরে তোমাদের ওপর শাসকরা কর্তৃত্ব করবে; পুণ্যবান তার পুণ্যসহ তোমাদের শাসন করবে এবং পাপাচারী তার পাপাচারসহ তোমাদের শাসন করবে। সুতরাং তোমরা তাদের কথা শোনো এবং প্রতিটি সত্যনিষ্ঠ বিষয়ে তাদের আনুগত্য করো। যদি তারা ভালো কাজ করে তবে তার সওয়াব তোমাদের ও তাদের উভয়ের জন্য, আর যদি তারা মন্দ কাজ করে তবে তার সওয়াব তোমাদের জন্য এবং তার দায়ভার তাদের ওপর।"২

---

১ সুতরাং সব অবস্থাতেই উম্মাহর জন্য এমন কাউকে নির্বাচন করা অপরিহার্য যাকে মানুষের মাঝে আল্লাহর জমিনে শরয়ি বিধান ও হদ কায়েম করার এবং তাঁর নির্দেশনাবলি কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। বরং ইমাম বা খলিফা নিয়োগ করা শরয়ি ওয়াজিবেরই অন্তর্ভুক্ত, যা এই মূলনীতির প্রয়োগ: "যে কাজ ছাড়া কোনো ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, সেই কাজটি করাও ওয়াজিব।" (দেখুন: আল-ইসলাম ওয়া আওদাউনা আস-সিয়ানিয়্যাহ: আব্দুল কাদির আওদাহ, পৃষ্ঠা: ১০৯, ১১০)।

২ দুর্বল: দারাকুতনি তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন, অনুচ্ছেদ: যার পেছনে সালাত জায়েজ এবং যার জানাজা পড়া যায় (২/৫); তাবারানি তাঁর আল-আউসাত গ্রন্থে (৬/২৪৭) এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উরওয়া ছাড়া আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি, ইবরাহিম ইবনুল মুনযির এতে একক হয়ে গেছেন। আর

হিশাম ইবনে উরওয়া এই আবু সালিহ থেকে কোনো বর্ণনা করেননি। হাইসামি এটি মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে (৫/২১৮) উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: তাবারানি এটি আল-আউসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তবে এতে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে উরওয়া রয়েছেন যিনি অত্যন্ত দুর্বল।
বিশেষ দ্রষ্টব্য: ডক্টর সানহুরি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষেত্রে উল্লিখিত নাস বা মূলপাঠগুলো খিলাফতকে সেই বিশেষ শাসনব্যবস্থা হিসেবে আবশ্যক করার ক্ষেত্রে অকাট্য নয় যেটির বৈশিষ্ট্যাবলি আমরা উল্লেখ করেছি। বরং এগুলো মুসলমানদের ওপর কোনো একটি সরকার ব্যবস্থা কায়েম করাকে আবশ্যক করে, তবে সরকারের ধরন সুনির্দিষ্ট করে দেয় না এবং এসব শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব করে। তবে আমরা মনে করি যে, এই নাসগুলো যদিও খিলাফত ওয়াজিব হওয়ার সপক্ষে এককভাবে দলিল হিসেবে যথেষ্ট নয়, কিন্তু অন্ততপক্ষে ইজমার ভিত্তি হওয়ার জন্য যথেষ্ট, যা খিলাফতকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। (ফিকহুল খিলাফাহ ওয়া তাতাওউরুহা: পৃষ্ঠা: ৬, টীকা: ১)।

(ص: 17)الأحكام السلطانية للماوردي

فَصْلٌ: "فِي بَيَانِ حُكْمِ الخِلَافَةِ"
فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْإِمَامَةِ فَفَرْضُهَا عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْجِهَادِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ. فَإِذَا قَامَ بِهَا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا سَقَطَ فَرْضُهَا عَلَى الْكِفَايَةِ. وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا أَحَدٌ خَرَجَ مِنَ النَّاسِ فَرِيقَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَهْلُ الِاخْتِيَارِ حَتَّى يَخْتَارُوا إِمَامًا لِلْأُمَّةِ1.
وَالثَّانِي: أَهْلُ الْإِمَامَةِ حَتَّى يَنْتَصِبَ أَحَدُهُمْ لِلْإِمَامَةِ. وَلَيْسَ عَلَى مَنْ عَدَا هَذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْأُمَّةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامَةِ حَرَجٌ وَلَا مَأْثَمٌ. وَإِذَا تَمَيَّزَ هَذَانِ الْفَرِيقَانِ مِنَ الْأُمَّةِ فِي فَرْضِ الْإِمَامَةِ وَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمَا بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ.
فَأَمَّا أَهْلُ الِاخْتِيَارِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ ثَلَاثَةٌ:

أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ الْجَامِعَةُ لِشُرُوطِهَا2

---

1 وهذا كما حدث بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

2 أقول: فالعدالة أمر مهم لا بُدَّ أن يتوافَر في أهل الشورى، حتى يؤتَمَنوا على مصالح المسلمين فضلًا على الإسلام، ولكن ما العدالة؟ يقول الأستاذ عبد القادر عودة في تحديد مفهومها:

"والعدالة هى التحلّي بالفرائض والفضائل، والتخلّي عن المعاصي والرذائل، وعمَّا يخِلُّ بالمروءة أيضًا".

فالعدالة في مجملها: هي الاستقامة الدينية التى تجعل صاحبها ملتزمًا بما يمليه عليه دينه في كل شيء؛ أقواله وأفعاله واعتقاده، فهي بمعنًى آخر: التقوى والورع.

فإذا تحققت هذه العدالة في أيّ إنسان فإنّها ستحيط جميع أقواله وأفعاله بسياج من الطهارة والوضوح، فيلتزم بما يمليه عليه ضميره الديني ووَرَعَه وتقاه.

لذلك كان شرط العدالة مُهِمًّا في كلِّ مَنْ يُخْتَار ليكون من أهل الحلِّ والعقدِ، بل وهو مهم في كل فردٍ حتى يكون صالحًا نافعًا لدينه ولوطنه.

لقد أثبت التاريخ أنَّ أهل التقوى هم أقدر الناس على نفع الرعية وخيرها، كما أثبت أنَّ طلاب السلطة من أهل الدنيا هم أقل الناس قدرة على هذا، بل هم دائمًا سبب شقاء العباد وفساد البلاد.

لذلك فلا ينبغي أن يكون من بين أهل الشورى مَنْ يَقْدَح في ذمته أو من يستبيح الكذب وخداع الناس!

পরিচ্ছেদ: খিলাফতের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে

যখন ইমামতের (নেতৃত্বের) আবশ্যকতা প্রমাণিত হলো, তখন এটি জিহাদ এবং জ্ঞান অন্বেষণের মতো একটি ফরজে কিফায়া (সামষ্টিক আবশ্যকতা)। সুতরাং যখন এর যোগ্য কোনো ব্যক্তি তা পালন করেন, তখন উম্মাহর অন্যদের ওপর থেকে এই ফরজের আবশ্যকতা

রহিত হয়ে যায়। আর যদি কেউ তা পালন না করে, তবে জনগণের মধ্য থেকে দুই শ্রেণির মানুষ দায়বদ্ধ হবে:

প্রথমত: নির্বাচক মণ্ডলী (আহলুল ইখতিয়ার), যতক্ষণ না তারা উম্মাহর জন্য একজন ইমাম নির্বাচন করেন।১

দ্বিতীয়ত: ইমামতের যোগ্য ব্যক্তিবর্গ, যতক্ষণ না তাদের মধ্য থেকে কেউ ইমামতের জন্য নিযুক্ত হন। এই দুই শ্রেণি ব্যতীত উম্মাহর অবশিষ্ট লোকদের ওপর ইমামত প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হওয়ার কারণে কোনো সংকীর্ণতা বা পাপ নেই। আর যখন ইমামতের এই আবশ্যিক দায়িত্ব পালনে উম্মাহর মধ্য থেকে এই দুই শ্রেণি স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হবে, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি বিবেচনা করা ওয়াজিব হবে।

নির্বাচক মণ্ডলীর জন্য বিবেচিত শর্তাবলি তিনটি:

প্রথমটি: সামগ্রিক ন্যায়পরায়ণতা (আদালাহ) যা এর সকল শর্তকে অন্তর্ভুক্ত করে।২

---

১. এটি ঠিক যেমনটি ঘটেছিল উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের পর।

২. আমি বলছি: ন্যায়পরায়ণতা বা আদালাহ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা শুরা সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য, যাতে করে ইসলামের পাশাপাশি মুসলিমদের স্বার্থের বিষয়েও তাদের ওপর আস্থা রাখা যায়। কিন্তু এই ন্যায়পরায়ণতা কী? এর ধারণার সীমানা নির্ধারণে উস্তাদ আব্দুল কাদির আওদাহ বলেন:

"ন্যায়পরায়ণতা বা আদালাহ হলো ফরজ কার্যাবলি ও সৎ গুণাবলিতে ভূষিত হওয়া এবং পাপাচার, অনৈতিকতা ও যা ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ন করে তা থেকে বিমুক্ত থাকা।"

সামগ্রিকভাবে আদালাহ হলো: এমন ধর্মীয় অবিচলতা যা তার অধিকারীকে কথা, কাজ এবং বিশ্বাসের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজ ধর্মের নির্দেশনার অনুগত করে তোলে; অন্য কথায় এটিই হলো তাকওয়া এবং খোদাভীতি।

যদি কোনো ব্যক্তির মাঝে এই ন্যায়পরায়ণতা অর্জিত হয়, তবে তা তার যাবতীয় কথা ও কাজকে পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার বেষ্টনীতে আবদ্ধ করবে, ফলে সে তার ধর্মীয় বিবেক ও পরহেজগারির নির্দেশনার ওপর অবিচল থাকবে।

এ কারণেই 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি' (সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ) হওয়ার জন্য যাকে নির্বাচন করা হবে, তার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার শর্তটি থাকা অত্যন্ত জরুরি। বরং

প্রতিটি ব্যক্তির জন্যই এটি গুরুত্বপূর্ণ যাতে সে তার ধর্ম ও স্বদেশের জন্য একজন যোগ্য ও কল্যাণকামী মানুষ হতে পারে।
ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, মুত্তাকি বা খোদাভীরু লোকেরাই জনগণের কল্যাণ ও উপকারে সবচেয়ে বেশি সক্ষম। তেমনি এটিও প্রমাণিত যে, দুনিয়ালোভী ক্ষমতা-পিপাসুরা এক্ষেত্রে সবচেয়ে কম যোগ্য; বরং তারাই সর্বদা জনগণের দুর্গতি এবং দেশ ও জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
তাই শুরা সদস্যদের মধ্যে এমন কেউ থাকা মোটেও উচিত নয় যার সততা নিয়ে প্রশ্ন আছে অথবা যে মিথ্যা বলা ও মানুষকে প্রতারিত করাকে বৈধ মনে করে!

(ص: 18)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالثَّانِي: الْعِلْمُ1 الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا.
وَالثَّالِثُ: الرَّأْيُ وَالْحِكْمَةُ2 الْمُؤَدِّيَانِ إِلَى اخْتِيَارِ مَنْ هُوَ لِلْإِمَامَةِ أَصْلَحُ، وَبِتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ أَقْوَمُ وَأَعْرَفُ، وَلَيْسَ لِمَنْ كَانَ فِي بَلَدِ الْإِمَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْبِلَادِ فَضْلُ مَزِيَّةٍ تَقَدَّمَ بِهَا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَنْ يَحْضُرُ بِبَلَدِ الْإِمَامِ مُتَوَلِّيًا لِعَقْدِ الْإِمَامَةِ عُرْفًا لَا شَرْعًا؛ لِسُبُوقِ عِلْمِهِمْ بِمَوْتِهِ، وَلِأَنَّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ فِي الْأَغْلَبِ مَوْجُودُونَ فِي بَلَدِهِ.

---

1 قلت: فرق كبير بين من يحكم على الأمور من خلال ميوله وانطباعاته الشخصية، أو متأثرًا بما يسمع ويرى، وبين من يحكم عليها من منطلق علمه بها وفهمه لها. فذلك الذي يحكم بميوله دون علمٍ يسهل التغرير به وإيقاعه في الخطأ، فيكون حكمه على الأمور بعيدًا عن الصواب كثيرًا.

فالشورى لا بُدَّ لمن يتصدَّى لها أن يكون من أهل العلم بالأحكام الشرعية والفقهية؛ بحيث يعرف الحلال من الحرام، ويمتلك أدوات الاجتهاد من قياسٍ واستنباطٍ ومراعاة لمصالح الأمة.... إلخ، أو على الأقلِّ يمتلك معظم هذه الأدوات.

"والعلم المقصود هو العلم بمعناه الواسع، فيدخل فيه علم الدين وعلم السياسة وغيرهما من العلوم، ولا يشترط أن يكون العالم منهم ملمًّا بكلِّ العلوم، بل يكفي أن يكون ملمًّا بفرعٍ من العلوم كالهندسة أو الطبِّ أو غير ذلك، وليس من الضروري أن يكون العلماء جميعًا مجتهدين، فيكفي أن يتوفَّر الاجتهاد في مجموعهم لا في كلِّ فرد منهم".

2 قلت: ويراد بهذا الشرط الحكمة والعقل الراجح الذي يمكِّنُ صاحبه من اختيار الرأي الأصوب، ويساعده على الترجيح بين الأمور؛ فلأنهم هم أهل الرأي وهم المستشارون في كل كبيرة وصغيرة، لا بُدَّ أن يكونوا من أصحاب الرأي السديد والقول الصائب، الذين يزنون الأمور بميزان العقل والحكمة، بعيدين عن الاندفاع.

"ويشترط فيمن يصلح للشورى أن يكون مِمَّنْ عُرِفَ بجودة الرأي والحكمة، ولا يشترط فيه أن يكون من ذوي العصبية؛ لأن أساس الشورى هو الرأي الصحيح الحكيم المتفق مع الشرع المجرَّد من الهوى والعصبية".

وقيل: "إذا كنت مستشيرًا فتوخَّ ذا الرأي والنصيحة، فإنه لا يكتفي برأي من لا ينصح، ولا نصيحة من لا رأي له".

وهذه الشروط التي استنبطناها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنته الفعلية، وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده، هي -في مجملها- الشروط التي يراها كثير من علماء الإسلام وفقهائه قديمًا وحديثًا.

দ্বিতীয়ত: এমন জ্ঞান১ যার মাধ্যমে নির্ধারিত শর্তাবলির ভিত্তিতে ইমামতের যোগ্য ব্যক্তিকে চেনা যায়।

তৃতীয়ত: বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা২ যা ইমামতের জন্য সর্বাধিক যোগ্য এবং জনস্বার্থ পরিচালনায় অধিক সক্ষম ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নির্বাচনে সহায়তা করে। ইমামের শহরে বসবাসকারীদের জন্য অন্য কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর এমন কোনো বিশেষ অগ্রাধিকার নেই যার ফলে তারা অগ্রগণ্য হবে; বরং ইমামের শহরে উপস্থিত ব্যক্তিরাই যে প্রথাগতভাবে (উরফ) ইমামত চুক্তির দায়িত্ব পালন করেন তা শরয়ি কোনো কারণে নয়; বরং তাদের মৃত্যুসংবাদ আগে জানার কারণে এবং সাধারণত খিলাফতের যোগ্য ব্যক্তিবর্গ সেই শহরেই উপস্থিত থাকেন বলে।

---

১. আমি বলছি: যারা ব্যক্তিগত ঝোঁক ও ধারণার বশবর্তী হয়ে অথবা শোনা কথায় প্রভাবিত হয়ে কোনো বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত দেয়, আর যারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেয়—এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।

যে ব্যক্তি জ্ঞানহীন অবস্থায় কেবল নিজের মর্জিমতো সিদ্ধান্ত দেয়, তাকে বিভ্রান্ত করা ও ভুল পথে পরিচালিত করা সহজ, ফলে তার সিদ্ধান্ত সঠিকতা থেকে অনেক দূরে থাকে।

সুতরাং যারা পরামর্শের (শুরা) দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের অবশ্যই শরয়ি বিধান ও ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞানী হতে হবে; যাতে তারা হালাল-হারাম বুঝতে পারেন এবং ইজতিহাদের হাতিয়ার যেমন কিয়াস, ইস্তিনবাত (বিধান আহরণ) ও জাতির স্বার্থ রক্ষার বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন... ইত্যাদি, অথবা অন্ততপক্ষে এসবের অধিকাংশ বিষয়ে তাদের দখল থাকে।

"এখানে উদ্দিষ্ট জ্ঞান বলতে জ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্রকে বোঝানো হয়েছে, যার মধ্যে দ্বীনি জ্ঞান, রাজনৈতিক জ্ঞান এবং অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত। এমন নয় যে তাদের প্রত্যেককে সব বিষয়েই পারদর্শী হতে হবে, বরং কোনো একটি শাখা যেমন প্রকৌশল বা চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হওয়াও যথেষ্ট হতে পারে। আবার বিজ্ঞজনদের সকলকেই মুজতাহিদ হওয়াও আবশ্যক নয়; বরং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের মধ্যে না থাকলেও সমষ্টিগতভাবে তাদের মাঝে ইজতিহাদি যোগ্যতার উপস্থিতি থাকাই যথেষ্ট।"

২. আমি বলছি: এই শর্ত দ্বারা হিকমত বা প্রজ্ঞা এবং পরিপক্ক বুদ্ধি উদ্দেশ্য, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সঠিক মতটি বেছে নিতে এবং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উত্তমটি অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম করে তোলে। যেহেতু তারা বিজ্ঞজন এবং প্রতিটি ছোট-বড় বিষয়ে পরামর্শদাতা, তাই তাদের অবশ্যই সুচিন্তিত মত ও সঠিক কথা বলার অধিকারী হতে হবে; যারা আবেগপ্রবণ না হয়ে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মানদণ্ডে বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন।

"পরামর্শের যোগ্য ব্যক্তির জন্য শর্ত হলো তাকে প্রখর ধীশক্তি ও হিকমতের অধিকারী হিসেবে পরিচিত হতে হবে। তার জন্য গোত্রীয় আভিজাত্য থাকা শর্ত নয়; কারণ পরামর্শের ভিত্তি হলো প্রবৃত্তি ও গোত্রবাদ মুক্ত সঠিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত, যা শরিয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।"
বলা হয়েছে: "যদি তুমি পরামর্শ করতে চাও, তবে বিজ্ঞ ও হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে তালাশ করো; কারণ যার মাঝে কল্যাণকামিতা নেই তার মতের কোনো মূল্য নেই, আর যার মাঝে বিজ্ঞতা নেই তার হিতোপদেশেরও কোনো ফায়দা নেই।"
এই শর্তগুলো যা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত, তাঁর সুন্নাহ এবং পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদীনের জীবনী থেকে আহরণ করেছি, তা সামগ্রিকভাবে ইসলামের অতীত ও বর্তমানের অনেক আলেম ও ফকিহগণের স্বীকৃত মত।

(ص: 19)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة"
وَأَمَّا أَهْلُ الْإِمَامَةِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ سَبْعَةٌ:
أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الْجَامِعَةِ1.
وَالثَّانِي: الْعِلْمُ الْمُؤَدِّي إِلَى الِاجْتِهَادِ فِي النَّوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ2.
وَالثَّالِثُ: سَلَامَةُ الْحَوَاسِّ مِنْ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ؛ لِيَصِحَّ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ مَا يُدْرَكُ بِهَا.
وَالرَّابِعُ: سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ عَنِ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ النُّهُوضِ3.

---

1 أَمَّا العدالة: فالمراد بها أن يكون صاحب استقامة في السيرة، وأن يكون متجنبًا الأفعال والأحوال الموجبة للفسق والفجور، فكما لا يكون الظالم والغادر مستحقًّا للخلافة، لا يكون المتَّصِف بالتآمر والتحايل كمثل تسليم قطيعٍ من الغنم للذئب

وجعله راعيًا لها. وأقوى برهان على ذلك قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام عندما سأله أن يجعل الإمامة في ذريته: {لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} ، أي: لا يستحقونها ولا يصلون إليها، والقصد الأساسي من تنصيب الخليفة هو دفع الظلم عن الناس لا تسليط الظلم عليهم، فلذا لا يجوز عند علماء الإسلام كافَّة انتخاب من هو بالظلم والبغي خليفة، كما أنَّ الخليفة الذي ارتكب الظلم والطغيان أثناء خلافته يستحقّ العزل، بل إنَّه عند قدماء الشافعية وعلى رأسهم الشافعي نفسه: ينعزل ولو لم تعزله الأمة. "فقه الخلافة وتطورها، ص 91".

2 يستلزم أغلبية الفقهاء أن يكون الخليفة على درجة كبيرة من العلم، فلا يكفي أن يكون عالمًا، بل يجب أن يبلغ مرتبة الاجتهاد في الأصول والفروع على السواء؛ لكي يكون قادرًا على تنفيذ شريعة الإسلام، ودفع الشبهات عن العقائد، وإعطاء فتاوى في المسائل التي تقتضيها، وإصدار الأحكام استنادًا إلى النصوص أو إلى الاستنباط؛ لأن الغرض الأساسي للخلافة هو صيانة العقائد وحل المشاكل والفصل في المنازعات. "فقه الخلافة وتطورها، ص 92".

قلت: وينبغي أن يكون الإمام إلى جانب علمه بأحكام الإسلام مثقَّفًا ثقافة عالية، مُلِمًّا بأطرافٍ من علوم عصره، ويا حبَّذا لو كان متخصِّصًا في بعضها، ويكون على علمٍ بتاريخ الدول وأخبارها، وبالقوانين والمعاهدات الدولية، والعلاقات السياسية والتجارية والتاريخية.

3 قلت: وقد فرَّق ابن خلدون في مقدمته بين العيوب الجسمية المطلقة التي تمنع الخليفة من أداء وظيفته، كأن يكون أعمى أو أخرس، أو أصمّ، أو مقطوع اليدين، أو الرجلين، ففي هذه الحالة لا يكون المرشَّح أهلًا للخلافة، أمَّا إن كان أعور أو أصمَّ بإحدى أذنيه، أو مقطوعًا إحدى يديه، ففي هذه الحالة يبقى المرشَّح أهلًا للرئاسة.

পরিচ্ছেদ: "খলিফার মধ্যে বিদ্যমান থাকা আবশ্যকীয় শর্তাবলি"

আর যারা ইমামত বা নেতৃত্বের যোগ্য, তাদের ক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য শর্তাবলি হলো সাতটি:

প্রথমত: সততা ও ন্যায়পরায়ণতা (আদালত), এর সকল প্রাসঙ্গিক শর্তাবলি পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান থাকা।১

দ্বিতীয়ত: এমন জ্ঞান অর্জন করা যা উদ্ভূত নব্য সমস্যাবলি এবং বিধিবিধানের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করার সক্ষমতা প্রদান করে।২

তৃতীয়ত: শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বাকশক্তির মতো ইন্দ্রিয়সমূহের সুস্থতা; যাতে এগুলোর মাধ্যমে লব্ধ বিষয়সমূহ সরাসরি অনুধাবন ও পরিচালনা করা সঠিক হয়।

চতুর্থত: শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এমন ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া যা স্বাভাবিক চলাচল এবং দ্রুত পদক্ষেপে বাধা সৃষ্টি করে।৩

---

১ ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) বলতে উদ্দেশ্য হলো চরিত্রে একনিষ্ঠ থাকা এবং পাপাচার ও দুশ্চরিত্রের কারণ হয় এমন সব কাজ ও অবস্থা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। যেভাবে একজন জালেম ও বিশ্বাসঘাতক খেলাফতের যোগ্য হতে পারে না, তেমনি ষড়যন্ত্র ও প্রতারণামূলক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিও এর যোগ্য নয়—যেমন একপাল মেষকে নেকড়ের কাছে সোপর্দ করে তাকে সেগুলোর রাখাল বানানো। এর ওপর সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী যা তিনি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বলেছিলেন যখন তিনি তাঁর বংশধরদের জন্য ইমামত প্রার্থনা করেছিলেন: {আমার প্রতিশ্রুতি জালেমদের স্পর্শ করবে না} অর্থাৎ, তারা এর যোগ্য হবে না এবং তা লাভ করবে না। খলিফা নিয়োগের মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষের ওপর থেকে জুলুম দূর করা, তাদের ওপর জুলুম চাপিয়ে দেওয়া নয়। অতএব, সমস্ত ইসলামি পণ্ডিতদের মতে কোনো জালেম ও স্বৈরাচারী ব্যক্তিকে খলিফা নির্বাচিত করা বৈধ নয়। একইভাবে যে খলিফা তাঁর খেলাফতকালে জুলুম ও স্বৈরাচারে লিপ্ত হবেন, তিনি পদচ্যুতির উপযুক্ত হবেন। এমনকি প্রাচীন শাফেয়ি আলেমদের মতে, যাদের শীর্ষে রয়েছেন স্বয়ং ইমাম শাফেয়ি রহ.: তিনি (জালেম হলে) স্বয়ংক্রিয়ভাবে পদচ্যুত হয়ে যান, যদিও উম্মত তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে পদচ্যুত না করে। "ফিকহুল খিলাফাহ ওয়া তাতাওউরুহা, পৃষ্ঠা ৯১"।

২ অধিকাংশ ফকিহ বা আইনজ্ঞ শর্তারোপ করেছেন যে, খলিফাকে উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। কেবল আলিম হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং তাকে উসুল (মূলনীতি) এবং ফুরু (শাখা-প্রশাখা) উভয় ক্ষেত্রেই ইজতিহাদ করার স্তরে পৌঁছাতে হবে; যাতে তিনি ইসলামের শরিয়ত বাস্তবায়ন করতে পারেন, আকিদা বা বিশ্বাসগত সংশয় নিরসন করতে পারেন, প্রয়োজনীয় বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করতে পারেন এবং কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট প্রমাণ বা

গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রায় দিতে পারেন। কারণ খেলাফতের মূল লক্ষ্যই হলো আকিদার সংরক্ষণ এবং নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও বিবাদ মীমাংসা করা। "ফিকহুল খিলাফাহ ওয়া তাতাওউরুহা, পৃষ্ঠা ৯২"।

আমি বলি: খলিফার জন্য ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞানের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষিত হওয়া এবং তাঁর সমসাময়িক বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা বাঞ্ছনীয়। যদি তিনি সেগুলোর কোনোটিতে বিশেষজ্ঞ হন তবে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাস ও সংবাদ, আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি এবং রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতে হবে।

৩ আমি বলি: ইবনে খালদুন তাঁর 'মুকাদ্দিমা'য় এমন শারীরিক ত্রুটির মধ্যে পার্থক্য করেছেন যা খলিফাকে তাঁর দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ বাধা দেয়—যেমন অন্ধ, বোবা, বধির কিংবা হাত-পা বিচ্ছিন্ন হওয়া—এরূপ ক্ষেত্রে প্রার্থী খেলাফতের যোগ্য হবেন না। কিন্তু যদি তিনি এক চোখে অন্ধ হন বা এক কানে বধির হন অথবা একটি হাত কাটা থাকে, তবে এ অবস্থায় তিনি নেতৃত্বের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন।

(ص: 20)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالْخَامِسُ: الرَّأْيُ الْمُفْضِي إِلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ1.

وَالسَّادِسُ: الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَى حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعَدُوِّ2.

وَالسَّابِعُ: النَّسَبُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ3؛ لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ وَانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِضِرَارٍ4 حِينَ شَذَّ فَجَوَّزَهَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه احْتَجَّ يَوْمَ السَّقِيفَةِ عَلَى الْأَنْصَارِ فِي دَفْعِهِمْ عَنِ الْخِلَافَةِ لَمَّا بَايَعُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ عَلَيْهَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ" 5 فَأَقْلَعُوا عَنِ التَّفَرُّدِ بِهَا وَرَجَعُوا عَنِ الْمُشَارَكَةِ فِيهَا حِينَ قَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، تَسْلِيمًا

لِرِوَايَتِهِ وَتَصْدِيقًا لِخَبَرِهِ وَرَضُوا بِقَوْلِهِ: نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا" 6.

وَلَيْسَ مَعَ هَذَا النَّصِّ الْمُسَلَّمِ شُبْهَةٌ لِمُنَازِعٍ فِيهِ، وَلَا قَوْلٌ لِمُخَالِفٍ لَهُ7.

---

1 قلت: ويعبّر بعض الفقهاء عن هذا الشرط بالحكمة، والحق أنَّ هذه الحكمة غالبًا ما تُكْتَسَب بالخبرة والتجربة، لكن غاية ما ينبغي أن يتوفَّر في المرشَّحِ لمنصب الخليفة أن يكون قادرًا على سياسة الأمور سياسةً دقيقة ناتجة عن حِنْكَة وتجربة وفهمٍ للواقع.

2 ذلك أنَّ الخليفة هو قائد الجيوش الإسلامية، ولا يتَّسق أن يكون قائد جيوش المسلمين جبانًا أو متخاذلًا عن الدفاع عن قضايا الإسلام الكبرى.

3 ويشمل ذلك كل من كان من ذرية قريش، التي تنتسب إلى جدِّها الأول "النضر بن كنانة"، الملقَّب بقريش، ولقد كان لهذه القبيلة في الجاهلية نفوذ كبير بين العرب من الناحية الدينية والأدبية. وبعد انتشار الإسلام في أنحاء الجزيرة، وخاصة بعد فتح مكة، وعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن القرشيين، زاد نفوذهم زيادة عظيمة، وخاصَّة لكون النبيّ وكبار صحابته كانوا من قريشٍ، وقد تأكَّد هذا النفوذ نهائيًّا بتولّي أبي بكر الخلافة، الذي كان معناه الاعتراف بسلطة قريش، وكان الخلفاء الأربعة الراشدون قرشيين أيضًا، وكذلك الأمويون والعباسيون، وطبقًا لمذهب أهل السنة: لا نزاع في وجوب توفُّر هذا الشرط، فهو لازم بالإجماع تقريبًا، إلَّا أن بعض فقهاء السنة، ومنهم ابن خلدون، فضلًا عن المعتزلة والخوارج يميلون إلى إلغاء هذا الشرط. "فقه الخلافة وتطورها: ص 96".

4 قلت: هو ضرار بن عمرو المعتزلي، إليه تنسب الفرقة الضرارية من المعتزلة، كان يقول: يمكن أن يكون جميع من في الأرض مِمَّن يظهر الإسلام كافرًا؛ توفِّي في حدود الثلاثين ومائتين.

5 صحيح: رواه أحمد "11898"، وصحَّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع "2758".
6 صحيح: ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال: أخرجه عبد الرزَّاق بإسناد صحيح، لكنَّه مرسل وله شواهد، وصحَّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع "2966".
7 والنظرية الأخرى التى أخذ بها الخوارج وغالبية المعتزلة، يقول هؤلاء: إنَّ الخلافة ممكنة لأيِّ شخص، ولو لم يمكن قرشيًّا، وحجتهم في ذلك الحديث النبوي: "اسمعوا وأطيعوا ولَوْ وُلِّيَ عليكم عبد حبشي" مما يدل -في نظرهم- على أنَّ الإمام يمكن أن يكون غير قرشي، بل إنَّ ضرار بن عمرو الغطفاني -وهو من فقهاء المعتزلة- يرى أنَّه يجب أن يفضَّل الزنجيّ على القرشيّ إذا كان كلاهما في درجة واحدة من الأهلية؛ لأنَّ الزنجي يكون من السهل عزله إذا خرج عن واجباته كخليفة. "فقه الخلافة وتطورها: ص 98".

পঞ্চমটি হলো: এমন দূরদর্শী প্রজ্ঞা যা প্রজাসাধারণের শাসন এবং জনস্বার্থ ব্যবস্থাপনার দিকে পরিচালিত করে।১
ষষ্ঠটি হলো: এমন সাহসিকতা ও বীরত্ব যা রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ড ও সংহতি রক্ষায় এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে।২
সপ্তমটি হলো: বংশমর্যাদা, অর্থাৎ তাকে কুরাইশ বংশোদ্ভূত হতে হবে; যেহেতু এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধর্মতাত্ত্বিক পাঠ বিদ্যমান এবং এর ওপর ইজমা বা সর্বসম্মত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দিরাব-এর মতের কোনো গুরুত্ব নেই, যখন তিনি বিচ্ছিন্নভাবে সর্বসাধারণের জন্য এটি বৈধ করেছেন। কারণ, আনসারগণ যখন সাদ ইবনে উবাদাহর হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তখন আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সাকিফাহর দিনে খিলাফত থেকে তাদের নিবৃত্ত করতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেন যে: "ইমামগণ কুরাইশ বংশ থেকে হবেন।"৫ ফলে তারা এককভাবে খিলাফত পরিচালনার দাবি ত্যাগ করেন এবং যখন তারা বলেছিলেন, "আমাদের মধ্য থেকে একজন আমির এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমির হবে", তখন তারা সেই অংশীদারিত্বের দাবি থেকেও সরে আসেন। তারা তাঁর বর্ণনার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর সংবাদকে সত্য জ্ঞান করে তাতে আশ্বস্ত হন এবং তাঁর এই কথায় সন্তুষ্ট হন যে: "আমরা হলাম আমির এবং

তোমরা হলে উজির।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেছেন: "তোমরা কুরাইশকে অগ্রগণ্য করো এবং তাদের অতিক্রম করে অগ্রগামী হয়ো না।"৬
এই সর্বজনগৃহীত অকাট্য দলিলের উপস্থিতিতে কোনো বিবাদকারীর জন্য সংশয়ের অবকাশ নেই এবং কোনো বিরোধিতাকারীর বক্তব্যেরও কোনো মূল্য নেই।৭

---

১ আমি বলছি: কোনো কোনো ফকিহ এই শর্তটিকে 'হিকমাহ' বা প্রজ্ঞা দ্বারা ব্যক্ত করেন। প্রকৃত সত্য হলো, এই প্রজ্ঞা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। তবে খলিফা পদের প্রার্থীর মধ্যে যা থাকা অপরিহার্য তা হলো দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতার উপলব্ধিজাত সূক্ষ্ম প্রশাসনিক পরিচালনার সক্ষমতা।
২ কারণ খলিফা হলেন ইসলামি সেনাবাহিনীর প্রধান। মুসলিম বাহিনীর প্রধান কাপুরুষ কিংবা ইসলামের বৃহৎ স্বার্থ রক্ষায় পশ্চাদপসরণকারী হওয়া সংগতিপূর্ণ নয়।
৩ এটি কুরাইশ বংশের সেই সকল সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের আদি পুরুষ 'নাদর বিন কিনানাহ'-র সাথে সম্পর্কিত, যার উপাধি ছিল কুরাইশ। জাহেলি যুগে এই গোত্রের আরবদের মাঝে ধর্মীয় ও সাহিত্যিক দিক থেকে ব্যাপক প্রভাব ছিল। আরব উপদ্বীপে ইসলাম প্রসারের পর, বিশেষ করে মক্কা বিজয়ের পর এবং কুরাইশদের প্রতি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ক্ষমার পর তাদের প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়; বিশেষ করে নবী এবং তাঁর বিশিষ্ট সাহাবীগণ কুরাইশ বংশের হওয়ার কারণে। আবু বকরের খিলাফত লাভের মাধ্যমে এই প্রভাব চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ছিল মূলত কুরাইশের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি। চার খলিফা রাশিদুনও কুরাইশ ছিলেন, তেমনি উমাইয়া ও আব্বাসীয়রাও। আহলুস সুন্নাহর মাজহাব অনুযায়ী: এই শর্তটির অপরিহার্যতার বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই, এটি প্রায় ইজমা বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে আবশ্যক। তবে ইবনে খালদুনসহ সুন্নিদের কোনো কোনো ফকিহ এবং মুতাজিলা ও খারিজিগণ এই শর্তটি বাতিলের দিকে ঝুঁকেছেন। (ফিকহুল খিলাফাহ ওয়া তাতাউউরুহা: পৃষ্ঠা ৯৬)।
৪ আমি বলছি: তিনি হলেন মুতাজিলা মতবাদের দিরাব ইবনে আমর। তাঁর অনুসারীদের মুতাজিলাদের 'দিরাবিয়্যাহ' উপদল বলা হয়। তিনি বলতেন: পৃথিবীর সকল মানুষ যারা ইসলাম প্রকাশ করে তারা কাফের হওয়া সম্ভব। তিনি ২৩০ হিজরির কাছাকাছি সময়ে মৃত্যুবরণ করেন।

৫ সহিহ: আহমদ (১১৮৯৮) এটি বর্ণনা করেছেন এবং শেখ আলবানী 'সহিহুল জামে' (২৭৫৮) গ্রন্থে একে সহিহ বলেছেন।
৬ সহিহ: হাফেজ ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী'তে এটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে আবদুর রাজ্জাক এটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন, তবে এটি মুরসাল এবং এর অন্যান্য সমর্থক বর্ণনা রয়েছে। শেখ আলবানী 'সহিহুল জামে' (২৯৬৬) গ্রন্থে একে সহিহ বলেছেন।
৭ অন্য একটি তত্ত্ব যা খারিজি এবং অধিকাংশ মুতাজিলা গ্রহণ করেছে; তারা বলে: খিলাফত যে কোনো ব্যক্তির জন্য সম্ভব, এমনকি তিনি কুরাইশ না হলেও। এ বিষয়ে তাদের দলিল হলো নববী হাদিস: "তোমরা শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো, যদিও তোমাদের ওপর একজন হাবশি ক্রীতদাসকে নেতা বানানো হয়।" এটি তাদের দৃষ্টিতে প্রমাণ করে যে ইমাম কুরাইশ ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারেন। বরং মুতাজিলা ফকিহদের অন্তর্ভুক্ত দিরাব ইবনে আমর আল-গাতফানি মনে করেন যে, যদি একজন কৃষ্ণাঙ্গ এবং একজন কুরাইশ যোগ্যতার দিক থেকে একই স্তরের হন, তবে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত; কারণ কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হলে পদচ্যুত করা সহজ হবে। (ফিকহুল খিলাফাহ ওয়া তাতাউউরুহা: পৃষ্ঠা ৯৮)।

(ص: 21)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل: "بِمَ تنعقد الإمامة"؟
والإمامة تنعقد من وجهين:
أحدهما: باختيار أهلِ العَقْدِ والحَلِّ1.

1أقول: إنَّ اختيار الحاكم في الإسلام حقٌّ من حقوق الأمَّة، كفله لها الإسلام، فلا ينبغي أن تفرِّط فيه أو أن تتنازل عنه ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا، تشهد بذلك الوقائع التاريخية المعتمدة في التشريع الإسلامي، وهي المدَّة من نزول الوحي على

النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى آخر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ... ".

ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية يقدِّم صلى الله عليه وسلم أوَّلَ إرساءٍ لهذا المبدأ -مبدأ حق الأمَّة في اختيار من يمثلها- حين قال مخاطبًا الأنصار: "أخرجوا إليَّ منكم اثني عشر نقيبًا ليكونوا على قومهم بما فيهم".

ثم كانت بيعة أبي بكر بعد مساجلات ومناقشات حرة ومداولات مطوَّلَة بين المهاجرين والأنصار، أدلى كلٌّ منهم برأيه حتى اجتمعوا على اختياره رضي الله عنه.

ثم كان أن استَخْلَفَ أبو بكر عمر فارتضت الأمَّة ذلك منه وبايعته رضي الله عنه عن اقتناع حر، بعد أن أعلن كل فرد رأيه، حتى قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه وهو على سرير الموت: ما أنت قائل لربِّك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته، وهو إذا وَلِيَ كان أفظّ وأغلظ؟

فردَّ أبو بكر قائلًا: "أبالله تخوّفني؟ خاف من تزود من أمركم بظلم!! أقول: اللهمَّ إني قد استخلفت على أهلك خير أهلك".

ثم كان استخلاف عثمان بعد مشاورات قام بها الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، استشار فيها كافَّة أهل المدينة، حتى إنَّه عبَّر عن ذلك قائلًا قبل مبايعته عثمان: "أيها الناس، إني قد سألتكم سرًّا وجهرًا عن إمامكم، فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إمَّا عليّ وإمَّا عثمان ... ".

فهذه الفترة من تاريخ الأمَّة الإسلامية، هو وحده الذي يصلح لاستنباط الأحكام والتشريعات منه وبعد ما حدَثَ بها سوابق دستورية يجب الالتزام بها والسير عليها.

أما ما حدث بعد ذلك على أيدي بني أمية، فليس من الإسلام في شيء، بل لا قيمة له في ميزان الإسلام.

يقول سيد قطب رحمه الله: "فلمَّا جاء بنو أميَّة وصارت الخلافة الإسلامية ملكًا عضوضًا فيهم بالوراثة، لم يكن ذلك من روح الإسلام، إنَّما كان من حمق الجاهلية الذي أطفأ إشراقة الروح الإسلامي".

পরিচ্ছেদ: "ইমামত (নেতৃত্ব) কীসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়?"
ইমামত বা নেতৃত্ব দুটি উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়:
প্রথমত: 'আহলুল আকদ ওয়াল হাল' (সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সক্ষম ব্যক্তিবর্গ)-এর নির্বাচনের মাধ্যমে।১

---

১ আমি বলছি: ইসলামে শাসক নির্বাচন করা উম্মাহর অন্যতম একটি অধিকার, যা ইসলাম তাদের জন্য সুনিশ্চিত করেছে। সুতরাং সাধ্যানুযায়ী এ ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করা বা এই অধিকার থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া উম্মাহর জন্য উচিত নয়। ইসলামি শরিয়তে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এর সাক্ষ্য দেয়; আর তা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহি নাজিল হওয়া থেকে শুরু করে আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের শেষ পর্যন্ত সময়কাল। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরবর্তী হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো...।"
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবায় তিনি নিজেই এই মূলনীতির প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন—যেটি হলো উম্মাহর প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারের মূলনীতি—যখন তিনি আনসারদের সম্বোধন করে বলেছিলেন: "তোমাদের মধ্য থেকে বারোজন নকীব (নেতা) নির্বাচন করে দাও, যারা তাদের সম্প্রদায়ের যাবতীয় বিষয়ের জিম্মাদার হবে।"
অতঃপর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে মুক্ত বিতর্ক, আলোচনা এবং দীর্ঘ পর্যালোচনার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়; প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিমত পেশ করেছিলেন, পরিশেষে তারা তাকে নির্বাচনের ব্যাপারে একমত হন।
এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন, তখন উম্মাহ তার এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয় এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশের পর পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। এমনকি মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন একজন ব্যক্তি

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন: "আপনি আপনার রবের কাছে কী জবাব দেবেন, যখন তিনি আপনাকে আমাদের ওপর ওমরকে খলিফা নিয়োগ করার বিষয়ে প্রশ্ন করবেন? অথচ আপনি তার কঠোরতা দেখছেন, আর সে যখন দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে তখন আরও বেশি রূঢ় ও কঠোর হবে?"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন: "তোমরা কি আমাকে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছ? সে-ই ভয় পাক যে তোমাদের ওপর জুলুমের পাথেয় সংগ্রহ করে!! আমি বলব: হে আল্লাহ, আমি আপনার বান্দাদের ওপর তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করেছি।"

অতঃপর মহান সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিচালিত দীর্ঘ পরামর্শের পর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্থলাভিষিক্ত হওয়া সম্পন্ন হয়, যাতে তিনি মদিনার সকল স্তরের মানুষের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। এমনকি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াতের আগে তিনি এই অবস্থাটি এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন: "হে লোকসকল! আমি তোমাদের ইমামের বিষয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছি; আমি তোমাদের আলী অথবা উসমান—এই দুই ব্যক্তির সমকক্ষ কাউকে পেতে দেখিনি...।"

সুতরাং মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের এই সময়কালটিই কেবল বিধান ও আইন প্রণয়নের উৎস হিসেবে উপযুক্ত এবং এ সময়ে যা ঘটেছে তা সাংবিধানিক নজির হিসেবে গণ্য, যা অনুসরণ করা এবং যার ওপর চলা আবশ্যক।

কিন্তু এরপর বনু উমাইয়াদের হাতে যা কিছু ঘটেছে, ইসলামের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই; বরং ইসলামের মানদণ্ডে তার কোনো মূল্য নেই।

সাইয়্যেদ কুতুব রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "অতঃপর যখন বনু উমাইয়ারা ক্ষমতায় এলো এবং ইসলামি খেলাফত তাদের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে কামড় দিয়ে আঁকড়ে থাকা রাজতন্ত্রে পরিণত হলো, তখন তা ইসলামের রূহ বা মেজাজ অনুযায়ী ছিল না; বরং তা ছিল জাহেলিয়াতের মূর্খতা, যা ইসলামি রূহের দীপ্তিকে নির্বাপিত করে দিয়েছিল।"

(ص: 22)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالثَّانِي: بِعَهْدِ الْإِمَامِ مِنْ قَبْلُ1.
فَأَمَّا انْعِقَادُهَا بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ2 فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ

---

1 قلت: ولا قيمة لعهد الإمام لأحدٍ من بعد بتولّي منصب الخلافة ما لم تزكِّ أغلبية الأمة هذا الترشيح وتبايعه على ذلك، فتلك البيعة أو الانتخابات الحرَّة النزيهة كما يطلق عليها في عصرنا، هي الشيء الوحيد الذي يضفي الشرعيّة على سلطة خليفة، أو نائب أو والٍ....إلخ.

2 على الرَّغم من أنَّ مصطلحات "أهل الشورى"، و"أهل الحل والعقد"، يتردَّد ذكرها كثيرًا في الكتب التي تتناول الحديث عن الخلافة والإمامة وشئون الحكم، إلَّا أننا لا نجد في هذه الكتب ما يشير من قريبٍ أو من بعيد إلى كيفيَّة اختيار هذه الهيئة التي تُعْرَف بأهلِ الحلِّ والعقد أو أهل الشورى، ولا من الذي يقوم باختيارهم أو تعيينهم.

إننا إذا نظرنا إلى آيات القرآن أو إلى السنَّة النبوية الصحيحة، لم نجد بين نصوصها ما يحدِّد صفات أهل الشورى ولا كيفية اختيارهم، بل لم نجد ذلك في عصر الصحابة.

يقول الدكتور السنهوري: "ففي عصر الصحابة لم يكن من الممكن التفكير في وضع شروط لمزاولة حقِّ انتخاب أهل الحلِّ والعقد؛ لأن الفكرة السهلة التي سادت هي أنَّ الناخبين هم صحابة النبي، ولو بقيت الخلافة انتخابية بعد جيل الصحابة لشعرت الأمة الإسلامية بضرورة إجراءات منظّمة ومحدّدة لاختيار أهل الحلِّ والعقد وتحديدهم؛ بحيث لا تبقى المسألة الجوهرية، وهي مسألة انتخاب أهل الحلِّ والعقد، ثم انتخاب الخليفة بمعرفتهم دون قواعد محددة".

ولعلَّ هذا هو السبب في ذلك الاختلاف البيِّن بين علماء الفقه السياسي الإسلامي قديمًا وحديثًا، ففي الوقت الذي نجد فيه الماوردي يحدِّد شروط أهل الاختيار في

ثلاثة شروط فيقول: "العدالة الجامعة لشروطها، والثاني: العلم الذي يتوصّل به إلى معرفة من يستحقّ الإمامة، على الشروط المعتبرة فيها، والثالث: الرأي والحكمة وبتدبير المصالح أقوم وأعرف".

كذلك نَجِد الإمام النووي يقول في تعريف أهل الحلِّ والعقد: "إنهم العلماء والرؤساء".

بينما يرى الإمام البغدادي أنَّ أهل الشورى هم من لهم حق الاجتهاد فيقول بأنهم: "أهل الاجتهاد".

ثم نَجِد من يقول: "إنَّهم الأشراف والأعيان"، ثم نَجِد الإمام محمد عبده يقول: "أهل الحلّ والعقد من المسلمين هم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح".

ويقول الإمام محمد عبده: "إن أولي الأمر في زماننا هم كبار العلماء ورؤساء الجند، والقضاة، وكبار التجار والزرَّاع وأصحاب المصالح العامَّة ومديرو الجمعيات والشركات، وزعماء الأحزاب، ونابغو الكُتَّاب والأطباء والمحامين الذين تثق بهم الأمة في مصالحها، وترجع إليهم في مشكلاتها".

ثم يحاول الشيخ محمود شلتوت تعريف أهل الشورى فيقول: "أولو الأمر هم أهل النظر الذين عرفوا في =

এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো: পূর্ববর্তী ইমামের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার মনোনয়নের মাধ্যমে।১ আর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'-এর নির্বাচনের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে কতজন সদস্যের উপস্থিতিতে তা সম্পন্ন হবে, সে বিষয়ে আলেমগণ মতবিরোধ করেছেন।২

---

১ আমি (সম্পাদক) বলছি: পরবর্তী কারোর জন্য ইমাম কর্তৃক খিলাফতের পদ গ্রহণের অসিয়ত বা মনোনয়নের কোনো মূল্য নেই, যতক্ষণ না উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই মনোনয়নকে অনুমোদন দেয় এবং তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। এই বাইআত অথবা

বর্তমান যুগে যাকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বলা হয়, তা-ই একমাত্র বিষয় যা কোনো খলিফা, প্রতিনিধি বা গভর্নরের কর্তৃত্বকে বৈধতা দান করে।... ইত্যাদি।

২ যদিও খিলাফত, ইমামত এবং শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলিতে "আহলুশ শুরা" এবং "আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ" পরিভাষাগুলোর বহুল ব্যবহার দেখা যায়, তথাপি এই গ্রন্থগুলোতে এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সংস্থার (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ বা আহলুশ শুরা) নির্বাচনের পদ্ধতি কিংবা কারা তাদের নির্বাচন বা নিয়োগ দেবেন সে সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করে।

আমরা যদি পবিত্র কুরআনের আয়াত কিংবা সহীহ সুন্নাহর দিকে লক্ষ্য করি, তবে সেগুলোর মূল পাঠের (نصوص) মধ্যে আহলুশ শুরার বৈশিষ্ট্য কিংবা তাদের নির্বাচনের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এমন কিছু পাব না; এমনকি সাহাবীগণের যুগেও এর কোনো সুনির্দিষ্ট অবকাঠামো পাওয়া যায় না।

ডক্টর সানহুরী বলেন: "সাহাবীগণের যুগে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর নির্বাচনের অধিকার প্রয়োগের জন্য কোনো শর্ত আরোপের চিন্তা করা সম্ভব ছিল না; কারণ তখন প্রচলিত সহজ ধারণাটি ছিল এই যে, নির্বাচক বা ভোটাররা হলেন খোদ আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ। যদি সাহাবীগণের প্রজন্মের পরে খিলাফত নির্বাচনভিত্তিক ব্যবস্থা হিসেবে বজায় থাকত, তবে মুসলিম উম্মাহ আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ নির্বাচন ও তাদের সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল ও সুনির্ধারিত প্রক্রিয়া প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত; যাতে মৌলিক বিষয়টি, অর্থাৎ আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ নির্বাচন এবং অতঃপর তাদের মাধ্যমে খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছাড়া অনির্ধারিত থেকে না যায়।"

সম্ভবত এটাই প্রাচীন ও আধুনিক ইসলামী রাজনৈতিক ফিকহশাস্ত্রবিদদের মধ্যে বিদ্যমান স্পষ্ট মতপার্থক্যের মূল কারণ। যেখানে আমরা দেখি আল-মাওয়ারদী নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য তিনটি শর্ত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন: "প্রথমত, এমন ন্যায়পরায়ণতা যা এর যাবতীয় শর্ত পূরণ করে। দ্বিতীয়ত, এমন জ্ঞান যার মাধ্যমে ইমামতের পদের জন্য বিবেচিত শর্তাবলির আলোকে যোগ্য ব্যক্তিকে চেনা সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা, যার মাধ্যমে জনস্বার্থের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে যিনি অধিকতর পারদর্শী ও অভিজ্ঞ তাকে চিহ্নিত করা যায়।"

একইভাবে আমরা ইমাম আন-নববীকে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর সংজ্ঞায় বলতে দেখি: "তারা হলেন ওলামায়ে কেরাম এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।"

অন্যদিকে ইমাম আল-বাগদাদী মনে করেন যে, আহলুশ শুরা হলেন তারা যাদের ইজতিহাদ বা গবেষণার যোগ্যতা রয়েছে। তিনি বলেন: "তারা হলেন আহলুল ইজতিহাদ।"
আবার কেউ কেউ বলেন: "তারা হলেন সমাজের গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।" ইমাম মুহাম্মদ আবদুহু বলেন: "মুসলিমদের মধ্যে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হলেন আমীরগণ, শাসকবৃন্দ, ওলামায়ে কেরাম, সেনাপ্রধানগণ এবং সেই সকল নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যাদের কাছে মানুষ তাদের প্রয়োজন ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করে।"
ইমাম মুহাম্মদ আবদুহু আরও বলেন: "আমাদের বর্তমান সময়ে 'উলুল আমর' হলেন প্রবীণ ওলামায়ে কেরাম, সেনাপ্রধানগণ, বিচারকবৃন্দ, শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও কৃষকগণ, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারগণ, কোম্পানি ও সংস্থার পরিচালকবৃন্দ, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং প্রতিভাবান লেখক, চিকিৎসক ও আইনজীবীগণ—যাদের ওপর জাতি তাদের স্বার্থের বিষয়ে আস্থা রাখে এবং নিজেদের সমস্যার সমাধানে যাদের শরণাপন্ন হয়।"
এরপর শেখ মাহমুদ শালতুত আহলুশ শুরার সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়াস পেয়ে বলেন: "উলুল আমর হলেন সেই সকল চিন্তাশীল ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যারা পরিচিত..."

(ص: 23)الأحكام السلطانية للماوردي

الْإِمَامَةُ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبَ شَتَّى. فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِجُمْهُورِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ؛ لِيَكُونَ الرِّضَاءُ بِهِ عَامًّا وَالتَّسْلِيمُ لِإِمَامَتِهِ إِجْمَاعًا. وَهَذَا مَذْهَبٌ مَدْفُوعٌ بِبَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى الْخِلَافَةِ بِاخْتِيَارِ مَنْ حَضَرَهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ بِبَيْعَتِهِ قُدُومَ غَائِبٍ عَنْهَا.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: أَقَلُّ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ مِنْهُمُ الْإِمَامَةُ خَمْسَةٌ يَجْتَمِعُونَ عَلَى عَقْدِهَا، أَوْ يَعْقِدُهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَا الْأَرْبَعَةِ اسْتِدْلَالًا بِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه انْعَقَدَتْ بِخَمْسَةٍ اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ تَابَعَهُمُ النَّاسُ فِيهَا، وَهُمْ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَبِشْرُ بْنُ سَعْدٍ، وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ رضي الله عنهم.

وَالثَّانِي: عُمَرُ رضي الله عنه جَعَلَ الشُّورَى فِي سِتَّةٍ لِيُعْقَدَ لِأَحَدِهِمْ بِرِضَا الْخَمْسَةِ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

= الأمَّة بكمال الاختصاص في بحث الشئون وإدراك المصالح والغيرة عليها، وليس من شكٍّ في أنَّ شئون الأمَّة متعددة، ففي الأمة جانب القوة، وفيها جانب القضاء، وفيها جانب المال، وفيها جانب السياسة الخارجية، وفيها غير ذلك من الجوانب، ولكل جانب رجال عرفوا فيه بنضج الآراء وعِظم الآثار، وهؤلاء الرجال هم أولو الأمر من الأمَّة، وهم أهل الإجماع الذين يكون اتفاقهم حجة يجب النزول عليها".

ويقول السيد رشيد رضا في تعريف أهل الحلِّ والعقد الذين يمثّلون سلطة الأمة، واختاره الأستاذ الإمام: "والمراد بأولي الأمر أهلُ الرأي والمكانة في الأمة، وهم العلماء بمصالحها وطرق حفظها، والمقبولة آراؤهم عند عامتها".

ولم يختلف علماء الإسلام في تعريف أهل الشورى والمراد بهم فحسب، بل اختلفوا أيضًا في تسميتهم، فمن قائل: "أهل الحل والعقد"، ومن قائل: "أهل الاختيار"، ومن قائل: "أهل الاجتهاد"، ومن قائل: "أولو الأمر".

والحقّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يترك قولًا يحدِّد فيه كيفية أهل الشورى، إلّا أنه صلى الله عليه وسلم قد ترك ذلك في سنَّتِه الفعلية برسمه الملامح والمنهاج الذي يمكن أن تسير عليه الأمة من بعده.

فمن خلال استقرائنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، بل ولتاريخ أمتنا، نستطيع أن نقول: إنّ أهل الحل والعقد لا بُدَّ وأن يتمَّ انتخابهم انتخابًا مباشرًا من قِبَلِ الأمَّة.

তাদের মধ্য থেকে ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। একদল বলেছে: প্রতিটি জনপদের নীতি-নির্ধারক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ) সংখ্যাগরিষ্ঠের উপস্থিতি ব্যতিরেকে এটি সম্পন্ন হবে না; যাতে তার প্রতি জনগণের সন্তুষ্টি সাধারণ ও ব্যাপক হয় এবং তার ইমামতের প্রতি আনুগত্য ঐকমত্যের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়। এই মতটি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের বাইয়াতের মাধ্যমে খণ্ডিত হয়েছে, যা কেবল সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল এবং তাঁর বাইয়াতের জন্য অনুপস্থিত ব্যক্তিদের আগমনের প্রতীক্ষা করা হয়নি।

অন্য একটি দল বলেছে: ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তাদের মধ্য থেকে সর্বনিম্ন পাঁচজন ব্যক্তির প্রয়োজন যারা ইমামত প্রদানের জন্য একত্রিত হবেন, অথবা তাদের চারজনের সন্তুষ্টিতে একজন তা সম্পন্ন করবেন। এর স্বপক্ষে তারা দুটি দলিল পেশ করেন:

প্রথমত: আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত পাঁচজন ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল যারা এ বিষয়ে একমত হয়েছিলেন, অতঃপর সাধারণ মানুষ তাদের অনুসরণ করেছিল। তাঁরা হলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব, আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ, উসাইদ ইবনুল হুদাইর, বিশর ইবনে সাদ এবং আবু হুজাইফার মুক্তদাস সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

দ্বিতীয়ত: উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুরার বিষয়টি ছয়জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিলেন যাতে বাকি পাঁচজনের সন্তুষ্টিতে তাদের একজনের জন্য খিলাফতের চুক্তি সম্পন্ন হয়। এটি বসরাবাসীদের মধ্য থেকে অধিকাংশ ফকিহ এবং ধর্মতাত্ত্বিকদের (মুতাকাল্লিম) অভিমত।

= উম্মাহর বিষয়াদি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা, জনস্বার্থ অনুধাবন এবং তার প্রতি গভীর অনুরাগের বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে উম্মাহর বিষয়াবলি বহুমুখী; এতে শক্তির দিক রয়েছে, বিচারিক দিক রয়েছে, আর্থিক দিক রয়েছে, বৈদেশিক রাজনীতির দিক রয়েছে এবং আরও অন্যান্য দিক রয়েছে। প্রতিটি দিকের জন্য এমন একদল ব্যক্তি রয়েছেন যারা সুপরিপক্ব মতামত এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাবের জন্য সুপরিচিত। এই ব্যক্তিরাই হলেন উম্মাহর 'উলুল আমর' বা কর্তৃপক্ষ এবং এরাই হলেন 'আহলুল ইজমা' (ঐকমত্য পোষণকারী), যাদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত এমন এক অকাট্য দলিল যা মেনে নেওয়া আবশ্যক।"

সাইয়্যিদ রশিদ রিদা উম্মাহর ক্ষমতার প্রতিনিধিত্বকারী 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'-এর সংজ্ঞায় বলেন, যা উস্তাদ ইমামও গ্রহণ করেছেন: "উলুল আমর বা কর্তৃপক্ষ বলতে উম্মাহর

বিজ্ঞ ও পদস্থ ব্যক্তিদের বোঝায়। তাঁরা উম্মাহর স্বার্থ এবং তা রক্ষার উপায় সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তাঁদের মতামত সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য।"
ইসলামী স্কলারগণ কেবল শুরা সদস্যদের সংজ্ঞা বা তাঁদের পরিচয় নিয়েই ভিন্নমত পোষণ করেননি, বরং তাঁদের নামকরণ নিয়েও মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন: 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ', কেউ বলেছেন: 'আহলুল ইখতিয়ার', কেউ বলেছেন: 'আহলুল ইজতিহাদ', আবার কেউ বলেছেন: 'উলুল আমর'।
প্রকৃত সত্য হলো এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও শুরা সদস্যদের ধরন নির্ধারণ করে কোনো মৌখিক বাণী রেখে যাননি, তবে তিনি তাঁর কর্মময় সুন্নাহর মাধ্যমে এমন এক রূপরেখা ও আদর্শ রেখে গেছেন যার ওপর ভিত্তি করে উম্মাহ তাঁর পরবর্তীকালে পরিচালিত হতে পারে।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত, তাঁর পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস এবং আমাদের উম্মাহর সামগ্রিক ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে: নীতি-নির্ধারক বা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-কে অবশ্যই উম্মাহর পক্ষ থেকে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হবে।

(ص: 24)الأحكام السلطانية للماوردي

وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ: تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ يَتَوَلَّاهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَا الِاثْنَيْنِ لِيَكُونُوا حَاكِمًا وَشَاهِدَيْنِ، كَمَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: تَنْعَقِدُ بِوَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْعَبَّاسَ قَالَ لِعَلِيٍّ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا: اُمْدُدْ يَدَكَ أُبَايِعْكَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَايَعَ ابْنَ عَمِّهِ، فَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ اثْنَانِ، وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ وَحُكْمُ وَاحِدٍ نَافِذٌ.

---

1 قلت: وهذا كلام غريب وعجيب ينبغي الوقوف أمامه طويلًا؛ لبيان ما به من مخالفات لروح الشريعة الإسلامية، فما يدَّعيه البعض من أنَّ الخلافة تنعقد بستة أو بخمسة، أو حتى بواحد، كلام لا يقبل شرعًا ولا عقلًا.

فكيف نجيز لواحد أو خمسة أو ستة من أفراد الأمَّة، أو حتى عدة آلاف أن تعقد الإمامة لفردٍ ما دون الرجوع لرأي الأمة؟.

ثم إنَّ الخلافة لم تنعقد لأبي بكر بخمسة كما يدَّعي القائلون بذلك، ولم تنعقد لعثمان بستة كما يزعمون، فما فعله الخمسة في بيعة أبي بكر، أو الستة في بيعة عثمان لم تنعقد به الإمامة، إنَّما انعقدت بالبيعة العامَّة التي تمَّت بعد ذلك من جموع أفراد الأمة.

وعلى ذلك: فلا وزن لتلك المقولات التي ساقها بعض الفقهاء في عصور الضَّعف الإسلامي، والتي تقوي نفوذ الحكَّام، وتهوّن من شأن الأمَّة وأهل الحلِّ والعقد في الأمور السياسية.

فابن جماعة -مثلًا- وجدناه يفتح الباب على مصراعيه أمام أهل النفوذ والقوة المسيطرين على البلاد، ليطلبوا ما ليس لهم، ويجعل من ذلك حقًّا شرعيًّا!.

يقول ابن جماعة: "إن خلا الوقت من إمام فتصدَّى لها -يعني الإمامة- من ليس من أهلها، وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف، انعقدت بيعته، ولزمت طاعته؛ لينتظم شمل المسلمين، ولا يقدح في إمامته كونه فاسقًا أو جاهلًا، ما دام قد تمَّت له الغلبة".

ليس هذا فحسب، بل إنَّه يذهب إلى أكثر من هذا فيقول: "وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحد، ثم قام آخر فقهر الأول بشوكته وجنوده، انعزل الأول، وصار الثاني إمامًا، لما قدمناه من مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم".

كما كانت أفكار الوزير السلجوقي "نظام الملك"، من أبعد تلك الأفكار عن روح الإسلام في مسألة الحكم؛ إذ يقول: "إن السلطان تختاره العناية الإلهية مباشرة، وإنه مسئول مباشرة أمام الله".

ثم وجدناه هذه الأفكار التي صدرت عن نظام الملك تنتقل إلى الأندلس عن طريق محمد بن الوليد الطرطوشي، الذي يقول: "إنَّ حق السلطان في الحكم صادر عن إرادة الله، ومن ثَمَّ فهو ليس موضع مناقشة قط، وهناك بيان أو عهد بين الله تعالى والملوك، يُلْزِم الحاكم بمعاملة رعاياهم بالعدل والإنصاف والإحسان، أمَّا الحاكم الظالم فهو يعتبره بمثابة عقوبة من الله تعالى قدرَّها على عباده، جزاءً لهم على عصيانهم، ولذلك كان لزامًا عليهم أن يتحمَّلوا حكمه".

فهذه الأفكار وأمثالها التي تغثّ بها بعض الكتب القديمة والحديثة على السواء أفكار انهزامية، أصدرها أصحابها في محاولةٍ منهم لجمع كلمة المسلمين، وللتوفيق بين المصلحة العامَّة من حفظٍ لدماء المسلمين، والحفاظ على وحدتهم من التفرُّق والتشتت، وبين الشريعة.

وعلى أيّ حالٍ فهي -كما قلنا- لا تعتبر سوابق دستورية ولا فتاوى يتَّكِأُ عليها اليوم أو غدًا، ذلك أنَّ لكل عصرٍ خصوصيته وظروفه.

কুফার অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন: তিনজনের উপস্থিতিতে এটি (ইমামত) সুসম্পন্ন হয়; তাঁদের মধ্যে একজন অপর দুইজনের সম্মতিতে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন যেন তাঁরা একজন শাসক এবং দুইজন সাক্ষী হিসেবে গণ্য হন, যেমনটি অভিভাবক ও দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ চুক্তি সম্পন্ন হওয়া শুদ্ধ।

অন্য এক দল বলেছেন: এটি একজনের মাধ্যমেও সুসম্পন্ন হয়; কারণ আব্বাস (রা.) আলী (রা.)-কে বলেছিলেন—আল্লাহ তাঁদের উভয়ের ওপর সন্তুষ্ট হোন—: "আপনার হাত প্রসারিত করুন, আমি আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করি। তখন মানুষ বলবে: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা তাঁর চাচাতো ভাইয়ের হাতে বায়আত নিয়েছেন, ফলে আপনার

ব্যাপারে দুইজন লোকও মতবিরোধ করবে না।" তাছাড়া এটি একটি ফয়সালা, আর একজনের ফয়সালাও কার্যকর হয়।

---

১ আমি বলছি: এটি অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কথা যার সামনে দীর্ঘক্ষণ থামা প্রয়োজন; ইসলামি শরীয়তের চেতনার সাথে এর যে সকল বৈপরীত্য রয়েছে তা স্পষ্ট করার জন্য। কেউ কেউ যে দাবি করেন যে খেলাফত ছয়জন, পাঁচজন এমনকি একজনের মাধ্যমেও সুসম্পন্ন হয়, তা শরয়ি বা যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

উম্মতের মাত্র একজন, পাঁচজন বা ছয়জন সদস্যকে—এমনকি কয়েক হাজার মানুষকেও—উম্মতের মতামতের তোয়াক্কা না করে কীভাবে কোনো ব্যক্তির জন্য ইমামত বা নেতৃত্বের চুক্তি সম্পন্ন করার অনুমতি আমরা দিতে পারি?

অধিকন্তু, খেলাফত আবু বকর (রা.)-এর জন্য পাঁচজনের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়নি যেমনটি এই মতের প্রবক্তারা দাবি করেন, এবং উসমান (রা.)-এর জন্যও ছয়জনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়নি যেমনটি তারা ধারণা করেন। আবু বকর (রা.)-এর বায়আতে সেই পাঁচজন বা উসমান (রা.)-এর বায়আতে সেই ছয়জন যা করেছিলেন তা দ্বারা ইমামত সুসম্পন্ন হয়নি; বরং তা সুসম্পন্ন হয়েছিল পরবর্তীতে উম্মতের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে সম্পাদিত ‘বায়আতে আম্মা’ বা সর্বজনীন আনুগত্যের শপথের মাধ্যমে।

অতএব, ইসলামি দুর্বলতার যুগে কিছু ফকিহ যেসকল বক্তব্য পেশ করেছেন তার কোনো গুরুত্ব নেই, যা মূলত শাসকদের প্রভাবকে শক্তিশালী করে এবং রাজনৈতিক বিষয়ে উম্মাহ ও ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর মর্যাদাকে খাটো করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখি ইবন জামাআহ দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী প্রভাবশালী ও শক্তিধর ব্যক্তিদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যেন তারা এমন কিছু দাবি করতে পারে যা তাদের প্রাপ্য নয়, এবং তিনি সেটাকে একটি শরয়ি অধিকারে পরিণত করেছেন!

ইবন জামাআহ বলেন: "যদি কোনো সময় ইমাম না থাকে এবং অযোগ্য কোনো ব্যক্তি বায়আত বা উত্তরাধিকার মনোনয়ন ছাড়াই তার শক্তি ও সেনাবাহিনী দিয়ে ক্ষমতা দখল করে এবং মানুষকে পরাভূত করে, তবে তার বায়আত সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্য করা আবশ্যক হবে; যেন মুসলমানদের সংহতি বজায় থাকে। সে ফাসেক বা জাহেল হলেও তার ইমামত ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিজয় ও আধিপত্য বজায় থাকে।"

শুধু তাই নয়, বরং তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বলেন: "যদি শক্তি ও বিজয়ের মাধ্যমে একজনের জন্য ইমামত সুসম্পন্ন হয়, অত:পর অন্য কেউ এসে তার শক্তি ও সেনাবাহিনী দিয়ে প্রথমজনকে পরাভূত করে, তবে প্রথমজন অপসারিত হবে এবং দ্বিতীয়জন ইমাম হিসেবে গণ্য হবে; মুসলমানদের কল্যাণ এবং তাদের ঐক্য বজায় রাখার যে কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তার ভিত্তিতে।"

একইভাবে সালজুক উজির 'নিজামুল মুলক'-এর চিন্তাধারাও শাসনব্যবস্থার প্রশ্নে ইসলামের মূল চেতনা থেকে অনেক দূরে ছিল; তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই সুলতান সরাসরি ঐশ্বরিক কৃপায় মনোনীত হন এবং তিনি সরাসরি আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ।"

এরপর আমরা দেখতে পাই যে, নিজামুল মুলকের এই চিন্তাধারা মুহাম্মদ ইবন ওয়ালিদ আল-তুর্তুশির মাধ্যমে আন্দালুসে পৌঁছেছে, যিনি বলেন: "নিশ্চয়ই সুলতানের শাসনের অধিকার আল্লাহর ইচ্ছা থেকে উৎসারিত, অতএব তা কোনোভাবেই আলোচনার বিষয় নয়। আল্লাহ তাআলা এবং রাজাদের মধ্যে একটি চুক্তি বা অঙ্গীকার রয়েছে, যা শাসককে তার প্রজাদের সাথে ন্যায়বিচার, ইনসাফ ও সদাচরণের নির্দেশ দেয়। তবে জালেম শাসককে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের ওপর নির্ধারিত একটি শাস্তি হিসেবে গণ্য করেন, যা তাদের অবাধ্যতার প্রতিফল। তাই তাদের জন্য তার শাসন সহ্য করা অপরিহার্য।"

প্রাচীন ও আধুনিক কিছু কিতাবে এ জাতীয় যেসকল অসার ধারণা সয়লাব হয়ে আছে, সেগুলো মূলত পরাজয়বাদী চিন্তা। লেখকরা মুসলমানদের রক্ত রক্ষা করা ও তাদের ঐক্য বজায় রাখার মতো জনস্বার্থ এবং শরীয়তের মধ্যে সমন্বয় সাধনের এক প্রকার প্রচেষ্টায় এ সকল বক্তব্য দিয়েছিলেন।

যা-ই হোক, আমরা যেমনটি বলেছি, এগুলোকে কোনো সাংবিধানিক নজির বা ফতোয়া হিসেবে গণ্য করা যাবে না যার ওপর আজ বা ভবিষ্যতে নির্ভর করা যায়; কেননা প্রতিটি যুগেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রেক্ষাপট রয়েছে।

الأحكام السلطانية للماوردي(ص: 25)

فصل: "في وجوب اختيار الأصلح"

فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ لِلِاخْتِيَارِ تَصَفَّحُوا أَحْوَالَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمْ شُرُوطَهَا، فَقَدَّمُوا لِلْبَيْعَةِ مِنْهُمْ أَكْثَرَهُمْ فَضْلًا وَأَكْمَلَهُمْ شُرُوطًا، وَمَنْ يُسْرِعُ النَّاسُ إِلَى طَاعَتِهِ، وَلَا يَتَوَقَّفُونَ عَنْ بَيْعَتِهِ، فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ مَنْ أَدَّاهُمُ الِاجْتِهَادُ إِلَى اخْتِيَارِهِ عَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ أَجَابَ إِلَيْهَا بَايَعُوهُ عَلَيْهَا، وَانْعَقَدَتْ بِبَيْعَتِهِمْ لَهُ الْإِمَامَةُ1، فَلَزِمَ كَافَّةَ

---

1 قلت: كلَّا والله لم تنعقد إلَّا بعد بيعة غالبية الأمة له، فبيعة أبي بكر رضي الله عنه لم تتمّ إلّا بعد مبايعة غالبية أهل المدينة، وكذلك مبايعة غالبية باقي الأمصار.

يقول الدكتور فهمي عبد الجليل: "فبيعة أبي بكر رضي الله عنه حدثت في مجلسٍ ضمَّ عامَّة الأنصار، وهم أكثرية أهل المدينة، وإذا كانت الخلاصة قد سبقت إلى بيعته، فإنَّ بيعة العامَّة من الحاضرين لمجلس السقيفة هي التي أعطت الشرعية لهذه البيعة".

كذلك كان اختيار أبي بكر لعمر للخلافة من بعده بناءً على موافقة الأمَّة، فقد روي أنه رضي الله عنه قال: "أترضون بمن أستخلف عليكم، فقالوا جميعًا: سمعنا وأطعنا".

وكذلك كان اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه بناءً على اختيار الأمَّة، فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسأل قبل أن يعلن عن الخليفة الذي تَمَّ اختياره من الأمَّة.

يقول الإمام السيوطي: "بويع بالخلافة -أي: عثمان- بعد دفن عمر بثلاث ليالٍ، فروي أنَّ الناس كانوا يجتمعون في تلك الأيام إلى عبد الرحمن بن عوف يشاورونه

ويناجونه، فلا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان أحدًا، ولمَّا جلس عبد الرحمن للمبايعة، حمد الله وأثنى عليه وقال في كلامه: إنِّي رأيت الناس يأبون إلّا عثمان.
ثم جاءت بيعة علي رضي الله عنه بناءً على اختيار الأمة؛ لتؤكِّد على دور العامَّة في اختيار من يمثِّلها، سواء كان الخليفة أو أهل الشورى أو غير ذلك.

পরিচ্ছেদ: "সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচনের আবশ্যকতা প্রসঙ্গে"
যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সমবেত হন, তখন তাঁরা ইমামত বা নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন যাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী বিদ্যমান। অতঃপর তাঁরা তাঁদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে বায়আত বা আনুগত্যের শপথের জন্য পেশ করেন, যিনি তাঁদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী এবং যাঁর মধ্যে নেতৃত্বের শর্তাবলী পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান, এবং যাঁর আনুগত্য স্বীকারে জনগণ দ্রুত অগ্রসর হয় ও যাঁর বায়আত গ্রহণে তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। যখন সেই দলের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট হন যাঁর নির্বাচনে তাঁদের ইজতিহাদ বা গবেষণা উপনীত হয়েছে, তখন তাঁরা তাঁর নিকট নেতৃত্বের প্রস্তাব পেশ করেন। যদি তিনি তাতে সম্মতি প্রদান করেন, তবে তাঁরা তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন এবং তাঁদের এই বায়আতের মাধ্যমেই নেতৃত্ব বা ইমামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফলে তা সকল মানুষের জন্য পালনীয় হয়ে পড়ে...

---

১. আমি বলছি: আল্লাহর শপথ, বিষয়টি মোটেও তেমন নয়; বরং উম্মাহর সংখ্যাগুরু অংশের বায়আত লাভ করার পরেই কেবল ইমামত বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আবু বকর (রা.)-এর বায়আত মদিনার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বায়আতের মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করেছিল এবং একইভাবে অন্যান্য শহরের সংখ্যাগুরু অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য ছিল।
ডক্টর ফাহমি আব্দুল জলিল বলেন: "আবু বকর (রা.)-এর বায়আত এমন এক মজলিসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে সাধারণ আনসারগণ উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা ছিলেন মদিনার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী। যদিও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বায়আতে অগ্রণী ছিলেন, তবে সাকিফাহর মজলিসে উপস্থিত সাধারণ জনগণের বায়আতই এই বায়আতকে বৈধতা দান করেছিল।"
অনুরূপভাবে, আবু বকর (রা.) কর্তৃক তাঁর পরবর্তী খলিফা হিসেবে উমর (রা.)-কে মনোনীত করাও উম্মাহর সম্মতির ভিত্তিতেই হয়েছিল। বর্ণিত আছে যে, আবু বকর (রা.) বলেছিলেন:

"আমি তোমাদের জন্য যাকে খলিফা মনোনীত করেছি, তোমরা কি তাতে সন্তুষ্ট?" তাঁরা সকলে উত্তরে বলেছিলেন: "আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।"
তেমনিভাবে উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর নির্বাচনও উম্মাহর পছন্দের ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়েছিল। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) উম্মাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত খলিফার নাম ঘোষণা করার আগে জনগণের মতামত গ্রহণ করছিলেন।
ইমাম সুয়ূতী বলেন: "উমর (রা.)-কে দাফন করার তিন রাত পর উসমান (রা.)-এর খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয়। বর্ণিত আছে যে, সেই দিনগুলোতে মানুষ আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর কাছে সমবেত হতো, তাঁর সাথে পরামর্শ ও আলোচনা করত। দূরদর্শী কোনো ব্যক্তিই তখন উসমানের বিপরীতে অন্য কাউকে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। যখন আব্দুর রহমান বায়আত গ্রহণের জন্য বসলেন, তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং ভাষণে বললেন: আমি দেখেছি যে জনগণ উসমান ব্যতীত অন্য কাউকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।"
অতঃপর আলী (রা.)-এর বায়আত উম্মাহর নির্বাচনের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়; যা জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনে সাধারণ মানুষের ভূমিকার গুরুত্বকে সুনিশ্চিত করে, চাই তিনি খলিফা হোন, শুরা সদস্য হোন বা অন্য কোনো পদাধিকারী হোন।

(ص: 26)الأحكام السلطانية للماوردي

الْأُمَّةِ الدُّخُولُ فِي بَيْعَتِهِ وَالِانْقِيَادُ لِطَاعَتِهِ، وَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْإِمَامَةِ وَلَمْ يُجِبْ إِلَيْهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا عَقْدُ مُرَاضَاةٍ وَاخْتِيَارٍ لَا يَدْخُلُهُ إِكْرَاهٌ وَلَا إِجْبَارٌ، وَعُدِلَ عَنْهُ إِلَى مَنْ سِوَاهُ مِنْ مُسْتَحِقِّيهَا.

فَلَوْ تَكَافَأَ فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ اثْنَانِ قُدِّمَ لَهَا اخْتِيَارًا أَسَنُّهُمَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةُ السِّنِّ مَعَ كَمَالِ الْبُلُوغِ شَرْطًا، فَإِنْ بُويِعَ أَصْغَرُهُمَا سِنًّا جَازَ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ وَالْآخَرُ أَشْجَعَ رُوعِيَ فِي الِاخْتِيَارِ مَا يُوجِبُهُ حُكْمُ الْوَقْتِ، فَإِنْ كَانَتِ الْحَاجَةُ إِلَى فَضْلِ الشَّجَاعَةِ

أَدْعَى لِانْتِشَارِ الثُّغُورِ وَظُهُورِ الْبُغَاةِ كَانَ الْأَشْجَعُ أَحَقَّ، وَإِنْ كَانَتِ الْحَاجَةُ إِلَى فَضْلِ الْعِلْمِ أَدْعَى لِسُكُونِ الدَّهْمَاءِ وَظُهُورِ أَهْلِ الْبِدَعِ كَانَ الْأَعْلَمُ أَحَقَّ، فَإِنْ وَقَفَ الِاخْتِيَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنِ اثْنَيْنِ فَتَنَازَعَاهَا، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ التَّنَازُعَ فِيهَا لَا يَكُونُ قَدْحًا مَانِعًا.

وَلَيْسَ طَلَبُ الْإِمَامَةِ مَكْرُوهًا، فَقَدْ تَنَازَعَ فِيهَا أَهْلُ الشُّورَى، فَمَا رُدَّ عَنْهَا طَالِبٌ، وَلَا مُنِعَ مِنْهَا رَاغِبٌ، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُقْطَعُ بِهِ تَنَازُعُهُمَا مَعَ تَكَافُؤِ أَحْوَالِهِمَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَيُقَدَّمُ مَنْ قَرَعَ مِنْهُمَا.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يَكُونُ أَهْلُ الِاخْتِيَارِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعَةِ أَيِّهِمَا شَاءُوا1 مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ، فلو

أقول: ويمكن الجمع بين قول من يقول باختيار من يمثل الأمة عن طريق أهل الحل والعقد، وبين من يرون الاختيار المباشر عن طريق الأمة، وذلك أن يتمّ الترشيح الأوليّ عن طريق أهل الحل والعقد الذين يستطيعون إنزال الناس منازلهم، ثم يعرض هذا الترشيح على الأمَّة لتختار من هذه الترشيحات ما تريد.

2 قلت: بل يرجع في ذلك إلى رأي الأمَّة لتختار من يتولَّى هذا المنصب الجليل، فالشعب وحده هو صاحب الحقِّ في اختيار الحاكم، ولا يحقّ لأحد مهما بلغت قوته ونفوذه الافتئات على الشعب، فيقوم باختيار الحاكم وتوليته من تلقاء نفسه، ومن يفعل ذلك فقد تعدَّ حدوده وخان هذه الأمة.

ولعلَّ هذا ما لفت إليه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الأنظار حين سمع من يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعت فلانًا، فقال عمر معترضًا ومؤكدًا على مبدأ سيادة الشعب: "إني لقائم العشية في الناس فمحذّرهم من هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوا الناس أمرهم".

غير أنَّ هناك من يرى أنَّ أهل الشورى الذين يُنَاط بهم اختيار الحاكم هم أهل الحل والعقد وحدهم وليس عامَّة الشعب، ومن هؤلاء المعتزلة الذين يرون أنَّ العامة لا تصلح لذلك، وها هو ذا أحد مفكريهم يقول: "إنَّ العامة لا تعرف معنى الإمامة ولا تأويل الخلافة، ولا تفصل بين فضل وجودها =

উম্মতের কর্তব্য হলো তাঁর বায়আতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা। তিনি যদি ইমামত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং এতে সাড়া না দেন, তবে তাঁকে এর জন্য বাধ্য করা যাবে না; কেননা এটি পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও নির্বাচনের একটি চুক্তি, যাতে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা চলে না। এমতাবস্থায় তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যোগ্য ব্যক্তিদের দিকে দৃষ্টি ফেরানো হবে।

যদি ইমামতের শর্তাবলীতে দুইজন সমান হন, তবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যদিও পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত বয়স হওয়া কোনো শর্ত নয়। তবে যদি কনিষ্ঠ জনের বায়আত গ্রহণ করা হয়, তবে তা বৈধ হবে। আর যদি তাঁদের একজন অধিক জ্ঞানী এবং অন্যজন অধিক সাহসী হন, তবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমসাময়িক পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে। যদি সীমান্ত রক্ষা এবং বিদ্রোহীদের দমনের প্রয়োজনে সাহসিকতার অধিক প্রয়োজন হয়, তবে অধিক সাহসী ব্যক্তিই বেশি হকদার হবেন। আর যদি জনগণের অস্থিরতা প্রশমিত করা এবং বিদআতিদের মোকাবিলায় গভীর জ্ঞানের অধিক প্রয়োজন হয়, তবে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিই বেশি হকদার হবেন। যদি নির্বাচন দুইজনের মধ্যে একজনের ওপর এসে স্থির হয় এবং তাঁরা এটি নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হন, তবে কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন: এই পদের জন্য বিবাদ করা কোনো অযোগ্যতা বা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে গণ্য হবে না।

ইমামতের পদ প্রার্থনা করা অপছন্দনীয় নয়; কেননা শূরা পরিষদের সদস্যরা এ নিয়ে বিবাদ (আলোচনা-পর্যালোচনা) করেছেন, কিন্তু কোনো প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি কিংবা কোনো আগ্রহী ব্যক্তিকে বাধা দেওয়া হয়নি। তবে যোগ্যতা সমান হওয়া অবস্থায় তাঁদের বিবাদ কীভাবে নিরসন করা হবে সে বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। একদল ফকীহ বলেছেন: তাঁদের মধ্যে লটারি করা হবে এবং লটারিতে যিনি বিজয়ী হবেন তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অন্যান্যরা বলেছেন: বরং নির্বাচক মণ্ডলী লটারি ছাড়াই তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো একজনের বায়আত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন। যদি

আমি বলছি: যারা আহলে হাল্লি ওয়াল আকদ (নীতি-নির্ধারক গোষ্ঠী)-এর মাধ্যমে উম্মতের প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা বলেন এবং যারা উম্মতের মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষপাতী, এই দুই মতের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা সম্ভব যে—প্রাথমিক মনোনয়ন হবে আহলে হাল্লি ওয়াল আকদ-এর মাধ্যমে যারা মানুষের যথাযথ মূল্যায়ন করতে সক্ষম, অতঃপর সেই মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকা উম্মতের সামনে পেশ করা হবে যাতে তারা তাদের মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দমতো কাউকে বেছে নিতে পারে।

২ আমি বলছি: বরং এই বিষয়ে উম্মতের মতামতের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে যাতে তারা এই মহান পদের দায়িত্বশীলকে নির্বাচন করতে পারে। কেননা জনগণই হলো শাসক নির্বাচনের প্রকৃত অধিকারী। কারোর জন্যই—তার শক্তি বা প্রভাব যতই হোক না কেন—জনগণের অধিকার হরণ করে নিজ ইচ্ছামতো কাউকে শাসক হিসেবে নির্বাচন বা নিযুক্ত করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে তার সীমা লঙ্ঘন করল এবং এই উম্মতের সাথে খিয়ানত করল।

সম্ভবত আমীরুল মুমিনীন ফারুকে আজম উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যখন তিনি কাউকে বলতে শুনেছিলেন: "যদি আমীরুল মুমিনীন ইন্তেকাল করেন তবে আমি অমুকের হাতে বায়আত গ্রহণ করব।" তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণের সার্বভৌমত্বের মূলনীতির ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রতিবাদস্বরূপ বলেছিলেন: "আমি আজ সন্ধ্যায় জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ওইসব লোকদের ব্যাপারে সতর্ক করব যারা জনগণের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়।"

তবে এমন কিছু লোকও রয়েছেন যারা মনে করেন যে, শাসক নির্বাচনের দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত তারা কেবল আহলে হাল্লি ওয়াল আকদ-ই হবেন, সাধারণ জনগণ নয়। তাদের মধ্যে মুতাজিলা সম্প্রদায় অন্যতম যারা মনে করে সাধারণ জনগণ এর যোগ্য নয়। তাঁদের একজন চিন্তাবিদ বলেন: "সাধারণ মানুষ ইমামতের মর্ম এবং খিলাফতের গূঢ় রহস্য বোঝে না, আর না তারা এর অস্তিত্বের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য করতে পারে ="

تَعَيَّنَ لِأَهْلِ الِاخْتِيَارِ وَاحِدٌ هُوَ أَفْضَلُ الْجَمَاعَةِ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِمَامَةِ، وَحَدَثَ بَعْدَهُ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ انْعَقَدَتْ بِبَيْعَتِهِمْ إِمَامَةُ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ؛ وَلَوْ ابْتَدَءُوا بَيْعَةَ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ دَعَا إِلَيْهِ مِنْ كَوْنِ الْأَفْضَلِ غَائِبًا أَوْ مَرِيضًا، أَوْ كَوْنِ الْمَفْضُولِ أَطْوَعَ فِي النَّاسِ وَأَقْرَبَ فِي الْقُلُوبِ، انْعَقَدَتْ بَيْعَةُ الْمَفْضُولِ وَصَحَّتْ إِمَامَتُهُ.

وَإِنْ بُويِعَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي انْعِقَادِ بَيْعَتِهِ وَصَحَّتْ إِمَامَتُهُ؛ فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ الْجَاحِظُ إِلَى أَنَّ بَيْعَتَهُ لَا تَنْعَقِدُ؛ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ إِذَا دَعَا إِلَى أَوْلَى الْأَمْرَيْنِ لَمْ يَجُزِ الْعُدُول عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِأَوْلَى كَالِاجْتِهَادِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَقَالَ الْأَكْثَرُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: تَجُوزُ إِمَامَتُهُ وَصَحَّتْ بَيْعَتُهُ، وَلَا يَكُونُ وُجُودُ الْأَفْضَلِ مَانِعًا مِنْ إِمَامَةِ الْمَفْضُولِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُقَصِّرًا عَنْ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ، كَمَا يَجُوزُ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْفَضْلِ مُبَالَغَةٌ فِي الِاخْتِيَارِ، وَلَيْسَتْ مُعْتَبَرَةً فِي شُرُوطِ الِاسْتِحْقَاقِ، فَلَوْ تَفَرَّدَ فِي الْوَقْتِ بِشُرُوطِ الْإِمَامَةِ وَاحِدٌ لَمْ يُشْرِكْ فِيهَا غَيْرُهُ تَعَيَّنَتْ فِيهِ الْإِمَامَةُ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْدَلَ بِهَا عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ1.

= ونقص عدمها، ولأي شيء ارتدت، ولأي أمر أمّلت، وكيف مأتاها والسبيل إليها، بل هي مع كل ريح تهب وناشئة تنجم، ولعلها بالمتطلبة أقر عينًا منها بالمحقين"، فأهل الشورى في نظر هذا الفريق هم: "خواص الطبقة العليا في الأمَّة الذين أمر الله -عز شأنه- نبيه بمشاورتهم في الأمر، الذين لهم شرعًا حق الاحتساب والسيطرة على الإمام والعمَّال؛ لأنهم رؤساء الأمة وكلاء العامة".

أقول: وإنَّ من يرى هذا الرأي منَ المعتزلة ومن وافقهم يرون أنَّ العامة لا تصلح لاختيار الحاكم، وأنها ليست مؤهَّلة لذلك. إذًا فمن يختار أهل الشورى؟ إن قالوا: الشعب أو العامَّة ناقضوا أنفسهم، وإن قالوا: الحاكم، قلنا: فما أهمية الشورى إذا كان الحاكم هو الذي يختار أهل مشورته؟!.

"وهذا ما فهمه المسلمون حين أخَّروا عليَّ بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة الزهراء وهو أقرب الناس إلى قلب وفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم نسبًا وصهرًا إليه، وإذا كان علي بن أبي طالب قد غبن في تأخيره -وبخاصة بعد استشهاد عمر- إلّا أنَّ هذا التأخير كان له الفضل في التقدير العلمي لنظرية الإسلام ومبادئه في الحكم، حتى تكون بعيدةً عن شبهة الوراثة التي هي أبعد شيء عن روح الإسلام ومبادئه".

1 يقول الدكتور السنهوري: ففي الفرض الأوَّل، أي: إذا كان هناك عذر مبرّر لترك الأفضل، يكون في =

যদি নির্বাচকমণ্ডলী জামাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে তার নিকট ইমামতের বায়আত গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তার চেয়েও অধিকতর যোগ্য কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, তবে প্রথম ব্যক্তির বায়আতের মাধ্যমেই ইমামত সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং তার থেকে বিচ্যুত হয়ে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তির দিকে ফিরে যাওয়া বৈধ হবে না। আর যদি তারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য (মাফদূল) ব্যক্তির বায়আত গ্রহণ করেন, তবে বিষয়টি বিশ্লেষণযোগ্য। যদি তা কোনো যুক্তিসঙ্গত ওজরের কারণে হয়—যেমন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অনুপস্থিত বা অসুস্থ হওয়া, অথবা অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তিটি জনগণের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও হৃদয়ের নিকটবর্তী হওয়া—তবে উক্ত ব্যক্তির বায়আত ও ইমামত বৈধ বলে গণ্য হবে।

আর যদি কোনো ওজর ছাড়াই তার বায়আত গ্রহণ করা হয়, তবে তার বায়আত ও ইমামতের বৈধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আল-জাহিজসহ একদল পণ্ডিতের মতে, তার বায়আত কার্যকর হবে না; কারণ নির্বাচন যখন দুটি বিষয়ের মধ্যে অধিকতর উত্তমটির দিকে আহ্বান করে, তখন শরয়ি বিধানের ইজতিহাদের ন্যায় অধিকতর উত্তমটিকে ছেড়ে অন্যটির দিকে যাওয়া বৈধ নয়।

অধিকাংশ ফকিহ ও মুতাকাল্লিম (ধর্মতাত্ত্বিক) বলেছেন: তার ইমামত ও বায়আত বৈধ। ইমামতের শর্তাবলীতে কোনো ঘাটতি না থাকলে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপস্থিতি অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তির ইমামতের পথে বাধা হবে না; যেমনটি বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপস্থিতিতেও অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া বৈধ। কেননা শ্রেষ্ঠত্বের আধিক্য হলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি কাম্য গুণ মাত্র, তা যোগ্যতার অপরিহার্য শর্ত নয়। তবে যদি সেই সময়ে ইমামতের শর্তাবলি কেবল একজনের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে এবং অন্য কেউ তাতে শরিক না হয়, তবে তার ইমামতই সুনির্ধারিত হবে এবং তাকে ছেড়ে অন্য কারো দিকে ফিরে যাওয়া বৈধ হবে না।১

= এবং এর অভাব একটি ত্রুটি; আর কিসের জন্য তা প্রত্যাখ্যাত হলো, কেনই বা তা প্রত্যাশা করা হলো এবং এর পথ ও পদ্ধতিই বা কী? বরং এটি প্রতিটি প্রবাহিত বাতাসের সাথে এবং উদীয়মান প্রতিটি নতুনের সাথেই পরিবর্তিত হয়। সম্ভবত এটি সত্যপন্থীদের চেয়ে সুযোগসন্ধানীদের চোখকেই বেশি জুড়ায়। এই দলের দৃষ্টিতে শুরা সদস্যগণ হলেন: "উম্মাহর উচ্চস্তরের সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে আদেশ দিয়েছেন; শরয়িভাবে যাদের ইমাম ও কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। কারণ তারা উম্মাহর প্রধান এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি।"

আমি বলছি: মুতাজিলাদের মধ্যে যারা এই মত পোষণ করেন এবং যারা তাদের সাথে একমত হয়েছেন, তারা মনে করেন যে সাধারণ জনগণ শাসক নির্বাচনের যোগ্য নয় এবং তাদের সেই সক্ষমতা নেই। তাহলে শুরা সদস্যদের কারা নির্বাচন করবে? তারা যদি বলে: জনগণ বা সাধারণ মানুষ, তবে তারা স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হবে। আর তারা যদি বলে: শাসক, তবে আমরা বলব: পরামর্শসভার গুরুত্বই বা কী থাকল যদি শাসক নিজেই তার পরামর্শদাতাদের নির্বাচন করেন?!

"মুসলমানরা এটিই অনুধাবন করেছিলেন যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই এবং ফাতিমা জেহরার স্বামী আলী ইবনে আবু তালিবকে পিছিয়ে দিয়েছিলেন; অথচ তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের মানুষ এবং বংশ ও বৈবাহিক সূত্রে তাঁর নিকটতম। যদিও আলী ইবনে আবু তালিবকে পিছিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে—বিশেষ করে উমরের শাহাদাতের পর—তার হক কিছুটা

ক্ষুন্ন হয়েছে, তবুও এই বিলম্বের সার্থকতা ছিল ইসলামের রাজনৈতিক তত্ত্ব ও মূলনীতির তাত্ত্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। যাতে এটি উত্তরাধিকারের সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকে, যা ইসলামের চেতনা ও আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ দূরে।"

১ ড. সানহুরি বলেন: প্রথম অনুমিতির ক্ষেত্রে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ত্যাগ করার পেছনে যদি কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর থাকে, তবে সেটি...

(ص: 28)الأحكام السلطانية للماوردي

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ثُبُوتِ إِمَامَتِهِ وَانْعِقَادِ وِلَايَتِهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلَا اخْتِيَارٍ؛ فَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ إِلَى ثُبُوتِ وِلَايَتِهِ وَانْعِقَادِ إِمَامَتِهِ، وَحَمْلِ الْأُمَّةِ عَلَى طَاعَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْهَا أَهْلُ الِاخْتِيَارِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الِاخْتِيَارِ تَمْيِيزُ الْمُوَلَّى وَقَدْ تَمَيَّزَ هَذَا بِصِفَتِهِ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ إِمَامَتَهُ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِالرِّضَا وَالِاخْتِيَارِ، لَكِنْ يَلْزَمُ أَهْلَ الِاخْتِيَارِ عَقْدُ الْإِمَامَةِ لَهُ، فَإِنْ اتَّفَقُوا أَتَمُّوا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ عَقْدٌ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِعَاقِدٍ، وَكَالْقَضَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا وَاحِدٌ لَمْ يَصِرْ قَاضِيًا حَتَّى يُوَلَّاهُ؛ فَرَكَّبَ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ الْمَذْهَبِ هَذَا الْبَابَ وَقَالَ: يَصِيرُ قَاضِيًا إِذَا تَفَرَّدَ بِصِفَتِهِ كَمَا يَصِيرُ الْمُنْفَرِدُ بِصِفَتِهِ إِمَامًا.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصِيرُ الْمُنْفَرِدُ قَاضِيًا وَإِنْ صَارَ الْمُنْفَرِدُ إِمَامًا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْقَضَاءَ نِيَابَةٌ خَاصَّةٌ يَجُوزُ صَرْفُهُ عَنْهُ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى صِفَتِهِ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ وِلَايَتُهُ إِلَّا بِتَقْلِيدٍ مُسْتَنِيبٍ لَهُ، وَالْإِمَامَةُ مِنَ الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، لَا يَجُوزُ صَرْفُ مَنِ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ إِذَا كَانَ عَلَى صِفَةٍ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ تَقْلِيدُ مُسْتَحِقِّهَا مَعَ تَمَيُّزِهِ إِلَى عَقْدٍ مُسْتَثْبَتٍ لَهُ.

= حكم غير الموجود؛ لوجود سبب كافٍ لتفضيل من هو أقل منه، ولكنَّ الفرض الثاني هو الذي تتعارض فيه النظريتان؛ فالفقهاء الذين يرون أنَّ بيعة المفضول تكون غير صحيحة ولا تنعقد بها الإمامة، يظهر أنَّهم يقولون بنظرية الصفة الكاشفة للانتخاب، أمَّا الذين يقولون بالعكس، وهم أغلبية الفقهاء والمتكلمين -كما ذكر الماوردي- فيرون الانتخاب تصرف منشئ. "فقه الخلافة وتطورها: ص109".

কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিক চুক্তি বা নির্বাচকমণ্ডলীর মনোনয়ন ব্যতিরেকে ইমামত সাব্যস্ত হওয়া এবং শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রসঙ্গে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। ইরাকের একদল ফকিহ এই মত পোষণ করেছেন যে, তাঁর কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে এবং ইমামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং উম্মতকে তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য করা হবে, যদিও নির্বাচকমণ্ডলী (আহলুল ইখতিয়ার) আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদন না করেন। কারণ নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্য হলো যোগ্য ব্যক্তিকে অন্যদের থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করা, আর তিনি স্বীয় গুণাবলির মাধ্যমেই ইতোমধ্যে স্বতন্ত্র ও চিহ্নিত হয়ে আছেন।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ ফকিহ ও কালামশাস্ত্রবিদের অভিমত হলো, সাধারণ সম্মতি ও নির্বাচকমণ্ডলীর মনোনয়ন ব্যতীত তাঁর ইমামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। তবে নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য তাঁর অনুকূলে ইমামতের চুক্তি সম্পাদন করা আবশ্যক। যদি তাঁরা একমত হয়ে তা সম্পন্ন করেন, তবেই তা পূর্ণতা পাবে। কারণ ইমামত হলো একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যা কোনো সম্পাদনকারী বা নিয়োগকারী ব্যতিরেকে পূর্ণতা পায় না। এটি বিচারকের পদের ন্যায়; বিচারক হওয়ার যোগ্য যদি মাত্র একজন ব্যক্তিই অবশিষ্ট থাকেন, তবুও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিয়োগ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি বিচারক হিসেবে গণ্য হন না। এই মত পোষণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ এই বিষয়টি এভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে: যে ব্যক্তি স্বীয় গুণাবলির কারণে অনন্য ও একক, তিনি সরাসরি বিচারক হয়ে যাবেন, ঠিক যেভাবে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য ব্যক্তি সরাসরি ইমাম হয়ে যান।

আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: গুণের দিক থেকে একক ব্যক্তি সরাসরি ইমাম হতে পারলেও সরাসরি বিচারক হতে পারবেন না। তাঁরা এই দুই পদের মাঝে পার্থক্য করে বলেন যে, বিচারকার্য হলো একটি বিশেষ প্রতিনিধিত্ব (নিসাবাতে খাসসাহ), তাই কোনো ব্যক্তি স্বীয় পদে বহাল থাকা অবস্থায় তাঁকে অপসারণ করা বৈধ। ফলে কোনো নিয়োগদাতার আনুষ্ঠানিক

নিয়োগ ব্যতীত তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্যদিকে ইমামত বা খেলাফত হলো এমন এক সাধারণ অধিকার, যা আল্লাহর হক ও বান্দার হকের মাঝে সমন্বিত। কোনো উপযুক্ত ব্যক্তির ওপর ইমামত স্থির হওয়ার পর তাঁকে পদচ্যুত করা বৈধ নয়। সুতরাং স্বীয় যোগ্যতায় অনন্য হওয়ার পর যোগ্য ব্যক্তির পদপ্রাপ্তির জন্য কোনো নতুন সমর্থনমূলক চুক্তির মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

= অস্তিত্বহীনের বিধান; কারণ অপেক্ষাকৃত কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান রয়েছে। তবে দ্বিতীয় অনুমিতি বা ধারণার ক্ষেত্রে দুটি তত্ত্ব পরস্পর বিরোধী। যে সকল ফকিহ মনে করেন যে, অপেক্ষাকৃত কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তির বাইয়াত সঠিক নয় এবং এর মাধ্যমে ইমামত প্রতিষ্ঠিত হয় না, প্রতীয়মান হয় যে তাঁরা নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'পরিচয় উন্মোচনকারী গুণ' (সিফাত কাশিফাহ) তত্ত্বে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে যাঁরা এর বিপরীত মত পোষণ করেন—এবং মাওয়ার্দী যেমনটি উল্লেখ করেছেন তাঁরা ফকিহ ও কালামশাস্ত্রবিদদের সংখ্যাগুরু অংশ—তাঁরা নির্বাচনকে একটি 'মর্যাদা সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ' (তসররুফ মুনশি) হিসেবে দেখেন। "ফেকহুল খিলাফা ওয়া তাতাওউরুহা: পৃষ্ঠা ১০৯"।

(ص: 29)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد"

وَإِذَا عُقِدَتِ الْإِمَامَةُ لِإِمَامَيْنِ فِي بَلَدَيْنِ لَمْ تَنْعَقِدْ إِمَامَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْأُمَّةِ إِمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ شَذَّ قَوْمٌ فَجَوَّزُوهُ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْإِمَامِ مِنْهُمَا؛ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ الَّذِي عُقِدَتْ لَهُ الْإِمَامَةُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ مَنْ تَقَدَّمَهُ؛ لِأَنَّهُمْ بِعَقْدِهَا أَخَصُّ، وَبِالْقِيَامِ بِهَا أَحَقُّ، وَعَلَى كَافَّةِ الْأُمَّةِ فِي الْأَمْصَارِ كُلِّهَا أَنْ يُفَوِّضُوا عَقْدَهَا إِلَيْهِمْ، وَيُسَلِّمُوهَا لِمَنْ بَايَعُوهُ لِئَلَّا يَنْتَشِرَ الْأَمْرُ بِاخْتِلَافِ الْآرَاءِ وَتَبَايُنِ الْأَهْوَاءِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَدْفَعَ الْإِمَامَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَيُسَلِّمَهَا إِلَى صَاحِبِهِ طَلَبًا لِلسَّلَامَةِ وَحَسْمًا لِلْفِتْنَةِ؛ لِيَخْتَارَ أَهْلُ الْعَقْدِ أَحَدَهُمَا أَوْ غَيْرَهُمَا. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا دَفْعًا لِلتَّنَازُعِ وَقَطْعًا لِلتَّخَاصُمِ. فَأَيُّهُمَا قَرَعَ كَانَ بِالْإِمَامَةِ أَحَقَّ.

وَالصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ وَمَا عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّ الْإِمَامَةَ لِأَسْبَقِهِمَا بَيْعَةً وَعَقْدًا، كَالْوَلِيَّيْنِ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ إِذَا زَوَّجَاهَا بِاثْنَيْنِ كَانَ النِّكَاحُ لِأَسْبَقِهِمَا عَقْدًا.

فَإِذَا تَعَيَّنَ السَّابِقُ مِنْهُمَا اسْتَقَرَّتْ لَهُ الْإِمَامَةُ، وَعَلَى الْمَسْبُوقِ تَسْلِيمُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ وَالدُّخُولُ فِي بَيْعَتِهِ، وَإِنْ عُقِدَتْ الْإِمَامَةُ لَهُمَا فِي حَالٍ وَاحِدٍ لَمْ يَسْبِقْ بِهَا أَحَدُهُمَا فَسَدَ الْعَقْدَانِ وَاسْتُؤْنِفَ الْعَقْدُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا، وَإِنْ تَقَدَّمَتْ بَيْعَةُ أَحَدِهِمَا وَأَشْكَلَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا وَقَفَ أَمْرُهُمَا عَلَى الْكَشْفِ، فَإِنْ تَنَازَعَاهَا وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ الْأَسْبَقُ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَمْ يَحْلِفْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْحَقِّ فِيهَا، وَإِنَّمَا هُوَ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا، فَلَا حُكْمَ لِيَمِينِهِ فِيهِ وَلَا لِنُكُولِهِ عَنْهُ، وَهَكَذَا لَوْ قَطَعَ التَّنَازُعَ فِيهَا وَسَلَّمَهَا أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ لَمْ تَسْتَقِرَّ إِمَامَتُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِتَقَدُّمِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِالتَّقَدُّمِ خَرَجَ مِنْهَا الْمُقِرُّ وَلَمْ تَسْتَقِرَّ لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ شَهِدَ لَهُ الْمُقِرُّ بِتَقَدُّمِهِ فِيهَا مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ سُمِعَتْ شَهَادَتُهُ إِنْ ذَكَرَ اشْتِبَاهَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ، وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَذْكُرِ الِاشْتِبَاهَ لِمَا فِي الْقَوْلَيْنِ مِنْ التَّكَاذُبِ.

পরিচ্ছেদ: "একই সময়ে দুই খলিফার অনুকূলে বায়আত গ্রহণ সম্পর্কে"

যখন দুই ভিন্ন শহরে দুই ইমামের অনুকূলে ইমামতের চুক্তি সম্পাদিত হয়, তখন তাদের কারো ইমামত কার্যকর হবে না; কেননা মুসলিম উম্মাহর জন্য একই সময়ে দুই ইমাম থাকা বৈধ নয়, যদিও একদল বিচ্ছিন্ন লোক একে বৈধ বলেছেন।

তথাথিত দুই ইমামের মধ্যে কে প্রকৃত ইমাম হবেন সে বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন।

একদল ফকীহ বলেছেন: তিনি হবেন সেই ব্যক্তি যাঁর অনুকূলে সেই শহরে ইমামতের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যেখানে তাঁর পূর্বসূরী মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা সেই শহরের অধিবাসীগণই ইমামত নির্বাচনের চুক্তি সম্পাদনে অধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং তা পরিচালনার

ক্ষেত্রে অধিক হকদার। আর সমগ্র বিশ্বের অন্যান্য জনপদের মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব হলো চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি তাঁদের হাতে ন্যস্ত করা এবং তাঁরা যাঁকে বায়আত প্রদান করেছেন তাঁকে মেনে নেওয়া, যাতে মতভিন্নতা ও খেয়ালখুশির পার্থক্যের কারণে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে না পড়ে।

অন্যান্য ফকীহগণ বলেছেন: বরং ফিতনা দূর করার জন্য ও নিরাপত্তা লাভের আশায় তাঁদের উভয়ের ওপর কর্তব্য হলো নিজ থেকে ইমামত পরিহার করা এবং একে অপরের অনুকূলে ছেড়ে দেওয়া; যাতে 'আহলুল আকদ' (চুক্তি সম্পাদনকারী বিশেষজ্ঞগণ) তাঁদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে অথবা অন্য কাউকে নির্বাচন করতে পারেন। আবার অনেকে বলেছেন: বরং বিবাদ ও কলহ নিরসনের জন্য তাঁদের মধ্যে লটারি করা হবে, লটারিতে যাঁর নাম আসবে তিনিই ইমামতের জন্য অধিক হকদার বিবেচিত হবেন।

এ বিষয়ে বিশুদ্ধ মত এবং যাঁর ওপর গবেষক ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন তা হলো: ইমামত সেই ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হবে যিনি বায়আত ও চুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগামী। যেমন এক নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে দুই অভিভাবক যদি পৃথকভাবে তাঁকে দুই ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেন, তবে সেই বিবাহটিই বৈধ হবে যা আগে সম্পাদিত হয়েছে।

সুতরাং যখন অগ্রগামী ব্যক্তি নির্ধারিত হয়ে যাবে, তখন তাঁর ইমামত সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং পশ্চাদগামী ব্যক্তির জন্য কর্তব্য হলো তাঁর নিকট বিষয়গুলো সমর্পণ করা এবং তাঁর বায়আতে প্রবেশ করা। কিন্তু যদি উভয়ের অনুকূলে একই সাথে ইমামত চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং তাঁদের কেউই অগ্রগামী না হন, তবে উভয় চুক্তিই বাতিল হয়ে যাবে এবং পুনরায় তাঁদের কোনো একজনের জন্য অথবা অন্য কারো জন্য নতুন করে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। আর যদি একজনের বায়আত আগে হয়ে থাকে কিন্তু কে আগে তা অস্পষ্ট থাকে, তবে সত্য উদঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত থাকবে। এমতাবস্থায় তাঁরা যদি বিবাদে লিপ্ত হন এবং প্রত্যেকে নিজেকে অগ্রগামী দাবি করেন, তবে তাঁদের সেই দাবি গ্রহণ করা হবে না এবং এ বিষয়ে কসমও নেওয়া হবে না; কারণ ইমামত কোনো ব্যক্তিগত অধিকার নয় বরং তা সকল মুসলমানের সামষ্টিক অধিকার। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর শপথ করা বা না করার কোনো আইনি মূল্য নেই। একইভাবে যদি বিবাদ নিরসনের লক্ষ্যে একজন অন্যজনের নিকট ক্ষমতা ছেড়ে দেন, তবুও স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া যা তাঁর অগ্রগামী হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, অপরজনের জন্য ইমামত সুনিশ্চিত হবে না। আর যদি একজন অপরজনের অগ্রগামী হওয়ার কথা স্বীকার করেন, তবে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ইমামত থেকে খারিজ হয়ে যাবেন, কিন্তু অপরজনের জন্য তা সুনিশ্চিত

হবে না; কেননা তিনি মুসলমানদের অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন। তবে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী যদি অন্য একজন সাক্ষীর সাথে মিলে অপরজনের অগ্রগামী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং এ কথা উল্লেখ করেন যে বিবাদের সময় বিষয়টি তাঁর কাছে অস্পষ্ট ছিল, তবে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যদি তিনি পূর্বের অস্পষ্টতার কথা উল্লেখ না করেন তবে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না, কারণ তাঁর দুই বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর মিথ্যাচার বা বৈপরীত্য বিদ্যমান থাকে।

(ص: 30)الأحكام السلطانية للماوردي

فَصْلٌ: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة"؟

وَإِذَا دَامَ الِاشْتِبَاهُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْكَشْفِ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِأَحَدِهِمَا بِالتَّقَدُّمِ لَمْ يُقْرَعْ بَيْنَهُمَا لِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّ الْإِمَامَةَ عَقْدٌ، وَالْقُرْعَةُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الْعُقُودِ.

وَالثَّانِي: إِنَّ الْإِمَامَةَ لَا يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِيهَا، وَالْقُرْعَةُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِيمَا لَا يَصِحُّ الِاشْتِرَاكُ فِيهِ كَالْمُنَاكِحِ، وَتَدْخُلُ فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ الِاشْتِرَاكُ كَالْأَمْوَالِ، وَيَكُونُ دَوَامُ هَذَا الِاشْتِبَاهِ مُبْطِلًا لِعَقْدَيِ الْإِمَامَةِ فِيهِمَا، وَيَسْتَأْنِفُ أَهْلُ الِاخْتِيَارِ عَقْدَهَا لِأَحَدِهِمَا، فَلَوْ أَرَادُوا الْعُدُولَ بِهَا عَنْهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا، فَقَدْ قِيلَ بِجَوَازِهِ لِخُرُوجِهِمَا عَنْهَا، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَةَ لَهُمَا قَدْ صَرَفَتِ الْإِمَامَةَ عَمَّنْ عَدَاهُمَا؛ وَلِأَنَّ الِاشْتِبَاهَ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَهَا فِي أَحَدِهِمَا.

পরিচ্ছেদ: খিলাফতের জন্য মনোনীত দুই ব্যক্তির মধ্যে কি লটারি করা হবে?

তদন্তের পরেও যদি তাঁদের উভয়ের মাঝে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায় এবং তাঁদের মধ্যে কে আগে মনোনীত হয়েছেন সে সম্পর্কে কোনো প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে দুইটি কারণে তাঁদের মাঝে লটারি করা হবে না:

প্রথমত: ইমামত হলো একটি চুক্তি, আর চুক্তির ক্ষেত্রে লটারির কোনো অবকাশ নেই।
দ্বিতীয়ত: ইমামতে অংশীদারিত্ব বৈধ নয়। আর যে সকল বিষয়ে অংশীদারিত্ব বৈধ নয় (যেমন বৈবাহিক বিষয়াবলি), সেগুলোতে লটারির কোনো সুযোগ নেই; লটারি কেবল ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে যেগুলোতে অংশীদারিত্ব বৈধ, যেমন সম্পদ। এই অস্পষ্টতা বজায় থাকা উভয়ের ইমামতের চুক্তিকে বাতিল করে দেবে এবং নির্বাচক মণ্ডলী নতুন করে তাঁদের একজনের জন্য ইমামতের চুক্তি সম্পাদন করবেন। এখন তাঁরা যদি ঐ দুজনকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দিকে ফিরে যেতে চান, তবে এক মতে তা বৈধ; যেহেতু অস্পষ্টতার কারণে তাঁরা দুজন এর বাইরে চলে গেছেন। অন্য মতে তা বৈধ নয়; কারণ তাঁদের উভয়ের জন্য গৃহীত বায়আত ইমামতকে অন্য সবার থেকে বিমুখ করে দিয়েছে এবং অস্পষ্টতা তাঁদের কোনো একজনের ক্ষেত্রে ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক নয়।

(ص: 30)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد"؟
وَأَمَّا انْعِقَادُ الْإِمَامَةِ بِعَهْدِ مَنْ قَبْلَهُ فَهُوَ مِمَّا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ، وَوَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى صِحَّتِهِ؛ لِأَمْرَيْنِ عَمِلَ الْمُسْلِمُونَ بِهِمَا وَلَمْ يَتَنَاكَرُوهُمَا:
أَحَدُهُمَا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه عَهِدَ بِهَا إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَأَثْبَتَ الْمُسْلِمُونَ إِمَامَتَهُ بِعَهْدِهِ1.

---

1 قلت: الثابت تاريخيًّا أن أبا بكر رضي الله عنه إِنَّمَا رجع إلى أهل الحل والعقد في هذا الأمر وسألهم إن كانوا يرضون من يوليه عليهم فوافقوا جميعًا، لا أنه ولَّى عمر كما يزعم البعض ثم قبلت الأمة، فقد روي أَنَّ أبا بكر لمَّا ثقل عليه المرض دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب؟ فقال: ما تسألني عن أمرٍ

إلّا وأنت أعلم به منّي، فقال أبو بكر: وإن. فقال عبد الرحمن بن عوف: هو والله أفضل من رأي كثير، ثم دعا عثمان بن عفان فقال: أخبرني عن عمر، فقال: أنت أخبرنا به. فقال: على ذلك؟ فقال: اللهم علمي به أنَّ سريرته خير من علانيته، وأن ليس فينا مثله، وشاور معهما سعيد بن زيد، وأسيد بن حضير، وغيرهما من المهاجرين والأنصار.

অনুচ্ছেদ: "উত্তরাধিকার মনোনয়নের মাধ্যমে কি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়?"
পূর্বসূরির মনোনয়নের মাধ্যমে ইমামত বা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি এমন একটি বিষয় যার বৈধতার ওপর ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারেও সকলে একমত হয়েছেন। এটি দুটি বিষয়ের কারণে, যা মুসলমানগণ পালন করেছেন এবং কেউই তা অস্বীকার করেননি:
প্রথমটি হলো: আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে এর জন্য মনোনীত করেছিলেন এবং মুসলমানগণ তাঁর মনোনয়নের মাধ্যমেই তাঁর ইমামতকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।১

---

১ আমি বলি: ঐতিহাসিকভাবে এটি প্রমাণিত যে, আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এই বিষয়ে কেবল 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি যাঁকে তাঁদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করবেন তাঁর প্রতি তাঁরা সন্তুষ্ট কি না; অতঃপর তাঁরা সকলেই তাতে সম্মত হয়েছিলেন। বিষয়টি এমন নয় যে, কেউ কেউ যেমনটি দাবি করেন—তিনি উমরকে সরাসরি নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং পরে উম্মত তা গ্রহণ করেছিল। বর্ণিত আছে যে, আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন, তখন তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে ডেকে বললেন: "আমাকে উমর ইবনুল খাত্তাব সম্পর্কে বলুন।" তিনি বললেন: "আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন যা আপনি আমার চেয়েও ভালো জানেন।" আবু বকর বললেন: "তা সত্ত্বেও বলুন।" আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বললেন: "আল্লাহর কসম, তিনি অনেকের ধারণার চেয়েও উত্তম।" অতঃপর তিনি উসমান ইবনে আফফানকে ডেকে বললেন: "আমাকে উমর সম্পর্কে বলুন।" তিনি বললেন: "আপনিই তাঁর সম্পর্কে আমাদের চেয়ে ভালো জানেন।" তিনি বললেন:

"তা সত্ত্বেও বলুন।" তিনি বললেন: "হে আল্লাহ, তাঁর সম্পর্কে আমার জ্ঞান হলো এই যে, তাঁর অভ্যন্তরীণ অবস্থা তাঁর বাহ্যিক অবস্থার চেয়েও উত্তম এবং আমাদের মধ্যে তাঁর মতো দ্বিতীয় কেউ নেই।" তিনি তাঁদের সাথে সাঈদ ইবনে যায়েদ, উসায়েদ ইবনে হুদাইর এবং মুহাজির ও আনসারদের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথেও পরামর্শ করেছিলেন।

وَالثَّانِي: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه عَهِدَ بِهَا إِلَى أَهْلِ الشُّورَى، فَقَبِلَتْ الْجَمَاعَةُ دُخُولَهُمْ فِيهَا، وَهُمْ أَعْيَانُ الْعَصْرِ اعْتِقَادًا لِصِحَّةِ الْعَهْدِ بِهَا، وَخَرَجَ بَاقِي الصَّحَابَةِ مِنْهَا، وَقَالَ عَلِيٌّ لِلْعَبَّاسِ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا- حِينَ عَاتَبَهُ عَلَى الدُّخُولِ فِي الشُّورَى: كَانَ أَمْرًا عَظِيمًا مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ لَمْ أَرَ لِنَفْسِي الْخُرُوجَ مِنْهُ، فَصَارَ الْعَهْدُ بِهَا إِجْمَاعًا فِي انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ، فَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْهِدَ رَأْيَهُ فِي الْأَحَقِّ بِهَا، وَالْأَقْوَمِ بِشُرُوطِهَا، فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِي وَاحِدٍ نَظَرَ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا جَازَ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لَهُ، وَبِتَفْوِيضِ الْعَهْدِ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَشِرْ فِيهِ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ، لَكِنِ اخْتَلَفُوا: هَلْ يَكُونُ ظُهُورُ الرِّضَا مِنْهُمْ شَرْطًا فِي انْعِقَادِ بَيْعَتِهِ أَوْ لَا؟ فَذَهَبَ بَعْضُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِلَى أَنَّ رِضَا أَهْلِ الِاخْتِيَارِ لِبَيْعَتِهِ شَرْطٌ فِي لُزُومِهَا لِلْأُمَّةِ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ، فَلَمْ تَلْزَمْهُمْ إِلَّا بِرِضَا أَهْلِ الِاخْتِيَارِ مِنْهُمْ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّ بَيْعَتَهُ مُنْعَقِدَةٌ وَأَنَّ الرِّضَا بِهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ1؛ لِأَنَّ بَيْعَةَ عُمَرَ رضي الله عنه لَمْ تَتَوَقَّفْ عَلَى رِضَا الصَّحَابَةِ؛ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ أَحَقُّ بِهَا، فَكَانَ اخْتِيَارُهُ فِيهَا أَمْضَى، وَقَوْلُهُ فِيهَا أَنْفَذَ؛ وَإِنْ كَانَ وَلِيُّ الْعَهْدِ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ انْفِرَادِهِ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ:

أَحَدُهَا: لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدٍ حَتَّى يُشَاوِرَ فِيهِ أَهْلَ الِاخْتِيَارِ فَيَرَوْنَهُ أَهْلًا لَهَا، فَيَصِحُّ مِنْهُ حِينَئِذٍ عَقْدُ الْبَيْعَةِ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ تَزْكِيَةٌ لَهُ تَجْرِي مَجْرَى الشَّهَادَةِ، وَتَقْلِيدُهُ عَلَى الْأُمَّةِ يَجْرِي مَجْرَى الْحُكْمِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ لِوَالِدٍ وَلَا لِوَلَدٍ وَلَا يَحْكُمَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتُّهْمَةِ الْعَائِدَةِ إِلَيْهِ بِمَا جُبِلَ مِنَ الْمَيْلِ إِلَيْهِ.
وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَقْدِهَا لِوَلَدٍ وَوَالِدٍ؛ لِأَنَّهُ أَمِيرُ الْأُمَّةِ نَافِذُ الْأَمْرِ لَهُمْ

---

1 قلت: وهذا الكلام من المصنّف مردود عليه؛ إذ إنَّ أبا بكر لم يعهد بالخلافة إلى عمر إلّا بعد مشاورات وموافقات من الصحابة كما قدَّمنا، كما أنَّ عمر حين حدَّد من حدَّد من الصحابة لاختيار الخليفة من بينهم، إنَّمَا اختار أولئك الذين لا يختلف عليهم اثنان من الصحابة على أنهم الأفضل والأصلح، بل كانوا هم أهل الحل والعقد والمشورة في حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وحياة أبي بكر وعمر من بعده.

وعليه: فإنَّ ما نراه أنَّ موافقة الأمة على تولية الخليفة لولي العهد أمر لا بُدَّ منه لتصحَّ ولاية العهد.

দ্বিতীয়ত: উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) খিলাফতের বিষয়টি পরামর্শ সভার (শুরা) সদস্যদের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন, ফলে সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এর বৈধতায় বিশ্বাস রেখে তাতে অন্তর্ভুক্ত হতে সম্মত হয়েছিলেন। অবশিষ্ট সাহাবীগণ এ থেকে সরে দাঁড়ান। আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) যখন পরামর্শ সভায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে আব্বাস (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর কাছে তিরস্কৃত হলেন, তখন তিনি বলেছিলেন: "এটি ইসলামের এমন এক মহান বিষয় ছিল যা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া আমি সংগত মনে করিনি।" ফলে এই মনোনয়ন (আহদ) ইমামত বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদ নির্ধারণে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে (ইজমা) পরিণত হয়। সুতরাং ইমাম যখন কাউকে উত্তরসূরি মনোনীত করতে চাইবেন, তখন তাঁর কর্তব্য হলো উক্ত পদের জন্য সবচেয়ে যোগ্য এবং এর শর্তাবলি পালনে সবচেয়ে সক্ষম ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। যখন তাঁর গবেষণায় নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম নিশ্চিত হবে, তখন তিনি তাঁকে পর্যবেক্ষণ করবেন। মনোনীত ব্যক্তি যদি তাঁর সন্তান বা পিতা

না হন, তবে তিনি একাই তাঁর জন্য আনুগত্যের শপথ (বাইআত) সম্পাদন করতে এবং খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবেন, যদিও তিনি নির্বাচক মণ্ডলীর (আহলে ইখতিয়ার) কারও সাথে পরামর্শ না করেন। তবে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে: নির্বাচক মণ্ডলীর সন্তুষ্টি প্রকাশ কি তাঁর বাইআত কার্যকর হওয়ার শর্ত, নাকি নয়? বসরার কোনো কোনো আলেমের মতে, উম্মতের ওপর এই বাইআত বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্য নির্বাচক মণ্ডলীর সন্তুষ্টি শর্ত; কারণ এটি তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি অধিকার, তাই তাদের নির্বাচক মণ্ডলীর সম্মতি ব্যতীত এটি তাদের ওপর অপরিহার্য হবে না।

সঠিক মত হলো, তাঁর এই মনোনয়ন কার্যকর এবং এক্ষেত্রে অন্যদের সন্তুষ্টি ধর্তব্য নয়; কারণ উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর খিলাফত প্রাপ্তি সাহাবীগণের সন্তুষ্টির ওপর স্থগিত ছিল না। এছাড়া ইমামই এ বিষয়ে সর্বাধিক যোগ্য, তাই এক্ষেত্রে তাঁর নির্বাচন অধিক কার্যকর এবং তাঁর সিদ্ধান্ত অধিক বাস্তবায়নযোগ্য। তবে যদি মনোনীত উত্তরসূরি ইমামের সন্তান বা পিতা হন, তবে তিনি একাকী তাঁর জন্য বাইআত সম্পন্ন করতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে তিনটি মতভেদ রয়েছে:

প্রথমত: পিতা বা সন্তানের জন্য একাকী বাইআতের চুক্তি করা বৈধ নয় যতক্ষণ না তিনি নির্বাচক মণ্ডলীর সাথে পরামর্শ করেন এবং তারা উক্ত ব্যক্তিকে এই পদের যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেন। এমতাবস্থায় ইমামের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য বাইআত করা সঠিক হবে; কারণ ইমামের এই পদক্ষেপটি ওই ব্যক্তির জন্য একটি চারিত্রিক প্রশংসা স্বরূপ যা সাক্ষ্য প্রদানের স্থলাভিষিক্ত, আর উম্মতের ওপর তাঁকে দায়িত্বশীল করা বিচারের স্থলাভিষিক্ত। অথচ স্বাভাবিক অনুরাগের কারণে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আসতে পারে বলে নিজের পিতা বা সন্তানের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া বা বিচার করা বৈধ নয়।

দ্বিতীয়ত: সন্তান বা পিতার জন্য একাকী বাইআতের চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ; কারণ তিনি উম্মতের নেতা এবং তাঁর আদেশ তাদের ওপর কার্যকর।

---

১. আমি বলছি: লেখকের এই বক্তব্যটি খণ্ডনযোগ্য; কারণ আবু বকর খিলাফতের দায়িত্ব উমরের ওপর অর্পণ করার আগে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেছিলেন এবং তাঁদের সম্মতি লাভ করেছিলেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তেমনিভাবে উমর যখন খিলাফতের জন্য সাহাবীগণের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কয়েকজনকে নির্বাচন করেছিলেন, তখন তিনি কেবল তাঁদেরই বেছে নিয়েছিলেন যাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতার বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে কোনো দ্বিমত ছিল না;

বরং তাঁরা আল্লাহর রাসুলের (তাঁর ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীকালে আবু বকর ও উমরের সময়কালেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরামর্শ প্রদানের মূল অধিকারী ছিলেন।
অতএব, আমাদের অভিমত হলো—পরবর্তী খলিফা বা উত্তরসূরি মনোনয়নের ক্ষেত্রে উম্মতের সম্মতি থাকা অপরিহার্য যেন তাঁর কর্তৃত্ব আইনত সিদ্ধ হয়।

(ص: 32)الأحكام السلطانية للماوردي

وَعَلَيْهِمْ فَغَلَبَ حُكْمُ الْمَنْصِبِ عَلَى حُكْمِ النَّسَبِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِلتُّهْمَةِ طَرِيقًا عَلَى أَمَانَتِهِ وَلَا سَبِيلًا إِلَى مُعَارَضَتِهِ وَصَارَ فِيهَا كَعَهْدِهِ بِهَا إِلَى غَيْرِ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ، وَهَلْ يَكُونُ رِضَا أَهْلِ الِاخْتِيَارِ بَعْدَ صِحَّةِ الْعَهْدِ مُعْتَبَرًا فِي لُزُومِهِ لِلْأُمَّةِ أَوْ لَا؟ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ.
وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لِوَالِدِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهَا لِوَلَدِهِ؛ لِأَنَّ الطَّبْعَ يَبْعَثُ عَلَى مُمَايَلَةِ الْوَلَدِ أَكْثَرُ مِمَّا يَبْعَثُ عَلَى مُمَايَلَةِ الْوَالِدِ، وَلِذَلِكَ كَانَ كُلُّ مَا يَقْتَنِيهِ فِي الْأَغْلَبِ مَذْخُورًا لِوَلَدِهِ دُونَ وَالِدِهِ؛ فَأَمَّا عَقْدُهَا لِأَخِيهِ وَمَنْ قَارَبَهُ مِنْ عَصَبَتِهِ وَمُنَاسِبِيهِ، فَكَعَقْدِهَا لِلْبُعَدَاءِ الْأَجَانِبِ فِي جَوَازِ تَفَرُّدِهِ بِهَا.

এবং তাঁদের ওপর; ফলে পদের মর্যাদা বংশীয় সম্পর্কের বিধানের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে। তিনি তাঁর আমানতদারিতার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সংশয়ের অবকাশ রাখেননি এবং তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতারও কোনো পথ রাখেননি। এক্ষেত্রে বিষয়টি নিজের সন্তান বা পিতা ব্যতীত অন্য কারো অনুকূলে তাঁর মনোনয়নের মতোই পরিগণিত হয়েছে। আর এই নিয়োগ বা উইল শুদ্ধ হওয়ার পর উম্মতের ওপর তা বাধ্যতামূলক হওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচনকারী ব্যক্তিবর্গের (আহলুল ইখতিয়ার) সম্মতি কি বিবেচ্য হবে কি না? এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আমাদের বর্ণিত দুটি অভিমত রয়েছে।

তৃতীয় মতটি হলো: তিনি তাঁর পিতার অনুকূলে এককভাবে বায়আতের চুক্তি সম্পন্ন করতে পারেন, কিন্তু তাঁর সন্তানের অনুকূলে এককভাবে তা করা বৈধ নয়; কারণ মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি পিতার চেয়ে সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্বে অধিক উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণেই মানুষ যা কিছু অর্জন করে, তার অধিকাংশ সাধারণত পিতার পরিবর্তে সন্তানের জন্যই সঞ্চিত থাকে। আর তাঁর ভাই কিংবা তাঁর নিকটাত্মীয় ও আসাবাগণের অনুকূলে বায়আতের চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি এককভাবে সম্পন্ন করার বৈধতার ক্ষেত্রে তা দূরবর্তী অনাত্মীয়দের ন্যায় গণ্য হবে।

(ص: 32)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده"

وَإِذَا عَهِدَ الْإِمَامُ بِالْخِلَافَةِ إِلَى مَنْ يَصِحُّ الْعَهْدُ إِلَيْهِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ، كَانَ الْعَهْدُ مَوْقُوفًا عَلَى قَبُولِ الْمُوَلَّى1.

وَاخْتُلِفَ فِي زَمَانِ قَبُولِهِ فَقِيلَ: بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَلِّي فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ نَظَرُ الْمُوَلَّى؛ وَقِيلَ -وَهُوَ الْأَصَحُّ: إِنَّهُ مَا بَيْنَ عَهْدِ الْمُوَلِّي وَمَوْتِهِ لِتَنْتَقِلَ عَنْهُ الْإِمَامَةُ إِلَى الْمُوَلَّى مُسْتَقِرَّةً بِالْقَبُولِ الْمُتَقَدِّمِ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ الْمُوَلَّى عَزْلُ مَنْ عَهِدَ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ وَإِنْ جَازَ لَهُ عَزْلُ مَنِ اسْتَنَابَهُ مِنْ سَائِرِ خُلَفَائِهِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَخْلِفٌ لَهُمْ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، فَجَازَ لَهُ عَزْلُهُمْ، وَمُسْتَخْلِفٌ لِوَلِيِّ عَهْدِهِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْلُهُ، كَمَا لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الِاخْتِيَارِ عَزْلُ مَنْ بَايَعُوهُ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ، فَلَوْ عَهِدَ الْإِمَامُ بَعْدَ عَزْلِ الْأَوَّلِ إِلَى ثَانٍ كَانَ عَهْدُ الثَّانِي بَاطِلًا وَالْأَوَّلُ عَلَى بَيْعَتِهِ، فَإِنْ خَلَعَ الْأَوَّلُ نَفْسَهُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعَةُ الثَّانِي حَتَّى يَبْتَدِئَ.

وَإِذَا اسْتَعْفَى وَلِيُّ الْعَهْدِ لَمْ يَبْطُلْ عَهْدُهُ بِالِاسْتِعْفَاءِ حَتَّى يُعْفَى لِلُزُومِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُوَلَّى ثُمَّ نُظِرَ، فَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ جَازَ اسْتِعْفَاؤُهُ وَخَرَجَ مِنَ الْعَهْدِ بِإِجْمَاعِهِمَا عَلَى الِاسْتِعْفَاءِ

وَالْإِعْفَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ لَمْ يَجُزْ اسْتِعْفَاؤُهُ وَلَا إِعْفَاؤُهُ، وَكَانَ الْعَهْدُ عَلَى لُزُومِهِ مِنْ جِهَتَيِ الْمُوَلَّى

---

1 قلت: هكذا وبكل غرابة جعل المصنّف الأمر محصورًا في عهد الإمام وقبول المولَّى، وكأنَّ الأمة لا دخل لها في الأمر!!.

পরিচ্ছেদ: খলিফা কর্তৃক তাঁর পরবর্তী ব্যক্তির নিকট খেলাফতের মনোনয়ন প্রদান প্রসঙ্গে
যখন ইমাম এমন কোনো ব্যক্তির নিকট খেলাফতের মনোনয়ন প্রদান করেন যার ক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে এই মনোনয়ন প্রদান বৈধ, তখন সেই মনোনয়ন মনোনীত ব্যক্তির গ্রহণের ওপর স্থগিত থাকে।১

এই গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন: এটি হবে মনোনয়ন প্রদানকারীর মৃত্যুর পর সেই সময়ে যখন মনোনীত ব্যক্তির দায়িত্বভার গ্রহণ করা বৈধ হয়। আবার কেউ বলেছেন—যা অধিকতর বিশুদ্ধ: এটি মনোনয়ন প্রদান এবং তাঁর মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে হতে হবে, যাতে পূর্ববর্তী সম্মতির মাধ্যমে খেলাফতের দায়িত্বটি মনোনীত ব্যক্তির কাছে সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে স্থানান্তরিত হতে পারে। আর মনোনয়ন প্রদানকারী ইমামের জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে অপসারণ করার অধিকার নেই যতক্ষণ না তার যোগ্যতায় কোনো পরিবর্তন (অযোগ্যতা) ঘটে, যদিও ইমামের জন্য তাঁর অন্যান্য সাধারণ প্রতিনিধিদের অপসারণ করা বৈধ। কারণ তিনি তাঁদেরকে নিজের ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতে স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তাই তাঁদেরকে অপসারণ করার অধিকার তাঁর রয়েছে। কিন্তু উত্তরসূরিকে তিনি মুসলিম উম্মাহর হকের ভিত্তিতে স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তাই তাকে অপসারণ করার অধিকার তাঁর নেই; ঠিক যেমন নির্বাচক মণ্ডলীর (আহলুল ইখতিয়ার) জন্য তাঁদের বায়আতকৃত ব্যক্তিকে অপসারণ করার অধিকার নেই যদি তার যোগ্যতায় কোনো পরিবর্তন না আসে। এমতাবস্থায় যদি ইমাম প্রথম ব্যক্তিকে অপসারণ করার পর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেন, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির মনোনয়ন বাতিল হবে এবং প্রথম ব্যক্তিই তাঁর বায়আতের ওপর বহাল থাকবেন। আর প্রথম ব্যক্তি যদি নিজে পদত্যাগ করেন, তবে পুনরায় নতুন করে প্রক্রিয়া শুরু না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তির বায়আত শুদ্ধ হবে না।

যদি মনোনীত উত্তরসূরি অব্যাহতি প্রার্থনা করেন, তবে কেবল প্রার্থনার মাধ্যমেই তাঁর মনোনয়ন বাতিল হবে না যতক্ষণ না তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়; কারণ নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে এটি তাঁর জন্য আবশ্যক হয়ে আছে। এরপর পরিস্থিতি বিবেচনা করা হবে; যদি যোগ্য বিকল্প কাউকে পাওয়া যায়, তবে তাঁর অব্যাহতি প্রার্থনা গ্রহণ করা জায়েজ এবং উভয়ের (নিয়োগকারী ও মনোনীত ব্যক্তি) সম্মতিতে তিনি দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু যদি বিকল্প কাউকে পাওয়া না যায়, তবে তাঁর অব্যাহতি প্রার্থনা বা তাঁকে অব্যাহতি প্রদান—কোনোটিই জায়েজ হবে না এবং মনোনয়নটি নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে অপরিহার্য হিসেবে বহাল থাকবে।

---

১. আমি বলছি: অত্যন্ত আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, লেখক বিষয়টি কেবল ইমামের মনোনয়ন এবং মনোনীত ব্যক্তির গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, যেন এ ব্যাপারে উম্মাহর কোনো সংশ্লিষ্টতা বা ভূমিকা নেই!!

(ص: 33)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالْمُوَلِّي؛ وَيُعْتَبَرُ شُرُوطُ الْإِمَامَةِ فِي الْمُوَلَّى مِنْ وَقْتِ الْعَهْدِ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ فَاسِقًا وَقْتَ الْعَهْدِ وَبَالِغًا عَدْلًا عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَلِّي لَمْ تَصِحَّ خِلَافَتُهُ حَتَّى يَسْتَأْنِفَ أَهْلُ الِاخْتِيَارِ بَيْعَتَهُ.

وَإِذَا عَهِدَ الْإِمَامُ إِلَى غَائِبٍ هُوَ مَجْهُولُ الْحَيَاةِ لَمْ يَصِحَّ عَهْدُهُ؛ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ الْحَيَاةِ وَكَانَ مَوْقُوفًا عَلَى قُدُومِهِ؛ فَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَخْلِفُ وَوَلِيُّ الْعَهْدِ عَلَى غَيْبَتِهِ اسْتَقْدَمَهُ أَهْلُ الِاخْتِيَارِ، فَإِنْ بَعُدَتْ وَاسْتَضَرَّ الْمُسْلِمُونَ بِتَأْخِيرِ النَّظَرِ فِي أُمُورِهِمْ اسْتَنَابَ أَهْلُ الِاخْتِيَارِ نَائِبًا عَنْهُ يُبَايِعُونَهُ بِالنِّيَابَةِ دُونَ الْخِلَافَةِ، فَإِذَا قَدِمَ الْخَلِيفَةُ الْغَائِبُ انْعَزَلَ الْمُسْتَخْلَفُ النَّائِبُ، وَكَانَ نَظَرُهُ قَبْلَ قُدُومِ الْخَلِيفَةِ مَاضِيًا، وَبَعْدَ قُدُومِهِ مَرْدُودًا، وَلَوْ أَرَادَ وَلِيُّ الْعَهْدِ قَبْلَ مَوْتِ الْخَلِيفَةِ أَنْ يَرُدَّ مَا إِلَيْهِ مِنْ وِلَايَةِ الْعَهْدِ إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ؛

لِأَنَّ الْخِلَافَةَ لَا تَسْتَقِرُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُسْتَخْلِفِ؛ وَهَكَذَا لَوْ قَالَ: جَعَلْتُهُ وَلِيَّ عَهْدِي إِذَا أَفْضَتْ الْخِلَافَةُ إِلَيَّ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَالِ لَيْسَ خَلِيفَةً، فَلَمْ يَصِحَّ عَهْدُهُ بِالْخِلَافَةِ.

وَإِذَا خَلَعَ الْخَلِيفَةُ نَفْسَهُ انْتَقَلَتْ إِلَى وَلِيِّ عَهْدِهِ، وَقَامَ خَلْعُهُ مَقَامَ مَوْتِهِ، وَلَوْ عَهِدَ الْخَلِيفَةُ إِلَى اثْنَيْنِ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ جَازَ، وَاخْتَارَ أَهْلُ الِاخْتِيَارِ أَحَدَهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِ كَأَهْلِ الشُّورَى، فَإِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه جَعَلَهَا فِي سِتَّةٍ.

حَكَى ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَجَدْتُ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ مَكْرُوبًا، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي هَذَا الْأَمْرِ؟ أَقُومُ فِيهِ وَأَقْعُدُ؟ فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَهَا لَأَهْلٌ، وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ فِيهِ دُعَابَةٌ، وَإِنِّي لَأُرَاهُ لَوْ تَوَلَّى أَمْرَكُمْ لَحَمَلَكُمْ عَلَى طَرِيقَةٍ مِنَ الْحَقِّ تَعْرِفُونَهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لَحَمَلَ ابْنُ أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، ثُمَّ لَمْ تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ الْعَرَبُ حَتَّى تَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَاَللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَفَعَلَ، وَلَوْ فَعَلَ لَفَعَلُوا؛ قَالَ: فَقُلْتُ: فَطَلْحَةُ، قَالَ: إِنَّهُ لَزَهْوٌ، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُوَلِّيَهُ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مَعَ مَا يَعْلَمُ مِنْ زَهْوِهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَالزُّبَيْرُ، قَالَ: إِنَّهُ لَبَطَلٌ وَلَكِنَّهُ يَسْأَلُ عَنِ الصَّاعِ وَالْمُدِّ بِالْبَقِيعِ بِالسُّوقِ، أَفَذَاكَ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّهُ لَصَاحِبُ مَقْتَبٍ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ، فَأَمَّا وَلِيُّ أَمْرٍ فَلَا، قَالَ: فَقُلْتُ: فَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ ذَكَرْتَ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ، إِنَّهُ وَاَللَّهِ لَا يَصْلُحُ لِهَذَا الْأَمْرِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا الْقَوِيُّ فِي غَيْرِ

উত্তরাধিকার প্রদানকারী; এবং যাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে ইমামতের (নেতৃত্বের) শর্তাবলী অঙ্গীকার প্রদানের সময় থেকেই বিদ্যমান থাকা জরুরি। যদি অঙ্গীকার প্রদানের সময় সে অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাপাচারী (ফাসিক) থাকে এবং উত্তরাধিকার প্রদানকারীর মৃত্যুর সময় প্রাপ্তবয়স্ক ও ন্যায়পরায়ণ (আদিল) হয়ে যায়, তবুও তার খিলাফত বৈধ হবে না যতক্ষণ না আহলুল ইখতিয়ার (নির্বাচকমণ্ডলী) পুনরায় তার আনুগত্যের বয়াত গ্রহণ করেন।

যদি ইমাম এমন কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির অনুকূলে উত্তরাধিকারের দায়িত্ব অর্পণ করেন যার জীবিত থাকার বিষয়টি অজ্ঞাত, তবে তার সেই অঙ্গীকার বৈধ হবে না। আর যদি তার জীবিত থাকা নিশ্চিত হয়, তবে বিষয়টি তার আগমনের ওপর স্থগিত থাকবে। এমতাবস্থায় যদি স্থলাভিষিক্তকারী মারা যান এবং উত্তরাধিকারী তখনও অনুপস্থিত থাকেন, তবে আহলুল ইখতিয়ার তাকে উপস্থিত করার ব্যবস্থা করবেন। যদি তার অবস্থান অনেক দূরে হয় এবং তার জন্য প্রতীক্ষা করার ফলে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি পরিচালনায় বিলম্ব ঘটে ও ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হয়, তবে আহলুল ইখতিয়ার তার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন এবং তারা খিলাফতের পরিবর্তে সেই প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতেই তার বয়াত গ্রহণ করবেন। যখন অনুপস্থিত খলিফা উপস্থিত হবেন, তখন সেই স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি অপসারিত হয়ে যাবেন। খলিফার আগমনের পূর্বে সেই প্রতিনিধির সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর বলে গণ্য হবে এবং আগমনের পর তা রদ হয়ে যাবে। যদি উত্তরাধিকারী ব্যক্তি খলিফার মৃত্যুর পূর্বেই তার ওপর অর্পিত উত্তরাধিকারের দায়িত্ব অন্য কাউকে হস্তান্তর করতে চায়, তবে তা বৈধ হবে না; কারণ স্থলাভিষিক্তকারীর মৃত্যুর আগে খিলাফত তার জন্য সুনিশ্চিত হয় না। একইভাবে সে যদি বলে: 'খিলাফত আমার ওপর অর্পিত হওয়ার পর আমি অমুককে আমার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলাম', তবে তাও বৈধ হবে না; কারণ বর্তমানে সে খলিফা নয়, তাই তার খিলাফতের অঙ্গীকার প্রদান করা সঠিক হবে না।

আর খলিফা যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন, তবে খিলাফত তার মনোনীত উত্তরাধিকারীর নিকট স্থানান্তরিত হবে এবং তার পদত্যাগ মৃত্যুর স্থলাভিষিক্ত গণ্য হবে। যদি খলিফা দুই ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন এবং একজনকে অন্যজনের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান না করেন, তবে তাও বৈধ হবে। খলিফার মৃত্যুর পর আহলুল ইখতিয়ার মজলিসে শুরার সদস্যদের ন্যায় তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করবেন; কারণ উমর (রা.) খিলাফতের বিষয়টি ছয়জন ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করেছিলেন।

ইবনে ইসহাক যুহরী থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: একদিন আমি উমর (রা.)-কে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিমর্ষ অবস্থায় পেলাম। তিনি বললেন: 'আমি জানি না এই বিষয়ের (খিলাফত) ক্ষেত্রে আমার কী করা উচিত? আমি কি এ বিষয়ে অগ্রসর হব নাকি বিরত থাকব?' আমি বললাম: 'আলীর ব্যাপারে আপনার চিন্তা কী?' তিনি বললেন: 'নিশ্চয়ই সে এর যোগ্য, কিন্তু তার মধ্যে কিছুটা রসিকতা রয়েছে। আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি যে, সে যদি তোমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তবে সে তোমাদেরকে সত্যের এমন এক পথে

পরিচালিত করবে যা তোমরা চেনো।' ইবনে আব্বাস বলেন, আমি বললাম: 'তাহলে উসমানের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?' তিনি বললেন: 'যদি আমি তাকে দায়িত্ব দেই, তবে ইবনে আবি মুআইত জনগণের ঘাড়ে চড়ে বসবে, ফলে আরবরা তার গর্দান না কাটা পর্যন্ত তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আল্লাহর কসম, আমি যদি তাকে নিয়োগ করি তবে সে এমনই করবে, আর সে এমন করলে লোকেরাও তাই করবে।' ইবনে আব্বাস বলেন, আমি বললাম: 'তাহলে তালহার কথা ভাবুন।' তিনি বললেন: 'সে তো অহংকারী; আল্লাহ তার অহংকার সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাকে মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের শাসক মনোনীত করবেন না।' আমি বললাম: 'তাহলে জুবায়ের?' তিনি বললেন: 'সে তো একজন বীর, কিন্তু সে মদীনার বাজারে সামান্য পরিমাণ কেনাবেচার হিসাব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এমন ব্যক্তি কি মুসলমানদের বিষয়াদি পরিচালনা করবে?' আমি বললাম: 'সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস?' তিনি বললেন: 'তার অবস্থান তেমন নয়; সে তো কেবল রণক্ষেত্রের অশ্বারোহী যোদ্ধা। যুদ্ধের জন্য সে উপযুক্ত, কিন্তু শাসক হিসেবে নয়।' আমি বললাম: 'তাহলে আবদুর রহমান বিন আউফ?' তিনি বললেন: 'তুমি এক উত্তম ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছ, কিন্তু সে তো দুর্বল। আল্লাহর কসম হে ইবনে আব্বাস, এই পদের জন্য কেবল সেই ব্যক্তিই উপযুক্ত যে কঠোরতা ছাড়াই শক্তিশালী...'

عُنْفٍ، اللَّيِّنُ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ، وَالْمُمْسِكُ مِنْ غَيْرِ بُخْلٍ، وَالْجَوَادُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا جَرَحَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ وَآيِسَ الطَّبِيبَ مِنْ نَفْسِهِ وَقَالُوا لَهُ: اعْهَدْ، جَعَلَهَا شُورَى فِي سِتَّةٍ وَقَالَ: هَذَا الْأَمْرُ إِلَى عَلِيٍّ وَبِإِزَائِهِ الزُّبَيْرُ، وَإِلَى عُثْمَانَ وَبِإِزَائِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَإِلَى طَلْحَةَ وَبِإِزَائِهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَلِمَا جَازَ الشُّورَى بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ، وَقَالَ طَلْحَةُ: جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ، وَقَالَ سَعْدٌ: جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَصَارَتْ الشُّورَى بَعْدَ السِّتَّةِ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَخَرَجَ مِنْهَا

أُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمْ يَبْرَأُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ وَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ شَهِيدٌ؛ لِيَحْرِصَ عَلَى صَلَاحِ الْأُمَّةِ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَأُخْرِجُ نَفْسِي مِنْهُ وَاللَّهُ عَلَيَّ شَهِيدٌ، عَلَى أَنِّي لَا آلُوكُمْ نُصْحًا، فَقَالَا: نَعَمْ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ فَصَارَتِ الشُّورَى بَعْدَ السِّتَّةِ فِي ثَلَاثَةٍ، ثُمَّ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فِي اثْنَيْنِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، ثُمَّ مَضَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَسْتَعْلِمَ مِنَ النَّاسِ مَا عِنْدَهُمْ، فَلَمَّا أَجَنَّهُمُ اللَّيْلُ اسْتَدْعَى الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَأَشْرَكَهُ مَعَهُ، ثُمَّ حَضَرَ فَأَخَذَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعُهُودَ أَيُّهُمَا بُويِعَ لَيَعْمَلَنَّ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، وَلَئِنْ بَايَعَ لِغَيْرِهِ لَيَسْمَعَنَّ وَلَيُطِيعَنَّ، ثُمَّ بَايَعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ.

فَكَانَتْ الشُّورَى الَّتِي دَخَلَ أَهْلُ الْإِمَامَةِ فِيهَا وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهَا أَصْلًا فِي انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ بِالْعَهْدِ، وَفِي انْعِقَادِ الْبَيْعَةِ بِعَدَدٍ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْإِمَامَةُ لِأَحَدِهِمْ بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ1، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تُجْعَلَ شُورَى فِي اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا كَانُوا عَدَدًا مَحْصُورًا.

وَيُسْتَفَادُ مِنْهَا أَنْ لَا تُجْعَلَ الْإِمَامَةُ بَعْدَهُ فِي غَيْرِهِمْ، فَإِذَا تَعَيَّنَتْ بِالِاخْتِيَارِ فِي أَحَدِهِمْ جَازَ لِمَنْ أَفْضَتْ إِلَيْهِ الْإِمَامَةُ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، وَلَيْسَ لِأَهْلِ الِاخْتِيَارِ إِذَا جَعَلَهَا الْإِمَامُ شُورَى فِي عَدَدٍ أَنْ يَخْتَارُوا أَحَدَهُمْ فِي حَيَاةِ الْمُسْتَخْلِفِ الْعَاهِدِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي تَقْدِيمِ

---

1 "أهل الحل والعقد": مصطلح جديد استحدثه المفكرون المسلمون، ويقصَد به: الخبراء في شئون المجتمع وأحواله الاجتماعية والسياسية، يرجع إليهم الناس في المصالح العامة، ويسمعون لهم بسبب ما توفَّر لهم من خبرة وحنكة ودراية في هذا المجال، وعلى عاتق هؤلاء مهمَّة اختيار رئيس الدولة الإسلامية من بين مَنْ تتوافر فيهم الشروط، ثم تقع على عاتقهم مهمة مراقبة ذلك الرئيس ومعاونته في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية التي تعود على أفراد المجتمع بالنفع مع النصح له

وتوجيهه. "انظر: نظام الدولة في الإسلام، للدكتور: عبد الله جمال الدين: ص117".

কঠোরতা ব্যতীত [দৃঢ়তা], দুর্বলতা ব্যতিরেকে কোমলতা, কৃপণতা ব্যতিরেকে মিতব্যয়িতা এবং অপব্যয় ব্যতিরেকে দানশীলতা।

ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন: যখন আবু লুলু উমর (রা.)-কে আহত করল এবং চিকিৎসক তার জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন, তখন লোকেরা তাকে বললেন: 'আপনি উত্তরসূরি মনোনীত করুন'। তখন তিনি বিষয়টি ছয়জনের একটি পরামর্শ সভার (শুরা) ওপর ন্যস্ত করলেন এবং বললেন: 'এই বিষয়টি আলীর দিকে এবং তার বিপরীতে জুবাইর, উসমানের দিকে এবং তার বিপরীতে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, এবং তালহার দিকে এবং তার বিপরীতে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের ওপর ন্যস্ত।' উমর (রা.)-এর মৃত্যুর পর যখন পরামর্শ সভা সম্পন্ন হলো, তখন আব্দুর রহমান বললেন: 'আপনারা বিষয়টি আপনাদের তিনজনের ওপর ন্যস্ত করুন।' তখন জুবাইর বললেন: 'আমি আমার বিষয়টি আলীর ওপর ন্যস্ত করলাম।' তালহা বললেন: 'আমি আমার বিষয়টি উসমানের ওপর ন্যস্ত করলাম।' সাদ বললেন: 'আমি আমার বিষয়টি আব্দুর রহমানের ওপর ন্যস্ত করলাম।' ফলে ছয়জনের পরামর্শ সভা এই তিনজনে পর্যবসিত হলো এবং বাকি তিনজন তা থেকে বেরিয়ে গেলেন। এরপর আব্দুর রহমান বললেন: 'আপনাদের মধ্যে কে এই বিষয় থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করবেন এবং আমরা বিষয়টি তার ওপর ন্যস্ত করব—আল্লাহ তার ওপর সাক্ষী থাকবেন—যাতে তিনি উম্মতের কল্যাণের জন্য সচেষ্ট হতে পারেন?' কেউ তাকে উত্তর দিল না। তখন আব্দুর রহমান বললেন: 'আপনারা কি বিষয়টি আমার ওপর ন্যস্ত করবেন এবং আমি নিজেকে এ থেকে প্রত্যাহার করব—আল্লাহ আমার ওপর সাক্ষী থাকবেন—এই শর্তে যে আমি আপনাদের উপদেশে কোনো ত্রুটি করব না?' তারা উভয়ে বললেন: 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন: 'আমি তাই করলাম।' ফলে ছয়জনের পরামর্শ সভা প্রথমে তিনজনে এবং পরে আলী ও উসমান—এই দুইজনে এসে উপনীত হলো। এরপর আব্দুর রহমান মানুষের অভিমত জানতে বেরিয়ে পড়লেন। রাত গভীর হলে তিনি মিসওয়ার বিন মাখরামাকে ডেকে তাকে নিজের সঙ্গে নিলেন। এরপর তিনি উপস্থিত হয়ে তাদের উভয়ের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তাদের মধ্যে যাকে বায়আত করা হবে, তিনি যেন আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করেন; আর যদি

অন্যজনকে বায়আত করা হয়, তবে তিনি যেন তার কথা শোনেন ও আনুগত্য করেন। অতঃপর তিনি উসমান ইবনে আফফানের হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন।

এই পরামর্শ সভা (শুরা), যাতে ইমামতের যোগ্য ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং যার ওপর ঐক্যমত (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা মনোনয়ন বা অঙ্গীকারের (আহদ) মাধ্যমে ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার এবং একদল নির্বাচকের মাধ্যমে বায়আত সম্পন্ন হওয়ার মূল নীতিতে পরিণত হয়েছে, যেখানে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (নীতিনির্ধারক)-দের নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো একজনের ইমামত নির্দিষ্ট করা হয়। সুতরাং, এটি দুই বা ততোধিক নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে শুরা বা পরামর্শের জন্য নির্ধারিত হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

এখান থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, তার (ইমামের) পরবর্তী ইমামত যেন তাদের বাইরে অন্য কারো মধ্যে রাখা না হয়। যখন নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের একজনের মধ্যে ইমামত নির্দিষ্ট হয়ে যাবে, তখন যার কাছে ইমামত ন্যস্ত হয়েছে তার জন্য জায়েজ হবে যে তিনি তাদের বাইরে অন্যদের কাছেও ইমামতের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবেন। কিন্তু ইমাম যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির পরামর্শের ওপর বিষয়টি ন্যস্ত করেন, তবে নির্বাচক মণ্ডলীর জন্য জায়েজ নেই যে তারা উত্তরসূরি মনোনীতকারী বা অঙ্গীকার প্রদানকারী ব্যক্তির জীবদ্দশায় কাউকে নির্বাচন করবেন, যদি না তিনি তাদের অগ্রিম নির্বাচনের অনুমতি প্রদান করেন।

---

১. 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ': এটি মুসলিম চিন্তাবিদদের দ্বারা প্রবর্তিত একটি আধুনিক পরিভাষা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সমাজের বিষয়াবলী এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ মানুষ যাদের শরণাপন্ন হয় এবং তাদের অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ও এই ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার কারণে তাদের কথা মেনে নেয়। যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব এদের ওপর ন্যস্ত থাকে। এরপর সেই প্রধানকে পর্যবেক্ষণ করা এবং সমাজের সদস্যদের জন্য কল্যাণকর এমন রাজনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকে সহযোগিতা করা এবং তাকে নসিহত ও দিকনির্দেশনা প্রদান করাও তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। (দ্রষ্টব্য: নিজামুদ দাওলাহ ফিল ইসলাম, ড. আবদুল্লাহ জামালুদ্দিন: পৃষ্ঠা ১১৭)।

الِاخْتِيَارِ فِي حَيَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِمَامَةِ أَحَقُّ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُشَارِكَ فِيهَا، فَإِنْ خَافُوا انْتِشَارَ الْأَمْرِ بَعْدَ مَوْتِهِ اسْتَأْذَنُوهُ وَاخْتَارُوا إِنْ أَذِنَ لَهُمْ، فَإِنْ صَارَ إِلَى حَالِ إِيَاسٍ نُظِرَ، فَإِنْ زَالَ عَنْهُ أَمْرُهُ وَغَرَبَ عَنْهُ رَأْيُهُ، فَهِيَ كَحَالِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي جَوَازِ الِاخْتِيَارِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى تَمْيِيزِهِ وَصِحَّةِ رَأْيِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الِاخْتِيَارُ إِلَّا عَنْ إِذْنِهِ.

حَكَى ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه لَمَّا دَخَلَ مَنْزِلَهُ مَجْرُوحًا سَمِعَ هَدَّةً فَقَالَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوا: يُرِيدُونَ الدُّخُولَ عَلَيْكَ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَقَالُوا: اعْهَدْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا عُثْمَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ يُحِبُّ الْمَالَ وَالْجَنَّةَ، فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ سَمِعَ لَهُمْ هَدَّةً فَقَالَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوا: يُرِيدُونَ الدُّخُولَ عَلَيْكَ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَقَالُوا: اسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: إِذَنْ يَحْمِلُكُمْ عَلَى طَرِيقَةٍ هِيَ الْحَقُّ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ وَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ، وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَمَيِّتًا؟

وَيَجُوزُ لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يَنُصَّ عَلَى أَهْلِ الِاخْتِيَارِ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنُصَّ عَلَى أَهْلِ الْعَهْدِ، فَلَا يَصِحُّ إِلَّا اخْتِيَارُ مَنْ نَصَّ عَلَيْهِ، كَمَا لَا يَصِحُّ إِلَّا تَقْلِيدُ مَنْ عَهِدَ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ حُقُوقِ خِلَافَتِهِ.

তাঁর জীবদ্দশায় (পরবর্তী খলিফা) নির্বাচন করা বৈধ নয়; কারণ তিনিই ইমামতের অধিক হকদার, ফলে এতে অন্য কারো অংশীদার হওয়া জায়েজ নয়। তবে তাঁর মৃত্যুর পর যদি বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তাঁরা তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করবেন এবং তিনি অনুমতি দিলে তাঁরা নির্বাচন সম্পন্ন করবেন। আর যদি তিনি নিরাশাজনক অবস্থায় (মুমূর্ষু অবস্থায়) উপনীত হন, তবে লক্ষ্য করতে হবে—যদি তাঁর কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বিচারবুদ্ধি লোপ পায়, তবে নির্বাচনের বৈধতার ক্ষেত্রে এটি তাঁর মৃত্যুপরবর্তী অবস্থার ন্যায় গণ্য হবে। আর যদি তাঁর বিচারবুদ্ধি ও মত প্রদানের ক্ষমতা সঠিক থাকে, তবে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁদের জন্য নির্বাচন করা বৈধ হবে না।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন আহত অবস্থায় তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি মানুষের উচ্চশব্দ শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "মানুষের কী হয়েছে?" তাঁরা বললেন: "তাঁরা আপনার নিকট প্রবেশ করতে চায়।" তিনি তাঁদের অনুমতি দিলেন। তাঁরা বললেন: "হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি অসিয়ত করুন এবং উসমানকে আমাদের ওপর স্থলাভিষিক্ত করুন।" তিনি বললেন: "সে সম্পদ ও জান্নাত উভয়কেই ভালোবাসে।" অতঃপর তাঁরা তাঁর নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেন। এরপর তিনি পুনরায় মানুষের কোলাহল শুনতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: "মানুষের কী হয়েছে?" তাঁরা বললেন: "তাঁরা আপনার নিকট প্রবেশ করতে চায়।" তিনি তাঁদের অনুমতি দিলেন। তাঁরা বললেন: "আলী ইবনে আবি তালিবকে আমাদের ওপর স্থলাভিষিক্ত করুন।" তিনি বললেন: "তবে তো তিনি তোমাদেরকে এমন এক পথে পরিচালিত করবেন যা চরম সত্য।" আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন: "তখন আমি তাঁর গায়ে হেলান দিয়ে বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! তবে তাঁকে নিযুক্ত করতে আপনাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? তিনি বললেন: হে বৎস! আমি কি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় এর দায়িত্বভার বহন করব?"
খলিফার জন্য যেমন পরবর্তী খলিফা মনোনীত করা বৈধ, তেমনি নির্বাচক মণ্ডলী (আহলে ইখতিয়ার) নির্ধারণ করে দেওয়াও বৈধ। সুতরাং তিনি যাদের নির্দিষ্ট করে দেবেন, তাদের নির্বাচন ব্যতীত অন্য কারো নির্বাচন সহিহ হবে না; ঠিক যেমন তিনি যাকে মনোনীত করবেন তাঁর নিয়োগ ব্যতীত অন্য কারো নিয়োগ সহিহ হয় না। কারণ এ উভয়টিই তাঁর খিলাফতের অধিকারভুক্ত।

فصل: "في تعدّي عهد الخليفة إلى من بعده"

وَلَوْ عَهِدَ الْخَلِيفَةُ إلَى اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَرَتَّبَ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ، فَقَالَ الْخَلِيفَةُ: بَعْدِي فُلَانٌ، فَإِنْ مَاتَ فَالْخَلِيفَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ فُلَانٌ، فَإِنْ مَاتَ فَالْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ فُلَانٌ جَازَ وَكَانَتْ الْخِلَافَةُ مُتَنَقِّلَةً إلَى الثَّلَاثَةِ عَلَى مَا رَتَّبَهَا، فَقَدْ اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم عَلَى جَيْشِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَقَالَ: "فَإِنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ أُصِيبَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَإِنْ أُصِيبَ فَلْيَرْتَضِ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا" فَتَقَدَّمَ زَيْدٌ فَقُتِلَ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ وَتَقَدَّمَ فَقُتِلَ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَتَقَدَّمَ فَقُتِلَ، فَاخْتَارَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ"1.

وَإِذْ فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ فِي الْإِمَارَةِ جَازَ مِثْلُهُ فِي الْخِلَافَةِ، فَإِنْ قِيلَ: هِيَ عَقْدُ وِلَايَةٍ عَلَى صِفَةٍ وَشَرْطٍ وَالْوِلَايَاتُ لَا يَقِفُ عَقْدُهَا عَلَى الشُّرُوطِ وَالصِّفَاتِ، قِيلَ: هَذَا مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَتَّسِعُ حُكْمُهَا عَلَى أَحْكَامِ الْعُقُودِ الْخَاصَّةِ، فَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ فِي الدَّوْلَتَيْنِ مَنْ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ، هَذَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَهِدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثُمَّ بَعْدَهُ إِلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ2.

وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ سُلَيْمَانُ حُجَّةً، فَإِقْرَارُ مَنْ عَاصَرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ وَمَنْ لَا يَخَافُونَ فِي الْحَقِّ

1صحيح: رواه أحمد "22045"، وصحَّحه الشيخ الألباني في تخريج أحاديث فقه السيرة لشيخنا الغزالي، ص 365.

2 قلت: من الواضح أنَّ الإمام الماوردي لا يعير أيَّ اهتمام أو دور للبيعة العامَّة التي كانت تتمّ للخلفاء، وكأنَّها لا قيمة لها، أو أنها مجرَّد تحصيل حاصل، وهذا خطأ كبير؛ فعمر بن عبد العزيز -مثلًا- وقد استشهد المصنِّف بأن سليمان بن عبد الملك قد عهد إليه بالأمر من بعده، لم يعترف بهذه الولاية إلّا بعد مبايعة الأمة، يقول السيوطي: ثم مات سليمان، وفتح الكتاب، فإذا فيه: العهد لعمر ابن عبد العزيز، فتغيَّرت وجوه بني عبد الملك، فلمَّا سمعوا: "وبعده يزيد بن عبد الملك" تراجعوا، فأتوا عمر فسلَّموا عليه بالخلافة، فعقر به، فلم يستطع النهوض حتى أخذوا بضبعيه، فدنوا به إلى المنبر وأصعدوه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني لست بفارضٍ ولكني منفذ، ولست بمبتدع، ولكني متَّبِع، وإنَّ من حولكم

من الأمصار والمدن إن هم أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أبوا فلست لكم بوالٍ ... " "تاريخ الخلفاء: ص362".

পরিচ্ছেদ: খলিফার অঙ্গীকার তাঁর পরবর্তী ব্যক্তিদের পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া প্রসঙ্গে
যদি খলিফা দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং তাঁদের মধ্যে খিলাফতের ক্রম নির্ধারণ করে দিয়ে বলেন: "আমার পরে অমুক খলিফা হবে, যদি সে মারা যায় তবে তার মৃত্যুর পর অমুক খলিফা হবে, আর যদি সেও মারা যায় তবে তার পরে অমুক খলিফা হবে"—তবে তা বৈধ হবে এবং খিলাফত তাঁর নির্ধারিত ক্রম অনুযায়ী তিনজনের কাছে পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরিত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুতাহর যুদ্ধের সেনাদলের ওপর জায়েদ ইবনে হারিসাকে আমির নিযুক্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "যদি সে আহত (বা নিহত) হয় তবে জাফর ইবনে আবি তালিব সেনাপতি হবে, যদি সেও আহত হয় তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, আর যদি সেও আহত হয় তবে মুসলিমরা যেন নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে পছন্দ করে নেয়।" অতঃপর জায়েদ অগ্রসর হলেন এবং শহিদ হলেন, এরপর জাফর পতাকা গ্রহণ করে অগ্রসর হলেন এবং শহিদ হলেন, এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং শহিদ হলেন। অতঃপর মুসলিমগণ তাঁর পরে খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে নির্বাচন করলেন।১
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেহেতু সেনাপতিত্বের ক্ষেত্রে এটি করেছেন, তাই খিলাফতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ করা বৈধ হবে। যদি বলা হয়: খিলাফত তো নির্দিষ্ট গুণ ও শর্তের ভিত্তিতে সম্পাদিত একটি অভিভাবকত্ব বা কর্তৃত্বের চুক্তি, আর এ জাতীয় চুক্তিসমূহ সাধারণত ভবিষ্যৎ শর্ত বা গুণের ওপর নির্ভর করে স্থগিত রাখা যায় না; তবে এর উত্তরে বলা হবে: এটি জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট (মাসালিহে আম্মাহ) বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, যার বিধানের পরিধি ব্যক্তিগত বা বিশেষ চুক্তির বিধানের চেয়ে ব্যাপক। দুই খেলাফতের (উমাইয়া ও আব্বাসীয়) আমলে এমন আমল করা হয়েছে এবং তৎকালীন সময়ের আলেমদের কেউ এর প্রতিবাদ করেননি। যেমন সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক প্রথমে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের জন্য এবং তাঁর পরে ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালিকের জন্য উত্তরাধিকারের অঙ্গীকার করেছিলেন।২
আর যদি সুলাইমানের কাজ দলিল হিসেবে গণ্য নাও হয়, তবে তাঁর সমসাময়িক তাবিঈ আলেমগণ এবং যাঁরা সত্যের পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় পান না, তাঁদের মৌন সম্মতি ও সমর্থন দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

---

১ সহিহ: আহমদ (২২০৪৫) এটি বর্ণনা করেছেন এবং শেখ আলবানী আমাদের উস্তাদ আল-গাজালির 'ফিকহুস সিরাহ'র হাদিস তাহকিকে (পৃ. ৩৬৫) একে সহিহ বলেছেন।
২ আমি (সম্পাদক) বলছি: এটি স্পষ্ট যে ইমাম আল-মাওয়ার্দি খলিফাদের জন্য অনুষ্ঠিত সর্বজনীন বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথকে কোনো গুরুত্ব বা ভূমিকা দেননি, যেন এর কোনো মূল্য নেই বা এটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এটি একটি বড় ভুল; কারণ ওমর ইবনে আবদুল আজিজ—যাঁকে লেখক সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক কর্তৃক মনোনীত হওয়ার উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন—তিনি উম্মতের বাইয়াত গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই শাসনভার গ্রহণ করেননি। আস-সুয়ূতি বলেন: যখন সুলাইমান মারা গেলেন এবং তাঁর উইল বা পত্রটি খোলা হলো, তাতে দেখা গেল: ওমর ইবনে আবদুল আজিজের জন্য খেলাফতের অঙ্গীকার করা হয়েছে। তখন বনু আবদুল মালিকের বংশধরদের চেহারা (অসন্তোষে) বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু যখন তারা শুনল: "এবং তাঁর পরে ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালিক", তখন তারা আশ্বস্ত হলো। তারা ওমরের কাছে এসে খিলাফতের সালাম পেশ করল। তিনি এই গুরুদায়িত্বের ভয়ে এতটাই স্তম্ভিত হলেন যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলেন না, অবশেষে তারা তাঁর বাহু ধরে তাঁকে মিম্বারের কাছে নিয়ে গেল এবং উপরে উঠাল। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, তারপর বললেন: "হে লোকসকল! আমি কোনো জবরদস্তিকারী আদেশদাতা নই বরং একজন বাস্তবায়নকারী মাত্র; আমি কোনো নতুন প্রথা প্রবর্তনকারী নই বরং একজন অনুসরণকারী। তোমাদের চারপাশের শহর ও নগরের মানুষ যদি তোমাদের মতো আনুগত্য করে, তবে আমি তোমাদের শাসক, আর যদি তারা অস্বীকার করে, তবে আমি তোমাদের শাসক নই..." (তারিখুল খুলাফা: পৃ. ৩৬২)।

(ص: 37)الأحكام السلطانية للماوردي

لَوْمَةَ لَائِمٍ هُوَ الْحُجَّةُ، وَقَدْ رَتَّبَهَا الرَّشِيدُ رضي الله عنه فِي ثَلَاثَةٍ مِنْ بَنِيهِ؛ فِي الْأَمِينِ ثُمَّ الْمَأْمُونِ ثُمَّ الْمُؤْتَمَنِ، عَنْ مَشُورَةِ مَنْ عَاصَرَهُ مِنْ فُضَلَاءِ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِذَا عَهِدَ

الْخَلِيفَةُ إِلَى ثَلَاثَةٍ رَتَّبَ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ وَمَاتَ وَالثَّلَاثَةُ أَحْيَاءُ، كَانَتِ الْخِلَافَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِلْأَوَّلِ؛ وَلَوْ مَاتَ الْأَوَّلُ فِي حَيَاةِ الْخَلِيفَةِ كَانَتِ الْخِلَافَةُ بَعْدَهُ لِلثَّانِي، وَلَوْ مَاتَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فِي حَيَاةِ الْخَلِيفَةِ فَالْخِلَافَةُ بَعْدَهُ لِلثَّالِثِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَقَرَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ بِالْعَهْدِ إِلَيْهِ حُكْمُ الْخِلَافَةِ بَعْدَهُ، وَلَوْ مَاتَ الْخَلِيفَةُ وَالثَّلَاثَةُ مِنْ أَوْلِيَاءِ عَهْدِهِ أَحْيَاءُ، وَأَفْضَتْ الْخِلَافَةُ إِلَى الْأَوَّلِ مِنْهُمْ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا إِلَى غَيْرِ الِاثْنَيْنِ مِمَّا يَخْتَارُهُ لَهَا، فَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ حَمْلًا عَلَى مُقْتَضَى التَّرْتِيبِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَنْزِلَ عَنْهَا مُسْتَحِقَّهَا طَوْعًا.

فَقَدْ عَهِدَ السَّفَّاحُ إِلَى الْمَنْصُورِ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَجَعَلَ الْعَهْدَ بَعْدَهُ لِعِيسَى بْنِ مُوسَى، فَأَرَادَ الْمَنْصُورُ تَقْدِيمَ الْمَهْدِيِّ عَلَى عِيسَى فَاسْتَنْزَلَهُ عَنِ الْعَهْدِ عَفْوًا لِحَقِّهِ فِيهِ، وَفُقَهَاءُ الْوَقْتِ عَلَى تَوَافُرٍ وَتَكَاثُرٍ لَمْ يَرَوْا لَهُ فُسْحَةً فِي صَرْفِهِ عَنْ وِلَايَةِ الْعَهْدِ قَسْرًا حَتَّى اسْتَنْزَلَ وَاسْتَطْيَبَ.

وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله، وَمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ أَفْضَتْ إِلَيْهِ الْخِلَافَةُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْعَهْدِ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا إِلَى مَنْ شَاءَ، وَيَصْرِفُهَا عَمَّنْ كَانَ مُرَتَّبًا مَعَهُ، وَيَكُونُ هَذَا التَّرْتِيبُ مَقْصُورًا عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ الْخِلَافَةَ مِنْهُمْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُسْتَخْلِفِ، فَإِذَا أَفْضَتْ الْخِلَافَةُ مِنْهُمْ إِلَى أَحَدِهِمْ عَلَى مُقْتَضَى التَّرْتِيبِ صَارَ أَمْلَكَ بِهَا بَعْدَهُ فِي الْعَهْدِ بِهَا إِلَى مَنْ شَاءَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ بِإِفْضَاءِ الْخِلَافَةِ إِلَيْهِ عَامَّ الْوِلَايَةِ، نَافِذَ الْأَمْرِ، فَكَانَ حَقُّهُ فِيهَا أَقْوَى، وَعَهْدُهُ بِهَا أَمْضَى، وَخَالَفَ هَذَا مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَرْتِيبِ أُمَرَائِهِ عَلَى جَيْشِ مُؤْتَةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَيَاةِ؛ حَيْثُ لَمْ تَنْتَقِلْ أُمُورُهُمْ إِلَى غَيْرِهِ، وَهَذَا يَكُونُ بَعْدَ انْتِقَالِ الْأَمْرِ بِمَوْتِهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَافْتَرَقَ حُكْمُ الْعَهْدَيْنِ.

وَأَمَّا اسْتِطَابَةُ الْمَنْصُورِ نَفْسَ عِيسَى بْنِ مُوسَى، فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ تَأَلُّفَ أَهْلِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي صَدْرِ الدَّوْلَةِ وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ، وَالتَّكَافُؤُ بَيْنَهُمْ مُنْتَشِرٌ، وَفِي أَحْشَائِهِمْ نُفُورٌ مُوهِنٌ، فَفَعَلَهُ سِيَاسَةً، وَإِنْ كَانَ فِي الْحُكْمِ سَائِغًا؛ فَعَلَى هَذَا لَوْ مَاتَ الْأَوَّلُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْعَهْدِ الثَّلَاثَةِ

بَعْدَ إِفْضَاءِ الْخِلَافَةِ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَعْهَدْ إِلَى غَيْرِهِمَا، كَانَ الثَّانِي هُوَ الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ بِالْعَهْدِ الْأَوَّلِ، وَقُدِّمَ عَلَى الثَّالِثِ اعْتِبَارًا

কোনো নিন্দুকের নিন্দাই তাঁর জন্য বাধা হয়নি, তিনিই হলেন প্রমাণ। আল-রশীদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর তিন পুত্রের ক্ষেত্রে খেলাফতের এই ক্রম নির্ধারণ করেছিলেন; প্রথমে আল-আমীন, এরপর আল-মামুন, অতঃপর আল-মুতামিন। এটি তিনি করেছিলেন তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ আলিমগণের পরামর্শক্রমে। সুতরাং খলিফা যদি তিনজনের অনুকূলে খেলাফতের অঙ্গীকার করেন এবং তাদের ক্রম নির্ধারণ করে দেন, আর এমতাবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন যে ওই তিনজনই জীবিত, তবে তাঁর মৃত্যুর পর খেলাফত প্রথম ব্যক্তির প্রাপ্য হবে। যদি প্রথম ব্যক্তি খলিফার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন, তবে তাঁর পর খেলাফত দ্বিতীয় ব্যক্তির হবে। আর যদি খলিফার জীবদ্দশায় প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়ই মৃত্যুবরণ করেন, তবে তাঁর পর খেলাফত তৃতীয় ব্যক্তির প্রাপ্য হবে। কারণ, উত্তরসূরি নিয়োগের অঙ্গীকারের মাধ্যমে তাঁদের প্রত্যেকের জন্য খেলাফতের বিধান সুনিশ্চিত হয়েছিল। তবে যদি খলিফা মারা যান এবং তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী তিনজনেই জীবিত থাকেন এবং খেলাফত তাদের প্রথম জনের কাছে পৌঁছায়, এমতাবস্থায় তিনি যদি অবশিষ্ট দুজন ব্যতীত অন্য কাউকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চান, তবে ফকীহদের মধ্যে কেউ কেউ ক্রমানুসারের বাধ্যবাধকতার কারণে তাঁকে তা থেকে নিষেধ করেছেন; যতক্ষণ না যার অধিকার আছে সে স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করে।

আস-সাফফাহ আল-মানসুরের অনুকূলে খেলাফতের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তাঁর পরে ঈসা ইবনে মুসার জন্য ক্রম নির্ধারণ করেছিলেন। পরবর্তীতে আল-মানসুর ঈসা ইবনে মুসার পরিবর্তে আল-মাহদীকে অগ্রাধিকার দিতে চাইলেন; ফলে তিনি ঈসা ইবনে মুসাকে তাঁর অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করার অনুরোধ জানালেন। তৎকালীন অসংখ্য ফকীহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, তাঁরা ঈসা ইবনে মুসাকে জোরপূর্বক খেলাফতের উত্তরাধিকার থেকে সরিয়ে দেওয়ার কোনো অবকাশ দেখেননি, যতক্ষণ না তিনি স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে সরে দাঁড়ান।

ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মাযহাবের প্রকাশ্য মত এবং অধিকাংশ ফকীহদের অভিমত হলো: যাঁর কাছে খেলাফত হস্তান্তরিত হয়েছে, তাঁর জন্য যাকে ইচ্ছা উত্তরাধিকারী মনোনীত করা এবং তাঁর সাথে নির্ধারিত ক্রমে থাকা ব্যক্তিকে সরিয়ে দেওয়া বৈধ। এই নির্ধারিত ক্রম কেবল উত্তরসূরি নিয়োগকারীর মৃত্যুর পর যারা খেলাফতের অধিকার লাভ

করবে তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং যখন নির্ধারিত ক্রম অনুযায়ী তাদের মধ্যে কারো কাছে খেলাফত পৌঁছাবে, তখন তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষমতার অধিকারী হবেন। কারণ খেলাফত তাঁর ওপর অর্পিত হওয়ার ফলে তিনি সাধারণ কর্তৃত্ব ও কার্যকর আদেশের অধিকারী হয়েছেন; ফলে এই বিষয়ে তাঁর অধিকার অধিক শক্তিশালী এবং তাঁর কৃত মনোনয়ন অধিক কার্যকর। এটি মুতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক সেনাপতিদের ক্রম নির্ধারণের বিষয়টি থেকে ভিন্ন; কারণ সেটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায়, যখন তাদের বিষয়াবলি অন্য কারও কাছে হস্তান্তরিত হয়নি। আর বর্তমান বিষয়টি হলো মূল ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্যের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পরের ঘটনা। সুতরাং এই দুই ধরণের অঙ্গীকারের বিধানে পার্থক্য রয়েছে।

আর আল-মানসুর যে ঈসা ইবনে মুসার মন জয় করার চেষ্টা করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল কেবল স্বীয় পরিবার ও স্বজনদের তুষ্ট রাখা। কারণ তখন ছিল রাজবংশের সূচনালগ্ন এবং অঙ্গীকারের সময়কালও ছিল নিকটবর্তী। তাদের মধ্যে সমকক্ষতার প্রভাব ছিল ব্যাপক এবং তাদের মনে এক ধরণের দুর্বলকারী অনীহা বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি এটি রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে করেছিলেন, যদিও আইনি বিচারে বিষয়টি বৈধ ছিল। এই নীতি অনুযায়ী, খেলাফত প্রাপ্তির পর তিনজন উত্তরাধিকারীর মধ্যে প্রথম জন যদি মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি অবশিষ্ট দুজন ব্যতীত অন্য কাউকে উত্তরাধিকারী মনোনীত না করে যান, তবে প্রথম অঙ্গীকার অনুযায়ী দ্বিতীয় জনই তাঁর পরবর্তী খলিফা হবেন এবং তৃতীয় জনের ওপর তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(ص: 38)الأحكام السلطانية للماوردي

بِحُكْمِ التَّرْتِيبِ فِيهِ. وَلَوْ مَاتَ هَذَا الثَّانِي قَبْلَ عَهْدٍ صَارَ الثَّالِثُ هُوَ الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ عَهْدِ الْعَاهِدِ تَقْتَضِي ثُبُوتَ حُكْمِهِ فِي الثَّلَاثَةِ مَا لَمْ يُجَدِّدْ بَعْدَهُ عَهْدًا يُخَالِفُهُ. فَيَصِيرُ الْعَهْدُ فِي الْأَوَّلِ مِنَ الثَّلَاثَةِ حَتْمًا. وَفِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ مَوْقُوفًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ

يَعْدِلَ عَنِ الْأَوَّلِ فَانْحَتَمَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْدِلَ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ عَنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَوَقَفَ.

وَلَوْ مَاتَ الْأَوَّلُ مِنَ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ إِفْضَاءِ الْخِلَافَةِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْهَدَ إِلَى أَحَدٍ، فَأَرَادَ أَهْلُ الِاخْتِيَارِ أَنْ يَخْتَارُوا لِلْخِلَافَةِ غَيْرَ الثَّانِي لَمْ يَجُزْ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ الثَّانِي بَعْدَ إِفْضَاءِ الْخِلَافَةِ إِلَيْهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَخْتَارُوا لَهَا غَيْرَ الثَّالِثِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا الثَّانِي إِلَى غَيْرِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّ الْعَهْدَ نَصٌّ لَا يُسْتَعْمَلُ الِاخْتِيَارُ إِلَّا مَعَ عَدَمِهِ، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ الْخَلِيفَةُ الْعَاهِدُ: قَدْ عَهِدْتُ إِلَى فُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ إِفْضَاءِ الْخِلَافَةِ إِلَيْهِ فَالْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ فُلَانٌ، لَمْ تَصِحَّ خِلَافَةُ الثَّانِي، وَلَمْ يَنْعَقِدْ عَهْدُهُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْهِ فِي الْحَالِ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ وَلِيَّ عَهْدِهِ بَعْدَ إِفْضَاءِ الْخِلَافَةِ إِلَى الْأَوَّلِ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ إِفْضَائِهَا إِلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ عَهْدُ الثَّانِي بِهَا مُنَفَّذًا، فَلِذَلِكَ بَطَلَ وَجَازَ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ إِفْضَاءِ الْخِلَافَةِ إِلَيْهِ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا إِلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عَهْدٍ جَازَ لِأَهْلِ الِاخْتِيَارِ اخْتِيَارُ غَيْرِهِ.

এতে বিন্যাসের বিধান কার্যকর হওয়ার কারণে। আর যদি এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কোনো উত্তরাধিকারী নিয়োগের অঙ্গীকার করার আগেই মারা যান, তবে তৃতীয় ব্যক্তিই তাঁর পরবর্তী খলিফা হবেন; কারণ অঙ্গীকারকারীর অঙ্গীকারের বৈধতা এই তিনজনের ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তের স্থায়িত্ব দাবি করে, যতক্ষণ না তিনি পরবর্তী সময়ে এর বিপরীত কোনো নতুন অঙ্গীকার করেন। ফলে এই তিনজনের মধ্যে প্রথমজনের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারটি অবধারিত হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়জনের ক্ষেত্রে তা স্থগিত থাকে; কারণ প্রথমজনের থেকে বিচ্যুত হওয়া বৈধ নয় বিধায় তা অবধারিত হয়েছে, আর এই মতবাদ অনুযায়ী দ্বিতীয় ও তৃতীয়জনের ক্ষেত্রে বিচ্যুত হওয়া বৈধ বিধায় তা স্থগিত রাখা হয়েছে।

আর যদি এই তিনজনের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি তাঁর নিকট খিলাফত হস্তান্তরিত হওয়ার পর অন্য কারো অনুকূলে অঙ্গীকার না করে মৃত্যুবরণ করেন, তবে নির্বাচকমণ্ডলী যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে খিলাফতের জন্য নির্বাচন করতে চান, তবে তা বৈধ হবে না। একইভাবে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁর নিকট খিলাফত হস্তান্তরিত হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করেন, তবে নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য তৃতীয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে নির্বাচন করা বৈধ হবে না; যদিও দ্বিতীয়

ব্যক্তির জন্য তৃতীয় ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কারো অনুকূলে অঙ্গীকার করা বৈধ ছিল। কারণ অঙ্গীকার হলো একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ, আর অঙ্গীকারের অনুপস্থিতি ব্যতিরেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া কার্যকর করা হয় না। তবে অঙ্গীকারকারী খলিফা যদি বলেন: "আমি অমুকের অনুকূলে অঙ্গীকার করলাম, অতঃপর তার নিকট খিলাফত হস্তান্তরিত হওয়ার পর সে যদি মারা যায় তবে তার পরবর্তী খলিফা হবে অমুক," তবে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তির খিলাফত বৈধ হবে না এবং তাঁর অনুকূলে অঙ্গীকারও সংঘটিত হবে না; কারণ তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর অনুকূলে অঙ্গীকার করেননি। বরং তিনি প্রথম ব্যক্তির নিকট খিলাফত পৌঁছানোর পরবর্তী সময়ের জন্য তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন। অথচ খিলাফত পৌঁছানোর আগেই তার মৃত্যু ঘটা সম্ভব, তাই দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুকূলে এই অঙ্গীকার কার্যকর হবে না। এ কারণেই তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং প্রথম ব্যক্তি খিলাফত লাভ করার পর অন্য কারো অনুকূলে অঙ্গীকার করার অধিকার পাবেন। আর যদি তিনি কোনো অঙ্গীকার ছাড়াই মারা যান, তবে নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য অন্য কাউকে নির্বাচন করা বৈধ হবে।

(ص: 39)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل: "في وجوب معرفة الأمَّة لمن تولَّى أمرها"

فَإِذَا اسْتَقَرَّتِ الْخِلَافَةُ لِمَنْ تَقَلَّدَهَا، إِمَّا بِعَهْدٍ أَوْ اخْتِيَارٍ، لَزِمَ كَافَّةَ الْأُمَّةِ أَنْ يَعْرِفُوا إِفْضَاءَ الْخِلَافَةِ إِلَى مُسْتَحِقِّهَا بِصِفَاتِهِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَعْرِفُوهُ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ، إِلَّا أَهْلُ الِاخْتِيَارِ الَّذِينَ تَقُومُ بِهِمُ الْحُجَّةُ وَبِبَيْعَتِهِمْ تَنْعَقِدُ الْخِلَافَةُ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ جَرِيرٍ: وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ، كَمَا عَلَيْهِمْ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَةُ رَسُولِهِ.

وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ النَّاسِ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ تَلْزَمُ الْكَافَّةَ عَلَى الْجُمْلَةِ دُونَ التَّفْصِيلِ، وَلَيْسَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَعْرِفَهُ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ إِلَّا عِنْدَ النَّوَازِلِ الَّتِي تُحْوِجُ إِلَيْهِ، كَمَا أَنَّ مَعْرِفَةَ الْقُضَاةِ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْأَحْكَامُ، وَالْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُفْتُونَ فِي الْحَلَالِ

وَالْحَرَامِ، تَلْزَمُ الْعَامَّةَ عَلَى الْجُمْلَةِ دُونَ التَّفْصِيلِ، إِلَّا عِنْدَ النَّوَازِلِ الْمُحْوِجَةِ إِلَيْهِمْ، وَلَوْ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأُمَّةِ أَنْ يَعْرِفَ الْإِمَامَ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ لَلَزِمَتْ الْهِجْرَةُ إِلَيْهِ، وَلَمَا جَازَ تَخَلُّفُ الْأَبَاعِدِ، وَلَأَفْضَى ذَلِكَ إِلَى خُلُوِّ الْأَوْطَانِ، وَلَصَارَ مِنَ الْعُرْفِ خَارِجًا، وَبِالْفَسَادِ عَائِدًا، وَإِذَا لَزِمَتْ مَعْرِفَتُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، فَعَلَى كَافَّةِ الْأُمَّةِ تَفْوِيضُ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ افْتِيَاتٍ عَلَيْهِ وَلَا مُعَارَضَةٍ لَهُ؛ لِيَقُومَ بِمَا وُكِّلَ إِلَيْهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَصَالِحِ وَتَدْبِيرِ الْأَعْمَالِ، وَيُسَمَّى خَلِيفَةً لِأَنَّهُ خَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُمَّتِهِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى الْإِطْلَاقِ فَيُقَالُ: الْخَلِيفَةُ.

وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ؟ فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِقِيَامِهِ بِحُقُوقِهِ فِي خَلْقِهِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ} [الأنعام: 165] .

وَامْتَنَعَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ، وَنَسَبُوا قَائِلَهُ إِلَى الْفُجُورِ وَقَالُوا: يُسْتَخْلَفُ مَنْ يَغِيبُ أَوْ يَمُوتُ، وَاَللَّهُ لَا يَغِيبُ وَلَا يَمُوتُ، وَقَدْ قِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه: يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ، فَقَالَ: لَسْتُ بِخَلِيفَةِ اللَّهِ، وَلَكِنِّي خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

---

1 الافتيات: السبق إلى الشيء دون ائتمار من يُؤْتمر، تقول: افتات عليه بأمر كذا، أي: فاته به، وفلان لا يفتات عليه، أي: لا يعمل شيء دون أمره، وتفاوت الشيئان: تباعد ما بينهما. "مختار الصحاح: ص215".

পরিচ্ছেদ: উম্মাহর জন্য তাদের শাসনভার গ্রহণকারীর পরিচয় জানার আবশ্যকতা প্রসঙ্গে যখন শাসনভার গ্রহণকারীর খিলাফত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়—তা অঙ্গীকার (মনোনয়ন) বা নির্বাচনের মাধ্যমেই হোক—তখন সমগ্র উম্মাহর জন্য আবশ্যক হলো খিলাফত তার গুণাবলির কারণে যোগ্য ব্যক্তির নিকট ন্যস্ত হওয়ার বিষয়টি অবগত হওয়া। তবে সাধারণ জনগণের জন্য খলিফাকে সশরীরে বা নাম ধরে জানা আবশ্যক নয়; কেবল সেই নির্বাচনকারী ব্যক্তিবর্গের

জন্য তা আবশ্যক, যাদের দ্বারা দলিল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যাদের বায়আতের মাধ্যমে খিলাফত সুসংগঠিত হয়।

সুলাইমান ইবনে জারীর বলেন: সকল মানুষের উপর ইমামকে সশরীরে এবং নামসহ জানা ওয়াজিব, যেমন তাদের উপর আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে জানা ওয়াজিব।

অধিকাংশ আলিমের মত হলো, ইমামের পরিচয় জানা সকলের উপর সামগ্রিকভাবে আবশ্যক, বিস্তারিতভাবে নয়। বিশেষ কোনো প্রয়োজন বা উদ্ভূত পরিস্থিতি ব্যতীত প্রত্যেকের জন্য তাঁকে সশরীরে বা নাম ধরে চেনা আবশ্যক নয়। যেমন বিচারক ও ফকিহদের—যাদের দ্বারা বিচারকার্য পরিচালিত হয় এবং যারা হালাল-হারাম বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করেন—পরিচয় জানা সাধারণ মানুষের জন্য সামগ্রিকভাবে আবশ্যক, বিস্তারিতভাবে নয়; কেবল সেই পরিস্থিতি ব্যতীত যেখানে তাঁদের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। যদি উম্মাহর প্রত্যেকের জন্য ইমামকে সশরীরে এবং নামসহ চেনা আবশ্যক হতো, তবে তাঁর নিকট হিজরত করাও সবার জন্য বাধ্যতামূলক হতো। ফলে দূরবর্তী স্থানে থাকা লোকেদের জন্য নিজ স্থানে অবস্থান করা বৈধ হতো না, যা স্বদেশ জনশূন্য হওয়ার কারণ হতো। এটি প্রচলিত প্রথা ও স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হতো। যখন আমাদের বর্ণিত বিস্তারিত পদ্ধতিতে তাঁর পরিচয় জানা আবশ্যক হবে, তখন সমগ্র উম্মাহর দায়িত্ব হলো তাঁর মতামতকে ডিঙিয়ে কোনো কাজ না করে এবং তাঁর বিরোধিতা না করে সাধারণ কার্যাবলি তাঁর ওপর ন্যস্ত করা; যাতে তিনি তাঁর ওপর অর্পিত জনকল্যাণ ও প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারেন। তাঁকে 'খলিফা' বলা হয়, কারণ তিনি উম্মাহর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। অতএব, 'হে আল্লাহর রসূলের খলিফা' বলা বৈধ, আবার সাধারণভাবে কেবল 'খলিফা'ও বলা যায়।

আলিমগণ মতভেদ করেছেন যে, 'হে আল্লাহর খলিফা' বলা জায়েজ কি না। কেউ কেউ সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর বিধানসমূহ কায়েম করার কারণে এবং আল্লাহর এই বাণীর প্রেক্ষিতে তা জায়েজ বলেছেন: "আর তিনিই তোমাদেরকে যমিনের খলিফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন।" [সূরা আল-আনআম: ১৬৫]

কিন্তু অধিকাংশ আলিম এটি জায়েজ হওয়া থেকে বিরত থেকেছেন এবং এ কথা প্রচারকারীকে সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন: স্থলাভিষিক্ত কেবল তাঁরই হয় যে অনুপস্থিত থাকে অথবা মৃত্যুবরণ করে, অথচ আল্লাহ তাআলা অনুপস্থিত হন না এবং মৃত্যুবরণও করেন না। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একদা বলা হয়েছিল, 'হে

আল্লাহর খলিফা', তখন তিনি বলেছিলেন: "আমি আল্লাহর খলিফা নই, বরং আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলিফা।"

---

১. ইফতিয়াত: কোনো বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি বা পরামর্শ ছাড়া নিজে থেকে কিছু করা। বলা হয়: অমুক বিষয়ে তার ওপর ইফতিয়াত করেছে, অর্থাৎ তাকে বাদ দিয়ে বা তাকে ডিঙিয়ে কাজটি করেছে। আর বলা হয়: অমুকের ওপর ইফতিয়াত করা যায় না, অর্থাৎ তার নির্দেশ ছাড়া কোনো কাজ করা হয় না। আর 'তফাউত' অর্থ হলো দুই বস্তুর মধ্যকার ব্যবধান। [মুখতারুস সিহাহ: পৃষ্ঠা ২১৫]।

(ص: 40)الأحكام السلطانية للماوردي

"مهام الخليفة ومسئولياته":

وَالَّذِي يَلْزَمُهُ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الْمُسْتَقِرَّةِ، وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، فَإِنْ نَجَمَ مُبْتَدِعٌ أَوْ زَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ، أَوْضَحَ لَهُ الْحُجَّةَ، وَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابَ، وَأَخَذَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ؛ لِيَكُونَ الدِّينُ مَحْرُوسًا مِنْ خَلَلٍ، وَالْأُمَّةُ مَمْنُوعَةً مِنْ زَلَلٍ.

الثَّانِي: تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ، وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ حَتَّى تَعُمَّ النَّصَفَةُ، فَلَا يَتَعَدَّى ظَالِمٌ، وَلَا يَضْعُفُ مَظْلُومٌ.

الثَّالِثُ: حِمَايَةُ الْبَيْضَةِ وَالذَّبُّ عَنِ الْحَرِيمِ؛ لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَايِشِ، وَيَنْتَشِرُوا فِي الْأَسْفَارِ آمِنِينَ مِنْ تَغْرِيرٍ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ.

وَالرَّابِعُ: إِقَامَةُ الْحُدُودِ؛ لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الِانْتِهَاكِ، وَتُحْفَظَ حُقُوقُ عِبَادِهِ مِنْ إِتْلَافٍ وَاسْتِهْلَاكٍ.

وَالْخَامِسُ: تَحْصِينُ الثُّغُورِ بِالْعُدَّةِ الْمَانِعَةِ وَالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ حَتَّى لَا تَظْفَرَ الْأَعْدَاءُ بِغِرَّةٍ يَنْتَهِكُونَ فِيهَا مُحَرَّمًا، أَوْ يَسْفِكُونَ فِيهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ دَمًا.

وَالسَّادِسُ: جِهَادُ مَنْ عَانَدَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ الدَّعْوَةِ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يَدْخُلَ فِي الذِّمَّةِ؛ لِيُقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي إِظْهَارِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.

وَالسَّابِعُ: جِبَايَةُ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ نَصًّا وَاجْتِهَادًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا عَسْفٍ.

وَالثَّامِنُ: تَقْدِيرُ الْعَطَايَا وَمَا يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا تَقْتِيرٍ، وَدَفْعُهُ فِي وَقْتٍ لَا تَقْدِيمَ فِيهِ وَلَا تَأْخِيرَ.

التَّاسِعُ: اسْتِكْفَاءُ الْأُمَنَاءِ وَتَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ فِيمَا يُفَوَّضُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَعْمَالِ وَيَكِلُهُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ؛ لِتَكُونَ الْأَعْمَالُ بِالْكَفَاءَةِ مَضْبُوطَةً، وَالْأَمْوَالُ بِالْأُمَنَاءِ مَحْفُوظَةً.

الْعَاشِرُ: أَنْ يُبَاشِرَ بِنَفْسِهِ مُشَارَفَةَ الْأُمُورِ، وَتَصَفُّحَ الْأَحْوَالِ؛ لِيَنْهَضَ بِسِيَاسَةِ الْأُمَّةِ وَحِرَاسَةِ الْمِلَّةِ، وَلَا يُعَوِّلُ عَلَى التَّفْوِيضِ تَشَاغُلًا بِلَذَّةٍ أَوْ عِبَادَةٍ، فَقَدْ يَخُونُ الْأَمِينُ وَيَغُشُّ

খলিফার কার্যাবলি ও দায়িত্বসমূহ:

জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট যে দশটি বিষয় সম্পাদন করা খলিফার জন্য অপরিহার্য, সেগুলো হলো:

প্রথমত: উম্মতের সালাফগণের ঐকমত্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতির ভিত্তিতে দ্বীনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। যদি কোনো বিদআতি আবির্ভূত হয় অথবা কোনো সংশয়বাদী সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তবে তিনি তার সামনে অকাট্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করবেন এবং তাকে সঠিক পথ বাতলে দেবেন। আর তাকে তার ওপর অর্পিত হক ও দণ্ডবিধি মোতাবেক শাসন করবেন, যাতে দ্বীন সকল প্রকার বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত থাকে এবং উম্মত পদস্খলন থেকে রক্ষা পায়।

দ্বিতীয়ত: বিবাদমান পক্ষসমূহের মধ্যে বিচারিক রায় কার্যকর করা এবং বিরোধীদের বিবাদ নিষ্পত্তি করা; যাতে ন্যায়বিচার সর্বব্যাপী হয় এবং কোনো জালিম সীমালঙ্ঘন করতে না পারে এবং কোনো মজলুম শক্তিহীন হয়ে না পড়ে।

তৃতীয়ত: মুসলিম ভূখণ্ডের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা; যাতে মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার সন্ধানে নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারে এবং জান ও মালের কোনো প্রকার ঝুঁকির আশঙ্কা ছাড়াই দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে পারে।

চতুর্থত: হুদুদ বা শরয়ি দণ্ডবিধি কায়েম করা; যাতে মহান আল্লাহর নির্ধারিত পবিত্র সীমাগুলো লঙ্ঘিত না হয় এবং তাঁর বান্দাদের অধিকারসমূহ বিনষ্ট হওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকে।

পঞ্চমত: সীমান্তসমূহকে পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রতিরোধ বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত রাখা; যাতে শত্রুরা অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ না পায় এবং কোনো নিষিদ্ধ কাজ করার অথবা কোনো মুসলিম কিংবা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের রক্তপাত করার সাহস না পায়।

ষষ্ঠত: ইসলামের সুমহান দাওয়াতের পরেও যারা হঠকারিতা প্রদর্শন করে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা; যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা জিম্মি হিসেবে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি করা হয় যাতে ইসলামকে সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করার যে হক মহান আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন, তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সপ্তমত: শরিয়তের অকাট্য দলীল ও ইজতিহাদ অনুযায়ী নির্ধারিত ফায় এবং সদকা (যাকাত) কোনো প্রকার জুলুম বা জবরদস্তি ছাড়াই যথাযথভাবে সংগ্রহ করা।

অষ্টমত: অপচয় বা কার্পণ্য না করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের (বায়তুল মাল) প্রাপ্য ভাতাসমূহ ও বরাদ্দগুলো ইনসাফের সাথে নির্ধারণ করা এবং কোনো প্রকার আগপিছ না করে তা যথা সময়ে প্রদান করা।

নবমত: অর্পিত প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যোগ্য ও আমানতদার ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া এবং আর্থিক বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের দায়িত্ব প্রদান করা; যাতে রাষ্ট্রীয় কাজসমূহ দক্ষতার সাথে সুসম্পন্ন হয় এবং সরকারি সম্পদ আমানতদারদের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে।

দশমত: রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ও জনগণের সামগ্রিক অবস্থা সরাসরি নিজেই তত্ত্বাবধান করা; যাতে তিনি উম্মাতের রাষ্ট্র পরিচালনা ও দ্বীনের সুরক্ষার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন। ভোগবিলাস বা ইবাদতে অধিক নিমগ্ন হয়ে সকল দায়িত্ব অন্যের ওপর অর্পণ করে তিনি যেন নিশ্চিন্ত না হয়ে যান। কারণ, অনেক সময় বিশ্বস্ত ব্যক্তিও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এবং হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিও প্রতারণা করতে পারে।

النَّاصِحُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا دَاوُد إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26] .

فَلَمْ يَقْتَصِرْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى التَّفْوِيضِ دُونَ الْمُبَاشَرَةِ وَلَا عَذَرَهُ فِي الِاتِّبَاعِ حَتَّى وَصَفَهُ بِالضَّلَالِ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ بِحُكْمِ الدِّينِ وَمَنْصِبِ الْخِلَافَةِ، فَهُوَ مِنْ حُقُوقِ السِّيَاسَةِ لِكُلِّ مُسْتَرْعٍ، قَالَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".

وَلَقَدْ أَصَابَ الشَّاعِرُ1 فِيمَا وَصَفَ بِهِ الزَّعِيمَ الْمُدَبِّرَ حَيْثُ يَقُولُ "مِنْ الْبَسِيطِ":

وَقَلِّدُوا أَمْرَكُمْ لِلَّهِ دَرُّكُمْ ... رَحْبَ الذِّرَاعِ بِأَمْرِ الْحَرْبِ مُضْطَلِعَا

لَا مُتْرَفًا إِنْ رَخَاءُ الْعَيْشِ ... سَاعَدَهُ وَلَا إِذَا عَضَّ مَكْرُوهٌ بِهِ خَشَعَا

مَا زَالَ يَحْلُبُ دَرَّ الدَّهْرِ أَشْطُرَهُ ... يَكُونُ مُتَّبِعًا يَوْمًا وَمُتَّبَعَا

حَتَّى اسْتَمَرَّ عَلَى شَزْرٍ مَرِيرَتُهُ ... مُسْتَحْكَمِ الرَّأْيِ لَا فَخْمًا وَلَا ضَرَعَا

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ2 لِلْمَأْمُونِ -وَكَانَ وَزِيرَهُ- "مِنْ الْبَسِيطِ":

مَنْ كَانَ حَارِسَ دُنْيَا إِنَّهُ قَمِنٌ ... أَنْ لَا يَنَامَ وَكُلُّ النَّاسِ نُوَامُ

وَكَيْفَ تَرْقُدُ عَيْنَا مَنْ تَضَيَّفَهُ ... هَمَّانِ مِنْ أَمْرِهِ حَلٌّ وَإِبْرَامُ

---

1 هو لقيط بن يعمر بن خارجة الإيادي؛ شاعر جاهلي فحل، من أهل الحيرة، كان يحسن الفارسية، واتّصل بكسرى سابور "ذي الأكتاف"، فكان من كُتّابه والمطّلعين على أسرار دولته، ومن مقدّمي مترجميه، وهو صاحب القصيدة التي مطلعها: "يا دار عمرة من محتلها الجرعا"، وهي من غرر الشعر، بعث بها إلى قومه بني إياد، ينذرهم بأنّ كسرى وجّه جيشًا لغزوهم، وسقطت القصيدة في يد من أوصلها إلى كسرى، فسخط عليه وقطع لسانه ثم قتله.

2 هو القاضي محمد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزي الوزير، وزر للمأمون، كان حَسَن البلاغة كثير الأدب مشهورًا بقول الشعر، له في المأمون مرثية معروفة، وكان سليمان بن وهب يكتب بين يديه، وكان به خاصًّا، ثم اتَّصل به أن سليمان سعى عليه فأطرحه، وتوفِّي سنة ثلاثين ومائتين بسرِّ من رأى.

নীতিনিষ্ঠ উপদেষ্টা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: {হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছি; অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার করো এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে} [সাদ: ২৬]।

মহান আল্লাহ কেবল দায়িত্ব অর্পণ করেই ক্ষান্ত হননি বরং সরাসরি তত্ত্বাবধানের নির্দেশ দিয়েছেন; আর খেয়াল-খুশির অনুসরণে তাকে কোনো ওজর বা অজুহাত দেখানোর সুযোগ দেননি, এমনকি একে পথভ্রষ্টতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। যদিও এটি দ্বীনী বিধান এবং খিলাফতের পদের কারণে তার ওপর অর্পিত একটি অপরিহার্য দায়িত্ব, তবে এটি প্রত্যেক শাসকের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। নবী (সা.) বলেছেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।"

কুশলী নেতা বা ব্যবস্থাপকের বর্ণনায় কবি যথার্থই বলেছেন - "আল-বাসীত ছন্দ থেকে":

তোমরা তোমাদের শাসনভার এমন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করো—আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য কল্যাণ হোক— … যে উদার হস্ত এবং যুদ্ধের বিষয়ে সুদক্ষ।

বিলাসী নয় যে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন … তাকে গ্রাস করবে, আর বিপদ যখন তাকে দংশন করে তখন সে ভেঙে পড়ে না।

সে সর্বদা কালের দুধের স্তনগুলো দোহন করেছে (উত্থান-পতন দেখেছে), … কখনো সে হয়েছে অনুসারী আবার কখনো অনুসৃত।

পরিশেষে তার রশি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হলো; … সে বিচক্ষণ মতামতের অধিকারী, না সে দাম্ভিক আর না সে হীনবল।

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজদাদ—যিনি খলিফা মামুনের উজির ছিলেন—মামুনকে সম্বোধন করে বলেছেন - "আল-বাসীত ছন্দ থেকে":

যে ব্যক্তি পার্থিব জগতের পাহারাদার, তার জন্য এটিই সঙ্গত যে, ... সে ঘুমাবে না যখন সকল মানুষ নিদ্রামগ্ন।
আর তার চোখ দুটি কীভাবে ঘুমাতে পারে, যাকে পরিবেষ্টন করে আছে ... বিষয়ের সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দুশ্চিন্তা?

---

১. তিনি হলেন লাকীত ইবনে ইয়ামুর ইবনে খারিজিয়া আল-ইয়াদি; একজন প্রথিতযশা জাহেলি কবি, হীরা নগরীর অধিবাসী। তিনি পারস্য ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং পারস্য সম্রাট কিসরা শাপুর "যুল আকতাফ"-এর সাথে তার যোগাযোগ ছিল। তিনি সম্রাটের অন্যতম সচিব এবং রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং সম্রাটের প্রধান অনুবাদকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সেই প্রসিদ্ধ কাসিদার রচয়িতা যার শুরু এভাবে: "হে আমরার ঘর...।" এটি কবিতার এক অনন্য নিদর্শন। তিনি তার গোত্র বনু ইয়াদকে সতর্ক করে এই কাসিদাটি পাঠিয়েছিলেন যে, কিসরা তাদের আক্রমণের জন্য সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে। কিন্তু কাসিদাটি এমন একজনের হাতে পড়ে যায় যে তা কিসরার কাছে পৌঁছে দেয়। ফলে সম্রাট তার ওপর রাগান্বিত হন, তার জিহ্বা কেটে ফেলেন এবং এরপর তাকে হত্যা করেন।
২. তিনি হলেন কাজী মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজদাদ ইবনে সুওয়াইদ আল-কাতিব আল-মারওয়াজি আল-ওয়াজির। তিনি খলিফা মামুনের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বাগ্মী, প্রজ্ঞাবান এবং কবিতা রচনায় সুপরিচিত ছিলেন। মামুনের স্মরণে তার একটি বিখ্যাত শোকগাথা (মারসিয়া) রয়েছে। সুলাইমান ইবনে ওয়াহাব তার অধীনে সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন যে সুলাইমান তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তাই তিনি তাকে সরিয়ে দেন। তিনি ২৩০ হিজরিতে 'সাররা মান রাআ' (সামারা) নগরে মৃত্যুবরণ করেন।

(ص: 42)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة"

وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ، فَقَدْ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهِمْ حَقَّانِ: الطَّاعَةُ1 وَالنُّصْرَةُ2 مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ.

وَالَّذِي يَتَغَيَّرُ بِهِ حَالُهُ فَيَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْإِمَامَةِ شَيْئَانِ:

أَحَدُهُمَا: جَرْحٌ فِي عَدَالَتِهِ.

وَالثَّانِي: نَقْصٌ فِي بَدَنِهِ، فَأَمَّا الْجَرْحُ فِي عَدَالَتِهِ وَهُوَ الْفِسْقُ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا تَابَعَ فِيهِ الشَّهْوَةَ.

وَالثَّانِي: مَا تَعَلَّقَ فِيهِ بِشُبْهَةٍ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ مِنْهُمَا فَمُتَعَلِّقٌ بِأَفْعَالِ الْجَوَارِحِ، وَهُوَ ارْتِكَابُهُ لِلْمَحْظُورَاتِ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْمُنْكَرَاتِ تَحْكِيمًا لِلشَّهْوَةِ وَانْقِيَادًا لِلْهَوَى، فَهَذَا فِسْقٌ يَمْنَعُ مِنِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَمِنِ اسْتِدَامَتِهَا، فَإِذَا طَرَأَ عَلَى مَنِ انْعَقَدَتْ إِمَامَتُهُ خَرَجَ مِنْهَا، فَلَوْ عَادَ إِلَى الْعَدَالَةِ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِمَامَةِ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: يَعُودُ إِلَى الْإِمَامَةِ بِعَوْدِهِ إِلَى الْعَدَالَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ لَهُ عَقْدٌ وَلَا بَيْعَةٌ؛ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ وَلُحُوقِ الْمَشَقَّةِ فِي اسْتِئْنَافِ بَيْعَتِهِ.

وَأَمَّا الثَّانِي مِنْهُمَا: فَمُتَعَلِّقٌ بِالِاعْتِقَادِ الْمُتَأَوَّلِ بِشُبْهَةٍ تَعْتَرِضُ، فَيَتَأَوَّلُ لَهَا خِلَافَ الْحَقِّ،

---

1 قلت: إلّا أنَّ هذه الطاعة ليست مطلقة، بل هي مقيَّدة بموافقتها للشرع، والنصوص الواردة في ذلك كثيرة، منها: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السمع والطاعة حقٌّ ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"، وفي رواية: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره إلّا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"، وعن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدّث أنَّها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: "ولو استُعْمِلَ عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا"، إلى آخر هذه النصوص الصحيحة.

2 قلت: ومن باب نصرة الخليفة أو الحاكم النصح له، وذلك واجب على كل مسلم، فعن تميم الداري أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم".

পরিচ্ছেদ: "খলিফার প্রতি উম্মাহর কর্তব্যসমূহ"
ইমাম যখন উম্মাহর অধিকারসমূহ সংক্রান্ত আমাদের আলোচিত দায়িত্বগুলো পালন করেন, তখন তিনি তাদের প্রাপ্য এবং তাদের ওপর অর্পিত বিষয়ে মহান আল্লাহর হক আদায় করলেন। এমতাবস্থায় উম্মাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য দুটি অধিকার সাব্যস্ত হওয়া ওয়াজিব: আনুগত্য এবং সহায়তা, যতক্ষণ না তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।
যে সকল কারণে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং ইমামত বাতিল হয়ে যায়, তা দুটি বিষয়:
এক: তাঁর ন্যায়নিষ্ঠায় আঘাত হানা।
দুই: শারীরিক কোনো ত্রুটি। আর ন্যায়নিষ্ঠায় আঘাত তথা পাপাচার দুই প্রকার:
প্রথমটি: যাতে সে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে।
দ্বিতীয়টি: যা কোনো সংশয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রথমটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর তা হলো কুপ্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশির বশবর্তী হয়ে নিষিদ্ধ কার্যে লিপ্ত হওয়া এবং গর্হিত কাজ করা। এই পাপাচার ইমামত সাব্যস্ত হওয়া এবং তা স্থায়ী হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায়। সুতরাং যাঁর ইমামত সাব্যস্ত হয়েছিল, তাঁর মধ্যে যদি এই অবস্থার উদ্ভব হয়, তবে তিনি ইমামত থেকে বিচ্যুত হবেন। এরপর তিনি যদি পুনরায় ন্যায়নিষ্ঠায় ফিরে আসেন, তবে নতুন করে চুক্তি সম্পাদন ব্যতীত তিনি ইমামতের পদে পুনর্বহাল হবেন না।
কোনো কোনো কালামশাস্ত্রবিদ বলেছেন: ন্যায়নিষ্ঠায় ফিরে আসার মাধ্যমে তিনি পুনরায় ইমামতের পদে আসীন হবেন, এজন্য নতুন কোনো চুক্তি বা বায়আতের প্রয়োজন নেই; কারণ তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপকতা এবং পুনরায় বায়আত গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা বিদ্যমান।
আর দ্বিতীয়টি ভ্রান্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিশ্বাসগত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা কোনো সংশয়ের কারণে সৃষ্টি হয়। ফলে সে সত্যের বিপরীতে ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে,

---

১ আমি বলছি: তবে এই আনুগত্য নিঃশর্ত নয়, বরং তা শরিয়তের অনুকূলে হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত। এ বিষয়ে অনেক দলিল বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) বলেছেন: "শোনা এবং আনুগত্য করা ততক্ষণ পর্যন্ত হক, যতক্ষণ না

পাপাচারের নির্দেশ দেওয়া হয়। যখন পাপাচারের নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন আর শোনা এবং আনুগত্য করা যাবে না।" অন্য বর্ণনায় আছে: "একজন মুসলিম ব্যক্তির ওপর শোনা এবং আনুগত্য করা আবশ্যক, যা সে পছন্দ করে বা অপছন্দ করে—ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তাকে পাপাচারের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি পাপাচারের নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে শোনা ও আনুগত্যের অবকাশ নেই।" ইয়াহইয়া ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আমার দাদিকে বলতে শুনেছি যে, তিনি নবী (সা.)-কে বিদায় হজ্জে ভাষণ দিতে শুনেছেন, তিনি বলছিলেন: "যদি তোমাদের ওপর কোনো ক্রীতদাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করে, তবে তোমরা তাঁর কথা শোনো ও আনুগত্য করো।"—এই জাতীয় আরও সহিহ দলিলসমূহ বিদ্যমান।

২ আমি বলছি: খলিফা বা শাসককে সহায়তা করার অন্যতম দিক হলো তাঁকে সদুপদেশ দেওয়া। এটি প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ওয়াজিব। তামীম আদ-দারি থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন: "দীন হলো নসিহত (সদুপদেশ)।" আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: কার জন্য? তিনি বললেন: "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলিমদের ইমাম ও সাধারণ জনগণের জন্য।"

(ص: 43)الأحكام السلطانية للماوردي

فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا.

فَذَهَبَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهَا تَمْنَعُ مِنِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَمِنِ اسْتِدَامَتِهَا وَيَخْرُجُ بِحُدُوثِهِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَوَى حُكْمُ الْكُفْرِ بِتَأْوِيلٍ وَغَيْرِ تَأْوِيلٍ وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ حَالُ الْفِسْقِ بِتَأْوِيلٍ وَغَيْرِ تَأْوِيلٍ.

وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْبَصْرَةِ: إِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَلَا يُخْرَجُ بِهِ مِنْهَا، كَمَا لَا يَمْنَعُ مِنْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَجَوَازِ الشَّهَادَةِ.

وَأَمَّا مَا طَرَأَ عَلَى بَدَنِهِ مِنْ نَقْصٍ فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: نَقْصُ الْحَوَاسِّ، وَالثَّانِي: نَقْصُ الْأَعْضَاءِ، وَالثَّالِثُ: نَقْصُ التَّصَرُّفِ.
فَأَمَّا نَقْصُ الْحَوَاسِّ فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:
قِسْمٌ يَمْنَعُ مِنَ الْإِمَامَةِ، وَقِسْمٌ لَا يَمْنَعُ مِنْهَا، وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
فَأَمَّا الْقِسْمُ الْمَانِعُ مِنْهَا فَشَيْئَانِ:
أَحَدُهُمَا: زَوَالُ الْعَقْلِ، وَالثَّانِي: ذَهَابُ الْبَصَرِ. فَأَمَّا زَوَالُ الْعَقْلِ فَضَرْبَانِ:
أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ عَارِضًا مَرْجُوَّ الزَّوَالِ كَالْإِغْمَاءِ، فَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنَ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ، وَلَا يُخْرِجُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ مَرَضٌ قَلِيلُ اللُّبْسِ، سَرِيعُ الزَّوَالِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ.
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا كَانَ لَازِمًا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ؛ كَالْجُنُونِ وَالْخَبَلِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُطْبِقًا دَائِمًا لَا يَتَخَلَّلُهُ إِفَاقَةٌ، فَهَذَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَاسْتِدَامَتِهَا، فَإِذَا طَرَأَ هَذَا بَطَلَتْ بِهِ الْإِمَامَةُ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ وَالْقَطْعِ بِهِ.
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَتَخَلَّلَهُ إِفَاقَةٌ يَعُودُ بِهَا إِلَى حَالِ السَّلَامَةِ فَيُنْظَرُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ زَمَانُ الْخَبَلِ أَكْثَرَ مِنْ زَمَانِ الْإِفَاقَةِ فَهُوَ كَالْمُسْتَدِيمِ يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَاسْتِدَامَتِهَا، وَيُخْرِجُ بِحُدُوثِهِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ زَمَانُ الْإِفَاقَةِ أَكْثَرَ مِنْ زَمَانِ الْخَبَلِ مَنَعَ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ.
وَاخْتُلِفَ فِي مَنْعِهِ مِنَ اسْتِدَامَتِهَا، فَقِيلَ: يَمْنَعُ مِنَ اسْتِدَامَتِهَا كَمَا يَمْنَعُ مِنَ ابْتِدَائِهَا، فَإِذَا طَرَأَ بَطَلَتْ بِهِ الْإِمَامَةُ؛ لِأَنَّ فِي اسْتِدَامَتِهِ إِخْلَالًا بِالنَّظَرِ الْمُسْتَحَقِّ فِيهِ، وَقِيلَ: لَا يَمْنَعُ مِنَ اسْتِدَامَةِ الْإِمَامَةِ، وَإِنْ مَنَعَ مِنْ عَقْدِهَا فِي الِابْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ يُرَاعِي فِي ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا سَلَامَةً كَامِلَةً

এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।
তাঁদের একটি দল মনে করেন যে, এটি ইমামত (নেতৃত্ব) প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তা বজায় থাকার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক এবং এর উপস্থিতিতে ইমামত বাতিল হয়ে যায়; কেননা কোনো ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কুফর হোক কিংবা ব্যাখ্যা ছাড়াই হোক—উভয় ক্ষেত্রেই বিধান যখন সমান,

তখন ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হওয়া ফিসক (পাপাচার) কিংবা ব্যাখ্যা ব্যতীত ফিসকের বিধানও অভিন্ন হওয়া আবশ্যক।

বসরা'র অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বলেন: এটি ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয় এবং এর কারণে তিনি ইমামত থেকে বিচ্যুত হবেন না; ঠিক যেমন এটি বিচারকের দায়িত্ব লাভ কিংবা সাক্ষ্য প্রদানের বৈধতার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক নয়।

আর তাঁর দেহে যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তা তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথমটি: ইন্দ্রিয়শক্তির ত্রুটি; দ্বিতীয়টি: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটি এবং তৃতীয়টি: কার্যক্ষমতার ত্রুটি।

ইন্দ্রিয়শক্তির ত্রুটি পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত:

এক প্রকার যা ইমামতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক, এক প্রকার যা প্রতিবন্ধক নয় এবং এক প্রকার যার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ইমামতের প্রতিবন্ধক অংশটি দুটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত:

একটি হলো বুদ্ধিবৃত্তিক লোপ পাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো দৃষ্টিশক্তি হারানো। বুদ্ধিবৃত্তিক লোপ আবার দুই প্রকার:

প্রথমটি: যা সাময়িক এবং দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন মূর্ছা যাওয়া। এটি ইমামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয় এবং এর কারণে ইমামত বাতিলও হয় না; কেননা এটি ক্ষণস্থায়ী অসুস্থতা এবং দ্রুত সেরে যায়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অসুস্থতাকালীন সময়ে মূর্ছা গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় প্রকার: যা স্থায়ী এবং দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নেই; যেমন উন্মাদনা বা মস্তিষ্কবিকৃতি। এটিও আবার দুই প্রকার:

এর একটি হলো অবিরাম উন্মাদনা, যাতে সুস্থ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এটি ইমামত গঠন এবং তা স্থায়ী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। যদি এটি ঘটে যায়, তবে নিশ্চিতভাবে তা প্রমাণিত হওয়ার পর ইমামত বাতিল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রকারটি হলো, যাতে মাঝেমধ্যে সুস্থতা ফিরে আসে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে: যদি অসুস্থতার সময় সুস্থতার সময়ের চেয়ে দীর্ঘ হয়, তবে এটি স্থায়ী উন্মাদনার মতোই বিবেচিত হবে, যা ইমামত গঠন ও স্থায়ী হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক এবং এর আবির্ভাবে ইমামত রহিত হয়ে যাবে। আর যদি সুস্থতার সময় অসুস্থতার সময়ের চেয়ে বেশি হয়, তবে তা কেবল ইমামত গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে।

কিন্তু ইমামত বজায় থাকার ক্ষেত্রে এটি বাধা হবে কি না তা নিয়ে মতভেদ আছে। বলা হয়েছে: এটি ইমামত অব্যাহত থাকার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক হবে যেমনটি শুরুর ক্ষেত্রে ছিল। সুতরাং এটি দেখা দিলে ইমামত বাতিল হয়ে যাবে; কারণ এর স্থিতিশীলতায় ইমামতের আবশ্যিক দায়িত্ব পালনে ত্রুটি দেখা দেবে। আবার বলা হয়েছে: এটি ইমামত বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাধা হবে না, যদিও শুরুতে ইমামত গঠনের ক্ষেত্রে বাধা ছিল; কেননা চুক্তি বা নিয়োগের সূচনালগ্নে পূর্ণ সুস্থতা বিবেচনা করা হয়।

(ص: 44)الأحكام السلطانية للماوردي

وَفِي الْخُرُوجِ مِنْهَا نَقْصٌ كَامِلٌ.

وَأَمَّا ذَهَابُ الْبَصَرِ فَيَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَاسْتِدَامَتِهَا، فَإِذَا طَرَأَ بَطَلَتْ بِهِ الْإِمَامَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَبْطَلَ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ، وَمَنَعَ مِنْ جَوَازِ الشَّهَادَةِ، فَأَوْلَى أَنْ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْإِمَامَةِ، وَأَمَّا عَشَاءُ الْعَيْنِ وَهُوَ أَنْ لَا يُبْصِرَ عِنْدَ دُخُولِ اللَّيْلِ، فَلَا يَمْنَعُ مِنَ الْإِمَامَةِ فِي عَقْدٍ وَلَا اسْتِدَامَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَرَضٌ فِي زَمَانِ الدَّعَةِ يُرْجَى زَوَالُهُ.

وَأَمَّا ضَعْفُ الْبَصَرِ، فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ بِهِ الْأَشْخَاصَ إِذَا رَآهَا لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الْإِمَامَةِ، وَإِنْ كَانَ يُدْرِكُ الْأَشْخَاصَ وَلَا يَعْرِفُهَا مُنِعَ مِنَ الْإِمَامَةِ عَقْدًا وَاسْتِدَامَةً.

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْحَوَاسِّ الَّتِي لَا يُؤَثِّرُ فَقْدُهَا فِي الْإِمَامَةِ فَشَيْئَانِ:

أَحَدُهُمَا: الْخَشْمُ فِي الْأَنْفِ الَّذِي لَا يُدْرِكُ بِهِ شَمَّ الرَّوَائِحِ.

وَالثَّانِي: فَقْدُ الذَّوْقِ الَّذِي يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الطُّعُومِ، فَلَا يُؤَثِّرُ عَلَى هَذَا فِي عَقْدِ الْإِمَامَةِ؛ لِأَنَّهُمَا يُؤَثِّرَانِ فِي اللَّذَّةِ وَلَا يُؤَثِّرَانِ فِي الرَّأْيِ وَالْعَمَلِ.

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مِنَ الْحَوَاسِّ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فَشَيْئَانِ:

الصَّمَمُ وَالْخَرَسُ فَيَمْنَعَانِ مِنِ ابْتِدَاءِ عَقْدِ الْإِمَامَةِ؛ لِأَنَّ كَمَالَ الْأَوْصَافِ بِوُجُودِهِمَا مَفْقُودٌ، وَاخْتُلِفَ فِي الْخُرُوجِ بِهِمَا مِنَ الْإِمَامَةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَخْرُجُ بِهِمَا مِنْهَا كَمَا يَخْرُجُ بِذَهَابِ الْبَصَرِ لِتَأْثِيرِهِمَا فِي التَّدْبِيرِ وَالْعَمَلِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَخْرُجُ بِهِمَا مِنَ الْإِمَامَةِ لِقِيَامِ الْإِشَارَةِ مَقَامَهُمَا، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا إِلَّا بِنَقْصٍ كَامِلٍ، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنْ كَانَ يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ لَمْ يَخْرُجْ بِهِمَا مِنَ الْإِمَامَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا خَرَجَ مِنَ الْإِمَامَةِ بِهِمَا؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مَفْهُومَةٌ وَالْإِشَارَةُ مَوْهُومَةٌ، وَالْأَوَّلُ مِنَ الْمَذَاهِبِ أَصَحُّ.

وَأَمَّا تَمْتَمَةُ اللِّسَانِ وَثِقَلُ السَّمْعِ مِنْ إِدْرَاكِ الصَّوْتِ إِذَا كَانَ عَالِيًا فَلَا يَخْرُجُ بِهِمَا مِنَ الْإِمَامَةِ إِذَا حَدَثَا، وَاخْتُلِفَ فِي ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا مَعَهُمَا، فَقِيلَ بِمَنْعِ ذَلِكَ مِنِ ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا؛ لِأَنَّهُمَا نَقْصٌ يَخْرُجُ بِهِمَا عَنْ حَالِ الْكَمَالِ، وَقِيلَ: لَا يَمْنَعُ؛ لِأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مُوسَى عليه السلام لَمْ تَمْنَعْهُ عُقْدَةُ لِسَانِهِ عَنِ النُّبُوَّةِ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنَ الْإِمَامَةِ.

এবং এর মাধ্যমে তা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ক্ষেত্রে এটি পূর্ণাঙ্গ ত্রুটি হিসেবে গণ্য হবে।

আর দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার বিষয়টি ইমামতের চুক্তি সম্পাদন এবং তা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। সুতরাং যদি তা আকস্মিকভাবে ঘটে, তবে তার ফলে ইমামত বাতিল হয়ে যাবে; কারণ এটি যখন বিচারকের দায়িত্বকে বাতিল করে দেয় এবং সাক্ষ্য প্রদানের বৈধতাকে বাধাগ্রস্ত করে, তখন ইমামতের শুদ্ধতাকে বাধাগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে এটি অধিকতর অগ্রগণ্য। আর রাতকানা রোগের ক্ষেত্রে—যা হলো রাতের শুরুতে দেখতে না পাওয়া—তা ইমামতের চুক্তি সম্পাদন বা তা স্থায়ী রাখার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়; কারণ এটি প্রশান্তির সময়ে সংঘটিত একটি ব্যাধি যা দূরীভূত হওয়ার আশা করা যায়।

আর দৃষ্টির দুর্বলতার বিষয়ে কথা হলো, যদি তিনি এর মাধ্যমে ব্যক্তিদের দেখে চিনতে পারেন, তবে তা ইমামতের জন্য প্রতিবন্ধক হবে না। আর যদি তিনি ব্যক্তিদের অবয়ব উপলব্ধি করতে পারেন কিন্তু তাদের চিনতে না পারেন, তবে ইমামত চুক্তি ও তার স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে তা প্রতিবন্ধক হবে।

আর ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বিতীয় প্রকার—যেগুলোর বিলুপ্তি ইমামতের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না—তা হলো দুটি বিষয়:

তার একটি হলো: ঘ্রাণশক্তিহীনতা, যার ফলে কোনো প্রকার ঘ্রাণ অনুভব করা যায় না। দ্বিতীয়টি হলো: স্বাদ গ্রহণের শক্তি হারানো, যার মাধ্যমে খাদ্যের বিভিন্ন স্বাদের পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। ইমামতের চুক্তির ক্ষেত্রে এটি কোনো প্রভাব ফেলবে না; কারণ এ দুটি বিষয় কেবল স্বাদ ও আনন্দের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মতৎপরতায় কোনো প্রভাব ফেলে না।

আর তৃতীয় প্রকার হলো: সেই সব ইন্দ্রিয় যেগুলোর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, আর তা হলো দুটি বিষয়:

বধিরতা ও মূকতা; এ দুটি বিষয় ইমামতের চুক্তি প্রারম্ভেই বাধা সৃষ্টি করে। কারণ এ দুটির উপস্থিতিতে গুণাবলির পূর্ণতা বজায় থাকে না। তবে এ দুটির কারণে ইমামত থেকে অপসারিত হওয়া প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে; একদল উলামা বলেছেন: এ দুটির কারণে তিনি ইমামত থেকে অপসারিত হবেন, যেমন দৃষ্টিশক্তি চলে গেলে অপসারিত হন; কারণ এ দুটি প্রশাসনিক পরিচালনা ও কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

অন্যরা বলেছেন: এ দুটির কারণে তিনি ইমামত থেকে অপসারিত হবেন না, কারণ ইশারা-ইঙ্গিত এ দুটির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে; সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ত্রুটি ছাড়া তিনি অপসারিত হবেন না। আবার অন্য একদল বলেছেন: যদি তিনি সুন্দরভাবে লিখতে পারেন তবে এ দুটির কারণে ইমামত থেকে অপসারিত হবেন না, আর যদি লিখতে না পারেন তবে অপসারিত হবেন; কারণ লিখনী সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে আর ইশারা কেবল অস্পষ্ট ধারণা দেয়। তবে মতগুলোর মধ্যে প্রথমটিই অধিকতর সঠিক।

আর জিহ্বার জড়তা এবং শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা—অর্থাৎ উচ্চস্বরে বলা হলে শুনতে পাওয়া—যদি পরবর্তীতে ঘটে তবে এগুলোর কারণে ইমামত থেকে অপসারিত হবেন না। তবে এ দুটি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ইমামতের চুক্তি প্রারম্ভের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে; একমতে বলা হয়েছে, এটি ইমামতের চুক্তি প্রারম্ভে বাধা দেবে, কারণ এগুলো এমন ত্রুটি যা পূর্ণাঙ্গ অবস্থা থেকে বিচ্যুত করে দেয়। আবার অন্য মতে বলা হয়েছে: তা বাধা দেবে না; কারণ আল্লাহর নবী মুসা (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর জিহ্বার জড়তা তাঁকে নবুয়তের দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়নি, সুতরাং ইমামতের ক্ষেত্রে তা বাধা না হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

فَصْلٌ:

وَأَمَّا فَقْدُ الْأَعْضَاءِ فَيَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا لَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْإِمَامَةِ فِي عَقْدٍ وَلَا اسْتِدَامَةٍ، وَهُوَ مَا لَا يُؤَثِّرُ فَقْدُهُ فِي رَأْيٍ وَلَا عَمَلٍ وَلَا نُهُوضٍ، وَلَا يَشِينُ فِي الْمَنْظَرِ، وَذَلِكَ مِثْلُ قَطْعِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَلَا مِنِ اسْتِدَامَتِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ فَقْدَ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ يُؤَثِّرُ فِي التَّنَاسُلِ دُونَ الرَّأْيِ وَالْحِنْكَةِ، فَيَجْرِي مَجْرَى الْعُنَّةِ، وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِذَلِكَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ} [آل عمران: 39] .

وَفِي الْحَصُورِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ الْعِنِّينُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ النِّسَاءِ، قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ.

وَالثَّانِي: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَكَرٌ يَغْشَى بِهِ النِّسَاءَ، أَوْ كَانَ كَالنَّوَاةِ، قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، فَلَمَّا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنَ الْإِمَامَةِ، وَكَذَلِكَ قَطْعُ الْأُذُنَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُؤَثِّرَانِ فِي رَأْيٍ وَلَا عَمَلٍ، وَلَهُمَا شَيْنٌ خَفِيٌّ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَتِرَ فَلَا يَظْهَرَ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَمِنَ اسْتِدَامَتِهَا، وَهُوَ مَا يَمْنَعُ مِنَ الْعَمَلِ كَذَهَابِ الْيَدَيْنِ أَوْ مِنَ النُّهُوضِ، كَذَهَابِ الرِّجْلَيْنِ، فَلَا تَصِحُّ مَعَهُ الْإِمَامَةُ فِي عَقْدٍ وَلَا اسْتِدَامَةٍ؛ لِعَجْزِهِ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ فِي عِلْمٍ أَوْ نَهْضَةٍ.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ، وَاخْتُلِفَ فِي مَنْعِهِ مِنَ اسْتِدَامَتِهَا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ بِهِ بَعْضُ الْعَمَلِ أَوْ فَقَدَ بِهِ بَعْضَ النُّهُوضِ، كَذَهَابِ إِحْدَى الْيَدَيْنِ أَوْ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ، فَلَا يَصِحُّ مَعَهُ عَقْدُ الْإِمَامَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ كَمَالِ التَّصَرُّفِ، فَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ عَقْدِ الْإِمَامَةِ فَفِي خُرُوجِهِ مِنْهَا مَذْهَبَانِ لِلْفُقَهَاءِ:

أَحَدُهُمَا: يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْإِمَامَةِ؛ لِأَنَّهُ عَجْزٌ يَمْنَعُ مِنَ ابْتِدَائِهَا فَمَنَعَ مِنَ اسْتِدَامَتِهَا.
وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْإِمَامَةِ وَإِنْ مَنَعَ مِنْ عَقْدِهَا، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي عَقْدِهَا كَمَالُ السَّلَامَةِ، وَفِي الْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَالُ النَّقْصِ.
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا لَا يَمْنَعُ مِنَ اسْتِدَامَةِ الْإِمَامَةِ، وَاخْتُلِفَ فِي مَنْعِهِ مِنَ ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا وَهُوَ

পরিচ্ছেদ:
আর অঙ্গহানি বা অঙ্গের অভাব চার ভাগে বিভক্ত:
প্রথমটি: যা ইমামতের চুক্তি (নিয়োগ) বা তার স্থায়িত্ব—কোনোটির বৈধতাতেই বাধা সৃষ্টি করে না। এটি এমন অঙ্গহানি যা চিন্তা-গবেষণা, কর্মতৎপরতা বা চলাফেরায় প্রভাব ফেলে না এবং বাহ্যিক অবয়বেও কোনো বিকৃতি বা ত্রুটি প্রকাশ করে না। যেমন লিঙ্গ বা অণ্ডকোষ কর্তিত হওয়া। এটি ইমামতের চুক্তিতে বা চুক্তির পর তার স্থায়িত্বে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না; কারণ এই অঙ্গ দুটির অনুপস্থিতি প্রজনন ক্ষমতায় প্রভাব ফেললেও মেধা বা অভিজ্ঞতায় কোনো প্রভাব ফেলে না। ফলে এটি যৌন অক্ষমতার পর্যায়ভুক্ত হবে। আর আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়া বিন জাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-কে এই গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন: {এবং তিনি হবেন নেতা, প্রবৃত্তি সংবরণকারী এবং পুণ্যবানদের মধ্য হতে একজন নবী।} [আলে ইমরান: ৩৯] ।
'প্রবৃত্তি সংবরণকারী' (হাসুর) শব্দের ব্যাখ্যায় দুটি অভিমত রয়েছে:
প্রথমটি: তিনি এমন পৌরুষহীন ব্যক্তি যিনি স্ত্রী গমনে সক্ষম নন। ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথা বলেছেন।
দ্বিতীয়টি: যাঁর কোনো পুরুষাঙ্গ নেই যা দিয়ে তিনি স্ত্রী সহবাস করতে পারেন, অথবা যার পুরুষাঙ্গ খেজুরের বিচির মতো (ক্ষুদ্র)। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) এ কথা বলেছেন।
যেহেতু এটি নবুওয়াতের পথে বাধা হয়নি, তাই ইমামতের ক্ষেত্রে বাধা না হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। অনুরূপভাবে কান দুটি কাটা যাওয়াও (প্রতিবন্ধকতা নয়); কারণ তা মেধা বা কর্মক্ষমতায় প্রভাব ফেলে না এবং এর মাধ্যমে যে ত্রুটি সৃষ্টি হয় তা লুকানো সম্ভব, ফলে তা প্রকাশ পায় না।

দ্বিতীয় প্রকার: যা ইমামতের চুক্তি এবং তার স্থায়িত্ব—উভয় ক্ষেত্রেই বাধা প্রদান করে। তা হলো এমন অভাব যা কর্মক্ষমতা রহিত করে দেয়, যেমন উভয় হাত না থাকা; অথবা চলাফেরায় অক্ষম করে দেয়, যেমন উভয় পা না থাকা। এক্ষেত্রে নিয়োগ বা স্থায়িত্ব কোনোভাবেই ইমামত বৈধ হবে না; কারণ উম্মাহর অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানগত বা কর্মগত তৎপরতায় তিনি অক্ষম।

তৃতীয় প্রকার: যা ইমামতের চুক্তি সম্পাদনে বাধা দেয়, তবে তার স্থায়িত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাধার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তা হলো এমন ত্রুটি যার ফলে কর্মক্ষমতা আংশিক লোপ পায় অথবা চলাফেরায় কিছুটা সমস্যা হয়, যেমন এক হাত বা এক পা না থাকা। এমতাবস্থায় পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব পরিচালনায় অক্ষমতার কারণে ইমামতের চুক্তি সম্পাদন বৈধ হবে না। যদি ইমামতের চুক্তির পর এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, তবে পদচ্যুত হওয়ার বিষয়ে ফকিহগণের দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি: এর দ্বারা তিনি ইমামত থেকে চ্যুত হবেন; কারণ এটি এমন এক অক্ষমতা যা ইমামতের সূচনায় বাধা প্রদান করে, সুতরাং তা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও বাধা হবে।

দ্বিতীয় মতটি হলো: তিনি ইমামত থেকে চ্যুত হবেন না, যদিও তা ইমামতের নতুন চুক্তিতে বাধা প্রদান করে। কেননা নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সুস্থতা বিচার্য, আর পদচ্যুতির ক্ষেত্রে বিচার্য হলো পূর্ণাঙ্গ ত্রুটি বা অক্ষমতা।

চতুর্থ প্রকার: যা ইমামতের স্থায়িত্বে বাধা দেয় না, তবে এর সূচনায় (নিয়োগের চুক্তিতে) বাধার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, আর তা হলো

(ص: 46)الأحكام السلطانية للماوردي

مَا شَانَ وَقَبَّحَ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي عَمَلٍ وَلَا فِي نَهْضَةٍ، كَجَدْعِ الْأَنْفِ وَسَمْلِ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، فَلَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْإِمَامَةِ بَعْدَ عَقْدِهَا؛ لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا.

وَفِي مَنْعِهِ مِنَ ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا مَذْهَبَانِ لِلْفُقَهَاءِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا؛ لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فِي حُقُوقِهَا.

وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: إِنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ، وَتَكُونُ السَّلَامَةُ مِنْهُ شَرْطًا مُعْتَبَرًا فِي عَقْدِهَا؛ لِيَسْلَمَ وُلَاةُ الْمِلَّةِ مِنْ شَيْنٍ يُعَابُ وَنَقْصٍ يُزْدَرَى، فَتَقِلُّ بِهِ الْهَيْبَةُ، وَفِي قِلَّتِهَا نُفُورٌ عَنِ الطَّاعَةِ، وَمَا أَدَّى إِلَى هَذَا فَهُوَ نَقْصٌ فِي حُقُوقِ الْأُمَّةِ.

যা রূপকে কলঙ্কিত ও কুৎসিত করে কিন্তু কর্মক্ষমতা কিংবা চলাফেরায় কোনো প্রভাব ফেলে না—যেমন নাসিকা কর্তন কিংবা একটি চোখ অন্ধ হওয়া—তা নেতৃত্বের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ইমামতি বা নেতৃত্ব থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণ হবে না; কেননা এটি নেতৃত্বের কোনো অধিকার বা দায়িত্ব পালনে কোনো প্রভাব ফেলে না।

আর নেতৃত্বের চুক্তি প্রারম্ভিকভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে এ ধরনের ত্রুটি বাধা হবে কি না, সে বিষয়ে ফকিহগণের দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমত: এটি ইমামতির চুক্তি সম্পাদনে বাধা হবে না এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এটি কোনো ধর্তব্য শর্তও নয়; কারণ ইমামতির অধিকারসমূহ আদায়ে এর কোনো প্রভাব নেই।

দ্বিতীয় অভিমত: এটি ইমামতির চুক্তি সম্পাদনে প্রতিবন্ধক হবে এবং এ থেকে মুক্ত থাকা নেতৃত্বের জন্য একটি ধর্তব্য শর্ত হিসেবে গণ্য হবে; যাতে মিল্লাতের নেতৃবৃন্দ এমন কোনো খুঁত থেকে মুক্ত থাকেন যার কারণে নিন্দা করা হয় এবং এমন ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকেন যাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। কারণ এতে গাম্ভীর্য ও প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়, আর গাম্ভীর্য কমে গেলে আনুগত্যের ক্ষেত্রে বিমুখতা সৃষ্টি হয়। আর যা এই পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, তা উম্মাহর অধিকারের ক্ষেত্রে এক প্রকার অপূর্ণতা।

فصل: "في نقصان حرية التصرف"

وَأَمَّا نَقْصُ التَّصَرُّفِ فَضَرْبَانِ: حَجْرٌ وَقَهْرٌ.

فَأَمَّا الْحَجْرُ: فَهُوَ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَعْوَانِهِ مَنْ يَسْتَبِدُّ بِتَنْفِيذِ الْأُمُورِ مِنْ غَيْرِ تَظَاهُرٍ بِمَعْصِيَةٍ، وَلَا مُجَاهَرَةٍ بِمُشَاقَّةٍ، فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ إِمَامَتِهِ، وَلَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ وِلَايَتِهِ، وَلَكِنْ يُنْظَرُ فِي أَفْعَالِ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى أُمُورِهِ، فَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً عَلَى أَحْكَامِ الدِّينِ وَمُقْتَضَى الْعَدْلِ جَازَ إِقْرَارُهُ عَلَيْهَا تَنْفِيذًا لَهَا وَإِمْضَاءً لِأَحْكَامِهَا؛ لِئَلَّا يَقِفَ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ مَا يَعُودُ بِفَسَادٍ عَلَى الْأُمَّةِ.

وَإِنْ كَانَتْ أَفْعَالُهُ خَارِجَةً عَنْ حُكْمِ الدِّينِ وَمُقْتَضَى الْعَدْلِ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ عَلَيْهَا، وَلَزِمَهُ أَنْ يَسْتَنْصِرَ مَنْ يَقْبِضَ يَدَهُ وَيُزِيلَ تَغَلُّبَهُ.

وَأَمَّا الْقَهْرُ: فَهُوَ أَنْ يَصِيرَ مَأْسُورًا فِي يَدِ عَدُوٍّ قَاهِرٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْهُ، فَيَمْنَعُ ذَلِكَ عَنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ لَهُ؛ لِعَجْزِهِ عَنِ النَّظَرِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَدُوُّ مُشْرِكًا أَوْ مُسْلِمًا بَاغِيًا، وَلِلْأُمَّةِ اخْتِيَارُ مَنْ عَدَاهُ مِنْ ذَوِي الْقُدْرَةِ، وَإِنْ أُسِرَ بَعْدَ أَنْ عُقِدَتْ لَهُ الْإِمَامَةُ، فَعَلَى كَافَّةِ الْأُمَّةِ اسْتِنْقَاذُهُ لِمَا أَوْجَبَتْهُ الْإِمَامَةُ مِنْ نُصْرَتِهِ، وَهُوَ عَلَى إِمَامَتِهِ مَا كَانَ مَرْجُوَّ الْخَلَاصِ مَأْمُولَ الْفِكَاكِ، إِمَّا بِقِتَالٍ أَوْ فِدَاءٍ، فَإِنْ وَقَعَ الْإِيَاسُ مِنْهُ لَمْ يَخْلُ حَالُ مَنْ أَسَرَهُ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُشْرِكِينَ أَوْ بُغَاةَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ فِي أَسْرِ الْمُشْرِكِينَ خَرَجَ مِنَ الْإِمَامَةِ لِلْيَأْسِ مِنْ خَلَاصِهِ، وَاسْتَأْنَفَ أَهْلُ الِاخْتِيَارِ بَيْعَةَ غَيْرِهِ عَلَى الْإِمَامَةِ.

فَإِنْ عَهِدَ بِالْإِمَامَةِ فِي حَالِ أَسْرِهِ نُظِرَ فِي عَهْدِهِ؛ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْإِيَاسِ مِنْ خَلَاصِهِ كَانَ عَهْدُهُ بَاطِلًا؛ لِأَنَّهُ عَهِدَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْإِمَامَةِ، فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ عَهْدٌ، وَإِنْ عَهِدَ قَبْلَ الْإِيَاسِ مِنْ خَلَاصِهِ وَقْتَ هُوَ فِيهِ مَرْجُوَّ الْخَلَاصِ صَحَّ عَهْدُهُ لِبَقَاءِ إِمَامَتِهِ، وَاسْتَقَرَّتْ إِمَامَةُ وَلِيِّ عَهْدِهِ بِالْإِيَاسِ مِنْ خَلَاصِهِ لِزَوَالِ إِمَامَتِهِ، فَلَوْ خَلَصَ مِنْ أَسْرِهِ بَعْدَ عَهْدِهِ نُظِرَ فِي خَلَاصِهِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْإِيَاسِ مِنْهُ لَمْ يَعُدْ إِلَى إِمَامَتِهِ؛ لِخُرُوجِهِ مِنْهَا بِالْإِيَاسِ، وَاسْتَقَرَّتْ فِي وَلِيِّ عَهْدِهِ، وَإِنْ خَلَصَ قَبْلَ الْإِيَاسِ فَهُوَ عَلَى إِمَامَتِهِ، وَيَكُونُ الْعَهْدُ فِي وَلِيِّ الْعَهْدِ ثَابِتًا وَإِنْ لَمْ يَصِرْ إِمَامًا.

وَإِنْ كَانَ مَأْسُورًا مَعَ بُغَاةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ مَرْجُوَّ الْخَلَاصِ فَهُوَ عَلَى إِمَامَتِهِ، وَإِنْ لَمْ

পরিচ্ছেদ: পরিচালনার স্বাধীনতা হ্রাস পাওয়া প্রসঙ্গে

পরিচালনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি দুই প্রকার: নিয়ন্ত্রণ ও পরাভূত হওয়া।

পক্ষান্তরে নিয়ন্ত্রণ (হাজর) হলো, ইমামের সহযোগীদের মধ্য থেকে এমন কেউ তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করা যে অবাধ্যতা বা প্রকাশ্য শত্রুতা প্রদর্শন ছাড়াই রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদনে একক কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এটি তাঁর ইমামতের পথে অন্তরায় হয় না এবং তাঁর কর্তৃত্বের বৈধতাকেও ক্ষুণ্ন করে না। তবে যাঁর হাতে বিষয়াবলির কর্তৃত্ব চলে গেছে তাঁর কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে; যদি তা দ্বীনের বিধান ও ইনসাফের অনুসরণে পরিচালিত হয়, তবে উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর দ্বীনী বিষয়গুলো যাতে স্থবির হয়ে না পড়ে, সেজন্য সেই সিদ্ধান্তসমূহ বহাল রাখা ও কার্যকর করা বৈধ হবে।

কিন্তু যদি তাঁর কার্যাবলি দ্বীনের বিধান ও ইনসাফের পরিপন্থী হয়, তবে তা বহাল রাখা জায়েজ হবে না; এমতাবস্থায় ইমামের ওপর কর্তব্য হলো এমন কারো সাহায্য গ্রহণ করা যে ওই ব্যক্তির প্রভাব খর্ব করবে এবং তাঁর একক আধিপত্য দূর করবে।

আর পরাভূত হওয়া (কাহর) হলো, ইমাম কোনো প্রবল শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া এবং সেখান থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম না হওয়া। এটি তাঁর জন্য ইমামতের চুক্তি সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে, কারণ তিনি মুসলিমদের বিষয়াবলি তত্ত্বাবধানে অক্ষম। শত্রু মুশরিক হোক কিংবা বিদ্রোহী মুসলিম হোক (উভয় ক্ষেত্রেই বিধান এক)। এমতাবস্থায় সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অন্য কাউকে মনোনীত করার অধিকার উম্মাহর রয়েছে। যদি ইমামতের চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি বন্দী হন, তবে ইমামতের হকের কারণে তাঁকে সাহায্য করা যেহেতু ওয়াজিব, তাই তাঁকে মুক্ত করা সমগ্র উম্মাহর ওপর বাধ্যতামূলক। যুদ্ধ কিংবা মুক্তিপণ—যেকোনো উপায়ে তাঁর মুক্তির আশা করা পর্যন্ত তিনি তাঁর ইমামত পদে বহাল থাকবেন। কিন্তু যদি তাঁর মুক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হতে হয়, তবে বন্দীকারী পক্ষ হয় মুশরিক হবে অথবা বিদ্রোহী মুসলিম। যদি তিনি মুশরিকদের হাতে বন্দী থাকেন, তবে তাঁর মুক্তির বিষয়ে নিরাশ হওয়ার কারণে তিনি ইমামত থেকে চ্যুত হবেন এবং যোগ্য নির্বাচকমণ্ডলী নতুন কারো কাছে ইমামতের বায়আত গ্রহণ করবেন।

তিনি যদি বন্দী অবস্থায় কাউকে ইমাম মনোনীত করেন, তবে তাঁর সেই মনোনয়নের সময়কাল লক্ষ্য করতে হবে। যদি মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার পর তিনি কাউকে মনোনীত করেন,

তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে; কারণ তখন তিনি আর ইমাম পদে নেই, তাই তাঁর পক্ষ থেকে কোনো মনোনয়ন কার্যকর হবে না। আর যদি তিনি নিরাশ হওয়ার পূর্বে এমন সময় কাউকে মনোনীত করেন যখন মুক্তির আশা ছিল, তবে তাঁর ইমামত বহাল থাকার কারণে মনোনয়নটি সঠিক হবে। অতঃপর নিরাশ হওয়ার সাথে সাথে তাঁর ইমামত রহিত হয়ে উত্তরাধিকারী মনোনীত ব্যক্তির ইমামত স্থায়ী হবে। যদি কাউকে মনোনীত করার পর তিনি বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পান, তবে দেখতে হবে মুক্তির সময়কাল কোনটি। যদি নিরাশ হওয়ার পর তিনি মুক্ত হন, তবে তিনি আর পূর্বের পদে ফিরে পাবেন না; কারণ নিরাশ হওয়ার মাধ্যমেই তিনি চ্যুত হয়ে গেছেন এবং তাঁর উত্তরসূরির পদ স্থায়ী হয়ে গেছে। আর যদি নিরাশ হওয়ার পূর্বেই তিনি মুক্ত হন, তবে তিনি তাঁর ইমামত পদে বহাল থাকবেন এবং মনোনীত উত্তরসূরির মনোনয়ন বহাল থাকবে যদিও তিনি তৎক্ষণাৎ ইমাম হবেন না।
আর তিনি যদি বিদ্রোহী মুসলিমদের হাতে বন্দী হন, তবে মুক্তির আশা থাকলে তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। আর যদি...

(ص: 48)الأحكام السلطانية للماوردي

يُرْجَ خَلَاصُهُ لَمْ يَخْلُ حَالُ الْبُغَاةِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونُوا نَصَّبُوا لِأَنْفُسِهِمْ إمَامًا أَوْ لَمْ يُنَصِّبُوا. فَإِنْ كَانُوا فَوْضَى لَا إمَامَ لَهُمْ فَالْإِمَامُ الْمَأْسُورُ فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى إمَامَتِهِ؛ لِأَنَّ بَيْعَتَهُ لَهُمْ لَازِمَةٌ وَطَاعَتَهُ عَلَيْهِمْ وَاجِبَةٌ. فَصَارَ مَعَهُمْ كَمَصِيرِهِ مَعَ أَهْلِ الْعَدْلِ إذَا صَارَتْ تَحْتَ الْحَجْرِ. وَعَلَى أَهْلِ الِاخْتِيَارِ أَنْ يَسْتَنِيبُوا عَنْهُ نَاظِرًا يَخْلُفُهُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ. فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا كَانَ أَحَقَّ بِاخْتِيَارِ مَنْ يَسْتَنِيبُهُ مِنْهُمْ. فَإِنْ خَلَعَ الْمَأْسُورُ نَفْسَهُ أَوْ مَاتَ لَمْ يَصِرْ الْمُسْتَنَابُ إمَامًا؛ لِأَنَّهَا نِيَابَةٌ عَنْ مَوْجُودٍ فَزَالَتْ بِفَقْدِهِ.

وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْبَغْيِ قَدْ نَصَّبُوا لِأَنْفُسِهِمْ إمَامًا دَخَلُوا فِي بَيْعَتِهِ وَانْقَادُوا لِطَاعَتِهِ. فَالْإِمَامُ الْمَأْسُورُ فِي أَيْدِيهِمْ خَارِجٌ مِنَ الْإِمَامَةِ بِالْإِيَاسِ مِنْ خَلَاصِهِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ

انْحَازُوا بِدَارٍ تَفَرَّدَ حُكْمُهَا عَنِ الْجَمَاعَةِ، وَخَرَجُوا بِهَا عَنِ الطَّاعَةِ، فَلَمْ يَبْقَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ بِهِمْ نُصْرَةٌ، وَلِلْمَأْسُورِ مَعَهُمْ قُدْرَةٌ، وَعَلَى أَهْلِ الِاخْتِيَارِ فِي دَارِ الْعَدْلِ أَنْ يَعْقِدُوا الْإِمَامَةَ لِمَنْ ارْتَضَوْا لَهَا، فَإِنْ خَلَصَ الْمَأْسُورُ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِمَامَةِ لِخُرُوجِهِ مِنْهَا.

তার মুক্তির আশা করা গেলে বিদ্রোহীদের অবস্থা দুইটির কোনো একটি থেকে মুক্ত নয়: হয় তারা নিজেদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করেছে, অথবা করেনি। যদি তারা বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে এবং তাদের কোনো ইমাম না থাকে, তবে তাদের হাতে বন্দি ইমাম তার ইমামত পদে বহাল থাকবেন; কারণ তার প্রতি তাদের আনুগত্যের অঙ্গীকার অপরিহার্য এবং তার আনুগত্য করা তাদের ওপর ওয়াজিব। ফলে তাদের সাথে তার অবস্থান ঠিক তেমন হবে যেমন ন্যায়নিষ্ঠ প্রজাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যখন তিনি সীমাবদ্ধতার অধীনে থাকেন। এমতাবস্থায় 'আহলুল ইখতিয়ার' বা নির্বাচকমণ্ডলীর দায়িত্ব হলো তার পক্ষ থেকে একজন তত্ত্বাবধায়ককে স্থলাভিষিক্ত করা, যদি তিনি প্রতিনিধি নিয়োগে সক্ষম না হন। আর যদি তিনি সক্ষম হন, তবে তাদের মধ্য থেকে নিজের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে তিনিই সমধিক হকদার। অতঃপর বন্দি ইমাম যদি পদত্যাগ করেন অথবা মৃত্যুবরণ করেন, তবে নিযুক্ত প্রতিনিধি ইমাম হিসেবে গণ্য হবেন না; কারণ এটি ছিল একজন বিদ্যমান ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব, যা তার অনুপস্থিতিতে বা বিলুপ্তিতে রহিত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে বিদ্রোহীরা যদি নিজেদের জন্য কোনো ইমাম নিযুক্ত করে থাকে, যার আনুগত্যে তারা প্রবেশ করেছে এবং যার নির্দেশ তারা মেনে চলে, তবে তাদের হাতে বন্দি ইমাম তার ইমামত পদ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবেন, যদি তার মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হওয়া যায়। কারণ তারা এমন এক ভূখণ্ডে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যার শাসনব্যবস্থা মূল জামাত থেকে পৃথক এবং এর মাধ্যমে তারা আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ন্যায়নিষ্ঠ প্রজাদের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে কোনো সহায়তা অবশিষ্ট থাকে না এবং বন্দি ইমামেরও তাদের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এমতাবস্থায় 'দারুল আদল' বা ন্যায়নিষ্ঠ ভূখণ্ডের নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য হলো—যাকে তারা এই পদের জন্য পছন্দ করেন তার অনুকূলে ইমামতের চুক্তি সম্পাদন করা। অতঃপর যদি বন্দি ইমাম মুক্তি লাভও করেন, তবে তিনি পুনরায় ইমামত ফিরে পাবেন না; যেহেতু তিনি তা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন।

فَصْلٌ: "نواب الخليفة وولاته"

وَإِذَا تَمَهَّدَ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ أَحْكَامِ الْإِمَامَةِ وَعُمُومِ نَظَرِهَا فِي مَصَالِحِ الْمِلَّةِ وَتَدْبِيرِ الْأُمَّةِ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ عَقْدُهَا لِلْإِمَامِ انْقَسَمَ مَا صَدَرَ عَنْهُ مِنْ وِلَايَاتِ خُلَفَائِهِ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ عَامَّةً فِي الْأَعْمَالِ الْعَامَّةِ وَهُمُ الْوُزَرَاءُ؛ لِأَنَّهُمْ يُسْتَنَابُونَ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ عَامَّةً فِي أَعْمَالٍ خَاصَّةٍ، وَهُمْ أُمَرَاءُ الْأَقَالِيمِ وَالْبُلْدَانِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ فِيمَا خُصُّوا بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ خَاصَّةً فِي الْأَعْمَالِ الْعَامَّةِ، وَهُمْ كَقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَقِيبِ الْجُيُوشِ وَحَامِي الثُّغُورِ وَمُسْتَوْفِي الْخَرَاجِ وَجَابِي الصَّدَقَاتِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقْصُورٌ عَلَى نَظَرٍ خَاصٍّ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ.

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ خَاصَّةً فِي الْأَعْمَالِ الْخَاصَّةِ، وَهُمْ كَقَاضِي بَلَدٍ أَوْ إِقْلِيمٍ أَوْ مُسْتَوْفِي خَرَاجِهِ أَوْ جَابِي صَدَقَاتِهِ أَوْ حَامِي ثَغْرِهِ أَوْ نَقِيبِ جُنْدٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَاصُّ النَّظَرِ مَخْصُوصُ الْعَمَلِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْوُلَاةِ شُرُوطٌ تَنْعَقِدُ بِهَا وِلَايَتُهُ، وَيَصِحُّ مَعَهَا نَظَرُهُ، وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا فِي أَبْوَابِهَا وَمَوَاضِعِهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ.

পরিচ্ছেদ: "খলিফার প্রতিনিধি ও তাঁর গভর্নরগণ"

আমরা ইমামতের বিধিবিধান এবং মিল্লাতের কল্যাণ ও উম্মাহর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর ব্যাপক পরিধি সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছি তা যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হলো, তখন ইমামের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিনিধিদের যে সকল শাসনভার অর্পিত হয়, তা চার ভাগে বিভক্ত:

প্রথম ভাগ: যাঁর শাসনভার সাধারণ কার্যাবলীর ক্ষেত্রে ব্যাপক; তাঁরা হলেন উজিরগণ (মন্ত্রীগণ)। কেননা তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়াই সকল বিষয়ে খলিফার স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হন।

দ্বিতীয় ভাগ: যাঁর শাসনভার বিশেষ অঞ্চলের সকল কার্যাবলীর ক্ষেত্রে ব্যাপক; তাঁরা হলেন প্রদেশ ও শহরসমূহের আমির বা প্রশাসকগণ। কারণ তাঁদের ওপর অর্পিত অঞ্চলের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে তাঁদের তত্ত্বাবধানের বিষয়টি সকল বিষয়েই ব্যাপক।
তৃতীয় ভাগ: যাঁর শাসনভার সাধারণ কার্যাবলীর ক্ষেত্রে বিশেষ বা নির্দিষ্ট; তাঁরা হলেন প্রধান বিচারপতি, সেনাপ্রধান, সীমান্ত রক্ষক, ভূমিরাজস্ব আদায়কারী এবং যাকাত সংগ্রাহক। কারণ তাঁদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সকল অঞ্চলের জন্য কেবল একটি বিশেষ বিষয়ের তত্ত্বাবধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
চতুর্থ ভাগ: যাঁর শাসনভার বিশেষ কার্যাবলীর ক্ষেত্রে বিশেষ বা নির্দিষ্ট; তাঁরা হলেন কোনো নির্দিষ্ট শহর বা প্রদেশের বিচারপতি, অথবা সেখানকার ভূমিরাজস্ব আদায়কারী, কিংবা যাকাত সংগ্রাহক, অথবা সীমান্ত রক্ষক, কিংবা সেনাদলের প্রধান। কারণ তাঁদের প্রত্যেকের তত্ত্বাবধান নির্দিষ্ট এবং কর্মক্ষেত্রও সীমিত। এসকল প্রশাসকদের প্রত্যেকেরই পদাধিকার লাভের নির্দিষ্ট শর্তাবলি রয়েছে যার মাধ্যমে তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁদের তত্ত্বাবধান বৈধতা পায়। আমরা আল্লাহর ইচ্ছা ও তাওফিকে সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ও স্থানসমূহে এগুলো আলোচনা করব।

(ص: 50)الأحكام السلطانية للماوردي

الباب الثاني: في تقليد الوزارة

مدخل

...

الباب الثاني: في تقليد الوزارة

وَالْوَزَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: وَزَارَةُ تَفْوِيضٍ1 وَوَزَارَةُ تَنْفِيذٍ.

فَأَمَّا وَزَارَةُ التَّفْوِيضِ فَهُوَ أَنْ يَسْتَوْزِرَ الْإِمَامُ مَنْ يُفَوِّضُ إِلَيْهِ تَدْبِيرَ الْأُمُورِ بِرَأْيِهِ، وَإِمْضَاءَهَا عَلَى اجْتِهَادِهِ. وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ جَوَازُ هَذِهِ الْوَزَارَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ

نَبِيِّهِ مُوسَى عليه الصلاة والسلام: {وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} [طه: 29-32] .

فَإِذَا جَازَ ذَلِكَ فِي النُّبُوَّةِ كَانَ فِي الْإِمَامَةِ أَجْوَزُ، وَلِأَنَّ مَا وُكِّلَ إِلَى الْإِمَامِ مِنْ تَدْبِيرِ الْأُمَّةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُبَاشَرَةِ جَمِيعِهِ إِلَّا بِاسْتِنَابَةٍ، وَنِيَابَةُ الْوَزِيرِ الْمُشَارِكِ لَهُ فِي التَّدْبِيرِ أَصَحُّ فِي تَنْفِيذِ الْأُمُورِ مِنْ تَفَرُّدِهِ بِهَا؛ لِيَسْتَظْهِرَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَبِهَا يَكُونُ أَبْعَدَ مِنَ الزَّلَلِ وَأَمْنَعَ مِنَ الْخَلَلِ.

وَيُعْتَبَرُ فِي تَقْلِيدِ هَذِهِ الْوَزَارَةِ شُرُوطُ الْإِمَامَةِ إِلَّا النَّسَبَ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ مُمْضِي الْآرَاءِ وَمُنَفِّذُ الِاجْتِهَادِ فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِينَ.

وَيَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى شَرْطٍ زَائِدٍ عَلَى شُرُوطِ الْإِمَامَةِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِفَايَةِ فِيمَا وُكِّلَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ الْحَرْبِ وَالْخَرَاجِ خِبْرَةً بِهِمَا وَمَعْرِفَةً بِتَفْصِيلِهِمَا، فَإِنَّهُ مُبَاشِرٌ لَهُمَا تَارَةً وَمُسْتَنِيبٌ فِيهِمَا أُخْرَى، فَلَا يَصِلُ إِلَى اسْتِنَابَةِ الْكُفَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ، كَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ إِذَا قَصَّرَ عَنْهُمْ، وَعَلَى هَذَا الشَّرْطِ مَدَارُ الْوَزَارَةِ وَبِهِ تَنْتَظِمُ السِّيَاسَةُ.

---

1 قلت: وزير التفويض هو الوزير الذي يعيّنه الخليفة ليتحمَّل معه مسئولية الحكم والسلطان، فيفوّض إليه تدبير الأمور برأيه، وإمضاءها حَسَب اجتهاده وفق أحكام الشرع، وإيجاد المعاون من المباحات، فيجوز للخليفة أن يعيّن معاونًا له يعاونه ويساعده في مسئولياته وأعماله، فقد أخرج الحاكم والترمذي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وزيراي من السَّمَاء جبريل وميكائيل، ومن الأرض أبو بكر وعمر"، وكلمة الوزير كما في الحديث يراد بها المعين والمساعد الذي هو المعني اللغوي، كما استعمل القرآن الكريم كلمة "وزير" بهذا المعني اللغوي، قال تعالى: {وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي} ، أي معينًا ومساعدًا.

كما أنَّ كلمة وزير في الحديث مطلقة تشمل، أي: معونة وأية مساعدة في أيِّ أمر من الأمور، ومنها إعانة الخليفة في مسئولية الخلافة وأعمالها.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: উজির নিয়োগ প্রসঙ্গে

ভূমিকা

...

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: উজির নিয়োগ প্রসঙ্গে

উজিরের পদ বা উজির নিয়োগ দুই প্রকার: অর্পিত ক্ষমতাসম্পন্ন উজির এবং নির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন উজির।

অর্পিত ক্ষমতাসম্পন্ন উজির (ওয়াজিরাতে তাফউইদ) হলো—ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান এমন একজন ব্যক্তিকে উজির হিসেবে নিয়োগ দেবেন, যাঁর নিকট তিনি যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনা তাঁর নিজস্ব সুচিন্তিত মতামতের ওপর ন্যস্ত করবেন এবং স্বীয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে তা বাস্তবায়ন করার এখতিয়ার দেবেন। এই ধরনের উজির নিয়োগ বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। মহান আল্লাহ তাঁর নবী মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত করে ইরশাদ করেন: {এবং আমার জন্য আমার পরিবারের মধ্য থেকে একজন উজির নির্ধারণ করে দিন, আমার ভাই হারুনকে; তার মাধ্যমে আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন এবং তাকে আমার কার্যে অংশীদার করুন} [সূরা ত্বহা: ২৯-৩২]।

যদি নবুওয়াতের ক্ষেত্রে এটি বৈধ হয়, তবে ইমামতের ক্ষেত্রে তা অধিকতর সংগত। কারণ, উম্মতের বিষয়াবলি পরিচালনার যে দায়িত্ব ইমামের ওপর অর্পিত হয়েছে, প্রতিনিধি নিয়োগ ব্যতীত তিনি একাকী তার সবটুকু আঞ্জাম দিতে সক্ষম নন। তাই ব্যবস্থাপনায় অংশীদার একজন উজিরের প্রতিনিধিত্ব কোনো বিষয়ে তাঁর একক সিদ্ধান্তের চেয়ে কার্যসম্পাদনে অধিকতর সঠিক ও নির্ভুল হবে; যাতে তিনি এর মাধ্যমে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারেন এবং এর ফলে ভুলভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা থেকে অধিকতর দূরে থাকা সম্ভব হয়।

এই উজির পদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বংশমর্যাদা ব্যতীত ইমামতের যাবতীয় শর্তাবলি বিবেচনা করা হবে। কেননা তিনি বিভিন্ন মতামত ও ইজতিহাদ বাস্তবায়নকারী, তাই তাঁর মধ্যে মুজতাহিদের গুণাবলি থাকা আবশ্যক।

এ ক্ষেত্রে ইমামতের শর্তাবলির অতিরিক্ত আরও একটি শর্ত প্রয়োজন; তা হলো—তাঁকে অর্পিত যুদ্ধবিগ্রহ ও ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলিতে যথেষ্ট পারদর্শী হতে হবে এবং এগুলোর বিস্তারিত

খুঁটিনাটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখতে হবে। কারণ তিনি কখনো সরাসরি এসকল কাজ পরিচালনা করবেন, আবার কখনো অন্যের মাধ্যমে তা সম্পাদন করাবেন। সুতরাং যোগ্য ব্যক্তিদের প্রতিনিধি নিয়োগ করা তাঁর পক্ষে ততক্ষণ সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না তিনি নিজে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। যেমন তিনি যদি এ সকল বিষয়ে যোগ্যতার ঘাটতি রাখেন তবে সরাসরি তা পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন না। এই শর্তটির ওপরই উজির পদের ভিত্তি এবং এর মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় রাজনীতি সুশৃঙ্খল হয়।

---

১. আমি বলছি: অর্পিত ক্ষমতাসম্পন্ন উজির (উজিরুত তাফউইদ) হলেন সেই উজির, যাকে খলিফা শাসন ও ক্ষমতার দায়িত্ব পালনে তাঁর সাথে শরীক হওয়ার জন্য নিযুক্ত করেন। খলিফা তাঁর নিকট যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনা তাঁর নিজস্ব মতামতের ওপর ন্যস্ত করেন এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী স্বীয় ইজতিহাদ মোতাবেক তা কার্যকর করার ক্ষমতা দেন। বৈধ ও অনুমোদিত বিষয়সমূহে সাহায্যকারী গ্রহণ করা জায়েজ। সুতরাং খলিফার জন্য এমন একজন সহকারী নিয়োগ করা বৈধ, যিনি তাঁর দায়িত্ব ও কার্যাবলিতে তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন। ইমাম হাকেম ও তিরমিজি আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—"আকাশবাসীদের মধ্য থেকে জিবরাঈল ও মিকাঈল আমার দুইজন উজির, আর পৃথিবীবাসীদের মধ্য থেকে আবু বকর ও উমর আমার দুইজন উজির।" হাদীসে ব্যবহৃত ‘উজির’ শব্দ দ্বারা আভিধানিক অর্থে সাহায্যকারী ও সহকারী বোঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনেও ‘উজির’ শব্দটি এই আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন: {এবং আমার জন্য আমার পরিবারের মধ্য থেকে একজন উজির নির্ধারণ করে দিন}, অর্থাৎ একজন সাহায্যকারী ও সহকারী।

একইভাবে হাদীসে ‘উজির’ শব্দটি নিরঙ্কুশভাবে এসেছে, যা যেকোনো বিষয়ের সাহায্য ও সহযোগিতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে খেলাফতের দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ডে খলিফাকে সাহায্য করাও শামিল।

حُكِيَ أَنَّ الْمَأْمُونَ رحمه الله كَتَبَ فِي اخْتِيَارِ وَزِيرٍ: إِنِّي الْتَمَسْتُ لِأُمُورِي رَجُلًا جَامِعًا لِخِصَالِ الْخَيْرِ، ذَا عِفَّةٍ فِي خَلَائِقِهِ وَاسْتِقَامَةٍ فِي طَرَائِقِهِ، قَدْ هَذَّبَتْهُ الْآدَابُ وَأَحْكَمَتْهُ التَّجَارِبُ، إِنِ ائْتُمِنَ عَلَى الْأَسْرَارِ قَامَ بِهَا، وَإِنْ قُلِّدَ مُهِمَّاتِ الْأُمُورِ نَهَضَ فِيهَا، يُسْكِتُهُ الْحِلْمُ وَيُنْطِقُهُ الْعِلْمُ، وَتَكْفِيهِ اللَّحْظَةُ وَتُغْنِيهِ اللَّمْحَةُ، لَهُ صَوْلَةُ الْأُمَرَاءِ وَأَنَاةُ الْحُكَمَاءِ وَتَوَاضُعُ الْعُلَمَاءِ وَفَهْمُ الْفُقَهَاءِ، إِنْ أُحْسِنَ إِلَيْهِ شَكَرَ، وَإِنْ ابْتُلِيَ بِالْإِسَاءَةِ صَبَرَ، لَا يَبِيعُ نَصِيبَ يَوْمِهِ بِحِرْمَانِ غَدِهِ، يَسْتَرِقُّ قُلُوبَ الرِّجَالِ بِخِلَابَةِ لِسَانِهِ وَحُسْنِ بَيَانِهِ، وَقَدْ جَمَعَ بَعْضَ الشُّعَرَاءِ1 هَذِهِ الْأَوْصَافَ فَأَوْجَزَهَا، وَوَصَفَ بَعْضَ وُزَرَاءِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ بِهَا فَقَالَ "من الوافر":

بَدِيهَتُهُ وَفِكْرَتُهُ سَوَاءٌ ... إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَى النَّاسِ الْأُمُورُ

وَأَحْزَمُ مَا يَكُونُ الدَّهْرَ يَوْمًا إِذَا ... أَعْيَا الْمُشَاوِرُ وَالْمُشِيرُ

وَصَدْرٌ فِيهِ لِلْهَمِّ اتِّسَاعٌ ... إِذَا ضَاقَتْ مِنَ الْهَمِّ الصُّدُورُ

فَهَذِهِ الْأَوْصَافُ إِذَا كَمُلَتْ فِي الزَّعِيمِ الْمُدَبِّرِ -وَقَلَّ مَا تَكْمُلُ- فَالصَّلَاحُ بِنَظَرِهِ عَامٌّ، وَمَا يُنَاطُ بِرَأْيِهِ وَتَدْبِيرِهِ تَامٌّ؛ وَإِنِ اخْتَلَّتْ فَالصَّلَاحُ بِحَسَبِهَا يَخْتَلُّ، وَالتَّدْبِيرُ عَلَى قَدْرِهَا يَعْتَلُّ، وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مِنَ الشُّرُوطِ الدِّينِيَّةِ الْمَحْضَةِ فَهُوَ مِنْ شُرُوطِ السِّيَاسَةِ الْمُمَازِجَةِ لِشُرُوطِ الدِّينِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ مَصَالِحِ الْأُمَّةِ وَاسْتِقَامَةِ الْمِلَّةِ.

فَإِذَا كَمُلَتْ شُرُوطُ هَذِهِ الْوَزَارَةِ فِيمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهَا فَصِحَّةُ التَّقْلِيدِ فِيهَا مُعْتَبَرَةٌ بِلَفْظِ الْخَلِيفَةِ الْمُسْتَوْزِرِ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ تَفْتَقِرُ إِلَى عَقْدٍ، وَالْعُقُودُ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالْقَوْلِ الصَّرِيحِ، فَإِنْ وَقَعَ لَهُ بِالنَّظَرِ وَأَذِنَ لَهُ لَمْ يَتِمَّ التَّقْلِيدُ، حُكْمًا، وَإِنْ أَمْضَاهُ الْوُلَاةُ عُرْفًا حَتَّى يَعْقِدَ لَهُ الْوَزَارَةَ بِلَفْظٍ يَشْتَمِلُ عَلَى شَرْطَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: عُمُومُ النَّظَرِ.

وَالثَّانِي: النِّيَابَةُ.

---

1 هو أشجع بن عمرو السلمي من وَلَد الشريد بن مطرود، رُبِّي ونشأ بالبصرة، ثم خرج إلى الرقة والرشيد بها، فمدح البرامكة وانقطع إلى جعفر خاصَّة وأصفاه مدحه، ووصله الرشيد وأعجبه وأثرت حاله في أيامه وتقدَّم عنده.

বর্ণিত আছে যে, আল-মামুন (রাহিমাহুল্লাহ) জনৈক উজির নির্বাচনের বিষয়ে লিখেছিলেন: "আমি আমার কার্যাবলীর জন্য এমন একজন ব্যক্তির সন্ধান করেছি, যে সমস্ত মহৎ গুণের আধার; স্বভাবে পবিত্র এবং কর্মপন্থায় অবিচল। শিষ্টাচার তাকে সুশোভিত করেছে এবং অভিজ্ঞতা তাকে পরিপক্ক করেছে। যদি তার কাছে কোনো গোপন রহস্য আমানত রাখা হয়, তবে সে তা রক্ষা করে; আর যদি তাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে সে তা সুচারুভাবে আঞ্জাম দেয়। ধৈর্য তাকে নীরব রাখে এবং জ্ঞান তাকে বাকপটু করে। একটি চোখের ইশারা তার জন্য যথেষ্ট এবং একটি ইঙ্গিতই তার জন্য পর্যাপ্ত। তার মধ্যে রয়েছে আমীরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, প্রাজ্ঞদের ধৈর্য-স্থিরতা, আলেমদের বিনয় এবং ফকীহদের প্রজ্ঞা। যদি তার প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; আর যদি সে অন্যায়ের শিকার হয়, তবে ধৈর্য ধারণ করে। সে আগামী দিনের বড় প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় আজকের সামান্য স্বার্থ বিকিয়ে দেয় না। সে তার মিষ্টভাষিতা এবং উত্তম বাচনভঙ্গির মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করে।" জনৈক কবি১ এই গুণাবলীকে একত্রিত করে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করেছেন এবং আব্বাসীয় খেলাফতের কোনো এক উজিরের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

যখন মানুষের কাছে বিষয়সমূহ অস্পষ্ট ও সংশয়পূর্ণ হয়ে যায়, তখন তার উপস্থিত বুদ্ধি ও সুচিন্তিত ভাবনা একই রূপ ফলদায়ক হয়।...

সময়ের পরিক্রমায় যখন কোনো কঠিন দিনে পরামর্শদাতা ও পরামর্শপ্রার্থী উভয়েই ক্লান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, তখন তার সিদ্ধান্তই হয় সবচেয়ে দৃঢ়।...

দুশ্চিন্তার ভারে যখন সবার অন্তর সংকুচিত হয়ে আসে, তখন তার হৃদয়ে সেই দুশ্চিন্তা ধারণ করার মতো প্রশস্ততা থাকে।...

সুতরাং এই গুণাবলী যখন একজন দক্ষ নেতার মধ্যে পূর্ণতা পায়—যা সচরাচর খুব কমই পূর্ণ হয়—তখন তার দূরদর্শিতার কারণে সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয় এবং তার চিন্তা ও ব্যবস্থাপনার ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পূর্ণতা লাভ করে। আর যদি এগুলোতে ঘাটতি থাকে, তবে সেই অনুপাতে জনকল্যাণেও বিঘ্ন ঘটে এবং সেই মাত্রায় ব্যবস্থাপনাও ত্রুটিযুক্ত হয়। যদিও এই

গুণাবলী নিছক ধর্মীয় শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও এগুলো দ্বীনি শর্তাবলীর সাথে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক শর্তাবলি; কারণ এর সাথে উম্মাহর স্বার্থ রক্ষা এবং মিল্লাতের স্থিতিশীলতা জড়িত। অতএব, যখন এই উজির পদের যোগ্য ব্যক্তির মধ্যে শর্তসমূহ পূর্ণ হবে, তখন নিয়োগদানকারী খলিফার সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমেই কেবল তার নিয়োগের বৈধতা সাব্যস্ত হবে। কারণ এটি এমন একটি কর্তৃত্ব যা চুক্তির মুখাপেক্ষী, আর চুক্তি কেবল সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমেই কার্যকর হয়। সুতরাং খলিফা যদি কেবল তাকে কাজ পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেন বা মৌখিক অনুমতি দেন, তবে আইনত নিয়োগ সম্পন্ন হবে না—যদিও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কর্মকর্তারা তা কার্যকর করে থাকে—যতক্ষণ না খলিফা এমন শব্দে তাকে উজির পদে চুক্তিবদ্ধ করেন যা দুটি শর্ত অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথমত: সাধারণ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা।

দ্বিতীয়ত: প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ত হওয়া।

---

১. তিনি হলেন আশজা ইবনে আমর আস-সুলামী, যিনি আশ-শারীদ ইবনে মাক্রুদ-এর বংশধর। তিনি বসরায় লালিত-পালিত ও বড় হয়েছেন। এরপর তিনি রাক্কায় গমন করেন যখন হারুনুর রশীদ সেখানে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তিনি বারমাকিদের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন এবং বিশেষভাবে জাফরের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে তাকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো উৎসর্গ করেন। হারুনুর রশীদ তাঁর প্রতি সদয় হন এবং তিনি খলিফার মুগ্ধতা ও বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন।

(ص: 52)الأحكام السلطانية للماوردي

فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى عُمُومِ النَّظَرِ دُونَ النِّيَابَةِ فَكَانَ بِوِلَايَةِ الْعَهْدِ أَخَصَّ؛ فَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ الْوَزَارَةُ، فَإِنْ اقْتَصَرَ بِهِ عَلَى النِّيَابَةِ فَقَدْ أَبْهَمَ مَا اسْتَنَابَهُ فِيهِ مِنْ عُمُومٍ وَخُصُوصٍ أَوْ تَنْفِيذٍ وَتَفْوِيضٍ فَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ الْوَزَارَةُ، وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا انْعَقَدَتْ وَتَمَّتْ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا يَكُونُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ بِأَحْكَامِ الْعُقُودِ أَخَصُّ أَنْ يَقُولَ: قَدْ قَلَّدْتُكَ مَا إِلَيَّ نِيَابَةً عَنِّي، فَتَنْعَقِدُ بِهِ الْوَزَارَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ لَهُ بَيْنَ عُمُومِ النَّظَرِ وَالِاسْتِنَابَةِ فِي النَّظَرِ، فَإِنْ قَالَ لَهُ: نُبْ عَنِّي فِيمَا إِلَيَّ، احْتَمَلَ أَنْ تَنْعَقِدَ بِهِ الْوَزَارَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ لَهُ فِي هَذَا اللَّفْظِ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ: عُمُومِ النَّظَرِ وَالِاسْتِنَابَةِ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا تَنْعَقِدَ بِهِ الْوَزَارَةُ؛ لِأَنَّهُ إِذْنٌ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَتَقَدَّمَهُ عَقْدٌ، وَالْإِذْنُ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ لَا تَصِحُّ بِهِ الْعُقُودُ، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: قَدْ اسْتَنَبْتُكَ فِيمَا إِلَيَّ، انْعَقَدَتْ بِهِ الْوَزَارَةُ؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ عَنْ مُجَرَّدِ الْإِذْنِ إِلَى أَلْفَاظِ الْعُقُودِ. وَلَوْ قَالَ: انْظُرْ فِيمَا إِلَيَّ، لَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ الْوَزَارَةُ؛ لِاحْتِمَالِهِ أَنْ يَنْظُرَ فِي تَصَفُّحِهِ أَوْ فِي تَنْفِيذِهِ أَوْ فِي الْقِيَامِ بِهِ، وَالْعَقْدُ لَا يَنْبَرِمُ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ حَتَّى يَصِلَهُ بِمَا يَنْفِي عَنْهُ الِاحْتِمَالَ، وَلَيْسَ يُرَاعَى فِيمَا يُبَاشِرُهُ الْخُلَفَاءُ وَمُلُوكُ الْأُمَمِ مِنَ الْعُقُودِ الْعَامَّةِ مَا يُرَاعَى فِي الْخَاصَّةِ مِنَ الشُّرُوطِ الْمُؤَكِّدَةِ لِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّ مِنْ عَادَتِهِمُ الِاكْتِفَاءُ بِيَسِيرِ الْقَوْلِ عَنْ كَثِيرِهِ، فَصَارَ ذَلِكَ فِيهِمْ عُرْفًا مَخْصُوصًا، وَرُبَّمَا اسْتَثْقَلُوا الْكَلَامَ فَاقْتَصَرُوا عَلَى الْإِشَارَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي الشَّرْعِ حُكْمٌ لِنَاطِقٍ سَلِيمٍ، فَكَذَلِكَ خَرَجَتْ بِالشَّرْعِ مِنْ عُرْفِهِمْ.

وَالثَّانِي: إِنَّهُمْ لِقِلَّةِ مَا يُبَاشِرُونَهُ مِنَ الْعُقُودِ تُجْعَلُ شَوَاهِدُ الْحَالِ فِي تَأَهُّبِهِمْ لَهَا مُوجِبًا لِحَمْلِ لَفْظِهِمُ الْمُجْمَلِ عَلَى الْغَرَضِ الْمَقْصُودِ دُونَ الِاحْتِمَالِ الْمُجَرَّدِ، فَهَذَا وَجْهٌ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ بِعُرْفِ الْمَنْصِبِ أَشْبَهُ أَنْ يَقُولَ: قَدْ اسْتَوْزَرْتُكَ تَعْوِيلًا عَلَى نِيَابَتِكَ، فَتَنْعَقِدُ بِهِ هَذِهِ الْوَزَارَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ عُمُومِ النَّظَرِ فِيمَا إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: اسْتَوْزَرْتُكَ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْوَزَارَةِ عَامٌّ، وَبَيَّنَ النِّيَابَةَ بِقَوْلِهِ: تَعْوِيلًا عَلَى نِيَابَتِكَ، فَخَرَجَتْ عَنْ وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ إِلَى وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ.

وَلَوْ قَالَ: قَدْ فَوَّضْتُ إِلَيْكَ وَزَارَتِي، احْتَمَلَ أَنْ تَنْعَقِدَ بِهِ هَذِهِ الْوَزَارَةُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ التَّفْوِيضِ

যদি তিনি প্রতিনিধিত্ব ব্যতিরেকে কেবল সাধারণ তত্ত্বাবধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন, তবে তা উত্তরাধিকার মনোনয়নের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ হবে; ফলে এর মাধ্যমে উজিরি বা

মন্ত্রিত্বের চুক্তি সম্পন্ন হবে না। আর যদি তিনি কেবল প্রতিনিধিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন, তবে তিনি যাতে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছেন তাতে সাধারণ বা বিশেষত্ব অথবা বাস্তবায়ন বা পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণের বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায়, ফলে এর মাধ্যমেও উজিরি বা মন্ত্রিত্বের চুক্তি সম্পন্ন হবে না। যখন তিনি এই উভয় বিষয়ের সমন্বয় করবেন, তখন চুক্তিটি সংগঠিত ও পূর্ণ হবে। এই সমন্বয় দুই পদ্ধতিতে হতে পারে:

প্রথম পদ্ধতি: যা চুক্তির বিধানাবলীর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা হলো তিনি বলবেন: "আমার উপর অর্পিত বিষয়াবলীতে আমি তোমাকে আমার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করলাম।" এর মাধ্যমে উজিরি বা মন্ত্রিত্বের চুক্তি সম্পন্ন হবে; কারণ তিনি এখানে তার জন্য সাধারণ তত্ত্বাবধান এবং সেই তত্ত্বাবধানে প্রতিনিধিত্ব—এই উভয় বিষয়ের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আর যদি তিনি তাকে বলেন: "আমার উপর অর্পিত বিষয়ে আমার প্রতিনিধিত্ব করো," তবে এর মাধ্যমে উজিরি বা মন্ত্রিত্বের চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; কারণ তিনি এই শব্দের মাধ্যমে উভয় দিক তথা সাধারণ তত্ত্বাবধান ও প্রতিনিধিত্বের সমন্বয় করেছেন। আবার এর মাধ্যমে উজিরি বা মন্ত্রিত্বের চুক্তি সম্পন্ন না হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে; কারণ এটি একটি অনুমতি মাত্র, যার পূর্বে একটি মূল চুক্তি থাকা প্রয়োজন। আর চুক্তির বিধানাবলীতে কেবল অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে চুক্তি শুদ্ধ হয় না। তবে তিনি যদি বলেন: "আমি তোমাকে আমার উপর অর্পিত বিষয়ে প্রতিনিধি নিযুক্ত করলাম," তবে এর মাধ্যমে উজিরি বা মন্ত্রিত্বের চুক্তি সম্পন্ন হবে; কারণ তিনি নিছক অনুমতি প্রদান থেকে সরে এসে চুক্তির শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন।

যদি তিনি বলেন: "আমার উপর অর্পিত বিষয়গুলো দেখো," তবে এর মাধ্যমে উজিরি বা মন্ত্রিত্বের চুক্তি সম্পন্ন হবে না; কারণ এতে কেবল পর্যবেক্ষণ, বাস্তবায়ন কিংবা তা আঞ্জাম দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর কোনো অস্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে চুক্তি সুসংবদ্ধ হয় না যতক্ষণ না এর সাথে এমন কিছু যুক্ত করা হয় যা সেই অস্পষ্টতা দূর করে। খলিফা ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ যেসব সাধারণ চুক্তি সম্পাদন করেন, সেখানে বিশেষ চুক্তির মতো সুদৃঢ় শর্তাবলির কঠোরতা রক্ষা করা হয় না, আর এটি দুটি কারণে:

প্রথমত: তাদের অভ্যাস হলো দীর্ঘ কথার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত কথাতেই সন্তুষ্ট থাকা, যা তাদের মাঝে একটি বিশেষ প্রথা বা রীতিতে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় তারা কথা বলাকে ভারাকষ্টকর মনে করে কেবল ইশারা বা ইঙ্গিতের ওপর সীমাবদ্ধ থাকেন। তবে শরয়ি বিধানে

বাকশক্তি সম্পন্ন সুস্থ ব্যক্তির ইশারার সাথে কোনো হুকুম বা বিধান সংশ্লিষ্ট হয় না, তাই শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে তা তাদের প্রথাগত অভ্যাসের বাইরে রাখা হয়েছে।
দ্বিতীয়ত: তারা যেহেতু অত্যন্ত কম সংখ্যায় সরাসরি চুক্তি সম্পাদন করেন, তাই তাদের প্রস্তুতির পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাসঙ্গিক আলামতগুলোকে এমন একটি কার্যকর কারণ হিসেবে গণ্য করা হয় যা তাদের অস্পষ্ট শব্দকে নিছক সম্ভাবনার পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের ওপর প্রয়োগ নিশ্চিত করে। এটি একটি পদ্ধতি।
দ্বিতীয় পদ্ধতি: যা পদমর্যাদার প্রথাগত ব্যবহারের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা হলো তিনি বলবেন: "তোমার প্রতিনিধিত্বের ওপর নির্ভর করে আমি তোমাকে উজির বা মন্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলাম।" এর মাধ্যমে এই উজিরি বা মন্ত্রিত্বের চুক্তি সম্পন্ন হবে; কারণ "আমি তোমাকে উজির বানালাম" বলার মাধ্যমে তিনি তার উপর অর্পিত বিষয়ে সাধারণ তত্ত্বাবধানের সমন্বয় করেছেন—কেননা উজিরের তত্ত্বাবধান সাধারণ বা ব্যাপক হয়ে থাকে; আর "তোমার প্রতিনিধিত্বের ওপর নির্ভর করে" বলার মাধ্যমে তিনি প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। ফলে এটি বাস্তবায়নকারী উজিরি থেকে পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত উজিরির অন্তর্ভুক্ত হলো।
আর যদি তিনি বলেন: "আমি আমার উজিরি বা মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব তোমাকে অর্পণ করলাম," তবে এর মাধ্যমে এই উজিরি বা মন্ত্রিত্বের চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; কারণ অর্পণের উল্লেখ...

(ص: 53)الأحكام السلطانية للماوردي

فِيهَا يُخْرِجُهَا عَنْ وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ إِلَى وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَنْعَقِدَ؛ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْوَزَارَةِ، فَافْتَقَرَ إِلَى عَقْدٍ يَتَقَدَّمُهُ، وَالْأَوَّلُ مِنَ الِاحْتِمَالَيْنِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ: قَدْ فَوَّضْنَا إِلَيْكَ الْوَزَارَةَ صَحَّ؛ لِأَنَّ وُلَاةَ الْأُمُورِ يُكَنُّونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، وَيُعَظِّمُونَ عَنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَيْهِمْ فَيُرْسِلُونَهُ، فَيَقُومُ قَوْلُهُ: قَدْ فَوَّضْنَا إِلَيْكَ، مَقَامَ قَوْلِهِ: فَوَّضْتُ إِلَيْكَ، وَقَوْلُهُ: الْوَزَارَةُ مَقَامَ قَوْلِهِ: وَزَارَتِي، وَهَذَا

أَفْخَمُ قَوْلٍ عُقِدَتْ بِهِ وَزَارَةُ التَّفْوِيضِ وَأَوْجَزُهُ، وَلَوْ كَنَّى غَيْرُ الْمُلُوكِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِالْجَمْعِ وَتَرَكَ الْإِضَافَةَ لَمَا تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمُ التَّفَرُّدِ وَالْإِضَافَةِ؛ لِخُرُوجِهِ عَنِ الْعُرْفِ الْمَعْهُودِ. فَأَمَّا إِذَا قَالَ: قَدْ قَلَّدْتُكَ وَزَارَتِي أَوْ قَدْ قَلَّدْنَاكَ الْوَزَارَةَ، لَمْ يَصِرْ بِهَذَا الْقَوْلِ مِنْ وُزَرَاءِ التَّفْوِيضِ حَتَّى يُبَيِّنَهُ بِمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّفْوِيضَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ حِكَايَةً عَنْ نَبِيِّهِ مُوسَى -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: {وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} [طه: 29-32] .

فَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى مُجَرَّدِ الْوَزَارَةِ حَتَّى قَرَنَهَا بِشَدِّ أَزْرِهِ وَإِشْرَاكِهِ فِي أَمْرِهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْوَزَارَةِ مُخْتَلَفٌ فِي اشْتِقَاقِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: إِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْوِزْرِ وَهُوَ الثِّقَلُ؛ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ عَنِ الْمَلِكِ أَثْقَالَهُ.

الثَّانِي: إِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْوَزَرِ وَهُوَ الْمَلْجَأُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {كَلَّا لَا وَزَرَ} [القيامة: 11] .

أَيْ: لَا مَلْجَأَ، فَسُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَلِكَ يُلْجَأُ إِلَى رَأْيِهِ وَمَعُونَتِهِ.

وَالثَّالِثُ: إِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْأَزْرِ وَهُوَ الظَّهْرُ؛ لِأَنَّ الْمَلِكَ يَقْوَى بِوَزِيرِهِ، كَقُوَّةِ الْبَدَنِ بِالظَّهْرِ، وَلِأَيِّ هَذِهِ الْمَعَانِي كَانَ مُشْتَقًّا فَلَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا مَا يُوجِبُ الِاسْتِبْدَادَ بِالْأُمُورِ.

এতে পদটি নির্বাহী মন্ত্রণালয় হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়। এবং এটিও সম্ভব যে তা কার্যকর হবে না; কারণ ক্ষমতা অর্পণ করা এই মন্ত্রণালয়ের বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত, তাই এর জন্য একটি চুক্তির প্রয়োজন যা এর পূর্বে সম্পন্ন হবে। তবে এই দুই সম্ভাবনার মধ্যে প্রথমটিই সঠিক হওয়ার অধিকতর যোগ্য। এই ভিত্তিতে যদি তিনি (শাসক) বলেন: 'আমরা আপনার নিকট মন্ত্রণালয় অর্পণ করলাম', তবে তা শুদ্ধ হবে; কারণ রাষ্ট্রপ্রধানগণ নিজেদের ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহার করে থাকেন এবং কোনো বিষয়কে সরাসরি নিজেদের দিকে সম্বন্ধ করার পরিবর্তে আভিজাত্যের খাতিরে তা সাধারণ ও অনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন। সুতরাং তাঁর উক্তি: 'আমরা আপনার নিকট অর্পণ করলাম', তাঁর উক্তি: 'আমি আপনার নিকট অর্পণ করলাম'-এর স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তাঁর উক্তি: 'মন্ত্রণালয়', তাঁর উক্তি: 'আমার মন্ত্রণালয়'-এর স্থলাভিষিক্ত

হবে। আর ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় নিযুক্তির ক্ষেত্রে এটিই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। যদি রাজন্যবর্গ ব্যতীত অন্য কেউ নিজেদের ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহার করেন এবং সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, তবে সেক্ষেত্রে একক বা সম্বন্ধের বিধান কার্যকর হবে না; কারণ এটি প্রচলিত প্রথার পরিপন্থী। পক্ষান্তরে, শাসক যদি বলেন: 'আমি আপনাকে আমার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করলাম' অথবা 'আমরা আপনাকে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করলাম', তবে এর মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না যতক্ষণ না তিনি তা এমন বিষয়ের মাধ্যমে স্পষ্ট করেন যা ক্ষমতা অর্পণকে আবশ্যক করে। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: {এবং আমার পরিবারের মধ্য হতে আমার জন্য একজন উজির নিযুক্ত করে দিন, আমার ভাই হারুনকে। তাঁর দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন এবং তাঁকে আমার কাজে অংশীদার করুন।} [ত্বহা: ২৯-৩২]।

তিনি কেবল সাধারণ উজির নিযুক্তির ওপর সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং এর সাথে শক্তি বৃদ্ধি ও কাজে অংশীদার করার বিষয়টিও যুক্ত করেছেন। কেননা 'ওয়াজারাত' (মন্ত্রণালয়) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ক্ষেত্রে তিনটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমত: এটি 'উইজর' শব্দ হতে উদ্ভূত, যার অর্থ বোঝা বা ভার; কারণ উজির রাজার পক্ষ হতে তাঁর গুরুভার বহন করেন।

দ্বিতীয়ত: এটি 'ওয়াযার' শব্দ হতে উদ্ভূত, যার অর্থ আশ্রয়স্থল। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: {কখনোই নয়, কোনো আশ্রয়স্থল নেই।} [কিয়ামাহ: ১১]

অর্থাৎ কোনো বাঁচার জায়গা নেই। একে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে কারণ রাজা উজিরের পরামর্শ ও সহযোগিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

তৃতীয়ত: এটি 'আজর' শব্দ হতে উদ্ভূত, যার অর্থ পিঠ বা শক্তি; কারণ উজিরের মাধ্যমে রাজা শক্তিশালী হন, যেমন পিঠের দ্বারা শরীর শক্তিশালী হয়। এই অর্থগুলোর মধ্যে যা থেকেই শব্দটি উদ্ভূত হোক না কেন, এর কোনোটিই কোনো বিষয়ে নিরঙ্কুশ বা একক কর্তৃত্বের অধিকার দান করে না।

فَصْلٌ: "في الفروق بين سلطات الوزير والإمام"

وَإِذَا تَقَرَّرَ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ وَزَارَةُ التَّفْوِيضِ فَالنَّظَرُ فِيهَا -وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعُمُومِ- مُعْتَبَرٌ بِشَرْطَيْنِ، يَقَعُ الْفَرْقُ بِهِمَا بَيْنَ الْإِمَامَةِ وَالْوَزَارَةِ:

أَحَدُهُمَا: ما يخْتَصُّ بِالْوَزِيرِ، وَهُوَ مُطَالَعَةُ الْإِمَامِ لِمَا أَمْضَاهُ مِنْ تَدْبِيرٍ، وَأَنْفَذَهُ مِنْ وِلَايَةٍ وَتَقْلِيدٍ، لِئَلَّا يَصِيرَ بِالِاسْتِبْدَادِ كَالْإِمَامِ.

وَالثَّانِي: مُخْتَصٌّ بِالْإِمَامِ، وَهُوَ أَنْ يَتَصَفَّحَ أَفْعَالَ الْوَزِيرِ وَتَدْبِيرَهُ الْأُمُورَ؛ لِيُقِرَّ مِنْهَا مَا وَافَقَ الصَّوَابَ، وَيَسْتَدْرِكَ مَا خَالَفَهُ؛ لِأَنَّ تَدْبِيرَ الْأُمَّةِ إِلَيْهِ مَوْكُولٌ، وَعَلَى اجْتِهَادِهِ مَحْمُولٌ.

وَيَجُوزُ لِهَذَا الْوَزِيرِ أَنْ يَحْكُمَ بِنَفْسِهِ، وَأَنْ يُقَلِّدَ الْحُكَّامَ، كَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّ شُرُوطَ الْحُكْمِ فِيهِ مُعْتَبَرَةٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمَظَالِمِ وَيَسْتَنِيبَ فِيهَا؛ لِأَنَّ شُرُوطَ الْمَظَالِمِ فِيهِ مُعْتَبَرَةٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى الْجِهَادَ بِنَفْسِهِ، وَأَنْ يُقَلِّدَ مَنْ يَتَوَلَّاهُ؛ لِأَنَّ شُرُوطَ الْحَرْبِ فِيهِ مُعْتَبَرَةٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يُبَاشِرَ تَنْفِيذَ الْأُمُورِ الَّتِي دَبَّرَهَا، وَأَنْ يَسْتَنِيبَ فِي تَنْفِيذِهَا؛ لِأَنَّ شُرُوطَ الرَّأْيِ وَالتَّدْبِيرِ فِيهِ مُعْتَبَرَةٌ.

وَكُلُّ مَا صَحَّ مِنَ الْإِمَامِ صَحَّ مِنَ الْوَزِيرِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: وِلَايَةُ الْعَهْدِ، فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْهَدَ إِلَى مَنْ يَرَى، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَزِيرِ.

الثَّانِي: إِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعْفِيَ الْأُمَّةَ مِنَ الْإِمَامَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَزِيرِ.

وَالثَّالِثُ: إِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْزِلَ مَنْ قَلَّدَهُ الْوَزِيرُ، وَلَيْسَ لِلْوَزِيرِ أَنْ يَعْزِلَ مَنْ قَلَّدَهُ الْإِمَامُ.

وَمَا سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَحُكْمُ التَّفْوِيضِ إِلَيْهِ يَقْتَضِي جَوَازَ فِعْلِهِ وَصِحَّةَ نُفُوذِهِ مِنْهُ، فَإِنْ عَارَضَهُ الْإِمَامُ فِي رَدِّ مَا أَمْضَاهُ، فَإِنْ كَانَ فِي حُكْمٍ نَفَذَ عَلَى وَجْهٍ، أَوْ فِي مَالٍ وُضِعَ فِي حَقِّهِ لَمْ يَجُزْ نَقْضُ مَا نَفَذَ بِاجْتِهَادِهِ مِنْ حُكْمٍ، وَلَا اسْتِرْجَاعُ مَا فَرَّقَ بِرَأْيِهِ مِنْ مَالٍ، فَإِنْ كَانَ فِي تَقْلِيدِ وَالٍ أَوْ تَجْهِيزِ جَيْشٍ وَتَدْبِيرِ حَرْبٍ، جَازَ لِلْإِمَامِ مُعَارَضَتُهُ بِعَزْلِ الْمُوَلَّى

وَالْعُدُولِ بِالْجَيْشِ إِلَى حَيْثُ يَرَى، وَتَدْبِيرُ الْحَرْبِ بِمَا هُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَدْرِكَ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِ نَفْسِهِ، فَكَانَ أَوْلَى أَنْ يَسْتَدْرِكَهُ مِنْ أَفْعَالِ وَزِيرِهِ.

পরিচ্ছেদ: "উজির (মন্ত্রী) এবং ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধান) কর্তৃত্বের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ"
অর্পিত ক্ষমতাধীন মন্ত্রণালয় (ওয়াজারাতে তাফউইদ) যেসকল বিষয়ের মাধ্যমে গঠিত হয় তা সাব্যস্ত হওয়ার পর এর পর্যালোচনায়—যদিও তা সাধারণভাবেই হোক না কেন—দুটি শর্ত বিবেচ্য, যার মাধ্যমে ইমামত (রাষ্ট্রপ্রধানের পদ) ও উজিরের (মন্ত্রিত্বের) পদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়:
প্রথমটি: যা উজিরের জন্য নির্দিষ্ট; আর তা হলো তিনি যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং যে শাসনকর্তৃত্ব ও পদ নিযুক্তি কার্যকর করেছেন, সে সম্পর্কে ইমামকে অবহিত করা; যাতে তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ব্যবহারের মাধ্যমে ইমামের সদৃশ না হয়ে যান।
দ্বিতীয়টি: যা ইমামের জন্য নির্দিষ্ট; আর তা হলো উজিরের কার্যাবলি ও বিষয়াদি পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা; যাতে এর মধ্য থেকে যা সঠিক তাকে তিনি অনুমোদন দিতে পারেন এবং যা সঠিকের পরিপন্থী তা সংশোধন করতে পারেন। কারণ উম্মাহর পরিচালনার দায়িত্ব ইমামের ওপর অর্পিত এবং তা তাঁর ইজতিহাদ বা বিচক্ষণতার ওপর নির্ভরশীল।
এই উজিরের জন্য স্বয়ং বিচার কার্য পরিচালনা করা এবং বিচারক নিয়োগ করা বৈধ, যেমনটা ইমামের জন্য বৈধ; কারণ তাঁর মধ্যে বিচারের শর্তসমূহ বিদ্যমান বলে গণ্য হয়। তাঁর জন্য জুলুম-অবিচার নিরসনে (মাজালিম) বিচার করা এবং এ কাজে কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করাও বৈধ; কারণ তাঁর মধ্যে মাজালিম বিচারের শর্তসমূহ বিদ্যমান। তিনি স্বয়ং জিহাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন এবং এর দায়িত্ব অর্পণের জন্য কাউকে নিযুক্তিও দিতে পারেন; কারণ যুদ্ধের শর্তসমূহ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। এছাড়া তাঁর পরিকল্পিত বিষয়াদির বাস্তবায়ন তিনি নিজে করতে পারেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কাউকে প্রতিনিধিও নিযুক্ত করতে পারেন; কারণ তাঁর মধ্যে পরামর্শ ও নীতি নির্ধারণের শর্তসমূহ বিদ্যমান রয়েছে।
ইমামের পক্ষ থেকে যা কিছু শুদ্ধ হয়, উজিরের পক্ষ থেকেও তা শুদ্ধ বলে গণ্য হবে, কেবল তিনটি বিষয় ব্যতীত:
প্রথমটি: পরবর্তী উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্তি; ইমাম যাকে ইচ্ছা উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করতে পারেন, কিন্তু উজিরের সেই অধিকার নেই।

দ্বিতীয়টি: ইমাম উম্মাহর নিকট ইমামতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করতে পারেন, কিন্তু উজিরের ক্ষেত্রে এমনটি প্রযোজ্য নয়।
তৃতীয়টি: উজির যাকে নিযুক্তি দিয়েছেন ইমাম তাকে বরখাস্ত করতে পারেন, কিন্তু ইমাম যাকে নিযুক্তি দিয়েছেন উজির তাকে বরখাস্ত করার অধিকার রাখেন না।
এই তিনটি বিষয় ব্যতীত তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতার বিধান তাঁর কার্যাবলির বৈধতা এবং তা কার্যকর হওয়ার দাবি রাখে। তবে উজিরের কার্যকর করা কোনো পদক্ষেপ রদ করার ক্ষেত্রে যদি ইমাম তাঁর বিরোধিতা করেন, আর তা যদি যথাযথভাবে কার্যকর করা কোনো বিচারিক রায় হয় কিংবা কোনো হকদারকে প্রদানকৃত সম্পদ সংক্রান্ত হয়, তবে উজিরের ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া কোনো বিচারিক রায় বাতিল করা যাবে না এবং তাঁর বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী বণ্টনকৃত সম্পদ ফেরত নেওয়াও বৈধ হবে না। কিন্তু যদি তা কোনো গভর্নর নিয়োগ কিংবা কোনো বাহিনী প্রেরণ এবং যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণ সম্পর্কিত হয়, তবে ইমামের জন্য উজিরের বিরোধিতা করা বৈধ; তিনি নিযুক্ত ব্যক্তিকে বরখাস্ত করতে পারেন এবং বাহিনীকে তাঁর পছন্দানুযায়ী অন্য কোনো অভিমুখে পাঠাতে পারেন এবং যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে যা অধিকতর উপযোগী মনে হয় সেই ব্যবস্থা নিতে পারেন। কারণ ইমাম নিজের কার্যাবলির সংশোধন করার অধিকার রাখেন, সুতরাং তাঁর উজিরের কার্যাবলি সংশোধন করা অধিকতর সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়।

(ص: 55)الأحكام السلطانية للماوردي

فَلَوْ قَلَّدَ الْإِمَامُ وَالِيًا عَلَى عَمَلٍ، وَقَلَّدَ الْوَزِيرُ غَيْرَهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ، نُظِرَ فِي أَسْبَقِهِمَا بِالتَّقْلِيدِ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْبَقَ تَقْلِيدًا فَتَقْلِيدُهُ أَثْبَتُ، وَلَا وِلَايَةَ لِمَنْ قَلَّدَهُ الْوَزِيرُ، وَإِنْ كَانَ تَقْلِيدُ الْوَزِيرِ أَسْبَقَ، فَإِنْ عَلِمَ الْإِمَامُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَقْلِيدِ الْوَزِيرِ كَانَ فِي تَقْلِيدِهِ الْإِمَامَ لِغَيْرِهِ عَزْلُ الْأَوَّلِ، وَاسْتِئْنَافُ تَقْلِيدِ الثَّانِي، فَصَحَّ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْإِمَامُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَقْلِيدِ الْوَزِيرِ، فَتَقْلِيدُ الْوَزِيرِ أَثْبَتُ، وَتَصِحُّ وِلَايَةُ

الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ تَقْلِيدَ الثَّانِي مَعَ الْجَهْلِ بِتَقْلِيدِ الْأَوَّلِ لَا يَكُونُ عَزْلًا لَوْ عَلِمَ بِتَقْلِيدِهِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه: لَا يَنْعَزِلُ الْأَوَّلُ مَعَ عِلْمِ الْإِمَامِ بِحَالِهِ إِذَا قَلَّدَ غَيْرَهُ حَتَّى يَعْزِلَهُ قَوْلًا، فَيَصِيرُ بِالْقَوْلِ مَعْزُولًا لَا بِتَقْلِيدِ غَيْرِهِ، فَعَلَى هَذَا إِنْ كَانَ النَّظَرُ مِمَّا يَصِحُّ فِيهِ الِاشْتِرَاكُ صَحَّ تَقْلِيدُهُمَا، فَكَانَا مُشْتَرِكَيْنِ فِي النَّظَرِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَصِحُّ فِيهِ الِاشْتِرَاكُ كَانَ تَقْلِيدُهُمَا مَوْقُوفًا عَلَى عَزْلِ أَحَدِهِمَا وَإِقْرَارِ الْآخَرِ؛ فَإِنْ تَوَلَّى ذَلِكَ الْإِمَامُ جَازَ أَنْ يَعْزِلَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَيُقِرَّ الْآخَرَ، وَإِنْ تَوَلَّاهُ الْوَزِيرُ جَازَ أَنْ يَعْزِلَ مَنِ اخْتَصَّ بِتَقْلِيدِهِ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْزِلَ مَنْ قَلَّدَهُ الْإِمَامُ.

যদি ইমাম কোনো কর্মের জন্য একজন প্রশাসক নিয়োগ করেন এবং উজির একই কর্মের জন্য অন্য কাউকে নিয়োগ দেন, তবে তাদের মধ্যে কার নিয়োগ আগে হয়েছে তা দেখা হবে। যদি ইমামের নিয়োগ আগে হয়ে থাকে, তবে তাঁর নিয়োগই অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং উজির যাকে নিয়োগ দিয়েছেন তার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। আর যদি উজিরের নিয়োগ আগে হয়ে থাকে, এমতাবস্থায় ইমাম যদি উজিরের সেই পূর্ববর্তী নিয়োগ সম্পর্কে অবগত থাকেন, তবে ইমাম কর্তৃক অন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়ার অর্থ হলো প্রথম ব্যক্তিকে বরখাস্ত করা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির নিয়োগ নতুনভাবে কার্যকর করা; ফলে দ্বিতীয় নিয়োগটিই সঠিক হবে, প্রথমটি নয়। পক্ষান্তরে, ইমাম যদি উজিরের সেই পূর্ববর্তী নিয়োগ সম্পর্কে অবগত না থাকেন, তবে উজিরের নিয়োগই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং প্রথম ব্যক্তির নিয়োগই সঠিক হবে, দ্বিতীয় ব্যক্তির নয়; কেননা প্রথম জনের নিয়োগ সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে দ্বিতীয় কাউকে নিয়োগ দেওয়া বরখাস্তকরণ হিসেবে গণ্য হয় না, যা তিনি অবগত থাকলে হতো।

ইমাম শাফিঈ (রা.)-এর জনৈক অনুসারীগণ বলেছেন: ইমাম যদি প্রথম ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অবগত থেকেও দ্বিতীয় কাউকে নিয়োগ দেন, তবুও প্রথম ব্যক্তি বরখাস্ত হবেন না যতক্ষণ না তিনি তাকে স্পষ্টভাবে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করেন। ফলে তিনি মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমেই বরখাস্ত হবেন, কেবল অন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়ার দ্বারা নয়। এই মতানুসারে, বিষয়টি যদি এমন হয় যাতে অংশীদারিত্ব বৈধ, তবে তাদের উভয়ের নিয়োগই সঠিক হবে এবং তারা সেই বিষয়ে অংশীদার হিসেবে গণ্য হবেন। আর যদি বিষয়টি এমন হয় যাতে অংশীদারিত্ব বৈধ নয়, তবে তাদের উভয়ের নিয়োগের বিষয়টি একজনের বরখাস্তকরণ ও অন্যজনের বহাল রাখার

ওপর স্থগিত থাকবে। যদি ইমাম এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেন, তবে তিনি যাকে ইচ্ছা বরখাস্ত করতে পারেন এবং অন্যজনকে বহাল রাখতে পারেন। আর যদি উজির এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেন, তবে তিনি কেবল যাকে নিজে নিয়োগ দিয়েছেন তাকেই বরখাস্ত করার অধিকার রাখবেন, কিন্তু ইমামের নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে বরখাস্ত করার অধিকার তাঁর থাকবে না।

(ص: 56)الأحكام السلطانية للماوردي

فَصْلٌ: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ" 1

وَأَمَّا وَزَارَةُ التَّنْفِيذِ فَحُكْمُهَا أَضْعَفُ وَشُرُوطُهَا أَقَلُّ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ فِيهَا مَقْصُورٌ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَتَدْبِيرِهِ، وَهَذَا الْوَزِيرُ وَسَطٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّعَايَا وَالْوُلَاةِ يُؤَدِّي عَنْهُ مَا أَمَرَ، وَيُنَفِّذُ عَنْهُ مَا ذَكَرَ، وَيُمْضِي مَا حَكَمَ، وَيُخْبِرُ بِتَقْلِيدِ الْوُلَاةِ وَتَجْهِيزِ الْجُيُوشِ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ مِنْ مُهِمٍّ وَتَجَدَّدَ مِنْ حَدَثٍ مُلِمٍّ؛ لِيَعْمَلَ فِيهِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ، فَهُوَ مُعِينٌ فِي تَنْفِيذِ الْأُمُورِ، وَلَيْسَ بِوَالٍ عَلَيْهَا وَلَا مُتَقَلِّدًا لَهَا، فَإِنْ شُورِكَ فِي الرَّأْيِ كَانَ بِاسْمِ الْوَزَارَةِ أَخَصَّ، وَإِنْ لَمْ يُشَارَكْ فِيهِ كَانَ بِاسْمِ الْوَاسِطَةِ وَالسِّفَارَةِ أَشْبَهَ، وَلَيْسَ تَفْتَقِرُ هَذِهِ الْوَزَارَةُ إِلَى تَقْلِيدٍ، وَإِنَّمَا يُرَاعَى فِيهَا مُجَرَّدُ الْإِذْنِ، وَلَا تُعْتَبَرُ فِي الْمُؤَهَّلِ لَهَا الْحُرِّيَّةُ وَلَا الْعِلْمُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِوِلَايَةٍ وَلَا تَقْلِيدٍ، فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعِلْمُ، وَإِنَّمَا هُوَ مَقْصُورُ النَّظَرِ عَلَى أَمْرَيْنِ:

---

1 قال أبو يعلى الفراء: ويجوز للخليفة أن يقلّد وزيرين، وزير تفويض ووزير تنفيذ، فوزير التفويض مطلق التصرّف، ووزير التنفيذ مقصور على تنفيذ ما صدَرَت به أوامر الخليفة، ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولّي معزولًا ولا يعزل مولًّى، ويجوز

لوزير التفويض أن يولّي معزولًا ويعزل مولَّاه، ولا يجوز له أن يعزل من ولَّاه الخليفة.

وليس لوزير التفويض أن يوقِّع عن نفسه ولا عن الخليفة إلا بإذنه، ويجوز لوزير التفويض أن يوقِّع عن نفسه إلى عماله وعمال الخليفة، ويلزمهم قبول توقيعاته، ولا يجوز أن يوقِّع عن الخليفة إلّا بأمره في عموم وخصوص، وإذا عزل الخليفة وزير التنفيذ لم ينعزل به أحد من الولاة.

وإذ عزل وزير التفويض انعزل به عمَّال التنفيذ، ولم ينعزل به عمال التفويض؛ لأن عمالة التنفيذ نيابة، وعمالة التفويض ولاية. ويجوز لوزير التفويض أن يستخلف نائبًا عنه، ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يستخلف من ينوب عنه؛ لأنَّ الاستخلاف تقليد، فصحَّ من وزير التفويض ولم يصح من وزير التنفيذ، وإذا نهى الخليفة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف؛ لأنَّ كل واحد من الوزيرين متصرِّف عن أمر الخليفة ونهيه، وإن اقترن حكمهما مع إطلاق التقليد.

وإذا فوّض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها وكّل النظر فيها إلى المستولي عليها، فالذي عليه أهل زماننا جواز ذلك، وكان حكم وزيره معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار الوزارتين.

পরিচ্ছেদ: "ওয়াজারাতে তাফবীয (ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়) ও ওয়াজারাতে তানফীয (নির্বাহী মন্ত্রণালয়)-এর মধ্যে পার্থক্য প্রসঙ্গে" ১

আর নির্বাহী মন্ত্রণালয়ের (ওয়াজারাতে তানফীয) বিধান অপেক্ষাকৃত শিথিল এবং এর শর্তাবলীও সীমিত; কারণ এতে দায়িত্ব কেবল ইমামের অভিমত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই মন্ত্রী মূলত ইমাম এবং প্রজা ও গভর্নরদের মধ্যকার একটি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন, যিনি ইমামের পক্ষ থেকে আদেশ পৌঁছে দেন, তাঁর নির্দেশনা কার্যকর করেন, তাঁর ফয়সালাসমূহ জারি করেন এবং গভর্নরদের নিয়োগ ও সৈন্যবাহিনী প্রেরণের সংবাদ প্রদান করেন। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতি তিনি ইমামের কাছে উপস্থাপন করেন, যেন প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী সে বিষয়ে কাজ

করতে পারেন। সুতরাং তিনি প্রশাসনিক কার্যাবলী বাস্তবায়নের একজন সাহায্যকারী মাত্র, সেসবের ওপর কোনো নিরঙ্কুশ অভিভাবকত্ব বা পূর্ণ কর্তৃত্ব তাঁর নেই। যদি নীতিনির্ধারণী পরামর্শে তাঁকে শরীক করা হয়, তবে তিনি 'উজির' (মন্ত্রী) নামের অধিক যোগ্য হবেন। আর যদি পরামর্শে শরীক না করা হয়, তবে তিনি 'যোগসূত্র' (ওয়াসিতা) ও 'দূত' (সিফারা) অভিধার সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হবেন। এই মন্ত্রণালয়ের জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক নিয়োগের প্রয়োজন পড়ে না, বরং কেবল অনুমতি থাকাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। এই পদের অধিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়া বা অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা শর্ত নয়; কারণ স্বাধীনভাবে কোনো শাসনক্ষমতা প্রয়োগ বা নিয়োগ প্রদানের এখতিয়ার তাঁর নেই যে তাঁর জন্য স্বাধীন হওয়া আবশ্যক হবে, এবং ফয়সালা দেওয়ারও কোনো অধিকার তাঁর নেই যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা শর্ত হবে। তাঁর কর্মপরিধি কেবল দুটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ:

---

১ আবু ইয়ালা আল-ফাররা বলেন: খলিফার জন্য দুইজন মন্ত্রী নিয়োগ করা বৈধ; একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী (ওয়াজিরে তাফবীয) এবং অন্যজন নির্বাহী মন্ত্রী (ওয়াজিরে তানফীয)। ওয়াজিরে তাফবীয স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকারী, আর ওয়াজিরে তানফীযের কাজ কেবল খলিফার পক্ষ থেকে জারিকৃত আদেশসমূহ কার্যকর করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওয়াজিরে তানফীয কোনো পদচ্যুত ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে পারবেন না এবং কোনো নিযুক্ত ব্যক্তিকে পদচ্যুত করতে পারবেন না; তবে ওয়াজিরে তাফবীয পদচ্যুত ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে এবং নিযুক্ত ব্যক্তিকে পদচ্যুত করতে পারেন। তবে খলিফা স্বয়ং যাকে নিয়োগ দিয়েছেন, ওয়াজিরে তাফবীয তাকে পদচ্যুত করতে পারবেন না।

ওয়াজিরে তাফবীযের জন্য খলিফার অনুমতি ব্যতীত নিজের পক্ষ থেকে বা খলিফার পক্ষ থেকে কোনো ফরমান সই করার অধিকার নেই। তবে ওয়াজিরে তাফবীয তাঁর নিজের অধীনস্থ কর্মকর্তা এবং খলিফার কর্মকর্তাদের কাছে নিজের পক্ষ থেকে নির্দেশনা পাঠাতে পারেন এবং তাঁরা তা মানতে বাধ্য। কিন্তু খলিফার পক্ষ থেকে সাধারণ বা বিশেষ কোনো বিষয়ে সই বা নির্দেশনা প্রদানের জন্য খলিফার সুনির্দিষ্ট আদেশের প্রয়োজন হবে। যদি খলিফা ওয়াজিরে তানফীযকে পদচ্যুত করেন, তবে এর ফলে কোনো গভর্নর পদচ্যুত হবেন না।

আর যদি ওয়াজিরে তাফবীযকে পদচ্যুত করা হয়, তবে তাঁর অধীনস্থ নির্বাহী কর্মচারীরাও পদচ্যুত হয়ে যাবেন, কিন্তু ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারীরা পদচ্যুত হবেন না; কারণ নির্বাহী দায়িত্ব হলো এক প্রকার প্রতিনিধিত্ব (নিয়াবত), আর ক্ষমতাপ্রাপ্ত দায়িত্ব হলো পূর্ণ কর্তৃত্ব (উলায়াত)।

ওয়াজিরে তাফবীয নিজের স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন, কিন্তু ওয়াজিরে তানফীয তা পারেন না; কারণ স্থলাভিষিক্ত করা হলো দায়িত্ব অর্পণ (তাকলীদ), যা ওয়াজিরে তাফবীযের জন্য বৈধ হলেও ওয়াজিরে তানফীযের জন্য নয়। যদি খলিফা ওয়াজিরে তাফবীযকে স্থলাভিষিক্ত নিয়োগে নিষেধ করেন, তবে তিনি তা করতে পারবেন না; কারণ উভয় মন্ত্রীই খলিফার আদেশ ও নিষেধের অনুসারী, যদিও নিয়োগের সময় তাঁদের ক্ষমতা নিঃশর্তভাবে দেওয়া হয়েছিল।

যদি খলিফা কোনো অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব সেখানকার গভর্নরদের হাতে অর্পণ করেন এবং এর তদারকি সেখানকার বিজয়ীর ওপর ন্যস্ত করেন, তবে আমাদের সমসাময়িক ফকীহদের মতে তা বৈধ। এমতাবস্থায় সেই গভর্নর ও তাঁর উজিরের মধ্যকার বিধান, খলিফা ও তাঁর উজিরের মধ্যকার বিধানের মতোই হবে।

(ص: 57)الأحكام السلطانية للماوردي

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى الْخَلِيفَةِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ، فَيُرَاعِي فِيهِ سَبْعَةَ أَوْصَافٍ1:

أَحَدُهَا: الْأَمَانَةُ حَتَّى لَا يَخُونَ فِيمَا قَدْ اُؤْتُمِنَ عَلَيْهِ، وَلَا يَغُشَّ فِيمَا قَدْ اُسْتُنْصِحَ فِيهِ.

وَالثَّانِي: صِدْقُ اللَّهْجَةِ حَتَّى يُوثَقَ بِخَبَرِهِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ، وَيُعْمَلَ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا يُنْهِيهِ.

وَالثَّالِثُ: قِلَّةُ الطَّمَعِ حَتَّى لَا يَرْتَشِيَ فِيمَا يَلِي، وَلَا يَنْخَدِعَ فَيَتَسَاهَلَ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَسْلَمَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ مِنْ عَدَاوَةٍ وَشَحْنَاءَ، فَإِنَّ الْعَدَاوَةَ تَصُدُّ عَنِ التَّنَاصُفِ وَتَمْنَعُ مِنَ التَّعَاطُفِ.

وَالْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ ذُكُورًا لِمَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْخَلِيفَةِ وَعَنْهُ؛ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ لَهُ وَعَلَيْهِ.

وَالسَّادِسُ: الذَّكَاءُ وَالْفِطْنَةُ؛ حَتَّى لَا تُدَلَّسَ عَلَيْهِ الْأُمُورُ فَتَشْتَبِهَ، وَلَا تُمَوَّهَ عَلَيْهِ فَتَلْتَبِسَ، فَلَا يَصِحُّ مَعَ اشْتِبَاهِهَا عَزْمٌ، وَلَا يَصْلُحُ مَعَ الْتِبَاسِهَا حَزْمٌ، وَقَدْ أَفْصَحَ بِهَذَا الْوَصْفِ وَزِيرُ الْمَأْمُونِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ2؛ حَيْثُ يَقُولُ "مِنَ الطَّوِيلِ":

إِصَابَةُ مَعْنَى الْمَرْءِ رُوحُ كَلَامِهِ ... فَإِنْ أَخْطَأَ الْمَعْنَى فَذَاكَ مَوَاتُ

إِذَا غَابَ قَلْبُ الْمَرْءِ عَنْ حِفْظِ لَفْظِهِ ... فَيَقْظَتُهُ لِلْعَالَمِينَ سُبَاتُ

وَالسَّابِعُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، فَيُخْرِجُهُ الْهَوَى مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ، وَيَتَدَلَّسُ عَلَيْهِ الْمُحِقُّ مِنَ الْمُبْطِلِ، فَإِنَّ الْهَوَى خَادِعُ الْأَلْبَابِ، وَصَارِفٌ لَهُ عَنِ الصَّوَابِ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ".

قَالَ الشَّاعِرُ3 "مِنَ السَّرِيعِ":

إِنَّا إِذَا قَلَّتْ دَوَاعِي الْهَوَى ... وَأَنْصَتَ السَّامِعُ لِلْقَائِلِ

---

1 قلت: ذكرها أبو يعلى الفراء.

2 هو محمد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزي الوزير، وزر للمأمون، كان حَسَن البلاغة، كثير الأدب، مشهورًا بقول الشعر، له في المأمون مرثية معروفة، وكان سليمان بن وهب يكتب بين يديه، وكان به خاصًّا، ثم اتَّصَل به أن سليمان سعى عليه فأبعده.

3 هو الربيع بن أبي الحقيق اليهودي.

উভয়ের মধ্যে একটি হলো: খলিফার নিকট সংবাদ পৌঁছে দেয়া।

এবং দ্বিতীয়টি হলো: তাঁর পক্ষ থেকে দায়িত্ব সম্পাদন করা, আর এ ক্ষেত্রে সাতটি গুণাবলি লক্ষ্য রাখতে হবে ১:

প্রথমটি হলো: আমানতদারি বা বিশ্বস্ততা, যাতে তিনি তাঁর ওপর অর্পিত আমানতে খেয়ানত না করেন এবং তাঁর নিকট পরামর্শ চাওয়া হলে তাতে কোনো প্রতারণার আশ্রয় না নেন।

দ্বিতীয়টি হলো: সত্যবাদিতা, যাতে তিনি যা পৌঁছে দেন সেই সংবাদে আস্থা রাখা যায় এবং তিনি যা ব্যক্ত করেন সেই কথার ওপর আমল করা যায়।

তৃতীয়টি হলো: অল্পলোভী হওয়া, যাতে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে ঘুষ গ্রহণ না করেন এবং প্ররোচিত হয়ে শিথিলতা প্রদর্শন না করেন।

চতুর্থটি হলো: তাঁর ও মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকা; কেননা শত্রুতা ন্যায়বিচারে বাধা প্রদান করে এবং সহমর্মিতায় অন্তরায় সৃষ্টি করে।

পঞ্চমটি হলো: খলিফার নিকট এবং তাঁর পক্ষ থেকে যা পৌঁছে দেয়া হয় তা স্মরণে রাখার মতো প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া; কেননা তিনি খলিফার পক্ষে বা বিপক্ষে একজন সাক্ষী স্বরূপ।

ষষ্ঠটি হলো: প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা; যাতে তাঁর সামনে বিষয়গুলো অস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে সংশয় তৈরি না করা যায় এবং সেগুলোকে রঞ্জিত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা না যায়। কেননা অস্পষ্টতার মাঝে কোনো সংকল্প সঠিক হয় না এবং বিভ্রান্তির মাঝে কোনো দৃঢ়তা ফলপ্রসূ হয় না। আল-মামুনের উজির মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজদাদ ২ এই গুণের কথা চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন; যেখানে তিনি 'তাউয়ীল' ছন্দে বলেন:

মানুষের বক্তব্যের মর্মার্থ উদ্ধার করাই হলো তার কথার প্রাণ … যদি অর্থ বুঝতে ভুল হয়, তবে তা নির্জীব বা মৃত সমতুল্য।

যদি কোনো ব্যক্তির হৃদয় তার উচ্চারিত শব্দ সংরক্ষণে অনুপস্থিত থাকে … তবে জগতের সামনে তার এই জাগ্রত অবস্থাও মূলত গভীর নিদ্রার নামান্তর।

সপ্তমটি হলো: প্রবৃত্তিপূজারী না হওয়া; কারণ প্রবৃত্তি মানুষকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে বাতিলের দিকে নিয়ে যায় এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করা তার জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে। কেননা প্রবৃত্তি হলো প্রজ্ঞার প্রতারক এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতকারী। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোনো জিনিসের প্রতি তোমার অতিশয় ভালোবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করে দেয়।"

কবি ৩ 'সারী' ছন্দে বলেন:

নিশ্চয়ই আমরা তেমন, যখন প্রবৃত্তি তাড়না কমে যায় … আর শ্রোতা বক্তার কথা মনোযোগ সহকারে শোনে।

---

১ আমি বলছি: আবু ইয়ালা আল-ফাররা এগুলো উল্লেখ করেছেন।

২ তিনি হলেন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজদাদ ইবনে সুওয়াইদ আল-কাতিব আল-মারওয়াজি, যিনি একজন উজির। তিনি আল-মামুনের উজির হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অত্যন্ত বাগ্মী ও

শিষ্টাচারী ছিলেন এবং কাব্য রচনার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। আল-মামুনকে নিয়ে তাঁর একটি বিখ্যাত শোকগাথা রয়েছে। সুলাইমান ইবনে ওয়াহাব তাঁর অধীনে কাজ করতেন এবং তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন; পরে তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছায় যে সুলাইমান তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, ফলে তিনি তাকে দূরে সরিয়ে দেন।
৩ তিনি হলেন আল-রাবি ইবনে আবি আল-হুকাইক আল-ইয়াহুদি।

(ص: 58)الأحكام السلطانية للماوردي

وَاصْطَرَعَ الْقَوْمُ بِأَلْبَابِهِمْ ... نَقْضِي بِحُكْمٍ عَادِلٍ فَاصِلِ
لَا نَجْعَلُ الْبَاطِلَ حَقًّا وَلَا ... نَلْفِظُ دُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ
نَخَافُ أَنْ تُسَفَّهَ أَحْلَامُنَا ... فَنَحْمِلُ الدَّهْرَ مَعَ الْحَامِلِ

فَإِنْ كَانَ هَذَا الْوَزِيرُ مُشَارِكًا فِي الرَّأْيِ احْتَاجَ إِلَى وَصْفٍ ثَامِنٍ وَهُوَ الْحِنْكَةُ وَالتَّجْرِبَةُ الَّتِي تُؤَدِّيهِ إِلَى صِحَّةِ الرَّأْيِ وَصَوَابِ التَّدْبِيرِ، فَإِنَّ فِي التَّجَارِبِ خِبْرَةً بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ، وَإِنْ لَمْ يُشَارِكْ فِي الرَّأْيِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى هَذَا الْوَصْفِ، وَإِنْ كَانَ يَنْتَهِي إِلَيْهِ مَعَ كَثْرَةِ الْمُمَارَسَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقُومَ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ وَإِنْ كَانَ خَبَرُهَا مَقْبُولًا؛ لِمَا تَضَمَّنَهُ مَعْنَى الْوِلَايَاتِ الْمَصْرُوفَةِ عَنِ النِّسَاءِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ" 1.

وَلِأَنَّ فِيهَا مِنْ طَلَبِ الرَّأْيِ وَثَبَاتِ الْعَزْمِ مَا تَضْعُفُ عَنْهُ النِّسَاءُ، وَمِنَ الظُّهُورِ فِي مُبَاشَرَةِ الْأُمُورِ مَا هُوَ عَلَيْهِنَّ مَحْظُورٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْوَزِيرُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ وَزِيرُ التَّفْوِيضِ مِنْهُمْ، وَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْوَزَارَتَيْنِ بِحَسَبِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي النَّظَرَيْنِ، وَذَاكَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: إِنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ مُبَاشَرَةُ الْحُكْمِ وَالنَّظَرُ فِي الْمَظَالِمِ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ.

وَالثَّانِي: إِنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَسْتَبِدَّ بِتَقْلِيدِ الْوُلَاةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ.

وَالثَّالِثُ: إِنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِتَسْيِيرِ الْجُيُوشِ وَتَدْبِيرِ الْحُرُوبِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ.

وَالرَّابِعُ: إِنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ بِقَبْضِ مَا يَسْتَحِقُّ لَهُ، وَبِدَفْعِ مَا يَجِبُ فِيهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ، وَلَيْسَ فِيمَا عَدَا هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ مَا يَمْنَعُ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْهَا، إِلَّا أَنْ يَسْتَطِيلُوا فَيَكُونُوا مَمْنُوعِينَ مِنَ الِاسْتِطَالَةِ.

وَلِهَذِهِ الْفُرُوقِ الْأَرْبَعَةِ بَيْنَ النَّظِيرَيْنِ افْتَرَقَ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ شُرُوطِ الْوَزَارَتَيْنِ:

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب الفِتَن "7099"، والترمذي في كتاب الفتن "2262"، والنسائي في كتاب آداب القضاة "5388"، وأحمد "27535".

লোকেরা তাদের মেধা দিয়ে লড়াই করল ... আমরা এক ন্যায়নিষ্ঠ ও চূড়ান্ত ফয়সালার মাধ্যমে বিচার করি।

আমরা মিথ্যাকে সত্য বানাই না এবং ... সত্য বর্জন করে মিথ্যার আশ্রয় নিই না।

আমরা আমাদের প্রজ্ঞার অবমাননা হওয়ার ভয় করি ... তাই আমরা ধৈর্যশীলদের সাথে কালের বোঝা বহন করি।

যদি এই উজির (মন্ত্রী) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশীদার হন, তবে তার জন্য অষ্টম একটি গুণের প্রয়োজন হবে, আর তা হলো বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা যা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত ও নির্ভুল ব্যবস্থাপনার দিকে পরিচালিত করবে। কেননা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বিষয়াবলির পরিণাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জিত হয়। আর যদি তিনি সিদ্ধান্তে অংশীদার না হন, তবে এই গুণের প্রয়োজন নেই, যদিও দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে তা অর্জিত হতে পারে। আর কোনো নারীর পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা বৈধ নয়, যদিও তার বর্ণিত সংবাদ গ্রহণযোগ্য হতে পারে; কারণ নেতৃত্বের যে অর্থ ও গুরুত্ব তা নারীদের থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "সেই জাতি কখনোই সফল হবে না, যারা তাদের বিষয়াবলি (নেতৃত্ব) কোনো নারীর ওপর ন্যস্ত করেছে।" ১।

কারণ এতে এমন বিচারবুদ্ধি ও সংকল্পের দৃঢ়তা প্রয়োজন হয় যাতে নারীরা দুর্বল হতে পারে, এবং জনসম্মুখে কার্যাবলি সশরীরে সম্পাদনের এমন আবশ্যকতা রয়েছে যা তাদের জন্য নিষিদ্ধ। আর আহলে জিম্মাহর (অমুসলিম নাগরিক) মধ্য থেকে এই উজির (নির্বাহী মন্ত্রী) নিযুক্ত হওয়া বৈধ, যদিও তারা 'ওয়াজিরে তাফবিদ' বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী হতে পারবে না। এই দুই প্রকার উজিরের মধ্যকার পার্থক্য মূলত তাদের কর্মপরিধির পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়, যা চারটি দিক থেকে বিবেচিত হয়:

প্রথমত: নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত উজির বিচারকার্য পরিচালনা ও জুলুম-অবিচার প্রতিকারের এখতিয়ার রাখেন; কিন্তু নির্বাহী উজিরের এই ক্ষমতা নেই।

দ্বিতীয়ত: নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত উজির এককভাবে প্রশাসক নিয়োগের অধিকার রাখেন; কিন্তু নির্বাহী উজিরের এই ক্ষমতা নেই।

তৃতীয়ত: নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত উজির এককভাবে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা ও যুদ্ধ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে পারেন; কিন্তু নির্বাহী উজিরের এই ক্ষমতা নেই।

চতুর্থত: নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত উজির রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ ও প্রদেয় অর্থ প্রদানের মাধ্যমে তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখেন; কিন্তু নির্বাহী উজিরের এই ক্ষমতা নেই। আর এই চারটি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে আহলে জিম্মাহর জন্য কোনো বাধা নেই, যতক্ষণ না তারা সীমালঙ্ঘন করে; কেননা সেক্ষেত্রে তারা নিষিদ্ধ হবে।

সমজাতীয় এই দুই পদের মধ্যকার এই চারটি পার্থক্যের কারণে উভয় উজিরের শর্তাবলির ক্ষেত্রেও চারটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়:

---

১ সহিহ: বুখারি ‘ফিতনা’ অধ্যায় (৭০৯৯), তিরমিজি ‘ফিতনা’ অধ্যায় (২২৬২), নাসায়ি ‘বিচারকদের শিষ্টাচার’ অধ্যায় (৫৩৮৮) এবং আহমদ (২৭৫৩৫) এটি বর্ণনা করেছেন।

أَحَدُهَا: أَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ، وَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ.
الثاني: أَنَّ الإسلام مُعْتَبَرٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ، وَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْعِلْمَ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مُعْتَبَرٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ، وَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ.
وَالرَّابِعُ: أَنَّ الْمَعْرِفَةَ بِأَمْرَيْ الْحَرْبِ وَالْخَرَاجِ مُعْتَبَرَةٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ، وَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ، فَافْتَرَقَا فِي شُرُوطِ التَّقْلِيدِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، كَمَا افْتَرَقَا فِي حُقُوقِ النَّظَرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، وَاسْتَوَيَا فِيمَا عَدَاهَا مِنْ حُقُوقٍ وَشُرُوطٍ.

প্রথমটি: ‘ওয়াযারাতুত তাফবীদ’ (পূর্ণ ক্ষমতাধর মন্ত্রণালয়)-এর ক্ষেত্রে আযাদী বা স্বাধীন হওয়া আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে গণ্য, তবে ‘ওয়াযারাতুত তানফীয’ (নির্বাহী মন্ত্রণালয়)-এর ক্ষেত্রে তা শর্ত নয়।
দ্বিতীয়টি: ‘ওয়াযারাতুত তাফবীদ’-এর ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া শর্ত হিসেবে গণ্য, তবে ‘ওয়াযারাতুত তানফীয’-এর ক্ষেত্রে তা শর্ত নয়।
তৃতীয়টি: শারঈ বিধানাবলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা ‘ওয়াযারাতুত তাফবীদ’-এর ক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে গণ্য, তবে ‘ওয়াযারাতুত তানফীয’-এর ক্ষেত্রে তা শর্ত নয়।
চতুর্থটি: যুদ্ধ ও খিরাজ (ভূমিরাজস্ব) সংক্রান্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা ‘ওয়াযারাতুত তাফবীদ’-এর ক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে গণ্য, তবে ‘ওয়াযারাতুত তানফীয’-এর ক্ষেত্রে তা শর্ত নয়।
সুতরাং নিয়োগের শর্তাবলির ক্ষেত্রে এই উভয় মন্ত্রণালয় চারটি দিক থেকে পৃথক হয়েছে, ঠিক যেমন তারা পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার অধিকারের ক্ষেত্রেও চারটি দিক থেকে পৃথক। আর এগুলি ব্যতীত অন্যান্য অধিকার ও শর্তাবলির ক্ষেত্রে উভয় মন্ত্রণালয়ই সমান।

(ص: 60)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل:

وَيَجُوزُ لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يُقَلِّدَ وَزِيرَيْ تَنْفِيذٍ عَلَى اجْتِمَاعٍ وَانْفِرَادٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ وَزِيرَيْ تَفْوِيضٍ عَلَى الِاجْتِمَاعِ؛ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِمَا، كَمَا لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ إِمَامَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا رُبَّمَا تَعَارَضَا فِي الْعَقْدِ وَالْحَلِّ وَالتَّقْلِيدِ وَالْعَزْلِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] .

فَإِنْ قَلَّدَ وَزِيرَيْ تَفْوِيضٍ لَمْ يَخْلُ حَالُ تَقْلِيدِهِ لَهُمَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يُفَوِّضَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُمُومَ النَّظَرِ، فَلَا يَصِحُّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ دَلِيلٍ وَتَعْلِيلٍ، وَيَنْظُرُ فِي تَقْلِيدِهِمَا، فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَطَلَ تَقْلِيدُهُمَا مَعًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ صَحَّ تَقْلِيدُ السَّابِقِ وَبَطَلَ تَقْلِيدُ الْمَسْبُوقِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ فَسَادِ التَّقْلِيدِ وَالْعَزْلِ أَنَّ فَسَادَ التَّقْلِيدِ يَمْنَعُ مِنْ نُفُوذِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَظَرِهِ، وَالْعَزْلُ لَا يَمْنَعُ مِنْ نُفُوذِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَظَرِهِ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَهُمَا فِي النَّظَرِ عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ، وَلَا يَجْعَلَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ، فَهَذَا يَصِحُّ، وَتَكُونُ الْوَزَارَةُ بَيْنَهُمَا لَا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَهُمَا تَنْفِيذُ مَا اتَّفَقَ رَأْيُهُمَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُمَا تَنْفِيذُ مَا اخْتَلَفَا فِيهِ، وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى رَأْيِ الْخَلِيفَةِ وَخَارِجًا عَنْ نَظَرِ هَذَيْنِ الْوَزِيرَيْنِ، وَتَكُونُ هَذِهِ الْوَزَارَةُ قَاصِرَةً عَنْ وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ الْمُطْلَقَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى تَنْفِيذِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ.

وَالثَّانِي: زَوَالُ نَظَرِهِمَا عَمَّا اخْتَلَفَا فِيهِ.

فَإِنْ اتَّفَقَا بَعْدَ الِاخْتِلَافِ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ عَنْ رَأْيِ اجْتَمَعَا عَلَى صَوَابِهِ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمَا فِيهِ دَخَلَ فِي نَظَرِهِمَا وَصَحَّ تَنْفِيذُهُ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاخْتِلَافِ لَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الِاتِّفَاقِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مُتَابَعَةِ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ مَعَ بَقَائِهِمَا عَلَى الرَّأْيِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ فَهُوَ عَلَى خُرُوجِهِ مِنْ نَظَرِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنَ الْوَزِيرِ تَنْفِيذُ مَا لَا يَرَاهُ صَوَابًا.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يُشْرِكَ بَيْنَهُمَا فِي النَّظَرِ، وَيُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا لَيْسَ فِيهِ لِلْآخَرِ نَظَرٌ، وَهَذَا يَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَمَلٍ يَكُونُ

فِيهِ عَامَّ النَّظَرِ خَاصَّ الْعَمَلِ، مِثْلَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى أَحَدِهِمَا وَزَارَةَ بِلَادِ الْمَشْرِقِ وَإِلَى الْآخَرِ وَزَارَةَ بِلَادِ الْمَغْرِبِ،

পরিচ্ছেদ:
খলীফার জন্য এটি বৈধ যে, তিনি এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য দুজন নির্বাহী মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। তবে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালনের শর্তে দুজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত (সার্বভৌম) মন্ত্রী নিয়োগ করা বৈধ নয়; কারণ তাঁদের কর্তৃত্বের পরিধি ব্যাপক। ঠিক যেমন একই সময়ে দুজন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) নিয়োগ করা বৈধ নয়। কেননা এতে চুক্তি সম্পাদন, বাতিলকরণ, নিয়োগ ও অব্যাহতির বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধের সম্ভাবনা থাকে। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত} [সূরা আল-আম্বিয়া: ২২]।
যদি তিনি দুজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিয়োগ করেন, তবে তাঁদের নিয়োগের অবস্থা তিনটি বিভাগের বাইরে হবে না:
প্রথম বিভাগ: তিনি তাঁদের প্রত্যেকের হাতে সাধারণ ও ব্যাপক তদারকির ক্ষমতা অর্পণ করবেন। আমরা পূর্বে যে দলীল ও কারণ বর্ণনা করেছি, সেই প্রেক্ষিতে এটি শুদ্ধ হবে না। এমতাবস্থায় তাঁদের নিয়োগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে; যদি তাঁদের একই সময়ে নিয়োগ দেওয়া হয়, তবে উভয়ের নিয়োগই বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি একজন অন্যজনের আগে নিয়োগ পেয়ে থাকেন, তবে প্রথমজনের নিয়োগ বৈধ হবে এবং পরবর্তী জনের নিয়োগ বাতিল গণ্য হবে। নিয়োগের অসারতা এবং অপসারণের (চাকরিচ্যুত করা) মধ্যে পার্থক্য হলো— নিয়োগ অসার বা অবৈধ হলে তা পূর্ববর্তী সকল কার্যক্রমের কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করে, কিন্তু অপসারণ পূর্ববর্তী কার্যক্রমের কার্যকারিতা রদ করে না।
দ্বিতীয় বিভাগ: তিনি তাঁদের তদারকির ক্ষেত্রে অংশীদার করবেন যাতে তাঁরা সম্মিলিতভাবে কাজ করেন এবং তাঁদের কাউকেই এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেবেন না। এটি বৈধ। এক্ষেত্রে মন্ত্রিত্ব তাঁদের উভয়ের সম্মিলিত অধিকারে থাকবে, একক কারো নয়। তাঁদের উভয়ের ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ তাঁরা কার্যকর করবেন। আর যে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ হবে, তা কার্যকর করার ক্ষমতা তাঁদের থাকবে না; বরং সেটি খলীফার সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিত থাকবে এবং এই দুই মন্ত্রীর তদারকির এখতিয়ার বহির্ভূত হয়ে যাবে। এই ধরণের মন্ত্রিত্ব দুই কারণে পূর্ণাঙ্গ বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রিত্ব থেকে সংকুচিত হবে:

এক: যে বিষয়ে তাঁরা একমত হবেন, কেবল তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাঁদের সম্মিলিত হওয়া।
দুই: যে বিষয়ে তাঁরা মতবিরোধ করবেন, তা তাঁদের তদারকির এখতিয়ার থেকে বিচ্যুত হওয়া।
যদি মতভেদের পর তাঁরা কোনো বিষয়ে একমত হন, তবে তা খতিয়ে দেখা হবে; যদি তাঁদের ঐকমত্য কোনো সঠিক সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে হয় তবে তা তাঁদের তদারকির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাঁদের পক্ষ থেকে তা কার্যকর করা শুদ্ধ হবে। কারণ পূর্বের মতভেদ পরবর্তী ঐকমত্যের পথে বাধা নয়। কিন্তু যদি তাঁদের ঐকমত্য কেবল একজনের মতের ওপর অন্যজনের অন্ধ অনুসরণের কারণে হয় অথচ তারা নিজ নিজ ভিন্ন মতে অটল থাকেন, তবে তা তাঁদের তদারকির এখতিয়ারের বাইরেই থাকবে; কারণ মন্ত্রীর জন্য এমন কোনো বিষয় কার্যকর করা বৈধ নয় যা তিনি সঠিক বলে মনে করেন না।
তৃতীয় বিভাগ: তিনি তাঁদের তদারকির ক্ষেত্রে অংশীদার করবেন না, বরং প্রত্যেকের জন্য এমন স্বতন্ত্র বিষয় নির্ধারণ করবেন যেখানে অন্যজনের হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে না। এটি দুইভাবে হতে পারে: হয় তিনি তাঁদের প্রত্যেককে এমন নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেবেন যেখানে তাঁর তদারকি ব্যাপক হবে কিন্তু কর্মক্ষেত্র হবে সীমিত। উদাহরণস্বরূপ, একজনকে তিনি পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের মন্ত্রিত্ব এবং অন্যজনকে পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশসমূহের মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

(ص: 61)الأحكام السلطانية للماوردي

وَإِمَّا أَنْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَظَرٍ يَكُونُ فِيهِ عَامَّ الْعَمَلِ خَاصَّ النَّظَرِ، مِثْلَ أَنْ يَسْتَوْزِرَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْحَرْبِ وَالْآخَرَ عَلَى الْخَرَاجِ، فَيَصِحُّ التَّقْلِيدُ عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ، غَيْرَ إِنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ وَزِيرَيْ تَفْوِيضٍ، وَيَكُونَانِ وَالِيَيْنِ عَلَى عَمَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ؛ لِأَنَّ وَزَارَةَ التَّفْوِيضِ مَا عَمَّتْ وَنَفَذَ أَمْرُ الْوَزِيرَيْنِ بِهَا فِي كُلِّ عَمَلٍ وَكُلِّ نَظَرٍ؛ وَيَكُونُ تَقْلِيدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُورًا عَلَى مَا خُصَّ بِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مُعَارَضَةُ الْآخَرِ فِي نَظَرِهِ وَعَمَلِهِ، وَيَجُوزُ

لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يُقَلِّدَ وَزِيرَيْنِ: وَزِيرَ تَفْوِيضٍ وَوَزِيرَ تَنْفِيذٍ، فَيَكُونُ وَزِيرُ التَّفْوِيضِ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، وَوَزِيرُ التَّنْفِيذِ مَقْصُورًا عَلَى تَنْفِيذِ مَا وَرَدَتْ بِهِ أَوَامِرُ الْخَلِيفَةِ.

وَلَا يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ أَنْ يُوَلِّيَ مَعْزُولًا وَلَا أَنْ يَعْزِلَ مُوَلًّى، وَيَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يُوَلِّيَ الْمَعْزُولَ وَيَعْزِلَ مَنْ وَلَّاهُ، وَلَا يَعْزِلُ مَنْ وَلَّاهُ الْخَلِيفَةُ، وَلَيْسَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ أَنْ يُوَقِّعَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا عَنِ الْخَلِيفَةِ إِلَّا بِأَمْرِهِ، وَيَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يُوَقِّعَ عَنْ نَفْسِهِ إِلَى عُمَّالِهِ وَعُمَّالِ الْخَلِيفَةِ، وَيَلْزَمُهُمْ قَبُولُ تَوْقِيعَاتِهِ؛ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَقِّعَ عَنِ الْخَلِيفَةِ إِلَّا بِأَمْرِهِ فِي عُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ، وَإِذَا عَزَلَ الْخَلِيفَةُ وَزِيرَ التَّنْفِيذِ لَمْ يَنْعَزِلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْوُلَاةِ.

وَإِذَا عَزَلَ وَزِيرَ التَّفْوِيضِ انْعَزَلَ بِهِ عُمَّالُ التَّنْفِيذِ، وَلَمْ يَنْعَزِلْ بِهِ عُمَّالُ التَّفْوِيضِ؛ لِأَنَّ عُمَّالَ التَّنْفِيذِ نُيَّابٌ وَعُمَّالَ التَّفْوِيضِ وُلَاةٌ، وَيَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ نَائِبًا عَنْهُ، وَلَا يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِخْلَافَ تَقْلِيدٌ فَصَحَّ مِنْ وَزِيرِ التَّفْوِيضِ، وَلَمْ يَصِحَّ مِنْ وَزِيرِ التَّنْفِيذِ، وَإِذَا نَهَى الْخَلِيفَةُ وَزِيرَ التَّفْوِيضِ عَنِ الِاسْتِخْلَافِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ، وَإِذَا أَذِنَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ فِي الِاسْتِخْلَافِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَزِيرَيْنِ يَتَصَرَّفُ عَنْ أَمْرِ الْخَلِيفَةِ وَنَهْيِهِ، وَإِنِ افْتَرَقَ حُكْمُهُمَا مَعَ إِطْلَاقِ التَّقْلِيدِ.

وَإِذَا فَوَّضَ الْخَلِيفَةُ تَدْبِيرَ الْأَقَالِيمِ إِلَى وُلَاتِهَا وَوَكَّلَ النَّظَرَ فِيهَا إِلَى الْمُسْتَوْلِينَ عَلَيْهَا - كَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ زَمَانِنَا- جَازَ لِمَالِكِ كُلِّ إِقْلِيمٍ أَنْ يَسْتَوْزِرَ، وَكَانَ حُكْمُ وَزِيرِهِ مَعَهُ كَحُكْمِ وَزِيرِ الْخَلِيفَةِ مَعَ الْخَلِيفَةِ فِي اعْتِبَارِ الْوَزَارَتَيْنِ وَأَحْكَامِ النَّظَرَيْنِ.

অথবা তিনি তাদের প্রত্যেককে এমন এক বিশেষ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করবেন যেখানে তাদের কর্মপরিধি হবে ব্যাপক কিন্তু পর্যবেক্ষণ হবে সুনির্দিষ্ট; যেমন—তাদের একজনকে যুদ্ধের এবং অন্যজনকে রাজস্বের মন্ত্রী নিয়োগ করা। এমতাবস্থায় উভয় পদ্ধতিতেই নিয়োগ বৈধ হবে, তবে তারা পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী (ওয়াজিরে তাফবিদ) হিসেবে গণ্য হবেন না, বরং তারা ভিন্ন ভিন্ন দুটি বিষয়ের শাসক হিসেবে বিবেচিত হবেন। কেননা, পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রিত্বের পরিধি সর্বব্যাপী এবং প্রতিটি কাজ ও পর্যবেক্ষণে এ ধরনের মন্ত্রীদের আদেশ কার্যকর হয়।

এখানে প্রত্যেকের নিয়োগ তার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং একজনের পক্ষে অন্যের পর্যবেক্ষণ ও কর্মপরিধিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না। খলিফার জন্য দুইজন মন্ত্রী নিয়োগ করা বৈধ: একজন পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং অন্যজন নির্বাহী মন্ত্রী (ওয়াজিরে তানফিজ)। পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্বাধীনভাবে কাজ করার পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন, আর নির্বাহী মন্ত্রীর দায়িত্ব কেবল খলিফার পক্ষ থেকে জারিকৃত আদেশসমূহ বাস্তবায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

নির্বাহী মন্ত্রীর জন্য কোনো অপসারিত ব্যক্তিকে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া কিংবা কোনো পদস্থ কর্মকর্তাকে অপসারণ করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী কোনো অপসারিত ব্যক্তিকে পুনরায় নিয়োগ দিতে পারেন এবং তাঁর নিজের নিযুক্ত ব্যক্তিকে পদচ্যুত করতে পারেন; তবে খলিফা যাকে নিযুক্ত করেছেন তাকে তিনি পদচ্যুত করতে পারবেন না। নির্বাহী মন্ত্রী খলিফার আদেশ ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কিংবা খলিফার পক্ষ থেকে কোনো ফরমান জারি করতে পারবেন না। কিন্তু পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী এবং খলিফার কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ জারি করতে পারেন এবং তারা সেই নির্দেশ গ্রহণ করতে বাধ্য। তবে সাধারণ বা বিশেষ কোনো বিষয়ে খলিফার পক্ষ থেকে ফরমান জারির ক্ষেত্রে তাঁর সুনির্দিষ্ট অনুমতির প্রয়োজন হবে। খলিফা যদি নির্বাহী মন্ত্রীকে পদচ্যুত করেন, তবে এর ফলে স্থানীয় শাসকদের কেউ পদচ্যুত হবেন না।

কিন্তু পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে পদচ্যুত করা হলে তাঁর নিযুক্ত নির্বাহী কর্মচারীরাও পদচ্যুত হবেন, তবে তাঁর নিযুক্ত স্বাধীন শাসকরা পদচ্যুত হবেন না। কারণ নির্বাহী কর্মচারীরা হলো প্রতিনিধি মাত্র এবং স্বাধীন শাসকরা হলেন প্রকৃত শাসক। পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন, কিন্তু নির্বাহী মন্ত্রীর জন্য তা বৈধ নয়। কেননা প্রতিনিধি নিয়োগ মূলত এক প্রকার কর্তৃত্ব অর্পণ, যা পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রীর ক্ষেত্রে বৈধ হলেও নির্বাহী মন্ত্রীর ক্ষেত্রে বৈধ নয়। খলিফা যদি পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে নিষেধ করেন, তবে তিনি তা করতে পারবেন না। আবার যদি নির্বাহী মন্ত্রীকে প্রতিনিধি নিয়োগের অনুমতি দেন, তবে তা তাঁর জন্য বৈধ হবে। কারণ নিয়োগের প্রকৃতি ভিন্ন হলেও উভয় মন্ত্রীই খলিফার আদেশ ও নিষেধের ভিত্তিতেই দায়িত্ব পালন করেন।

খলিফা যখন বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপনা সেই অঞ্চলের শাসকদের ওপর ন্যস্ত করেন এবং এর পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব বিজয়ীদের হাতে অর্পণ করেন—যেমনটি আমাদের সমকালীন সময়ে প্রচলিত—তখন প্রতিটি অঞ্চলের অধিপতির জন্য মন্ত্রী নিয়োগ করা বৈধ। সে ক্ষেত্রে তাঁর মন্ত্রীর

বিধানসমূহ ঠিক তেমনই হবে, যেমনটি দুই প্রকার মন্ত্রিত্ব ও দুই প্রকার পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে খলিফার মন্ত্রীর বিধান খলিফার সাথে হয়ে থাকে।

(ص: 62)الأحكام السلطانية للماوردي

الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد

وَإِذَا قَلَّدَ الْخَلِيفَةُ أَمِيرًا عَلَى إِقْلِيمٍ أَوْ بَلَدٍ كَانَتْ إِمَارَتُهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ: فَأَمَّا الْعَامَّةُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: إِمَارَةُ اسْتِكْفَاءٍ بِعَقْدٍ عَنْ اخْتِيَارٍ. وَإِمَارَةُ اسْتِيلَاءٍ بِعَقْدٍ عَنْ اضْطِرَارٍ.

فَإِمَارَةُ الِاسْتِكْفَاءِ الَّتِي تَنْعَقِدُ عَنْ اخْتِيَارِهِ فَتَشْتَمِلُ عَلَى عَمَلٍ مَحْدُودٍ وَنَظَرٍ مَعْهُودٍ، وَالتَّقْلِيدُ فِيهَا أَنْ يُفَوِّضَ إِلَيْهِ الْخَلِيفَةُ إِمَارَةَ بَلَدٍ أَوْ إِقْلِيمٍ وِلَايَةً عَلَى جَمِيعِ أَهْلِهِ وَنَظَرًا فِي الْمَعْهُودِ مِنْ سَائِرِ أَعْمَالِهِ، فَيَصِيرُ عَامَّ النَّظَرِ فِيمَا كَانَ مَحْدُودًا مِنْ عَمَلٍ وَمَعْهُودًا مِنْ نَظَرٍ، فَيَشْتَمِلُ نَظَرُهُ فِيهِ عَلَى سَبْعَةِ أُمُورٍ: أَحَدُهَا: النَّظَرُ فِي تَدْبِيرِ الْجُيُوشِ وَتَرْتِيبِهِمْ فِي النَّوَاحِي وَتَقْدِيرِ أَرْزَاقِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَلِيفَةُ قَدَّرَهَا فَيَذَرُهَا عَلَيْهِمْ.

وَالثَّانِي: النَّظَرُ فِي الْأَحْكَامِ وَتَقْلِيدِ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ.

وَالثَّالِثُ: جِبَايَةُ الْخَرَاجِ وَقَبْضُ الصَّدَقَاتِ وَتَقْلِيدُ الْعُمَّالِ فِيهِمَا وَتَفْرِيقُ مَا اسْتُحِقَّ مِنْهَا.

وَالرَّابِعُ: حِمَايَةُ الدِّينِ وَالذَّبُّ1 عَنِ الْحَرِيمِ وَمُرَاعَاةُ الدِّينِ مِنْ تَغْيِيرٍ أَوْ تَبْدِيلٍ.

وَالْخَامِسُ: إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي حَقِّ اللَّهِ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ.

وَالسَّادِسُ: الْإِمَامَةُ فِي الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ حَتَّى يَؤُمَّ بِهَا أَوْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهَا.

وَالسَّابِعُ: تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ مَنْ عَمِلَهُ وَمَنْ سَلَكَهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ حَتَّى يَتَوَجَّهُوا مُعَانِينَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِقْلِيمُ ثَغْرًا مُتَاخِمًا لِلْعَدُوِّ وَاقْتَرَنَ بِهَا.

الثَّامِنُ: وَهُوَ جِهَادُ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَقَسْمُ غَنَائِمِهِمْ فِي الْمُقَاتِلَةِ وَأَخْذُ خُمُسِهَا لِأَهْلِ الْخُمُسِ وَتُعْتَبَرُ فِي هَذِهِ الْإِمَارَةِ الشروط المعتبرة في وزارة التفويض؛ لأن الفرق بينهما خصوص الولاية في الإمارة وَعُمُومِهَا فِي الْوَزَارَةِ وَلَيْسَ بَيْنَ عُمُومِ الْوِلَايَةِ وَخُصُوصِهَا فَرْقٌ

---

1 الذب: المنع والدفع. [مختار الصحاح: ص 92] .

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন জনপদে নেতৃত্ব প্রদান প্রসঙ্গে

খলীফা যখন কোনো প্রদেশ বা শহরের ওপর কোনো আমির বা প্রশাসক নিযুক্ত করেন, তখন তাঁর সেই নেতৃত্ব দুই প্রকারের হয়ে থাকে: সাধারণ এবং বিশেষ। সাধারণ নেতৃত্ব আবার দুই প্রকার: স্বেচ্ছাধীন চুক্তির মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে অর্পিত নেতৃত্ব এবং অনন্যোপায় হয়ে চুক্তির মাধ্যমে বাধ্যবাধকতামূলক দখলকৃত নেতৃত্ব।

যোগ্যতার ভিত্তিতে অর্পিত নেতৃত্ব যা খলীফার স্বেচ্ছাধীন মনোনয়নের মাধ্যমে গঠিত হয়, তা সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধি এবং প্রচলিত তদারকিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর নিয়োগপদ্ধতি হলো, খলীফা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোনো শহর বা প্রদেশের নেতৃত্ব অর্পণ করবেন, যা সেই অঞ্চলের সকল জনগণের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব এবং এর যাবতীয় প্রচলিত কার্যাবলীর ওপর তাঁর তদারকি নিশ্চিত করবে। ফলে তিনি সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র এবং প্রচলিত প্রশাসনিক বিষয়ে সাধারণ কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন। তাঁর এই তদারকি সাতটি বিষয়কে শামিল করবে: প্রথমটি হলো, সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা, বিভিন্ন প্রান্তরে তাদের বিন্যস্ত করা এবং তাদের রসদ ও ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করা; তবে খলীফা যদি তা আগেই নির্ধারণ করে দিয়ে থাকেন, তবে আমির তা বহাল রাখবেন।

দ্বিতীয়টি হলো, বিচারিক কার্যাবলীর তদারকি করা এবং বিচারক ও কাজীদের নিয়োগ প্রদান করা।

তৃতীয়টি হলো, ভূমির খাজনা আদায় করা, সদকা বা জাকাত গ্রহণ করা, এ উভয় কাজের জন্য কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান করা এবং সংগৃহীত অর্থের মধ্য থেকে যা পাওনা তা হকদারদের মাঝে বণ্টন করা।

চতুর্থটি হলো, দ্বীনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, পবিত্র সীমানা রক্ষা করা এবং দ্বীনকে কোনো প্রকার বিকৃতি বা পরিবর্তন থেকে হেফজত করা।
পঞ্চমটি হলো, আল্লাহর হক এবং বান্দার হকের ক্ষেত্রে নির্ধারিত দণ্ডবিধি বা হুদুদ কার্যকর করা।
ষষ্ঠটি হলো, জুমুআ ও জামাতের নামাজে ইমামতি করা, যাতে তিনি নিজেই ইমামতি করেন অথবা এর জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।
সপ্তমটি হলো, তাঁর নিজস্ব এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত হাজীদের কাফেলা পরিচালনা করা, যাতে তারা প্রয়োজনীয় সহায়তাপ্রাপ্ত হয়ে গন্তব্যে অগ্রসর হতে পারে। আর যদি এই প্রদেশটি শত্রুর সীমান্তবর্তী এলাকা হয়, তবে এর সাথে অষ্টম আরেকটি বিষয় যুক্ত হবে:
অষ্টম বিষয়: আর তা হলো নিকটবর্তী শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা, যোদ্ধাদের মধ্যে গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করা এবং গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বা খুমুস এর হকদারদের জন্য গ্রহণ করা। এই নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও 'ক্ষমতাপ্রাপ্ত উজিরের' জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি বিবেচিত হবে; কারণ এ দুটির মধ্যে পার্থক্য কেবল নেতৃত্বের পরিধির বিশেষত্ব ও ব্যাপকতার ক্ষেত্রে। আর নেতৃত্বের ব্যাপকতা ও বিশেষত্বের মধ্যে [শর্তাবলির দিক থেকে] কোনো পার্থক্য নেই।

---

১. আয-যাব্বু: প্রতিরোধ করা এবং প্রতিহত করা। [মুখতারুস সিহাহ: পৃষ্ঠা ৯২]

(ص: 63)الأحكام السلطانية للماوردي

فِي الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا ثُمَّ يَنْظُرُ فِي عَقْدِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ، فَإِنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ قَدْ تَوَلَّاهُ كَانَ
لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ عَلَيْهِ حَقُّ الْمُرَاعَاةِ وَالتَّصَفُّحِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْلُهُ وَلَا نَقْلُهُ مِنْ إِقْلِيمٍ إِلَى غَيْرِهِ.

وَإِنْ كَانَ الْوَزِيرُ قَدْ تَفَرَّدَ بِتَقْلِيدِهِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَلِّدَهُ عَنْ إِذْنِ الْخَلِيفَةِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ عَزْلُهُ وَلَا نَقْلُهُ عَنْ عَمَلِهِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا عَنْ إِذْنِ الْخَلِيفَةِ وَأَمْرِهِ، وَلَوْ عُزِلَ الْوَزِيرُ لَمْ يَنْعَزِلْ هَذَا الْأَمِيرُ.
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يُقَلِّدَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ نَائِبٌ عَنْهُ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَزْلِهِ وَالِاسْتِبْدَالِ بِهِ بِحَسَبِ مَا يُؤَدِّيهِ الِاجْتِهَادُ إِلَيْهِ مِنَ النَّظَرِ فِي الْأَوْلَى وَالْأَصَحِّ.
وَلَوْ أَطْلَقَ الْوَزِيرُ تَقْلِيدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَلَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ بِأَنَّهُ عَنِ الْخَلِيفَةِ وَلَا عَنْ نَفْسِهِ كَانَ التَّقْلِيدُ عَنْ نَفْسِهِ؛ وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَزْلِهِ، وَمَتَى انْعَزَلَ الْوَزِيرُ انْعَزَلَ هَذَا الْأَمِيرُ، إِلَّا أَنْ يُقَرَّ الْخَلِيفَةُ عَلَى إِمَارَتِهِ، فَيَكُونَ ذَلِكَ تَجْدِيدَ وِلَايَةٍ وَاسْتِئْنَافَ تَقْلِيدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي لَفْظِ الْعَقْدِ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ أَنْ يَقُولَ: قَدْ قَلَّدْتُكَ نَاحِيَةَ كَذَا إِمَارَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَنَظَرًا عَلَى جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَى تَفْصِيلٍ لَا يَدْخُلُهُ إِجْمَالٌ وَلَا يَتَنَاوَلُهُ احْتِمَالٌ، فَإِذَا قَلَّدَ الْخَلِيفَةُ هَذِهِ الْإِمَارَةَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عَزْلٌ لِلْوَزِيرِ عَنْ تَصَفُّحِهَا وَمُرَاعَاتِهَا، وَإِذَا قَلَّدَ الْوَزَارَةَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عَزْلٌ لِهَذَا الْأَمِيرِ عَنْ إِمَارَتِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ عُمُومُ التَّقْلِيدِ وَخُصُوصُهُ فِي الْوِلَايَاتِ السُّلْطَانِيَّةِ كَانَ عُمُومُ التَّقْلِيدِ مَحْمُولًا فِي الْعُرْفِ عَلَى مُرَاعَاةِ الْأَخَصِّ وَتَصَفُّحِهِ، وَكَانَ خُصُوصُ التَّقْلِيدِ مَحْمُولًا عَلَى مُبَاشَرَةِ الْعَمَلِ وَتَنْفِيذِهِ.
وَيَجُوزُ لِهَذَا الْأَمِيرِ أَنْ يَسْتَوْزِرَ لِنَفْسِهِ وَزِيرَ تَنْفِيذٍ بِأَمْرِ الْخَلِيفَةِ وَبِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوْزِرَ وَزِيرَ تَفْوِيضٍ إِلَّا عَنْ إِذْنِ الْخَلِيفَةِ وَأَمْرِهِ؛ لِأَنَّ وَزِيرَ التَّنْفِيذِ مُعَيَّنٌ وَوَزِيرَ التَّفْوِيضِ مُسْتَبِدٌّ.
وَإِذَا أَرَادَ هَذَا الْأَمِيرُ أَنْ يَزِيدَ فِي أَرْزَاقِ1 جَيْشِهِ لِغَيْرِ سَبَبٍ لَمْ يَجُزْ لِمَا فِيهِ مِنَ اسْتِهْلَاكِ مَالٍ فِي غَيْرِ حَقٍّ، وَإِنْ زَادَهُمْ لِحُدُوثِ سَبَبٍ يَقْتَضِيهِ نُظِرَ فِي السَّبَبِ.
فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُرْجَى زَوَالُهُ لَا تَسْتَقِرُّ بِهِ الزِّيَادَةُ عَلَى التَّأْبِيدِ كَالزِّيَادَةِ لِغَلَاءِ سِعْرٍ، أَوْ حُدُوثِ حَدَثٍ، أَوْ نَفَقَةٍ فِي حَرْبٍ جَازَ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَدْفَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَلْزَمُهُ اسْتِثْمَارُ

---

1 يعني الرواتب.

এতে বিবেচ্য শর্তাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। অতঃপর এই ইমারাতের নিয়োগ বা চুক্তিনামা সম্পর্কে পর্যালোচিত হবে। যদি খলিফা নিজেই এই নিয়োগ দিয়ে থাকেন, তবে ‘ওয়াযীরে তাফবীদ’ (সার্বভৌম ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী)-এর উপর তার তদারকি ও পর্যালোচনার অধিকার থাকবে; কিন্তু তাকে পদচ্যুত করা বা এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে বদলি করার ক্ষমতা তার থাকবে না।

আর যদি উজির বা মন্ত্রী তাকে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে একক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন, তবে তা দুই প্রকার:

প্রথমত: খলিফার অনুমতিক্রমে তাকে নিয়োগ দান করা। এমতাবস্থায় খলিফার অনুমতি ও আদেশ ব্যতীত তাকে পদচ্যুত করা বা তার দায়িত্ব থেকে অন্য কোনো দায়িত্বে বদলি করা মন্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। এমনকি মন্ত্রী নিজে পদচ্যুত হলেও এই আমির পদচ্যুত হবেন না।

দ্বিতীয়ত: মন্ত্রী নিজ ক্ষমতা বলে তাকে নিয়োগ দান করা, ফলে তিনি হবেন মন্ত্রীর প্রতিনিধি। এমতাবস্থায় ইজতিহাদের ভিত্তিতে অধিকতর উত্তম ও সঠিক মনে হলে তাকে এককভাবে পদচ্যুত করা এবং তার স্থলাভিষিক্ত করার অধিকার মন্ত্রীর থাকবে।

যদি মন্ত্রী এই আমিরের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা রাখেন অর্থাৎ তিনি এটি খলিফার পক্ষ থেকে নাকি নিজ পক্ষ থেকে করছেন তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করেন, তবে তা মন্ত্রীর নিজের পক্ষ থেকেই হয়েছে বলে গণ্য হবে; সেক্ষেত্রে তাকে পদচ্যুত করার একক অধিকার মন্ত্রীর থাকবে এবং যখনই মন্ত্রী পদচ্যুত হবেন, এই আমিরও পদচ্যুত হয়ে যাবেন; তবে খলিফা যদি তাকে তার পদে বহাল রাখেন, তবে তা হবে একটি নতুন নিয়োগ এবং নতুন করে দায়িত্ব প্রদান। তবে চুক্তির শব্দের ক্ষেত্রে শুরু থেকে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ন্যায় বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন হবে না যে, তিনি বলবেন: "আমি আপনাকে অমুক অঞ্চলের জনগণের আমির হিসেবে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছি"—যেখানে কোনো অস্পষ্টতা বা সংশয়ের অবকাশ থাকবে না। সুতরাং যখন খলিফা এই ইমারাত বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিয়োগ দান করবেন, তখন তাতে মন্ত্রীকে এর তদারকি ও পর্যবেক্ষণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। আবার যখন উজিরকে নিয়োগ দেওয়া হবে, তখন তার দ্বারা এই আমিরের পদচ্যুতি ঘটবে না; কারণ সুলতানি শাসনব্যবস্থায় যখন সাধারণ নিয়োগ এবং

বিশেষ নিয়োগ একত্রিত হয়, তখন প্রথাগতভাবে সাধারণ নিয়োগ বলতে বিশেষ নিয়োগপ্রাপ্তের তদারকি ও পর্যালোচনা বুঝায় এবং বিশেষ নিয়োগ বলতে সরাসরি কাজ পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা বুঝায়।

এই আমিরের জন্য খলিফার আদেশ কিংবা আদেশ ব্যতীতই নিজের জন্য ‘ওয়াযীরে তানফীয’ (নির্বাহী মন্ত্রী) নিযুক্ত করা বৈধ। কিন্তু খলিফার অনুমতি ও আদেশ ব্যতীত ‘ওয়াযীরে তাফবীদ’ (সার্বভৌম ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী) নিযুক্ত করা বৈধ নয়; কারণ ‘ওয়াযীরে তানফীয’ হলেন একজন নির্ধারিত সাহায্যকারী এবং ‘ওয়াযীরে তাফবীদ’ হলেন স্বাধীন কর্তৃত্বসম্পন্ন।

যদি এই আমির অহেতুক কারণে তার সেনাবাহিনীর ভাতা বা বেতনে১ বৃদ্ধি করতে চান, তবে তা বৈধ হবে না; কারণ এতে অনাহক অর্থ বিনষ্ট করার বিষয় রয়েছে। তবে যদি তিনি কোনো অনিবার্য কারণে তাদের ভাতা বৃদ্ধি করেন, তবে সেই কারণটি খতিয়ে দেখতে হবে।

সেই কারণটি যদি এমন হয় যা অচিরেই দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে এই বর্ধিত অংশ স্থায়ী হিসেবে বিবেচিত হবে না। যেমন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, কোনো বিশেষ ঘটনার সূত্রপাত বা যুদ্ধের ব্যয়ভারের কারণে ভাতা বৃদ্ধি করা হলে আমিরের জন্য বায়তুল মাল থেকে এই বর্ধিত অর্থ প্রদান করা বৈধ হবে এবং এক্ষেত্রে বাড়তি কোনো আয় সৃষ্টির দায় তার ওপর থাকবে না।

---

১ অর্থাৎ বেতন বা ভাতাদি।

(ص: 64)الأحكام السلطانية للماوردي

الْخَلِيفَةَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ السِّيَاسَةِ الْمَوْكُولَةِ إلَى اجْتِهَادِهِ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الزِّيَادَةِ مِمَّا يَقْتَضِي اسْتِقْرَارَهَا عَلَى التَّأْبِيدِ -كَالزِّيَادَةِ لِحَرْبٍ- أَبْلَوْا فِيهَا وَقَامُوا بِالنَّصْرِ حَتَّى انْجَلَتْ أَوْقَفَهَا عَلَى اسْتِثْمَارِ الْخَلِيفَةِ فِيهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ التَّفَرُّدُ بِإِمْضَائِهَا، وَيَجُوزُ أَنْ

يَرْزُقَ1 مَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِ الْجَيْشِ وَيَفْرِضَ لَهُمُ الْعَطَاءَ بِغَيْرِ أَمْرٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَفْرِضَ لِجَيْشٍ مُبْتَدَإٍ إِلَّا بِأَمْرٍ.

وَإِذَا فَضَلَ مِنْ مَالِ الْخَرَاجِ فَاضِلٌ عَنْ أَرْزَاقِ جَيْشِهِ حَمَلَهُ إِلَى الْخَلِيفَةِ لِيَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ الْعَامِّ الْمُعَدِّ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، وَإِذَا فَضَلَ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ فَاضِلٌ عَنْ أَهْلِ عَمَلِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ حَمْلُهُ إِلَى الْخَلِيفَةِ، وَصَرْفُهُ فِي أَقْرَبِ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ مِنْ عَمَلِهِ، وَإِذَا نَقَصَ مَالُ الْخَرَاجِ عَنْ أَرْزَاقِ جَيْشِهِ طَالَبَ الْخَلِيفَةَ بِتَمَامِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَلَوْ نَقَصَ مَالُ الصَّدَقَاتِ عَنْ أَهْلِ عَمَلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْخَلِيفَةِ بِتَمَامِهِ؛ لِأَنَّ أَرْزَاقَ الْجَيْشِ مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ، وَحُقُوقُ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ مُعْتَبَرَةٌ بِالْوُجُودِ.

إِذَا كَانَ تَقْلِيدُ الْأَمِيرِ مِنْ قِبَلِ الْخَلِيفَةِ لَمْ يَنْعَزِلْ بِمَوْتِ الْخَلِيفَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْوَزِيرِ انْعَزَلَ بِمَوْتِ الْوَزِيرِ؛ لِأَنَّ تَقْلِيدَ الْخَلِيفَةِ نِيَابَةٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَتَقْلِيدَ الْوَزِيرِ نِيَابَةٌ عَنْ نَفْسِهِ، وَيَنْعَزِلُ الْوَزِيرُ بِمَوْتِ الْخَلِيفَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ بِهِ الْأَمِيرُ؛ لِأَنَّ الْوَزَارَةَ نِيَابَةٌ عَنِ الْخَلِيفَةِ وَالْإِمَارَةَ نِيَابَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهَذَا حُكْمُ أَحَدِ قِسْمَيِ الْإِمَارَةِ الْعَامَّةِ وَهِيَ إِمَارَةُ الِاسْتِكْفَاءِ الْمَعْقُودَةِ عَنِ اخْتِيَارٍ.

وَنَحْنُ نُقَدِّمُ أَمَامَ الْقِسْمِ الْأَخِيرِ مِنْهَا حُكْمَ الْإِمَارَةِ الْخَاصَّةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عَقْدِ الِاخْتِيَارِ، ثُمَّ نَذْكُرُ الْقِسْمَ الثَّانِي: فِي إِمَارَةِ الِاسْتِيلَاءِ الْمَعْقُودَةِ عَنِ اضْطِرَارٍ لِنَبْنِيَ حُكْمَ الِاضْطِرَارِ عَلَى حُكْمِ الِاخْتِيَارِ فَيُعْلَمُ فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شُرُوطٍ وَحُقُوقٍ.

فَأَمَّا الْإِمَارَةُ الْخَاصَّةُ، فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْأَمِيرُ مَقْصُورَ الْإِمَارَةِ عَلَى تَدْبِيرِ الْجَيْشِ وَسِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّبِّ عَنِ الْحَرِيمِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ وَلِجِبَايَةِ الْخَرَاجِ وَالصَّدَقَاتِ.

فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فَمَا افْتَقَرَ مِنْهَا إِلَى اخْتِيَارٍ لِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِيهِ وَافْتَقَرَ إِلَى إِقَامَةِ بَيِّنَةٍ لِتَنَاكُرِ الْمُتَنَازِعِينَ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ التَّعَرُّضُ لِإِقَامَتِهَا؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْأَحْكَامِ الْخَارِجَةِ عَنْ خُصُوصِ

---

1 يعني: يفرض لهم رواتب.

খলিফাকে; কারণ এটি খলিফার ইজতিহাদের ওপর ন্যস্ত প্রশাসনিক রাজনীতির অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি বেতন বৃদ্ধির কারণ এমন হয় যা একে স্থায়ী করার দাবি রাখে—যেমন যুদ্ধের জন্য বৃদ্ধি—যেখানে তারা বীরত্ব প্রদর্শন করেছে এবং বিজয় অর্জিত হওয়া পর্যন্ত তারা সহায়তা করেছে, তবে বিষয়টি খলিফার বিবেচনার ওপর স্থগিত থাকবে এবং আমিরের জন্য এককভাবে তা অনুমোদন করা বৈধ হবে না। তিনি সেনাবাহিনীর সন্তানদের মধ্য থেকে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে তাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারেন ১ এবং তাদের জন্য পূর্ব অনুমতি ছাড়াই ভাতা নির্ধারণ করতে পারেন। তবে নতুন কোনো নতুন গঠিত সেনাবাহিনীর জন্য অনুমতি ব্যতীত ভাতা নির্ধারণ করা জায়েজ নয়।

যখন খরাজ থেকে সেনাবাহিনীর জীবিকা নির্বাহের পর অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তখন তিনি তা খলিফার নিকট প্রেরণ করবেন যাতে তিনি তা জনকল্যাণের জন্য নির্ধারিত সাধারণ বায়তুল মালে জমা রাখতে পারেন। আর যদি জাকাত বা সদকার অর্থ থেকে নিজ কার্যক্ষেত্রের অধিবাসীদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তবে তা খলিফার নিকট পাঠানো তাঁর জন্য আবশ্যক নয়; বরং তা তাঁর কার্যক্ষেত্রের নিকটবর্তী সদকা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের মাঝে ব্যয় করবেন। যদি খরাজ সম্পদ সেনাবাহিনীর জীবিকার তুলনায় কম হয়, তবে তিনি বায়তুল মাল থেকে তা পূর্ণ করার জন্য খলিফার নিকট দাবি করবেন। কিন্তু সদকা বা জাকাতের মাল যদি সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের জন্য অপর্যাপ্ত হয়, তবে তা পূর্ণ করার জন্য খলিফার নিকট দাবি করার অধিকার তাঁর নেই; কারণ সেনাবাহিনীর জীবিকা প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ততার নিরিখে নির্ধারিত, আর সদকার হকদারদের অধিকার বিদ্যমান সম্পদের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল।

যদি আমিরের নিয়োগ খলিফার পক্ষ থেকে হয়, তবে খলিফার মৃত্যুতে তিনি পদচ্যুত হবেন না। কিন্তু যদি নিয়োগ উজিরের পক্ষ থেকে হয়, তবে উজিরের মৃত্যুতে তিনি পদচ্যুত হবেন; কারণ খলিফার নিয়োগ হলো মুসলিমদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব, আর উজিরের নিয়োগ হলো তাঁর নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব। খলিফার মৃত্যুতে উজির পদচ্যুত হন, যদিও আমির পদচ্যুত হন না; কারণ উজিরের পদটি খলিফার প্রতিনিধিত্ব মাত্র, আর ইমারত (আমিরের পদ) হলো মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব। এটি সাধারণ ইমারতের দুই প্রকারের মধ্যে একটির বিধান, যা হলো স্বেচ্ছায় সম্পাদিত যোগ্যতাসম্পন্ন ইমারত (ইমারতে ইস্তিকফা)।

আমরা এর শেষ প্রকারের আগে বিশেষ ইমারতের বিধান উপস্থাপন করছি, কারণ উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় সম্পাদিত চুক্তির সাদৃশ্য রয়েছে। এরপর আমরা দ্বিতীয় প্রকার আলোচনা করব: অর্থাৎ জবরদখল বা বাধ্যবাধকতার ফলে প্রতিষ্ঠিত ইমারত (ইমারতে ইস্তিলা); যাতে আমরা বাধ্যবাধকতামূলক ইমারতের বিধানকে স্বেচ্ছাধীন ইমারতের বিধানের ওপর ভিত্তি করে বর্ণনা করতে পারি এবং এর মাধ্যমে এ দুয়ের মধ্যকার শর্তাবলি ও অধিকারের পার্থক্যগুলো জানা যায়।

বিশেষ ইমারতের ক্ষেত্রে বিষয়টি হলো, আমিরের কর্তৃত্ব কেবল সেনাবাহিনী পরিচালনা, প্রজাদের শাসন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মান-সম্মান রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বিচার বিভাগীয় কার্যাবলি, খরাজ ও সদকা আদায়ের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাঁর থাকবে না।

আর হুদুদ (শরিয়াহ নির্ধারিত দণ্ড) কায়েমের ক্ষেত্রে, যেসব বিষয়ে ফকিহদের মতভেদের কারণে ইজতিহাদের প্রয়োজন হয় এবং বিবাদমান পক্ষগুলোর অস্বীকারের কারণে সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয়, সেসব ক্ষেত্রে দণ্ড কার্যকর করার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাঁর নেই; কারণ এগুলো বিশেষ ইমারতের বহির্ভূত বিচারিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত...

---

১ অর্থাৎ: তাদের জন্য নিয়মিত ভাতা বা বেতন নির্ধারণ করবেন।

(ص: 65)الأحكام السلطانية للماوردي

إمارته، وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى اخْتِيَارٍ وَلَا بَيِّنَةٍ أَوْ افْتَقَرَ إِلَيْهِمَا فَنَفَذَ فِيهِ اجْتِهَادُ الْحَاكِمِ أَوْ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ

عِنْدَهُ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَوْ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ.

فَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ كَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ كَانَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا بِحَالِ الطَّالِبِ، فَإِنْ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى الْحَاكِمِ كَانَ الْحَاكِمُ أَحَقَّ بِاسْتِيفَائِهِ لِدُخُولِهِ

فِي جُمْلَةِ الْحُقُوقِ الَّتِي نَدَبَ الْحَاكِمُ إِلَى اسْتِيفَائِهَا، وَإِنْ عَدَلَ الطَّالِبُ بِاسْتِيفَاءِ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ إِلَى هَذَا الْأَمِيرِ كَانَ الْأَمِيرُ أَحَقَّ بِاسْتِيفَائِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَإِنَّمَا هُوَ مَعُونَةٌ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ وَصَاحِبُ الْمَعُونَةِ هُوَ الْأَمِيرُ دُونَ الْحَاكِمِ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدُّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ -تَعَالَى- الْمَحْضَةُ كَحَدِّ الزِّنَا -جَلْدًا أَوْ رَجْمًا- فَالْأَمِيرُ أَحَقُّ بِاسْتِيفَائِهِ مِنَ الْحَاكِمِ لِدُخُولِهِ فِي قَوَانِينِ السِّيَاسَةِ وَمُوجِبَاتِ الْحِمَايَةِ وَالذَّبِّ عَنِ الْمِلَّةِ.

وَلِأَنَّ تَتَبُّعَ الْمَصَالِحِ مَوْكُولٌ إِلَى الْأُمَرَاءِ الْمَنْدُوبِينَ إِلَى الْبَحْثِ عَنْهَا دُونَ الْحُكَّامِ الْمُرْصَدِينَ لِفَصْلِ التَّنَازُعِ بَيْنَ الْخُصُومِ، فَدَخَلَ فِي حُقُوقِ الْإِمَارَةِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا إِلَّا بِنَصٍّ، وَخَرَجَ مِنْ حُقُوقِ الْقَضَاءِ فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهَا إِلَّا بِنَصٍّ.

وَأَمَّا نَظَرُهُ فِي الْمَظَالِمِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا نَفَذَتْ فِيهِ الْأَحْكَامُ وَأَمْضَاهُ الْقُضَاةُ وَالْحُكَّامُ؛ جَازَ لَهُ النَّظَرُ فِي اسْتِيفَائِهِ مَعُونَةً لِلْمُحِقِّ عَلَى الْمُبْطِلِ، وَانْتِزَاعًا لِلْمُحِقِّ مِنَ الْمُعْتَرِفِ الْمُمَاطِلِ، لِأَنَّهُ مَوْكُولٌ إِلَى الْمَنْعِ مِنَ التَّظَالُمِ وَالتَّغَالُبِ، وَمَنْدُوبٌ إِلَى الْأَخْذِ بِالتَّعَاطُفِ وَالتَّنَاصُفِ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَظَالِمُ مِمَّا تُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْأَحْكَامُ وَيُبْتَدَأُ فِيهَا الْقَضَاءُ مُنِعَ مِنْهُ هَذَا الْأَمِيرُ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَمْ يَتَضَمَّنْهَا عَقْدُ إِمَارَتِهِ وَرَدَّهُمْ إِلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ؛ فَإِنْ نَفَذَ حُكْمُهُ لِأَحَدِهِمْ بِحَقٍّ قَامَ بِاسْتِيفَائِهِ إِنْ ضَعُفَ عَنْهُ الْحَاكِمُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهِ حَاكِمٌ عَدَلَ بِهَا إِلَى أَقْرَبِ الْحُكَّامِ مِنْ بَلَدِهِ إِنْ لَمْ يَلْحَقْهُمَا فِي الْمَصِيرِ إِلَيْهِ مَشَقَّةٌ، فَإِنْ لَحِقَتْ لَمْ يَكْفُلْهُمَا ذَلِكَ وَاسْتَأْمَرَ الْخَلِيفَةُ فِيمَا تَنَازَعَا، وَنَفَذَ حُكْمُهُ فِيهِ.

وَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ مِنْ عَمَلِهِ، فَدَاخِلٌ فِي أَحْكَامِ إِمَارَتِهِ،؛لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَعُونَاتِ الَّتِي نَدَبَ لَهَا.

فَأَمَّا إِمَامَةُ الصَّلَوَاتِ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ، فَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْقُضَاةَ بِهَا أَخَصُّ وَهُوَ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَشْبَهُ، وَقِيلَ إِنَّ الْأُمَرَاءَ بِهَا أَحَقُّ وَهُوَ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَشْبَهُ، فَإِنْ تَاخَمَتْ

وِلَايَةُ هَذَا الْأَمِيرِ ثَغْرًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ جِهَادَ أَهْلِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْخَلِيفَةِ، وَكَانَ عَلَيْهِ حَرْبُهُمْ وَدَفْعُهُمْ

তাঁর শাসনক্ষমতা; তাতে যদি বিষয়টি কোনো নির্বাচন বা সাক্ষ্য-প্রমাণের মুখাপেক্ষী না হয়, অথবা যদি সে দুটির মুখাপেক্ষী হয় এবং তাতে শাসকের ইজতিহাদ কিংবা তাঁর নিকট সাক্ষ্য উপস্থাপিত হয়ে থাকে, তবে তা অবশ্যই হয় মহান আল্লাহর অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে, নতুবা মানুষের অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যদি তা মানুষের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়, যেমন অপবাদের দণ্ড এবং জীবন বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিসাস, তবে বিষয়টি আবেদনকারীর অবস্থার ওপর নির্ভর করবে। যদি সে আমিরের পরিবর্তে বিচারকের শরণাপন্ন হয়, তবে বিচারকই তা কার্যকর করার অধিক হকদার; কারণ এটি সেই সব অধিকারের অন্তর্ভুক্ত যা আদায় করার জন্য বিচারককে নিযুক্ত করা হয়েছে। আর যদি আবেদনকারী দণ্ড বা কিসাস কার্যকর করার জন্য এই আমিরের শরণাপন্ন হয়, তবে আমিরই তা কার্যকর করার অধিক হকদার। কারণ এটি কোনো বিচারিক রায় নয়, বরং হক বা অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে একটি সহযোগিতা মাত্র; আর সহযোগিতার দায়িত্ব বিচারকের পরিবর্তে আমিরের ওপরই বর্তায়। পক্ষান্তরে এই দণ্ড যদি কেবল মহান আল্লাহর অধিকারভুক্ত হয়, যেমন ব্যভিচারের দণ্ড—বেত্রাঘাত বা পাথর নিক্ষেপ—তবে বিচারকের তুলনায় আমিরই তা কার্যকর করার অধিক হকদার। কারণ এটি প্রশাসনিক নিয়মাবলী এবং ধর্মাদর্শের সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষার আবশ্যিক দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

অধিকন্তু জনকল্যাণের অন্বেষণ করা আমিরদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব, যাঁরা তা অনুসন্ধান করার জন্য আদিষ্ট; পক্ষান্তরে বিচারকগণ বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নিয়োজিত। সুতরাং এটি আমিরের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত এবং কোনো অকাট্য দলিল ব্যতীত তা থেকে খারিজ হবে না; এবং এটি বিচারকের অধিকারবহির্ভূত এবং কোনো অকাট্য দলিল ব্যতীত তার অধীনে দাখিল হবে না।

আর জুলুম বা নিপীড়ন সংক্রান্ত তাঁর পর্যালোচনার বিষয়টি হলো—যদি তা এমন হয় যাতে ইতোমধ্যে রায় কার্যকর হয়েছে এবং বিচারক ও শাসকগণ তা অনুমোদন করেছেন, তবে সত্যপন্থীকে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে সহায়তা করার জন্য এবং স্বীকারোক্তি প্রদানকারী টালবাহানাকারীর নিকট থেকে সত্যপন্থীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তাতে হস্তক্ষেপ করা তাঁর জন্য বৈধ। কেননা তাঁর ওপর পারস্পরিক জুলুম ও জবরদস্তি প্রতিরোধ করার দায়িত্ব অর্পিত

হয়েছে এবং তিনি সহানুভূতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট। কিন্তু অভিযোগগুলো যদি এমন হয় যাতে নতুন করে বিচারকার্য বা রায় প্রদানের প্রয়োজন পড়ে, তবে এই আমিরকে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ এটি এমন বিচারিক কার্য যা তাঁর নিয়োগচুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। এমতাবস্থায় তিনি পক্ষগুলোকে স্থানীয় বিচারকের নিকট পাঠিয়ে দেবেন। অতঃপর যদি বিচারক তাদের কারো অনুকূলে কোনো হকের রায় প্রদান করেন এবং বিচারক তা কার্যকর করতে অক্ষম হন, তবে আমির তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যদি তাঁর শহরে কোনো বিচারক না থাকে, তবে তিনি তাদের পার্শ্ববর্তী শহরের নিকটতম বিচারকের নিকট প্রেরণ করবেন—যদি সেখানে যাতায়াতে তাদের কোনো কষ্ট না হয়। আর যদি তাতে কষ্ট হয়, তবে তিনি তাদের ওপর সেই বোঝা চাপিয়ে দেবেন না এবং তাদের বিরোধের বিষয়ে খলিফার নিকট নির্দেশনা প্রার্থনা করবেন এবং খলিফার সিদ্ধান্তই তাতে কার্যকর হবে।

আর তাঁর এলাকা থেকে হাজীদের কাফেলা পরিচালনা করার বিষয়টি তাঁর প্রশাসনিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত; কারণ এটি সেই সব সাধারণ জনসেবার অংশ যার জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছেন।

জুমুআ ও দুই ঈদের সালাতের ইমামতির বিষয়ে বলা হয়েছে যে, বিচারকগণই এর জন্য বেশি নির্দিষ্ট, যা শাফেয়ী মাযহাবের অধিক নিকটবর্তী। আবার বলা হয়েছে যে, আমিরগণই এর জন্য অধিক হকদার, যা আবু হানিফার মাযহাবের অধিক সদৃশ। যদি এই আমিরের প্রশাসনিক সীমানা কোনো সীমান্ত অঞ্চলের সংলগ্ন হয়, তবে খলিফার অনুমতি ব্যতীত সেখানকার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করার অধিকার তাঁর নেই; তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা তাঁর দায়িত্ব।

(ص: 66)الأحكام السلطانية للماوردي

إِنْ هَجَمُوا عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ لِأَنَّ دَفْعَهُمْ مِنْ حُقُوقِ الْحِمَايَةِ وَمُقْتَضَى الذَّبِّ عَنْ الْحَرِيمِ.

وَيُعْتَبَرُ فِي وِلَايَةِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ وَزِيَادَةُ شَرْطَيْنِ عَلَيْهَا هُمَا: الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ، لِمَا تَضَمَّنَتْهَا مِنَ الْوِلَايَةِ عَلَى أُمُورٍ دِينِيَّةٍ لَا تَصِحُّ مَعَ الْكُفْرِ وَالرِّقِّ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ، وَإِنْ كَانَ فَزِيَادَةُ فَضْلٍ، فَصَارَتْ شُرُوطُ الْإِمَارَةِ الْعَامَّةِ مُعْتَبَرَةً بِشُرُوطِ وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عُمُومِ النَّظَرِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي خُصُوصِ الْعَمَلِ.

وَشُرُوطُ الْإِمَارَةِ الْخَاصَّةِ تَقْصُرُ عَنْ شُرُوطِ الْإِمَارَةِ الْعَامَّةِ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْعِلْمُ؛ لِأَنَّ لِمَنْ عَمَّتْ إِمَارَتُهُ أَنْ يَحْكُمَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ خَصَّتْ إِمَارَتُهُ: وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمِيرِينَ مُطَالَعَةُ الْخَلِيفَةِ بِمَا أَمْضَاهُ فِي عَمَلِهِ عَلَى مُقْتَضَى إِمَارَتِهِ إِذَا كَانَ مَعْهُودًا، إِلَّا عَلَى وَجْهِ الِاخْتِيَارِ تَظَاهُرًا بِالطَّاعَةِ، فَإِنْ حَدَثَ حَادِثٌ غَيْرُ مَعْهُودٍ أَوْقَفَاهُ عَلَى مُطَالَعَةِ الْإِمَامِ وَعَمِلَا فِيهِ بِأَمْرِهِ، فَإِنْ خَافَا مِنِ اتِّسَاعِ الْخَرْقِ إِنْ أَوْقَفَاهُ، قَامَا بِمَا يَدْفَعُ هُجُومَهُ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِمَا إِذْنُ الْخَلِيفَةِ فِيمَا يَعْمَلَانِ بِهِ، لِأَنَّ رَأْيَ الْخَلِيفَةِ لِإِشْرَافِهِ عَلَى عُمُومِ الْأُمُورِ أَمْضَى فِي الْحَوَادِثِ النَّازِلَةِ.

وَأَمَّا إِمَارَةُ الِاسْتِيلَاءِ الَّتِي تُعْقَدُ عَنِ اضْطِرَارٍ، فَهِيَ أَنْ يَسْتَوْلِيَ الْأَمِيرُ بِالْقُوَّةِ عَلَى بِلَادٍ يُقَلِّدُهُ الْخَلِيفَةُ إِمَارَتَهَا، وَيُفَوِّضُ إِلَيْهِ تَدْبِيرَهَا وَسِيَاسَتَهَا، فَيَكُونُ الْأَمِيرُ بِاسْتِيلَائِهِ مُسْتَبِدًّا بِالسِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ، وَالْخَلِيفَةُ بِإِذْنِهِ مُنَفِّذًا لِأَحْكَامِ الدِّينِ؛ لِيَخْرُجَ مِنَ الْفَسَادِ إِلَى الصِّحَّةِ وَمِنَ الْحَظْرِ إِلَى الْإِبَاحَةِ، وَهَذَا وَإِنْ خَرَجَ عَنْ عُرْفِ التَّقْلِيدِ الْمُطْلَقِ فِي شُرُوطِهِ وَأَحْكَامِهِ فَفِيهِ مِنْ حِفْظِ الْقَوَانِينِ الشَّرْعِيَّةِ وَحِرَاسَةِ الْأَحْكَامِ الدِّينِيَّةِ مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ مُخْتَلًّا مَخْذُولًا وَلَا فَاسِدًا مَعْلُولًا، فَجَازَ فِيهِ مَعَ الِاسْتِيلَاءِ وَالِاضْطِرَارِ مَا امْتَنَعَ فِي تَقْلِيدِ الِاسْتِكْفَاءِ وَالِاخْتِيَارِ؛ لِوُقُوعِ الْفَرْقِ بَيْنَ شُرُوطِ الْمُكْنَةِ وَالْعَجْزِ.

وَالَّذِي يَتَحَفَّظُ بِتَقْلِيدِ الْمُسْتَوْلِي مِنْ قَوَانِينِ الشَّرْعِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ، فَيَشْتَرِكُ فِي الْتِزَامِهَا الْخَلِيفَةُ الْوَلِيُّ وَالْأَمِيرُ الْمُسْتَوْلِي، وَوُجُوبُهَا فِي جِهَةِ الْمُتَوَلِّي أَغْلَظُ:

أَحَدُهَا: حِفْظُ مَنْصِبِ الْإِمَامَةِ فِي خِلَافَةِ النُّبُوَّةِ وَتَدْبِيرِ أُمُورِ الْمِلَّةِ، لِيَكُونَ مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ مِنْ إِقَامَتِهَا مَحْفُوظًا، وَمَا تَفَرَّعَ عَنْهَا مِنَ الْحُقُوقِ مَحْرُوسًا.

যদি তারা তার অনুমতি ব্যতীত তার ওপর আক্রমণ করে; কারণ তাদের প্রতিহত করা সুরক্ষার অধিকার এবং পবিত্র পরিমণ্ডল রক্ষার দাবি।

এই আমিরাতের পরিচালনার ক্ষেত্রে 'নির্বাহী মন্ত্রণালয়'-এর জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি বিবেচ্য হবে এবং এর সাথে অতিরিক্ত দুটি শর্ত যুক্ত হবে: ইসলাম ও স্বাধীনতা। কারণ এতে এমন দ্বীনি বিষয়াবলির কর্তৃত্ব নিহিত রয়েছে যা কুফর ও দাসত্বের অবস্থায় বৈধ নয়। এই পদের জন্য পাণ্ডিত্য ও ফিকহ শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান থাকা অপরিহার্য নয়, তবে তা থাকলে তা হবে একটি অতিরিক্ত গুণ। ফলে, সাধারণ আমিরাতের শর্তাবলি 'প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রণালয়'-এর শর্তাবলির অনুরূপ গণ্য হয়, কারণ উভয়েরই কর্মপরিধি ব্যাপক, যদিও নির্দিষ্ট কার্যাবলির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

বিশেষ আমিরাতের শর্তাবলি সাধারণ আমিরাতের শর্তাবলি থেকে একটি শর্তের দিক দিয়ে কম, আর তা হলো পাণ্ডিত্য বা ইলম। কারণ যাঁর আমিরাত সাধারণ বা ব্যাপক, তাঁর বিচারকার্য পরিচালনা করার অধিকার থাকে, কিন্তু যাঁর আমিরাত বিশেষ, তাঁর সেই অধিকার নেই। এই দুই আমিরের কারোর জন্যই তাদের ওপর অর্পিত নিয়মিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে খলিফাকে অবহিত করা অপরিহার্য নয়, যদি না তারা আনুগত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় তা করতে চান। তবে যদি কোনো নজিরবিহীন বা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে, তবে তারা ইমামকে বিষয়টি অবহিত করবেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবেন। আর যদি তারা আশঙ্কা করেন যে, ইমামকে অবহিত করার অপেক্ষায় বিলম্ব করলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে, তবে খলিফার নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত তারা উদ্ভূত আক্রমণ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কারণ খলিফার দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক বিষয়াবলির ওপর তাঁর পর্যবেক্ষণের কারণে নতুন সংকটকালীন পরিস্থিতিতে অধিকতর কার্যকর।

আর নিরুপায় হয়ে প্রতিষ্ঠিত 'দখলদারিত্বের আমিরাত'-এর বিষয়টি হলো: কোনো আমির যদি শক্তির বলে কোনো ভূখণ্ড দখল করে নেন এবং খলিফা তাকে সেই অঞ্চলের আমিরাতের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং এর পরিচালনা ও রাজনীতির ভার তার ওপর অর্পণ করেন। ফলে আমির তার দখলের মাধ্যমে শাসন ও ব্যবস্থাপনায় একক কর্তৃত্ব লাভ করেন, আর খলিফা তাঁর অনুমোদনের মাধ্যমে দ্বীনি বিধানাবলি কার্যকর করেন; যাতে তা বিশৃঙ্খলা থেকে শুদ্ধতায় এবং নিষিদ্ধ অবস্থা থেকে বৈধতায় উন্নীত হয়। যদিও এই প্রক্রিয়াটি তার শর্তাবলি ও বিধিবিধানের দিক থেকে সাধারণ নিয়োগ পদ্ধতির পরিপন্থী, তবুও এর মধ্যে শরঈ আইন সংরক্ষণ এবং ধর্মীয় বিধিবিধানের সুরক্ষার এমন বিষয় নিহিত রয়েছে যা বিশৃঙ্খল, পরিত্যক্ত বা ত্রুটিপূর্ণ

অবস্থায় ফেলে রাখা সমীচীন নয়। সুতরাং, সক্ষমতা ও অক্ষমতার শর্তাবলির মধ্যে পার্থক্যের কারণে সাধারণ নিয়োগের ক্ষেত্রে যা নিষিদ্ধ ছিল, দখলদারিত্ব ও নিরুপায় অবস্থার ক্ষেত্রে তা বৈধ হয়ে যায়।

দখলদার আমিরকে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে শরীয়তের যে সাতটি নিয়ম সংরক্ষিত হয়, সেগুলো পালনে খলিফা এবং দখলদার আমির উভয়ই দায়বদ্ধ, তবে সরাসরি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা অধিকতর কঠোর:

প্রথমত: নবুওয়াতের উত্তরসূরি হিসেবে ইমামতের পদমর্যাদা সংরক্ষণ এবং উম্মাহর বিষয়াবলি পরিচালনা করা, যাতে ইমামত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শরীয়ত যা অবধারিত করেছে তা সুরক্ষিত থাকে এবং এ থেকে উদ্ভূত অধিকারসমূহ সংরক্ষিত হয়।

(ص: 67)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالثَّانِي: ظُهُورُ الطَّاعَةِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي يَزُولُ مَعَهَا حُكْمُ الْعِنَادِ فِيهِ وَيَنْتَفِي بِهَا إِثْمُ الْمُبَايَنَةِ1 لَهُ.

وَالثَّالِثُ: اجْتِمَاعُ الْكَلِمَةِ عَلَى الْأُلْفَةِ وَالتَّنَاصُرِ؛ لِيَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ عُقُودُ الْوِلَايَاتِ الدِّينِيَّةِ جَائِزَةً وَالْأَحْكَامُ وَالْأَقْضِيَةُ فِيهَا نَافِذَةً لَا تَبْطُلُ بِفَسَادِ عُقُودِهَا، وَلَا تَسْقُطُ بِخَلَلِ عُهُودِهَا.

وَالْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ اسْتِيفَاءُ الْأَمْوَالِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَقٍّ تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّةُ مُؤَدِّيهَا وَيَسْتَبِيحُهُ آخِذُهَا.

وَالسَّادِسُ: أَنْ تَكُونَ الْحُدُودُ مُسْتَوْفَاةً بِحَقٍّ وَقَائِمَةً عَلَى مُسْتَحَقٍّ؛ فَإِنَّ جَنْبَ الْمُؤْمِنِ حَمِيٌّ إِلَّا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَحُدُودِهِ.

وَالسَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْأَمِيرُ فِي حِفْظِ الدِّينِ وَرِعًا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ يَأْمُرُ بِحَقِّهِ إِنْ أُطِيعَ، وَيَدْعُو إِلَى طَاعَتِهِ إِنْ عُصِيَ، فَهَذِهِ سَبْعُ قَوَاعِدَ فِي قَوَانِينِ الشَّرْعِ يُحْفَظُ بِهَا حُقُوقُ

الْإِمَامَةِ وَأَحْكَامُ الْأُمَّةِ فَلِأَجْلِهَا وَجَبَ تَقْلِيدُ الْمُسْتَوْلِي؛ فَإِنْ كَمُلَتْ فِيهِ شُرُوطُ الِاخْتِيَارِ كَانَ تَقْلِيدُهُ حَيًّا اسْتِدْعَاءً لِطَاعَتِهِ وَدَفْعًا لِمُشَاقَّتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ، وَصَارَ بِالْإِذْنِ لَهُ نَافِذَ التَّصَرُّفِ فِي حُقُوقِ الْمِلَّةِ وَأَحْكَامِ الْأُمَّةِ، وَجَرَى عَلَى مَنْ اسْتَوْزَرَهُ وَاسْتَنَابَهُ لِأَحْكَامِ مَنْ اسْتَوْزَرَهُ الْخَلِيفَةُ وَاسْتَنَابَهُ، وَجَازَ أَنْ يَسْتَوْزِرَ وَزِيرَ تَفْوِيضٍ وَوَزِيرَ تَنْفِيذٍ، فَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ فِي الْمُتَوَلِّي شُرُوطُ الِاخْتِيَارِ جَازَ لِلْخَلِيفَةِ إِظْهَارُ تَقْلِيدِهِ؛ اسْتِدْعَاءً لِطَاعَتِهِ وَحَسْمًا لِمُخَالَفَتِهِ وَمُعَانَدَتِهِ، أَوْ كَانَ نُفُوذُ تَصَرُّفِهِ فِي الْأَحْكَامِ وَالْحُقُوقِ مَوْقُوفًا عَلَى أَنْ يَسْتَنِيبَ لَهُ الْخَلِيفَةُ فِيهَا لِمَنْ قَدْ تَكَامَلَتْ فِيهِ شُرُوطُهَا؛ لِيَكُونَ كَمَالُ الشُّرُوطِ فِيمَنْ أُضِيفَ إِلَى نِيَابَتِهِ جَبْرًا لِمَا أَعْوَزَ مِنْ شُرُوطِهَا فِي نَفْسِهِ، فَيَصِيرُ التَّقْلِيدُ لِلْمُسْتَوْلِي وَالتَّنْفِيذُ مِنَ الْمُسْتَنَابِ.

وَجَازَ مِثْلُ هَذَا وَإِنْ شَذَّ عَنِ الْأُصُولِ لِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الضَّرُورَةَ تُسْقِطُ مَا أَعْوَزَ مِنْ شُرُوطِ الْمُكْنَةِ.

الثَّانِي: أَنَّ مَا خِيفَ انْتِشَارُهُ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ تُخَفَّفُ شُرُوطُهُ عَنْ شُرُوطِ الْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ، فَإِذَا صَحَّتْ إِمَارَةُ الِاسْتِيلَاءِ كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ إِمَارَةِ الِاسْتِكْفَاءِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

---

1 المباينة: المفارقة. وتباين القوم: تهاجروا. [اللسان: 13/ 63] .

দ্বিতীয়: ধর্মীয় আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ, যার মাধ্যমে তার প্রতি অবাধ্যতার হুকুম দূরীভূত হয় এবং তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার১ গুনাহ মিটে যায়।

তৃতীয়: হৃদ্যতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া; যাতে অন্যদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সম্মিলিত শক্তি সুসংহত হয়।

চতুর্থ: ধর্মীয় কর্তৃত্বের নিয়োগসমূহ বৈধ হওয়া এবং তাতে বিচার ও শাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর থাকা; যেন চুক্তিপত্রের ত্রুটির কারণে তা বাতিল না হয় এবং অঙ্গীকারের বিচ্যুতিতে তা অকার্যকর হয়ে না পড়ে।

পঞ্চম: শরয়ি সম্পদসমূহ যথাযথভাবে উসুল করা, যার মাধ্যমে আদায়কারীর দায়মুক্তি ঘটে এবং গ্রহণকারীর জন্য তা ব্যয় করা বৈধ হয়।
ষষ্ঠ: হদ বা নির্ধারিত দণ্ডসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর হওয়া এবং দণ্ড পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তির ওপর তা প্রয়োগ করা; কেননা মুমিনের জান-মাল সুরক্ষিত, তবে আল্লাহর হক ও তাঁর নির্ধারিত দণ্ডসমূহের ক্ষেত্র ব্যতীত।
সপ্তম: দ্বীন হেফাযতের ক্ষেত্রে আমীর বা শাসক আল্লাহর হারামকৃত বিষয়গুলো থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন; যদি তার আনুগত্য করা হয় তবে তিনি আল্লাহর হক অনুযায়ী আদেশ দেবেন, আর যদি অবাধ্যতা করা হয় তবে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহ্বান করবেন। এগুলি শরয়ি বিধানের সাতটি মূলনীতি, যার মাধ্যমে ইমামতের অধিকার ও উম্মাহর বিধানসমূহ সংরক্ষিত হয়। এ কারণেই ক্ষমতা দখলকারী ব্যক্তির নিয়োগ বা স্বীকৃতি প্রদান ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি তার মধ্যে নির্বাচনের শর্তাবলি পূর্ণ থাকে, তবে তাকে ক্ষমতায় বহাল রাখা হলো তার আনুগত্য নিশ্চিত করা এবং তার সঙ্গে বিবাদ ও বিরোধিতা দূর করার একটি মাধ্যম। খলিফার অনুমোদনের ফলে উম্মাহর অধিকার ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে তার পদক্ষেপসমূহ কার্যকর হবে। তিনি যাদের উজির বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন, তাদের হুকুম খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত উজির ও প্রতিনিধিদের মতোই হবে। তিনি 'তফবীজ' (পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত) উজির বা 'তানফীজ' (বাস্তবায়নকারী) উজির নিয়োগ করতে পারবেন। আর যদি ক্ষমতা দখলকারীর মধ্যে নির্বাচনের শর্তাবলি পূর্ণ না থাকে, তবে খলিফা তার আনুগত্য নিশ্চিত করতে এবং অবাধ্যতা ও হঠকারিতা বন্ধ করতে তার নিয়োগ প্রকাশ করতে পারেন। অথবা বিধান ও অধিকারের ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্বের কার্যকারিতা খলিফা কর্তৃক এমন একজন যোগ্য প্রতিনিধি নিয়োগের ওপর নির্ভরশীল হবে যার মধ্যে শর্তাবলি পূর্ণ রয়েছে; যাতে সেই প্রতিনিধির যোগ্যতার দ্বারা শাসকের নিজের অযোগ্যতা পূরণ হয়। এমতাবস্থায় নিয়োগটি হবে ক্ষমতা দখলকারীর নামে, আর কার্যকর করার ক্ষমতা থাকবে সেই প্রতিনিধির কাছে।
যদিও এটি মূলনীতির পরিপন্থী, তবুও দুটি কারণে তা জায়েয:
এক. প্রয়োজনীয়তা বা অপারগতা সক্ষমতার শর্তাবলির ঘাটতিকে মার্জনা করে দেয়।
দুই. জনস্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সেক্ষেত্রে শর্তাবলিকে ব্যক্তিগত স্বার্থের শর্তাবলির তুলনায় শিথিল করা হয়। যখন জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের শাসন বৈধ সাব্যস্ত হয়, তখন এর সাথে সক্ষমতা ভিত্তিক শাসনের পার্থক্য চারটি দিক থেকে পরিলক্ষিত হয়:
---

১ মুবায়ানাহ: বিচ্ছিন্ন হওয়া। এবং 'তাবায়ানাল কওমু' অর্থ: তারা একে অপরকে বর্জন করেছে। [লিসান: ১৩/৬৩]

(ص: 68)الأحكام السلطانية للماوردي

أَحَدُهَا: أَنَّ إِمَارَةَ الِاسْتِيلَاءِ مُتَعَيِّنَةٌ فِي الْمُتَوَلِّي وَإِمَارَةَ الِاسْتِكْفَاءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى اخْتِيَارِ الْمُسْتَكْفِي.

وَالثَّانِي: أَنَّ إِمَارَةَ الِاسْتِيلَاءِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبِلَادِ الَّتِي غَلَبَ عَلَيْهَا الْمُتَوَلِّي، وَإِمَارَةَ الِاسْتِكْفَاءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى الْبِلَادِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا عَهْدُ الْمُتَكَفِّي.

وَالثَّالِثُ: أَنَّ إِمَارَةَ الِاسْتِيلَاءِ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْهُودِ النَّظَرِ وَنَادِرِهِ، وَإِمَارَةُ الِاسْتِكْفَاءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَعْهُودِ النَّظَرِ دُونَ نَادِرِهِ.

وَالرَّابِعُ: أَنَّ وَزَارَةَ التَّفْوِيضِ تَصِحُّ فِي إِمَارَةِ الِاسْتِيلَاءِ وَلَا تَصِحُّ فِي إِمَارَةِ الِاسْتِكْفَاءِ؛ لِوُقُوعِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُسْتَوْلِي وَوَزِيرِهِ فِي النَّظَرِ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْوَزِيرِ مَقْصُورٌ عَلَى الْمَعْهُودِ، وَلِلْمُسْتَوْلِي أَنْ يَنْظُرَ فِي النَّادِرِ وَالْمَعْهُودِ، وَإِمَارَةُ الِاسْتِكْفَاءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى النَّظَرِ الْمَعْهُودِ فَلَمْ تَصِحَّ مَعَهَا وَزَارَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مِثْلِهَا مِنَ النَّظَرِ الْمَعْهُودِ لِاشْتِبَاهِ حَالِ الْوَزِيرِ بِالْمُسْتَوْزِرِ.

প্রথমটি হলো: বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত শাসনক্ষমতা শাসনকর্তার ওপর অবধারিত হয়, অন্যদিকে অর্পিত শাসনক্ষমতা নিয়োগকর্তার নির্বাচনের ওপর সীমাবদ্ধ থাকে।
দ্বিতীয়টি হলো: বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত শাসনক্ষমতা সেই সমস্ত জনপদকে অন্তর্ভুক্ত করে যা শাসনকর্তা জয় করেছেন, আর অর্পিত শাসনক্ষমতা কেবলমাত্র নিয়োগপত্রের চুক্তিতে উল্লিখিত জনপদসমূহের ওপর সীমাবদ্ধ থাকে।

তৃতীয়টি হলো: বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত শাসনক্ষমতা সাধারণ এবং ব্যতিক্রমী—উভয় প্রকার প্রশাসনিক তদারকির অধিকার প্রদান করে, কিন্তু অর্পিত শাসনক্ষমতা কেবলমাত্র সাধারণ তদারকির ওপর সীমাবদ্ধ থাকে, এতে ব্যতিক্রমী বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয় না।
চতুর্থটি হলো: বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত শাসনক্ষমতায় 'অর্পিত মন্ত্রিত্ব' (ওয়াযারাতুত তাফবীদ) নিয়োগ করা বৈধ, কিন্তু অর্পিত শাসনক্ষমতায় তা বৈধ নয়। এর কারণ হলো, বিজয়ী শাসক ও তার মন্ত্রীর প্রশাসনিক এখতিয়ারের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান; মন্ত্রীর এখতিয়ার কেবল সাধারণ তদারকির মধ্যে সীমাবদ্ধ, অথচ বিজয়ী শাসক সাধারণ ও ব্যতিক্রমী—উভয় বিষয়ে তদারকি করতে পারেন। অন্যদিকে, অর্পিত শাসনক্ষমতা যেহেতু নিজেই সাধারণ তদারকির মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই এর অধীনে একই ধরণের সাধারণ তদারকির এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো মন্ত্রিত্ব বৈধ নয়; কারণ এতে মন্ত্রীর অবস্থা ও নিয়োগকারী আমিরের অবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য ও অস্পষ্টতা তৈরি হবে।

(ص: 69)الأحكام السلطانية للماوردي

الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد

وَالْإِمَارَةُ عَلَى الْجِهَادِ مُخْتَصَرَةٌ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ. وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ مَقْصُورَةً عَلَى سِيَاسَةِ الْجَيْشِ وَتَدْبِيرِ الْحَرْبِ؛ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا شُرُوطُ الْإِمَارَةِ الْخَاصَّةِ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يُفَوَّضَ إِلَى الْأَمِيرِ فِيهَا جَمِيعُ أَحْكَامِهَا مِنْ قَسْمِ الْغَنَائِمِ وَعَقْدِ الصُّلْحِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهَا شُرُوطُ الْإِمَارَةِ الْعَامَّةِ، وَهِيَ أَكْبَرُ الْوِلَايَاتِ الْخَاصَّةِ أَحْكَامًا وَأَوْفَرُهَا فُصُولًا وَأَقْسَامًا، وَحُكْمُهَا إِذَا خُصَّتْ دَاخِلٌ فِي حُكْمِهَا إِذَا عَمَّتْ، فَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ إِيجَازًا.

وَالَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ إِذَا عَمَّتْ سِتَّةُ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فِي تَسْيِيرِ الْجَيْشِ، وَعَلَيْهِ فِي السَّيْرِ بِهِمْ سَبْعَةُ حُقُوقٍ:

أَحَدُهَا: الرِّفْقُ بِهِمْ فِي السَّيْرِ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَضْعَفُهُمْ وَتُحْفَظُ بِهِ قُوَّةُ أَقْوَاهُمْ، وَلَا يَجِدَّ السَّيْرَ فَيَهْلَكُ الضَّعِيفُ وَيَسْتَفْرِغُ جَلَدَ الْقَوِيِّ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَذَا الدِّينُ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى وَشَرُّ السَّيْرِ الْحَقْحَقَةُ1" 2.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "الْمُضْعَفُ أَمِيرُ الرُّفْقَةِ"3.

يُرِيدُ أَنَّ مَنْ ضَعُفَتْ دَابَّتُهُ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَسِيرُوا بِسَيْرِهِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَتَفَقَّدَ خَيْلَهُمُ الَّتِي يُجَاهِدُونَ عَلَيْهَا وَظُهُورَهُمُ الَّتِي يَمْتَطُونَهَا، فَلَا يُدْخِلُ فِي خَيْلِ الْجِهَادِ ضَخْمًا كَبِيرًا، وَلَا ضَرْعًا صَغِيرًا، وَلَا حَطَمًا كَسِيرًا، وَلَا أَعْجَفَ زَارِحًا هَزِيلًا؛

---

1 الحقحقة: هو أشد السير وقيل: هو أن يجتهد في السير ويلح فيه حتى تعطب راحلته أو تقف عند ذلك.

2 ضعيف: ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف "2022".

3 ذكره صاحب عون المعبود، فقال: وقال السيوطي: وجاء في بعض طرق الحديث: "المضعف أمير الرفقة"، أي: يسيرون سير الضعيف لا يتقدمونه فيتخلف عنهم ويبقى بمضيعة. انتهى.

চতুর্থ অধ্যায়: জিহাদের নেতৃত্ব প্রদান প্রসঙ্গে

জিহাদের নেতৃত্ব মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: এটি কেবল সেনাবাহিনীর পরিচালনা এবং যুদ্ধ ব্যবস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা; এক্ষেত্রে বিশেষ নেতৃত্বের (ইমারতে খাসসা) শর্তাবলি বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় প্রকার: সেনাপতির নিকট জিহাদ সংক্রান্ত সকল বিধান অর্পণ করা, যেমন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গণিমত) বণ্টন এবং সন্ধি স্থাপন। এটি বিশেষ শাসনকর্তৃত্বের (বিলায়তে খাসসা) মধ্যে বিধি-বিধানের দিক থেকে সর্ববৃহৎ এবং পরিচ্ছেদ ও ভাগের দিক থেকে সর্বাধিক সমৃদ্ধ। এর পরিধি

যখন সীমিত থাকে, তখন তার বিধান সাধারণ বা বিস্তৃত পরিধির বিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে আমরা সাধারণ নেতৃত্বের আলোচনার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকলাম। যখন এর পরিধি সাধারণ হয়, তখন এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি ছয়টি ভাগে বিভক্ত:
প্রথম ভাগ: সেনাবাহিনী পরিচালনা প্রসঙ্গে। তাদের নিয়ে পথ চলার ক্ষেত্রে আমীরের ওপর সাতটি দায়িত্ব অর্পিত হয়:
প্রথমত: পথ চলার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি এমন নম্রতা প্রদর্শন করা যা তাদের মধ্যে দুর্বলতম ব্যক্তি সহ্য করতে পারে এবং যার মাধ্যমে সবলদের শক্তিও সংরক্ষিত থাকে। তিনি যেন অতি দ্রুত পথ না চলেন, যার ফলে দুর্বলরা ধ্বংস হয়ে যায় এবং সবলদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই এই দ্বীন সুদৃঢ়, সুতরাং তোমরা এতে নম্রতার সাথে প্রবেশ করো। কারণ, যে ব্যক্তি তার বাহনকে অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত করে ফেলে, সে না পথ অতিক্রম করতে পারে, না তার বাহনটিকে অবশিষ্ট রাখতে পারে। আর নিকৃষ্টতম চলন হলো হাকহাকাহ ১" ২।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "দুর্বল ব্যক্তিই হলো কাফেলার নেতা" ৩।
এর অর্থ হলো, যার বাহন দুর্বল, কাফেলার লোকজনের উচিত তার গতির সাথে মিলিয়ে পথ চলা।
দ্বিতীয়ত: তিনি তাদের সেই ঘোড়াগুলোর তদারকি করবেন যা নিয়ে তারা জিহাদ করছে এবং সেই বাহনগুলোরও যা তারা আরোহণ করছে। সুতরাং জিহাদের ঘোড়াগুলোর মধ্যে তিনি অতি স্থূল, অতি অল্পবয়স্ক, পঙ্গু বা জরাগ্রস্ত এবং অত্যন্ত রুগ্ণ ও দুর্বল ঘোড়া অন্তর্ভুক্ত করবেন না;
---
১ হাকহাকাহ: এটি হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত পথ চলা। কারো মতে: এর অর্থ হলো পথ চলার ক্ষেত্রে চরম পরিশ্রম করা এবং একনাগাড়ে চলতে থাকা, যতক্ষণ না বাহনটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে অথবা অকেজো হয়ে থেমে যায়।
২ জয়ীফ: শেখ আলবানী 'জয়ীফ' (২০২২) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।
৩ 'আওনুল মাবুদ' গ্রন্থের লেখক এটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: সুয়ূতী রহ. বলেছেন: হাদীসের কোনো কোনো সূত্রে এসেছে "দুর্বল ব্যক্তিই কাফেলার আমীর", অর্থাৎ তারা দুর্বলের গতি অনুযায়ী পথ চলবে, তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে না, যাতে সে পিছিয়ে পড়ে ধ্বংসের মুখে না পড়ে। সমাপ্ত।

لِأَنَّهَا لَا تَقِي وَرُبَّمَا كَانَ ضَعْفُهَا وَهْنًا، وَيَتَفَقَّدُ ظُهُورَ الِامْتِطَاءِ وَالرُّكُوبِ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى السَّيْرِ وَيَمْنَعُ مَنْ حَمَلَ زِيَادَةً عَلَى طَاقَتِهَا، قَالَ اللَّهُ -تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: 60] .

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ، فَإِنَّ ظُهُورَهَا لَكُمْ عِزٌّ، وَبُطُونَهَا لَكُمْ كَنْزٌ"1.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يُرَاعِيَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ وَهُمْ صِنْفَانِ: مُسْتَرْزِقَةٌ وَمُتَطَوِّعَةٌ، فَأَمَّا الْمُسْتَرْزِقَةُ فَهُمْ أَصْحَابُ الدِّيوَانِ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ وَالْجِهَادِ، يُفْرَضُ لَهُمُ الْعَطَاءُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنَ الْفَيْءِ بِحَسَبِ الْغِنَى وَالْحَاجَةِ.

وَأَمَّا الْمُتَطَوِّعَةُ فَهُمُ الْخَارِجُونَ عَنْ الدِّيوَانِ مِنَ الْبَوَادِي وَالْأَعْرَابِ وَسُكَّانِ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي النَّفِيرِ الَّذِي نَدَبَ اللَّهُ -تَعَالَى- إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 41] .

وَفِي قَوْله -تَعَالَى: {خِفَافًا وَثِقَالًا} .

أَرْبَعَةُ تَأْوِيلَاتٍ2:

أَحَدُهَا: شُبَّانًا وَشُيُوخًا. قَالَهُ الْحَسَنُ وَعِكْرِمَةُ.

وَالثَّانِي: أَغْنِيَاءَ وَفُقَرَاءَ قَالَهُ أَبُو صَالِحٍ.

وَالثَّالِثُ: رُكْبَانًا وَمُشَاةً قَالَهُ أَبُو عُمَرَ.

وَالرَّابِعُ: ذَا عِيَالٍ وَغَيْرِ ذِي عِيَالٍ قَالَهُ الْفَرَّاءُ. وَهَؤُلَاءِ يُعْطَوْنَ مِنَ الصَّدَقَاتِ دُونَ الْفَيْءِ مِنْ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَذْكُورِ فِي آيَةِ الصَّدَقَاتِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ الْفَيْءِ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الصَّدَقَاتِ وَلَا يُعْطَى أَهْلُ الْفَيْءِ الْمُسْتَرْزِقَةُ مِنَ الدِّيوَانِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْفَيْءِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ مَالٌ لَا

يَجُوزُ أَنْ يُشَارِكَ غَيْرُهُ فِيهِ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ صَرْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَالَيْنِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، وَقَدْ مَيَّزَ اللَّهُ تَعَالَى

---

1 لم أقف عليه.

2 انظر: تفسير ابن جرير "10/ 138".

কারণ তা সুরক্ষা প্রদান করতে পারে না এবং অনেক সময় এর দুর্বলতা ভীরুতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি সওয়ারি ও আরোহণের পশুগুলোর অবস্থা তদারকি করবেন; ফলে যে পশু পথ চলতে অক্ষম সেগুলোকে বের করে দেবেন এবং পশুর সক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে নিষেধ করবেন। মহান আল্লাহ বলেন: "আর তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি ও যুদ্ধের ঘোড়া প্রস্তুত রাখো।" [আল-আনফাল: ৬০]।
এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা ঘোড়া পালন করো, কেননা এর পিঠ তোমাদের জন্য সম্মান এবং এর পেট তোমাদের জন্য গুপ্তধন।" ১।
তৃতীয়ত: তার সাথে থাকা যোদ্ধাদের তত্ত্বাবধান করা; তারা দুই প্রকার: বেতনভুক্ত এবং স্বেচ্ছাসেবী। বেতনভুক্ত যোদ্ধারা হলেন সরকারি দপ্তরের তালিকাভুক্ত ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) ও জিহাদের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ, বায়তুল মাল থেকে ফায়-এর অংশ হতে তাদের সচ্ছলতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ভাতা নির্ধারিত করা হয়।
আর স্বেচ্ছাসেবীরা হলেন তারা যারা সরকারি দপ্তরের তালিকাভুক্ত নন, যেমন মরুচারী বেদুইন এবং গ্রাম ও নগরের অধিবাসী, যারা সেই সাধারণ আহ্বানে সাড়া দিয়ে বের হয়েছেন যার প্রতি মহান আল্লাহ এই বলে উৎসাহ দিয়েছেন: "তোমরা হালকা বা ভারী যে কোনো অবস্থাতেই অভিযানে বের হও এবং আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করো।" [আত-তাওবাহ: ৪১]।
এবং মহান আল্লাহর বাণী: "হালকা বা ভারী অবস্থায়" এর ব্যাপারে চারটি ব্যাখ্যা রয়েছে ২:
প্রথমটি: যুবক ও বৃদ্ধ অবস্থায়। এটি হাসান ও ইকরিমাহ বলেছেন।
দ্বিতীয়টি: ধনী ও দরিদ্র অবস্থায়। এটি আবু সালিহ বলেছেন।
তৃতীয়টি: সওয়ারি ও পদব্রজে। এটি আবু উমর বলেছেন।

চতুর্থটি: পরিবার-পরিজন সম্পন্ন ও পরিবারহীন অবস্থায়। এটি আল-ফাররা বলেছেন। এদেরকে সদকা থেকে প্রদান করা হবে, ফায় থেকে নয়; যা সদকা বিষয়ক আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দিষ্ট খাত থেকে দেওয়া হয়। তাদের ফায় থেকে প্রদান করা বৈধ নয়, কারণ তাদের হক হলো সদকায়। অনুরূপভাবে সরকারি দপ্তরের তালিকাভুক্ত ফায়-এর অধিকারী বেতনভুক্তদের সদকার সম্পদ থেকে প্রদান করা হবে না; কারণ তাদের হক হলো ফায়-এর সম্পদে। এই দুই দলের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট সম্পদ রয়েছে যেখানে অন্য দলের অংশীদার হওয়া বৈধ নয়। তবে ইমাম আবু হানিফা প্রয়োজন অনুসারে উভয় প্রকারের সম্পদ উভয় দলের প্রত্যেকের জন্য ব্যয় করা বৈধ বলেছেন। আর মহান আল্লাহ পৃথক করেছেন—

---

১. আমি এর উৎস খুঁজে পাইনি।

২. দেখুন: তাফসীরে ইবনে জারীর "১০/ ১৩৮"।

(ص: 71)الأحكام السلطانية للماوردي

بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ فَلَمْ يَجُزْ الْجَمْعُ بَيْنَ مَا فَرَّقَ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يُعَرِّفَ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ الْعُرَفَاءَ1، وَيَنْقُلَ عَلَيْهِمَا النُّقَبَاءَ؛ لِيَعْرِفَ مِنْ عُرَفَائِهِمْ وَنُقَبَائِهِمْ أَحْوَالَهُمْ وَيَقْرَبُونَ عَلَيْهِ إذَا دَعَاهُمْ، فَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ فِي مَغَازِيهِ وَقَالَ اللَّهُ -تَعَالَى: {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: 13] ..

وَفِيهَا ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ لِلشُّعُوبِ النَّسَبَ الْأَقْرَبَ. وَالْقَبَائِلِ النَّسَبَ الْأَبْعَدَ قَالَهُ مُجَاهِدٌ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الشُّعُوبَ عَرَبُ قَحْطَانَ، وَالْقَبَائِلَ عَرَبُ عَدْنَانَ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّ الشُّعُوبَ بُطُونُ الْعَجَمِ، وَالْقَبَائِلَ بُطُونُ الْعَرَبِ.

وَالْخَامِسُ: أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شِعَارًا يَتَدَاعَوْنَ بِهِ لِيَصِيرُوا مُتَمَيِّزِينَ وَبِالِاجْتِمَاعِ مُتَظَافِرِينَ.

رَوَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ: يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَشِعَارَ الْخَزْرَجِ: يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ، وَشِعَارَ الْأَوْسِ: يَا بَنِي عُبَيْدِ اللَّهِ، وَسَمَّى خَيْلَهُ خَيْلَ اللَّهِ.

وَالسَّادِسُ: أَنْ يَتَصَفَّحَ الْجَيْشَ وَمَنْ فِيهِ؛ لِيُخْرِجَ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ فِيهِ تَخْذِيلٌ لِلْمُجَاهِدِينَ وَإِرْجَافٌ لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ عَيْنًا عَلَيْهِمْ لِلْمُشْرِكِينَ.

فَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ ابْنَ سَلُولَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ لِتَخْذِيلِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ -تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [البقرة: 193] .

أَيْ لَا يَفْتِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

وَالسَّابِعُ: أَنْ لَا يُمَالِئَ مَنْ نَاسَبَهُ أَوْ وَافَقَ رَأْيَهُ وَمَذْهَبَهُ عَلَى مَنْ بَايَنَهُ فِي نَسَبٍ أَوْ خَالَفَهُ فِي رَأْيٍ وَمَذْهَبٍ، فَيُظْهِرُ مِنْ أَحْوَالِ الْمُبَايَنَةِ مَا تُفَرَّقُ بِهِ الْكَلِمَةُ الْجَامِعَةُ - تَشَاغُلًا بِالتَّقَاطُعِ وَالِاخْتِلَافِ، وَقَدْ أَغْضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُنَافِقِينَ وَهُمْ أَضْدَادٌ فِي الدِّينِ، وَأَجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمَ الظَّاهِرِ حَتَّى قَوِيَتْ بِهِمُ الشَّوْكَةُ وَكَثُرَ بِهِمُ الْعَدَدُ وَتَكَامَلَتْ بِهِمُ الْقُوَّةُ، وَوَكَلَهُمْ فِيمَا أَضْمَرَتْهُ قُلُوبُهُمْ مِنْ النِّفَاقِ إلَى عَلَّامِ الْغُيُوبِ الْمُؤَاخِذِ بِضَمَائِرِ الْقُلُوبِ.

قَالَ اللَّهُ -تَعَالَى:

---

1 قال ابن الأثير: العرفاء؛ جمع عريف وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم، فعيل بمعنى فاعل، والعرافة عمله. [اللسان: 9/ 239] .

দুই দলের মধ্যে; সুতরাং যা পৃথক করে দেওয়া হয়েছে তা একত্রিত করা বৈধ নয়।

চতুর্থত: উভয় দলের জন্য তদারককারী বা পরিদর্শক (উরাফা) নিযুক্ত করা এবং তাদের ওপর গোত্রপ্রধান বা প্রতিনিধি (নুকাবা) নিয়োগ করা; যেন তিনি তাদের এই পরিদর্শক ও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাদের অবস্থা জানতে পারেন এবং যখনই তাদের আহ্বান করা হয়, তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হতে পারে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যুদ্ধসমূহে এরূপ করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {এবং আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার} [সূরা হুজুরাত: ১৩] ..

এর ব্যাপারে তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

প্রথমটি: 'শুউব' (জাতি) বলতে নিকটবর্তী বংশধারা এবং 'কাবায়িল' (গোত্র) বলতে দূরবর্তী বংশধারাকে বোঝায়। এটি মুজাহিদ বলেছেন।

দ্বিতীয়টি: 'শুউব' হলো কাহতানি আরব এবং 'কাবায়িল' হলো আদনানি আরব।

তৃতীয়টি: 'শুউব' হলো অনারবদের শাখা-উপশাখা এবং 'কাবায়িল' হলো আরবদের শাখা-উপশাখা।

পঞ্চমত: প্রত্যেক দলের জন্য একটি সংকেত বা প্রতীক নির্ধারণ করা যার মাধ্যমে তারা একে অপরকে ডাকবে, যাতে তারা স্বতন্ত্র হতে পারে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে শক্তিশালী করতে পারে।

উরওয়া ইবনুল জুবাইর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজিরদের প্রতীক নির্ধারণ করেছিলেন: হে বনী আবদুর রহমান, খাজরাজদের প্রতীক: হে বনী আবদুল্লাহ এবং আওসদের প্রতীক: হে বনী উবায়দুল্লাহ। আর তিনি তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে আল্লাহর বাহিনী নামে অভিহিত করেছিলেন।

ষষ্ঠত: সেনাবাহিনী এবং এর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা; যেন তাদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিদের বের করে দেওয়া যায় যারা মুজাহিদদের মনোবল ভেঙে দেয়, মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় অথবা মুশরিকদের পক্ষ হয়ে গোয়েন্দাগিরি করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোনো এক যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ সে মুসলমানদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছিল। আর মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়} [সূরা বাকারা: ১৯৩]।

অর্থাৎ, যেন তোমাদের একে অপরকে ফিতনায় না ফেলে।

সপ্তমত: বংশগত বা মতাদর্শগত মিল থাকার কারণে কারো প্রতি এমন পক্ষপাতিত্ব না করা যা ভিন্ন বংশ বা ভিন্ন মতের মানুষের বিরুদ্ধে যায়। এর ফলে বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যা বিবাদ ও অনৈক্যে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে খণ্ডিত করে ফেলে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদের ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিলেন যদিও তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে শত্রু ছিল; তিনি তাদের ওপর বাহ্যিক বিধান প্রয়োগ করেছিলেন যতক্ষণ না তাদের মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি পায়, সংখ্যাধিক্য ঘটে এবং সামরিক সামর্থ্য পূর্ণতা পায়। আর তাদের অন্তরে লুক্কায়িত নিফাকের বিচারের ভার তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন, যিনি অন্তরের গূঢ় রহস্যের হিসাব গ্রহণকারী।
মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

---

১. ইবনুল আসীর বলেছেন: 'উরাফা' হলো 'আরিফ'-এর বহুবচন। তিনি হলেন গোত্র বা জনসমষ্টির দায়িত্বশীল ব্যক্তি, যিনি তাদের বিষয়াদি দেখাশোনা করেন এবং আমীর তাঁর নিকট থেকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন। এটি 'ফায়ীল' (فعيل) এর ওজনে 'ফায়িল' (فاعل) অর্থে ব্যবহৃত। আর 'আরাফাহ' হলো তাঁর কর্ম বা দায়িত্ব। [লিসানুল আরব: ৯/ ২৩৯]।

(ص: 72)الأحكام السلطانية للماوردي

{وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: 46] .
وَفِيهِ تَأْوِيلَانِ:
أَحَدُهُمَا: إِنَّ الْمُرَادَ بِالرِّيحِ الدَّوْلَةُ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ.
وَالثَّانِي: إِنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْقُوَّةُ، فَضَرَبَ الرِّيحَ بِهَا مَثَلًا لِقُوَّتِهَا1.
فَصْلٌ:
وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ فِي تَدْبِيرِ الْحَرْبِ، وَالْمُشْرِكُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ صِنْفَانِ:

صِنْفٌ مِنْهُمْ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ فَامْتَنَعُوا مِنْهَا وَتَابُوا عَلَيْهَا، فَأَمِيرُ الْجَيْشِ مُخَيَّرٌ فِي قِتَالِهِمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ يَفْعَلُ مِنْهُمَا مَا عَلِمَ أَنَّهُ الْأَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَنْكَأُ لِلْمُشْرِكِينَ؛ مِنْ بَيَاتِهِمْ لَيْلًا وَنَهَارًا بِالْقِتَالِ وَالتَّحْرِيقِ، وَأَنْ يُنْذِرَهُمْ بِالْحَرْبِ وَيُصَافَّهُمْ بِالْقِتَالِ. وَالصِّنْفُ الثَّانِي: لَمْ تَبْلُغْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَقَلَّ أَنْ يَكُونُوا الْيَوْمَ؛ لِمَا قَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ مِنْ دَعْوَةِ رَسُولِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْمٌ مِنْ وَرَاءِ مَنْ يُقَابِلُنَا مِنَ التُّرْكِ وَالرُّومِ فِي مَبَادِئِ الْمَشْرِقِ وَأَقَاصِيّ الْمَغْرِبِ لَا نَعْرِفُهُمْ، فَيَحْرُمُ عَلَيْنَا الْإِقْدَامُ عَلَى قِتَالِهِمْ غِرَّةً وَبَيَاتًا بِالْقَتْلِ وَالتَّحْرِيقِ، وَأَنْ نَبْدَأَهُمْ بِالْقَتْلِ قَبْلَ إِظْهَارِ دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ لَهُمْ، وَإِعْلَامِهِمْ مِنْ مُعْجِزَاتِ النُّبُوَّةِ وَإِظْهَارِ الْحُجَّةِ بِمَا يَقُودُهُمْ إِلَى الْإِجَابَةِ، فَإِنْ قَامُوا عَلَى الْكُفْرِ بَعْدَ ظُهُورِهَا لَهُمْ حَارَبَهُمْ، وَصَارُوا فِيهِ كَمَنْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125] .

يَعْنِي: ادْعُ إِلَى دِينِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ، وَفِيهَا تَأْوِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: بِالنُّبُوَّةِ.

وَالثَّانِي: بِالْقُرْآنِ.

قَالَ الْكَلْبِيُّ: وَفِي الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ تَأْوِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: الْقُرْآنُ فِي لِينٍ مِنَ الْقَوْلِ، قَالَهُ الْكَلْبِيُّ.

---

1 انظر: تفسير ابن جرير "10/ 16".

{আর তোমরা বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রভাব বিলুপ্ত হবে} [আল-আনফাল: ৪৬] .

এর ব্যাখ্যায় দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি: এখানে ‘রিহ’ (বায়ু) দ্বারা রাষ্ট্র বা প্রতিপত্তি বোঝানো হয়েছে; এটি আবু উবায়দ বলেছেন।

দ্বিতীয়টি: এটি দ্বারা শক্তি বোঝানো হয়েছে; বাতাসের প্রাবল্যের কারণে একে শক্তির উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে।১

পরিচ্ছেদ:
যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে এই নেতৃত্বের বিধানাবলির দ্বিতীয় বিভাগ হলো; আর দারুল হারবে মুশরিকরা দুই প্রকার:
এক প্রকার হলো তারা, যাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে কিন্তু তারা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে অটল থেকেছে। সুতরাং সেনাপতি তাদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে দুটি বিষয়ের মধ্যে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা রাখেন; তিনি এ দুটির মধ্য থেকে তাই করবেন যা তিনি মুসলমানদের জন্য অধিক কল্যাণকর এবং মুশরিকদের জন্য অধিক ক্ষতিকারক বলে জানবেন; যেমন রাত বা দিনে অতর্কিতে আক্রমণের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করা ও অগ্নিসংযোগ করা, অথবা যুদ্ধের সতর্কতা প্রদান করা এবং সারিবদ্ধভাবে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়া।
দ্বিতীয় প্রকার: যাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি। বর্তমানে এমন জাতি বিরল; কারণ আল্লাহ তাঁর রাসূলের দাওয়াতকে প্রকাশিত করেছেন। তবে যদি এমন কোনো সম্প্রদায় তুর্কি ও রোমানদের মতো আমাদের সম্মুখবর্তী জাতিগুলোর পেছনে প্রাচ্যের শুরুতে কিংবা দূর পাশ্চাত্যের প্রান্তে থাকে যাদের সম্পর্কে আমরা জানি না, তবে তাদের ওপর অতর্কিতে বা রাতে হঠাৎ আক্রমণ করে হত্যা ও অগ্নিসংযোগ করা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। ইসলামের দাওয়াত তাদের নিকট পেশ করার আগে এবং নবুওয়াতের মুজিজাসমূহ জানানোর ও সত্যের সপক্ষে দলিল উপস্থাপনের আগে যুদ্ধ শুরু করা আমাদের জন্য বৈধ নয়। যদি দাওয়াত পৌঁছানোর পরও তারা কুফরের ওপর অটল থাকে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে এবং তারা তাদের ন্যায় গণ্য হবে যাদের কাছে ইতিপূর্বেই দাওয়াত পৌঁছেছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: {আপনি আপনার রবের পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায়} [আন-নাহল: ১২৫] .
অর্থাৎ: হিকমতের মাধ্যমে আপনার রবের দ্বীনের দিকে আহ্বান করুন। আর এর ব্যাখ্যায় দুটি অভিমত রয়েছে:
প্রথমটি: নবুওয়াতের মাধ্যমে।
দ্বিতীয়টি: কুরআনের মাধ্যমে।
কালবী বলেন: উত্তম উপদেশের ব্যাখ্যায় দুটি অভিমত রয়েছে:
প্রথমটি: নম্রভাবে কথা বলার মাধ্যমে কুরআনের দাওয়াত প্রদান; এটি কালবী-র উক্তি।
---

১ দেখুন: তাফসিরে ইবনে জারির "১০/ ১৬"।

(ص: 73)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالثَّانِي: مَا فِيهِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.
{وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} .
أَيْ: يُبَيِّنُ لَهُمُ الْحَقَّ وَيُوَضِّحُ لَهُمُ الْحُجَّةَ، فَإِنْ بَدَأَ بِقِتَالِهِمْ قَبْلَ دُعَائِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَإِنْذَارِهِمْ بِالْحُجَّةِ وَقَتْلِهِمْ غُرَّةً وَبَيَاتًا ضَمِنَ دِيَاتِ نُفُوسِهِمْ، وَكَانَتْ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَدِيَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَقِيلَ: بَلْ كَدِيَاتِ الْكُفَّارِ عَلَى اخْتِلَافِهَا اخْتِلَافِ مُعْتَقِدِهِمْ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا دِيَةَ عَلَى قَتْلِهِمْ وَنُفُوسُهُمْ هَدَرٌ، وَإِذَا تَقَاتَلَتْ الصُّفُوفُ فِي الْحَرْبِ جَازَ لِمَنْ قَاتَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ بِمَا يَشْتَهِرُ بِهِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، وَيَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ جَمِيعِ الْجَيْشِ، بِأَنْ يَرْكَبَ الْأَبْلَقَ1 وَإِنْ كَانَتْ خُيُولُ النَّاسِ دُهْمًا وَشُقْرًا، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْإِعْلَامِ رُكُوبَ الْأَبْلَقِ، وَلَيْسَ لِمَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ وَجْهٌ، رَوَى عَبْدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: "تَسَوَّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ"2.
وَيَجُوزُ أَنْ يُجِيبَ إِلَى الْبِرَازِ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهِ.
فَقَدْ دَعَا أُبَيّ بْنُ خَلَفٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبِرَازِ يَوْمَ أُحُدٍ فَبَرَزَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ، وَأَوَّلُ حَرْبٍ شَهِدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ، بَرَزَ فِيهَا مِنْ شُرَفَاءِ قُرَيْشٍ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَابْنُهُ الْوَلِيدُ وَأَخُوهُ شَيْبَةُ وَدَعَوْا إِلَى الْبِرَازِ، فَبَرَزَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَنْصَارِ عَوْفٌ وَمَسْعُودٌ ابْنَا عَفْرَاءَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَقَالُوا: لِيَبْرُزْ أَكْفَاؤُنَا إِلَيْنَا فَمَا نَعْرِفُكُمْ، فَبَرَزَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، بَرَزَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْوَلِيدِ

فَقَتَلَهُ، وَبَرَزَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَى عُتْبَةَ فَقَتَلَهُ، وَبَرَزَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ إِلَى شَيْبَةَ فَاخْتَلَفَا بِضَرْبَتَيْنِ أَثْبَتَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَمَاتَ شَيْبَةُ لِوَقْتِهِ وَاحْتُمِلَ عُبَيْدَةُ حَيًّا قَدْ قُدَّتْ رِجْلُهُ فَمَاتَ بِالصَّفْرَاءِ، فَقَالَ فِيهِ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ3 "مِنْ الْمُتَقَارِبِ":

---

1 البلق: سواد وبياض، وكذلك البلقة -بالضم.

2 ضعيف: رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه "32722"، وفي إسناده عمير بن إسحاق.

3 هو الصحابي الجليل كعب بن مالك بن عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم -ينتهي إلى الخزرج- الأنصاري السلمي، أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن، أمه ليلى بنت زيد بن ثعلبة من بني سلمة. شهد العقبة واختُلِفَ في شهوده بدرًا، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين طلحة بن عبيد الله حين آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يردُّون الأذى عنه.

وعرف به، وأسلم وشهد أحدًا والمشاهد كلها حاشا تبوك، فإنه تخلَّف عنها، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا.

দ্বিতীয়ত: এর মধ্যে যা আদেশ ও নিষেধ রয়েছে।

{এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন এমন পদ্ধতিতে যা সর্বোত্তম}।

অর্থাৎ: তিনি তাদের নিকট সত্য বর্ণনা করবেন এবং তাদের জন্য দলিল সুস্পষ্ট করবেন। সুতরাং তিনি যদি তাদের ইসলামের দাওয়াত প্রদান এবং দলিলের মাধ্যমে সতর্ক করার পূর্বেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং অতর্কিত আক্রমণে বা রাতের অন্ধকারে তাদের হত্যা করেন, তবে তিনি তাদের জীবনের রক্তপণ পরিশোধের দায়ভার গ্রহণ করবেন। ইমাম শাফিঈর মাযহাবের অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এই রক্তপণ মুসলিমদের রক্তপণের সমপরিমাণ হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন: বরং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিন্নতা অনুযায়ী তা কাফেরদের ভিন্ন ভিন্ন রক্তপণের ন্যায় হবে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন: তাদের হত্যার জন্য কোনো রক্তপণ নেই এবং তাদের জীবন নিষ্ফল। যুদ্ধের ময়দানে যখন কাতারগুলো পরস্পরের মোকাবিলা করে, তখন কোনো মুসলিম

যোদ্ধার জন্য এমন কোনো চিহ্ন ব্যবহার করা বৈধ যা তাকে দুই কাতারের মাঝে পরিচিত করে তুলবে এবং পুরো সেনাবাহিনী থেকে তাকে পৃথক করবে; যেমন চিত্রবিচিত্র ঘোড়ায় আরোহণ করা, যদিও অন্যদের ঘোড়া কালো বা লালচে রঙের হয়। ইমাম আবু হানিফা চিত্রবিচিত্র ঘোড়ায় আরোহণ করে নিজেকে জাহির করা নিষেধ করেছেন, কিন্তু তার এই নিষেধাজ্ঞার কোনো সুনির্দিষ্ট ভিত্তি নেই। ইবনে আউনিল্লাহ ইবনে উমাইর আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদরের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন: "তোমরা নিজেদের বিশেষ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করো, কারণ ফেরেশতারাও নিজেদের বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত করেছিলেন।"
আর দ্বন্দ্বযুদ্ধের (একাকী লড়াই) আহ্বান জানানো হলে তাতে সাড়া দেওয়া বৈধ।
কেননা ওহুদ যুদ্ধের দিন উবাই ইবনে খালাফ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল, তখন তিনি তার মোকাবিলায় অগ্রসর হলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম যে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন তা ছিল বদরের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কুরাইশদের অভিজাতদের মধ্য থেকে উতবা ইবনে রবিয়া, তার পুত্র ওয়ালিদ এবং তার ভাই শায়বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল। আনসারদের মধ্য থেকে আউফ ও মাসউদ (আফরার দুই পুত্র) এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তাদের মোকাবিলায় বের হলেন। তখন তারা (কুরাইশরা) বলল: "আমাদের সমকক্ষদের আমাদের মোকাবিলায় বের করো, আমরা তোমাদের চিনি না।" তখন বনী হাশিমের তিন ব্যক্তি তাদের মোকাবিলায় বের হলেন। আলী ইবনে আবু তালিব ওয়ালিদের মোকাবিলায় বের হয়ে তাকে হত্যা করলেন। হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব উতবার মোকাবিলায় বের হয়ে তাকে হত্যা করলেন। আর উবায়দাহ ইবনুল হারিস শায়বার মোকাবিলায় বের হলেন এবং তারা একে অপরকে আঘাত করলেন, ফলে তারা উভয়েই পরস্পরকে ঘায়েল করলেন। শায়বা তৎক্ষণাৎ মারা গেল এবং উবায়দাহকে জীবন্ত অবস্থায় নিয়ে আসা হলো যার পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, অতঃপর তিনি সাফরা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তার সম্পর্কে কাব ইবনে মালিক "মুতাক্বারিব" ছন্দে বলেছিলেন:

---

১. আল-বালক্ব: সাদা ও কালোর মিশ্রণ, তদ্রূপ আল-বুলক্বাহ—পেশ যোগে।
২. দুর্বল: ইবনে আবি শাইবা তার 'মুসান্নাফ' (৩২৭২২) গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদে উমাইর ইবনে ইসহাক রয়েছেন।

৩. তিনি হলেন মহান সাহাবী কাব ইবনে মালিক ইবনে আমর ইবনুল কাইন ইবনে কাব ইবনে সাওয়াদ ইবনে গানাম—যিনি খাযরাজ গোত্র পর্যন্ত বিস্তৃত—আনসারী সালামী, আবু আব্দুল্লাহ, এবং কারো মতে আবু আব্দুর রহমান। তার মা লাইলা বিনতে যাইদ ইবনে সালাবা বনী সালামা গোত্রের। তিনি আকাবার বাইয়াতে উপস্থিত ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে উপস্থিত থাকার বিষয়ে মতভেদ আছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরি করেন, তখন তার ও তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্যতম কবি ছিলেন যারা রাসূলের পক্ষ থেকে অপপ্রচারের জবাব দিতেন।
তিনি এর মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে ওহুদসহ অন্যান্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, তবে তাবুক যুদ্ধে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই তিনজনের একজন যাদের তওবা কবুল হওয়া পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

(ص: 74)الأحكام السلطانية للماوردي

أَيَا عَيْنُ جُودِي وَلَا تَبْخَلِي ... بِدَمْعِكِ وَكُفًّا وَلَا تَنْزُرِي
عَلَى سَيِّدٍ هَدَّنَا هُلْكُهُ ... كَرِيمِ الْمَشَاهِدِ وَالْعُنْصُرِيّ
عُبَيْدَةُ أَمْسَى وَلَا نَرْتَجِيـ ... ـهِ لِعُرْفٍ غَدَا وَلَا مُنْكَرِ
وَقَدْ كَانَ يَحْمِي عُدَاةَ الْقِتَا ... لِ حَامِيَةُ الْجَيْشِ بِالْمُبْتِرِ
ثُمَّ نَذَرَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ لِوَحْشِيّ نَذْرًا إنْ قَتَلَ حَمْزَةَ بِأَبِيهَا يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمَّا قَتَلَهُ بَقَرَتْ بَطْنَهُ وَلَاكَتْ كَبِدَهُ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- وَأَنْشَأَتْ تَقُولُ مِنَ السَّرِيعِ:
نَحْنُ جَزَيْنَاكُمْ بِيَوْمِ بَدْرِ ... وَالْحَرْبُ بَعْدَ الْحَرْبِ ذَاتُ سُعُرِ
مَا كَانَ عَنْ عُتْبَةَ لِي مِنْ صَبْرِ ... وَلَا أَخِي وَعَمِّهِ وَبَكْرِ
شَفَيْتُ نَفْسِي وَقَضَيْتُ نَذْرِي ... شَفَيْتَ وَحْشِيُّ غَلِيلَ صَدْرِي

فَشُكْرُ وَحْشِيّ عَلَيَّ عُمْرِي ... حَتَّى تُضَمَّ أَعْظُمِي فِي قَبْرِي

هَذَا أَقَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَبَ أَهْلِهِ إِلَيْهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ مُبَارَزَةِ يَوْمِ بَدْرٍ مَعَ ضَنِّهِ بِهِمْ وَإِشْفَاقِهِ عَلَيْهِمْ، وَبَارَزَ أُبَيًّا بِنَفْسِهِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَذِنَ لِعَلِيّ عليه السلام فِي حَرْبِ الْخَنْدَقِ وَالْخَطْبُ أَصْعُبُ، وَإِشْفَاقُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَلِيّ أَكْثَرُ، بَارَزَ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ1 لَمَّا دَعَا إِلَى الْبِرَازِ أَوَّلَ يَوْمٍ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ دَعَا إِلَى الْبِرَازِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ دَعَا إِلَى الْبِرَازِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَقَالَ حِينَ رَأَى الْإِحْجَامَ عَنْهُ وَالْحَذَرَ مِنْهُ: يَا مُحَمَّدُ، أَلَسْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ قَتْلَاكُمْ فِي الْجَنَّةِ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وَقَتْلَانَا فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ؟ فَمَا يُبَالِي أَحَدُكُمْ لِيُقْدُمَ عَلَى كَرَامَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوْ يُقَدِّمَ عَدُوًّا إِلَى النَّارِ وَأَنْشَأَ يَقُولُ "مِنَ الْكَامِلِ":

وَلَقَدْ دَنَوْتُ إِلَى النِّدَاءِ ... لِجَمْعِهِمْ هَلْ مِنْ مُبَارِز

---

1 عمرو بن عبد ود، كان يقال له: ذو الشدي؛ وكان فارس قريش، وهو أوّل من جزع الخندق؛ وقال الشاعر:

عمرو بن عبد كان أول فارس ... جزع المذاد وكان فارس يليل

المذاد: موضع الخندق وفيه حفر، ويليل: قريب من بدر، وادٍ يدفع على بدر، وبارز عمرو بن عبد على بن أبي طالب يوم الخندق فقتله عليّ.

হে চক্ষু! অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জন দাও, কৃপণতা করো না ... অবিরাম ধারায় ঝরাও এবং অশ্রু সংবরণ করো না।

সেই নেতার স্মরণে, যাঁর মৃত্যু আমাদের বিধ্বস্ত করেছে ... যিনি ছিলেন সভা ও বংশমর্যাদায় অনন্য।

উবায়দাহ এমন এক সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছেন যে, আমরা আর তাঁর কাছে ... কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণের প্রত্যাশা করি না (তিনি পরলোকে)।

তিনি যুদ্ধের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতেন … তাঁর ধারালো তরবারি দিয়ে বাহিনীর রক্ষক হিসেবে।

অতঃপর হিন্দা বিনতে উতবাহ ওয়াহশিকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, যদি সে উহুদের দিন তার পিতার বদলায় হামজাকে হত্যা করতে পারে (তবে সে তাকে পুরস্কৃত করবে)। যখন ওয়াহশি তাঁকে (হামজা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে) শহীদ করল, তখন হিন্দা তাঁর পেট চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে ফেলল—আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন—এবং সে দ্রুত ছন্দে (সারি' কাব্যে) এই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল:

আমরা তোমাদের বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়েছি … যুদ্ধের পর যুদ্ধ সর্বদাই লেলিহান শিখার মতো।

উতবাহর বিয়োগ ব্যথায় আমার সবুর ছিল না … আর না ছিল ধৈর্য আমার ভাই, তার চাচা এবং বকরের জন্য।

আমি আমার কলিজা শীতল করেছি এবং আমার মানত পূরণ করেছি … হে ওয়াহশি! তুমি আমার বুকের দহন জুড়িয়ে দিয়েছ।

ওয়াহশির প্রতি এই কৃতজ্ঞতা আমার সারা জীবন থাকবে … যতক্ষণ না কবরে আমার হাড়গুলো বিলীন হয়ে যায়।

আর আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিবের মধ্য থেকে তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়তে অনুমোদন দিয়েছিলেন, যদিও তাঁদের প্রতি তাঁর গভীর মমতা ও উৎকণ্ঠা ছিল। উহুদের দিন তিনি স্বয়ং উবাইয়ের সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। খন্দকের যুদ্ধের দিন পরিস্থিতি যখন অত্যন্ত কঠিন ছিল এবং আলীর (আলাইহিস সালাম) প্রতি তাঁর উৎকণ্ঠা যখন আরও বেশি ছিল, তখন তিনি তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের অনুমতি দেন। আলী তখন আমর ইবনে আবদ উদের সাথে লড়াইয়ে নামেন, যে কি না লড়াইয়ের প্রথম দিন আহ্বান জানিয়েছিল কিন্তু কেউ তাতে সাড়া দেয়নি। এরপর সে দ্বিতীয় দিন আহ্বান জানায়, তখনও কেউ সাড়া দেয়নি। অতঃপর সে তৃতীয় দিন আহ্বান জানায় এবং মুসলমানদের মধ্যে ভীতি ও সংকোচ দেখে সে বিদ্রূপ করে বলতে লাগল: হে মুহাম্মদ! তোমরা কি দাবি করো না যে তোমাদের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতে জীবিত আছে এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে রিযিক প্রাপ্ত হচ্ছে, আর আমাদের নিহতরা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করছে? তবে তোমাদের কেউ কেন পরোয়া করছে না যে সে তার রবের পক্ষ থেকে সম্মান (শাহাদাত) প্রাপ্ত

হবে অথবা তার শত্রুকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে? এরপর সে 'কামিল' ছন্দে আবৃত্তি করতে লাগল:

আমি তাদের সমাবেশের দিকে চিৎকার করে অগ্রসর হয়েছি ... এই বলে যে, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আছে কি?

---

১. আমর ইবনে আবদ উদ; তাকে 'জুস সাদি' বলা হতো। সে ছিল কুরাইশদের অশ্বারোহী বীর এবং সে-ই প্রথম পরিখা অতিক্রম করেছিল। এক কবি বলেছেন:

আমর ইবনে আবদ ছিল প্রথম অশ্বারোহী ... যে মিজাদ অতিক্রম করেছিল এবং সে ছিল ইয়ালিল প্রান্তরের বীর যোদ্ধা।

মিজাদ হলো খন্দক বা পরিখার স্থান যেখানে গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। আর ইয়ালিল হলো বদরের নিকটবর্তী একটি উপত্যকা যা বদরের দিকে ধাবিত হয়েছে। খন্দকের দিন আলী ইবনে আবি তালিব এই আমর ইবনে আবদের সাথে মল্লযুদ্ধে লড়েন এবং আলী তাকে হত্যা করেন।

(ص: 75)الأحكام السلطانية للماوردي

وَوَقَفْتُ إِذْ جَبُنَ الْمُشَجَّعُ ... مَوْقِفَ الْقِرْنِ الْمُنَاجِزْ

إِنِّي كَذَلِكَ لَمْ أَزَلْ ... مُتَسَرِّعًا نَحْوَ الْهَزَاهِزْ

إِنَّ الشَّجَاعَةَ فِي الْفَتَى ... وَالْجُودَ مِنْ خَيْرِ الْغَرَائِزْ

فَقَامَ عَلِيٌّ عليه السلام فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُبَارَزَةِ، فَأَذِنَ لَهُ وَقَالَ: "اُخْرُجْ يَا عَلِيُّ فِي حِفْظِ اللَّهِ وَعِيَاذِهِ"، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ مِنَ "الْكَامِلِ":

أَبْشِرْ أَتَاكَ يُجِيبُ صَوْ ... تَكَ فِي الْهَزَاهِزِ غَيْرُ عَاجِزْ

ذُو نِيَّةٍ وَبَصِيرَةٍ ... يَرْجُو الْغَدَاةَ نَجَاةَ فَائِزْ

إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِـ ... ـيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزْ

مِنْ طَعْنَةٍ نَجْلَاءَ يَبْـ ... ـهَرُ ذِكْرُهَا عِنْدَ الْهَزَائِزْ

وَتَجَاوَلَا وَثَارَتْ عَجَاجَةٌ1 أَخْفَتْهُمَا عَنِ الْأَبْصَارِ، ثُمَّ انْجَلَتْ عَنْهُمَا وَعَلِيٌّ عليه السلام يَمْسَحُ سَيْفَهُ بِثَوْبِ عَمْرٍو وَهُوَ قَتِيلٌ؛ حَكَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي مَغَازِيهِ، فَدَلَّ هَذَانِ الْخَبَرَانِ عَلَى جَوَازِ الْبِرَازِ مَعَ التَّغْرِيرِ بِالنَّفْسِ، فَأَمَّا إِذَا أَرَادَ الْمُقَاتِلُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى الْبِرَازِ مُبْتَدِئًا فَقَدْ مَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، لِأَنَّ الدُّعَاءَ إِلَى الْبِرَازِ وَالِابْتِدَاءَ بِالتَّطَاوُلِ بَغْيٌ، وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهُ إِظْهَارُ قُوَّةٍ فِي دِينِ اللَّهِ -تَعَالَى وَنُصْرَةِ رَسُولِهِ، فَقَدْ نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مِثْلِهِ وَحَثَّ عَلَيْهِ وَتَخَيَّرَ لَهُ، مَعَ اسْتِظْهَارِهِ بِنَفْسِهِ مَنْ أَقْدَمَ عَلَيْهِ وَبَدَأَ بِهِ.

حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ وَأَخَذَ سَيْفًا فَهَزَّهُ وَقَالَ: "مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ"؟ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ هَزَّهُ الثَّانِيَةَ وَقَالَ: "مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ"؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَقَالَ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَوَجَدَا فِي أَنْفُسِهِمَا، ثُمَّ عَرَضَهُ الثَّالِثَةَ وَقَالَ: "مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ"؟ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ فَقَالَ: وَمَا حَقُّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَنْ تَضْرِبَ فِي الْعَدُوِّ حَتَّى يَنْحَنِيَ"، فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَأَعْلَمَ بِعِصَابَةٍ حَمْرَاءَ

---

1 أعجَّت الريح، وعَجَّت: اشتدَّ هبوبها وساقت العجاج، والعجاج: مثير العجاج. والتعجيج: إثارة الغبار. [اللسان: 2/ 320] .

আমি অটল রইলাম যখন সাহসী ব্যক্তিও ভীরু হয়ে পড়েছিল ... রণক্ষেত্রে সম্মুখযোদ্ধার ন্যায়।
আমি তেমনই রয়েছি, সর্বদা ... যুদ্ধের সংকটের দিকে ধাবমান।
নিশ্চয়ই যুবকের মাঝে বীরত্ব ... এবং দানশীলতা সর্বোত্তম স্বভাবসমূহের অন্তর্ভুক্ত।
অতঃপর আলী (আলাইহিস সালাম) দাঁড়িয়ে দ্বৈরথ যুদ্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন: "হে আলী, আল্লাহর রক্ষা ও আশ্রয়ে বের হও।" অতঃপর তিনি 'কামিল' ছন্দে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বের হলেন:

সুসংবাদ গ্রহণ করো, যুদ্ধের বিভীষিকায় তোমার ডাকে সাড়া দিতে এক সক্ষম সত্তা উপস্থিত হয়েছে ...
সংকল্প ও দূরদর্শিতার অধিকারী সে, ... যে আজ প্রভাতে এক সফল বিজয়ীর মুক্তি আশা করে।
আমি নিশ্চয়ই আশা করি তোমার ওপর ... জানাজার বিলাপ ধ্বনি প্রতিষ্ঠিত করতে।
এমন এক গভীর আঘাতের মাধ্যমে যার আলোচনা ... যুদ্ধের ভয়াবহতায় সকলকে অভিভূত করবে।
তারা উভয়ে একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং ধূলিকণা১ উত্থিত হলো যা তাদেরকে দৃষ্টির আড়ালে করে ফেলল। অতঃপর ধূলি অপসৃত হলে দেখা গেল আলী (আলাইহিস সালাম) নিহত আমরের পোশাকে স্বীয় তলোয়ার মুছছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক তাঁর 'মাগাজি' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। এই দুটি সংবাদ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দ্বৈরথ যুদ্ধের বৈধতা প্রমাণ করে। তবে কোনো যোদ্ধা যদি নিজে থেকে দ্বৈরথের আহ্বান জানাতে চায়, তবে ইমাম আবু হানিফা তা নিষেধ করেছেন। কারণ দ্বৈরথের আহ্বান জানানো এবং নিজে থেকে দম্ভ প্রকাশ করা সীমা লঙ্ঘন। আর ইমাম শাফেঈ তা জায়েজ বলেছেন; কারণ এটি আল্লাহর দ্বীনের শক্তি প্রদর্শন এবং তাঁর রাসূলের সাহায্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ধরনের কাজের জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, আর যে ব্যক্তি নিজে থেকে অগ্রসর হয়ে তা শুরু করেছে তার জন্য তিনি মনোনীত করেছেন।
মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুটি বর্ম পরিধান করেছিলেন এবং একটি তলোয়ার হাতে নিয়ে তা নাড়ালেন এবং বললেন: "কে আছে যে এই তলোয়ারটি এর হকের সাথে গ্রহণ করবে?" তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর দিকে দাঁড়িয়ে বললেন: আমি এটি এর হকের সাথে গ্রহণ করব। তিনি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার তা নাড়িয়ে বললেন: "কে আছে যে এই তলোয়ারটি এর হকের সাথে গ্রহণ করবে?" তখন যুবাইর ইবনুল আওয়াম দাঁড়িয়ে বললেন: আমি এটি এর হকের সাথে গ্রহণ করব। তিনি তাঁর থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এতে তারা উভয়ে মনে মনে কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেন। অতঃপর তিনি তৃতীয়বার তা পেশ করে বললেন: "কে আছে যে এই তলোয়ারটি এর হকের সাথে গ্রহণ করবে?" তখন আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাহ দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এর হক কী? তিনি

বললেন: "শত্রুকে এর দ্বারা আঘাত করবে যতক্ষণ না এটি বেঁকে যায়।" অতঃপর তিনি তা তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করলেন এবং একটি লাল পট্টি বেঁধে নিজেকে চিহ্নিত করলেন।

---

১ বাতাস প্রবল হলো এবং ধূলি উড়িয়ে নিল। 'আজাজ' অর্থ ধূলি উড্ডয়নকারী, আর 'তাজজিজ' অর্থ ধূলি উড়ানো। [লিসানুল আরব: ২/৩২০]

كَانَ إِذَا أَعْلَمَ بِهَا عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ سَيُقَاتِلُ وَيُبْلِي، وَمَشَى إِلَى الْحَرْبِ وَهُوَ يَقُولُ مِنَ السَّرِيعِ:

أَنَا الَّذِي أَخَذْتُهُ فِي رَقِّهِ ... إِذْ قَالَ مَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ

قَبِلْتُهُ بِعَدْلِهِ وَصِدْقِهِ ... لِلْقَادِرِ الرَّحْمَنِ بَيْنَ خَلْقِهِ

الْمُدْرِكِ الْفَائِضِ فَضْلُ رِزْقِهِ ... مَنْ كَانَ فِي مَغْرِبِهِ وَشَرْقِهِ

ثُمَّ جَعَلَ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

"إِنَّهَا لَمِشْيَةٌ يَبْغُضُهَا اللَّهُ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْطِنِ"، وَدَخَلَ فِي الْحَرْبِ مُبْتَدِئًا بِالْقِتَالِ، فَأَبْلَى وَأَنْكَى وَهُوَ يَقُولُ مِنَ السَّرِيعِ:

أَنَا الَّذِي عَاهَدَنِي خَلِيلِي ... وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ مِنَ النَّخِيلِ

أَلَّا أَقُومَ الدَّهْرَ فِي الْكُبُولِ ... أَخَذْتُ سَيْفَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ

وَإِذَا جَازَتِ الْمُبَارَزَةُ بِمَا اسْتَشْهَدْنَا مِنْ حَالِ الْمُبْتَدِئِ بِهَا وَأُجِيبَ إِلَيْهَا، كَانَ لِتَمْكِينِ الْمُبَارَزَةِ شَرْطَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ ذَا نَجْدَةٍ وَشَجَاعَةٍ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَنْ يَعْجَزَ عَنْ مُقَاوَمَةِ عَدُوِّهِ، فَإِنْ كَانَ بِخِلَافِهِ مُنِعَ.

وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ زَعِيمًا لِلْجَيْشِ يُؤَثِّرُ فَقْدُهُ فِيهِمْ، فَإِنَّ فَقْدَ الزَّعِيمِ الْمُدَبِّرِ مُفْضٍ إِلَى الْهَزِيمَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْدَمَ عَلَى الْبِرَازِ ثِقَةً بِنَصْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَإِنْجَازِ وَعْدِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَيَجُوزُ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ إِذَا حُضَّ عَلَى الْجِهَادِ أَنْ يُحَرِّضَ لِلشَّهَادَةِ مِنَ الرَّاغِبِينَ فِيهَا مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مِثْلَهُ فِي الْمَعْرَكَةِ يُؤْثِرُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ؛ إِمَّا تَحْرِيضُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْقِتَالِ حَمِيَّةً لَهُ، وَإِمَّا تَخْذِيلُ الْمُشْرِكِينَ بِجَرَاءَةٍ عَلَيْهِمْ فِي نُصْرَةِ اللَّهِ.

حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْعَرِيشِ يَوْمَ بَدْرٍ فَحَرَّضَ النَّاسَ عَلَى الْجِهَادِ وَقَالَ: "لِكُلِّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ"؟ وَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ، فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ" فَقَالَ عُمَيْرُ بْنُ حُمَامٍ مِنْ بَنِي مَسْلَمَةَ وَفِي يَدِهِ تَمَرَاتٌ يَأْكُلُهُنَّ: بَخٍ بَخٍ، مَا بَقِيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَنِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ، ثُمَّ قَذَفَ بِالتَّمَرَاتِ مِنْ يَدِهِ وَأَخَذَ سَيْفَهُ فَقَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ رحمه الله، وَهُوَ يَقُولُ مِنْ

যখনই তিনি (আবু দুজানা) এটি মাথায় বাঁধতেন, তখন লোকেরা বুঝতে পারত যে তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করবেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেকে বিলিয়ে দেবেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং সরী' ছন্দে নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করছিলেন:

আমিই সেই ব্যক্তি, যে এটি গ্রহণ করেছি এর স্বত্বানুসারে ... যখন তিনি বলেছিলেন, কে আছে একে এর যথার্থ হকসহ গ্রহণ করবে?

আমি একে ইনসাফ ও সততার সাথে গ্রহণ করেছি ... স্বীয় সৃষ্টির মাঝে মহাক্ষমতাবান পরম দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে।

যাঁর রহমত ও রিযিকের প্রাচুর্য সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ... চাই কেউ প্রাচ্যে থাকুক কিংবা প্রতীচ্যে।

অতঃপর তিনি দুই সারির মাঝখানে গর্বভরে চলতে লাগলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

"নিশ্চয়ই এটি এমন এক চলন, যা আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন, কেবল এই বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত।" অতঃপর তিনি লড়াই শুরু করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করে শত্রুদের পর্যুদস্ত করতে লাগলেন। তিনি সরী' ছন্দে বলছিলেন:

আমি সেই ব্যক্তি, যাঁর সাথে আমার সুহৃদ অঙ্গীকার করেছিলেন ... যখন আমরা খেজুর বাগানের পাদদেশে অবস্থান করছিলাম।

(প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন) যেন আমি কখনোই পশ্চাদপসরণ না করি ... আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তলোয়ার গ্রহণ করেছি।

দ্বৈরথ বা মল্লযুদ্ধ যখন বৈধ হিসেবে প্রমাণিত হলো—যার সপক্ষে আমরা শুরুতে আক্রমণকারী ও আহ্বানে সাড়াদানকারীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছি—তখন এই মল্লযুদ্ধের অনুমতির ক্ষেত্রে দুটি শর্ত প্রযোজ্য হয়:

প্রথমটি হলো: তাকে অসীম সাহসী ও বীর হতে হবে, যিনি নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকবেন যে তিনি শত্রুর মোকাবিলায় অক্ষম হবেন না। যদি বিষয়টি এর বিপরীত হয়, তবে তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না।

দ্বিতীয়টি হলো: তাকে সেনাপতি বা বাহিনীর এমন প্রধান হওয়া চলবে না, যাঁর অনুপস্থিতি সৈন্যদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কেননা বিজ্ঞ নেতৃত্বের পতন পরাজয় ডেকে আনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে মল্লযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন; আর এই বিশেষ মর্যাদা অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। সেনাপতির জন্য জায়েয হলো, জিহাদের উদ্দীপনা সৃষ্টির সময় শাহাদাতপ্রত্যাশীদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিদের উৎসাহিত করা, যাদের রণাঙ্গনে উপস্থিতি দুটির একটি ফলাফল বয়ে আনবে: হয় তাদের বীরত্ব দেখে মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধের প্রেরণা ও আত্মমর্যাদাবোধ বৃদ্ধি পাবে, অথবা আল্লাহর সাহায্যে মুশরিকদের ওপর অসীম সাহসিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের মনোবল ভেঙে যাবে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের দিন সেনাতাবু থেকে বের হয়ে লোকদের জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করলেন এবং বললেন: "প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে যা সে অর্জন করবে।" আরও বললেন: "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আজ এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে ধৈর্যসহকারে সওয়াবের আশায় এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবে এবং নিহত হবে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" তখন বনু মাসলামার উমাইর ইবনে হুমাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর হাতে থাকা কিছু খেজুর খাচ্ছিলেন, তিনি বলে উঠলেন: বাহ্! বাহ্! আমার এবং জান্নাতের মাঝে কেবল এইটুকুই ব্যবধান যে, এই লোকগুলো আমাকে হত্যা করবে। অতঃপর তিনি হাতের খেজুরগুলো ফেলে দিলেন এবং স্বীয় তরবারি তুলে নিয়ে যুদ্ধ

করতে লাগলেন, যতক্ষণ না তিনি শহীদ হলেন (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন)। তিনি আবৃত্তি করছিলেন...

(ص: 77)الأحكام السلطانية للماوردي

السَّرِيعِ:

رَكْضًا إِلَى اللَّهِ بِغَيْرِ زَادِ ... إِلَّا التُّقَى وَعَمَلِ الْمَعَادِ

وَالصَّبْرِ فِي اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ ... وَكُلُّ زَادٍ عُرْضَةُ النَّفَادِ

غَيْرَ التُّقَى وَالْبِرِّ وَالرَّشَادِ

وَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْ مُقَاتِلَةِ الْمُشْرِكِينَ مُحَارِبًا وَغَيْرَ مُحَارِبٍ، وَاخْتُلِفَ فِي قَتْلِ شُيُوخِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ مِنْ سُكَّانِ الصَّوَامِعِ وَالْأَدْيِرَةِ، فَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِيهِمْ: إِنَّهُمْ لَا يُقْتَلُونَ حَتَّى يُقَاتِلُوا؛ لِأَنَّهُمْ مُوَادِعُونَ كَالذَّرَارِيِّ.

وَالثَّانِي: يُقْتَلُونَ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا؛ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا أَشَارُوا بِرَأْيِ هُوَ أَنْكَى لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقِتَالِ، وَقَدْ قُتِلَ دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ1 فِي حَرْبِ هَوَازِنَ وَهُوَ يَوْمُ حُنَيْنٍ، وَقَدْ جَاوَزَ مِائَةَ سَنَةٍ مِنْ عُمْرِهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرَاهُ فَلَمْ يُنْكِرْ قَتْلَهُ، وَكَانَ يَقُولُ حَيْثُ قُتِلَ "مِنَ الطَّوِيلِ":

أَمَرْتُهُمُ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللِّوَى ... يَسْتَبِينُوا الرُّشْدَ إِلَّا ضُحَى الْغَدِ

فَلَمَّا عَصَوْنِي كُنْتُ مِنْهُمْ وَقَدْ أَرَى ... غَوَايَتَهُمْ وَأَنَّنِي غَيْرُ مُهْتَدِ

وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي حَرْبٍ وَلَا فِي غَيْرِهَا مَا لَمْ يُقَاتِلُوا؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهِمْ. وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الْعُسَفَاءِ وَالْوُصَفَاءِ2.

وَالْعُسَفَاءُ: الْمُسْتَخْدَمُونَ.

وَالْوُصَفَاءُ: الْمَمَالِيكُ، فَإِنْ قَاتَلَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ قُوتِلُوا وَقُتِلُوا مُقْبِلِينَ وَلَا يُقْتَلُوا مُدْبِرِينَ.

وَإِذَا تَتَرَّسُوا فِي الْحَرْبِ بِنِسَائِهِمْ وَأَطْفَالِهِمْ عِنْدَ قَتْلِهِمْ يَتَوَقَّى قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ، فَإِنْ لَمْ يُوصَلْ إِلَى قَتْلِهِمْ إِلَّا بِقَتْلِ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ جَازَ.

---

1 هو دريد بن الصمَّة، أبو قرة الهوازني الجشمي، واسم الصمَّة معاوية، وفد على الحارث بن أبي شمر، ويُعَدُّ من شعراء العرب وشجعانها وذوي أسنانها، عاش نحوًا من مائة سنة حتى سقط حاجباه على عينيه. وخرجت به هوازن يوم حنين تتيمَّن برأيه فقتل كافرًا.

2 منقطع: رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه "33114"، وأحمد "14994"، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد "5/ 315"، وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم.

সারী ছন্দে:

আল্লাহর পানে ধাবমান পাথেয়হীন ... কেবল তাকওয়া ও পরকালের আমল ব্যতিরেকে

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদে ধৈর্য ধারণ ... এবং সব পাথেয়ই নিঃশেষ হওয়ার পথে

তাকওয়া, নেক কাজ ও সঠিক পথ ব্যতিরেকে।

একজন মুসলমানের জন্য মুশরিক যোদ্ধাদের মধ্যে যাকে সে আয়ত্তে পায় তাকে হত্যা করা বৈধ, চাই সে যুদ্ধরত থাকুক বা না থাকুক। তবে তাদের বৃদ্ধ এবং গির্জা ও মঠের অধিবাসী সন্ন্যাসীদের হত্যার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তাদের ব্যাপারে একটি অভিমত হলো: তারা যুদ্ধ না করা পর্যন্ত তাদের হত্যা করা যাবে না; কারণ তারা শিশুদের ন্যায় নিরাপদ।

দ্বিতীয় অভিমত: যুদ্ধ না করলেও তাদের হত্যা করা যাবে; কারণ তারা হয়তো এমন পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতে পারে যা সরাসরি যুদ্ধের চেয়েও মুসলমানদের জন্য বেশি ক্ষতিকর।

হাওয়াযিন যুদ্ধের দিন (হুনায়নের দিন) দুরাইদ ইবনে আল-সিম্মাহকে হত্যা করা হয়েছিল অথচ তখন তার বয়স একশত বছর অতিক্রম করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখেছিলেন কিন্তু তার হত্যাকে অস্বীকার করেননি। তাকে যখন হত্যা করা হচ্ছিল তখন সে তবিল ছন্দে বলছিল:

আমি তাদের 'মুনআরাজুল লিওয়া' নামক স্থানে আমার নির্দেশ দিয়েছিলাম ... যেন তারা সঠিক পথ প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা তা বুঝল কেবল পরবর্তী দিন সকালে
যখন তারা আমার অবাধ্য হলো, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম যদিও আমি দেখছিলাম ... তাদের পথভ্রষ্টতা এবং এও যে আমি নিজেও সঠিক পথে নেই।
যুদ্ধ কিংবা অন্য কোনো অবস্থায় নারী ও শিশুদের হত্যা করা বৈধ নয় যতক্ষণ না তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসাফা (শ্রমিক) ও ওয়াসাফা (সেবক)-দের হত্যা করতেও নিষেধ করেছেন।
'উসাফা' হলো কর্মচারীগণ।
আর 'ওয়াসাফা' হলো দাসগণ। তবে নারী ও শিশুরা যদি যুদ্ধ করে, তবে সম্মুখ সমরে থাকা অবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে ও হত্যা করা যাবে, কিন্তু পলায়নপর অবস্থায় তাদের হত্যা করা যাবে না।
যুদ্ধের সময় শত্রুরা যদি নারী ও শিশুদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তবে মূল শত্রুকে হত্যার সময় নারী ও শিশুদের রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। তবে নারী ও শিশুদের আক্রান্ত করা ছাড়া যদি শত্রুদের পরাস্ত করা সম্ভব না হয়, তবে তা বৈধ হবে।

---

১. তিনি হলেন দুরাইদ ইবনে আল-সিম্মাহ, আবু কুররা আল-হাওয়াযিনি আল-জুশামি। আল-সিম্মাহর প্রকৃত নাম মুয়াবিয়া। তিনি আল-হারিস ইবনে আবি শামিরের নিকট প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিলেন। তিনি আরবদের বিশিষ্ট কবি, বীর ও প্রবীণদের অন্যতম হিসেবে গণ্য হন। তিনি প্রায় একশত বছর বেঁচে ছিলেন, এমনকি বার্ধক্যে তার ভ্রুদ্বয় চোখের ওপর ঝুলে পড়েছিল। হুনায়নের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্র তার রণকৌশল ও পরামর্শের বরকত হাসিলের জন্য তাকে সাথে নিয়ে বের হয়েছিল এবং তিনি কাফির অবস্থায় নিহত হন।
২. বিচ্ছিন্ন সূত্র (মুনকাতি): এটি ইবনে আবি শায়বা তার 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে (৩৩১১৪) এবং আহমাদ (১৪৯৯৪) বর্ণনা করেছেন। আল-হাইসামি এটি 'মাজমাউয যাওয়াইদ' গ্রন্থে (৫/৩১৫) উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদে একজন অনুল্লেখিত ব্যক্তি রয়েছেন।

وَلَوْ تَتَرَّسُوا بِأُسَارَى الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُوصَلْ إِلَى قَتْلِهِمْ إِلَّا بِقَتْلِ الْأُسَارَى لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُمْ، فَإِنْ أَفْضَى الْكَفُّ عَنْهُمْ إِلَى الْإِحَاطَةِ بِالْمُسْلِمِينَ تَوَصَّلُوا إِلَى الْخَلَاصِ مِنْهُمْ كَيْفَ أَمْكَنَهُمْ، وَتَحَرَّزُوا أَنْ يَعْمِدُوا إِلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ فِي أَيْدِيهِمْ، فَإِنْ قُتِلَ ضَمِنَهُ قَاتِلُهُ بِالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ إِنْ عَرَفَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.

وَضَمِنَ الْكَفَّارَةَ وَحْدَهَا إِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ، وَيَجُوزُ عَقْرُ خَيْلِهِمْ مِنْ تَحْتِهِمْ إِذَا قَاتَلُوا عَلَيْهَا.

وَمَنَعَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ عَقْرِهَا، وَقَدْ عَقَرَ حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ1 فَرَسَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ يَوْمَ أُحُدٍ، وَاسْتَعْلَى عَلَيْهِ لِيَقْتُلَهُ فَرَآهُ ابْنُ شَعُوبٍ فَبَرَزَ إِلَى حَنْظَلَةَ وَهُوَ يَقُولُ مِنَ السَّرِيعِ:

لَأَحْمِيَنَّ صَاحِبِي وَنَفْسِي ... بِطَعْنَةٍ مِثْلِ شُعَاعِ الشَّمْسِ

ثُمَّ طَعَنَ حَنْظَلَةَ فَقَتَلَهُ، وَاسْتَنْقَذَ أَبَا سُفْيَانَ مِنْهُ، فَخَلَصَ أَبُو سُفْيَانَ وَهُوَ يَقُولُ مِنَ الطَّوِيلِ:

وَمَا زَالَ مُهْرِي مَزْجَرَ الْكَلْبِ مِنْهُمُ ... لَدُنْ غُدْوَةٍ حَتَّى دَنَتْ لِغُرُوبِ

أُقَاتِلُهُمْ طُرًّا وَأَدْعُو لِغَالِبٍ ... وَأَدْفَعُهُمْ عَنِّي بِرُكْنٍ صَلِيبِ

وَلَوْ شِئْتُ نَجَّانِي حِصَانٌ طِمِرَّةٌ ... وَلَمْ أَحْمِلِ النَّعْمَاءَ لِابْنِ شَعُوبِ

فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ شَعُوبٍ، فَقَالَ مُجِيبًا لَهُ حِينَ لَمْ يَشْكُرْهُ مِنَ الطَّوِيلِ:

لَوْلَا دِفَاعِي يَا ابْنَ حَرْبٍ وَمَشْهَدِي ... لَأُلْفِيتَ يَوْمَ النَّعْفِ غَيْرَ مُجِيبِ

وَلَوْلَا مَكَرُّ الْمُهْرِ بِالنَّعْفِ قَرْقَرَتْ ... ضِبَاعٌ عَلَى أَوْصَالِهِ وَكَلِيبِ

فَأَمَّا إِذَا أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَعْقِرَ فَرَسَ نَفْسِهِ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه اقْتَحَمَ يَوْمَ مُؤْتَةَ بِفَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ حَتَّى الْتَحَمَ الْقِتَالُ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهَا وَعَقَرَهَا، وَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ رضي الله عنه، فَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَقَرَ فَرَسَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْقِرَ فَرَسَهُ؛ لِأَنَّهُ قُوَّةٌ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِعْدَادِهَا فِي جِهَادِ

عَدُوِّهِ؛ حَيْثُ يَقُولُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60] .

وَجَعْفَرٌ إِنَّمَا عَقَرَ فَرَسَهُ بَعْدَ أَنْ أُحِيطَ بِهِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَقْرُهُ لَهَا لِئَلَّا يَتَقَوَّى بِهَا الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَصَارَ عَقْرُهَا مُبَاحًا كَعُقْرِ خَيْلِهِمْ وَإِلَّا فَجَعْفَرٌ أَحْفَظُ لِدِينِهِ مِنْ

---

1 هو غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسي، واسم أبي عامر: عمرو بن صيفي، وكان عامر يعرف بالراهب في الجاهلية، قتل حنظلة شهيدًا يوم أحد، قتله أبو سفيان بن حرب، وقال: حنظلة بحنظلة، يعني: به حنظلة ابنه الذي قتل ببدر، وقيل: بل قتله شداد بن الأوس الليثي. وقال مصعب الزبيري: بارز أبو سفيان حنظلة فصرعه حنظلة، فأتاه ابن شعوب وقد علاه، فأعانه حتى قتل حنظلة.

যদি শত্রুরা মুসলিম বন্দীদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং বন্দীদের হত্যা করা ব্যতীত শত্রুদের পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব না হয়, তবে তাদের হত্যা করা বৈধ নয়। তবে যদি তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার ফলে মুসলিমদের শত্রুপক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তারা নিজেদের যেভাবে সম্ভব রক্ষা করবে এবং তাদের কাছে থাকা কোনো মুসলিমকে লক্ষ্য করে হত্যা করা থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবে। এরপরও যদি কোনো মুসলিম নিহত হয় এবং ঘাতক যদি জানত যে সে মুসলিম, তবে তাকে রক্তপণ এবং কাফফারা প্রদান করতে হবে।

আর যদি সে তাকে মুসলিম হিসেবে না চিনে থাকে, তবে শুধুমাত্র কাফফারা প্রদান করবে।

যখন শত্রুরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করে, তখন তাদের নিচ থেকে তাদের ঘোড়াকে পঙ্গু করে দেওয়া বৈধ।

কোনো কোনো আইনজ্ঞ ঘোড়াকে পঙ্গু করতে নিষেধ করেছেন। অথচ ওহুদের যুদ্ধে হানজালা বিন আর-রাহিব আবু সুফিয়ান বিন হারবের ঘোড়াকে আঘাত করেছিলেন এবং তাকে হত্যা করার জন্য তার ওপর চড়ে বসেছিলেন। তখন ইবনে শা'উব তা দেখতে পেয়ে হানজালার দিকে এগিয়ে আসেন এবং আস-সারী ছন্দ অনুযায়ী আবৃত্তি করেন:

আমি অবশ্যই আমার সাথীকে এবং নিজেকে রক্ষা করব … সূর্যের রশ্মির মতো তীক্ষ্ণ এক আঘাতের মাধ্যমে

অতঃপর তিনি হানজালাকে আঘাত করে হত্যা করেন এবং আবু সুফিয়ানকে তার হাত থেকে উদ্ধার করেন। আবু সুফিয়ান তখন মুক্তি পেয়ে আত-তাবীল ছন্দ অনুযায়ী আবৃত্তি করেন:

আমার ঘোড়াটি তাদের মাঝে কুকুর তাড়ানোর লাঠির মতো হয়ে ছিল … ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত

আমি তাদের সকলের সাথে লড়াই করছি এবং গালিব বংশের জয়গান গাইছি … আর এক শক্তিশালী স্তম্ভের মাধ্যমে তাদের আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি

আমি যদি চাইতাম তবে এক শক্তিশালী দ্রুতগামী ঘোড়া আমাকে উদ্ধার করত … এবং ইবনে শা'উবের প্রতি আমাকে কৃতজ্ঞ থাকতে হতো না

এ খবর ইবনে শা'উবের কাছে পৌঁছালে, আবু সুফিয়ান তাকে ধন্যবাদ না জানানোয় তিনি আত-তাবীল ছন্দ অনুযায়ী প্রত্যুত্তরে বলেন:

হে ইবনুল হারব! আমার প্রতিরক্ষা এবং আমার উপস্থিতি যদি না থাকত … তবে সেই টিলার পাদদেশে তোমাকে কেউ জবাব দেওয়ার মতো খুঁজে পেত না

আর সেই টিলার পাদদেশে ঘোড়া নিয়ে যদি আমি বারবার আক্রমণ না করতাম … তবে হায়েনা আর কুকুরগুলো তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে কামড়াকামড়ি করত

পক্ষান্তরে, কোনো মুসলিম যদি নিজের ঘোড়াকে পঙ্গু করতে চায়, তবে বর্ণিত আছে যে, জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.) মুতার যুদ্ধের দিন তার এক লালচে রঙের ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যখন যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করল, তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে সেটিকে পঙ্গু করে দিলেন এবং নিজে শহীদ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। তিনিই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম যিনি নিজের ঘোড়াকে পঙ্গু করেছিলেন। তবে সাধারণভাবে কোনো মুসলিমের জন্য নিজের ঘোড়াকে পঙ্গু করা জায়েজ নয়; কারণ এটি এমন এক শক্তি যা আল্লাহ তাআলা শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন: 'তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও যুদ্ধের ঘোড়া প্রস্তুত রাখো, যা দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবে।' [আনফাল: ৬০]

জাফর (রা.) তার ঘোড়াটিকে তখনই পঙ্গু করেছিলেন যখন তিনি শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলেন। সম্ভবত তিনি এটি এ কারণে করেছিলেন যাতে মুশরিকরা এই ঘোড়া ব্যবহার করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হতে না পারে। এমতাবস্থায় এটি শত্রুদের ঘোড়াকে পঙ্গু

করার মতোই বৈধ হয়ে যায়। অন্যথায়, জাফর (রা.) তো তাঁর দ্বীনের সংরক্ষণে অন্যদের চেয়ে অধিক সচেতন ছিলেন—

---

১. তিনি হলেন ফেরেশতাদের দ্বারা গোসল প্রাপ্ত হানজালা বিন আবি আমির আর-রাহিব আল-আনসারী আল-অউসি। তার পিতার নাম ছিল আমর বিন সায়ফি। তার পিতা জাহেলি যুগে ‘রাহিব’ নামে পরিচিত ছিলেন। হানজালা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। আবু সুফিয়ান বিন হারব তাকে হত্যা করেছিলেন এবং বলেছিলেন: হানজালার বদলে হানজালা, অর্থাৎ বদর যুদ্ধে নিহত তার পুত্র হানজালার পরিবর্তে। আবার বলা হয়ে থাকে যে, শাদ্দাদ বিন আউস আল-লাইসি তাকে হত্যা করেছেন। মুসাব আজ-যুবাইরি বলেন: আবু সুফিয়ান ও হানজালার মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় এবং হানজালা তাকে ধরাশায়ী করেন। তখন ইবনে শা’উব এসে তাকে আক্রমণ করেন এবং আবু সুফিয়ানকে সাহায্য করেন, শেষ পর্যন্ত হানজালা শহীদ হন।

(ص: 79)الأحكام السلطانية للماوردي

أَنْ يَفْعَلَ مَا يَمْنَعُ مِنْهُ الشَّرْعُ، وَلَمَّا عَادَ جَيْشُهُ تَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَحْثُونَ عَلَى الْجَيْشِ التُّرَابَ وَيَقُولُونَ: يَا فُرَّارُ، لِمَ فَرَرْتُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ؟ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ بِفِرَارٍ، وَلَكِنَّهُ الْكِرَارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ".

فَصْلٌ:

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ مَا يَلْزَمُ مِنْ أَمِيرِ الْجَيْشِ فِي سِيَاسَتِهِمْ، وَالَّذِي يَلْزَمُهُ فِيهِمْ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: حِرَاسَتُهُمْ مِنْ غِرَّةٍ يَظْفَرُ بِهَا الْعَدُوُّ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَتَبَّعَ الْمَكَامِنَ وَيُحَوِّطَ سَوَادَهُمْ بِحَرَسٍ يَأْمَنُونَ بِهِ عَلَى نُفُوسِهِمْ وَرِجَالِهِمْ؛ لِيَسْكُنُوا فِي وَقْتِ الدَّعَةِ، وَيَأْمَنُوا مَا وَرَاءَهُمْ فِي وَقْتِ الْمُحَارَبَةِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَتَخَيَّرَ لَهُمْ مَوْضِعَ نُزُولِهِمْ لِمُحَارَبَةِ عَدُوِّهِمْ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونُوا أَوْطَأَ الْأَرْضِ مَكَانًا وَأَكْثَرَ مَرْعًى وَمَاءً وَأَحْرَسَهَا أَكْنَافًا وَأَطْرَافًا؛ لِيَكُونَ أَعْوَنَ لَهُمْ عَلَى الْمُنَازَلَةِ، وَأَقْوَى لَهُمْ عَلَى الْمُرَابَطَةِ.

وَالثَّالِثُ: إِعْدَادُ مَا يَحْتَاجُ الْجَيْشُ إِلَيْهِ مِنْ زَادٍ وَعلُوفَةٍ تُفَرَّقُ عَلَيْهِمْ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ؛ حَتَّى تَسْكُنَ نُفُوسُهُمْ إِلَى مَادَّةٍ يَسْتَغْنُونَ عَنْ طَلَبِهَا؛ لِيَكُونُوا عَلَى الْحَرْبِ أَوْفَرَ، وَعَلَى مُنَازَلَةِ الْعَدُوِّ أَقْدَرَ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَعْرِفَ أَخْبَارَ عَدُوِّهِ حَتَّى يَقِفَ عَلَيْهَا، وَيَتَصَفَّحَ أَحْوَالَهُ حَتَّى يُخْبِرَهَا، فَيَسْلَمَ مِنْ مَكْرِهِ، وَيَلْتَمِسَ الْغِرَّةَ فِي الْهُجُومِ عَلَيْهِ.

وَالْخَامِسُ: تَرْتِيبُ الْجَيْشِ فِي مَصَافِّ الْحَرْبِ، وَالتَّعْوِيلُ فِي كُلِّ جِهَةٍ عَلَى مَنْ يَرَاهُ كُفُؤًا لَهَا، وَيَتَفَقَّدُ الصُّفُوفَ مِنَ الْخَلَلِ فِيهَا، وَيُرَاعِي كُلَّ جِهَةٍ يَمِيلُ الْعَدُوُّ عَلَيْهَا بِمَدَدٍ يَكُونُ عَوْنًا لَهَا.

وَالسَّادِسُ: أَنْ يُقَوِّيَ نُفُوسَهُمْ بِمَا يُشْعِرُهُمْ مِنَ الظَّفَرِ، وَيُخَيِّلَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَسْبَابِ النَّصْرِ؛ لِيَقِلَّ الْعَدُوُّ فِي أَعْيُنِهِمْ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ أَجْرَأَ وَبِالْجُرْأَةِ يَتَسَهَّلُ الظَّفَرُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ} [الأنفال: 43] .

وَالسَّابِعُ: أَنْ يَعِدَ أَهْلَ الصَّبْرِ وَالْبَلَاءِ مِنْهُمْ بِثَوَابِ اللَّهِ وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، وَبِالْجَزَاءِ وَالنَّفَلِ مِنَ الْغَنِيمَةِ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا} [آل عمران: 145] ، وَثَوَابُ الدُّنْيَا الْغَنِيمَةُ وَثَوَابُ

এমন কিছু করা যা শরিয়ত নিষিদ্ধ করেছে। যখন তাঁর বাহিনী ফিরে এল, তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং মুসলিমরা তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তখন মানুষ বাহিনীর ওপর ধুলোবালি ছিটিয়ে দিচ্ছিল এবং বলছিল: হে পলায়নকারীরা, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় কেন পালিয়ে এলে?

তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলছিলেন: "তারা পলায়নকারী নয়, বরং ইনশাআল্লাহ তারা অচিরেই পুনরায় আক্রমণকারী।"

পরিচ্ছেদ:

এই নেতৃত্বের বিধানাবলির তৃতীয় বিভাগ হলো বাহিনীর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সেনাপতির ওপর যা আবশ্যক। তাদের ক্ষেত্রে তাঁর ওপর দশটি বিষয় পালন করা বাধ্যতামূলক:

প্রথমত: শত্রুরা যেন বাহিনীর অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে জয়ী হতে না পারে, সেজন্য তাদেরকে পাহারা দেওয়া। আর তা হলো ওঁত পেতে থাকার জায়গাগুলো অনুসন্ধান করা এবং বাহিনীর চারপাশ প্রহরীদের দ্বারা বেষ্টন করা, যাতে তারা নিজেদের জীবন ও জানমালের ব্যাপারে নিরাপদ বোধ করে; যেন বিশ্রামের সময় তারা শান্তিতে থাকতে পারে এবং যুদ্ধের সময় নিজেদের পশ্চাৎভাগ নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে।

দ্বিতীয়ত: শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য তাদের অবস্থানস্থল নির্বাচন করা। আর তা হলো এমন স্থান যা হবে সমতল ভূমি, যেখানে প্রচুর চারণভূমি ও পানি থাকবে এবং যার চারপাশ ও সীমান্তসমূহ হবে অধিক সুরক্ষিত; যাতে এটি সম্মুখ সমরে তাদের জন্য অধিক সহায়ক হয় এবং সীমান্ত রক্ষায় তাদের অধিক শক্তি জোগায়।

তৃতীয়ত: বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় রসদ ও পশুখাদ্যের সংস্থান করা যা প্রয়োজনের সময় তাদের মাঝে বণ্টন করা হবে; যাতে রসদ সংগ্রহের দুশ্চিন্তা থেকে তারা মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে; যেন তারা যুদ্ধের জন্য পূর্ণ মনোযোগী হতে পারে এবং শত্রুর মোকাবিলায় অধিক সক্ষমতা অর্জন করে।

চতুর্থত: শত্রুর খবরাখবর সংগ্রহ করা যাতে সে সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় এবং তাদের অবস্থা সবিস্তারে পর্যবেক্ষণ করা যাতে সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। এর ফলে তাদের কূটকৌশল থেকে নিরাপদ থাকা যাবে এবং তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ সন্ধান করা সম্ভব হবে।

পঞ্চমত: যুদ্ধক্ষেত্রে বাহিনীকে সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করা এবং প্রতিটি দিকে এমন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা যাকে তিনি সেই কাজের যোগ্য মনে করেন। যুদ্ধের সারিতে কোনো ত্রুটি

আছে কি না তা তদারকি করা এবং যে দিকে শত্রুরা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, সে দিকে অতিরিক্ত সাহায্য পাঠিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করা।
ষষ্ঠত: বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা এবং তাদের সামনে সফলতার কারণসমূহ তুলে ধরা; যাতে তাদের দৃষ্টিতে শত্রু তুচ্ছ মনে হয় এবং তারা তাদের ওপর অধিক সাহসী হয়ে ওঠে। কারণ সাহসিকতার মাধ্যমেই বিজয় সহজতর হয়। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমার স্বপ্নে তাদের সংখ্যা অল্প করে দেখিয়েছিলেন, যদি তিনি তাদের সংখ্যা বেশি করে দেখাতেন, তবে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হতে} [আনফাল: ৪৩]।
সপ্তমত: বাহিনীর ধৈর্যশীল ও বীরত্ব প্রদর্শনকারীদেরকে আল্লাহর পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া যদি তারা পরকালকামী হয়; আর যদি তারা দুনিয়াদার হয় তবে তাদেরকে উপযুক্ত প্রতিদান ও গণিমতের অতিরিক্ত অংশের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কার চায় আমি তাকে তা থেকে প্রদান করি, আর যে আখেরাতের পুরস্কার চায় আমি তাকে তা থেকে প্রদান করি} [আলে ইমরান: ১৪৫]। আর পার্থিব পুরস্কার হলো গণিমত এবং পুরস্কার...

(ص: 80)الأحكام السلطانية للماوردي

الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ، فَجَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَرْغِيبِهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؛ لِيَكُونَ أَرْغَبَ الْفَرِيقَيْنِ.
وَالثَّامِنُ: أَنْ يُشَاوِرَ ذَوِي الرَّأْيِ فِيمَا أَعْضَلَ، وَيَرْجِعَ إِلَى أَهْلِ الْحَزْمِ فِيمَا أَشْكَلَ؛ لِيَأْمَنَ الْخَطَأَ وَيَسْلَمَ مِنَ الزَّلَلِ، فَيَكُونَ مِنَ الظَّفَرِ أَقْرَبَ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران: 159] .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي أَمْرِهِ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُشَاوَرَةِ مَعَ مَا أَمَدَّهُ بِهِ مِنَ التَّوْفِيقِ، وَأَعَانَهُ مِنَ التَّأْيِيدِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ أَمَرَهُ بِمُشَاوَرَتِهِمْ فِي الْحَرْبِ؛ لِيَسْتَقِرَّ لَهُ الرَّأْيُ الصَّحِيحُ فِيهِ فَيَعْمَلَ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَقَالَ: "مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا لِأَرْشَدِ أُمُورِهِمْ" 1.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ أَمَرَهُ بِمُشَاوَرَتِهِمْ تَأْلِيفًا لَهُمْ وَتَطْيِيبًا لِنُفُوسِهِمْ، وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ أَمَرَهُ بِمُشَاوَرَتِهِمْ لِمَا عَلِمَ فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ وَعَادَ بِهَا مِنَ النَّفْعِ، وَهَذَا قَوْلُ الضَّحَّاكِ.

وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ أَمَرَهُ بِمُشَاوَرَتِهِمْ لِيَسْتَنَّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَتْبَعَهُ فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ، وَإِنْ كَانَ عَنْ مَشُورَتِهِمْ غَنِيًّا، وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ.

وَالتَّاسِعُ: أَنْ يَأْخُذَ جَيْشَهُ بِمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حُقُوقِهِ، وَأَمَرَ بِهِ مِنْ حُدُودِهِ، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ تَجَوُّزٌ فِي دِينٍ وَلَا تَحَيُّفٌ فِي حَقٍّ، فَإِنَّ مَنْ جَاهَدَ عَنِ الدِّينِ كَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْتِزَامِ أَحْكَامِهِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ.

وَقَدْ رَوَى حَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:

"انْهَوْا جُيُوشَكُمْ عَنِ الْفَسَادِ، فَإِنَّهُ مَا فَسَدَ جَيْشٌ قَطُّ إِلَّا قَذَفَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَانْهَوْا جُيُوشَكُمْ عَنِ الْغُلُولِ، فَإِنَّهُ مَا غَلَّ جَيْشٌ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرَّجْلَةَ، وَانْهَوْا جُيُوشَكُمْ عَنِ الزِّنَا، فَإِنَّهُ مَا زَنَى جَيْشٌ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَانِ".

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَيُّهَا النَّاسُ، اعْمَلُوا صَالِحًا قَبْلَ الْغَزْوَةِ، فَإِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ.

وَالْعَاشِرُ: أَنْ لَا يُمَكِّنَ أَحَدًا مِنْ جَيْشِهِ أَنْ يَتَشَاغَلَ بِتِجَارَةٍ أَوْ زِرَاعَةٍ؛ لِصَرْفِهِ الِاهْتِمَامَ بِهَا عَنْ مُصَابَرَةِ الْعَدُوِّ وَصِدْقِ الْجِهَادِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "بُعِثْتُ مَرْغَمَةً وَمَرْحَمَةً

---

1 قال الشيخ الألباني في صحيح الكلم الطيب "116": واهٍ جدًّا.

পরকালীন প্রতিদান হলো জান্নাত। আল্লাহ তাআলা তাঁর উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে একত্রিত করেছেন, যাতে তা উভয় দলের জন্য অধিক আগ্রহোদ্দীপক হয়।

অষ্টম: জটিল বিষয়ে প্রজ্ঞাবানদের সাথে পরামর্শ করা এবং অস্পষ্ট বিষয়ে দৃঢ়চেতা বিজ্ঞজনদের শরণাপন্ন হওয়া; যাতে তিনি ভুল থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন এবং পদস্খলন থেকে মুক্তি পান, ফলে বিজয় লাভের অধিক নিকটবর্তী হতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলেছেন: {এবং কাজের ক্ষেত্রে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন আপনি সংকল্প করবেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন} [আলে ইমরান: ১৫৯]।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা তাওফীক ও ঐশী সাহায্যের মাধ্যমে সুদৃঢ় করা সত্ত্বেও তাঁকে পরামর্শ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণ চারটি মত ব্যক্ত করেছেন:

প্রথমত: আল্লাহ তাঁকে যুদ্ধের বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন যেন এতে সঠিক সিদ্ধান্তটি স্থির হয় এবং তিনি সে অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। এটি হাসান বসরীর অভিমত। তিনি বলতেন: "কোনো জাতি যখনই পরামর্শ করেছে, তখনই তারা তাদের সবচেয়ে সঠিক ও উত্তম বিষয়ের দিকে হেদায়াত পেয়েছে।"

দ্বিতীয়ত: তাদের অন্তরকে জয় করা এবং তাদের চিত্তকে প্রফুল্ল রাখার উদ্দেশ্যে তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি কাতাদার অভিমত।

তৃতীয়ত: পরামর্শের মধ্যে তিনি যে মর্যাদা ও উপকারিতা নিহিত জেনেছেন, তার জন্যই পরামর্শের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি যাহহাকের অভিমত।

চতুর্থত: তিনি তাঁকে পরামর্শের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে মুসলমানরা একে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুমিনরা এ ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করে, যদিও তিনি তাদের পরামর্শ থেকে অমুখাপেক্ষী ছিলেন। এটি সুফিয়ানের অভিমত।

নবম: তাঁর সেনাবাহিনীকে আল্লাহর নির্ধারিত হকসমূহ এবং তাঁর নির্দেশিত বিধিবিধান পালনে বাধ্য করা, যাতে তাদের মধ্যে দ্বীনের বিষয়ে কোনো শৈথিল্য বা হকের বিষয়ে কোনো জুলুম না থাকে। কেননা যারা দ্বীনের জন্য জিহাদ করে, তারা এর বিধানসমূহ মেনে চলা এবং হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক হকদার।

হারিস বিন নাবহান আবান বিন উসমান থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

"তোমাদের বাহিনীকে বিশৃঙ্খলা থেকে বিরত রাখো। কারণ যখনই কোনো বাহিনী বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হয়েছে, তখনই আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। তোমাদের বাহিনীকে আত্মসাৎ বা খেয়ানত করা থেকে বিরত রাখো। কেননা যখনই কোনো বাহিনী খেয়ানত

করেছে, তখনই আল্লাহ তাদের ওপর পদাতিক শত্রুকে বিজয়ী করে দিয়েছেন। আর তোমাদের বাহিনীকে ব্যভিচার থেকে বিরত রাখো। কারণ কোনো বাহিনী যখনই ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, তখনই আল্লাহ তাদের ওপর মহামারি চাপিয়ে দিয়েছেন।"
আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: হে লোকসকল! যুদ্ধের পূর্বে তোমরা সৎ কাজ করো। কারণ তোমরা তোমাদের আমলের মাধ্যমেই যুদ্ধ করো।
দশম: তাঁর সেনাবাহিনীর কাউকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কৃষিকাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ না দেওয়া; কারণ এতে ব্যস্ততা তাকে শত্রুর বিরুদ্ধে ধৈর্য ধারণ ও জিহাদের একনিষ্ঠতা থেকে বিমুখ করে দেবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "আমি কঠোরতা ও রহমতসহ প্রেরিত হয়েছি...

শেখ আলবানী 'সহীহ আল-কালিম আত-তাইয়িব' (১১৬) গ্রন্থে বলেছেন: এটি অত্যন্ত দুর্বল।

(ص: 81)الأحكام السلطانية للماوردي

وَلَمْ أُبْعَثْ تَاجِرًا وَلَا زَارِعًا، وَإِنَّ شَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ التُّجَّارُ وَالزُّرَّاعُ إِلَّا مَنْ شَحَّ عَلَى دِينِهِ"1، وَغَزَا نَبِيٌّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ: "لَا يَغْزُوَنَّ مَعِي رَجُلٌ بَنَى بِنَاءً لَمْ يُكْمِلْهُ، وَلَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَا رَجُلٌ زَرَعَ زَرْعًا لَمْ يَحْصُدْهُ"2.

فَصْلٌ:

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ مَا يَلْزَمُ الْمُجَاهِدِينَ مَعَهُ مِنْ حُقُوقِ الْجِهَادِ وَهُوَ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا يَلْزَمُهُمْ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى.

وَالثَّانِي: مَا يَلْزَمُهُمْ فِي حَقِّ الْأَمِيرِ، فَأَمَّا اللَّازِمُ لَهُمْ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: مُصَابَرَةُ الْعَدُوِّ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجَمْعَيْنِ، بِأَنْ لَا يَنْهَزِمَ عَنْهُ مِنْ مِثْلَيْهِ فَمَا دُونَهُ، وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَضَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُقَاتِلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} [الأنفال: 65] .

ثُمَّ خَفَّفَ اللَّهُ عز وجل- عَنْهُمْ عِنْدَ قُوَّةِ الْإِسْلَامِ وَكَثْرَةِ أَهْلِهِ، فَأَوْجَبَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ لَاقَى الْعَدُوَّ أَنْ يُقَاتِلَ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ، فَقَالَ: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 66] .

وَحَرَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْهَزِمَ مِنْ مِثْلَيْهِ إِلَّا لِإِحْدَى حَالَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَتَحَرَّفَ لِقِتَالٍ فَيُوَلِّي لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ لِمَكِيدَةٍ وَيَعُودُ إِلَى قِتَالِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَتَحَيَّزَ إِلَى فِئَةٍ أُخْرَى يَجْتَمِعُ مَعَهَا عَلَى قِتَالِهِمْ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ} [الأنفال: 16] .

وَسَوَاءٌ قَرُبَتِ الْفِئَةُ الَّتِي يَتَحَيَّزُ إِلَيْهَا أَوْ بَعُدَتْ، فَقَدْ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه لِأَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ حِينَ انْهَزَمُوا إِلَيْهِ: أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَجُوزُ إِذَا زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ إِلَى

---

1 ضعيف: أورده الشيخ الغزالي في سلسلة الأحاديث الضعيفة "1571"، وفي ضعيف الجامع "2340".

2 رواه سعيد بن منصور في سننه "2867".

"আমি বণিক বা কৃষক হিসেবে প্রেরিত হইনি। নিশ্চয়ই এই উম্মাতের সর্বনিকৃষ্ট হলো ঐ সকল বণিক ও কৃষক, তবে তারা ব্যতীত যারা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে কার্পণ্য করে।" ১, আর আল্লাহর নবিগণের মধ্য থেকে একজন নবি যুদ্ধাভিযানে বের হলেন এবং বললেন: "আমার

সাথে এমন কোনো ব্যক্তি যুদ্ধে বের হবে না যে কোনো দালান নির্মাণ করেছে কিন্তু তা শেষ করেনি, কিংবা এমন ব্যক্তি যে কোনো নারীকে বিয়ে করেছে কিন্তু তার সাথে বাসর সম্পন্ন করেনি, কিংবা এমন ব্যক্তি যে কোনো শস্য বপন করেছে কিন্তু তা সংগ্রহ করেনি।" ২।
পরিচ্ছেদ:
এই ইমারত বা নেতৃত্বের বিধানাবলির চতুর্থ পরিচ্ছেদ হলো ঐ সকল জিহাদের হক বা অধিকারসমূহ যা আমিরের সাথে মুজাহিদদের জন্য আবশ্যক; আর তা দুই প্রকার:
প্রথমটি: যা মহান আল্লাহর হকের ব্যাপারে তাদের জন্য আবশ্যক।
দ্বিতীয়টি: যা আমিরের হকের ব্যাপারে তাদের জন্য আবশ্যক। আল্লাহর হকের ব্যাপারে তাদের ওপর যা আবশ্যক তা চারটি বিষয়:
প্রথমটি: দুই বাহিনীর সম্মুখ সমরের সময় শত্রুর মোকাবিলায় অবিচল থাকা; অর্থাৎ শত্রুর সংখ্যা নিজের দ্বিগুণ বা তার কম হলে সেখান থেকে পলায়ন না করা। ইসলামের সূচনালগ্নে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর দশজন মুশরিকের সাথে লড়াই করা ফরয করেছিলেন। তিনি বলেছেন: {হে নবি! মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করুন। যদি আপনাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দুইশত জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর যদি আপনাদের মধ্যে একশত জন থাকে, তবে তারা কাফেরদের মধ্য থেকে এক হাজারের ওপর বিজয়ী হবে; কারণ তারা এমন এক কওম যাদের বোধশক্তি নেই।} [আল-আনফাল: ৬৫] ।
পরবর্তীতে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পেলে এবং মুসলমানদের সংখ্যা বাড়লে আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর থেকে ভার লাঘব করেন। ফলে শত্রুর মোকাবিলা করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক করলেন যেন সে তাদের মধ্য থেকে দুইজনের সাথে লড়াই করে। আল্লাহ বলেন: {এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিলেন এবং তিনি অবগত আছেন যে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। সুতরাং যদি তোমাদের মধ্যে একশত জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দুইশত জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকে, তবে আল্লাহর নির্দেশে তারা দুই হাজার জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।} [আল-আনফাল: ৬৬] ।
আর দ্বিগুণ শত্রুর সামনে থেকে পলায়ন করা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হারাম করেছেন, কেবল দুটি অবস্থা ব্যতীত: হয় যুদ্ধের কৌশল হিসেবে পিছু হটা যাতে বিশ্রাম নেওয়া যায় কিংবা ফাঁদ পাতা যায় এবং পুনরায় তাদের সাথে যুদ্ধে ফিরে আসা যায়, অথবা অন্য

কোনো দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে যাতে একত্রিত হয়ে পুনরায় শত্রুর মোকাবিলা করা যায়। মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: {আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদের থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে—তবে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে কিংবা অন্য কোনো দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে হলে ভিন্ন কথা—সে অবশ্যই আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরে আসবে।} [আল-আনফাল: ১৬] ।
যে দলের সাথে মিলিত হতে চায় তারা নিকটে হোক বা দূরে, উভয়ই সমান। ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কাদিসিয়ার অধিবাসীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন যখন তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাঁর নিকট ফিরে এসেছিল: আমি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আশ্রয়স্থল। আর যখন শত্রুর সংখ্যা দুই গুণের বেশি হয় এবং কোনো উপায় না থাকে...

---

১ যঈফ: শেখ আল-গাজালি একে সিলসিলাতুল আহাদিসিল যঈফাহ "১৫৭১" এবং যঈফুল জামি "২৩৪০" এ উল্লেখ করেছেন।
২ সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁর সুনান গ্রন্থে "২৮৬৭" বর্ণনা করেছেন।

(ص: 82)الأحكام السلطانية للماوردي

الْمُصَابَرَةِ سَبِيلًا أَنْ يُوَلِّيَ عَنْهُمْ غَيْرَ مُتَحَرِّفٍ لِقِتَالٍ وَلَا مُتَحَيِّزٍ إِلَى فِئَةٍ، هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِيمَنْ عَجَزَ عَنْ مُقَاوَمَةِ مِثْلَيْهِ، وَأَشْرَفَ عَلَى الْقَتْلِ فِي جَوَازِ انْهِزَامِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ عَنْهُمْ مُنهَزِمًا وَإِنْ قُتِلَ لِلنَّصِّ فِيهِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ نَاوِيًا أَنْ يَتَحَرَّفَ لِقِتَالٍ، أَوْ يَتَحَيَّزَ إِلَى فِئَةٍ لِيَسْلَمَ مِنَ الْقَتْلِ، وَمَا ثَمَّ خِلَافٌ، فَإِنَّهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمُصَابَرَةِ فَلَيْسَ يَعْجَزُ عَنْ هَذِهِ النِّيَّةِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا اعْتِبَارَ بِهَذَا التَّفْصِيلِ وَالنَّصُّ فِيهِ مَنْسُوخٌ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ مَا أَمْكَنَهُ، وَيَنْهَزِمَ إِذَا عَجَزَ وَخَافَ الْقَتْلَ، وَالثَّانِي أَنْ يَقْصِدَ بِقِتَالِهِ نُصْرَةَ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى،

وَإِبْطَالِ مَا خَالَفَهُ مِنَ الْأَدْيَانِ: {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة: 33] .

فَيَكُونُ بِهَذَا الِاعْتِقَادِ حَائِزًا لِثَوَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُطِيعًا لَهُ فِي أَوَامِرِهِ وَنُصْرَةِ دِينِهِ، وَمُسْتَنْصِرًا بِهِ عَلَى عَدُوِّهِ؛ لِيَسْتَهِلَّ مَا لَقِي؛ فَيَكُونُ أَكْثَرَ ثَبَاتًا وَأَبْلَغَ نِكَايَةً، وَلَا يَقْصِدُ بِجِهَادِهِ اسْتِفَادَةَ الْمَغْنَمِ فَيَصِيرُ مِنَ الْمُكْتَسِبِينَ لَا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَمَعَ أَسْرَى بَدْرٍ وَكَانُوا أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا بَعْدَ أَنْ قَتَلَ فِي الْمَعْرَكَةِ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ مِثْلَهُمْ شَاوَرَ أَصْحَابَهُ فِيهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْتُلُ أَعْدَاءَ اللَّهِ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَرُءُوسَ الضَّلَالَةِ، فَإِنَّهُمْ كَذَّبُوكَ وَأَخْرَجُوكَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُمْ عَشِيرَتُكَ وَأَهْلُكَ، تَجَاوَزْ عَنْهُمْ يَسْتَنْقِذْهُمُ اللَّهُ بِكَ مِنَ النَّارِ. فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ قَبْلَ الْأَسْرَى بِيَوْمٍ، فَمِنْ قَائِلٍ: الْقَوْلُ مَا قَالَهُ عُمَرُ، وَمِنْ قَائِلٍ: الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ: "مَا قَوْلُكُمْ فِي هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ؟ إِنَّ مَثَلَهُمَا كَمِثْلِ إِخْوَةٍ لَهُمَا كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمَا قَالَ نُوحٌ" {رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} [نوح: 26] وَقَالَ مُوسَى: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [يونس: 88] ، وَقَالَ عِيسَى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118] وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [إبراهيم: 36] ، إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَيُشَدِّدُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَيُلَيِّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّبِنِ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَيْلَةٌ فَلَا يَنْقَلِبْ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبَةِ عُنُقٍ".

وَفَادَاهُ كُلُّ أَسِيرٍ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَكَانَ فِي الْأَسْرَى الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسَرَهُ

ধৈর্যের পথ হিসেবে শত্রুর মোকাবিলা থেকে পিছু হটা বৈধ নয়, যদি না তা যুদ্ধের কৌশলের জন্য স্থান পরিবর্তন অথবা অন্য কোনো দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে হয়; এটি ইমাম শাফেঈর মাজহাব।

তাঁর অনুসারীগণ এমন ব্যক্তির বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে নিজের দ্বিগুণ সংখ্যক শত্রুর মোকাবিলা করতে অক্ষম এবং নিহত হওয়ার উপক্রম হয়েছে, এমতাবস্থায় তার জন্য পলায়ন করা বৈধ কি না। একদল বলেছেন: তার জন্য পলায়ন করা বৈধ নয়, এমনকি সে নিহত হলেও; কারণ এ বিষয়ে অকাট্য বিধান বিদ্যমান। অন্য একদল বলেছেন: যুদ্ধের কৌশলের নিয়তে বা অন্য কোনো দলের সাথে মিলিত হওয়ার নিয়তে তার জন্য প্রস্থান করা বৈধ যেন সে মৃত্যু থেকে রক্ষা পায়। বস্তুত এখানে কোনো প্রকৃত বিরোধ নেই; কারণ সে ধৈর্য ধারণে অক্ষম হলেও এই নিয়ত করতে অক্ষম নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: এই বিস্তারিত বিশ্লেষণের কোনো কার্যকারিতা নেই এবং এই বিষয়ের বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। তার উচিত যতটুকু সম্ভব যুদ্ধ করা, আর যখন সে অক্ষম হয়ে পড়বে এবং নিহত হওয়ার আশঙ্কা করবে তখন সে পিছু হটতে পারে। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের বিজয় এবং এর বিরোধী মতাদর্শসমূহকে বাতিল করা: "যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে" [আত-তাওবাহ: ৩৩]।

এই বিশ্বাসের মাধ্যমে সে আল্লাহ তাআলার পুরস্কারের অধিকারী হবে এবং তাঁর নির্দেশ পালনে ও তাঁর দ্বীনের সাহায্যে অনুগত থাকবে। সে শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হবে যেন তার সম্মুখীন হওয়া কঠিন পরিস্থিতিগুলো সহজ হয়ে যায়; ফলে সে অধিক দৃঢ়পদ হবে এবং শত্রুর ওপর অধিকতর আঘাত হানতে সক্ষম হবে। সে জিহাদের মাধ্যমে কেবল বৈষয়িক লাভের উদ্দেশ্য করবে না, অন্যথায় সে মুজাহিদদের পরিবর্তে কেবল উপার্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বদরের বন্দীদের একত্র করলেন—যাঁরা সংখ্যায় ছিলেন চুয়াল্লিশজন, আর যুদ্ধের ময়দানে কুরাইশদের সমসংখ্যক অভিজাত ব্যক্তি নিহত হয়েছিল—তখন তিনি তাঁদের বিষয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। ওমর (রা.) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শত্রু, কুফর ও গোমরাহির মূল হোতাদের হত্যা করুন; কারণ তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং আপনাকে বহিষ্কার করেছে। আবু বকর (রা.) বললেন: তারা আপনারই আত্মীয় ও স্বজন, আপনি তাঁদের মার্জনা করুন, হতে পারে আল্লাহ আপনার মাধ্যমে তাঁদের জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করবেন। রাসূলুল্লাহ (সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বন্দীদের আসার একদিন আগে মদিনায় প্রবেশ করলেন। তখন কেউ বলছিলেন: ওমরের কথাটিই সঠিক, আবার কেউ বলছিলেন: আবু বকরের কথাটিই সঠিক। এরপর রাসূলুল্লাহ (সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের

সামনে এসে বললেন: "এই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী? তাঁদের দৃষ্টান্ত তাঁদের পূর্ববর্তী ভাইদের মতো; নূহ (আ.) বলেছিলেন: 'হে আমার রব, আপনি পৃথিবীতে কাফিরদের কোনো গৃহবাসীকে অবশিষ্ট রাখবেন না' [নূহ: ২৬]। মুসা (আ.) বলেছিলেন: 'হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহ কঠোর করে দিন' [ইউনুস: ৮৮]। ঈসা (আ.) বলেছিলেন: 'যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন তবে নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' [আল-মায়িদাহ: ১১৮]। ইবরাহিম (আ.) বলেছিলেন: 'সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত, আর যে আমার অবাধ্য হবে তবে নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' [ইবরাহিম: ৩৬]। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিছু মানুষের অন্তরকে তাঁর পথে এমন কঠোর করে দেন যে তা পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে যায়, আবার কিছু মানুষের অন্তরকে এমন কোমল করে দেন যে তা দুধের চেয়েও নরম হয়ে যায়। আর তোমাদের যদি দারিদ্র্য থাকে, তবে মুক্তিপণ গ্রহণ অথবা শিরশ্ছেদ ব্যতীত কেউ যেন এখান থেকে ফিরে না যায়।"
অতঃপর প্রত্যেক বন্দী চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্তিপণের ব্যবস্থা করল। বন্দীদের মধ্যে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবও ছিলেন, যাঁকে বন্দী করেছিলেন...

(ص: 83)الأحكام السلطانية للماوردي

أَبُو الْيُسْرِ، وكَانَ الْعَبَّاسُ رَجُلًا جَسِيمًا وَأَبُو الْيُسْرِ رَجُلًا مُجْتَمَعًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي الْيُسْرِ: "كَيْفَ أَسَرْتَ الْعَبَّاسَ يَا أَبَا الْيُسْرِ"؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَعَانَنِي عَلَيْهِ رَجُلٌ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ، هَيْئَتُهُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ أَعَانَكَ عَلَيْهِ مَلَكٌ كَرِيمٌ" 1.
وقَالَ لِلْعَبَّاسِ: "افْدِ نَفْسَكَ وَابْنَيْ أَخِيكَ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ وَحَلِيفَكَ عُتْبَةَ بْنَ عُمَرَ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ مُسْلِمًا وَلَكِنَّ الْقَوْمَ

اسْتَكْرَهُونِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْلَمُ بِإِسْلَامِكَ، فَإِنْ كَانَ مَا قُلْتَ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَجْزِيكَ". فَفَدَى الْعَبَّاسُ نَفْسَهُ بِمِائَةِ أُوقِيَّةٍ، وَفَدَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ أَخِيهِ وَحَلِيفِهِ بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، وَنَزَلَ فِي الْعَبَّاسِ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنفال: 70] .

فَلَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِدَاءَ أَسْرَى بَدْرٍ لِفَقْرِ الْمُهَاجِرِينَ وَحَاجَتِهِمْ، عَاتَبَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَى مَا فَعَلَ فَقَالَ: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 67] يَعْنِي بِهِ الْقَتْلَ {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} يَعْنِي مَالَ الْفِدَاءِ: {وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [الأنفال: 67] يَعْنِي: الْعَمَلَ بِمَا يُوجِبُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال: 67] يَعْنِي: عَزِيزٌ فِيمَا كَانَ مِنْ نَصْرِكُمْ، حَكِيمٌ فِيمَا أَرَادَهُ لَكُمْ، {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 68] .

يَعْنِي بِهِ: مَالَ الْفِدَاءِ الْمَأْخُوذَ مِنَ الْأَسْرِ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ:

أَحَدُهَا: لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ فِي أَهْلِ بَدْرٍ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ مِنْ فِدَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ.

وَالثَّانِي: لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ فِي أَنَّهُ تُسْتَحَلُّ الْغَنَائِمُ لَمَسَّكُمْ فِي تَعْجِيلِهَا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

وَالثَّالِثُ: لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ أَنْ لَا يُؤَاخِذَ أَحَدًا بِعَمَلٍ أَتَاهُ عَلَى جَهَالَةٍ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمُوهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ إِسْحَاقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ: "لَوْ عَذَّبَنَا اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا عُمَرُ مَا نَجَا غَيْرُكَ" 2.

---

1 رواه ابن جرير في تفسيره "4/ 78".

2 رواه ابن جرير في تفسيره "10/ 48".

আবু আল-ইয়াসার। আব্বাস (রা.) ছিলেন একজন বিশালদেহী ব্যক্তি, আর আবু আল-ইয়াসার ছিলেন একজন মাঝারি গড়নের মানুষ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু আল-ইয়াসারকে বললেন: "হে আবু আল-ইয়াসার! তুমি কীভাবে আব্বাসকে বন্দি করলে?" তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, তাঁর বিরুদ্ধে আমাকে এমন এক ব্যক্তি সাহায্য করেছেন যাকে আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি, তাঁর অবয়ব ছিল এমন এমন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "নিশ্চয়ই একজন সম্মানিত ফেরেশতা তোমাকে তাঁর বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন।" ১।

এবং তিনি আব্বাসকে বললেন: "তুমি নিজের মুক্তিপণ দাও এবং তোমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আকীল ইবনে আবি তালিব ও নাওফাল ইবনুল হারিস এবং তোমার মিত্র উতবা ইবনে ওমরের মুক্তিপণও প্রদান করো।" তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো মুসলিম ছিলাম, কিন্তু লোকেরা আমাকে (যুদ্ধে আসতে) বাধ্য করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তোমার ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক অবগত। যদি তোমার কথা সত্য হয় তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তোমাকে এর প্রতিদান দেবেন।" অতঃপর আব্বাস নিজের পক্ষ থেকে একশত উকিয়া এবং তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র ও মিত্রের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে চল্লিশ উকিয়া প্রদান করে মুক্তিপণ সম্পন্ন করলেন। আব্বাস সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এই বাণী অবতীর্ণ হয়: {হে নবী, তোমাদের হাতে যারা বন্দি আছে তাদেরকে বলো, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কোনো কল্যাণ দেখেন তবে তোমাদের থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু তিনি তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।} [আল-আনফাল: ৭০]।

অতঃপর মুহাজিরদের দারিদ্র্য ও অভাবের কারণে যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদরের বন্দিদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য সতর্ক করে বললেন: {দেশে শত্রুকে পুরোপুরি পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোনো নবীর জন্য সমীচীন নয়} [আল-আনফাল: ৬৭], এখানে 'পরাভূত করা' বলতে শত্রু নিধন বোঝানো হয়েছে। {তোমরা দুনিয়ার নশ্বর সম্পদ কামনা করছ} অর্থাৎ মুক্তিপণের অর্থ; {আর আল্লাহ চান আখিরাত} [আল-আনফাল: ৬৭] অর্থাৎ এমন আমল যা আখিরাতের সওয়াব নিশ্চিত করে। {আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়} [আল-আনফাল: ৬৭] অর্থাৎ তোমাদের সাহায্যে তিনি পরাক্রমশালী এবং তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন

তাতে তিনি প্রজ্ঞাময়। {যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ববিধান না থাকত তবে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের ওপর মহাশাস্তি আপতিত হতো।} [আল-আনফাল: ৬৮]।
এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: বন্দিদের থেকে গৃহীত মুক্তিপণের অর্থ। এ বিষয়ে তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে:
প্রথমটি: যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে বদরবাসীদের শাস্তি না দেওয়ার ব্যাপারে পূর্বসিদ্ধান্ত না থাকত, তবে বদরের বন্দিদের থেকে তোমরা যে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের ওপর মহাশাস্তি আপতিত হতো। এটি মুজাহিদ (রহ.)-এর অভিমত।
দ্বিতীয়টি: যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল হওয়ার ব্যাপারে পূর্ববিধান না থাকত, তবে বদরবাসীদের ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করার ত্বরা করার কারণে তোমাদের ওপর মহাশাস্তি আপতিত হতো। এটি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত।
তৃতীয়টি: যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তি না জেনে কিছু করলে তাকে পাকড়াও না করার ব্যাপারে পূর্ববিধান না থাকত, তবে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের ওপর মহাশাস্তি আপতিত হতো। এটি ইবনে ইসহাক (রহ.)-এর অভিমত। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: "হে ওমর, এই আয়াতে যদি আল্লাহ আমাদের ওপর আজাব নাজিল করতেন, তবে তুমি ছাড়া আর কেউ রক্ষা পেত না।" ২।

---

১. ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে (৪/৭৮) এটি বর্ণনা করেছেন।
২. ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে (১০/৪৮) এটি বর্ণনা করেছেন।

وَالثَّالِثُ: مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ فِيمَا حَازَهُ مِنَ الْغَنَائِمِ، وَلَا يَغُلَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا حَتَّى يُقَسَّمَ بَيْنَ جَمِيعِ الْغَانِمِينَ مِمَّنْ شَهِدَ الْوَاقِعَةَ وَكَانَ عَلَى الْعَدُوِّ يَدًا؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيهَا حَقًّا؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161] .

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ:

أَحَدُهَا: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ أَصْحَابَهُ وَيَخُونَهُمْ فِي غَنَائِمِهِمْ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ1.

وَالثَّانِي: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّهُ أَصْحَابُهُ وَيَخُونُوهُ فِي غَنَائِمِهِمْ، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ2.

وَالثَّالِثُ: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْتُمَ أَصْحَابَهُ مَا بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ إِلَيْهِمْ؛ لِرَهْبَةٍ مِنْهُمْ وَلَا لِرَغْبَةٍ فِيهِمْ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ3.

وَالرَّابِعُ: مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يُمَايِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ذَا قُرْبَى، وَلَا يُحَابِي فِي نُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ ذَا مَوَدَّةٍ، فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ أَوْجَبُ وَنُصْرَةَ دِينِهِ أَلْزَمُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ} [الممتحنة: 1] .

نَزَلَتْ فِي حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، وَقَدْ كَتَبَ كِتَابًا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ حِينَ هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغَزْوِهِمْ، يُعْلِمُهُمْ فِيهِ حَالَ مَسِيرِهِ إِلَيْهِمْ، وَأَنْفَذَهُ مَعَ سَارَةَ مَوْلَاةٍ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهَا، فَأَنْفَذَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ فِي أَثَرِهَا حَتَّى أَخْرَجَاهُ مِنْ قَرْنِ رَأْسِهَا، فَدَعَا حَاطِبًا وَقَالَ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ"؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا كَفَرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ، وَلَكِنِّي امْرُؤٌ لَيْسَ لِي فِي الْقَوْمِ أَصْلٌ وَلَا عَشِيرَةٌ، وَكَانَ لِي بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ أَهْلُ وَلَدٍ، فَطَالَعْتُهُمْ بِذَلِكَ، وَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

---

1 رواه ابن جرير في تفسيره "4/ 154".

2 رواه ابن جرير في تفسيره "4/ 157".

3 رواه ابن جرير في تفسيره "4/ 156".

তৃতীয়ত: আল্লাহ তাআলার হকসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো সংগৃহীত যুদ্ধলব্ধ মালে (গনিমতে) আমানত রক্ষা করা। তাদের কেউ যেন সামান্য পরিমাণও আত্মসাৎ না করে যতক্ষণ না তা যুদ্ধে উপস্থিত সকল বিজয়ীর মাঝে বণ্টন করা হয়, যারা শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তিতে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ, তাদের প্রত্যেকেরই এতে অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {আর কোনো নবীর পক্ষে সম্ভব নয় যে তিনি খিয়ানত করবেন; আর যে ব্যক্তি খিয়ানত করবে, সে কিয়ামতের দিন সেই খিয়ানতকৃত বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে} [আল ইমরান: ১৬১]।

এ বিষয়ে তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

প্রথমটি: কোনো নবীর পক্ষে সম্ভব নয় যে তিনি নিজ সাহাবীদের সাথে খিয়ানত করবেন এবং তাঁদের যুদ্ধলব্ধ মালের ব্যাপারে আত্মসাৎ করবেন। এটি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর অভিমত।

দ্বিতীয়টি: কোনো নবীর ক্ষেত্রে এমন হতে পারে না যে তাঁর সাহাবীগণ তাঁর সাথে খিয়ানত করবেন এবং তাঁর গনিমতের মালে আত্মসাৎ করবেন। এটি হাসান ও কাতাদাহ (রাহিমাহুমাল্লাহ)-এর অভিমত।

তৃতীয়টি: কোনো নবীর পক্ষে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট যা অবতীর্ণ করেছেন তা সাহাবীদের থেকে গোপন করা সম্ভব নয়; তাদের প্রতি কোনো ভীতির কারণে নয় এবং কোনো প্রাপ্তির আশায়ও নয়। এটি মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রাহিমাহুল্লাহ)-এর অভিমত।

চতুর্থত: আল্লাহ তাআলার হকসমূহের অন্যতম হলো মুশরিকদের মধ্যে কোনো আত্মীয়ের প্রতি পক্ষপাত না করা এবং আল্লাহর দ্বীনের সহায়তার ক্ষেত্রে কোনো প্রিয়জনের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন না করা। কেননা আল্লাহর হক অধিকতর ওয়াজিব এবং তাঁর দ্বীনের সাহায্য করা অধিকতর অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে} [আল মুমতাহিনা: ১]। এই আয়াত হাতিব বিন আবি বালতাআহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মক্কা অভিযানের সংকল্প করলেন, তখন তিনি মক্কাবাসীদের কাছে একটি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রে তিনি তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অভিযানের সংবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি পত্রটি বনু আব্দুল মুত্তালিবের মুক্তদাসী সারাহ-র মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে এ

বিষয়ে অবহিত করেন। তখন তিনি আলী ও যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে তার সন্ধানে পাঠান এবং তারা তার মাথার বেণী থেকে তা উদ্ধার করেন। অতঃপর তিনি হাতিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডেকে বললেন: "তুমি যা করেছ তা করতে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল?" তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী, আমি কুফরি করিনি এবং দ্বীন পরিবর্তনও করিনি। কিন্তু আমি এমন একজন লোক যার সেই কওমের মধ্যে কোনো মূল ভিত্তি বা গোত্রীয় সমর্থন নেই। সেখানে আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি ছিল, তাই আমি এই পত্রের মাধ্যমে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চেয়েছিলাম।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।

---

১. ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন "৪/ ১৫৪"।

২. ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন "৪/ ১৫৭"।

৩. ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন "৪/ ১৫৬"।

(ص: 85)الأحكام السلطانية للماوردي

وَأَمَّا مَا يَلْزَمُهُمْ فِي حَقِّ الْأَمِيرِ عَلَيْهِمْ فَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: الْتِزَامُ طَاعَتِهِ وَالدُّخُولُ فِي وِلَايَتِهِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَيْهِمْ انْعَقَدَتْ وَطَاعَتُهُ بِالْوِلَايَةِ وَجَبَتْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] .

وَفِي أُولِي الْأَمْرِ تَأْوِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمُ الْأُمَرَاءُ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُمُ الْعُلَمَاءُ2، وَهَذَا قَوْلُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ، وَرَوَى أَبُو صَالِحٍ

---

1 قلت: اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في تعريف أولي الأمر، فنجد الإمام النووي يعرفهم: "بأنَّهم العلماء والرؤساء".

بينما يرى الإمام البغدادي أنَّهم "أهل الاجتهاد".

ثم نجد من يقول: "إنهم الأشراف والأعيان"، ثم نجد الإمام محمد عبده يقول: "إنهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجعُ إليهم الناس في الحاجات والمصالح".

ثم يقول الإمام أيضًا: "إن أولي الأمر في زماننا هم كبار العلماء ورؤساء الجند، والقضاة، وكبار التجار والزراع، وأصحاب المصالح العامَّة، ومديرو الجمعيات والشركات، وزعماء الأحزاب، ونابغو الكُتَّاب والأطبَّاء والمحامين الذين تثق بهم الأمة في مصالحها، وترجع إليهم في مشكلاتها".

ثم يقول الشيخ محمود شلتوت رحمه الله: "أولو الأمر هم أهل النظر الذين عرفوا في الأمة بكمال الاختصاص في بحث الشئون وإدراك المصالح والغيرة عليها، وليس منْ شكٍّ في أن شئون الأمة متعددة، ففي الأمة جانب القوة، وفيها جانب القضاء، وفيها جانب المال، وفيها جانب السياسة الخارجية، وفيها غير ذلك من الجوانب، ولكل جانب رجال عرفوا فيه بنضج الآراء وعظم الآثار، وهؤلاء الرجال هم أولو الأمر من الأمة، وهم أهل الإجماع الذين يكون اتفاقهم حجة يجب النزول عليها".

ويقول السيد رشيد رضا: "والمراد بأُولي الأمر: أهل الرأي والمكانة في الأمة، وهم العلماء بمصالحها وطرق حفظها، والمقبولة آراؤهم عند عامتها".

2 فائدة: يقول الدكتور عبد الكريم الحمداوي: كان الاجتهاد شديد الاضطراب عند محاولته تحديد هوية أولي الأمر الذين أشارت إليهم الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] ، مما ترك ثغرة للحكام وظَّفُوها للاستئثار بأمر الأمة كله، إلَّا أنَّ إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالتدبير السياسي دلَّت بما لا يدع مجالًا للريب أنَّ أولي الأمر الدنيوي العام هم

المسلمون جميعًا، وهم الأداة البشرية الموكلة بصياغة القوانين والقواعد، واتخاذ القرارات وتنفيذها والمحاسبة عليها.

ولئن اعترض معترض بأنَّ قضايا الدنيا متنوعة ومعقدة لا يفهمها إلّا أولو الاختصاص والخبرة من العلماء والفقهاء والأطباء والمهندسين، فإنَّ هذا الإشكال يزول إذا علمنا أنَّ هؤلاء يشاركون في الشورى، ويقومون أثناءها بمهمة الشرح والتوعية وتوضيح الأحكام الدينية والحقائق العلمية، على أن لا يحرم أحد من حقه إبداء الرأي أو الاعتراض أو المساهمة في اتخاذ القرار، أو يوظّف اختلاف المستوى العلمي مبررًا لاحتكار الشورى، والاستئثار بها؛ إذ الجميع في سفينة واحدة يهلكون مهلكًا واحدًا بغرقها. [فقه الأحكام السلطانية] .

আর তাদের ওপর নিযুক্ত আমিরের প্রতি তাদের যে কর্তব্যগুলো অবধারিত রয়েছে, তা চারটি বিষয়:

প্রথমটি: তাঁর আনুগত্যে অবিচল থাকা এবং তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে প্রবেশ করা; কেননা তাদের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই কর্তৃত্বের কারণেই তাঁর আনুগত্য করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্যকার উলুল আমর বা আদেশদাতাদের (নেতৃবৃন্দের)} [আন-নিসা: ৫৯]।

আর 'উলুল আমর' (আদেশদাতা) শব্দটির ব্যাখ্যায় দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি: তাঁরা হলেন শাসক বা আমিরগণ। এটি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অভিমত।

দ্বিতীয়টি: তাঁরা হলেন উলামায়ে কিরাম, এটি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, হাসান ও আতা-এর অভিমত। আর আবু সালিহ বর্ণনা করেছেন—

---

১. আমি বলছি: 'উলুল আমর'-এর সংজ্ঞায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণ মতভেদ করেছেন। আমরা দেখি ইমাম নববী তাঁদের সংজ্ঞায় বলেছেন: "তাঁরা হলেন আলেম এবং নেতৃবৃন্দ।" অপরদিকে ইমাম বাগদাদী মনে করেন যে তাঁরা হলেন "ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ (আহলুল ইজতিহাদ)।"

এরপর আমরা কাউকে বলতে দেখি: "তাঁরা হলেন সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।" আবার ইমাম মুহাম্মদ আবদুহ বলেন: "তাঁরা হলেন আমির, শাসক, আলেম, সেনাপ্রধান এবং অন্যান্য সকল প্রধান ও নেতা, যাদের কাছে মানুষ তাদের প্রয়োজন ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরণাপন্ন হয়।" অতঃপর ইমাম আরও বলেন: "আমাদের যুগে উলুল আমর হলেন বিজ্ঞ আলেম সমাজ, সেনাপ্রধানগণ, বিচারকগণ, বড় ব্যবসায়ী ও কৃষকগণ, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানির পরিচালকগণ, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, প্রতিভাবান লেখক, চিকিৎসক ও আইনজীবীগণ—যাদের ওপর উম্মাহ তাদের স্বার্থের বিষয়ে আস্থা রাখে এবং তাদের সমস্যার সমাধানে যাদের কাছে ফিরে আসে।"

এরপর শেখ মাহমুদ শালতুত (রহ.) বলেন: "উলুল আমর হলেন এমন চিন্তাশীল গবেষকগণ, যারা উম্মাহর মাঝে বিভিন্ন বিষয় গবেষণায় পূর্ণ পারদর্শিতা, জনস্বার্থ অনুধাবন এবং সেগুলোর প্রতি গভীর মমত্ববোধের জন্য পরিচিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে উম্মাহর বিষয়াবলি বহুমুখী; উম্মাহর যেমন শক্তির দিক আছে, তেমনি আছে বিচার বিভাগীয় দিক, আর্থিক দিক, পররাষ্ট্রনীতির দিক এবং আরও অন্যান্য দিক। প্রতিটি দিকের জন্য এমন সব ব্যক্তি রয়েছেন যারা সুপরিপক্ক মতামত ও মহান অবদানের জন্য সুপরিচিত। এই ব্যক্তিরাই হলেন উম্মাহর উলুল আমর এবং তাঁরাই ইজমা বা ঐকমত্যের অধিকারী পক্ষ, যাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া উম্মাহর জন্য আবশ্যক।"

আর সাইয়্যেদ রশিদ রিযা বলেন: "উলুল আমর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উম্মাহর নীতিনির্ধারক ও মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা হলেন উম্মাহর স্বার্থ এবং তা রক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত আলেমগণ, যাদের মতামত সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য।"

২. জ্ঞাতব্য: ড. আব্দুল কারিম আল-হামদাউই বলেন: পবিত্র কুরআনের আয়াতে নির্দেশিত 'উলুল আমর'-এর পরিচয় নির্ধারণে ইজতিহাদ বা গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়েছে: {হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্যকার উলুল আমর বা আদেশদাতাদের (নেতৃবৃন্দের)} [আন-নিসা: ৫৯]। এর ফলে শাসকদের জন্য একটি ছিদ্রপথ তৈরি হয়েছিল যা তারা উম্মাহর সকল বিষয় কুক্ষিগত করতে ব্যবহার করত। তবে রাজনৈতিক পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট পাঠ্যসমূহ পুনর্বিবেচনা করলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ জাগতিক বিষয়ের 'উলুল আমর' হলেন সকল মুসলিম। তাঁরাই সেই মানবীয় মাধ্যম যাদের ওপর আইন ও নিয়ম প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং সেই বিষয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব অর্পিত।

যদি কেউ আপত্তি করেন যে, পার্থিব বিষয়াবলি বিচিত্র ও জটিল, যা বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আলেম, ফকিহ, চিকিৎসক ও প্রকৌশলী ছাড়া আর কেউ বুঝতে সক্ষম নয়—তবে এই সংশয় দূর হয়ে যাবে যখন আমরা জানব যে, তাঁরা পরামর্শ সভায় (শুরা) অংশগ্রহণ করেন এবং পরামর্শ চলাকালীন তাঁরা ব্যাখ্যা প্রদান, সচেতনতা তৈরি এবং ধর্মীয় বিধান ও বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ স্পষ্ট করার দায়িত্ব পালন করেন। তবে শর্ত হলো, কাউকে তার মতামত প্রকাশ, আপত্তি জানানো বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। অথবা কারো উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাকে পরামর্শ সভায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার বা অন্যদের বঞ্চিত করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না; কারণ সবাই একই নৌকার যাত্রী, নৌকা ডুবলে সবাই সমানভাবে ধ্বংস হবে। [ফিকহুল আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ]।

(ص: 86)الأحكام السلطانية للماوردي

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي" 1.

وَالثَّانِي: أَنْ يُفَوِّضُوا الْأَمْرَ إِلَى رَأْيِهِ، وَيَكِلُوهُ إِلَى تَدْبِيرِهِ، حَتَّى لَا تَخْتَلِفَ آرَاؤُهُمْ، فَتَتَلَفَ كَلِمَتُهُمْ وَيَفْتَرِقَ جَمْعُهُمْ، قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83] .

فَجَعَلَ تَفْوِيضَ الْأَمْرِ إِلَى وَلِيِّهِ سَبَبًا لِحُصُولِ الْعِلْمِ وَسَدَادِ الْأَمْرِ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُمْ صَوَابٌ خَفِيَ عَلَيْهِ بَيَّنُوهُ لَهُ وَأَشَارُوا بِهِ عَلَيْهِ؛ وَلِذَلِكَ نُدِبَ إِلَى الْمُشَاوَرَةِ لِيَرْجِعَ بِهَا إِلَى الصَّوَابِ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يُسَارِعُوا إِلَى امْتِثَالِ الْأَمْرِ وَالْوُقُوفِ عَنْهُ نَهْيِهِ وَزَجْرِهِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ لَوَازِمِ طَاعَتِهِ.

فَإِنْ تَوَقَّفُوا عَمَّا أَمَرَهُمْ بِهِ وَأَقْدَمُوا عَلَى مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ فَلَهُ تَأْدِيبُهُمْ عَلَى الْمُخَالَفَةِ بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ وَلَا يُغْلِظُ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: 159] ، وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ} 2.

وَالرَّابِعُ: أَنْ لَا يُنَازِعُوهُ فِي الْغَنَائِمِ إِذَا قَسَّمَهَا، وَيَرْضَوْا مِنْهُ بِتَعْدِيلِ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِمْ، فَقَدْ سَوَّى اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا بَيْنَ الشَّرِيفِ وَالْمَشْرُوفِ، وَمَاثَلَ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ.

وَرَوَى عَمْرو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: إِنَّ النَّاسَ اتَّبَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ يَقُولُونَ: اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئَنَا، حَتَّى أَلْجَأَهُ إِلَى شَجَرَةٍ فَاخْتُطِفَ عَنْهُ رِدَاؤُهُ، فَقَالَ: "رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي أَيُّهَا النَّاسُ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ عَدَدُ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ، وَمَا أَلْفَيْتُمُونِي بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذُوبًا"، ثُمَّ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَغَامِ بَعِيرِهِ فَرَفَعَهَا وَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَاللَّهِ مَالِي مِنْ فَيْئِكُمْ وَلَا هَذِهِ الْوَبَرَةِ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب الأحكام "7137"، ومسلم في كتاب الإمارة "1835".

2 صحيح: رواه أحمد "15506"، وصحَّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع "3309".

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করল; আর যে ব্যক্তি আমার (নিযুক্ত) আমিরের আনুগত্য করল, সে যেন আমারই আনুগত্য করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে যেন আল্লাহরই অবাধ্যতা করল; আর যে ব্যক্তি আমার (নিযুক্ত) আমিরের অবাধ্যতা করল, সে যেন আমারই অবাধ্যতা করল।" ১।

দ্বিতীয়ত: তারা সকল বিষয়ের ফয়সালা তাঁর মতামতের ওপর অর্পণ করবে এবং তা তাঁর পরিচালনার ওপর ন্যস্ত করবে, যাতে তাদের মতপার্থক্য না ঘটে, ফলে তাদের ঐক্য বিনষ্ট না

হয় এবং সংহতি বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {আর তারা যদি তা রাসূলের এবং তাদের মধ্যকার উলুল আমর বা দায়িত্বশীলদের কাছে পেশ করত, তবে তাদের মধ্যে যারা গবেষণা করে তত্ত্ব বের করতে পারে তারা অবশ্যই তা জানত।} [আন-নিসা: ৮৩]। সুতরাং কোনো বিষয়কে তার দায়িত্বশীলের ওপর ন্যস্ত করাকে ইলম অর্জন ও বিষয়ের সঠিকতা লাভের কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে যদি তাদের কাছে এমন কোনো সঠিক বিষয় প্রকাশ পায় যা তাঁর নিকট অস্পষ্ট ছিল, তবে তারা তা তাঁর কাছে ব্যক্ত করবে এবং সে বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দেবে; এ কারণেই পরামর্শের (মাশওয়ারা) প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে যেন এর মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

তৃতীয়ত: নির্দেশ পালনে ত্বরান্বিত হওয়া এবং তাঁর নিষেধ ও ধমক প্রদানকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকা; কেননা এ উভয়টিই তাঁর আনুগত্যের অপরিহার্য দাবি।

আর তিনি যা আদেশ করেছেন তা পালনে যদি তারা বিরত থাকে এবং যা নিষেধ করেছেন তাতে যদি লিপ্ত হয়, তবে অবাধ্যতার কারণে তাদের অবস্থা অনুযায়ী তিনি তাদের শাসন বা আদব শিক্ষা দিতে পারেন, তবে কঠোরতা করবেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।} [আল-ইমরান: ১৫৯]। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: {তোমাদের দ্বীনের সর্বোত্তম বিষয় হলো এর সহজতা।} ২।

চতুর্থত: তিনি যখন গনীমতের মাল বণ্টন করবেন, তখন যেন তারা এ নিয়ে তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত না হয় এবং তারা যেন তাঁর ইনসাফপূর্ণ বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকে। কেননা আল্লাহ তাআলা এতে অভিজাত ও সাধারণের মাঝে সমতা বিধান করেছেন এবং শক্তিশালী ও দুর্বলের মাঝে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন।

আমর ইবনু শুআইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন: হুনায়নের যুদ্ধের বছর মানুষ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছু নিয়েছিল এবং বলছিল, আমাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করে দিন। এমনকি তারা তাঁকে একটি গাছের নিকট যেতে বাধ্য করল এবং তাঁর চাদরটি ছিনিয়ে নেওয়া হলো। তখন তিনি বললেন: "হে লোকসকল! আমার চাদরটি আমাকে ফিরিয়ে দাও। আল্লাহর কসম! যদি তোমাদের জন্য তিহামার গাছপালার সমপরিমাণ গবাদি পশুও থাকতো, তবে আমি তা তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম; তোমরা আমাকে কৃপণ, ভীরু বা মিথ্যাবাদী হিসেবে পেতে না।" এরপর তিনি

তাঁর উটের কুঁজের একটি পশম হাতে নিলেন এবং তা উঁচিয়ে ধরে বললেন: "হে লোকসকল! আল্লাহর কসম, তোমাদের গনীমতের এই মালের মধ্য থেকে এই পশম সমপরিমাণও আমার জন্য নয়, কেবল 'খুমুস' (এক-পঞ্চমাংশ) ব্যতীত; আর সেই খুমুসও তোমাদের মাঝেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং তোমরা সুঁই-সুতা পর্যন্ত সবকিছু আদায় করে দাও। কেননা খিয়ানত (লুণ্ঠন) কিয়ামতের দিন লুণ্ঠনকারীর জন্য লজ্জা, জাহান্নামের আগুন এবং অপমানের কারণ হবে।" অতঃপর জনৈক ব্যক্তি আসলো...

---

১ সহীহ: বুখারী, কিতাবুল আহকাম (৭১৩৭); মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ (১৮৩৫)।
২ সহীহ: আহমদ (১৫৫০৬); শেখ আলবানী সহীহুল জামি' গ্রন্থে (৩৩০৯) এটিকে সহীহ বলেছেন।

(ص: 87)الأحكام السلطانية للماوردي

الْأَنْصَارِ بِكُبَّةٍ مِنْ خُيُوطِ شَعْرٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذْتُ هَذِهِ الْكُبَّةَ أَعْمَلُ بِهَا بَرْذَعَةَ بَعِيرٍ لِي قَدْ بَرَدَ. فَقَالَ: "أَمَّا نَصِيبِي مِنْهَا فَلَكَ"، فَقَالَ: "أَمَّا إِذَا بَلَغْتَ هَذَا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا" ثُمَّ طَرَحَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ 1.

فَصْلٌ:

وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ: مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ: مُصَابَرَةُ الْأَمِيرِ قِتَالَ الْعَدُوِّ مَا صَابَرَ وَإِنْ تَطَاوَلَتْ بِهِ الْمُدَّةُ، وَلَا يُوَلِّي عَنْهُ وَفِيهِ قُوَّةٌ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 200] .

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ:

أَحَدُهَا: اصْبِرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَصَابِرُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ، وَرَابِطُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ2.

وَالثَّانِي: اصْبِرُوا عَلَى دِينِكُمْ، وَصَابِرُوا الْوَعْدَ الَّذِي وَعَدَكُمْ، وَرَابِطُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ3.

وَالثَّالِثُ: اصْبِرُوا عَلَى الْجِهَادِ، وَصَابِرُوا الْعَدُوَّ، وَرَابِطُوا بِمُلَازَمَةِ الثَّغْرِ، وَهَذَا قَوْلُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ4.

وَإِذَا كَانَتْ مُصَابَرَةُ الْقِتَالِ مِنْ حُقُوقِ الْجِهَادِ فَهِيَ لَازِمَةٌ حَتَّى يُظْفَرَ بِخَصْلَةٍ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ:

إِحْدَاهُنَّ: أَنْ يُسْلِمُوا فَيَصِيرَ لَهُمْ بِالْإِسْلَامِ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا، وَيُقَرُّوا عَلَى مَا مَلَكُوا مِنْ بِلَادٍ وَأَمْوَالٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

---

1 حسن: رواه أبو داود في كتاب الجهاد "2694"، والنسائي في كتاب قسم الفيء "4139"، ومالك في كتاب الجهاد "994"، وحسنه الشيخ الألباني.

2 رواه ابن جرير في تفسيره "4/ 221".

3 انظر التخريج السابق.

4 انظر التخريج السابق.

আনসারদের এক ব্যক্তি চুলের সুতোর একটি গোলক নিয়ে এলেন। তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি এই গোলকটি নিয়েছি আমার একটি উটের জিনের গদি তৈরি করার জন্য যার পিঠ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। তিনি বললেন: "এতে আমার যে অংশ রয়েছে, তা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম।" তখন লোকটি বলল: "বিষয়টি যখন এই পর্যায়ে পৌঁছেছে, তবে এতে আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই।" এরপর সে সেটি তাঁর সামনে ফেলে দিল ১।

পরিচ্ছেদ:

পঞ্চম ভাগ: এই নেতৃত্বের (ইমারত) বিধিবিধানের অন্তর্ভুক্ত হলো: সেনাপতি যতক্ষণ ধৈর্য ধরে শত্রুর মোকাবিলা করবেন ততক্ষণ তার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, যদিও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়; এবং শক্তি অবশিষ্ট থাকতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু না হটা। আল্লাহ তাআলা বলেন: {হে

মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধরো এবং ধৈর্যের প্রতিযোগিতায় জয়ী হও, আর (সীমান্তে) পাহারায় নিয়োজিত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো} [আল ইমরান: ২০০]।

এর ব্যাখ্যায় তিনটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি: আল্লাহর আনুগত্যের ওপর ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে অটল থাকো এবং আল্লাহর পথে পাহারায় নিয়োজিত থাকো। এটি হাসানের অভিমত ২।

দ্বিতীয়টি: তোমাদের দ্বীনের ওপর অবিচল থাকো, তোমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করো এবং আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সীমান্তে পাহারায় নিয়োজিত থাকো। এটি মুহাম্মদ ইবনে কাবের অভিমত ৩।

তৃতীয়টি: জিহাদের ওপর ধৈর্য ধারণ করো, শত্রুর মোকাবিলায় অটল থাকো এবং সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মাধ্যমে সেখানে অবস্থান করো। এটি যায়দ ইবনে আসলামের অভিমত ৪।

যখন যুদ্ধে অবিচল থাকা জিহাদের হকের অন্তর্ভুক্ত, তখন চারটি বিষয়ের কোনো একটি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তা আবশ্যক থাকে:

প্রথমটি: তারা ইসলাম গ্রহণ করবে; ফলে ইসলামের কারণে আমাদের জন্য যা (অধিকার) রয়েছে তাদের জন্যও তা সাব্যস্ত হবে এবং আমাদের ওপর যা (দায়িত্ব) রয়েছে তাদের ওপরও তা অর্পিত হবে। আর তারা যেসব দেশ ও সম্পদের মালিক ছিল, সেগুলোর ওপর তাদের মালিকানা বহাল রাখা হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই...

---

১ হাসান: আবু দাউদ 'জিহাদ' অধ্যায়ে (২৬৯৪), নাসায়ি 'ফাই বণ্টন' অধ্যায়ে (৪১৩৯) এবং মালিক 'জিহাদ' অধ্যায়ে (৯৯৪) এটি বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

২ ইবনে জারির তার তাফসিরে এটি বর্ণনা করেছেন (৪/২২১)।

৩ পূর্ববর্তী তথ্যসূত্র দেখুন।

৪ পূর্ববর্তী তথ্যসূত্র দেখুন।

فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا" 1.

وَتَصِيرُ بِلَادُهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا دَارَ الْإِسْلَامِ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ، وَلَوْ أَسْلَمَ فِي مَعْرَكَةِ الْحَرْبِ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ -قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ- أَحْرَزُوا بِإِسْلَامِهِمْ مَا مَلَكُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ أَرْضٍ وَمَالٍ، فَإِنْ ظَهَرَ الْأَمِيرُ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَغْنَمْ أَمْوَالَ مَنْ أَسْلَمَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَغْنَمُ مَا لَا يُنْقَلُ مِنْ أَرْضٍ وَدَارٍ، وَلَا يَغْنَمُ مَا يُنْقَلُ مِنْ مَالٍ وَمَتَاعٍ وَهُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ.

وَقَدْ أَسْلَمَ فِي حِصَارِ بَنِي قُرَيْظَةَ ثَعْلَبَةُ وَأُسَيْدٌ ابْنَا شُعْبَةَ الْيَهُودِيَّانِ، فَأَحْرَزَ إِسْلَامُهُمَا أَمْوَالَهُمَا، وَيَكُونُ إِسْلَامُهُمْ إِسْلَامًا لِصِغَارِ أَوْلَادِهِمْ وَلِكُلِّ حَمْلٍ كَانَ لَهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَسْلَمَ كَافِرٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ إِسْلَامًا لِصِغَارِ وَلَدِهِ، وَلَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ إِسْلَامًا لِصِغَارِ وَلَدِهِ، وَلَا يَكُونُ إِسْلَامًا لِلْحَمْلِ، وَتَكُونُ زَوْجَتُهُ وَالْحَمْلُ فَيْئًا، وَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْبِ فَاشْتَرَى فِيهَا أَرْضًا وَمَتَاعًا، لَمْ يُمْلَكْ عَلَيْهِ إِذَا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا، وَكَانَ مُشْتَرِيهَا أَحَقَّ بِهَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ مَا مَلَكَهُ مِنْ أَرْضٍ فَيْئًا.

وَالْخَصْلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُظْفِرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ مَعَ مَقَامِهِمْ عَلَى شِرْكِهِمْ، فَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، وَتُغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ، وَيُقْتَلُ مَنْ لَمْ يَحْصُلْ فِي الْأَسْرِ مِنْهُمْ.

وَيَكُونُ فِي الْأَسْرَى مُخَيَّرًا فِي اسْتِعْمَالِ الْأَصْلَحِ مِنْ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَقْتُلَهُمْ صَبْرًا بِضَرْبِ الْعُنُقِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ وَيُجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامَ الرِّقِّ مِنْ بَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يُفَادِيَ بِهِمْ عَلَى مَالٍ أَوْ أَسْرَى.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ وَيَعْفُوَ عَنْهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4] .

وَفِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ ضَرْبُ رِقَابِهِمْ صَبْرًا بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ قِتَالُهُمْ بِالسِّلَاحِ وَالتَّدْبِيرِ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى ضَرْبِ رِقَابِهِمْ فِي الْمَعْرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} [محمد: 4] ، يَعْنِي بِالْإِثْخَانِ: الطَّعْنَ، وَبِشَدِّ الْوَثَاقِ:

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير "2946"، ومسلم في كتاب الإيمان "21".

"যখন তারা তা বলবে, তখন তারা আমার নিকট থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ করে নিল, তবে তার হকের বিষয়টি ভিন্ন।" ১.

এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের ভূখণ্ড দারুল ইসলামে পরিণত হবে এবং তাদের ওপর ইসলামের বিধান জারি হবে। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের কোনো দল—তা অল্প হোক বা অধিক—ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তারা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে দারুল হারবে তাদের মালিকানাধীন ভূমি ও সম্পদের সুরক্ষা লাভ করবে। সুতরাং আমির (শাসক) যদি দারুল হারব বিজয় করেন, তবে তিনি ইসলাম গ্রহণকারীর সম্পদ গনিমত হিসেবে গ্রহণ করবেন না।

ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন: ভূমি ও গৃহের মতো স্থাবর সম্পত্তি গনিমত হিসেবে গণ্য হবে, তবে অর্থ-কড়ি ও আসবাবপত্রের মতো অস্থাবর সম্পদ গনিমত হবে না। আর এটি সুন্নাহর পরিপন্থী।

বনু কুরাইজা অবরোধের সময় ইয়াহুদি শু'বার দুই পুত্র সা'লাবা ও উসাইদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, ফলে তাদের ইসলাম গ্রহণ তাদের সম্পদকে সুরক্ষা প্রদান করেছিল। তাদের এই ইসলাম গ্রহণ তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের জন্য এবং তাদের গর্ভস্থ সকল সন্তানের জন্য ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে।

ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন: যদি কোনো কাফির ব্যক্তি দারুল ইসলামে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তা তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে না; কিন্তু যদি সে দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তা তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে। তবে তা গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষেত্রে ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তার স্ত্রী ও গর্ভস্থ সন্তান 'ফায়' (রাষ্ট্রীয়

সম্পদ) হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি কোনো মুসলিম দারুল হারবে প্রবেশ করে সেখানে কোনো ভূমি ও আসবাবপত্র ক্রয় করে, তবে মুসলিমরা সেই ভূখণ্ড জয় করলে তা তার মালিকানা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে না এবং এর ক্রেতাই এর অধিক হকদার হবেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন: তার মালিকানাধীন ভূমি 'ফায়' হিসেবে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শিরকের ওপর থাকা অবস্থায় মুসলিমদের করায়ত্ত করে দেবেন; ফলে তাদের সন্তানদের বন্দি করা হবে, তাদের সম্পদ গনিমত হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের মধ্যে যারা বন্দি অবস্থায় আসেনি তাদের হত্যা করা হবে।

আর বন্দিদের ক্ষেত্রে চারটি বিষয়ের মধ্য থেকে যেটি অধিক কল্যাণকর, তা প্রয়োগ করার ইখতিয়ার থাকবে:

প্রথমত: গর্দান দ্বিখণ্ডিত করার মাধ্যমে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা।

দ্বিতীয়ত: তাদেরকে দাসে পরিণত করা এবং তাদের ওপর দাসত্বের বিধান যেমন ক্রয়-বিক্রয় বা মুক্তি প্রদান কার্যকর করা।

তৃতীয়ত: সম্পদের বিনিময়ে অথবা মুসলিম বন্দিদের বিনিময়ে তাদের মুক্তিপণ গ্রহণ করা।

চতুর্থত: তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং তাদের ক্ষমা করে দেওয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা করো, তখন তাদের গর্দান আঘাত করো" [মুহাম্মদ: ৪]।

এর ব্যাখ্যায় দুটি অভিমত রয়েছে:

একটি হলো: তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের পর তাদের গর্দান দ্বিখণ্ডিত করা।

দ্বিতীয়টি হলো: অস্ত্র ও রণকৌশলের মাধ্যমে তাদের সাথে যুদ্ধ করা, যতক্ষণ না রণক্ষেত্রে তাদের গর্দান দ্বিখণ্ডিত করার পর্যায়ে পৌঁছায়। অতঃপর তিনি বলেছেন: "অবশেষে যখন তোমরা তাদের পূর্ণরূপে পরাস্ত করবে, তখন তোমরা বন্ধন শক্ত করে বাঁধবে" [মুহাম্মদ: ৪]। এখানে পূর্ণরূপে পরাস্ত করা বলতে আঘাত করা এবং বন্ধন শক্ত করা বলতে বোঝানো হয়েছে:

---

১. সহিহ: বুখারি এটি 'জিহাদ ও সিয়ার' অধ্যায়ে (২৯৪৬) এবং মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়ে (২১) বর্ণনা করেছেন।

الْأَسْرَ. {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] .

وَفِي الْمَنِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْعَفْوُ وَالْإِطْلَاقُ كَمَا مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ بَعْدَ أَسْرِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْعِتْقُ بَعْدَ الرِّقِّ، وَهَذَا قَوْلُ مُقَاتِلٍ، وَأَمَّا الْفِدَاءُ فَفِيهِ هَهُنَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْمُفَادَاةُ عَلَى مَالٍ يُؤْخَذُ أَوْ أَسِيرٍ يُطْلَقُ، كَمَا فَادَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْرَى بَدْرٍ عَلَى مَالٍ، وَفَادَى فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ رَجُلٌ بِرَجُلَيْنِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْبَيْعُ، وَهُوَ قَوْلُ مُقَاتِلٍ: {حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4] .

وَفِيهِ تَأْوِيلَانِ 1:

أَحَدُهُمَا: أَوْزَارُ الْكُفْرِ بِالْإِسْلَامِ.

وَالثَّانِي: أَثْقَالُ الْحَرْبِ وَهُوَ السِّلَاحُ، وَفِي الْمَقْصُودِ بِهَذَا السِّلَاحِ الْمَوْضُوعِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا سِلَاحُ الْمُسْلِمِينَ بِالنَّصْرِ.

وَالثَّانِي: سِلَاحُ الْمُشْرِكِينَ بِالْهَزِيمَةِ، وَلِهَذِهِ الْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ شَرْحٌ يُذْكَرُ مَعَ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَعْدُ، وَالْخَصْلَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَبْذُلُوا مَالًا عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَالْمُوَادَعَةِ؛ فَيَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمْ وَيُوَادِعَهُمْ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبْذُلُوهُ لِوَقْتِهِمْ وَلَا يَجْعَلُوهُ خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا، فَهَذَا الْمَالُ غَنِيمَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِإِيجَافِ خَيْلٍ وَرِكَابٍ، فَيُقَسَّمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَيَكُونُ ذَلِكَ أَمَانًا لَهُمْ فِي الِانْكِفَافِ بِهِ عَنْ قِتَالِهِمْ فِي هَذَا الْجِهَادِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ جِهَادِهِمْ فِيمَا بَعْدُ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَبْذُلُوهُ فِي كُلِّ عَامٍ، فَيَكُونُ هَذَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا، وَيَكُونُ الْأَمَانُ بِهِ مُسْتَقِرًّا، وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ غَنِيمَةٌ تُقَسَّمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَمَا يُؤْخَذُ فِي

الْأَعْوَامِ الْمُسْتَقْبَلَةِ يُقَسَّمُ فِي أَهْلِ الْفَيْءِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَاوِدَ جِهَادَهُمْ مَا كَانُوا مُقِيمِينَ عَلَى بَذْلِ الْمَالِ لِاسْتِقْرَارِ الْمُوَادَعَةِ عَلَيْهِ.

وَإِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ لَهُ بِعَقْدِ الْمُوَادَعَةِ الْأَمَانُ

---

1 انظر: تفسير ابن جرير "26/ 43".

বন্দিত্ব। {অতঃপর হয় অনুগ্রহ করো, না হয় মুক্তিপণ গ্রহণ করো} [মুহাম্মদ: ৪]।

আর অনুগ্রহের (মান্ন) বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি: তা হলো ক্ষমা করা ও মুক্তি দান করা, যেমনটি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুমামা ইবনে উসালকে বন্দি হওয়ার পর অনুগ্রহ করে মুক্তি দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়টি: তা হলো দাসত্বের পর মুক্তি দান করা; এটি মুকাতিলের বক্তব্য। আর মুক্তিপণের (ফিদা) বিষয়ে এখানে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি: তা হলো সম্পদের বিনিময়ে অথবা কোনো বন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে মুক্তি প্রদান, যেমন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদরের বন্দিদের সম্পদের বিনিময়ে মুক্তিপণ নিয়েছিলেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজনের বিনিময়ে দুইজনকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়টি: তা হলো বিক্রয় করা; এটি মুকাতিলের অভিমত: {যতক্ষণ না যুদ্ধ তার সাজসরঞ্জাম নামিয়ে রাখে} [মুহাম্মদ: ৪]।

এতে দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে ১:

প্রথমটি: ইসলামের মাধ্যমে কুফরের বোঝা দূরীভূত হওয়া।

দ্বিতীয়টি: যুদ্ধের ভার অর্থাৎ যুদ্ধাস্ত্র; আর এই নামিয়ে রাখা বা জমিয়ে রাখা অস্ত্র দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা নিয়ে দুটি দিক রয়েছে:

প্রথমটি: বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিমদের অস্ত্রের বিরতি।

দ্বিতীয়টি: পরাজয়ের মাধ্যমে মুশরিকদের অস্ত্র ত্যাগ করা। আর এই চারটি বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরবর্তীতে গনীমত বণ্টনের আলোচনার সাথে উল্লেখ করা হবে। তৃতীয় বিষয়টি হলো: তারা সন্ধি ও যুদ্ধবিরতির আবেদনের প্রেক্ষিতে সম্পদ প্রদান করবে; সেক্ষেত্রে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করা বৈধ এবং তাদের সাথে দুইভাবে সন্ধি করা যেতে পারে:

প্রথমটি: তারা তৎক্ষণাৎ সম্পদ প্রদান করবে এবং একে স্থায়ী খাজনা হিসেবে নির্ধারণ করবে না; এমতাবস্থায় এই সম্পদ গনীমত হিসেবে গণ্য হবে, কারণ এটি ঘোড়া ও উট চালনার (সশস্ত্র অভিযানের) মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। ফলে তা যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং এর মাধ্যমে এই জিহাদে তাদের সাথে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, তবে পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পথে কোনো বাধা থাকবে না।
দ্বিতীয় প্রকার: তারা প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ প্রদান করবে, ফলে তা স্থায়ী খাজনা (খারাজ) হিসেবে গণ্য হবে এবং এর মাধ্যমে নিরাপত্তা স্থায়ী রূপ পাবে। তাদের কাছ থেকে প্রথম বছরে যা নেওয়া হবে তা গনীমত হিসেবে যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টিত হবে, আর পরবর্তী বছরগুলোতে যা নেওয়া হবে তা 'ফাই' বা সাধারণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে প্রাপ্যদের মাঝে বণ্টিত হবে। তারা যতদিন সম্পদ প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে, ততদিন তাদের বিরুদ্ধে পুনরায় জিহাদ করা জায়েজ হবে না, যেহেতু সন্ধি এর ওপরই স্থিতিশীল হয়েছে।
আর যখন তাদের কেউ দারুল ইসলামে (মুসলিম ভূখণ্ডে) প্রবেশ করবে, তখন সন্ধি চুক্তির কারণে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।

---

১ দেখুন: তাফসিরে ইবনে জারির "২৬/ ৪৩"।

(ص: 90)الأحكام السلطانية للماوردي

عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَإِنْ مَنَعُوا الْمَالَ زَالَتِ الْمُوَادَعَةُ وَارْتَفَعَ الْأَمَانُ وَلَزِمَ جِهَادُهُمْ كَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَكُونُ مَنْعُهُمْ مِنْ مَالِ الْجِزْيَةِ وَالصُّلْحِ نَقْضًا لِأَمَانِهِمْ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِمْ، فَلَا يُنْتَقَضُ الْعَهْدُ، وَجَازَ حَرْبُهُمْ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ الْعَهْدَ مَا كَانَ عَنْ عَقْدٍ.

وَالْخَصْلَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَسْأَلُوا الْأَمَانَ وَالْمُهَادَنَةَ، فَيَجُوزُ إِذَا تَعَذَّرَ الظَّفَرُ بِهِمْ وَأَخْذُ الْمَالِ مِنْهُمْ أَنْ يُهَادِنَهُمْ عَلَى الْمُسَالَمَةِ فِي مُدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ يَعْقِدُ الْهُدْنَةَ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي الْهُدْنَةِ أَوْ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ.

قَدْ هَادَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَشْرَ سِنِينَ. وَيَقْتَصِرُ فِي مُدَّةِ الْهُدْنَةِ عَلَى أَقَلِّ مَا يُمْكِنُ وَلَا يُجَاوِزُ أَكْثَرُهَا عَشْرَ سِنِينَ، فَإِنْ هَادَنَهُمْ أَكْثَرَ مِنْهَا بَطَلَتْ الْمُهَادَنَةُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا، وَلَهُمْ الْأَمَانُ فِيهَا إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا، وَلَا يُجَاهِدُونَ فِيهَا مَا أَقَامُوا عَلَى الْعَهْدِ، فَإِنْ نَقَضُوهُ صَارَ حَرْبًا يُجَاهِدُونَ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ، قَدْ نَقَضَتْ قُرَيْشٌ صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ فَسَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ مُحَارِبًا حَتَّى فَتَحَ مَكَّةَ صُلْحًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَعَنْوَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ وَلَا يَجُوزُ إِذَا نَقَضُوا عَهْدَهُمْ أَنْ يُقْتَلَ مَا فِي أَيْدِينَا مِنْ رَهَائِنِهِمْ، قَدْ نَقَضَ الرُّومُ عَهْدَهُمْ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ وَفِي يَدِهِ رَهَائِنُ فَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا مِنْ قَتْلِهِمْ وَخَلَّوْا سَبِيلَهُمْ وَقَالُوا: وَفَاءٌ بِغَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ غَدْرٍ بِغَدْرٍ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَدِّ الْأَمَانَةَ لِمَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ" 1.

فَإِذَا لَمْ يَجُزْ قَتْلُ الرَّهَائِنِ لَمْ يَجُزْ إِطْلَاقُهُمْ مَا لَمْ يُحَارِبُهُمْ، فَإِذَا حَارَبَهُمْ وَجَبَ إِطْلَاقُ رَهَائِنِهِمْ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِيهِمْ، فَإِنْ كَانُوا رِجَالًا وَجَبَ إِبْلَاغُهُمْ مَأْمَنَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا ذَرَارِيَّ نِسَاءً وَأَطْفَالًا وَجَبَ إِيصَالُهُمْ إِلَى أَهَالِيهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَتْبَاعٌ لَا يَنْفَرِدُونَ بِأَنْفُسِهِمْ، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُمْ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ رَدَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ رِجَالِهِمْ، فَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا مَأْمُونِينَ عَلَى دَمِهِ، وَلَمْ يُرَدَّ إِلَيْهِمْ أَنْ يُؤْمَنُوا عَلَيْهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ رَدُّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ نِسَائِهِمْ؛ لِأَنَّهُنَّ ذَوَاتُ فُرُوجٍ مُحَرَّمَةٍ، فَإِنْ اُشْتُرِطَ رَدُّهُنَّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُرَدُّوا، وَدَفَعَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ مُهُورَهُنَّ إِذَا طُلِّقْنَ.

وَإِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَى عَقْدِ الْمُهَادَنَةِ ضَرُورَةٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُهَادِنَهُمْ، وَيَجُوزُ أَنْ يُوَادِعَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَمَا دُونَ

---

1 صحيح: رواه أبو داود في كتاب البيوع "3535"، والترمذي في كتاب البيوع "1264"، والدارمي في كتاب "البيوع" "2597"، وصحَّحه الشيخ الألباني.

তার নিজের জান ও মালের ওপর; অতঃপর তারা যদি সম্পদ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তবে সন্ধি বাতিল হয়ে যাবে এবং নিরাপত্তা রহিত হবে এবং অন্যান্য হারবি কাফিরদের ন্যায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন: তাদের পক্ষ থেকে জিযিয়া বা সন্ধির অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি তাদের নিরাপত্তার জন্য চুক্তিভঙ্গ বলে গণ্য হবে না; কারণ এটি তাদের ওপর একটি পাওনা অধিকার মাত্র। সুতরাং চুক্তি ভঙ্গ হবে না, তবে এরপর তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ হবে; কারণ সন্ধিটি ছিল একটি চুক্তির ভিত্তিতে।

চতুর্থ বিষয়টি হলো: তারা যদি নিরাপত্তা ও যুদ্ধবিরতির আবেদন করে; তবে তাদের ওপর বিজয় লাভ করা কিংবা তাদের থেকে সম্পদ গ্রহণ করা যদি দুঃসাধ্য হয়, তবে ইমাম যদি তাকে যুদ্ধবিরতির অনুমতি দেন অথবা বিষয়টি তার ওপর ন্যস্ত করেন, তবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য শান্তিচুক্তির ভিত্তিতে তাদের সাথে যুদ্ধবিরতি করা বৈধ হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) হুদায়বিয়ার বছর কুরাইশদের সাথে দশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি করেছিলেন। যুদ্ধবিরতির মেয়াদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সম্ভাব্য সময়ের ওপর সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং তা সর্বোচ্চ দশ বছর অতিক্রম করবে না। যদি তাদের সাথে এর চেয়ে বেশি সময়ের জন্য যুদ্ধবিরতি করা হয়, তবে অতিরিক্ত সময়ের ক্ষেত্রে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। মেয়াদের শেষ পর্যন্ত তারা নিরাপত্তা লাভ করবে এবং যতদিন তারা চুক্তির ওপর অটল থাকবে, ততদিন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে না। কিন্তু তারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে তা যুদ্ধাবস্থায় পরিণত হবে এবং কোনো পূর্ব সতর্কবার্তা ছাড়াই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে। কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করেছিল, তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বিজয়ের বছর তাদের অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং শেষ পর্যন্ত মক্কা জয় করেন—যা ইমাম শাফি'র মতে সন্ধির মাধ্যমে এবং ইমাম আবু হানিফার মতে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল। তারা যদি তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে আমাদের হস্তগত তাদের জিম্মিদের হত্যা করা বৈধ নয়। মুয়াবিয়ার যুগে রোমানরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং তার নিকট জিম্মি ছিল, কিন্তু সকল মুসলিম তাদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন এবং তাদের ছেড়ে দেন। তারা বলেছিলেন: ‘প্রতারণার বিপরীতে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, প্রতারণার বিপরীতে প্রতারণা করার চেয়ে উত্তম।’

নবী (সা.) বলেছেন: "যে তোমাকে বিশ্বাস করেছে তার আমানত আদায় করো এবং যে তোমার সাথে খেয়ানত করেছে তুমি তার সাথে খেয়ানত করো না" ১।

যখন জিম্মিদের হত্যা করা বৈধ নয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত তাদের মুক্ত করে দেওয়াও বৈধ নয়। যখন তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু হবে, তখন তাদের জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া আবশ্যক হবে। অতঃপর তাদের বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে: যদি তারা পুরুষ হয়, তবে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক; আর যদি তারা নারী ও শিশু হয়, তবে তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক; কারণ তারা অন্যের অনুগামী, তারা স্বতন্ত্র নয়।

যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে তাদের পক্ষ থেকে ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষদের ফেরত দেওয়ার শর্ত করা বৈধ। সুতরাং তাদের কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাকে তাদের নিকট ফেরত পাঠানো হবে যদি তার জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে। কিন্তু যদি তারা তার জীবনের নিরাপত্তা দিতে না পারে, তবে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না। তবে তাদের ইসলাম গ্রহণকারী নারীদের ফেরত দেওয়ার শর্ত করা বৈধ নয়; কারণ তারা নিষিদ্ধ লজ্জাস্থানের অধিকারী। যদি তাদের ফেরত দেওয়ার শর্ত করাও হয়, তবুও তাদের ফেরত দেওয়া বৈধ হবে না; তবে তারা তালাকপ্রাপ্তা হলে তাদের স্বামীদের মোহরানা ফিরিয়ে দিতে হবে।

যদি যুদ্ধবিরতির কোনো আবশ্যকতা না থাকে, তবে তাদের সাথে সন্ধি করা বৈধ নয়। তবে চার মাস বা তার কম সময়ের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধবিরতি করা বৈধ।

---

১ সহিহ: আবু দাউদ এটি কিতাবুল বুয়ু' (৩৫৩৫), তিরমিজি কিতাবুল বুয়ু' (১২৬৪), দারেমি কিতাবুল বুয়ু' (২৫৯৭) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং শেখ আলবানি একে সহিহ বলেছেন।

وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة: 2] .

وَأَمَّا الْأَمَانُ الْخَاصُّ فَيَصِحُّ أَنْ يَبْذُلَهُ كُلُّ مُسْلِمٍ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ" 1، يَعْنِي: عَبِيدَهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْقِتَالِ.

فَصْلٌ:

وَالْقِسْمُ السَّادِسُ مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ: السِّيرَةُ فِي نِزَالِ الْعَدُوِّ وَقِتَالِهِ، وَيَجُوزُ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ فِي حِصَارِ الْعَدُوِّ أَنْ يَنْصِبَ عَلَيْهِمُ الْعَرَّادَاتِ وَالْمَنْجَنِيقَاتِ، قَدْ نَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ مَنْجَنِيقًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَهْدِمَ عَلَيْهِمْ مَنَازِلَهُمْ، وَيَضَعَ عَلَيْهِمُ الْبَيَاتَ وَالتَّحْرِيقَ، وَإِذَا رَأَى فِي قَطْعِ نَخْلِهِمْ وَشَجَرِهِمْ صَلَاحًا يَسْتَضْعِفُهُمْ بِهِ؛ لِيَظْفَرَ بِهِمْ عَنْوَةً أَوْ يَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ صُلْحًا فَعَلَ، وَلَا يَفْعَلُ إِنْ لَمْ يَرَ فِيهِ صَلَاحًا. قَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُرُومَ أَهْلِ الطَّائِفِ، فَكَانَ سَبَبًا فِي إِسْلَامِهِمْ، وَأَمَرَ فِي حَرْبِ بَنِي النَّضِيرِ بِقَطْعِ نَوْعٍ مِنَ النَّخْلِ يُقَالُ لَهُ الْأَصْفَرُ، يُرَى نَوَاهُ مِنْ وَرَاءِ اللِّحَاءِ، وَكَانَتِ اللِّحَاءُ مِنْهَا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَضِيعِ، فَقَطَعَ بِهِمْ وَحَزِنُوا لَهُ وَقَالُوا: إِنَّمَا قَطَعْتُ نَخْلَةً وَأَحْرَقْتُ نَخْلَةً، وَلَمَّا قَطَعَ نَخْلَةً قَالَ سِمَاكٌ الْيَهُودِيُّ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُتَقَارِبِ:

أَلَسْنَا وَرِثْنَا الْكِتَابَ الْحَكِيـ ... ـمَ عَلَى عَهْدِ مُوسَى فَلَمْ نُصْرَفْ

وَأَنْتُمْ رِعَاءٌ لِشَاءٍ عِجَافٍ ... بِسَهْلِ تِهَامَةَ وَالْأَحْنَفِ

يَرَوْنَ الرِّعَايَةَ مَجْدًا لَكُمْ ... كَذَا كُلُّ دَهْرٍ بِكُمْ مُجْحِفِ

فَيَا أَيُّهَا الشَّاهِدُونَ انْتَهُوا ... عَنِ الظُّلْمِ وَالْمَنْطِقِ الْمُوكَفِ

لَعَلَّ اللَّيَالِيَ وَصَرْفَ الدُّهُورِ ... تُدِيلُ مِنَ الْعَادِلِ الْمُنْصِفِ

بِقَتْلِ النَّضِيرِ وَإِجْلَائِهَا ... وَعَقْرِ النَّخِيلِ وَلَمْ تُخْطَفْ

فَأَجَابَهُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ الْوَافِرِ:

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب الجزية "3180"، وأبو داود في كتاب المناسك "2034"، والترمذي "2127"، والنسائي في كتاب القسامة "4734"، وأحمد "784".

এবং তিনি এর অধিক বৃদ্ধি করবেন না; কেননা আল্লাহ তাআলার বাণী: {অতএব তোমরা পৃথিবীতে চার মাস বিচরণ করো} [আত-তাওবাহ: ২]।

আর ব্যক্তিগত অভয়দানের (আমান) বিষয়টি হলো, পুরুষ বা নারী, স্বাধীন বা দাস—প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষেই তা প্রদান করা বৈধ; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুসলিমদের রক্ত অন্যদের বিপরীতে সমতুল্য, এবং তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ব্যক্তিও তাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার করতে পারে।" অর্থাৎ: তাদের দাসগণ।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: দাসের দেওয়া নিরাপত্তা বৈধ হবে না, যদি না তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

পরিচ্ছেদ:

এই নেতৃত্বের বিধানাবলির ষষ্ঠ বিভাগ: শত্রুর মুখোমুখি হওয়া এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার কর্মপদ্ধতি। সেনাবাহিনীর আমিরের জন্য শত্রুকে অবরোধ করার সময় তাদের ওপর আরাদাহ (ছোট নিক্ষেপাস্ত্র) ও মানজানিক (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) স্থাপন করা বৈধ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফবাসীর বিরুদ্ধে মানজানিক স্থাপন করেছিলেন। আর তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা, তাদের ওপর অতর্কিত নৈশকালীন আক্রমণ চালানো এবং অগ্নিসংযোগ করাও বৈধ। আর যদি তিনি তাদের খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছপালা কাটার মধ্যে এমন কোনো কল্যাণ দেখেন যা তাদের দুর্বল করে দেবে, যাতে তিনি শক্তির জোরে তাদের ওপর বিজয় লাভ করতে পারেন অথবা তারা সন্ধি ও শান্তির পথে আসে, তবে তিনি তা করবেন; আর যদি কল্যাণ না দেখেন তবে করবেন না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফবাসীদের আঙুর বাগান কেটে দিয়েছিলেন, যা তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। তিনি বনু নাযিরের যুদ্ধে এক প্রকার খেজুর গাছ কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাকে 'আসফার' বলা হয়, যার আঁটি ছালের বাইরে থেকে দেখা যায়। এই ছালগুলো তাদের কাছে তুচ্ছ মালের চেয়েও প্রিয় ছিল। ফলে তিনি সেগুলো কেটে ফেললেন এবং তারা এতে ব্যথিত হলো। তারা বলেছিল: আপনি কিছু খেজুর গাছ কাটলেন এবং কিছু পুড়িয়ে দিলেন। যখন তিনি একটি

খেজুর গাছ কাটলেন, তখন সিমাক ইয়াহুদি 'মুতাক্বারিব' ছন্দে এ বিষয়ে এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিল:

আমরা কি মুসার আমলে হিকমতপূর্ণ কিতাবের উত্তরাধিকারী হইনি? ... অতঃপর আমরা বিচ্যুত হইনি

অথচ তোমরা ছিলে কৃশকায় মেষের রাখাল ... তিহামার সমতলে এবং উপত্যকায়

তারা রাখালিকেই তোমাদের জন্য গৌরব মনে করে ... এভাবেই প্রতিটি কাল তোমাদের প্রতি অবিচারকারী

হে প্রত্যক্ষদর্শীগণ! তোমরা বিরত হও ... জুলুম এবং বিভ্রান্তিকর কথা বলা থেকে

হয়তো রাত ও কালের আবর্তন ... ন্যায়নিষ্ঠ ইনসাফকারীর পক্ষ নিয়ে বিজয় দান করবে

বনু নাযিরকে হত্যা ও বহিষ্কারের বিনিময়ে ... এবং খেজুর গাছ কর্তনের কারণে যা ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি

অতঃপর হাসসান ইবনে সাবিত 'ওয়াফির' ছন্দে তাকে উত্তর দিলেন:

---

১ সহীহ: বুখারী 'কিতাবুল জিজিয়া' (৩১৮০), আবু দাউদ 'কিতাবুল মানাসিক' (২০৩৪), তিরমিযী (২১২৭), নাসাঈ 'কিতাবুল কাসামাহ' (৪৭৩৪) এবং আহমাদ (৭৮৪) বর্ণনা করেছেন।

هُمُ أُوتُوا الْكِتَابَ فَضَيَّعُوهُ ... فَهُمْ عُمْيٌ عَنِ التَّوْرَاةِ بُورُ

كَفَرْتُمْ بِالْقُرَانِ وَقَدْ أَتَاكُمْ ... بِتَصْدِيقِ الَّذِي قَالَ النَّذِيرُ

فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

فَلَمَّا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ بِهِمْ جَلَّ فِي صُدُورِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ لَنَا فِيمَا قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ؟ وَهَلْ عَلَيْنَا فِيمَا تَرَكْنَاهُ

مِنْ وِزْرٍ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5] ، وَفِي "لِينَةٍ" أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ1:

أَحَدُهَا: أَنَّهَا النَّخْلَةُ مِنْ أَيِّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ؟ وَهَذَا قَوْلُ مُقَاتِلٍ.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا كِرَامُ النَّخْلِ، وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ الْفَسِيلَةُ؛ لِأَنَّهَا أَلْيَنُ مِنَ النَّخْلَةِ.

وَالرَّابِعُ: أَنَّهَا جَمِيعُ الْأَشْجَارِ لِلِينِهَا بِالْحَيَاةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُغَوِّرَ عَلَيْهِمُ الْمِيَاهَ وَيَقْطَعَهَا عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ نِسَاءٌ وَأَطْفَالٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ ضَعْفِهِمْ وَالظَّفَرِ بِهِمْ عَنْوَةً وَصُلْحًا، وَإِذَا اسْتَسْقَى مِنْهُمْ عَطْشَانُ كَانَ الْأَمِيرُ مُخَيَّرًا بَيْنَ سَقْيِهِ أَوْ مَنْعِهِ كَمَا كَانَ مُخَيَّرًا فِيهِ بَيْنَ قَتْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ، وَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ وَارَاهُ عَنِ الْأَبْصَارِ وَلَمْ يُلْزَمْ تَكْفِينَهُ، قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَى بَدْرٍ فَأُلْقُوا فِي الْقَلِيبِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَرِّقَ بِالنَّارِ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا.

رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ بِعَذَابِ اللَّهِ" 2.

وَقَدْ أَحْرَقَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ وَالْخَبَرُ لَمْ يَبْلُغْهُ، وَمَنْ قُتِلَ مِنْ شُهَدَاءِ الْمُسْلِمِينَ زُمِّلَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا وَدُفِنَ بِهَا، وَلَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ: "زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

1 انظر: تفسير ابن جرير "28/ 32".

2 صحيح: رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير "3017"، والترمذي في كتاب الحدود "1458"، والنسائي في كتاب تحريم الدم "4060"، وأحمد "1904".

তারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু তারা তা নষ্ট করেছে ... ফলে তারা তাওরাতের ব্যাপারে অন্ধ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত।

তোমরা কুরআনের সাথে কুফরি করেছ অথচ তা তোমাদের নিকট এসেছে ... সতর্ককারীর বাণীর সত্যায়নকারী হিসেবে।

বনু লুয়াই-এর নেতৃবৃন্দের নিকট সহজ মনে হলো ... বুওয়াইরাহ্ প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ অগ্নিদাহ।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাদের সাথে এরূপ আচরণ করলেন, তখন মুসলিমদের মনে দ্বিধা তৈরি হলো এবং তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমরা যা কেটেছি তাতে কি আমাদের কোনো সওয়াব রয়েছে? আর আমরা যা ছেড়ে দিয়েছি তার জন্য কি আমাদের কোনো গুনাহ হবে? তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: {তোমরা যে সব লীনাহ (খেজুর গাছ) কেটে ফেলেছ অথবা যা সেগুলোর কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এবং যাতে তিনি পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করেন} [আল-হাশর: ৫]। আর 'লীনাহ' শব্দটির ব্যাখ্যায় চারটি অভিমত রয়েছে ১:

প্রথমত: এটি যেকোনো জাতের খেজুর গাছ। এটি মুকাতিল-এর অভিমত।

দ্বিতীয়ত: এটি উৎকৃষ্ট মানের খেজুর গাছ। এটি সুফিয়ান-এর অভিমত।

তৃতীয়ত: এটি ছোট খেজুরের চারা; কারণ এটি বড় খেজুর গাছের চেয়ে অধিক নরম ও কোমল।

চতুর্থত: এটি সজীবতার কারণে কোমল সকল বৃক্ষকেই বোঝায়। আর শত্রুপক্ষের পানির উৎসগুলো নষ্ট করে দেওয়া এবং তাদের পানি সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা জায়েজ, যদিও তাদের মধ্যে নারী ও শিশু থাকে; কারণ এটি তাদের দুর্বল করার এবং শক্তির মাধ্যমে বা সন্ধির মাধ্যমে তাদের ওপর বিজয় লাভ করার অন্যতম প্রধান উপায়। তাদের কোনো তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি পান করতে চাইলে সেনাপতি তাকে পানি পান করানো বা না করানোর ব্যাপারে পূর্ণ ইখতিয়ার রাখবেন, যেমনটি তাকে হত্যা করা বা ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার রয়েছে। আর তাদের মধ্যে যাকে হত্যা করা হবে তাকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে সমাহিত করা হবে, তবে তাকে কাফন দেওয়া আবশ্যক নয়। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদরের যুদ্ধে নিহতদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ফলে তাদের কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর কাউকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা জায়েজ নয়, সে জীবিত হোক বা মৃত।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "তোমরা আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর আজাব (আগুন) দিয়ে শাস্তি দিও না" ২।
আর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুরতাদদের এক দলকে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন; সম্ভবত এ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাটি তাঁর কাছে পৌঁছেনি বলেই তিনি এমনটি করেছিলেন। আর মুসলিম শহীদদের মধ্যে যারা নিহত হন, তাদের পরিহিত পোশাকেই জড়িয়ে দাফন করা হবে, তাদের গোসল দেওয়া হবে না এবং তাদের জানাজাও পড়া হবে না।
আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহুদের শহীদদের ব্যাপারে বলেছেন: "তোমরা তাদের জখমসহ পরিহিত পোশাকে জড়িয়ে দাও, কেননা কিয়ামতের দিন তারা উত্থিত হবে...

---

১ দেখুন: তাফসিরে ইবনে জারির "২৮/ ৩২"।
২ সহিহ: বুখারি, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার "৩০১৭"; তিরমিজি, কিতাবুল হুদুদ "১৪৫৮"; নাসায়ি, কিতাবুত তাহরিমুদ দাম "৪০৬০"; এবং আহমাদ "১৯০৪"।

وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ" 1.
وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ تَكْرِيمًا لَهُمْ إِجْرَاءً لِحُكْمِ الْحَيَاةِ فِي ذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169] .
وَفِيهِ تَأْوِيلَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ بَعْدَ الْبَعْثِ، وَلَيْسُوا فِي الدُّنْيَا بِأَحْيَاءٍ.
وَالثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ: إِنَّهُمْ بَعْدَ الْقَتْلِ أَحْيَاءٌ؛ لِاسْتِعْمَالِ ظَاهِرِ النَّصِّ فَرْقًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يُوصَفْ بِالْحَيَاةِ، وَلَا يُمْنَعُ الْجُيُوشُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ أَكْلِ

طَعَامِهِمْ وَعُلُوفَةِ دَوَابِّهِمْ غَيْرَ مُحْتَسِبٍ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَتَعَدَّوْا الْقُوتَ وَالْعَلُوفَةَ إِلَى مَا سِوَاهُمَا مِنْ مَلْبُوسٍ وَمَرْكُوبٍ، فَإِنْ دَعَتْهُمْ الضَّرُورَةُ إِلَى ذَلِكَ كَانَ مَا لَبِسُوهُ أَوْ رَكِبُوهُ أَوْ اسْتَعْمَلُوهُ مُسْتَرْجَعًا مِنْهُمْ فِي الْمَغْنَمِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَمُحْتَسَبًا عَلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِمْ إِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا؛ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُعْطَاهَا بِسَهْمِهِ، فَيَطَأَهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ، فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ عُزِّرَ وَلَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا سَهْمًا وَوَجَبَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا، وَيُضَافُ إِلَى الْغَنِيمَةِ، فَإِنْ أَحْبَلَهَا لَحِقَ بِهِ وَلَدُهَا وَصَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ إِنْ مَلَكَهَا، وَإِنْ وَطِئَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي السَّبْيِ حُدَّ؛ لِأَنَّ وَطْأَهَا زِنًا، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِ وَلَدُهَا إِنْ عَلِقَتْ.

فَإِذَا عُقِدَتْ هَذِهِ الْإِمَارَةُ عَلَى غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَكُنْ لِأَمِيرِهَا أَنْ يَغْزُوَ غَيْرَهَا سَوَاءٌ غَنِمَ فِيهَا أَوْ لَمْ يَغْنَمْ، وَإِذَا عُقِدَتْ عُمُومًا عَامًا بَعْدَ عَامٍ لَزِمَهُ مُعَاوَدَةُ الْغَزْوِ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَقْدِرُ عَلَى غَزْوٍ، فِيهِ وَلَا يَفْتُرُ عَنْهُ مَعَ ارْتِفَاعِ الْمَوَانِعِ إِلَّا قَدْرَ الِاسْتِرَاحَةِ وَأَقَلُّ مَا يَجْزِيهِ أَنْ لَا يُعَطِّلَ عَامًا مِنْ جِهَادٍ وَلِهَذَا الْأَمِيرِ إِذَا فُوِّضَتْ إِلَيْهِ الْإِمَارَةُ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ أَنْ يَنْظُرَ فِي أَحْكَامِهِمْ، وَيُقِيمَ الْحُدُودَ عَلَيْهِمْ، وَسَوَاءٌ مَنِ ارْتَزَقَ مِنْهُمْ أَوْ تَطَوَّعَ، وَلَا يَنْظُرُ فِي أَحْكَامِ غَيْرِهِمْ مَا كَانَ سَائِرًا إِلَى ثَغْرِهِ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ فِي الثَّغْرِ الَّذِي تَقَلَّدَهُ جَازَ أَنْ يَنْظُرَ فِي أَحْكَامِ جَمِيعِ أَهْلِهِ مِنْ مُقَاتِلَتِهِ وَرَعِيَّتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ إِمَارَةً خَاصَّةً أُجْرِيَ عَلَيْهَا حُكْمُ الْخُصُوصِ.

---

1 صحيح: رواه النسائي في كتاب الجنائز "2002"، وأحمد "23146"، وصححه الشيخ الألباني.

এবং তাদের ঘাড়ের রগ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে; যার রঙ হবে রক্তের মতো, কিন্তু সুগন্ধ হবে কস্তুরীর মতো। ১।

প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এবং তাদের ক্ষেত্রে জীবনের বিধান জারি রাখার জন্যই এমনটি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: {আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে

তাদের মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের রবের নিকট থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হয়।} [আল ইমরান: ১৬৯]।

এ বিষয়ে দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

প্রথমত: তারা পুনরুত্থানের পর জান্নাতে জীবিত থাকবেন, কিন্তু পৃথিবীতে তারা জীবিত নন।

দ্বিতীয়ত: এটিই অধিকাংশ আলিমের অভিমত যে, শাহাদাতের পরেই তারা জীবিত; কারণ দলিলের প্রকাশ্য অর্থ অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয় যাতে তাদের এবং যাদের সম্পর্কে জীবনের বর্ণনা দেওয়া হয়নি তাদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। শত্রু দেশে থাকা অবস্থায় সেনাবাহিনীর জন্য তাদের খাদ্য গ্রহণ এবং পশুখাদ্য ব্যবহার করা বৈধ, যার জন্য তাদের ওপর কোনো দায়ভার আসবে না। তবে তারা খাদ্য ও পশুখাদ্য ব্যতিরেকে অন্য কিছু যেমন পোশাক বা বাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে না। যদি প্রয়োজনবশত তারা এগুলো ব্যবহার করে, তবে সেই পোশাক, বাহন বা ব্যবহৃত সরঞ্জাম যদি অবশিষ্ট থাকে তবে তা গণিমত হিসেবে ফেরত দিতে হবে, আর যদি তা নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে তার মূল্য কেটে রাখা হবে। কোনো যোদ্ধার জন্য যুদ্ধবন্দী দাসীর সাথে সহবাস করা বৈধ নয় যতক্ষণ না তাকে তার প্রাপ্য অংশ হিসেবে প্রদান করা হয়; এরপর পবিত্রতা নিশ্চিত হওয়ার (ইস্তিবরা) পরেই কেবল সে তার সাথে সহবাস করতে পারবে। বণ্টনের আগে সহবাস করলে তাকে শাসনমূলক শাস্তি (তাজির) দেওয়া হবে কিন্তু নির্ধারিত দণ্ড (হদ) কার্যকর হবে না; কারণ সেখানে তার প্রাপ্য অধিকার বা মালিকানার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাকে সমপরিমাণ মোহরানা (মোহর-ই-মিসল) প্রদান করতে হবে যা গণিমতের মালের সাথে যুক্ত হবে। যদি সে তাকে গর্ভবতী করে তবে সন্তান তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে এবং যদি সে দাসীটির মালিক হয় তবে সে তার 'উম্মু ওয়ালাদ' হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি কেউ এমন নারীর সাথে সহবাস করে যে যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তার ওপর নির্ধারিত দণ্ড (হদ) কার্যকর হবে; কারণ সেই সহবাস যিনা হিসেবে গণ্য হবে এবং গর্ভধারণ করলে সন্তান তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে না। যদি এই নেতৃত্ব কেবল একটি অভিযানের জন্য নির্ধারিত হয়, তবে আমীরের জন্য অন্য কোনো অভিযানে যাওয়ার সুযোগ নেই, চাই তিনি তাতে গনিমত লাভ করুন বা না করুন। আর যদি এই নেতৃত্ব সাধারণ ও স্থায়ীভাবে বছর বছর পালনের জন্য দেওয়া হয়, তবে যখনই সম্ভব হবে তাকে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। কোনো বাস্তব বাধা না থাকলে কেবল বিশ্রামের সময়টুকু বাদে তিনি এ থেকে বিরত থাকবেন না। আর তার জন্য নূন্যতম দায়িত্ব হলো জিহাদ থেকে কোনো বছরকে খালি না রাখা। আমীরকে যখন মুজাহিদদের ওপর নেতৃত্ব অর্পণ করা হয় তখন

তার দায়িত্ব হলো তাদের বিচারিক বিষয়গুলো দেখা এবং তাদের ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর করা, চাই তারা বেতনভুক্ত হোক বা স্বেচ্ছাসেবী। গন্তব্যস্থলে যাওয়ার পথে তিনি অন্যদের বিচারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না। তবে যখন তিনি নির্ধারিত সীমান্তে স্থায়ী হবেন, তখন সেখানকার যোদ্ধা ও সাধারণ প্রজাসকলের বিচার কার্য পরিচালনা করতে পারবেন। আর যদি নেতৃত্ব বিশেষ কোনো কার্যের জন্য হয়, তবে বিশেষত্বের বিধানই সেখানে কার্যকর হবে।

---

১. সহীহ: এটি নাসাঈ 'জানাজা' অধ্যায়ে (২০০২) এবং আহমাদ (২৩১৪৬) বর্ণনা করেছেন। শেখ আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

(ص: 94)الأحكام السلطانية للماوردي

الباب الخامس: في الولاية على المصالح

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الولاية على الحروب

فِي قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَمَا عَدَا جِهَادَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قِتَالٍ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: قِتَالُ أَهْلِ الرِّدَّةِ، وَقِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَقِتَالُ الْمُحَارِبِينَ.

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فِي قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ: فَهُوَ أَنْ يَرْتَدَّ قَوْمٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِمْ، سَوَاءٌ وُلِدُوا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَسْلَمُوا عَنْ كُفْرٍ، فَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ فِي حُكْمِ الرِّدَّةِ سَوَاءٌ، فَإِذَا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى أَيِّ دِينٍ انْتَقَلُوا إِلَيْهِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُقَرَّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ؛ كَاليَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة، أَوْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَرَّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ؛ كَالزَّنْدَقَةِ وَالْوَثَنِيَّةِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَرَّ مَنِ ارْتَدَّ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْحَقِّ يُوجِبُ الْتِزَامَ أَحْكَامِهِ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" 1.

فَإِذَا كَانُوا مِمَّنْ وَجَبَ قَتْلُهُمْ بِمَا ارْتَدُّوا عَنْهُ مِنْ دِينِ الْحَقِّ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَدْيَانِ، لَمْ يَخْلُ حَالُهُمْ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ شُذَّاذًا وَأَفْرَادًا لَمْ

يَتَحَيَّزُوا بِدَارٍ يَتَمَيَّزُونَ بِهَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى قِتَالِهِمْ لِدُخُولِهِمْ تَحْتَ الْقُدْرَةِ، وَيُكْشَفُ عَنْ سَبَبِ رِدَّتِهِمْ، فَإِنْ ذَكَرُوا شُبْهَةً فِي الدِّينِ أُوضِحَتْ لَهُمْ بِالْحِجَجِ وَالْأَدِلَّةِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، وَأُخِذُوا بِالتَّوْبَةِ مِمَّا دَخَلُوا فِيهِ مِنَ الْبَاطِلِ، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُمْ مِنْ كُلِّ رِدَّةٍ، وَعَادُوا إِلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ كَمَا كَانُوا.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أَقْبَلُ تَوْبَةَ مَنِ ارْتَدَّ إِلَى مَا يُسْتَرُ بِهِ مِنَ الزَّنْدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَبْتَدِئَهَا مِنْ نَفْسِهِ، وَأَقْبَلُ تَوْبَةَ غَيْرِهِ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ، وَعَلَيْهِمْ بَعْدَ التَّوْبَةِ قَضَاءُ مَا تَرَكُوهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير "3017"، وأبو داود في كتاب الحدود "4351"، والترمذي في كتاب الحدود "1458"، والنسائي في كتاب تحريم الدم "4059"، وابن ماجه في كتاب الحدود "2535"، وأحمد "2960".

পঞ্চম অধ্যায়: জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির পরিচালনা প্রসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ: যুদ্ধ সংক্রান্ত পরিচালনা প্রসঙ্গে

মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদ ব্যতীত অন্য সকল লড়াই তিন ভাগে বিভক্ত: মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সশস্ত্র লুণ্ঠনকারী বা ডাকাতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

প্রথম বিভাগ: মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রসঙ্গে: এটি হলো এমন এক সম্প্রদায়ের ধর্মত্যাগ যাদের মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল; তারা জন্মগতভাবে মুসলিম হোক কিংবা কুফর ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে থাকুক, ধর্মত্যাগের বিধানের ক্ষেত্রে উভয় দলই সমান। সুতরাং তারা যখন ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোনো ধর্মে চলে যায়—চাই তা এমন ধর্ম হোক যার অনুসারীদের জিম্মি হিসেবে বহাল রাখা বৈধ, যেমন ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম; অথবা এমন ধর্ম হোক যার অনুসারীদের বহাল রাখা বৈধ নয়, যেমন জিন্দিকবাদ (ধর্মহীনতা) ও মূর্তিপূজা—তবে যে ব্যক্তি ধর্মত্যাগ করে সে পথে গেছে তাকে সেখানে বহাল রাখা বৈধ হবে না; কারণ সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া তার বিধানসমূহ মেনে চলাকে আবশ্যক করে দেয়।

আল্লাহর রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করো।" ১

সত্য ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে যাওয়ার কারণে যারা মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য হয়, তাদের অবস্থা দুই প্রকারের বাইরে নয়: হয় তারা দারুল ইসলামের ভেতরে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হিসেবে থাকবে যারা মুসলমানদের থেকে আলাদা কোনো স্বতন্ত্র ভূখণ্ড দখল করে নেয়নি। এমতাবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, কারণ তারা প্রশাসনের আয়ত্তাধীন রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের ধর্মত্যাগের কারণ অনুসন্ধান করা হবে। যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে কোনো সংশয়ের কথা উল্লেখ করে, তবে দলিল ও প্রমাণের মাধ্যমে তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট করে দেওয়া হবে এবং তারা যে ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছে তা থেকে তওবা করার আহ্বান জানানো হবে। যদি তারা তওবা করে, তবে যেকোনো প্রকার ধর্মত্যাগ থেকেই তাদের তওবা কবুল করা হবে এবং তারা পূর্বের ন্যায় ইসলামের বিধানের অধীনে ফিরে আসবে।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন: যে ব্যক্তি জিন্দিকবাদের (গোপন কুফরি) মতো বিষয়ে লিপ্ত হয়ে ধর্মত্যাগ করেছে, আমি তার তওবা কবুল করব না যদি না সে নিজ থেকে তা শুরু করে (অর্থাৎ ধরা পড়ার আগেই প্রকাশ করে)। তবে অন্যান্য মুরতাদদের তওবা আমি গ্রহণ করব। তওবা করার পর তাদের ওপর পূর্বের ত্যাগ করা সালাত ও সিয়ামের কাজা করা ওয়াজিব হবে...

---

১ সহিহ: বুখারি এটি 'জিহাদ ও সিয়ার' অধ্যায়ে (৩০১৭), আবু দাউদ 'হুদুদ' অধ্যায়ে (৪৩৫১), তিরমিজি 'হুদুদ' অধ্যায়ে (১৪৫৮), নাসায়ি 'রক্ত হারাম হওয়া' অধ্যায়ে (৪০৫৯), ইবনে মাজাহ 'হুদুদ' অধ্যায়ে (২৫৩৫) এবং আহমদ (২৯৬০) বর্ণনা করেছেন।

(ص: 95)الأحكام السلطانية للماوردي

زَمَانِ الرِّدَّةِ؛ لِاعْتِرَافِهِمْ بِوُجُوبِهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ كَمَنْ أَسْلَمَ عَنْ كُفْرٍ، وَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ قَدْ حَجَّ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الرِّدَّةِ لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ بِهَا وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَدْ بَطَلَ بِالرِّدَّةِ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ بَعْدَ التَّوْبَةِ، وَمَنْ أَقَامَ عَلَى رِدَّتِهِ وَلَمْ يَتُبْ وَجَبَ قَتْلُهُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا أَقْتُلُ الْمَرْأَةَ بِالرِّدَّةِ، وَقَدْ قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالرِّدَّةِ امْرَأَةً كَانَتْ تُكْنَّى أُمَّ رُومَانَ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمُرْتَدِّ عَلَى رِدَّتِهِ بِجِزْيَةٍ وَلَا عَهْدٍ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ، وَلَا تُنْكَحُ مِنْهُ امْرَأَةٌ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَتْلِهِمْ: هَلْ يُعَجَّلُ فِي الْحَالِ أَوْ يُؤَجَّلُونَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: تَعْجِيلُ قَتْلِهِمْ فِي الْحَالِ لِئَلَّا يُؤَخَّرَ لِلَّهِ عز وجل حَقٌّ.

وَالثَّانِي: يُنْظَرُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَعَلَّهُمْ يَسْتَدْرِكُونَهُ بِالتَّوْبَةِ، وَقَدْ أَنْذَرَ عَلِيٌّ عليه السلام الْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيّ بِالتَّوْبَةِ ثَلَاثَةً ثُمَّ قَتَلَهُ بَعْدَهَا، وَقُتِلَ صَبْرًا بِالسَّيْفِ.

وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ1 مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيّ: يُضْرَبُ بِالْخَشَبِ حَتَّى يَمُوتَ؛ لِأَنَّهُ أَبْطَأُ قَتْلًا مِنَ السَّيْفِ الْمُوحِي، وَرُبَّمَا اسْتَدْرَكَ بِهِ التَّوْبَةَ، وَإِذَا قُتِلَ لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَوُرِيَ مَقْبُورًا وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِخُرُوجِهِ بِالرِّدَّةِ عَنْهُمْ، وَلَا فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ لِمَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ حُرْمَةِ الْإِسْلَامِ الْمُبَايِنَةِ لَهُمْ، وَيَكُونُ مَالُهُ فَيْئًا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَصْرُوفًا فِي أَهْلِ الْفَيْءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهُ عَنْهُ وَارِثٌ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا كَافِرٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُورَثُ عَنْهُ مَا اكْتَسَبَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ، وَيَكُونُ مَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ فَيْئًا.

---

1 هو أحمد بن عمر بن سريج، القاضي أبو العباس البغدادي، إمام أصحاب الشافعي، شرح "المهذب" ولخَّصه، وصنَّف التصانيف، وردَّ على مخالفي النصوص، سمع الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وعلي بن أشكاب، وأبا داود السجستاني، وعباس بن محمد الدوري، وروى عنه أبو القاسم الطبراني وأبو أحمد

الغطريفي، وتفقَّه على عدة أئمة، ووقع حديثه بعلوٍّ في جزء الغطريفي لأصحاب ابن طبرزد.

قال أبو إسحاق: كان يقال له: الباز الأشهب، ولي القضاء بشيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي، حتى على المزني، وفهرست كتبه يشتمل على أربعمائه مصنَّف، وكان أبو حامد الإسفراييني يقول: نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون دقائقه.

ধর্মত্যাগের সময়কাল; কেননা ধর্মত্যাগের পূর্বে তারা এর আবশ্যকতা স্বীকার করেছিল।
এবং আবু হানিফা বলেছেন: তাদের ওপর কোনো কাজা নেই, যেমন কুফর থেকে ইসলাম গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে হয়। আর মুরতাদদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইসলাম অবস্থায় ধর্মত্যাগের পূর্বে হজ করেছিল, তার সেই হজ ধর্মত্যাগের কারণে বাতিল হবে না এবং তওবার পর তার ওপর পুনরায় তা আদায় করা আবশ্যক হবে না।
এবং আবু হানিফা বলেছেন: ধর্মত্যাগের কারণে তা বাতিল হয়ে গেছে এবং তওবার পর পুনরায় হজ করা তার ওপর আবশ্যক। আর যে ব্যক্তি তার ধর্মত্যাগের ওপর অটল থাকে এবং তওবা না করে, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব, সে পুরুষ হোক বা নারী।
এবং আবু হানিফা বলেছেন: আমি ধর্মত্যাগের কারণে নারীকে হত্যা করব না। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধর্মত্যাগের কারণে উম্মে রুমান উপনামের এক নারীকে হত্যা করেছিলেন। মুরতাদকে জিজিয়া বা চুক্তির বিনিময়ে তার ধর্মত্যাগের ওপর বহাল রাখা জায়েজ নয়। তার জবেহ করা পশুর গোশত খাওয়া যাবে না এবং তার সাথে কোনো নারীর বিবাহ বৈধ হবে না।
ফকিহগণ তাদের হত্যার বিষয়ে মতভেদ করেছেন: তাদের কি তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করা হবে নাকি তিন দিন সময় দেওয়া হবে? এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে:
প্রথমটি: তাদের তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করা, যাতে মহান আল্লাহর কোনো হক আদায়ে বিলম্ব না হয়।
দ্বিতীয়টি: তাদের তিন দিন সময় দেওয়া হবে, সম্ভবত তারা তওবার মাধ্যমে তা সংশোধন করে নেবে। আলী (আলাইহিস সালাম) মুস্তাওরিদ আল-ইজলিকে তিন দিন তওবার আহ্বান

জানিয়েছিলেন, অতঃপর তাকে হত্যা করেছিলেন; তাকে তলোয়ারের মাধ্যমে আবদ্ধ অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল।

শাফেয়ী মাজহাবের পণ্ডিতদের মধ্যে ইবনে সুরাইজ (১) বলেছেন: তাকে কাঠ দিয়ে প্রহার করা হবে যতক্ষণ না সে মারা যায়; কারণ এটি দ্রুত ঘাতক তলোয়ারের চেয়ে ধীরগতির মৃত্যু, ফলে হয়তো সে এর মাধ্যমে তওবা করার সুযোগ পাবে। তাকে হত্যা করা হলে গোসল দেওয়া হবে না এবং তার জানাজা পড়া হবে না। তাকে গর্ত খুঁড়ে মাটিচাপা দেওয়া হবে কিন্তু মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না; কারণ ধর্মত্যাগের মাধ্যমে সে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আবার মুশরিকদের কবরস্থানেও দাফন করা হবে না; কারণ তার মধ্যে ইসলামের যে মর্যাদা ছিল তা মুশরিকদের থেকে ভিন্ন। আর তার সম্পদ মুসলমানদের বায়তুল মালে 'ফে' (ফাই) হিসেবে জমা হবে এবং তা 'ফে'-এর হকদারদের মাঝে ব্যয় করা হবে; কারণ কোনো মুসলিম বা কাফের উত্তরাধিকারীই তার ওয়ারিশ হবে না।

এবং আবু হানিফা বলেছেন: ধর্মত্যাগের পূর্বে সে যা অর্জন করেছে তা উত্তরাধিকারসূত্রে বণ্টিত হবে, আর ধর্মত্যাগের পরে যা অর্জন করেছে তা 'ফে' হবে।

---

১ তিনি হলেন আহমদ ইবনে উমর ইবনে সুরাইজ, কাজী আবুল আব্বাস আল-বাগদাদি, শাফেয়ী পণ্ডিতদের ইমাম। তিনি ‘আল-মুহাজ্জাব’ কিতাবের ব্যাখ্যা ও সংক্ষেপণ করেছেন, এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি নস (শরয়ি দলিল) বিরোধীদের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাবাহ আল-জাফরানি, আলী ইবনে আশকাব, আবু দাউদ আস-সিজিস্তানি, আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ আদ-দাওরি প্রমুখের নিকট হাদিস শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আবু কাসিম আত-তাবারানি এবং আবু আহমদ আল-গাতরিফি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি অনেক ইমামের নিকট ফিকহ শিক্ষা করেছেন এবং ইবনে তাবারজাদের সূত্রে আল-গাতরিফির জুজ-এ তাঁর বর্ণিত হাদিস উচ্চ সনদে বিদ্যমান।

আবু ইসহাক বলেন: তাঁকে ‘আল-বাজ আল-আশহাব’ (শিকারি বাজপাখি) বলা হতো। তিনি শিরাজে কাজীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁকে ইমাম শাফেয়ীর সকল অনুসারীর ওপর প্রাধান্য দেওয়া হতো, এমনকি মুজানি-র ওপরও। তাঁর রচিত গ্রন্থের তালিকা চারশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। আবু হামিদ আল-ইসফরাইনি বলতেন: আমরা আবুল আব্বাসের সাথে ফিকহের প্রকাশ্য মাসআলাগুলোতে একমত পোষণ করি, কিন্তু এর সূক্ষ্ম বিষয়গুলোতে নয়।

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ1: يُورَثُ عَنْهُ مَا اكْتَسَبَ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَبَعْدَهَا، فَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ كَانَ مَالُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ أُعِيدَ عَلَيْهِ، وَإِنْ هَلَكَ عَلَى الرِّدَّةِ صَارَ فَيْئًا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَحْكُمُ بِمَوْتِهِ إِذَا صَارَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَأُقَسِّمُ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، فَإِنْ عَادَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ اسْتَرْجَعْتُ مَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ أُغَرِّمْهُمْ مَا اسْتَهْلَكُوهُ، فَهَذَا حُكْمُ الْمُرْتَدِّينَ إِذَا لَمْ يَنْحَازُوا إِلَى دَارٍ وَكَانُوا شُذَّاذًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَنْحَازُوا إِلَى دَارٍ يَنْفَرِدُونَ بِهَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَصِيرُوا فِيهَا مُمْتَنِعِينَ، فَيَجِبُ قِتَالُهُمْ عَلَى الرِّدَّةِ بَعْدَ مُنَاظَرَتِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَإِيضَاحِ دَلَائِلِهِ، وَيَجْرِي عَلَى قِتَالِهِمْ بَعْدَ الْإِنْذَارِ وَالْإِعْذَارِ حُكْمُ قِتَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي قِتَالِهِمْ غُرَّةً وَبَيَاتًا، وَمُصَافَّتِهِمْ فِي الْحَرْبِ جِهَارًا، وَقِتَالِهِمْ مُقْبِلِينَ وَمُدْبِرِينَ.

وَمَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ جَازَ قَتْلُهُ صَبْرًا إِنْ لَمْ يَتُبْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله، وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ لَمْ تُسْبَ ذَرَارِيُّهُمْ، وَسَوَاءٌ مِنْ وُلِدَ مِنْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَ الرِّدَّةِ، وَقِيلَ: إِنَّ مَنْ وُلِدَ مِنْهُمْ بَعْدَ الرِّدَّةِ جَازَ سَبْيُهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ سَبْيُ مَنِ ارْتَدَّ مِنْ نِسَائِهِمْ إِذَا لَحِقْنَ بِدَارِ الْحَرْبِ؛ وَإِذَا غُنِمَتْ أَمْوَالُهُمْ لَمْ تُقَسَّمْ فِي الْغَانِمِينَ، وَكَانَ مَالُ مَنْ قُتِلَ مِنْهَا فَيْئًا وَمَالُ الْأَحْيَاءِ مَوْقُوفًا، إِنْ أَسْلَمُوا رُدَّ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ هَلَكُوا عَلَى رِدَّتِهِمْ صَارَ فَيْئًا، وَمَا أَشْكَلَ أَرْبَابُهُ مِنَ الْأَمْوَالِ الْمَغْنُومَةِ صَارَ فَيْئًا إِذَا وَقَعَ الْإِيَاسُ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ، وَمَا اسْتَهْلَكَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فِي نَائِرَةِ الْحَرْبِ لَمْ يُضْمَنْ

---

1 هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري، وسعد ابن حبتة أحد الصحابة رضي الله عنهم، وهو مشهور في

الأنصار بأُمِّه، وهي حبتة بنت مالك، كان القاضي أبو يوسف من أهل الكوفة، وهو صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه، كان فقيهًا عالمًا حافظًا، سمع أبا إسحاق الشيباني، وسليمان التيمي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والأعمش، وهشام بن عروة، وعطاء بن السائب، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وتلك الطبقة، وجالس محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثم جالس أبا حنيفة النعمان بن ثابت، وكان الغالب عليه مذهب أبي حنيفة، وخالفه في مواضع كثيرة، روى عنه محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، وبشر بن الوليد الكندي، وعلي بن الجعد وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين في آخرين، وكان قد سكن بغداد وتولَّى القضاء بها لثلاثة من الخلفاء: المهدي وابنه الهادي ثم هارون الرشيد، وكان الرشيد يكرمه ويجلُّه، وكان عنده حظيًا، وهو أوّل من دعي بقاضي القضاة.

আবু ইউসুফ ১ বলেন: ধর্মত্যাগের আগে এবং পরে সে যা কিছু উপার্জন করেছে, তা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হবে। যখন ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) ব্যক্তি দারুল হারবে (শত্রু ভূমিতে) চলে যায়, তখন দারুল ইসলামে (ইসলামী রাষ্ট্রে) থাকা তার সম্পদ তার জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে; যদি সে ইসলামে ফিরে আসে তবে তা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, আর যদি সে ধর্মত্যাগী অবস্থায় মারা যায় তবে তা ফায় (রাষ্ট্রীয় সম্পদ) হিসেবে গণ্য হবে।
আবু হানিফা বলেন: সে যখন দারুল হারবে চলে যায়, তখনই আমি তার মৃত্যুর ফয়সালা প্রদান করি এবং তার সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেই। অতঃপর সে যদি পুনরায় দারুল ইসলামে ফিরে আসে, তবে তাদের নিকট তার যে সম্পদ অবশিষ্ট রয়েছে তা আমি তাকে ফিরিয়ে দেবো, কিন্তু যা তারা ভোগ বা ব্যয় করে ফেলেছে তার জন্য আমি তাদের দায়ী করব না। এটি হলো সেইসব ধর্মত্যাগীদের বিধান যারা কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সমবেত হয়ে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করেনি, বরং মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে।
দ্বিতীয় অবস্থা: তারা এমন কোনো ভূখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করে যেখানে তারা মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং সেখানে তারা অজেয় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় তাদের সাথে ইসলামের বিষয়ে বিতর্ক ও এর প্রমাণাদি স্পষ্ট করার পর ধর্মত্যাগের কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। তাদের সতর্ক করার এবং সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধের ক্ষেত্রে দারুল হারবের অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধের বিধান প্রযোজ্য হবে; যেমন— অতর্কিত আক্রমণ করা কিংবা স্পষ্টভাবে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া, যুদ্ধের ময়দানে প্রকাশ্যে সারিবদ্ধ হওয়া এবং সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক থেকে আক্রমণ করা।

তাদের মধ্য থেকে যাকে বন্দি করা হবে, সে যদি তওবা না করে তবে তাকে আটক অবস্থায় হত্যা করা বৈধ। ইমাম শাফেঈ (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-এর মতে তাদের দাসে পরিণত করা জায়েজ নয়। যখন তাদের ওপর বিজয় অর্জিত হবে, তখন তাদের সন্তানদের দাস হিসেবে গ্রহণ করা হবে না; চাই তারা ইসলামে থাকাকালীন জন্মগ্রহণ করুক বা ধর্মত্যাগের পরে। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, ধর্মত্যাগের পরে যাদের জন্ম হয়েছে তাদের দাস হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ।

আবু হানিফা বলেন: তাদের মধ্য থেকে যে মহিলারা ধর্মত্যাগী হয়ে দারুল হারবে চলে গেছে, তাদের বন্দি করা জায়েজ। যখন তাদের সম্পদ গনীমত হিসেবে হস্তগত হবে, তখন তা যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে না। তাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে তাদের সম্পদ হবে ফায় (রাষ্ট্রীয় সম্পদ), আর যারা জীবিত আছে তাদের সম্পদ সংরক্ষিত থাকবে; যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে, অন্যথায় তারা ধর্মত্যাগী অবস্থায় মারা গেলে তা ফায় হয়ে যাবে। গনীমতের মালের মধ্যে যে সম্পদের মালিকানা অস্পষ্ট হয়ে যায়, তা ফায় হিসেবে গণ্য হবে যখন তাদের প্রকৃত মালিককে চেনার বিষয়ে নিরাশ হওয়া যাবে। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মুসলমানরা তাদের যে সম্পদ ধ্বংস করেছে, তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

---

১. তিনি হলেন প্রধান বিচারপতি আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম ইবনে হাবিব ইবনে খুনায়েস ইবনে সাদ ইবনে হাবতাহ আল-আনসারী। সাদ ইবনে হাবতাহ ছিলেন একজন সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। আনসারদের মধ্যে তিনি তার মা হাবতাহ বিনতে মালেকের পরিচয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিচারপতি আবু ইউসুফ কুফাবাসী ছিলেন এবং তিনি ইমাম আবু হানিফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ ফকিহ, বিজ্ঞ আলেম এবং হাফেজ। তিনি আবু ইসহাক আল-শাইবানী, সুলাইমান আত-তাইমী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী, আল-আ'মাশ, হিশাম ইবনে উরওয়াহ, আতা ইবনে সায়েব, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার এবং সেই স্তরের মনীষীদের নিকট থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলার মজলিসে বসতেন,

অতঃপর আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবিতের সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। তাঁর ওপর ইমাম আবু হানিফার মাযহাবের প্রভাব প্রবল ছিল, তবে তিনি অনেক মাসআলায় তাঁর বিরোধিতা করেছেন। তাঁর থেকে মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল-শাইবানী আল-হানাফী, বিশর ইবনে ওয়ালিদ আল-কিন্দি, আলী ইবনে জা'দ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনসহ আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বাগদাদে বসবাস করতেন এবং তিনজন খলিফা—মাহদী, তাঁর পুত্র হাদী এবং অতঃপর হারুনুর রশিদের আমলে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। হারুনুর রশিদ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম 'কাযিল কুযাত' (প্রধান বিচারপতি) উপাধিতে ভূষিত হন।

(ص: 97)الأحكام السلطانية للماوردي

إِذَا أَسْلَمُوا، وَمَا اسْتَهْلَكُوا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ نَائِرَةِ الْحَرْبِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمْ.
وَاخْتُلِفَ فِي ضَمَانِ مَا اسْتَهْلَكُوهُ فِي نَائِرَةِ الْحَرْبِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُونَهُ؛ لِأَنَّ مَعْصِيَتَهُمْ بِالرِّدَّةِ لَا تُسْقِطُ عَنْهُمْ غُرْمَ الْأَمْوَالِ الْمَضْمُونَةِ.
وَالثَّانِي: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فِيمَا اسْتَهْلَكُوهُ مِنْ دَمٍ وَمَالٍ.
قَدْ أَصَابَ أَهْلُ الرِّدَّةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه نُفُوسًا وَأَمْوَالًا عُرِفَ مُسْتَهْلِكُوهَا، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: يَدُونَ قَتْلَانَا وَلَا نَدِي قَتْلَاهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَدُونَ قَتْلَانَا وَلَا نَدِي قَتْلَاهُمْ، فَجَرَتْ بِذَلِكَ سِيرَتُهُ وَسِيرَةُ مَنْ بَعْدَهُ.
وَقَدْ أَسْلَمَ طُلَيْحَةُ1 بَعْدَ أَنْ سُبِيَ وَكَانَ قَدْ قَتَلَ وَسَبَى، فَأَقَرَّهُ عُمَرُ رضي الله عنه بَعْدَ إِسْلَامِهِ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ؛ وَوَفَدَ أَبُو شَجَرَةَ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَاتِ، فَقَالَ: أَعْطِنِي فَإِنِّي ذُو حَاجَةٍ، فَقَالَ مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَبُو شَجَرَةَ، فَقَالَ: أَيْ عَدُوَّ اللَّهِ، أَلَسْتَ تَقُولُ "مِنَ الطَّوِيلِ":

وَرَوَّيْتُ رُمْحِي مِنْ كَتِيبَةِ خَالِدٍ ... وَإِنِّي لَأَرْجُو بَعْدَهَا أَنْ أُعَمَّرَا

ثُمَّ جَعَلَ يَعْلُوهُ بِالدِّرَّةِ فِي رَأْسِهِ حَتَّى وَلَّى رَاجِعًا إِلَى قَوْمِهِ وَهُوَ يَقُولُ "مِنَ الْبَسِيطِ":

ضَنَّ عَلَيْنَا أَبُو حَفْصٍ بِنَائِلِهِ ... وَكُلُّ مُخْتَبِطٍ يَوْمًا لَهُ وَرَقُ

مَا زَالَ يَضْرِبُنِي حَتَّى حَدَثْتُ لَهُ ... وَحَالَ مِنْ دُونِ بَعْضِ الْبُغْيَةِ الشَّفَقُ

لَمَّا رَهِبْتُ أَبَا حَفْصٍ وَشُرْطَتَهُ ... وَالشَّيْخُ يُقْرَعُ أَحْيَانًا فَيَنْمَحِقُ

فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه بِسِوَى التَّعْزِيرِ لِاسْتِطَالَتِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ؛ وَلِدَارِ الرِّدَّةِ حُكْمٌ تُفَارِقُ بِهِ دَارَ الْإِسْلَامِ وَدَارَ الْحَرْبِ.

فَأَمَّا مَا تُفَارِقُ بِهِ دَارَ الْإِسْلَامِ فَمِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

---

1 هو طليحة بن خويلد الأسدي الفقعسي، كان مِمَّن شهد مع الأحزاب الخندق، ثم قَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع، ثم ارتدَّ وادَّعى النبوة في عهد أبي بكر في أرض نجد، وكانت له وقائع مع المسلمين، ثم خذله الله فهرب حتى لحق بدمشق ونزل على آل جفنة، ثم أسلم وحسن إسلامه، وقدم مكة حاجًّا معتمرًا، وخرج إلى الشام مجاهدًا، وشهد اليرموك وبعض حروب الفرس، قال ابن سعد: في الطبقة الرابعة، كان يعد بألف فارس لشدَّته وشجاعته وبصره في الحرب، انتهى. ولم يغمس عليه في دينه شيء، واستشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين مع النعمان بن مقرن وعمرو بن معدي كرب.

যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে, যুদ্ধের উন্মত্ততা ব্যতীত তারা মুসলমানদের যে সম্পদ বিনষ্ট করেছে, তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া তাদের ওপর আবশ্যক।

যুদ্ধের উন্মত্ততার মধ্যে তারা যা বিনষ্ট করেছে, তার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে দুটি মতভেদ রয়েছে:

প্রথমটি: তারা এর ক্ষতিপূরণ দেবে; কারণ ধর্মত্যাগের মাধ্যমে তাদের কৃত পাপাচার সম্পদের ক্ষতিপূরণের দায়কে তাদের থেকে রহিত করে না।

দ্বিতীয়টি: তারা যে রক্তপাত ঘটিয়েছে বা সম্পদ বিনষ্ট করেছে, তার জন্য তাদের ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে ধর্মত্যাগীরা এমন অনেক জান ও মালের ক্ষতি সাধন করেছিল যাদের বিনষ্টকারী ব্যক্তিরা সুপরিচিত ছিল। তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন: তারা আমাদের নিহতদের রক্তপণ প্রদান করবে কিন্তু আমরা তাদের নিহতদের রক্তপণ দেব না। তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আমাদের নিহতদের রক্তপণ দেওয়া হবে না এবং তাদের নিহতদেরও রক্তপণ দেব না। অতঃপর তাঁর এবং পরবর্তী খলিফাদের নীতি এভাবেই পরিচালিত হয়েছে।

আর তোলায়হা১ বন্দী হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; তিনি ইতিপূর্বে হত্যা ও বন্দী করার মতো কাজ করেছিলেন। উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁকে পূর্বাবস্থায় বহাল রাখেন এবং কোনো রক্ত বা সম্পদের জন্য তাঁকে পাকড়াও করেননি। আর আবু শাজারা বিন আবদিল উজ্জা, যিনি মুরতাদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট এমন সময় প্রতিনিধি হয়ে এলেন যখন তিনি সদকা বণ্টন করছিলেন। তিনি বললেন: আমাকে কিছু প্রদান করুন, কারণ আমি অভাবী। উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: তুমি কে? তিনি বললেন: আবু শাজারা। তিনি বললেন: ওহে আল্লাহর শত্রু! তুমি কি ‘তাওয়িল’ ছন্দে একথা বলোনি:

আমি খালিদের বাহিনীতে আমার বর্শাকে রক্তে সিক্ত করেছি... আর এরপরে আমি দীর্ঘায়ু লাভের আশা রাখি।

অতঃপর উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর চাবুক দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করতে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন এবং ‘বাসিত’ ছন্দে বলছিলেন:

আবু হাফস তাঁর দানে আমাদের প্রতি কার্পণ্য করেছেন... অথচ প্রতিটি যাঞ্চাকারী একদিন না একদিন তার কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে।

তিনি আমাকে মারতে থাকলেন যতক্ষণ না আমি তাঁর থেকে সরে গেলাম... এবং ভীতি আমাকে আমার অভীষ্ট অর্জনে বাধা প্রদান করল।

যখন আমি আবু হাফস ও তাঁর প্রহরীদের ভয় পেলাম... আর কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কখনো প্রহার করলে সে তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর উদ্ধত আচরণের জন্য কেবল ‘তা’জির’ (শাস্তি) প্রদান ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবস্থা নেননি। দারুর রিদ্দার (ধর্মত্যাগী অঞ্চল) এমন কিছু বিধান রয়েছে যার কারণে তা দারুল ইসলাম ও দারুল হারব থেকে ভিন্নতর।

দারুল ইসলামের সাথে এর পার্থক্যের ক্ষেত্রগুলো চারটি দিক থেকে রয়েছে:

---

১ তিনি হলেন তোলায়হা বিন খুয়াইলিদ আল-আসাদি আল-ফাকা'সি। তিনি আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধে কাফিরদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর নবম হিজরিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করেন। এরপর তিনি মুরতাদ হয়ে যান এবং আবু বকরের যুগে নজদ অঞ্চলে নবুওয়াতের দাবি করেন। মুসলমানদের সাথে তাঁর অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে লাঞ্ছিত করেন এবং তিনি পালিয়ে দামেস্কে চলে যান এবং আলে জাফনার কাছে আশ্রয় নেন। এরপর তিনি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণ একনিষ্ঠ ছিল। তিনি হজ ও ওমরাহ করার জন্য মক্কায় আসেন এবং মুজাহিদ হিসেবে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধ এবং পারস্যের কিছু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইবনে সাদ বলেন: তিনি সাহাবীগণের চতুর্থ স্তরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর কঠোরতা, বীরত্ব ও রণকৌশলের কারণে তাঁকে এক হাজার অশ্বারোহীর সমতুল্য বিবেচনা করা হতো (সমাপ্ত)। তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে পরবর্তীতে কোনো সংশয় পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি ২১ হিজরিতে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে নুমান বিন মুকাররিন ও আমর বিন মাদিকারিবের সাথে শাহাদাত বরণ করেন।

(ص: 98)الأحكام السلطانية للماوردي

أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُهَادَنُوا عَلَى الْمُوَادَعَةِ فِي دِيَارِهِمْ، وَيَجُوزُ أَنْ يُهَادَنَ أَهْلُ الْحَرْبِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالَحُوا عَلَى مَالٍ يُقَرُّونَ بِهِ عَلَى رِدَّتِهِمْ، وَيَجُوزُ أَنْ يُصَالَحَ أَهْلُ الْحَرْبِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ وَلَا سَبْيُ نِسَائِهِمْ، وَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ أَهْلُ الْحَرْبِ وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ.

وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْغَانِمُونَ أَمْوَالَهُمْ، وَيَمْلِكُونَ مَا غَنِمُوهُ مِنْ مَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه: قَدْ صَارَتْ دِيَارُهُمْ بِالرِّدَّةِ دَارَ حَرْبٍ، وَيُسْبَوْنَ وَيُغْنَمُونَ، وَتَكُونُ أَرْضُهُمْ فَيْئًا وَهُمْ عِنْدَهُ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ.

وَأَمَّا مَا تُفَارِقُ بِهِ دَارَ الْإِسْلَامِ فَمِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: وُجُوبُ قِتَالِهِمْ مُقْبِلِينَ وَمُدْبِرِينَ كَالْمُشْرِكِينَ.

وَالثَّانِي: إِبَاحَةُ إِمَائِهِمْ أَسْرَى وَمُمْتَنِعِينَ.

وَالثَّالِثُ: تَصِيرُ أَمْوَالُهُمْ فَيْئًا لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ.

وَالرَّابِعُ: بُطْلَانُ مُنَاكَحَتِهِمْ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ وَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى الرِّدَّةِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَبْطُلُ مُنَاكَحَتُهُمْ بِارْتِدَادِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَلَا تَبْطُلُ بِارْتِدَادِهِمَا مَعًا، وَمَنِ ادُّعِيَتْ عَلَيْهِ الرِّدَّةُ فَأَنْكَرَهَا كَانَ قَوْلُهُ مَقْبُولًا بِغَيْرِ يَمِينِهِ، وَلَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِالرِّدَّةِ لَمْ يَصِرْ مُسْلِمًا بِالْإِنْكَارِ حَتَّى يَتَلَفَّظَ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَإِذَا امْتَنَعَ قَوْمٌ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَامِ الْعَادِلِ جُحُودًا لَهَا كَانُوا بِالْجُحُودِ مُرْتَدِّينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ أَهْلِ الرِّدَّةِ، وَلَوْ امْتَنَعُوا مِنْ أَدَائِهَا مَعَ الِاعْتِرَافِ بِوُجُوبِهَا كَانُوا مِنْ بُغَاةِ الْمُسْلِمِينَ، يُقَاتَلُونَ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: لَا يُقَاتَلُونَ. وَقَدْ قَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه مَانِعِي الزَّكَاةِ، مَعَ تَمَسُّكِهِمْ بِالْإِسْلَامِ حَتَّى قَالُوا: وَاللَّهِ مَا كَفَرْنَا بَعْدَ إِيمَانِنَا وَلَكِنْ شَحِحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: عَلَامَ تُقَاتِلُهُمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا". قَالَ أَبُو

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير "2946"، ومسلم في كتاب الإيمان "21".

প্রথমটি: তাদের সাথে তাদের নিজ ভূখণ্ডে সন্ধি বা আপস করা বৈধ নয়, অথচ হারবি কাফিরদের সাথে সন্ধি করা বৈধ।
দ্বিতীয়টি: কোনো সম্পদের বিনিময়ে তাদের ধর্মত্যাগের ওপর বহাল রাখার শর্তে তাদের সাথে সন্ধি করা বৈধ নয়, অথচ হারবিদের সাথে তা করা বৈধ।
তৃতীয়টি: তাদের দাস বানানো বা তাদের নারীদের যুদ্ধবন্দিনী করা বৈধ নয়, কিন্তু হারবি কাফিরদের দাস বানানো এবং তাদের নারীদের বন্দিনী করা বৈধ।
চতুর্থটি: বিজয়ীরা তাদের সম্পদের মালিক হতে পারে না, অথচ তারা হারবিদের থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মালের মালিক হয়। আবু হানিফা (রা.) বলেন: ধর্মত্যাগের কারণে তাদের ভূখণ্ড 'দারুল হারব' (যুদ্ধক্ষেত্র) এ পরিণত হয়েছে, তাই তাদের যুদ্ধবন্দি করা যাবে এবং তাদের সম্পদ গনিমতের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর তাদের ভূমি 'ফায়' (রাষ্ট্রীয় সম্পদ) হিসেবে গণ্য হবে; তারা তাঁর নিকট আরবের মূর্তিপূজকদের সমতুল্য।
আর যেসব দিক থেকে এটি দারুল ইসলাম থেকে পৃথক হয় তা চারটি বিষয়ের কারণে:
প্রথমত: মুশরিকদের ন্যায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব, চাই তারা সম্মুখপানে অগ্রসর হোক কিংবা পলায়নপর হোক।
দ্বিতীয়ত: তারা বন্দী অবস্থায় থাকুক বা প্রতিরোধরত, তাদের দাসীদের গ্রহণ করা বৈধ হওয়া।
তৃতীয়ত: তাদের ধন-সম্পদ সকল মুসলমানের জন্য 'ফায়' (সাধারণ মুসলিমদের সম্পদ) হিসেবে গণ্য হওয়া।
第四ত: ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল হয়ে যাওয়া, যদিও তারা উভয়েই ধর্মত্যাগের বিষয়ে একমত হয়।
আবু হানিফা বলেন: স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজনের ধর্মত্যাগের কারণে তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে, তবে উভয়ে একসাথে ধর্মত্যাগ করলে তা বাতিল হবে না। যার বিরুদ্ধে ধর্মত্যাগের অভিযোগ আনা হয়েছে সে যদি তা অস্বীকার করে, তবে শপথ ছাড়াই তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি তার বিরুদ্ধে ধর্মত্যাগের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে শাহাদাতাইন (কালেমা) পাঠ করা ব্যতীত কেবল অস্বীকার করার মাধ্যমে সে মুসলিম বলে গণ্য হবে না। আর যদি কোনো সম্প্রদায় ন্যায়পরায়ণ ইমামের কাছে জাকাত প্রদানে অস্বীকার করে এবং এর আবশ্যকতাকে অস্বীকার করে, তবে এই অস্বীকারের কারণে তারা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হিসেবে গণ্য হবে এবং তাদের ওপর ধর্মত্যাগীদের বিধান জারি হবে। কিন্তু যদি তারা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করা সত্ত্বেও তা প্রদানে বিরত থাকে, তবে তারা মুসলিম

বিদ্রোহীদের (বুগাত) অন্তর্ভুক্ত হবে এবং জাকাত আদায়ে বাধা দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।
আবু হানিফা (রহ.) বলেন: তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না। অথচ আবু বকর (রা.) জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, যদিও তারা ইসলামের ওপর অটল থাকার দাবি করছিল; এমনকি তারা বলেছিল: "আল্লাহর কসম, আমরা ঈমান আনার পর কুফরি করিনি, কিন্তু আমরা আমাদের সম্পদের ব্যাপারে কৃপণতা করেছি।" তখন ওমর (রা.) বলেছিলেন: "আপনি কিসের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, যেখানে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: 'আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; যখন তারা তা বলবে, তখন তারা আমার থেকে তাদের রক্ত ও জানমাল নিরাপদ করে নেবে, তবে হকের পাওনা ব্যতীত'।" আবু...

---

১ সহিহ: বুখারি এটি জিহাদ ও সিয়ার অধ্যায় '২৯৪৬' এবং মুসলিম ঈমান অধ্যায় '২১'-এ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 99)الأحكام السلطانية للماوردي

بَكْرٍ: هَذَا مِنْ حَقِّهَا، أَرَأَيْتَ لَوْ سَأَلُوا تَرْكَ الصَّلَاةِ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ سَأَلُوا تَرْكَ الصِّيَامِ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ سَأَلُوا تَرْكَ الْحَجِّ؟ فَإِذَا لَا تَبْقَى عُرْوَةٌ مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ إِلَّا انْحَلَّتْ؛ وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا وَعِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَشَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، وَقَدْ أَبَانَ عَنْ إِسْلَامِهِمْ قَوْلُ زَعِيمِهِمْ حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ فِي شِعْرِهِ "مِنَ الطَّوِيلِ":

أَلَا فَاصْحَبِينَا قَبْلَ نَائِرَةِ الْفَجْرِ ... لَعَلَّ الْمَنَايَا قَرِيبٌ وَلَا نَدْرِي
أَطَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ بَيْنَنَا ... فَيَا عَجَبًا مَا بَالُ مُلْكِ أَبِي بَكْرِ
فَإِنَّ الَّذِي سَأَلُوكُمُ فَمَنَعْتُمُو ... لَكَالتَّمْرِ أَوْ أَحْلَى إِلَيْهِمْ مِنَ التَّمْرِ

سَنَمْنَعُكُمْ مَا كَانَ فِينَا بَقِيَّةٌ ... كِرَامٌ عَلَى الْعَزَّاءِ فِي سَاعَةِ الْعُسْرِ

আবু বকর বললেন: "এটি তার (জাকাতের) প্রাপ্য হক। আপনি কি ভেবে দেখেছেন, যদি তারা সালাত বর্জন করার প্রার্থনা করত? আপনি কি ভেবে দেখেছেন, যদি তারা সিয়াম বর্জন করার প্রার্থনা করত? আপনি কি ভেবে দেখেছেন, যদি তারা হজ বর্জন করার প্রার্থনা করত? তবে তো ইসলামের প্রতিটি বন্ধনই ছিন্ন হয়ে যেত। আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমাকে একটি ছাগলছানা কিংবা উট বাঁধার রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রদান করত, তবে আমি তার ওপর ভিত্তি করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" অতঃপর উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "আল্লাহ আমার অন্তরকে সেই বিষয়ের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন যার জন্য তিনি আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অন্তরকে উন্মুক্ত করেছিলেন।" তাদের ইসলামের স্বরূপ তাদের নেতা হারিসা ইবনে সুরাকার কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে (তবীল ছন্দে):

ওহে, প্রভাতী আলোর বিচ্ছুরণের পূর্বেই আমাদের সহগামী হও ... হয়তো মৃত্যু সন্নিকটে অথচ আমরা তা অবগত নই

আমরা আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করেছিলাম যখন তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন ... হায় বিস্ময়! আবু বকরের শাসনের একি দশা!

নিশ্চয়ই যা তারা তোমাদের নিকট প্রার্থনা করেছে আর তোমরা তা দিতে অস্বীকার করেছ ... তা তাদের নিকট খেজুরের ন্যায় কিংবা খেজুরের চাইতেও অধিক মিষ্ট

যতক্ষণ আমাদের সত্তার অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান থাকবে আমরা তোমাদের প্রতিহত করব ... কঠিন সংকটের মুহূর্তে ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একদল মর্যাদাবান মানুষ

(ص: 100)الأحكام السلطانية للماوردي

الفصل الثاني: في قتال أهل البغي

وَإِذَا بَغَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَخَالَفُوا رَأْيَ الْجَمَاعَةِ وَانْفَرَدُوا بِمَذْهَبٍ ابْتَدَعُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجُوا بِهِ عَنِ الْمَظَاهرةِ بِطَاعَةِ الْإِمَامِ، وَلَا تَحَيَّزُوا بِدَارٍ اعْتَزَلُوا فِيهَا، وَكَانُوا أَفْرَادًا مُتَفَرِّقِينَ تَنَالُهُمُ الْقُدْرَةُ وَتَمْتَدُّ إِلَيْهِمُ الْيَدُ تُرِكُوا وَلَمْ يُحَارَبُوا، وَأُجْرِيَتْ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْعَدْلِ فِيمَا يَجِبُ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ مِنَ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ، وَقَدْ عَرَضَ قَوْمٌ مِنَ الْخَوَارِجِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- لِمُخَالَفَةِ رَأْيِهِ.

وَقَالَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلَاثٌ: لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ اللَّهِ، وَلَا نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ، وَلَا نَمْنَعُكُمُ الْفَيْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا، فَإِنْ تَظَاهَرُوا بِاعْتِقَادِهِمْ وَهُمْ عَلَى اخْتِلَاطِهِمْ بِأَهْلِ الْعَدْلِ، أَوْضَحَ لَهُمُ الْإِمَامُ فَسَادَ مَا اعْتَقَدُوا، وَبُطْلَانَ مَا ابْتَدَعُوا؛ لِيَرْجِعُوا عَنْهُ إِلَى اعْتِقَادِ الْحَقِّ وَمُوَافَقَةِ الْجَمَاعَةِ، وَجَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَزِّرَ مِنْهُمْ مَنْ تَظَاهَرَ بِالْفَسَادِ أَدَبًا وَزَجْرًا، وَلَمْ يَتَجَاوَزْهُ إِلَى قَتْلٍ وَلَا حَدٍّ.

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ"1.

فَإِذَا اعْتَزَلَتْ هَذِهِ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ أَهْلَ الْعَدْلِ، وَتَحَيَّزَتْ بِدَارٍ تَمَيَّزَتْ فِيهَا عَنْ مُخَالَطَةِ الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ لَمْ تَمْتَنِعْ عَنْ حَقٍّ وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ طَاعَةٍ، لَمْ يُحَارَبُوا مَا أَقَامُوا عَلَى الطَّاعَةِ وَتَأْدِيَةِ الْحُقُوقِ.

قَدْ اعْتَزَلَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ عَلِيًّا عليه السلام بِالنَّهْرَوَانِ، فَوَلَّى عَلَيْهِمْ عَامِلًا أَقَامُوا عَلَى طَاعَتِهِ زَمَانًا وَهُوَ لَهُمْ مُوَادِعٌ إِلَى أَنْ قَتَلُوهُ، فَأَنْفَذَ إِلَيْهِمْ أَنْ سَلِّمُوا إِلَيَّ قَاتِلَهُ فَأَبَوْا وَقَالُوا: كُلُّنَا قَتَلَهُ، قَالَ: فَاسْتَسْلِمُوا إِلَيَّ أَقْتَصَّ مِنْكُمْ، وَسَارَ إِلَيْهِمْ فَقَتَلَ أَكْثَرَهُمْ.

وَإِنْ امْتَنَعَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الْبَاغِيَةُ مِنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَمَنَعُوا مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحُقُوقِ، وَتَفَرَّدُوا بِاجْتِبَاءِ الْأَمْوَالِ

---

1 صحيح: رواه أبو داود في كتاب الحدود "4363"، والنسائي في كتاب تحريم الدم "4071"، وصححه الشيخ الألباني.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বিদ্রোহী দলগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রসঙ্গে

যদি মুসলমানদের কোনো একটি দল বিদ্রোহ করে এবং মূলধারার মুসলিম জামায়াতের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং তারা নিজেদের উদ্ভাবিত কোনো নতুন মতবাদে একাত্ম হয়, এমতাবস্থায় যদি তারা ইমামের আনুগত্যের প্রকাশ্য ঘোষণা থেকে সরে না যায় এবং কোনো পৃথক ভূখণ্ডে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে, বরং তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এমন ব্যক্তি হয় যাদের ওপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বজায় থাকে এবং যাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়, তবে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না। তাদের প্রাপ্য অধিকার এবং তাদের ওপর অর্পিত দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ বিধান এবং নির্ধারিত দণ্ডসমূহ (হুদুদ) তাদের ওপর কার্যকর করা হবে। খারিজিদের একটি দল আলী ইবনে আবু তালিব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার জন্য তাঁর মুখোমুখি হয়েছিল।

তিনি যখন মিম্বরে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন তাদের একজন বলে উঠল: "আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিধান দেওয়ার অধিকার নেই।" তখন আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বললেন: "কথাটি সত্য, কিন্তু এর দ্বারা একটি বাতিল বা অসৎ উদ্দেশ্য অন্বেষণ করা হয়েছে। আমাদের ওপর তোমাদের তিনটি অধিকার রয়েছে: আমরা তোমাদের আল্লাহর মাসজিদসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে বাধা দেব না, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আগে যুদ্ধ শুরু করব না এবং যতক্ষণ তোমরা আমাদের সাথে থাকবে ততক্ষণ তোমাদের যুদ্ধের লব্ধ সম্পদ (ফায়) থেকে বঞ্চিত করব না।" এরপর তারা যদি ন্যায়নিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সাথে মিলেমিশে থাকা অবস্থায় তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রকাশ করে, তবে ইমাম তাদের বিশ্বাসের অসারতা এবং তাদের উদ্ভাবিত মতবাদের অসারতা স্পষ্ট করে দেবেন; যাতে তারা সত্য বিশ্বাস এবং জামায়াতের ঐক্যের দিকে ফিরে আসে। আর ইমামের জন্য এটি বৈধ যে, তাদের মধ্যে যারা প্রকাশ্য ফিতনা-ফ্যাসাদ করবে, তাদের আদব শিক্ষা দেওয়া ও নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি তা'যির বা লঘু শাস্তি প্রদান করবেন, তবে তা হত্যা বা নির্ধারিত দণ্ড (হদ) পর্যন্ত পৌঁছাবে না।

নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "তিনটি কারণ ব্যতীত কোনো মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ নয়: ঈমান আনার পর কুফরি করা, বিবাহিত হওয়ার পর ব্যভিচার করা, অথবা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।"১ যদি এই বিদ্রোহী দলটি ন্যায়নিষ্ঠ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং কোনো নির্দিষ্ট জনপদে আশ্রয় নিয়ে জামায়াতের সংস্রব থেকে নিজেদের পৃথক করে নেয়, এমতাবস্থায় যদি তারা কোনো হক আদায়ে অস্বীকৃতি না জানায় এবং আনুগত্য ত্যাগ না করে, তবে যতক্ষণ তারা আনুগত্যের ওপর অটল থাকবে এবং পাওনা অধিকারসমূহ আদায় করবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না।

খারিজিদের একটি দল নাহরাওয়ানে আলী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তিনি তাদের ওপর একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন এবং তারা বেশ কিছুকাল তাঁর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি তাদের সাথে শান্তি বজায় রেখেছিলেন যতক্ষণ না তারা সেই প্রতিনিধিকে হত্যা করে। তখন তিনি তাদের কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, "হত্যাকারীকে আমার কাছে সোপর্দ করো।" কিন্তু তারা তা অস্বীকার করল এবং বলল: "আমরা সবাই তাকে হত্যা করেছি।" তিনি বললেন: "তবে তোমরা সবাই আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো যাতে আমি তোমাদের থেকে কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণ করতে পারি।" এরপর তিনি তাদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাদের অধিকাংশকে হত্যা করলেন। আর যদি এই বিদ্রোহী দলটি ইমামের আনুগত্য অস্বীকার করে এবং তাদের ওপর ওয়াজিব অধিকারসমূহ প্রদানে বাধা দেয়, এবং তারা এককভাবে সম্পদ সংগ্রহ করতে শুরু করে...

---

১ সহীহ: আবু দাউদ 'কিতাবুল হুদুদ' (৪৩৬৩), নাসায়ি 'কিতাব তাহরীমুদ দাম' (৪০৭১) গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং শেখ আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

وَتَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ وَلَمْ يُنَصِّبُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَامًا وَلَا قَدَّمُوا عَلَيْهِمْ زَعِيمًا، كَانَ مَا اجْتَبَوْهُ مِنَ الْأَمْوَالِ غَصْبًا لَا تَبْرَأُ مِنْهُ ذِمَّةٌ، وَمَا نَفَّذُوهُ مِنَ الْأَحْكَامِ مَرْدُودًا لَا يَثْبُتُ بِهِ حَقٌّ.

وَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ وَقَدْ نَصَّبُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَامًا اجْتَبَوْا بِقَوْلِهِ الْأَمْوَالَ وَنَفَّذُوا بِأَمْرِهِ الْأَحْكَامَ، لَمْ يَتَعَرَّضْ لِأَحْكَامِهِمْ بِالرَّدِّ، وَلَا لِمَا اجْتَبَوْهُ بِالْمُطَالَبَةِ، وَحُورِبُوا فِي الْحَالَيْنِ عَلَى سَوَاءٍ؛ لِيَنْزِعُوا عَنِ الْمُبَايَنَةِ وَيَفِيئُوا إِلَى الطَّاعَةِ، قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9] .

وَفِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى} وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: بَغَتْ بِالتَّعَدِّي فِي الْقِتَالِ.

وَالثَّانِي: بَغَتْ بِالْعُدُولِ عَنِ الصُّلْحِ.

وَقَوْلُهُ: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} يَعْنِي: بِالسَّيْفِ رَدْعًا عَنِ الْبَغْيِ وَزَجْرًا عَنِ الْمُخَالَفَةِ.

وَفِي قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الصُّلْحِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

وَالثَّانِي: إِلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ.

{فَإِنْ فَاءَتْ} أَيْ: رَجَعَتْ عَنِ الْبَغْيِ، {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ} فِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: بِالْحَقِّ.

وَالثَّانِي: بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا قَلَّدَ الْإِمَامُ أَمِيرًا عَلَى قِتَالِ الْمُمْتَنِعِينَ مِنَ الْبُغَاةِ قَدَّمَ قَبْلَ الْقِتَالِ إِنْذَارَهُمْ وَإِعْذَارَهُمْ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ إِذَا أَصَرُّوا عَلَى الْبَغْيِ كِفَاحًا، وَلَا يَهْجُمُ عَلَيْهِمْ غِرَّةً وَبَيَاتًا.

وَيُخَالِفُ قِتَالُهُمْ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَقْصِدَ بِالْقِتَالِ رَدْعَهُمْ وَلَا يَعْتَمِدُ بِهِ قَتْلَهُمْ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْتَمِدَ قَتْلَ الْمُشْرِكِينَ

এবং বিধানসমূহ কার্যকর করা; যদি তারা তা করে অথচ নিজেদের জন্য কোনো ইমাম নিযুক্ত না করে এবং নিজেদের ওপর কোনো নেতাকে অগ্রবর্তী না করে, তবে তারা যে সম্পদ সংগ্রহ করবে তা হবে জবরদখলকৃত, যা থেকে তাদের দায়মুক্তি ঘটবে না। আর তারা যে সকল বিধান কার্যকর করবে তা হবে প্রত্যাখ্যাত, যার মাধ্যমে কোনো অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

কিন্তু যদি তারা তা এমন অবস্থায় করে যে নিজেদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করেছে, যার নির্দেশে তারা সম্পদ সংগ্রহ করে এবং যার আদেশে বিধানসমূহ কার্যকর করে, তবে তাদের বিচারিক সিদ্ধান্তসমূহ প্রত্যাখ্যান করা হবে না এবং তাদের সংগৃহীত সম্পদের বিষয়ে কোনো দাবি তোলা হবে না। তবে উভয় অবস্থাতেই তাদের বিরুদ্ধে একইভাবে যুদ্ধ করা হবে, যাতে তারা বিচ্ছিন্নতা বর্জন করে আনুগত্যে ফিরে আসে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন: {যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের এক দল অপর দলের ওপর বিদ্রোহ বা বাড়াবাড়ি করে, তবে তোমরা বিদ্রোহকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।} [আল-হুজুরাত: ৯]।

মহান আল্লাহর বাণী: {অতঃপর যদি তাদের এক দল অপর দলের ওপর বিদ্রোহ বা বাড়াবাড়ি করে}—এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

প্রথমটি: যুদ্ধে সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে বিদ্রোহ করা।

দ্বিতীয়টি: সন্ধি বা মীমাংসা থেকে বিমুখ হওয়ার মাধ্যমে বিদ্রোহ করা।

তাঁর বাণী: {তবে তোমরা বিদ্রোহকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো}—অর্থাৎ তলোয়ারের মাধ্যমে, যেন তাদের বিদ্রোহ দমন করা যায় এবং অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখা যায়।

মহান আল্লাহর বাণী: {যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে}—এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

প্রথমটি: যতক্ষণ না তারা সেই সন্ধির দিকে ফিরে আসে যার নির্দেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন; এটি সাঈদ ইবনে জুবায়েরের মত।

দ্বিতীয়টি: তাদের অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়ে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর দিকে ফিরে আসা; এটি কাতাদাহর মত।

{যদি তারা ফিরে আসে}—অর্থাৎ যদি বিদ্রোহ থেকে ফিরে আসে, {তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দাও}—এর দুটি অর্থ হতে পারে:

প্রথমটি: হকের সাথে।

দ্বিতীয়টি: আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী। সুতরাং যখন ইমাম বিদ্রোহী ও অবাধ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য কোনো সেনাপতি নিযুক্ত করবেন, তখন তিনি যুদ্ধের আগে তাদের সতর্ক করবেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবেন। এরপরও যদি তারা বিদ্রোহে অটল থাকে, তবে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ করবেন; তাদের ওপর অতর্কিত বা নৈশ হামলা চালানো যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুশরিক ও মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে আটটি দিক দিয়ে ভিন্ন:

প্রথমটি: যুদ্ধের উদ্দেশ্য হবে তাদের দমন করা, হত্যা করাকে উদ্দেশ্য করা যাবে না; অথচ মুশরিকদের ক্ষেত্রে হত্যার উদ্দেশ্য রাখা বৈধ।

(ص: 102)الأحكام السلطانية للماوردي

والمرتدين.

وَالثَّانِي: أَنْ يُقَاتِلَهُمْ مُقْبِلِينَ، وَيَكُفَّ عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ، وَيَجُوزُ قِتَالُ أَهْلِ الرِّدَّةِ فِي الْحَرْبِ مُقْبِلِينَ وَمُدْبِرِينَ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يُجْهِزَ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَإِنْ جَازَ الْإِجْهَازُ عَلَى جَرْحَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ.

أَمَرَ عَلِيٌّ عليه السلام مُنَادِيَهُ أَنْ يُنَادِيَ يَوْمَ الْجَمَلِ: أَلَا لَا يُتْبَعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ لَا يَقْتُلَ أَسْرَاهُمْ وَإِنْ قَتَلَ أَسْرَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ،

وَيَعْتَبِرَ أَحْوَالَ مَنْ فِي الْأَسْرِ مِنْهُمْ، فَمَنْ أَمِنَتْ رَجْعَتُهُ إِلَى الْقِتَالِ أُطْلِقَ، وَمَنْ لَمْ تُؤْمَنْ مِنْهُ الرَّجْعَةُ حُبِسَ إِلَى انْجِلَاءِ الْحَرْبِ ثُمَّ يُطْلَقُ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْبَسَ بَعْدَهَا.

أَطْلَقَ الْحَجَّاجُ أَسِيرًا مِنْ أَصْحَابِ قَطَرِيِّ بْنِ الْفُجَاءَةِ1 لِمَعْرِفَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ لَهُ قَطَرِيٌّ: عُدْ إِلَى قِتَالِ عَدُوِّ اللَّهِ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: هَيْهَاتَ غَلَّ يَدًا مُطْلِقُهَا، وَاسْتَرَقَّ رَقَبَةً مُعْتِقُهَا، وَأَنْشَأَ يَقُولُ "مِنَ الْكَامِلِ":

أَأُقَاتِلُ الْحَجَّاجَ عَنْ سُلْطَانِهِ ... بِيَدٍ تُقِرُّ بِأَنَّهَا مَوْلَاتُهُ

إِنِّي إِذًا لَأَخُو الدَّنَاءَةِ وَالَّذِي ... شَهِدَتْ بِأَقْبَحِ فِعْلِهِ غَدَرَاتُهُ

مَاذَا أَقُولُ إِذَا بَرَزْتُ إِزَاءَهُ ... فِي الصَّفِّ وَاحْتَجَّتْ لَهُ فَعَلَاتُهُ

أَأَقُولُ جَارَ عَلَيَّ لَا إِنِّي إِذًا ل ... أَحَقُّ مَنْ جَارَتْ عَلَيْهِ وُلَاتُهُ

وَتَحَدَّثَ الْأَقْوَامُ أَنَّ صَنَائِعًا ... غُرِسَتْ لَدَيَّ فَحَنْظَلَتْ نَخَلَاتُهُ

وَالْخَامِسُ: أَنْ لَا يَغْنَمَ أَمْوَالَهُمْ، وَلَا يَسْبِيَ ذَرَارِيَّهُمْ.

رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنَعَتْ دَارُ الْإِسْلَامِ مَا فِيهَا، وَأَبَاحَتْ دَارُ الشِّرْكِ مَا فِيهَا".

وَالسَّادِسُ: أَنْ لَا يُسْتَعَانَ لِقِتَالِهِمْ بِمُشْرِكٍ مُعَاهَدٍ وَلَا ذِمِّيٍّ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يُسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالرِّدَّةِ.

وَالسَّابِعُ: أَنْ لَا يُهَادِنَهُمْ إِلَى مُدَّةٍ، وَلَا يُوَادِعَهُمْ عَلَى مَالٍ، فَإِنْ هَادَنَهُمْ إِلَى مُدَّةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ، فَإِنْ

---

1 هو قطري بن الفجاءة، واسم أبيه جعونة التميمي المازني، أبو نعامة، رأس الخوارج في زمانه، كان أحد الشجعان، خرج في خلافة ابن الزبير، وبقي يقاتل المسلمين ويستظهر عليهم بضع عشرة سنة، وتغلب على نواحي فارس ولم يقدر عليه، بل عثرت به فرسه واندقت عنقه بطبرستان سنة تسع وتسعين للهجرة، وحمل رأسه إلى الحجاج، وكان من الخطباء البلغاء الشعراء، وشعره في الحماسة.

ও মুরতাদদের থেকে।

দ্বিতীয়ত: তাদের সাথে ততক্ষণই যুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ তারা সম্মুখে অগ্রসরমান থাকে, আর যখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করে তখন তাদের থেকে বিরত থাকতে হবে। পক্ষান্তরে, যুদ্ধের ময়দানে মুরতাদদের সাথে তারা সম্মুখে অগ্রসরমান হোক বা পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী হোক—সর্বাবস্থায় যুদ্ধ করা বৈধ।

তৃতীয়ত: তাদের আহত ব্যক্তিদের হত্যা করা যাবে না, যদিও মুশরিক ও মুরতাদদের আহত ব্যক্তিদের হত্যা করা বৈধ।

আলী আলাইহিস সালাম জ্যামালের যুদ্ধের দিন তাঁর ঘোষককে এই ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন: "সাবধান! কোনো পলায়নকারীকে অনুসরণ করা হবে না এবং কোনো আহত ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না।"

চতুর্থত: তাদের বন্দীদের হত্যা করা যাবে না, যদিও মুশরিক ও মুরতাদদের বন্দীদের হত্যা করা বৈধ।

তাদের মধ্যে যারা বন্দী হবে তাদের অবস্থা বিবেচনা করা হবে; যাদের ব্যাপারে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। আর যাদের পুনরায় যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে, তাদের যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে এবং এরপর মুক্তি দেওয়া হবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তাদের বন্দী রাখা বৈধ নয়।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কাতারি ইবনুল ফুজায়ার ১ একজন সঙ্গীকে পূর্বপরিচয়ের খাতিরে মুক্তি দিয়েছিলেন। কাতারি তাকে বলল: "আল্লাহর শত্রু হাজ্জাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফিরে যাও।" সে উত্তরে বলল: "কখনোই নয়! যে হাত আমাকে মুক্তি দিয়েছে তা (কৃতজ্ঞতায়) অবশ হয়ে গেছে, আর যে গর্দানকে আজাদ করেছে তাকে সে দাসে পরিণত করেছে।" এরপর সে এই কবিতা আবৃত্তি করল:

আমি কি হাজ্জাজের সাথে তার রাজত্বের জন্য লড়ব … এমন হাত দিয়ে, যে হাত স্বীকার করে যে সে-ই তার মুনিব?

তবে তো আমি নিকৃষ্টতার সহোদর হয়ে যাব, … যার বিশ্বাসঘাতকতা তার জঘন্যতম কর্মের সাক্ষী হয়ে থাকবে।

আমি কী উত্তর দেব যখন আমি রণাঙ্গনে তার মুখোমুখি হব … এবং তার কৃত অনুগ্রহগুলোই তার পক্ষে দলিল হয়ে দাঁড়াবে?

আমি কি বলব যে সে আমার ওপর জুলুম করেছে? না, বরং আমিই তখন ... শাসকগোষ্ঠীর জুলুমের অধিক যোগ্য বলে বিবেচিত হব।
আর লোকজন বলাবলি করবে যে, আমার মাঝে সদাচরণের চারা ... রোপণ করা হয়েছিল, অথচ সেই খেজুর গাছগুলো তিতকুটে ফলে পরিণত হয়েছে।
পঞ্চমত: তাদের ধন-সম্পদ গনীমত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না এবং তাদের সন্তানদের দাস বানানো যাবে না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "দারুল ইসলাম তার অভ্যন্তরে থাকা যাবতীয় বিষয়কে সংরক্ষিত করেছে, আর দারুল শিরক তার অভ্যন্তরে থাকা বিষয়গুলোকে বৈধ করেছে।"
ষষ্ঠত: তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনো চুক্তিবদ্ধ মুশরিক বা জিম্মির সাহায্য নেওয়া যাবে না, যদিও হারবি কাফির ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য নেওয়া বৈধ।
সপ্তমত: তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদে কোনো যুদ্ধবিরতি চুক্তি করা যাবে না এবং অর্থের বিনিময়ে সন্ধি করা যাবে না। যদি নির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি করা হয়ও, তবে তা পালন করা তার জন্য আবশ্যক হবে না, কেননা

---

১. তিনি হলেন কাতারি ইবনুল ফুজায়া, তাঁর পিতার নাম জউনা আত-তামিমি আল-মাজিনি, উপনাম আবু নামামাহ। তিনি তাঁর সময়ের খারেজিদের প্রধান ছিলেন এবং অত্যন্ত সাহসী বীরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনুল জুবাইরের খিলাফতকালে তিনি বিদ্রোহ করেন এবং দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও প্রভাব বিস্তার অব্যাহত রাখেন। তিনি পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করেন এবং কেউ তাকে পরাস্ত করতে পারেনি। অবশেষে নিরানব্বই হিজরি সনে তাবারিস্তানে তাঁর ঘোড়া হোঁচট খেলে তাঁর ঘাড় ভেঙে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরে তাঁর মস্তক হাজ্জাজের কাছে নিয়ে আসা হয়। তিনি একজন বাগ্মী খতিব ও কবি ছিলেন এবং তাঁর কবিতাগুলো বীরত্বগাথা বিষয়ক।

ضَعُفَ عَنْ قِتَالِهِمُ انْتَظَرَ بِهِمُ الْقُوَّةَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ وَادَعَهُمْ عَلَى مَالٍ بَطَلَتِ الْمُوَادَعَةُ وَنُظِرَ فِي الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ فَيْئِهِمْ أَوْ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَصَرَفَ الصَّدَقَاتِ فِي أَهْلِهَا، وَالْفَيْءَ فِي مُسْتَحَقِّيهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خَالِصِ أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْلِكَهُ عَلَيْهِمْ، وَوَجَبَ رَدُّهُ إِلَيْهِمْ.

الثَّامِنُ: أَنْ يَنْصِبَ عَلَيْهِمُ الْعَرَّادَاتِ، وَلَا يُحْرِقُ عَلَيْهِمُ الْمَسَاكِنَ، وَلَا يَقْطَعُ عَلَيْهِمُ النَّخِيلَ وَالْأَشْجَارَ؛ لِأَنَّهَا دَارُ إِسْلَامٍ تَمْنَعُ مَا فِيهَا وَإِنْ بَغَى أَهْلُهَا، فَإِنْ أَحَاطُوا بِأَهْلِ الْعَدْلِ وَخَافُوا مِنْهُمُ الِاصْطِلَامَ جَازَ أَنْ يَدْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ مَا اسْتَطَاعُوا مِنِ اعْتِمَادِ قَتْلِهِمْ وَنَصْبِ الْعَرَّادَاتِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أُرِيدَتْ نَفْسُهُ جَازَ لَهُ الدَّفْعُ عَنْهَا بِقَتْلِ مَنْ أَرَادَهَا إِذَا كَانَ لَا يَنْدَفِعُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِدَوَابِّهِمْ وَلَا سِلَاحِهِمْ، وَلَا يُسْتَعَانَ بِهِ فِي قِتَالِهِمْ، وَيَرْفَعُ الْيَدَ عَنْهُ فِي وَقْتِ الْقِتَالِ وَبَعْدَهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه: يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعَانَ عَلَى قِتَالِهِمْ بِدَوَابِّهِمْ وَسِلَاحِهِمْ مَا كَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" 1.

فَإِذَا انْجَلَتِ الْحَرْبُ وَمَعَ أَهْلِ الْعَدْلِ لَهُمْ أَمْوَالٌ رُدَّتْ عَلَيْهِمْ، وَمَا تَلِفَ مِنْهَا فِي غَيْرِ قِتَالٍ، فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى مُتْلِفِهِ، وَمَا أَتْلَفُوهُ فِي نَائِرَةِ الْحَرْبِ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ فَهُوَ هَدَرٌ، وَمَا أَتْلَفُوهُ عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ فِي غَيْرِ نَائِرَةِ الْحَرْبِ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمْ، وَمَا أَتْلَفُوهُ فِي نَائِرَةِ الْحَرْبِ فَفِي وُجُودِ ضَمَانِهِ عَلَيْهِمْ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَكُونُ هَدَرًا لَا يُضْمَنُ.

وَالثَّانِي: يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تُبْطِلُ حَقًّا وَلَا تُسْقِطُ غُرْمًا، فَتُضْمَنُ النُّفُوسُ بِالْقَوَدِ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةِ فِي الْخَطَإِ. وَيُغَسَّلُ قَتْلَى أَهْلِ الْبَغْيِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ عُقُوبَةً لَهُمْ، وَلَيْسَ عَلَى مَيِّتٍ فِي الدُّنْيَا عُقُوبَةٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فُرِضَ عَلَى أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ" 2.

وَأَمَّا قَتْلَى أَهْلِ الْعَدْلِ فِي مَعْرَكَةِ الْحَرْبِ فِي غُسْلِهِمْ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ فَقَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: لَا يُغَسَّلُونَ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ تَكْرِيمًا وَتَشْرِيفًا كَالشُّهَدَاءِ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ.

---

1 صحيح: رواه أحمد "20172"، وصحَّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع "7662".
2 لم أقف عليه.

যদি তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব হয়, তবে তাদের ওপর শক্তি অর্জিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর যদি অর্থের বিনিময়ে তাদের সাথে সন্ধি করা হয়, তবে সেই সন্ধি বাতিল হয়ে যাবে এবং সেই অর্থের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে; যদি তা তাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ (ফাই) কিংবা তাদের সদকা (যাকাত) থেকে হয়, তবে তা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না এবং সদকা তার উপযুক্ত খাতে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ তার প্রাপকদের মাঝে ব্যয় করা হবে। আর যদি তা তাদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ থেকে হয়, তবে তা মালিকানাভুক্ত করা বৈধ হবে না এবং তা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক।
অষ্টম: তাদের বিরুদ্ধে মিনজানিক (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) স্থাপন করা যাবে, কিন্তু তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া যাবে না এবং তাদের খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছ কাটা যাবে না; কারণ এটি একটি ইসলামী ভূখণ্ড, যা এর অভ্যন্তরে থাকা সম্পদকে সুরক্ষা প্রদান করে যদিও এর অধিবাসীরা বিদ্রোহী হয়। তবে যদি তারা ন্যায়পন্থীদের ঘেরাও করে ফেলে এবং তারা যদি সমূলে বিনাশ হওয়ার আশঙ্কা করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে সাধ্যমতো নিজেদের আত্মরক্ষা করা, তাদের হত্যা করার সংকল্প করা এবং তাদের বিরুদ্ধে মিনজানিক স্থাপন করা বৈধ। কেননা, কোনো মুসলিমের প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিলে তার জন্য আত্মরক্ষা করা বৈধ, এমনকি আক্রমণকারীকে হত্যার মাধ্যমে হলেও, যদি হত্যা ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে তা প্রতিহত করা সম্ভব না হয়। তাদের গবাদি পশু বা অস্ত্র ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া যাবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সাহায্য নেওয়া যাবে না। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরে তাদের সম্পদের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে হবে। আবু হানিফা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) বলেছেন: যুদ্ধ চলাকালীন তাদের গবাদি পশু ও অস্ত্র দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য নেওয়া বৈধ। অথচ রাসুলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ তার মনের সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কারো জন্য বৈধ নয়।" ১।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ন্যায়পন্থীদের কাছে যদি তাদের কোনো সম্পদ থাকে, তবে তা তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। যুদ্ধের পরিস্থিতি ছাড়া অন্য সময় যা বিনষ্ট হবে, তা বিনষ্টকারীর ওপর ক্ষতিপূরণ হিসেবে বর্তাবে। আর যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে জান ও মালের যে ক্ষতি তারা করবে, তা ক্ষমাযোগ্য। পক্ষান্তরে, যুদ্ধের ভয়াবহতার বাইরে তারা ন্যায়পন্থীদের জান ও মালের যে ক্ষতি করবে, তা তাদের জন্য ক্ষতিপূরণযোগ্য হবে। আর যুদ্ধের উত্তেজনার সময় তারা যা বিনষ্ট করবে, সেটির ক্ষতিপূরণ তাদের ওপর ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে দুটি মত রয়েছে:
প্রথমটি: এটি ক্ষমাযোগ্য হবে এবং এর কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।
দ্বিতীয়টি: এটি তাদের ওপর ক্ষতিপূরণযোগ্য হবে; কারণ পাপাচার কোনো অধিকারকে বাতিল করে না এবং কোনো দায়বদ্ধতাকেও বিলুপ্ত করে না। ফলে ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ (কিসাস) এবং ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে রক্তপণ (দিয়ত) প্রদান করতে হবে।
বিদ্রোহীদের মৃতদের গোসল দেওয়া হবে এবং তাদের জানাজার নামাজ পড়া হবে। আবু হানিফা তাদের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে জানাজার নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। অথচ দুনিয়াতে মৃত ব্যক্তির ওপর কোনো শাস্তি নেই। আর নবী (আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "আমার উম্মতের ওপর তাদের মৃতদের গোসল দেওয়া ও জানাজার নামাজ পড়া ফরজ করা হয়েছে।" ২।
আর রণক্ষেত্রে নিহত ন্যায়পন্থীদের গোসল দেওয়া ও জানাজার নামাজ পড়ার ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে:
প্রথমটি: মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে নিহত শহীদদের ন্যায় সম্মান ও মর্যাদাবশত তাদের গোসল দেওয়া হবে না এবং তাদের জানাজার নামাজও পড়া হবে না।

---

১ সহিহ: এটি বর্ণনা করেছেন আহমদ "২০১৭২", এবং শেখ আলবানি 'সহিহুল জামে' "৭৬৬২" তে একে সহিহ বলেছেন।
২ আমি এই হাদিসটি খুঁজে পাইনি।

وَالثَّانِي: يُغَسَّلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَإِنْ قُتِلُوا بَغْيًا، وَقَدْ صَلَّى الْمُسْلِمُونَ عَلَى عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما، وَصُلِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى عَلِيّ عليه السلام، وَإِنْ قُتِلُوا ظُلْمًا وَبَغْيًا، وَلَا يَرِثُ بَاغٍ قَتَلَ عَادِلًا، وَلَا عَادِلٌ قَتَلَ بَاغِيًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ" 1.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أُورِثُ الْعَادِلَ مِنَ الْبَاغِي؛ لِأَنَّهُ مُحِقٌّ، وَلَا أُورِثُ الْبَاغِيَ مِنَ الْعَادِلِ؛ لِأَنَّهُ مُبْطِلٌ.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ: أُورِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ فِي قَتْلِهِ، وَإِذَا مَرَّ تُجَّارُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِعَشَّارِ أَهْلِ الْبَغْيِ فَعَشَّرَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ قُدِرَ عَلَيْهِمْ عُشِّرُوا، وَلَمْ يُجْزِهِمُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ بِخِلَافِ الْمَأْخُوذِ مِنَ الزَّكَاةِ، لِأَنَّهُمْ مَرُّوا بِهِمْ مُخْتَارِينَ، وَالزَّكَاةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْمُقِيمِينَ الْمُكْرَهِينَ، وَإِذَا أَتَى أَهْلُ الْبَغْيِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ حُدُودًا، فَفِي إِقَامَتِهَا عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ وَجْهَانِ

---

1 صحيح: رواه الترمذي في كتاب الفرائض "2109"، وابن ماجه في كتاب الديات "2645"، وصحَّحه الشيخ الألباني.

দ্বিতীয়ত: তাদের গোসল দেওয়া হবে এবং তাদের জানাযার সালাত আদায় করা হবে, যদিও তারা বিদ্রোহের কারণে নিহত হয়। বস্তুত মুসলিমগণ উমর ও উসমান (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর জানাযার সালাত আদায় করেছেন এবং এরপরে আলী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর জানাযার সালাতও আদায় করা হয়েছে, যদিও তাঁরা অন্যায় ও বিদ্রোহের শিকার হয়ে নিহত হয়েছিলেন। আর কোনো বিদ্রোহী ব্যক্তি কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার উত্তরাধিকার লাভ করবে না, এবং কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কোনো বিদ্রোহীকে হত্যা করলেও তার উত্তরাধিকারী হবে না; কারণ নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "হত্যাকারী উত্তরাধিকার লাভ করবে না" ১।

ইমাম আবু হানিফা বলেন: আমি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে বিদ্রোহীর উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করব; কারণ সে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে বিদ্রোহীকে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করব না; কারণ সে অসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আবু ইউসুফ বলেন: আমি তাদের একে অপরকে অন্যের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করব; কারণ সে হত্যার ক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যাখ্যার (তাউইল) ওপর নির্ভরশীল ছিল। আর যখন জিম্মি ব্যবসায়ীরা বিদ্রোহীদের কর সংগ্রাহকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে এবং সে তাদের মালের দশমাংশ কর আদায় করে নেয়, এরপর যদি তাদের (বিদ্রোহীদের) ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা হয়, তবে তাদের থেকে পুনরায় দশমাংশ কর নেওয়া হবে। তাদের থেকে যা নেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট হবে না, যাকাতের ক্ষেত্রে যা নেওয়া হয় তার বিষয়টি ভিন্ন। কারণ তারা স্বেচ্ছায় তাদের (বিদ্রোহীদের) নিকট দিয়ে যাতায়াত করেছে, আর যাকাত সাধারণত বাসিন্দাদের থেকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করা হয়। বিদ্রোহীরা যদি তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের আগে কোনো দণ্ডবিধিযোগ্য (হদ) অপরাধ করে থাকে, তবে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের পর সেই দণ্ড কার্যকর করার বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে।

---

১. সহীহ: তিরমিজি এটি ‘কিতাবুল ফারায়িদ’ (২১০৯) এবং ইবনে মাজাহ ‘কিতাবুদ দিয়াত’ (২৬৪৫) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং শেখ আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

(ص: 105)الأحكام السلطانية للماوردي

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي قِتَالِ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ

وَإِذَا اجْتَمَعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْفَسَادِ عَلَى شَهْرِ السِّلَاحِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ وَقَتْلِ النُّفُوسِ، وَمَنْعِ السَّابِلَةِ، فَهُمُ الْمُحَارِبُونَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] .

فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ:

أَحَدُهَا: أَنَّ الْإِمَامَ وَمَنِ اسْتَنَابَهُ عَلَى قِتَالِهِمْ مِنَ الْوُلَاةِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُقَتِّلَ وَلَا يُصَلِّبَ، وَبَيْنَ أَنْ يُقَتِّلَ وَيُصَلِّبَ، وَبَيْنَ أَنْ يُقَطِّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَبَيْنَ

أَنْ يَنْفِيَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ1 وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ2 وَإِبْرَاهِيمِ النَّخَعِيِّ3.

وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ذَا رَأْيٍ وَتَدْبِيرٍ قَتَلَهُ وَلَمْ يَعْفُ عَنْهُ، وَمَنْ كَانَ ذَا بَطْشٍ وَقُوَّةٍ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ ذَا رَأْيٍ وَلَا بَطْشٍ عَزَّرَهُ وَحَبَسَهُ، هَذَا قَوْلُ

---

1 هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي المدني، عالم أهل المدينة بلا مدافعة، وُلِدَ في خلافة عمر لأربع مضين منها، وتوفّي سنة أربع وتسعين للهجرة، وقيل: ولد لسنتين من خلافة عمر، رأى عمر، وسمع عثمان وعليًّا وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأبا موسى وأبا هريرة وجبير بن مطعم وعبد الله بن زيد المازني وأم سلمة وطائفة من الصحابة.

2 هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم -وقيل: سالم- بن صفوان، مولى بني فهر أو جمح المكي، وقيل: إنه مولى أبي ميسرة الفهري، من مولدي الجند؛ كان من أجلَّاء الفقهاء وتابعي مكة وزهَّادها، سمع جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وخلقًا كثيرًا من الصحابة -رضوان الله عليهم، وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة ومالك بن دينار والأعمش والأوزاعي وخلق كثير -رحمهم الله تعالى، وإليه وإلى مجاهد انتهت فتوى مكة في زمانهما. قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاء.

3 هو إبراهيم بن يزيد بن قيس، أبو عمران النخعي الكوفي، فقيه العراق، روى عن علقمة ومسروق وخاله الأسود بن يزيد والربيع بن خثيم وشريح القاضي، وصلة بن زفر وعبيدة السلماني، وسويد بن غفلة، وعابس بن ربيعة، وهمام بن الحارث، ودخل على عائشة وهو صبيّ، وتوفّي سنة ست وتسعين للهجرة، وقيل: سنة خمس وله تسع وأربعون سنة على الصحيح.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বিদ্রোহী ও ডাকাতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রসঙ্গে

যখন একদল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অস্ত্র প্রদর্শন, পথরোধ, সম্পদ লুণ্ঠন, নরহত্যা এবং পথচারীদের চলাচলে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়, তখন তারাই হলো সেই 'মুহারিবুন' (বিদ্রোহী/ডাকাত) যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন: {নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশান্তর করা হবে} [সূরা আল-মায়িদাহ: ৩৩]।

এই আয়াতের বিধান সম্পর্কে ফকীহগণ তিনটি মাযহাবে (মতে) বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথমত: ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) এবং তাঁর পক্ষ থেকে যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্বপ্রাপ্ত, সেই সকল শাসকের এই এখতিয়ার রয়েছে যে, তারা চাইলে এদের হত্যা করবেন কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ করবেন না, অথবা হত্যা ও ক্রুশবিদ্ধ উভয়ই করবেন, অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে ফেলবেন, অথবা দেশান্তর করবেন। এটি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, মুজাহিদ, আতা এবং ইবরাহিম নাখয়ীর অভিমত।

দ্বিতীয় মাযহাব: তাদের মধ্যে যারা প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনার অধিকারী, তাদের হত্যা করা হবে এবং ক্ষমা করা হবে না; যারা দৈহিক শক্তি ও বিক্রমের অধিকারী, তাদের বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে ফেলা হবে; আর যাদের প্রজ্ঞা বা বিক্রম কোনটিই নেই, তাদের তাযীর (লঘু শাস্তি) প্রদান করা হবে এবং কারারুদ্ধ করা হবে। এটি...

---

১. তিনি হলেন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ইবনে হাযন আল-কুরাশী আল-মাখযূমী আল-মাদানী। তিনি মদীনার বাসিন্দাদের অবিসংবাদিত আলিম ছিলেন। তিনি উমর (রা.)-এর খিলাফতের চার বছর অতিবাহিত হওয়ার পর জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৯৪ সনে মৃত্যুবরণ করেন। মতান্তরে, তিনি উমর (রা.)-এর খিলাফতের দ্বিতীয় বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উমর (রা.)-কে দেখেছেন এবং উসমান, আলী, যায়দ ইবনে সাবিত, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আয়িশা, আবু মুসা, আবু হুরায়রা, জুবায়র ইবনে মুতইম, আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ আল-মাযানী, উম্মে সালামাহ এবং একদল সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন।

২. তিনি হলেন আবু মুহাম্মদ আতা ইবনে আবি রাবাহ আসলাম—মতান্তরে সালিম—ইবনে সাফওয়ান। তিনি বনু ফিহর অথবা মক্কার জুমাহ গোত্রের আযাদকৃত দাস ছিলেন। আবার কারো মতে তিনি আবু মাইসারা আল-ফিহরীর আযাদকৃত দাস ছিলেন এবং আল-জুনদ নামক

স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথিতযশা ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং মক্কার তাবেঈ ও যাহিদদের (সংসারবিরাগী) অন্যতম ছিলেন। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়ের এবং সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এক বিশাল জামাত থেকে শ্রবণ করেছেন। তাঁর নিকট থেকে আমর ইবনে দীনার, যুহরী, কাতাদা, মালিক ইবনে দীনার, আমাশ, আওযাঈ এবং এক বিশাল জামাত (রাহিমাহুল্লাহু তাআলা) বর্ণনা করেছেন। তাঁদের সময়ে মক্কার ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব তাঁর ও মুজাহিদের ওপর ন্যস্ত ছিল। কাতাদা বলেছেন: "হজ্জের মাসায়েল সম্পর্কে আতা মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী।"

৩. তিনি হলেন ইবরাহিম ইবনে ইয়াযীদ ইবনে কাইস, আবু ইমরান আন-নাখয়ী আল-কুফী। তিনি ইরাকের ফকীহ ছিলেন। তিনি আলকামা, মাসরূক, তাঁর মামা আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, রাবী ইবনে খুসায়ম, বিচারক শুরাইহ, সিলাহ ইবনে যুফার, উবাইদাহ আস-সালমানী, সুওয়াইদ ইবনে গাফালাহ এবং আবীস ইবনে রাবীআহ ও হাম্মাম ইবনুল হারিস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বাল্যকালে আয়িশা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি হিজরী ৯৬ সনে মৃত্যুবরণ করেন। বিশুদ্ধ মতে, তাঁর মৃত্যু হিজরী ৯৫ সনে হয়েছে এবং তখন তাঁর বয়স ছিল ৪৯ বছর।

(ص: 106)الأحكام السلطانية للماوردي

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَهَا مُرَتَّبَةً بِاخْتِلَافِ صِفَاتِهِمْ لَا بِاخْتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ.

وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ:

أَنَّهَا مُرَتَّبَةٌ بِاخْتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ لَا بِاخْتِلَافِ صِفَاتِهِمْ، فَمَنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَصُلِبَ، وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَلَمْ يُصْلَبْ، وَمَنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَمَنْ كَثُرَ وَهَيَّبَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ عُزِّرَ وَلَمْ

يُقْتَلُ وَلَمْ يُقَطَّعْ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَالسُّدِّيِّ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ قَتْلِهِمْ ثُمَّ صَلْبِهِمْ، وَبَيْنَ قَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ قَتْلِهِمْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مَهِيبًا مُكْثِرًا فَحُكْمُهُ كَحُكْمِهِمْ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} ، فَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقَاوِيلَ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ إِبْعَادُهُمْ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ إِلَى بِلَادِ الشِّرْكِ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِخْرَاجُهُمْ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى أُخْرَى، وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ الْحَبْسُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ.

وَالرَّابِعُ: وَهُوَ أَنْ يُطْلَبُوا لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ فَيَبْعُدُوا، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالشَّافِعِيِّ.

وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34] فَفِيهِ لِأَهْلِ التَّأْوِيلِ سِتَّةُ أَقَاوِيلَ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ وَارِدٌ فِي الْمُحَارِبِينَ الْمُفْسِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ إِذَا تَابُوا مِنْ شِرْكِهِمْ بِالْإِسْلَامِ.

وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُسْقِطُ التَّوْبَةُ عَنْهُمْ حَدًّا وَلَا حَقًّا، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ1 رضي الله عنهم.

---

1 هو قتادة بن دعامة، أبو الخطاب السدوسي البصري المفسّر، أحد الأئمة الأعلام، روى عن عبد الله بن سرجس وابن مالك وابن الطفيل وأبي الصائغ وأبي الوقت المراغي وأبي الشعثاء وزرارة بن أوفى والشعبي وعبد الله بن شقيق ومطرف بن

الشخير وسعيد بن المسيب وأبي العالية وصفوان بن محرز ومعاذة العدوية وأبي عثمان النهدي والحسن وخلق.

وكان أحد من يضرب به المثل لحفظه. قال: ما قلت لمحدّث قط: أعد عليّ وما سمعت أذناي قط شيئًا إلّا وعاه قلبي.

قال أحمد بن حنبل: قتادة أعلم بالتفسير وباختلاف العلماء؛ ثم وصفه بالفقه والحفظ. وأطنب في ذكره. وقال: قلَّمَا نجد من يتقدمه. قرأت عليه مرة صحيفة جابر فحفظها.

মালিক ইবনে আনাস এবং মদীনার একদল ফকীহ (আইনবিদ); তারা এই শাস্তিগুলোকে অপরাধীদের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছেন, তাদের কার্যাবলির ভিন্নতা অনুযায়ী নয়।

এবং তৃতীয় মতটি হলো:

এই শাস্তিগুলো অপরাধীদের কার্যাবলির ভিন্নতা অনুযায়ী বিন্যস্ত, তাদের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা অনুযায়ী নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি হত্যা করল এবং সম্পদ লুণ্ঠন করল, তাকে হত্যা করা হবে এবং ক্রুশবিদ্ধ করা হবে। আর যে ব্যক্তি হত্যা করল কিন্তু সম্পদ লুণ্ঠন করল না, তাকে হত্যা করা হবে কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি সম্পদ লুণ্ঠন করল কিন্তু হত্যা করল না, তার বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে ফেলা হবে। আর যে ব্যক্তি দল ভারী করল এবং জনমনে ত্রাসের সৃষ্টি করল কিন্তু কাউকে হত্যা করল না এবং সম্পদও লুণ্ঠন করল না, তাকে তা'যীর (লঘু শাস্তি) দেওয়া হবে; তাকে হত্যা করা হবে না এবং তার অঙ্গচ্ছেদও করা হবে না। এটি ইবনে আব্বাস, হাসান, কাতাদাহ এবং সুদ্দীর অভিমত এবং এটিই শাফিঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাযহাব।

এবং আবু হানিফা বলেছেন: যদি তারা হত্যা করে এবং সম্পদ লুণ্ঠন করে, তবে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের ইখতিয়ার থাকবে যে, তিনি তাদের হত্যা করবেন এবং এরপর ক্রুশবিদ্ধ করবেন, অথবা তাদের বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে ফেলবেন এবং এরপর হত্যা করবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের সাথে দল ভারী করে ও ভীতি প্রদর্শন করে অবস্থান করবে, তার হুকুমও তাদের হুকুমের মতোই হবে। আর মহান আল্লাহর বাণী: {অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে}, এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদগণ চারটি মত ব্যক্ত করেছেন:

প্রথমটি: তাদের ইসলামী ভূখণ্ড থেকে শিরকের ভূখণ্ডে তাড়িয়ে দেওয়া। এটি মালিক ইবনে আনাস, হাসান, কাতাদাহ এবং যুহরীর অভিমত।
দ্বিতীয়টি: তাদের এক শহর থেকে অন্য শহরে নির্বাসিত করা। এটি উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) এবং সাঈদ ইবনে জুবায়েরের অভিমত।
তৃতীয়টি: এর অর্থ হলো কারারুদ্ধ করা। এটি আবু হানিফা ও মালিকের অভিমত।
চতুর্থটি: তাদের বিরুদ্ধে হদ (নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর করার জন্য তাড়া করা হবে যেন তারা পালিয়ে দূরে চলে যায়। এটি ইবনে আব্বাস ও শাফিঈর অভিমত।
আর মহান আল্লাহর বাণী: {কিন্তু যারা তোমাদের আয়ত্তে আসার আগে তওবা করে} [সূরা আল-মায়িদাহ: ৩৪], এই আয়াতাংশের ক্ষেত্রে তাফসীরবিদগণের ছয়টি অভিমত রয়েছে:
প্রথমটি: এটি কুফরী অবস্থায় থাকা সেইসব লুণ্ঠনকারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলামের মাধ্যমে তাদের শিরক থেকে তওবা করে।
তবে মুসলিমদের ক্ষেত্রে তওবা কোনো নির্ধারিত শাস্তি (হদ) বা মানুষের পাওনা হক রহিত করে না। এটি ইবনে আব্বাস, হাসান, মুজাহিদ এবং কাতাদাহ ১ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর অভিমত।

---

১ তিনি হলেন কাতাদাহ ইবনে দিয়ামাহ, আবু আল-খাত্তাব আস-সাদূসী আল-বাসরী, বিশিষ্ট মুফাসসির এবং অন্যতম প্রধান ইমাম। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস, ইবনে মালিক, ইবনে তুফাইল, আবুস সাইগ, আবুল ওয়াক্ত আল-মারাগী, আবুশ শা'সা, যুরারাহ ইবনে আওফা, শা'বী, আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক, মুতাররিফ ইবনে শিখখীর, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আবুল আলিয়াহ, সাফওয়ান ইবনে মুহরিয, মুআযাহ আল-আদাবিয়্যাহ, আবু উসমান আন-নাহদী, হাসান এবং এক বিশাল জামাত থেকে বর্ণনা করেছেন।
তিনি প্রখর মুখস্থ শক্তির জন্য প্রবাদপুরুষ ছিলেন। তিনি বলতেন: আমি কোনো হাদীস বর্ণনাকারীকে কখনোই বলিনি 'আমার কাছে পুনরায় বর্ণনা করুন', এবং আমার কান যা কিছু শুনেছে তা আমার অন্তর হেফাযত করে নিয়েছে।
আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন: কাতাদাহ তাফসীর এবং আলেমদের মতপার্থক্য সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতেন। এরপর তিনি তাঁর ফিকহ ও হিফযের প্রশংসা করেন এবং সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনি বলেন: তাঁর অগ্রগণ্য কাউকে আমরা খুব কমই পাই। আমি একবার তাঁর কাছে জাবিরের সহীফা পাঠ করেছিলাম, আর তিনি তা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন।

وَالثَّانِي: أَنَّهُ وَارِدٌ فِي الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ إِذَا تَابُوا بِأَمَانِ الْإِمَامِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ، وَأَمَّا التَّائِبُ بِغَيْرِ أَمَانٍ فَلَا تُؤَثِّرُ تَوْبَتُهُ فِي سُقُوطِ حَدٍّ وَلَا حَقٍّ، وَهَذَا قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، وَالشَّعْبِيِّ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ وَارِدٌ فِيمَنْ تَابَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ لُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ عَادَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ وَهُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه.

وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ وَارِدٌ فِيمَنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي مَنَعَةٍ وَتَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَتْ عُقُوبَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَنَعَةٍ لَمْ تَسْقُطْ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَرَبِيعَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ رضي الله عنه وَعَنْهُمْ.

وَالْخَامِسُ: أَنَّ تَوْبَتَهُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَنَعَةٍ تَضَعُ عَنْهُ جَمِيعَ حُدُودِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَلَا تُسْقِطُ عَنْهُ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَالسَّادِسُ: أَنَّ تَوْبَتَهُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ تَضَعُ عَنْهُ جَمِيعَ الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ إِلَّا الدِّمَاءَ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فَهَذَا حُكْمُ الْآيَةِ وَاخْتِلَافُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ فِيهَا، ثُمَّ نَقُولُ فِي الْمُحَارِبِينَ: إِنَّهُمْ إِذَا كَانُوا عَلَى امْتِنَاعِهِمْ مُقِيمِينَ قُوتِلُوا كَقِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ فِي عَامَّةِ أَحْوَالِهِمْ وَيُخَالِفُهُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: إِنَّهُمْ يَجُوزُ قِتَالُهُمْ مُقْبِلِينَ وَمُدْبِرِينَ؛ لِاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ مِنْهُمْ، وَلَا يَجُوزُ اتِّبَاعُ مَنْ وَلَّى مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْمِدَ فِي الْحَرْبِ إِلَى قَتْلِ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى قَتْلِ أَهْلِ الْبَغْيِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُمْ يُؤَاخَذُونَ بِمَا اسْتَهْلَكُوهُ مِنْ دَمٍ وَمَالٍ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا بِخِلَافِ أَهْلِ الْبَغْيِ.

দ্বিতীয়ত: এটি সেই সব লুণ্ঠনকারী বা সশস্ত্র বিদ্রোহী মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের পূর্বে ইমামের অভয় বা নিরাপত্তার মাধ্যমে তওবা করে। পক্ষান্তরে, নিরাপত্তা ব্যতিরেকে তওবাকারীর তওবা কোনো নির্ধারিত দণ্ড (হদ) কিংবা মানুষের অধিকার (হক) রহিত করার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না। এটি আলী ইবনে আবু তালিব (আল্লাহ তাঁর চেহারাকে মর্যাদামণ্ডিত করুন) এবং শাবি-র অভিমত।

তৃতীয়ত: এটি ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে দারুল হারবে (অমুসলিম যুদ্ধক্ষেত্র) চলে যাওয়ার পর তওবা করেছে এবং আয়ত্তে আসার পূর্বেই ফিরে এসেছে। এটি উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অভিমত।

চতুর্থত: এটি ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে দারুল ইসলামে শক্তিশালী ও সুরক্ষিত অবস্থানে থাকা অবস্থায় আয়ত্তে আসার পূর্বেই তওবা করেছে; এমতাবস্থায় তার দণ্ড রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে শক্তিশালী অবস্থানে না থাকে, তবে তা রহিত হবে না। এটি ইবনে উমর, রাবিয়াহ এবং হাকাম ইবনে উয়াইনাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর অভিমত।

পঞ্চমত: আয়ত্তে আসার পূর্বে তার তওবা—সে শক্তিশালী অবস্থানে থাকুক বা না থাকুক—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সকল দণ্ড (হদ) রহিত করে দেয়, তবে তা মানুষের অধিকারসমূহ (পাওনাদি) রহিত করে না। এটি ইমাম শাফেয়ী-র অভিমত।

ষষ্ঠত: আয়ত্তে আসার পূর্বে তার তওবা রক্ত বা জীবনের বিনিময় (কিসাস) ব্যতীত সমস্ত দণ্ড ও দায়বদ্ধতা রহিত করে দেয়। এটি মালিক ইবনে আনাস-এর অভিমত। এই হলো আয়াতের বিধান এবং এ বিষয়ে মুফাসসিরগণের মতভেদ। অতঃপর আমরা লুণ্ঠনকারীদের সম্পর্কে বলি: তারা যদি তাদের প্রতিরোধে অটল থাকে, তবে তাদের বিরুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের ন্যায় যুদ্ধ করা হবে। তবে পাঁচটি দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে:

প্রথমত: তাদের সাথে সম্মুখমুখী হয়ে কিংবা পলায়নরত অবস্থায়—উভয় অবস্থায় যুদ্ধ করা বৈধ, যাতে তাদের কাছ থেকে পাওনা অধিকারসমূহ আদায় করা যায়; কিন্তু বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা পলায়ন করে তাদের অনুসরণ করা বৈধ নয়।

দ্বিতীয়ত: যুদ্ধের ময়দানে তাদের মধ্যে যারা হত্যা করেছে তাদের সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করে হত্যা করা বৈধ, কিন্তু সাধারণ বিদ্রোহীদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করে হত্যা করা বৈধ নয়।

তৃতীয়ত: যুদ্ধ বা অন্য কোনো অবস্থায় তারা যে জান ও মালের ক্ষতি করেছে, তার জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে; যা সাধারণ বিদ্রোহীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ يَجُوزُ حَبْسُ مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ لِاسْتِبْرَاءِ حَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ حَبْسُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ.

وَالْخَامِسُ: أَنَّ مَا اجْتَبَوْهُ مِنْ خَرَاجٍ وَأَخَذُوهُ مِنْ صَدَقَاتٍ فَهُوَ كَالْمَأْخُوذِ غَصْبًا نَهْبًا لَا يُسْقِطُ عَنْ أَهْلِ الْخَرَاجِ وَالصَّدَقَاتِ حَقًّا، فَيَكُونُ غُرْمُهُ عَلَيْهِمْ مُسْتَحَقًّا، وَإِذَا كَانَ الْمَوْلَى عَلَى قِتَالِهِمْ مَقْصُورَ الْوِلَايَةِ عَلَى مُحَارَبَتِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِمْ حَدًّا، وَلَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُمْ حَقًّا، وَيَلْزَمُهُ حَمْلُهُمْ إِلَى الْإِمَامِ لِيَأْمُرَ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ، وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ مِنْهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَامَّةً عَلَى قِتَالِهِمْ وَاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ مِنْهُمْ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ لِيَنْفُذَ حُكْمُهُ فِيمَا يُقِيمُهُ مِنْ حَدٍّ وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْ حَقٍّ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَشَفَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ:

إِمَّا بِإِقْرَارِهِمْ طَوْعًا مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا إِكْرَاهٍ.

وَإِمَّا بِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، فَإِذَا عَلِمَ مِنْ أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مَا فَعَلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ جَرَائِمِهِ نَظَرَ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ قَدْ قَتَلَ، وَأَخَذَ الْمَالَ قَتَلَهُ وَصَلَبَهُ بَعْدَ الْقَتْلِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يُصْلَبُ حَيًّا ثُمَّ يَطْعَنُهُ بِالرُّمْحِ حَتَّى يَمُوتَ وَهَذَا الْقَتْلُ مَحْتُومٌ وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ، وَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَلِيُّ الدَّمِ كَانَ عَفْوُهُ لَغْوًا، وَيُصْلَبُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَتَجَاوَزُهَا، ثُمَّ يَحُطُّهُ بَعْدَهَا، وَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ قَتَلَهُ وَلَمْ يَصْلُبْهُ، وَغَسَّلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ مَنْ حَكَمَ بِقَتْلِهِ، وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُمْ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ، فَكَانَ قَطْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى لِسَرِقَتِهِ، وَقَطْعُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى

لِمُجَاهَرَتِهِ، وَمَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ اقْتَصَّ مِنْهُمُ الْجَارِحَ إِنْ كَانَ فِي مِثْلِهَا قِصَاصٌ، وَفِي إحْتَامِ الْقِصَاصِ فِي الْجُرُوحِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَحْتُومٌ وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ كَالْقَتْلِ.
وَالثَّانِي هُوَ إلَى خِيَارِ مُسْتَحِقِّهِ تَجِبُ بِمُطَالَبَتِهِ وَيَسْقُطُ بِعَفْوِهِ، وَإِنْ كَانَ الْجَرْحُ مِمَّا لَا قِصَاصَ فِيهِ وَجَبَتْ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ إنْ طَلَبَ بِهَا، وَتَسْقُطُ إنْ عَفَا عَنْهَا، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُهِيبًا أَوْ مُكْثِرًا لَمْ يُبَاشِرْ قَتْلًا وَلَا جَرْحًا، وَلَا أَخْذَ مَالٍ عُزِّرَ أَدَبًا وَزَجْرًا وَجَازَ حَبْسُهُ، لِأَنَّ الْحَبْسَ أَحَدُ التَّعْزِيرَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ بِهِ ذَلِكَ؛ لَا قَطْعٌ وَلَا قَتْلٌ.

চতুর্থত: তাদের মধ্যে যারা বন্দী হবে, তাদের অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে কারারুদ্ধ করা বৈধ, যদিও বিদ্রোহে লিপ্ত ব্যক্তিদের কাউকে কারারুদ্ধ করা বৈধ নয়।
পঞ্চমত: তারা যে ভূমি-কর (খারাজ) এবং সদকা আদায় করেছে, তা জবরদখল ও লুণ্ঠনকৃত সম্পদের ন্যায় বিবেচিত হবে; যা খারাজ ও সদকা প্রদানকারীদের ওপর থেকে মূল পাওনাকে রহিত করবে না। ফলে তা পুনরায় পরিশোধ করা তাদের জন্য আবশ্যক হবে। যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত নেতার কর্তৃত্ব কেবল যুদ্ধ পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাদের ওপর দণ্ডবিধি (হদ) প্রয়োগ করার বা তাদের থেকে কোনো পাওনা আদায় করার অধিকার তার থাকবে না। বরং তার দায়িত্ব হলো তাদেরকে ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধান) নিকট নিয়ে যাওয়া, যাতে তিনি তাদের ওপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ এবং পাওনা আদায়ের নির্দেশ দেন। তবে যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা এবং দণ্ডবিধি ও পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব সাধারণ বা ব্যাপক হয়, তবে অবশ্যই তাকে জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে যাতে তার প্রযুক্ত দণ্ডবিধি এবং আদায়কৃত পাওনার ক্ষেত্রে তার ফয়সালা কার্যকর হয়। এমতাবস্থায় তিনি দুটি পন্থার যেকোনো একটির মাধ্যমে তাদের অবস্থা অনুসন্ধান করবেন:
প্রথমত: প্রহার বা জবরদস্তি ছাড়াই তাদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত স্বীকারোক্তির মাধ্যমে।
দ্বিতীয়ত: যারা অস্বীকার করবে তাদের বিরুদ্ধে ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে। এই দুই পন্থার কোনো একটির মাধ্যমে যখন প্রত্যেকের কৃত অপরাধ সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে, তখন তিনি তা বিবেচনা করবেন। তাদের মধ্যে যারা হত্যা করেছে এবং সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, তিনি তাদের মৃত্যুদণ্ড দেবেন এবং হত্যার পর শূলে চড়াবেন।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন: তাকে জীবিত অবস্থায় শূলে চড়াতে হবে এবং এরপর বর্শা দিয়ে আঘাত করতে হবে যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করে। এই মৃত্যুদণ্ড অবধারিত, এতে ক্ষমা করা বৈধ নয়। যদি নিহতের উত্তরাধিকারী তাকে ক্ষমা করে দেয়, তবে সেই ক্ষমা নিরর্থক বলে গণ্য হবে। তাকে তিন দিন পর্যন্ত শূলে রাখা হবে, এর অতিরিক্ত নয়, এরপর নামিয়ে ফেলা হবে। আর যে হত্যা করেছে কিন্তু সম্পদ লুণ্ঠন করেনি, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে কিন্তু শূলে চড়ানো হবে না; তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং তার জানাযার নামায পড়া হবে।
ইমাম মালিক (রহ.) বলেন: যে ব্যক্তি তার মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কেউ তার জানাযার নামায পড়বেন। আর যে সম্পদ লুণ্ঠন করেছে কিন্তু হত্যা করেনি, তার বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে দেওয়া হবে; চুরির দায়ে তার ডান হাত এবং প্রকাশ্য দস্যুতার দায়ে তার বাম পা কাটা হবে। আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কেবল আহত করেছে কিন্তু হত্যা করেনি এবং সম্পদও লুণ্ঠন করেনি, তার থেকে জখমের প্রতিশোধ (কিসাস) নেওয়া হবে যদি অনুরূপ জখমে কিসাস গ্রহণ সম্ভব হয়। জখমের ক্ষেত্রে কিসাস কি অবধারিত? এক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে:
প্রথমটি হলো: এটি অবধারিত এবং হত্যার মতোই এতে ক্ষমা করা বৈধ নয়।
দ্বিতীয়টি হলো: এটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ইচ্ছাধীন; সে দাবি করলে তা কার্যকর করা আবশ্যক হবে এবং সে ক্ষমা করলে তা রহিত হয়ে যাবে। আর জখম যদি এমন হয় যাতে কিসাস নেওয়া যায় না, তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি দাবি করলে তার রক্তপণ (দিয়াত) প্রদান করা আবশ্যক হবে, আর সে ক্ষমা করলে তা রহিত হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে যারা কেবল ভীতি সঞ্চারকারী বা সংখ্যা বৃদ্ধিকারী ছিল কিন্তু হত্যা, জখম বা সম্পদ লুণ্ঠনে সরাসরি লিপ্ত হয়নি, তাকে শিক্ষা ও সতর্ক করার জন্য তা'যীর (বিবেচনামূলক শাস্তি) প্রদান করা হবে এবং তাকে কারারুদ্ধ করা বৈধ হবে। কেননা কারাবাস হলো তা'যীরের একটি প্রকার। তবে কেবল এই কারণে তার অঙ্গহানি বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বৈধ হবে না।

وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ فِيهِ إِلْحَاقًا بِحُكْمِ الْمُبَاشِرِينَ مَعَهُ، فَإِنْ تَابُوا عَنْ جَرَائِمِهِمْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْمَآثِمُ دُونَ الْمَظَالِمِ، وَأُخِذُوا بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ، فَإِنْ تَابُوا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُمْ مَعَ الْمَآثِمِ حُدُودُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُمْ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ قَدْ قَتَلَ فَالْخِيَارُ إِلَى الْوَلِيِّ فِي الْقِصَاصِ مِنْهُ أَوْ الْعَفْوِ عَنْهُ، وَيَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ إِحْتَامُ قَتْلِهِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ قَدْ أَخَذَ الْمَالَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْغُرْمُ إِلَّا بِالْعَفْوِ، وَيَجْرِي عَلَى الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ فِي الْأَمْصَارِ حُكْمُ قُطَّاعِهِ فِي الصَّحَارِي وَالْأَسْفَارِ، وَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِالْجَرَاءَةِ فِي الْأَمْصَارِ أَغْلَظُ جُرْمًا لَمْ يَكُونُوا أَخَفَّ حُكْمًا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَخْتَصُّونَ بِهَذَا الْحُكْمِ فِي الصَّحَارِي؛ حَيْثُ لَا يُدْرَكُ الْغَوْثُ، فَأَمَّا فِي الْأَمْصَارِ أَوْ خَارِجِهَا بِحَيْثُ يُدْرَكُ الْغَوْثُ، فَلَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْجُرْأَةِ فِي الْأَمْصَارِ، وَإِذَا ادَّعَوْا التَّوْبَةَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَقْتَرِنْ بِالدَّعْوَى أَمَارَاتٌ تَدُلُّ عَلَى التَّوْبَةِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُمْ لَهَا لِمَا فِي سُقُوطِهَا مِنْ حَدٍّ قَدْ وَجَبَ.

وَإِنْ اُقْتُرِنَ بِدَعْوَاهُمْ أَمَارَاتٌ تَدُلُّ عَلَى التَّوْبَةِ فَفِي قَبُولِهَا مِنْهُمْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَجْهَانِ مُحْتَمَلَانِ:

أَحَدُهُمَا: تُقْبَلُ لِيَكُونَ ذَلِكَ شُبْهَةً تَسْقُطُ بِهَا الْحُدُودُ.

وَالثَّانِي: لَا تُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تَشْهَدُ لَهُمْ بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهَا حُدُودٌ قَدْ وَجَبَتْ، وَالشُّبْهَةُ مَا اُقْتُرِنَتْ بِالْفِعْلِ لَا مَا تَأَخَّرَتْ عَنْهُ.

ইমাম আবু হানিফা অপরাধের মূল সহযোগীদের সংশ্লিষ্ট বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে একে বৈধ গণ্য করেছেন। তারা যদি গ্রেফতার হওয়ার পর নিজেদের অপরাধ থেকে তওবা করে, তবে তাদের পারলৌকিক গুনাহ মোচন হবে কিন্তু বান্দার হকের দায় রহিত হবে না; এবং তাদের ওপর ওয়াজিব হওয়া নির্ধারিত দণ্ড (হদ) ও পাওনা অধিকারসমূহ কার্যকর করা হবে। আর যদি তারা গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তওবা করে, তবে তাদের গুনাহর পাশাপাশি মহান আল্লাহর নির্ধারিত হদসমূহ রহিত হয়ে যাবে, কিন্তু মানুষের পাওনা অধিকারসমূহ রহিত হবে না। অতএব, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হত্যা করেছে, তার উত্তরাধিকারীর এখতিয়ার থাকবে

কিসাস গ্রহণ করা অথবা তাকে ক্ষমা করে দেওয়া; আর তওবার মাধ্যমে তাকে হত্যার আবশ্যকতা রহিত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে যে সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, তার থেকে হাত কাটার দণ্ড রহিত হবে কিন্তু ক্ষমা ব্যতীত আর্থিক ক্ষতিপূরণ রহিত হবে না। জনপদে বা শহরে অবস্থানকারী বিদ্রোহী ও ডাকাতদের ক্ষেত্রেও মরুভূমি ও সফরে থাকা ডাকাতদের মতো একই বিধান প্রযোজ্য হবে। যদিও জনপদে এ জাতীয় ধৃষ্টতা মরুভূমির তুলনায় অধিক গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য নয়, তবুও তাদের হুকুম বা বিধান লঘু হবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেন: এই বিশেষ বিধান কেবল মরুভূমির ডাকাতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে সাহায্য পৌঁছানো সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, জনপদে কিংবা জনপদের বাইরে এমন স্থানে যেখানে সাহায্য পৌঁছানো সম্ভব, সেখানে শহরকেন্দ্রিক দস্যুবৃত্তির এই কঠোর বিধান কার্যকর হবে না। তারা যখন গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তওবা করার দাবি করে, তখন যদি সেই দাবির সপক্ষে তওবা নির্দেশক কোনো আলামত বা নিদর্শন বিদ্যমান না থাকে, তবে তাদের দাবি গ্রহণ করা হবে না; কারণ এতে এমন এক নির্ধারিত দণ্ড রহিত হওয়ার বিষয় রয়েছে যা ইতিমধ্যে অবধারিত হয়ে গেছে।

আর যদি তাদের দাবির সাথে তওবা নির্দেশক আলামতসমূহ বিদ্যমান থাকে, তবে কোনো স্বতন্ত্র সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাব্য অভিমত রয়েছে:

প্রথমত: তা গ্রহণ করা হবে যাতে একে একটি ‘সন্দেহ’ হিসেবে গণ্য করা যায় যার মাধ্যমে নির্ধারিত দণ্ডসমূহ (হদ) রহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত তা গ্রহণ করা হবে না, যা সাক্ষ্য দেবে যে তারা গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তওবা করেছে। কেননা এগুলো এমন দণ্ড যা ইতিপূর্বে ওয়াজিব হয়ে গেছে; আর ‘সন্দেহ’ কেবল মূল কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়, কাজ পরবর্তী বিষয়ের ক্ষেত্রে নয়।

الباب السادس: في ولاية القضاء

مدخل

...

الباب السادس: في ولاية القضاء 1

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلَّدَ الْقَضَاءُ إِلَّا مَنْ تَكَامَلَتْ فِيهِ شُرُوطُهُ الَّتِي يَصِحُّ مَعَهَا تَقْلِيدُهُ، وَيَنْفُذُ بِهَا حُكْمُهُ، وَهِيَ سَبْعَةٌ:

فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ مِنْهَا:

أَنْ يَكُونَ رَجُلًا، وَهَذَا الشَّرْطُ يَجْمَعُ صِفَتَيْنِ: الْبُلُوغَ وَالذُّكُورِيَّةَ، فَأَمَّا الْبُلُوغُ فَإِنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ قَلَمٌ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ عَلَى نَفْسِهِ حُكْمٌ، وَكَانَ أَوْلَى أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ عَلَى غَيْرِهِ حُكْمٌ.

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلِنَقْصِ النِّسَاءِ عَنْ رُتَبِ الْوِلَايَاتِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِقَوْلِهِنَّ أَحْكَامٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَنْ تَقْضِيَ الْمَرْأَةُ فِيمَا تَصِحُّ فِيهَا شَهَادَتُهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقْضِيَ فِيمَا لَا تَصِحُّ فِيهِ شَهَادَتُهَا.

وَشَذَّ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فَجَوَّزَ قَضَاءَهَا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلٍ يَرُدُّهُ الْإِجْمَاعُ مَعَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34] .

يَعْنِي: فِي الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ، فَلَمْ يُجِزْ أَنْ يَقُمْنَ عَلَى الرِّجَالِ2.

---

1 القضاء لغة: عبارة عن اللزوم، حقيقته الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام، من أجل فصل الخصومات وقطع المنازعات.

ولقد كانت ولاية القضاء في التاريخ الإسلامي يندرج تحتها كل ما يتعلّق بالمنازعات حول الأنكحة والمواريث والأموال والعقود والفسوخ، ودعاوى التهم والعدوان، وكشف المظالم وحقوق الأيتام، والجنايات على الأنفس والأعراض والجراحات والحدود والحسبة والخرص وجباية الصدقات وصرفها، وعموم أحكام السياسات التي

يرجع إسناد القضاء فيها إلى المصلحة والعرف وأحوال السلم والحرب والمهادنة؛ وهو لذلك مصدر غني من مصادر التشريع الشوري، إلَّا أن القضاء في العصر الحديث عرف نظمًا وزعت الاختصاصات، ونوعت أساليب الممارسة، فعرف القضاء الواقف والقضاء الجالس، وتعددت مراتب التقاضي، وتميَّز القضاء الشرعي عن القضاء الوضعي، وفي كل الأحوال تناولت أحكام القضاء -قديمًا وحديثًا- قضايا سكت عنها الشرع، وبث فيها الاجتهاد البشري. [انظر: فقه الأحكام السلطانية: ص 310] .

2 المرأة هل يصح أن تلي القضاء؟ قال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح، وقال أبو حنيفة: يصح أن=

ষষ্ঠ অধ্যায়: বিচারিক কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে

ভূমিকা

...

ষষ্ঠ অধ্যায়: বিচারিক কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে ১

বিচারকের পদে এমন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে নিযুক্ত করা বৈধ নয়, যার মধ্যে এর জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি পূর্ণতা পেয়েছে; যে শর্তাবলির উপস্থিতিতেই তার নিয়োগ বৈধ হয় এবং তার রায় কার্যকর হয়। আর সেই শর্তাবলি হলো সাতটি:

তন্মধ্যে প্রথম শর্তটি হলো:

তাকে পুরুষ হতে হবে। এই শর্তটি দুটি গুণকে অন্তর্ভুক্ত করে: সাবালকত্ব এবং পুরুষত্ব। সাবালকত্বের বিষয়ে কথা হলো, যে ব্যক্তি সাবালক নয় তার ওপর শরয়ি বিধানের কলম চলে না এবং তার নিজের বিরুদ্ধে দেওয়া তার কোনো বক্তব্য আইনিভাবে ধর্তব্য নয়; সুতরাং অন্যের ওপর তার কোনো রায় কার্যকর না হওয়াটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

আর নারীর ক্ষেত্রে কথা হলো, নারীগণ নেতৃত্বের বিভিন্ন স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে (মর্যাদাগত) ঘাটতির অধিকারী, যদিও কোনো কোনো বিধানে তাদের বক্তব্য ধর্তব্য হয়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: যেসব বিষয়ে নারীর সাক্ষ্য প্রদান বৈধ, সেসব বিষয়ে সে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারবে; তবে যেসব বিষয়ে তার সাক্ষ্য বৈধ নয়, সেসব বিষয়ে সে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারবে না।

ইবনে জারীর আত-তাবারী একাকী এক ভিন্ন মত পোষণ করেছেন এবং তিনি সমস্ত বিধানেই নারীর বিচারক হওয়া বৈধ বলেছেন। তবে ইজমা (ঐক্যমত্য) দ্বারা প্রত্যাখ্যাত কোনো মতের কোনো গুরুত্ব নেই, বিশেষ করে যেখানে মহান আল্লাহর বাণী রয়েছে: {পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল, যেহেতু আল্লাহ তাদের এককে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন} [সূরা আন-নিসা: ৩৪]।

অর্থাৎ: বুদ্ধি ও সুচিন্তিত মতামতের ক্ষেত্রে। সুতরাং নারীদের জন্য পুরুষদের ওপর কর্তৃত্বশীল হওয়া বৈধ নয়।২।

---

১. শাব্দিকভাবে 'কাদা' (বিচার) অর্থ হলো অনিবার্য করা। এর প্রকৃত অর্থ হলো—বিরোধ নিষ্পত্তি ও ঝগড়া মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলকভাবে কোনো শরয়ি বিধান সম্পর্কে অবহিত করা।

ইসলামিক ইতিহাসে বিচারিক কর্তৃত্বের অধীনে বিবাহ, উত্তরাধিকার, সম্পদ, চুক্তি ও বাতিলকরণ সংক্রান্ত সকল বিরোধ, অপরাধের অভিযোগ, আগ্রাসন, জুলুম উন্মোচন, এতিমদের অধিকার রক্ষা, জীবন ও সম্মানের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ, ক্ষত ও হদ (শাস্তি), হিসবাহ (তত্ত্বাবধান), খারাছ (ফল বা শস্যের পরিমাণ নির্ধারণ), জাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন ইত্যাদি বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া রাজনীতির সাধারণ বিধানসমূহ যেখানে বিচারিক দায়িত্ব অর্পণ করা জনস্বার্থ, প্রথা এবং শান্তি, যুদ্ধ ও সন্ধিকালীন পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে, তা-ও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য এটি 'শুরা'ভিত্তিক আইন প্রণয়নের একটি সমৃদ্ধ উৎস। তবে আধুনিক যুগে বিচার ব্যবস্থার এমন সব নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে যা এখতিয়ারসমূহকে বিন্যস্ত করেছে এবং অনুশীলনের পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য এনেছে। ফলে এখন 'দণ্ডায়মান বিচার' (প্রসিকিউশন) এবং 'উপবিষ্ট বিচার' (বেঞ্চ) ব্যবস্থার পরিচয় ঘটেছে, বিচারিক ধাপসমূহ বহুগুণ হয়েছে এবং শরয়ি বিচার ব্যবস্থা মানব রচিত বিচার ব্যবস্থা থেকে পৃথক হয়েছে। সব অবস্থাতেই বিচারিক বিধানসমূহ—প্রাচীন ও আধুনিক উভয় ক্ষেত্রেই—এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে যে ব্যাপারে শরিয়ত নীরব ছিল এবং মানুষের ইজতিহাদ (গবেষণা) সে ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছে। [দ্রষ্টব্য: ফিকহুল আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৩১০]।

২. নারীর জন্য কি বিচারিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়া বৈধ? ইমাম মালিক, শাফিঈ এবং আহমাদ বলেছেন: তা বৈধ নয়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: বৈধ যে=

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى اعْتِبَارِهِ، وَلَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالْعَقْلِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّكْلِيفُ مِنْ عِلْمِهِ بِالْمُدْرَكَاتِ الضَّرُورِيَّةِ، حَتَّى يَكُونَ صَحِيحَ التَّمْيِيزِ، جَيِّدَ الْفَطِنَةِ، بَعِيدًا عَنِ السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ، يَتَوَصَّلُ بِذَكَائِهِ إِلَى إِيضَاحِ مَا أَشْكَلَ وَفَصْلَ مَا أَعْضَلَ.

وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْحُرِّيَّةُ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الْعَبْدِ عَنْ وِلَايَةِ نَفْسِهِ يَمْنَعُ مِنِ انْعِقَادِ وِلَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّ الرِّقَّ لَمَّا مَنَعَ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ كَانَ أَوْلَى أَنْ يَمْنَعَ مِنْ نُفُوذِ الْحُكْمِ وَانْعِقَادِ الْوِلَايَةِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَنْ لَمْ تَكْمُلْ حُرِّيَّتُهُ مِنَ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ، وَمَنْ رُقَّ بَعْضُهُ، وَلَا يَمْنَعُهُ الرِّقُّ أَنْ يُفْتِيَ، كَمَا لَا يَمْنَعُهُ الرِّقُّ أَنْ يَرْوِيَ بِعَدَمِ الْوِلَايَةِ فِي الْفَتْوَى وَالرِّوَايَةِ.

وَيَجُوزُ لَهُ إِذَا عَتَقَ أَنْ يَقْضِيَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَلَاءٌ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي وِلَايَةِ الْحُكْمِ.

وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْإِسْلَامُ لِكَوْنِهِ شَرْطًا فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ مَعَ قَوْلِ اللَّهِ سبحانه وتعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] .

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلَّدَ الْكَافِرُ الْقَضَاءَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا عَلَى الْكُفَّارِ.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ الْقَضَاءَ بَيْنَ أَهْلِ دِينِهِ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ عُرْفُ الْوُلَاةِ بِتَقْلِيدِهِ جَارِيًا فَهُوَ تَقْلِيدُ زَعَامَةٍ وَرِئَاسَةٍ، وَلَيْسَ بِتَقْلِيدِ حُكْمٍ وَقَضَاءٍ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ لِالْتِزَامِهِمْ لَهُ لَا لُزُومِهِ لَهُمْ، وَلَا يَقْبَلُ الْإِمَامُ قَوْلَهُ فِيمَا حَكَمَ بِهِ بَيْنَهُمْ.

وَإِذَا امْتَنَعُوا مِنْ تَحَاكُمِهِمْ إِلَيْهِ لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ، وَكَانَ حُكْمُ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ أَنْفَذَ.

= تكون قاضية في كل شيء تقبل فيه شهادة النساء، وعنده أنَّ شهاة النساء تقبل في كل شيء إلّا في الحدود والجِرَاح، فهي عنده تقضي في كل شيء إلّا في الحدود

والجراح. وقال ابن جرير الطبري: يصح أن تكون قاضية في كل شيء. [جوهر العقود: 2/ 290] .

وروى ابن أبي مريم عن أبي القاسم جواز ولاية المرأة. قال ابن عرفة: قال ابن زرقون: أظنه فيما تجوز فيه شهادتها. قال ابن عبد السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقًا. قلت: الأظهر قول ابن زرقون؛ لأن ابن عبد السلام قال في الرد على من شذَّ مِنَ المتكلمين وقال: الفسق لا ينافي القضاء ما نصه: وهذا ضعيف جدًّا؛ لأن العدالة شرط في قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها.

قلت: فجعل ما هو منافٍ الشهادة منافٍ للقضاء، وأن النكاح والطلاق والعتق والحدود لا تقبل فيها شهادتها، فكذلك لا يصح فيها قضاؤها، انتهى. [مواهب الجليل: 6/ 88] .

দ্বিতীয় শর্ত: যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সর্বসম্মত। এক্ষেত্রে কেবল সেই বিবেক বা বুদ্ধিমত্তা যথেষ্ট নয় যার ওপর শারঈ দায়বদ্ধতা (তাকলিফ) বর্তায় অর্থাৎ যার দ্বারা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ অনুধাবন করা যায়; বরং তাকে হতে হবে প্রখর বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, তুখোড় মেধাবী এবং বিস্মৃতি ও গাফিলতি থেকে মুক্ত। যাতে সে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অস্পষ্ট বিষয়সমূহকে স্পষ্ট করতে পারে এবং জটিল সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

তৃতীয় শর্ত: আযাদ বা স্বাধীন হওয়া; কারণ নিজের ওপর কর্তৃত্বের অভাব অন্য কারো ওপর কর্তৃত্ব লাভে বাধা প্রদান করে। আর যেহেতু দাসত্ব সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা নাকচ করে দেয়, তাই বিচারকার্য পরিচালনা ও কর্তৃত্ব লাভের ক্ষেত্রে অন্তরায় হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

অনুরূপভাবে যার স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ—যেমন মুদাব্বার, মুকাতাব এবং আংশিক আযাদ দাসের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। তবে দাসত্ব তাকে ফতোয়া দিতে বাধা দেয় না, যেমনিভাবে রেওয়ায়েত বা হাদিস বর্ণনা করতেও বাধা দেয় না; কারণ ফতোয়া ও রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের (বিলায়াহ) শর্ত নেই।

সে আযাদ হওয়ার পর বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে পারবে, যদিও তার ওপর 'ওয়ালা' (প্রাক্তন মনিবের সাথে সম্পর্ক) বিদ্যমান থাকে; কারণ বিচারকার্যের কর্তৃত্বে বংশপরিচয় ধর্তব্য নয়।

চতুর্থ শর্ত: ইসলাম; কারণ এটি সাক্ষ্য প্রদানের বৈধতার জন্য একটি শর্ত, আর মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {আর আল্লাহ কখনোই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না} [আন-নিসা: ১৪১]।

কোনো কাফিরকে মুসলিমদের ওপর বিচারক নিযুক্ত করা জায়েজ নয় এবং কাফিরদের ওপরও নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেন: স্বীয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তাকে বিচারক নিযুক্ত করা জায়েজ। শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে তাকে নিযুক্ত করার যে প্রচলন রয়েছে, তা মূলত নেতৃত্ব ও প্রাধান্যমূলক নিযুক্তি, তা বিচারবিভাগীয় ফয়সালা বা বিচারকের নিযুক্তি নয়। তাদের ওপর তার নির্দেশ কার্যকর হয় কেবল তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকারের কারণে, বিচারক হিসেবে তার নির্দেশের নিজস্ব কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে নয়। আর তাদের মধ্যে সে যে ফয়সালা করবে, সে ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান তার কথা গ্রহণ করবেন না।

তারা যদি তার কাছে বিচার নিয়ে যেতে অস্বীকার করে, তবে তাদের বাধ্য করা হবে না। বরং তাদের ওপর ইসলামের বিধানই অধিক কার্যকর হবে।

= নারীরা সেই সমস্ত বিষয়ে বিচারক হতে পারে যেগুলোতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে হুদুদ ও জখম সংক্রান্ত বিষয় ব্যতিরেকে অন্য সব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, তাই এ দুটি ক্ষেত্র বাদে বাকি সব বিষয়ে সে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারে। ইবনে জারির তাবারী বলেন: সব বিষয়েই নারীর বিচারক হওয়া শুদ্ধ। [জাওয়াহিরুল উকুদ: ২/২৯০]।

ইবনে আবি মারইয়াম আবুল কাসিম থেকে নারীর ক্ষমতা লাভের বৈধতা বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আরফাহ বলেন, ইবনে যারকুন বলেছেন: আমার ধারণা এটি কেবল ঐ সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে যেখানে তার সাক্ষ্য বৈধ। ইবনে আব্দুস সালাম বলেন: এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, কারণ হতে পারে ইবনে কাসিম হাসান ও তাবারীর মতই নিঃশর্তভাবে বিচারকার্য পরিচালনার বৈধতার কথা বলেছেন। আমি বলি: ইবনে যারকুনের বক্তব্যই অধিক স্পষ্ট; কারণ ইবনে আব্দুস সালাম সেই সমস্ত মানুষের খণ্ডন করতে গিয়ে যারা মনে করে ফাসেক ব্যক্তিও বিচারক

হতে পারে, বলেছেন: এটি অত্যন্ত দুর্বল মত; কারণ সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা শর্ত, আর বিচারকার্য পরিচালনার মর্যাদা সাক্ষ্য প্রদানের চেয়েও অনেক বেশি।
আমি বলি: যা সাক্ষ্যের পরিপন্থী তা বিচারকার্যেরও পরিপন্থী। যেহেতু বিবাহ, তালাক, দাসমুক্তি এবং হুদুদের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, তাই এই বিষয়গুলোতে তার বিচারিক ফয়সালাও শুদ্ধ হবে না। সমাপ্ত। [মাওয়াহিবুল জলীল: ৬/৮৮]।

(ص: 112)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ: الْعَدَالَةُ، وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ، وَالْعَدَالَةُ أَنْ يَكُونَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ ظَاهِرَ الْأَمَانَةِ، عَفِيفًا عَنِ الْمَحَارِمِ، مُتَوَقِّيًا الْمَآثِمَ، بَعِيدًا مِنَ الرَّيْبِ، مَأْمُونًا فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، مُسْتَعْمِلًا لِمُرُوءَةِ مِثْلِهِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ فَهِيَ الْعَدَالَةُ الَّتِي تَجُوزُ بِهَا شَهَادَتُهُ، وَتَصِحُّ مَعَهَا وِلَايَتُهُ، وَإِنْ انْخَرَمَ مِنْهَا وَصْفٌ مُنِعَ مِنَ الشَّهَادَةِ وَالْوِلَايَةِ، فَلَمْ يُسْمَعْ لَهُ قَوْلٌ وَلَمْ يَنْفُذْ لَهُ حُكْمٌ.

وَالشَّرْطُ السَّادِسُ: السَّلَامَةُ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ؛ لِيَصِحَّ بِهِمَا إِثْبَاتُ الْحُقُوقِ، وَيُفَرِّقَ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، وَيُمَيِّزَ الْمُقِرَّ مِنَ الْمُنْكِرِ؛ لِيَتَمَيَّزَ لَهُ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ، وَيَعْرِفَ الْمُحِقَّ مِنَ الْمُبْطِلِ، فَإِنْ كَانَ ضَرِيرًا كَانَتْ وِلَايَتُهُ بَاطِلَةً، وَجَوَّزَهَا مَالِكٌ كَمَا جَوَّزَ شَهَادَتَهُ، وَإِنْ كَانَ أَصَمَّ فَعَلَى الِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَمَانَةِ؛ فَأَمَّا سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ فَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَبَرَةً فِي الْإِمَامَةِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ وَإِنْ كَانَ مُقْعَدًا ذَا زَمَانَةٍ، وَإِنْ كَانَتِ السَّلَامَةُ مِنَ الْآفَاتِ أَهْيَبَ لِذَوِي الْوِلَايَةِ.

وَالشَّرْطُ السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَعِلْمُهُ بِهَا يَشْتَمِلُ عَلَى عِلْمِ أُصُولِهَا وَالِارْتِيَاضِ بِفُرُوعِهَا.

وَأُصُولُ الْأَحْكَامِ فِي الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَا: عِلْمُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَصِحُّ بِهِ مَعْرِفَةُ مَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ نَاسِخًا وَمَنْسُوخًا، وَمُحْكَمًا وَمُتَشَابِهًا، وَعُمُومًا وَخُصُوصًا، وَمُجْمَلًا وَمُفَسَّرًا.
وَالثَّانِي: عِلْمُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الثَّابِتَةِ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَطُرُقِ مَجِيئِهَا فِي التَّوَاتُرِ وَالْآحَادِ وَالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ، وَمَا كَانَ عَنْ سَبَبٍ أَوْ إِطْلَاقٍ.
وَالثَّالِثُ: عِلْمُهُ بِتَأْوِيلِ السَّلَفِ فِيمَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ؛ لِيَتْبَعَ الْإِجْمَاعَ وَيَجْتَهِدَ بِرَأْيِهِ فِي الِاخْتِلَافِ.
وَالرَّابِعُ: عِلْمُهُ بِالْقِيَاسِ1 الْمُوجِبِ لِرَدِّ الْفُرُوعِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا إِلَى الْأُصُولِ الْمَنْطُوقِ

---

1 واعلم أَنَّ القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه، بمعنى يجمع بينهما، وقال بعض أصحابنا القياس هو: الأمارة على الحكم، وقال بعض الناس: هو فعل القائس، وقال بعضهم: القياس هو =

পঞ্চম শর্ত: ন্যায়পরায়ণতা; যা প্রতিটি কর্তৃত্বের বা শাসনভারের ক্ষেত্রেই বিবেচিত। ন্যায়পরায়ণতা হলো—সে হবে সত্যভাষী, প্রকাশ্য আমানতদারিতার অধিকারী, হারাম কার্যাবলি থেকে পবিত্র, পাপাচার থেকে সতর্ক, সন্দেহাতীত, সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় নির্ভরযোগ্য এবং স্বীয় দীন ও দুনিয়ার বিষয়ে সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের ন্যায় গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা। যখন তার মধ্যে এসব গুণের পূর্ণতা ঘটবে, তখন তা-ই হবে সেই ন্যায়পরায়ণতা যার মাধ্যমে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় এবং তার কর্তৃত্ব বৈধ হয়। আর যদি এর কোনো একটি গুণও লোপ পায়, তবে সে সাক্ষ্য ও কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবে; ফলে তার কোনো কথা শোনা হবে না এবং তার কোনো নির্দেশ কার্যকর হবে না।

ষষ্ঠ শর্ত: শ্রবণ ও দর্শনশক্তির সুস্থতা; যেন এ দুটির মাধ্যমে অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করা বৈধ হয় এবং বিবাদী ও ফরিয়াদীর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়, আর স্বীকারকারী ও অস্বীকারকারীকে পৃথকভাবে চেনা যায়; যাতে তার নিকট সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট হয় এবং সে সত্যপন্থী ও মিথ্যাবাদীকে চিনতে পারে। সুতরাং সে যদি দৃষ্টিহীন হয়, তবে তার কর্তৃত্ব বাতিল বলে গণ্য হবে; যদিও ইমাম মালিক একে বৈধ মনে করেছেন যেমন তিনি তার সাক্ষ্য প্রদানকেও বৈধ বলেছেন। আর যদি সে বধির হয়, তবে সে ক্ষেত্রে আমানতদারিতার বিষয়ে উল্লিখিত

মতপার্থক্য বিদ্যমান থাকবে। তবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুস্থতা বিচারকের ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়, যদিও তা ইমামতের (রাষ্ট্রপ্রধানের পদের) ক্ষেত্রে অপরিহার্য। সুতরাং পঙ্গু বা দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারেন, যদিও যাবতীয় ত্রুটি ও ব্যাধিমুক্ত হওয়া শাসনকর্তাদের জন্য অধিকতর প্রভাব ও মর্যাদাপূর্ণ।

সপ্তম শর্ত: শরয়ি বিধানাবলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা; আর এই জ্ঞানের পরিধিতে বিধানের মূলনীতিসমূহ এবং এর শাখা-প্রশাখার প্রয়োগপদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

শরিয়তে বিধানের মূল উৎস চারটি:

প্রথমত: মহান আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে এমন স্তরের জ্ঞান রাখা, যার মাধ্যমে তার অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলি যেমন—নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসুখ (রহিত), মুহকাম (সুস্পষ্ট) ও মুতাশাবিহ (রূপক/অস্পষ্ট), আম (সাধারণ) ও খাস (বিশেষ) এবং মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) ও মুফাসসার (বিস্তারিত) সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায়।

দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রমাণিত সুন্নাহ অর্থাৎ তাঁর বাণী ও কর্মসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা এবং সেগুলোর প্রাপ্তির মাধ্যম যেমন—মুতাওয়াতির ও আহাদ, বিশুদ্ধতা ও ত্রুটিপূর্ণতা এবং যা কোনো বিশেষ কারণবশত বা সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া।

তৃতীয়ত: সালাফদের ব্যাখ্যার বিষয়ে জ্ঞান রাখা—তাঁরা যে সকল বিষয়ে একমত হয়েছেন এবং যে সকল বিষয়ে মতভেদ করেছেন; যেন সে ক্ষেত্রে ঐকমত্য অনুসরণ করা যায় এবং মতভেদের ক্ষেত্রে নিজ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে ইজতিহাদ করা যায়।

চতুর্থত: কিয়াস বা সাদৃশ্য বিধান সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, যা এমন উহ্য শাখা-প্রশাখাগুলোকে মূল উদ্ধৃতিতে পর্যবসিত করা আবশ্যক করে...

---

১. জেনে রাখুন যে, কিয়াস হলো কোনো একটি শাখাকে তার কোনো একটি বিধানের ক্ষেত্রে মূলের ওপর আরোপ করা এমন একটি অর্থের ভিত্তিতে যা উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। আমাদের কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন: কিয়াস হলো বিধানের একটি নিদর্শন। আবার কেউ কেউ বলেছেন: এটি কিয়াসকারীর একটি কাজ। আবার কারো কারো মতে কিয়াস হলো =

بِهَا وَالْمُجْمَعِ عَلَيْهَا، حَتَّى يَجِدَ طَرِيقًا إِلَى الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ النَّوَازِلِ، وَتَمْيِيزِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ، فَإِذَا أَحَاطَ عِلْمُهُ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ صَارَ بِهَا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِي الدِّينِ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ وَيَقْضِيَ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ وَيَسْتَقْضِيَ، وَإِنْ أَخَلَّ بِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهَا خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْتِيَ وَلَا أَنْ يَقْضِيَ.

فَإِنْ قُلِّدَ الْقَضَاءَ فَحَكَمَ بِالصَّوَابِ أَوِ الْخَطَإِ كَانَ تَقْلِيدُهُ بَاطِلًا وَحُكْمُهُ وَإِنْ وَافَقَ الْحَقَّ وَالصَّوَابَ مَرْدُودًا، وَتَوَجَّهَ الْحَرَجُ فِيمَا قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ قَلَّدَهُ الْحُكْمَ وَالْقَضَاءَ.

وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ تَقْلِيدَ الْقَضَاءِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ لِيَسْتَفْتِيَ فِي أَحْكَامِهِ وَقَضَايَاهُ، وَالَّذِي

= اجتهاد، والصحيح هو الأول؛ لأنه يطَّرِدُ وينعكس، ألا ترى أنه يوجد بوجوده القياس، وبعدمه يُعْدَم القياس، فدلَّ على صحته، فأمَّا الأمارة فلا تطَّرِد، ألا ترى أنَّ زوال الشمس أمارة على دخول الوقت وليس بقياس؟ وفعل القائس أيضًا لا معنى له؛ لأنه لو كان ذلك صحيحًا لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس من المشي والقعود قياسًا، وهذا لا يقوله أحد، فبطل تحديده بذلك، وأمَّا الاجتهاد فهو أعمّ من القياس؛ لأنَّ الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم، وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيد، وترتيب العام على الوجوه التي يطلب منها الحكم، وشيء من ذلك ليس بقياس، فلا معنى لتحديد القياس به.

والقياس حجّة في إثبات الأحكام العقلية وطريق من طرقها، وذلك مثل حدوث العالم وإثبات الصانع وغير ذلك، ومن الناس من أنكر ذلك، والدليل على فساد قوله: إن إثبات هذه الأحكام لا يخلو إمَّا أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال،

والقياس لا يجوز أن يكون بالضرورة؛ لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيها، فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب، وكذلك هو حجة في الشرعيات، وطريق لمعرفة الأحكام، ودليل من أدلتها من جهة الشرع، وقال أبو بكر الدقاق: هو طريق من طرقها يجب العمل به من جهة العقل والشرع، وذهب النظام والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية، ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل.

وقال داود وأهل الظاهر: يجوز أن يرد التعبّد به من جهة العقل، إلَّا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه، والدليل على أنَّه لا يجب العمل به من جهة العقل أنَّ تعليق تحريم التفاضل على الكيل أو الطعم في العقل ليس بأولى من تعليق التحليل عليهما، ولهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلًا عن الآخر، وإذا استوى الأمر أنَّ في التجويز يبطل أن يكون العقل موجبًا لذلك، وأمَّا الدليل على جواز ورود التعبّد به من جهة العقل هو أنه إذا جاز أن يحكم في الشيء بحكمٍ لعلة منصوص عليها جاز أن يحكم فيه منصوص عليها، وينصب عليها دليلًا يتوصّل به إليها، ألا ترى أنَّه لمَّا جاز أن يؤمر من عاين القبلة بالتوجُّه إليها جاز أيضًا أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصَّل بالدليل إليها، وأما الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل به فإجماع الصحابة. [اللمع في أصول الفقه: ص 96] .

সেগুলোর মাধ্যমে এবং সর্বসম্মত বিষয়াবলি সম্পর্কে, যাতে তিনি সমসাময়িক উদ্ভূত সমস্যাবলির বিধান জানার এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার পথ খুঁজে পান। যখন তিনি শরীয়তের বিধানাবলির এই চারটি মূলনীতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করবেন, তখন তিনি দ্বীনের ব্যাপারে ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন বলে বিবেচিত হবেন। এমতাবস্থায় তার জন্য ফতোয়া প্রদান করা ও বিচারকার্য পরিচালনা করা বৈধ হবে, এবং অন্যদের জন্যও তার নিকট ফতোয়া চাওয়া ও বিচার প্রার্থনা করা জায়েজ হবে। আর যদি তিনি এই মূলনীতিসমূহ বা এর কোনো একটির ব্যাপারে ত্রুটি করেন, তবে তিনি ইজতিহাদ করার যোগ্যতা হারাবেন। সেক্ষেত্রে তার জন্য ফতোয়া দেওয়া বা বিচার করা বৈধ হবে না।

যদি তাকে বিচারকের পদে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং তিনি নির্ভুল বা ভুল কোনো রায় প্রদান করেন, তবে তার সেই নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার রায়—তা সত্য ও সঠিকের অনুকূলে হলেও—প্রত্যাখ্যাত হবে। আর এই বিচারের দায়ভার তার নিজের উপর এবং তাকে বিচারকার্য ও বিচারকের পদে নিযুক্তকারীর উপর বর্তাবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এমন ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া বৈধ বলেছেন, যিনি ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন নন, যাতে তিনি তার বিচারিক কার্যক্রম ও মামলা-মোকাদ্দমায় ফতোয়া গ্রহণ করতে পারেন। আর যা...

= ইজতিহাদ; আর সঠিক হলো প্রথম মতটি; কারণ এটি একটি সুসংগত ও বিপরীতমুখীভাবেও প্রযোজ্য মূলনীতি। আপনি কি দেখেন না যে, এটি বিদ্যমান থাকলে কিয়াস বিদ্যমান থাকে এবং এর অনুপস্থিতিতে কিয়াসও বিলুপ্ত হয়? এটি এর সঠিকতার প্রমাণ। পক্ষান্তরে 'চিহ্ন' বা 'আলামত' সুসংগত নয়; আপনি কি দেখেন না যে, সূর্যের ঢলে পড়া ওয়াক্ত প্রবেশের একটি আলামত, কিন্তু এটি কিয়াস নয়? অনুরূপভাবে কিয়াসকারীর কাজেরও কোনো অর্থ নেই; কারণ এটি সঠিক হলে কিয়াসকারীর হাঁটাচলা ও উঠাবসা—সবই কিয়াস হিসেবে গণ্য হওয়া ওয়াজিব হতো, যা কেউ বলে না। সুতরাং এর মাধ্যমে কিয়াসের সংজ্ঞা প্রদান বাতিল হয়ে গেল। আর ইজতিহাদ কিয়াসের চেয়ে ব্যাপকতর; কারণ ইজতিহাদ হলো বিধান অন্বেষণে পূর্ণ সামর্থ্য ব্যয় করা, যার মধ্যে মুতলাককে (সাধারণ) মুকাইয়্যাদ (শর্তযুক্ত) করা এবং আমকে (ব্যাপক) যে পদ্ধতিতে বিধান তালাশ করা হয় সে অনুযায়ী বিন্যস্ত করা অন্তর্ভুক্ত। এর কোনোটিই কিয়াস নয়; সুতরাং এর মাধ্যমে কিয়াসের সংজ্ঞা দেওয়ার কোনো মানে হয় না। কিয়াস আকলী (যৌক্তিক) বিধান প্রমাণের ক্ষেত্রে একটি হুজ্জাত বা দলিল এবং এর অন্যতম একটি পদ্ধতি; যেমন জগতের সৃষ্টি এবং এর একজন স্রষ্টা থাকার প্রমাণ ইত্যাদি। কিছু মানুষ এটি অস্বীকার করেছেন। তাদের মতের অসারতার প্রমাণ হলো: এই বিধানসমূহের প্রমাণ হয় আবশ্যিক হবে অথবা দলিল নির্ভর হবে। আর কিয়াস আবশ্যিক হতে পারে না; কারণ তা হলে এ বিষয়ে বুদ্ধিমানদের মধ্যে কোনো মতভেদ থাকত না। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এর প্রমাণ কিয়াস ও অদৃশ্যের ওপর দৃশ্যের প্রমাণের মাধ্যমে হয়। একইভাবে শরয়ী বিষয়েও এটি হুজ্জাত এবং আহকাম বা বিধান জানার পথ, এবং শরীয়তের অন্যতম দলিল। আবু বকর আদ-দাক্কাক বলেন: এটি বিধান লাভের এমন একটি পথ যার ওপর আমল করা বিবেক ও শরীয়ত উভয় দিক থেকেই ওয়াজিব। অন্যদিকে নাজ্জাম, শিয়া এবং বাগদাদী মুতাজিলাদের কেউ

কেউ মনে করেন এটি শরয়ী বিধানের পথ নয় এবং বিবেকের বিচারে এর দ্বারা ইবাদত সাব্যস্ত হওয়া জায়েজ নয়।
দাউদ এবং আহলে জাহেরগণ বলেন: বিবেকের বিচারে এর দ্বারা ইবাদত সাব্যস্ত হওয়া জায়েজ, তবে শরীয়ত একে নিষিদ্ধ করেছে। বিবেকের দিক থেকে এর ওপর আমল করা ওয়াজিব না হওয়ার দলিল হলো: বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী মালের আধিক্য বা স্বাদের ওপর হারাম হওয়াকে সংশ্লিষ্ট করা, হালাল হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট করার চেয়ে অধিক যুক্তিযুক্ত নয়। এই কারণেই শরীয়ত একটি বিধানের পরিবর্তে অপরটি প্রদান করতে পারে। যখন বিষয়টি অনুমানের ক্ষেত্রে সমান হয়ে যায়, তখন বিবেক একে অবধারিত করে না। আর বিবেকের পক্ষ থেকে এর দ্বারা ইবাদত সাব্যস্ত হওয়ার বৈধতার দলিল হলো: যখন কোনো দলিলে বর্ণিত ইল্লত বা কারণের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে বিধান দেওয়া জায়েজ হয়, তখন এমন বিষয়েও বিধান দেওয়া জায়েজ হবে যেখানে দলিল স্পষ্ট নয় এবং সেখানে এমন দলিল স্থাপন করা হবে যার মাধ্যমে বিধানটি পাওয়া যায়। আপনি কি দেখেন না যে, যখন কোনো ব্যক্তি কাবা শরীফ দেখতে পায় তাকে সেদিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া যেমন জায়েজ, তেমনই যে ব্যক্তি কাবা থেকে দূরে আছে তাকেও দলিলের মাধ্যমে সেদিকে অভিমুখী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া জায়েজ। আর শরীয়তের পক্ষ থেকে কিয়াসের প্রমাণ এবং এর ওপর আমল করা ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো সাহাবায়ে কেরামের ইজমা। [আল-লুমআ ফি উসূলিল ফিকহ: পৃষ্ঠা ৯৬] ।

(ص: 114)الأحكام السلطانية للماوردي

عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ وِلَايَتَهُ بَاطِلَةٌ وَأَحْكَامَهُ مَرْدُودَةٌ؛ وَلِأَنَّ التَّقْلِيدَ فِي فُرُوعِ الشَّرْعِ ضَرُورَةٌ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ إِلَّا فِي مُلْتَزِمِ الْحَقِّ دُونَ مُلْزِمِهِ.
قَدْ اخْتَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَالِيًا وَقَالَ: "بِمَ تَحْكُمُ؟ " قَالَ: بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ " قَالَ: بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: "فَإِنْ

لَمْ تَجِدْ؟ " قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ"1.

فَأَمَّا وِلَايَةُ مَنْ لَا يَقُولُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ2 فَغَيْرُ جَائِزَةٍ؛ لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِأَصْلٍ قَدْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، وَأَكْثَرُ أَحْكَامِ الشَّرْعِ عَنْهُ مَأْخُوذَةٌ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا يَقُولُ بِحُجَّةِ الْإِجْمَاعِ الَّذِي لَا تَجُوزُ وِلَايَتُهُ لِرَدِّ مَا وَرَدَ النَّصُّ بِهِ.

وَأَمَّا نُفَاةُ الْقِيَاسِ فَضَرْبَانِ:

ضَرْبٌ مِنْهُمْ نَفَوْهُ وَاتَّبَعُوا ظَاهِرَ النَّصِّ، وَأَخَذُوا بِأَقَاوِيلِ سَلَفِهِمْ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ، وَطَرَحُوا الِاجْتِهَادَ وَعَدَلُوا عَنِ الْفِكْرِ وَالِاسْتِنْبَاطِ، فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمُ الْقَضَاءَ لِقُصُورِهِمْ عَنْ طَرَفِ الْأَحْكَامِ.

وَضَرْبٌ مِنْهُمْ نَفَوُا الْقِيَاسَ وَاجْتَهَدُوا فِي الْأَحْكَامِ تَعَلُّقًا بِفَحْوَى الْكَلَامِ وَمَفْهُومِ الْخِطَابِ كَأَهْلِ الظَّاهِرِ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي جَوَازِ تَقْلِيدِهِمُ الْقَضَاءَ عَلَى

---

1 ضعيف: رواه أبو داود في كتاب الأقضية "3592"، والترمذي في كتاب الأحكام "1327"، والدارمي في المقدمة "168"، وأحمد "21502"، وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة "881": منكر.

2 خبر الواحد لغةً: ما يرويه شخص واحد، واصطلاحًا: ما لم يجمع شروط التواتر، والخبر: لفظ مجرَّد عن العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظًا نحو: زيد قائم، أو تقديرًا نحو: أقائم زيد. خبر كان وأخواتها هو المسند بعد دخول هذه الحروف. [التعاريف: ص 306] .

قال الفيروزآبادي: يقبل خبر الواحد وإن كان مخالفًا للقياس ويقدم عليه، وقال أصحاب مالك: إذا كان مخالفًا للقياس لم يقدّم. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان مخالفًا لقياس الأصول لم يقبل.

[التبصرة: ص 317] .

অধিকাংশ ফকিহগণের মতে তার কর্তৃত্ব বাতিল এবং তার সিদ্ধান্তসমূহ প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কারণ, শরিয়তের শাখা-প্রশাখায় তাকলিদ বা অনুসরণ হলো একটি আবশ্যকতা, যা কেবল সত্যের অনুসারীদের ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়, সত্য চাপিয়ে দেওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়।
রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুয়াজ (রা.)-কে যখন ইয়ামেনে গভর্নর হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাকে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কিসের মাধ্যমে বিচার করবে?" তিনি বললেন: "আল্লাহর কিতাব দিয়ে।" রাসুল (সা.) বললেন: "যদি না পাও?" তিনি বললেন: "রাসুলুল্লাহর সুন্নাহ দিয়ে।" রাসুল (সা.) বললেন: "যদি সেখানেও না পাও?" তিনি বললেন: "আমি আমার বিচারবুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ করব।" তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আল্লাহর রাসুলের প্রতিনিধিকে এমন বিষয়ের তাওফিক দিয়েছেন যা তাঁর রাসুলকে সন্তুষ্ট করে।"১।
আর যারা খবরে ওয়াহিদ (একক বর্ণনা) স্বীকার করে না, তাদের কর্তৃত্ব বৈধ নয়; কারণ তারা এমন একটি মূলনীতি বর্জনকারী যার ওপর সাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন এবং শরিয়তের অধিকাংশ বিধানই তা থেকে গৃহীত হয়েছে। ফলে তারা এমন ব্যক্তির সমতুল্য হলো যে ইজমার (ঐক্যমত) প্রামাণ্যতা স্বীকার করে না, নস (স্পষ্ট পাঠ) দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করার কারণে যার কর্তৃত্ব বৈধ নয়।
আর কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক অনুমান) অস্বীকারকারীরা দুই প্রকার:
এক প্রকার হলো তারা, যারা কিয়াস অস্বীকার করে এবং নসের বাহ্যিক অর্থের অনুসরণ করে। যে বিষয়ে নস নেই, সে ক্ষেত্রে তারা তাদের পূর্বসূরিদের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে। তারা ইজতিহাদ বর্জন করেছে এবং চিন্তা ও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত থেকে বিমুখ হয়েছে। বিধানে তাদের অদক্ষতার কারণে তাদেরকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া জায়েজ নয়।
অন্য প্রকার হলো তারা, যারা কিয়াস অস্বীকার করলেও বক্তব্যের গভীর অর্থ এবং ভাষ্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভিত্তিতে বিধান নির্ণয়ে ইজতিহাদ করে থাকে, যেমন আহলে জাহিরগণ। তাদের বিচারক পদে নিয়োগের বৈধতার বিষয়ে ইমাম শাফিয়ী (রা.)-এর অনুসারীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে

---

১ দুর্বল: এটি আবু দাউদ 'বিচার' অধ্যায় (৩৫৯২), তিরমিজি 'বিধান' অধ্যায় (১৩২৭), দারেমি 'ভূমিকা' (১৬৮) এবং আহমাদ (২১৫০২) বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানি 'সিলসিলাতুল আহাদিস আদ-দায়িফাহ' (৮৮১) গ্রন্থে একে 'মুনকার' বলেছেন।
২ খবরে ওয়াহিদ আভিধানিকভাবে: যা একজন ব্যক্তি বর্ণনা করে। পরিভাষায়: যাতে মুতাওয়াতির হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যায় না। আর 'খবর' হলো: শাব্দিক কারকসমূহ থেকে মুক্ত এমন শব্দ যা তার পূর্ববর্তী পদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়; যেমন: জায়েদ দণ্ডায়মান। অথবা উহ্যভাবে, যেমন: জায়েদ কি দণ্ডায়মান? কানা ও এর সমজাতীয় শব্দাবলির 'খবর' হলো এই অব্যয়গুলো প্রবেশের পর যা প্রেডিকেট বা বিধেয় হিসেবে আসে। [আত-তারিফাত: পৃষ্ঠা ৩০৬]।
ফিরোজাবাদি বলেন: খবরে ওয়াহিদ কিয়াসের পরিপন্থী হলেও তা গ্রহণযোগ্য এবং কিয়াসের ওপর একে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইমাম মালিকের অনুসারীগণ বলেন: কিয়াসের পরিপন্থী হলে একে প্রাধান্য দেওয়া হবে না। আবু হানিফার অনুসারীগণ বলেন: এটি যদি মৌলিক উসুলের পরিপন্থী হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।
[আত-তাবসিরাহ: পৃষ্ঠা ৩১৭]।

(ص: 115)الأحكام السلطانية للماوردي

وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ.
وَالثَّانِي: يَجُوزُ لِأَنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَهُ وَاضِحَ الْمَعَانِي وَإِنْ عَدَلُوا عَنْ خَفِيِّ الْقِيَاسِ، فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَلَّى إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِاجْتِمَاعِهَا فِيهِ؛ إِمَّا بِتَقَدُّمِ مَعْرِفَةٍ، وَإِمَّا بِاخْتِبَارٍ وَمَسْأَلَةٍ.
قَدْ قَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا عليه السلام قَضَاءَ الْيَمَنِ، وَلَمْ يَخْتَبِرْهُ لِعِلْمِهِ بِهِ، وَلَكِنَّهُ وَصَّاهُ تَنْبِيهًا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ فَقَالَ:

"إِذَا حَضَرَ خَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلَا تَقْضِ لِأَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ" 1.
فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: فَمَا أَشْكَلَتْ عَلَيَّ قَضِيَّةٌ بَعْدَهَا، وَبَعَثَ مُعَاذًا إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْيَمَنِ وَاخْتَبَرَهُ صلى الله عليه وسلم.

فَصْلٌ:

وَيَجُوزُ لِمَنْ اعْتَقَدَ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله أَنْ يُقَلِّدَ الْقَضَاءَ مَنِ اعْتَقَدَ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَجْتَهِدَ بِرَأْيِهِ فِي قَضَائِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُقَلِّدَ فِي النَّوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ مَنِ اعْتَزَى إِلَى مَذْهَبِهِ، فَإِذَا كَانَ شَافِعِيًّا لَمْ يَلْزَمْهُ الْمَصِيرُ فِي أَحْكَامِهِ إِلَى أَقَاوِيلِ الشَّافِعِيِّ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهَا، فَإِنْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى الْأَخْذِ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَمِلَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِهِ، وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مَنِ اعْتَزَى إِلَى مَذْهَبٍ أَنْ يَحْكُمَ بِغَيْرِهِ، فَمُنِعَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَحْكُمَ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُنِعَ الْحَنَفِيُّ أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إِذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ لِمَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ مِنَ التُّهْمَةِ وَالْمُمَايَلَةِ فِي الْقَضَايَا وَالْأَحْكَامِ، وَإِذَا حَكَمَ بِمَذْهَبٍ لَا يَتَعَدَّاهُ كَانَ أَنْفَى لِلتُّهْمَةِ وَأَرْضَى لِلْخُصُومِ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَتِ السِّيَاسَةُ تَقْتَضِيهِ فَأَحْكَامُ الشَّرْعِ لَا تُوجِبُهُ؛ لِأَنَّ التَّقْلِيدَ فِيهَا مَحْظُورٌ، وَالِاجْتِهَادَ فِيهَا مُسْتَحَقٌّ، وَإِذَا نَفَذَ قَضَاؤُهُ بِحُكْمٍ وَتَجَدَّدَ مِثْلُهُ مِنْ بَعْدُ أَعَادَ الِاجْتِهَادَ فِيهِ، وَقَضَى بِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ وَإِنْ خَالَفَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُكْمِهِ، فَإِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَضَى فِي الْمُشْرِكَةِ بِالتَّشْرِيكِ فِي عَامٍ، وَتَرَكَ التَّشْرِيكَ فِي غَيْرِهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَكَذَا حَكَمْتَ فِي

---

1 حسن: رواه أبو داود في كتاب الأقضية "3582"، والترمذي في كتاب الأحكام "3582"، وأحمد "692"، وحسنه الشيخ الألباني.

দুটি অভিমত:

প্রথমত: উল্লিখিত কারণে এটি জায়েজ নয়।

দ্বিতীয়ত: এটি জায়েজ, কারণ তারা একে অর্থগতভাবে সুস্পষ্ট মনে করেন, যদিও তারা সূক্ষ্ম কিয়াস (অনুমান) থেকে বিচ্যুত হন। সুতরাং বিচার বিভাগের জন্য আমরা যে সকল শর্ত বর্ণনা

করেছি তা যদি সাব্যস্ত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাঝে সেগুলোর সমন্বয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিয়োগ দেওয়া জায়েজ হবে না; এটি হয় পূর্বপরিচয়ের ভিত্তিতে অথবা পরীক্ষা ও জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে হতে হবে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী আলাইহিস সালামকে ইয়ামেনের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে অবগত থাকায় তাঁকে পরীক্ষা করেননি; তবে বিচারের পদ্ধতির ব্যাপারে সচেতন করার জন্য তিনি তাঁকে অসিয়ত করে বলেছিলেন:

"যখন তোমার কাছে দুজন বিবাদী উপস্থিত হয়, তখন অপরপক্ষের কথা না শোনা পর্যন্ত তুমি তাদের কারো পক্ষে ফয়সালা দিও না।" ১।

আলী আলাইহিস সালাম বলেন: এরপর থেকে কোনো বিচার্য বিষয় আমার কাছে অস্পষ্ট থাকেনি। আর তিনি (নবীজি) মুয়াজকে ইয়ামেনের এক অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন।

পরিচ্ছেদ:

শাফেয়ী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযহাবের অনুসারী কোনো ব্যক্তির জন্য আবু হানিফার মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তিকে বিচারকের পদে নিয়োগ দেওয়া জায়েজ। কারণ বিচারকের জন্য তাঁর বিচারে নিজস্ব রায় বা ইজতিহাদ করার অধিকার রয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি ও আহকামের ক্ষেত্রে তিনি যে মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত, তার তাকলীদ (অনুসরণ) করা তাঁর জন্য আবশ্যক নয়। সুতরাং তিনি শাফেয়ী হলেও নিজের বিচারকার্যে শাফেয়ীর অভিমত গ্রহণ করা তাঁর জন্য অপরিহার্য নয়, যতক্ষণ না তাঁর ইজতিহাদ তাঁকে সেদিকে নিয়ে যায়। যদি তাঁর ইজতিহাদ তাঁকে আবু হানিফার মত গ্রহণের দিকে ধাবিত করে, তবে তিনি সে অনুযায়ী আমল করবেন এবং তা গ্রহণ করবেন। তবে কোনো কোনো ফকীহ কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির জন্য অন্য মাযহাব অনুযায়ী বিচার করা নিষিদ্ধ করেছেন। ফলে শাফেয়ীকে আবু হানিফার মত অনুযায়ী বিচার করতে এবং হানাফীকে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী বিচার করতে নিষেধ করা হয়েছে—যখন তাঁর ইজতিহাদ তাঁকে সেদিকে নিয়ে যায়—যাতে বিচার ও আহকামের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা সন্দেহের অবকাশ না থাকে। যখন তিনি একটি নির্দিষ্ট মাযহাব অনুযায়ী বিচার করবেন এবং তা অতিক্রম করবেন না, তখন তা সন্দেহের অবকাশ দূর করবে এবং বিবাদীদের অধিক সন্তুষ্ট করবে। যদিও প্রশাসনিক নীতি (সিয়াসাহ) এটি দাবি করে, কিন্তু শরয়ি বিধান একে আবশ্যিক করে না; কেননা শরয়ি বিষয়ে তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ নিষিদ্ধ এবং ইজতিহাদ করা আবশ্যক। আর যখন তিনি কোনো

বিধান দ্বারা বিচার সম্পন্ন করবেন এবং পরবর্তীতে অনুরূপ বিষয় পুনরায় উপস্থিত হবে, তখন তিনি নতুন করে ইজতিহাদ করবেন এবং তাঁর ইজতিহাদ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে সে অনুযায়ী বিচার করবেন—যদিও তা তাঁর আগের বিচারের বিপরীত হয়। কেননা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুশাররাকাহ (উত্তরাধিকার সংক্রান্ত) মাসআলায় এক বছর অংশীদারত্বের (তাশরিক) ভিত্তিতে ফয়সালা দিয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে অন্যভাবে ফয়সালা দেন। তাঁকে বলা হলো: আপনি তো আগে এভাবে বিচার করেননি—

---

১ হাসান: এটি আবু দাউদ 'বিচার বিভাগ' অধ্যায়ে (৩৫৮২), তিরমিজি 'আহকাম' অধ্যায়ে (৩৫৮২) এবং আহমাদ (৬৯২) বর্ণনা করেছেন; শেখ আলবানী একে হাসান হিসেবে অভিহিত করেছেন।

(ص: 116)الأحكام السلطانية للماوردي

الْعَامِ الْمَاضِي، فَقَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا نَقْضِي.

فَلَوْ شَرَطَ الْمُوَلِّي وَهُوَ حَنَفِيٌّ أَوْ شَافِعِيٌّ عَلَى مَنْ وَلَّاهُ الْقَضَاءَ أَنْ لَا يَحْكُمَ إِلَّا بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَوْ أَبِي حَنِيفَةَ فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عُمُومًا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ، فَهَذَا شَرْطٌ بَاطِلٌ، سَوَاءٌ كَانَ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْمُوَلِّي أَوْ مُخَالِفًا لَهُ، وَأَمَّا صِحَّةُ الْوِلَايَةِ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ شَرْطًا فِيهَا، وَأَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْأَمْرِ أَوْ مَخْرَجَ النَّهْيِ، وَقَالَ: قَدْ قَلَّدْتُكَ الْقَضَاءَ فَاحْكُمْ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله عَلَى وَجْهِ الْأَمْرِ، أَوْ لَا تَحْكُمْ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ -عَلَى وَجْهِ النَّهْيِ، كَانَتْ الْوِلَايَةُ صَحِيحَةً وَالشَّرْطُ فَاسِدًا، سَوَاءٌ تَضَمَّنَ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ، سَوَاءٌ وَافَقَ شَرْطَهُ أَوْ خَالَفَهُ، وَيَكُونُ اشْتِرَاطُ الْمُوَلِّي لِذَلِكَ قَدْحًا فِيهِ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ اشْتَرَطَ مَا لَا يَجُوزُ، وَلَا يَكُونُ قَدْحًا إِنْ جَهِلَ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ أَنْ

يَكُونَ مُوَلِّيًا وَلَا وَالِيًا، فَإِنْ أَخْرَجَ ذَلِكَ مَخْرَجَ الشَّرْطِ فِي عَقْدِ الْوِلَايَةِ فَقَالَ: قَدْ قَلَّدْتُكَ الْقَضَاءَ عَلَى أَنْ لَا تَحْكُمَ فِيهِ إِلَّا بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، أَوْ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، كَانَتْ الْوِلَايَةُ بَاطِلَةً؛ لِأَنَّهُ عَقَدَهَا عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ.

وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: تَصِحُّ الْوِلَايَةُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ خَاصًّا فِي حُكْمٍ بِعَيْنِهِ؛ فَلَا يَخْلُو الشَّرْطُ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، فَإِنْ كَانَ أَمْرًا فَقَالَ لَهُ: أَقِدْ مِنَ الْعَبْدِ بِالْحُرِّ، وَمِنَ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ، وَاقْتَصَّ فِي الْقَتْلِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ، كَانَ أَمْرُهُ بِهَذَا الشَّرْطِ فَاسِدًا، ثُمَّ إِنْ جَعَلَهُ شَرْطًا فِي عَقْدِ الْوِلَايَةِ فَسَدَتْ، وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ شَرْطًا فِيهَا صَحَّتْ، وَحَكَمَ فِي ذَلِكَ بِمَا يُؤَدِّيهِ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ نَهْيًا فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدِهِمَا: أَنْ يَنْهَاهُ عَنِ الْحُكْمِ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ وَالْحُرِّ بِالْعَبْدِ، وَلَا يَقْضِي فِيهِ بِوُجُوبِ قَوَدٍ وَلَا بِإِسْقَاطِهِ فَهَذَا جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ بِوِلَايَتِهِ عَلَى مَا عَدَاهُ فَصَارَ ذَلِكَ خَارِجًا عَنْ نَظَرِهِ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَنْهَاهُ عَنِ الْحُكْمِ وَيَنْهَاهُ عَنِ الْقَضَاءِ فِي الْقِصَاصِ.

فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا النَّهْيِ هَلْ يُوجِبُ صَرْفَهُ عَنِ النَّظَرِ فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدِهِمَا: أَنْ يَكُونَ صَرْفًا عَنِ الْحُكْمِ فِيهِ، وَخَارِجًا عَنْ وِلَايَتِهِ، فَلَا يَحْكُمُ فِيهِ بِإِثْبَاتِ قَوَدٍ وَلَا بِإِسْقَاطِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الصَّرْفَ عَنْهُ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَمْرِ بِهِ وَيُثْبِتُ صِحَّةَ النَّظَرِ إِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ شَرْطًا فِي التَّقْلِيدِ، وَيَحْكُمُ فِيهِ بِمَا يُؤَدِّيهِ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ.

গত বছরের বিষয়, তখন তিনি বলেছিলেন: ওটি ছিল আমাদের তৎকালীন ফয়সালা অনুযায়ী, আর এটি আমাদের বর্তমান ফয়সালা অনুযায়ী।

যদি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—যিনি নিজে হানাফি বা শাফেয়ি—বিচারক হিসেবে যাকে নিয়োগ দিচ্ছেন তার ওপর এই শর্তারোপ করেন যে, তিনি শাফেয়ি মাযহাব বা ইমাম আবু হানিফার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মতে বিচার করতে পারবেন না, তবে বিষয়টি দুই প্রকার হতে পারে:

প্রথমত: সকল বিচারিক বিষয়ের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এই শর্তারোপ করা। এটি একটি বাতিল শর্ত, চাই তা নিয়োগকারীর মাযহাবের অনুকূলে হোক বা প্রতিকূলে। আর নিয়োগের বৈধতার ক্ষেত্রে বিচার্য হলো: যদি তিনি এটিকে নিয়োগের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত না করেন, বরং আদেশ বা নিষেধ হিসেবে পেশ করেন এবং বলেন: "আমি আপনাকে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করলাম, সুতরাং শাফেয়ি মাযহাব (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) অনুযায়ী বিচার করুন" —এটি আদেশের প্রেক্ষিতে; অথবা (নিষেধের প্রেক্ষিতে) বলেন: "ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অনুযায়ী বিচার করবেন না" —তবে নিয়োগটি বৈধ হবে কিন্তু শর্তটি বাতিল হবে, চাই তা আদেশ হোক বা নিষেধ। এমতাবস্থায় বিচারক তাঁর ইজতিহাদলব্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিচার করার অধিকারী হবেন, চাই তা শর্তের অনুকূলে হোক বা প্রতিকূলে। আর নিয়োগকারীর এহেন শর্তারোপ তাঁর অযোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে যদি তিনি জেনেশুনে এমন শর্ত দেন যা জায়েজ নয়। আর যদি তিনি অজ্ঞতাবশত এমন করেন তবে তা অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে না, যদিও অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে নিয়োগকারী বা শাসক হওয়া সমীচীন নয়। কিন্তু যদি তিনি নিয়োগ চুক্তিতে এটিকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করে বলেন: "আমি আপনাকে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করলাম এই শর্তে যে, আপনি শাফেয়ি মাযহাব বা ইমাম আবু হানিফার মত ছাড়া অন্য কোনো মতে বিচার করবেন না," তবে নিয়োগটি বাতিল হবে; কারণ তিনি একটি ত্রুটিযুক্ত শর্তের ওপর ভিত্তি করে এই চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

ইরাকবাসীরা বলেছেন: নিয়োগ বৈধ হবে কিন্তু শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত: নির্দিষ্ট কোনো বিধানের ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তারোপ করা। এক্ষেত্রে শর্তটি আদেশ বা নিষেধের বাইরে হবে না। যদি তা আদেশ হয় এবং তিনি তাকে বলেন: "মুক্ত ব্যক্তির বদলে গোলামকে হত্যা করুন, মুসলিমের বদলে কাফিরকে হত্যা করুন এবং লোহা ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে হত্যার ক্ষেত্রেও কিসাস কার্যকর করুন," তবে এই শর্তারোপ বাতিল হবে। এমতাবস্থায় যদি তিনি একে নিয়োগ চুক্তির শর্ত হিসেবে গণ্য করেন তবে নিয়োগ বাতিল হবে, আর যদি শর্ত হিসেবে না হয় তবে নিয়োগ বৈধ হবে এবং বিচারক সেক্ষেত্রে নিজের ইজতিহাদলব্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। আর যদি তা নিষেধ হয় তবে তা দুই প্রকার: প্রথম প্রকার: তাকে কাফিরের বদলে মুসলিমকে হত্যা করা এবং গোলামের বদলে মুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার বিষয়ে বিচার করতে নিষেধ করা, যেন তিনি এ বিষয়ে কিসাস সাব্যস্ত বা মওকুফ করার কোনো ফয়সালাই না দেন। এটি জায়েজ; কারণ তিনি তার বিচারিক

এখতিয়ারকে এ বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন, ফলে বিষয়টি তার বিচারিক অধিকারের বাইরে চলে গেছে।
দ্বিতীয় প্রকার: তাকে মূল বিচারকার্য থেকে নিষেধ না করে কেবল কিসাস বা দণ্ড প্রদানের বিষয়ে বিচার করতে নিষেধ করা।
এ বিষয়ে আমাদের মাযহাবের পণ্ডিতগণ মতভেদ করেছেন যে, এই নিষেধটি কি তাকে উক্ত বিষয়ে বিচার করা থেকে সরিয়ে দেবে? এর দুটি অভিমত রয়েছে:
প্রথমত: এটি তাকে সেই বিচার থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং এটি তার এখতিয়ারের বহির্ভূত বিষয় হওয়া। ফলে তিনি সেই বিষয়ে কিসাস সাব্যস্ত বা বাতিল করার কোনো বিচার করবেন না।
দ্বিতীয়ত: এটি বিচারকার্য থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া বোঝায় না এবং এর ওপর আদেশের বিধান বলবৎ হবে। ফলে যদি নিয়োগের সময় একে শর্ত হিসেবে উল্লেখ না করা হয়, তবে তার বিচারিক এখতিয়ারের বৈধতা বহাল থাকবে এবং তিনি নিজের ইজতিহাদ অনুযায়ী সেই বিষয়ে ফয়সালা করবেন।

(ص: 117)الأحكام السلطانية للماوردي

فَصْلٌ: "ما تنعقد به ولاية القضاء"
وَوِلَايَةُ الْقَضَاءِ تَنْعَقِدُ بِمَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْوِلَايَاتُ، مَعَ الْحُضُورِ بِاللَّفْظِ مُشَافَهَةً، وَمَعَ الْغَيْبَةِ مُرَاسَلَةً وَمُكَاتَبَةً، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مَعَ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا مِنْ شَوَاهِدِ الْحَالِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمَوْلَى وَأَهْلِ عَمَلِهِ.
وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْوِلَايَةُ ضَرْبَانِ: صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ:
فَالصَّرِيحُ أَرْبَعَةُ أَلْفَاظٍ: قَدْ قَلَّدْتُكَ، وَوَلَّيْتُكَ، وَاسْتَخْلَفْتُكَ، وَاسْتَنَبْتُكَ، فَإِذَا أَتَى بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ انْعَقَدَتْ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْوِلَايَاتِ، وَلَيْسَ يَحْتَاجُ مَعَهَا إِلَى قَرِينَةٍ أُخْرَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْكِيدًا لَا شَرْطًا.

فَأَمَّا الْكِنَايَةُ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا سَبْعَةُ أَلْفَاظٍ: قَدْ اعْتَمَدْتُ عَلَيْكَ، وَعَوَّلْتُ عَلَيْكَ، وَرَدَدْتُ إِلَيْكَ، وَجَعَلْتُ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ إِلَيْكَ، وَوَكَّلْتُ إِلَيْكَ، وَأَسْنَدْتُ إِلَيْكَ، فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الِاحْتِمَالِ تُضْعِفُ فِي الْوِلَايَةِ عَنْ حُكْمِ الصَّرِيحِ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهَا فِي عَقْدِ الْوِلَايَةِ مَا يَنْفِي عَنْهَا الِاحْتِمَالَ، فَتَصِيرُ مَعَ مَا يَقْتَرِنُ بِهَا فِي حُكْمِ الصَّرِيحِ مِثْلَ قَوْلِهِ: فَانْظُرْ فِيمَا وَكَّلْتُهُ إِلَيْكَ، وَاحْكُمْ فِيمَا اعْتَمَدْتُ فِيهِ عَلَيْكَ، فَتَصِيرُ الْوِلَايَةُ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكِنَايَةِ مُنْعَقِدَةً، ثُمَّ تَمَامُهَا مَوْقُوفٌ عَلَى قَبُولِ الْمُوَلِّي، فَإِنْ كَانَ التَّقْلِيدُ مُشَافَهَةً فَقَبُولُهُ عَلَى الْفَوْرِ لَفْظًا، وَإِنْ كَانَ مُرَاسَلَةً أَوْ مُكَاتَبَةً جَازَ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّرَاخِي، وَيَجُوزُ قَبُولُهُ بِالْقَوْلِ مَعَ التَّرَاخِي.

وَاخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ الْقَبُولِ بِالشُّرُوعِ فِي النَّظَرِ؛ فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ وَجَعَلَهُ كَالنُّطْقِ، وَأَبَاهُ آخَرُونَ حَتَّى يَكُونَ نُطْقًا؛ لِأَنَّ الشُّرُوعَ فِي النَّظَرِ فَرْعٌ لِعَقْدِ الْوِلَايَةِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ قَبُولُهَا.

وَيَكُونُ تَمَامُ الْوِلَايَةِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ لَفْظِ التَّقْلِيدِ مُعْتَبَرًا بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ:

পরিচ্ছেদ: বিচারবিভাগীয় কর্তৃত্ব যা দ্বারা সাব্যস্ত হয়

বিচারবিভাগীয় কর্তৃত্ব বা কাযা-র ক্ষমতা সেই মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয় যা দ্বারা অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হয়। উপস্থিতির ক্ষেত্রে তা সরাসরি মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে এবং অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে বার্তা প্রেরণ বা পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তবে পত্র বিনিময়ের ক্ষেত্রে তার সাথে এমন কিছু পারিপার্শ্বিক আলামত থাকা আবশ্যক যা নিয়োগকর্তা ও তার অধীনস্থদের নিকট নিয়োগের বিষয়টি প্রমাণ করে।

যে সকল শব্দের মাধ্যমে এই কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হয় তা দুই প্রকার: স্পষ্ট এবং ইঙ্গিতমূলক।

স্পষ্ট শব্দসমূহ চারটি: 'আমি তোমাকে নিযুক্ত করলাম', 'আমি তোমাকে দায়িত্ব প্রদান করলাম', 'আমি তোমাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করলাম' এবং 'আমি তোমাকে আমার প্রতিনিধি বানালাম'। যখন এই শব্দগুলোর কোনো একটি ব্যবহার করা হয়, তখন বিচারবিভাগীয় বা অন্য যেকোনো কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হয়ে যায়। এর সাথে অন্য কোনো আলামত বা ইঙ্গিতের প্রয়োজন পড়ে না; তবে যদি অতিরিক্ত কিছু বলা হয় তা কেবল গুরুত্বারোপের জন্য হতে পারে, শর্ত হিসেবে নয়।

পক্ষান্তরে অস্পষ্ট বা ইঙ্গিতমূলক শব্দের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো কোনো ফকিহ উল্লেখ করেছেন যে, তা সাতটি: 'আমি তোমার ওপর আস্থা রাখলাম', 'আমি তোমার ওপর নির্ভর করলাম', 'আমি বিষয়টি তোমার ওপর ন্যস্ত করলাম', 'আমি বিষয়টি তোমার জন্য নির্ধারণ করলাম', 'আমি তোমাকে ক্ষমতা অর্পণ করলাম', 'আমি তোমাকে দায়িত্ব সোপর্দ করলাম' এবং 'আমি তোমাকে অবলম্বন বানালাম'। এই শব্দগুলোর মধ্যে বহুমুখী অর্থ থাকার সম্ভাবনা থাকায় কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট শব্দের তুলনায় দুর্বল। যতক্ষণ না এর সাথে এমন কোনো বিষয় যুক্ত হয় যা অস্পষ্টতা দূর করে দেয়। যখন কোনো আলামত যুক্ত হয়, তখন তা স্পষ্ট শব্দের বিধান লাভ করে; যেমন তাঁর উক্তি: 'আমি তোমাকে যে দায়িত্ব সোপর্দ করেছি তা দেখো' অথবা 'আমি যে বিষয়ে তোমার ওপর আস্থা রেখেছি তাতে বিচার করো'। ফলে পূর্বোক্ত ইঙ্গিতমূলক শব্দগুলোর সাথে এই জাতীয় আলামত যুক্ত হয়ে কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হয়ে যায়। অতঃপর এর পূর্ণতা নির্ভর করে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মতির ওপর। যদি নিয়োগটি সরাসরি মৌখিকভাবে হয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে মৌখিক সম্মতি আবশ্যক। আর যদি বার্তা বা পত্রের মাধ্যমে হয়, তবে বিলম্বে সম্মতি প্রদান করাও জায়েজ, এবং বিলম্ব সত্ত্বেও মৌখিক সম্মতির মাধ্যমে তা কার্যকর হবে।

বিচারকার্য পরিচালনার মাধ্যমে সম্মতি প্রদান করার বৈধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একে জায়েজ বলেছেন এবং একে উচ্চারণের সমতুল্য গণ্য করেছেন। অন্যগণ তা অস্বীকার করেছেন যতক্ষণ না মুখে উচ্চারণ করা হয়; কারণ বিচারকার্য শুরু করা হলো কর্তৃত্বের চুক্তির একটি শাখা বা ফলাফল, তাই এর মাধ্যমে মূল চুক্তির সম্মতি সাব্যস্ত হতে পারে না।

আমরা নিয়োগের যে শব্দগুলো উল্লেখ করেছি, তার মাধ্যমে কর্তৃত্ব পূর্ণ হওয়ার বিষয়টি চারটি শর্তের ওপর নির্ভরশীল:

أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ الْمَوْلَى لِلْمَوْلَى بِأَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ يُوَلَّى مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي تَجُوزُ مَعَهَا تِلْكَ الْوِلَايَةُ لَمْ يَصِحَّ تَقْلِيدُهُ، فَلَوْ عَرَفَهَا بَعْدَ التَّقْلِيدِ اسْتَأْنَفَهَا وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَوِّلَ عَلَى مَا تَقَدَّمَهَا.

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ الْمُوَلَّى بِمَا عَلَيْهِ الْمُوَلِّي مِنْ اسْتِحْقَاقِ تِلْكَ الْوِلَايَةِ بِصِفَاتِهِ الَّتِي يَصِيرُ بِهَا مُسْتَحِقًّا لَهَا، وَأَنَّهُ قَدْ تَقَلَّدَهَا وَصَارَ مُسْتَحِقًّا لِلْإِنَابَةِ فِيهَا، إِلَّا أَنَّ هَذَا شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ فِي قَبُولِ الْمُوَلَّى وَجَوَازِ نَظَرِهِ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي عَقْدِ تَقْلِيدِهِ وَوِلَايَتِهِ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَيْسَ يُرَاعَى فِي هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ الْمُشَاهَدَةُ بِالنَّظَرِ، وَإِنَّمَا يُرَاعَى انْتِشَارُهَا بِتَتَابُعِ الْخَبَرِ.

وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: ذِكْرُ مَا تَضَمَّنَهُ التَّقْلِيدُ مِنْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ أَوْ إِمَارَةِ الْبِلَادِ أَوْ جِبَايَةِ الْخَرَاجِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ شُرُوطٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ تَقْلِيدٍ فَافْتَقَرَتْ إِلَى تَسْمِيَةِ مَا تَضَمَّنَتْ؛ لِيُعْلَمَ عَلَى أَيِّ نَظَرٍ عُقِدَتْ فَإِنْ جُهِلَ فَسَدَتْ.

وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ: ذِكْرُ تَقْلِيدِ الْبَلَدِ الَّذِي عُقِدَتْ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ؛ لِيُعْرَفَ بِهِ الْعَمَلُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ النَّظَرَ فِيهِ، وَلَا تَصِحُّ الْوِلَايَةُ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ، فَإِذَا انْعَقَدَتْ تَمَّ تَقْلِيدُ الْوِلَايَةِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الشُّرُوطِ، وَاحْتَاجَ فِي لُزُومِ النَّظَرِ إِلَى شَرْطٍ زَائِدٍ عَلَى شُرُوطِ الْعَقْدِ، وَهُوَ إِشَاعَةُ تَقْلِيدِ الْمُوَلَّى فِي أَهْلِ عَمَلِهِ؛ لِيَذْعَنُوا بِطَاعَتِهِ وَيَنْقَادُوا إِلَى حُكْمِهِ، وَهُوَ شَرْطٌ فِي لُزُومِ الطَّاعَةِ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي نُفُوذِ الْحُكْمِ، فَإِذَا صَحَّتْ عَقْدًا وَلُزُومًا بِمَا وَصَفْنَا صَحَّ فِيهَا نَظَرُ الْمُوَلِّي وَالْمُوَلَّى كَالْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهُمَا مَعًا اسْتِنَابَةٌ وَلَمْ يَلْزَمْ الْمَقَامُ عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْمُوَلَّى، وَلَا مِنْ جِهَةِ الْمُوَلِّي، وَكَانَ لِلْمُوَلِّي عَزْلُهُ عَنْهَا مَتَى شَاءَ، وَلِلْمُوَلَّى عَزْلُ نَفْسِهِ عَنْهَا إِذَا شَاءَ، غَيْرَ أَنَّ الْأَوْلَى بِالْمُوَلِّي أَنْ يَعْزِلَهُ إِلَّا بِعُذْرٍ، وَأَنْ لَا يَعْتَزِلَ الْمُوَلَّى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ لِمَا فِي هَذِهِ الْوِلَايَةِ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا عَزَلَ أَوْ اعْتَزَلَ وَجَبَ إِظْهَارُ الْعَزْلِ كَمَا وَجَبَ إِظْهَارُ التَّقْلِيدِ، حَتَّى لَا يَقْدَمُ عَلَى إِنْفَاذِ حُكْمٍ وَلَا يَغْتَرُّ بِالتَّرَافُعِ إِلَيْهِ خَصْمٌ، فَإِنْ حَكَمَ بَعْدَ عَزْلِهِ وَقَدْ عَرَفَ عَزْلَهُ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ، وَإِنْ حَكَمَ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَزْلِهِ كَانَ فِي نُفُوذِ حُكْمِهِ وَجْهَانِ كَاخْتِلَافِهِمَا فِي عُقُودِ الْوَكِيلِ.

প্রথম শর্ত: নিয়োগকর্তা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে এই জ্ঞান থাকা যে, তিনি সেই সকল গুণাবলির অধিকারী যার ভিত্তিতে তাকে উক্ত পদে নিয়োগ দেওয়া বৈধ। যদি তিনি এটি নিশ্চিত না হন যে উক্ত ব্যক্তি সেই যোগ্যতার অধিকারী যার মাধ্যমে সেই দায়িত্ব অর্পণ করা জায়েজ, তবে তার নিয়োগদান সঠিক হবে না। আর যদি নিয়োগের পর তা জানতে পারেন, তবে নতুনভাবে নিয়োগদান করতে হবে এবং পূর্বের নিয়োগের ওপর নির্ভর করা জায়েজ হবে না।
দ্বিতীয় শর্ত: নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক নিয়োগকর্তার সেই সকল গুণাবলি ও যোগ্যতার বিষয়ে অবগত হওয়া, যার মাধ্যমে তিনি উক্ত দায়িত্ব প্রদানের অধিকারী হয়েছেন এবং তিনি নিজে সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং অন্যকে স্থলাভিষিক্ত করার অধিকারী হয়েছেন। তবে এই শর্তটি নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ ও কর্মপরিচালনা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে, কিন্তু এটি নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদানের মূল চুক্তির শর্ত নয়—যা পূর্ববর্তী শর্তের বিপরীত। এই অবগতির ক্ষেত্রে সচক্ষে প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক নয়, বরং জনশ্রুতি ও খবরের ব্যাপক প্রচারই যথেষ্ট।
তৃতীয় শর্ত: নিয়োগের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি উল্লেখ করা; যেমন—বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব, অঞ্চলের শাসনভার কিংবা রাজস্ব সংগ্রহ। যেহেতু প্রতিটি নিয়োগের ক্ষেত্রে এগুলো অপরিহার্য শর্ত, তাই নিয়োগে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন; যাতে বোঝা যায় কোন ধরনের কর্মপরিচালনার জন্য এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। যদি তা অজ্ঞাত থাকে, তবে নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে।
চতুর্থ শর্ত: যে অঞ্চলের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তা উল্লেখ করা; যাতে এর মাধ্যমে সেই কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয় যেখানে তিনি দায়িত্ব পালনের অধিকারী হবেন। কর্মক্ষেত্র অজ্ঞাত রেখে নিয়োগ বৈধ হবে না। উল্লিখিত শর্তাবলির মাধ্যমে যখন নিয়োগ সম্পন্ন হবে, তখন দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতার জন্য চুক্তির শর্তাবলির অতিরিক্ত আরও একটি শর্তের প্রয়োজন হবে; আর তা হলো—নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিয়োগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণের মধ্যে প্রচার করা, যাতে তারা তার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তার নির্দেশের অনুগত হয়। এটি আনুগত্য বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্ত, ফয়সালা কার্যকর হওয়ার শর্ত নয়। আমাদের বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী যখন নিয়োগ চুক্তিগতভাবে ও বাধ্যতামূলকভাবে শুদ্ধ হবে, তখন নিয়োগকর্তা ও নিয়োগপ্রাপ্ত উভয়ের জন্যই কর্মপরিচালনা বৈধ হবে, যেমনটি ওকালত বা প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কারণ উভয়ই হলো স্থলাভিষিক্তকরণ। আর এটি কোনো পক্ষের জন্যই অপরিহার্য নয় যে তাকে এই পদে বহাল থাকতেই হবে; বরং নিয়োগকর্তা চাইলে যেকোনো সময় তাকে বরখাস্ত করতে পারেন এবং নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাইলেও পদত্যাগ করতে

পারেন। তবে বিশেষ কারণ ব্যতীত নিয়োগকর্তার জন্য তাকে বরখাস্ত না করা এবং বিশেষ কারণ ছাড়া নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য পদত্যাগ না করাই উত্তম, কারণ এই দায়িত্বের সাথে মুসলিম উম্মাহর অধিকার জড়িত। যখন বরখাস্ত বা পদত্যাগ ঘটবে, তখন নিয়োগের ঘোষণার মতোই বরখাস্তের ঘোষণাও প্রকাশ করা আবশ্যক, যাতে তিনি কোনো ফয়সালা কার্যকর করতে অগ্রসর না হন এবং কোনো বিবাদী তার কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ে প্রতারিত না হয়। যদি বরখাস্ত হওয়ার কথা জানার পর তিনি কোনো ফয়সালা করেন, তবে তা কার্যকর হবে না। আর যদি বরখাস্তের খবর না জেনে কোনো রায় প্রদান করেন, তবে তা কার্যকর হওয়ার বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে, যেমনটি প্রতিনিধির চুক্তির ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে।

(ص: 119)الأحكام السلطانية للماوردي

فَصْلٌ: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص"

وَلَا تَخْلُو وِلَايَةُ الْقَاضِي مِنْ عُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ، فَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَامَّةً مُطْلَقَةَ التَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَنَظَرُهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَشَرَةِ أَحْكَامٍ:

أَحَدُهَا: فَصْلٌ فِي الْمُنَازَعَاتِ، وَقَطْعُ التَّشَاجُرِ وَالْخُصُومَاتِ، إِمَّا صُلْحًا عَنْ تَرَاضٍ، وَيُرَاعَى فِيهِ الْجَوَازُ، أَوْ إِجْبَارًا بِحُكْمٍ بَاتٍّ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْوُجُوبُ.

وَالثَّانِي: اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ مِمَّنْ مَطَلَ بِهَا، وَإِيصَالُهَا إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا بَعْدَ ثُبُوتِ اسْتِحْقَاقِهَا مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِقْرَارٌ، أَوْ بَيِّنَةٌ، وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ حُكْمِهِ فِيهَا بِعِلْمِهِ؛ فَجَوَّزَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رضي الله عنهما أَصَحَّ قَوْلَيْهِ، وَمَنَعَ مِنْهُ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ بِعِلْمِهِ فِيمَا عَلِمَهُ فِي وِلَايَتِهِ وَلَا يَحْكُمُ بِمَا عَلِمَهُ قَبْلَهَا1.

---

1 وقد اختلف في ذلك -قديمًا وحديثًا، وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات، إحداها: وهي الرواية المشهورة عنه المنصورة عند أصحابه: إنَّه لا يحكم بعلمه لأجل التهمة. والثانية: يجوز له ذلك مطلقًا في الحدود وغيرها. والثالثة: يجوز إلّا في الحدود، ولا خلاف عنه أنَّه يبني على علمه في عدالة الشهود وجرحهم، ولا يجب عليه أن يسأل غيره عمَّا علمه من ذلك.

ولأصحاب الشافعي طريقان:

أحدهما: يقضي بعلمه قطعًا، والثاني: إنَّ المسألة على قولين أظهرهما أكثر الصحابة يقضي به.

قالوا: لأنه يقضي بشاهدين، وذلك يفيد ظنًّا، فالعلم أولى بالجواز، وأجابوا عمَّا احتج به المانعون من ذلك من التهمة أنَّ القاضي لو قال: ثبت عندي وصحَّ كذا وكذا، ألزم قبوله بلا خلاف، ولم يبحث عمَّا ثبت به وصحَّ، والتهمة قائمة.

ووجه هذا أنَّه لما ملك الإنشاء ملك الإخبار، ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها وما علمه في غيرها.

قالوا: فإن قلنا: لا يقضي بعلمه، فذلك إذا كان مستنده مجرد العلم، أمَّا إذا شهد رجلان يعرف عدالتهما فله أن يقضي ويغنيه علمه بهما عن تزكيتهما، وفيه وجه ضعيف لا يغنيه ذلك عن تزكيتهما للتهمة.

قالوا: ولو أقرَّ بالمدَّعَى به في مجلس قضائه قضى وذلك قضاء بالإقرار لا يعلمه، وإن أقر عنده سرًّا فعلى القولين، وقيل: يقضي قطعًا، ولو شهد عنده واحد فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر على قول =

পরিচ্ছেদ: "কাজির কর্তৃত্ব: সাধারণ ও বিশেষের মধ্যবর্তী অবস্থা"

কাজির (বিচারকের) কর্তৃত্ব বা শাসনক্ষমতা সাধারণ অথবা বিশেষ—এই দুই অবস্থার কোনো একটি থেকে মুক্ত নয়। যদি তাঁর কর্তৃত্ব সাধারণ ও নিরঙ্কুশ হয় এবং এর অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ে

তাঁর হস্তক্ষেপের অধিকার থাকে, তবে তাঁর বিচারিক এখতিয়ার দশটি বিধান বা কার্যাবলিকে শামিল করে:

প্রথমত: বিরোধের নিষ্পত্তি এবং বিবাদ ও কলহের অবসান ঘটানো; এটি হয় উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে আপোসের মাধ্যমে হবে—যেক্ষেত্রে শরয়ি বৈধতার বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হয়, অথবা চূড়ান্ত রায়ের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে হবে—যেক্ষেত্রে রায়ের আবশ্যকতা বিচার্য হয়।

দ্বিতীয়ত: যারা পাওনা আদায়ে টালবাহানা করে, তাদের নিকট থেকে পাওনা আদায় করা এবং দুটি পন্থার কোনো একটির মাধ্যমে অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার পর তা প্রকৃত পাওনাদারের নিকট পৌঁছে দেওয়া। পন্থা দুটি হলো: স্বীকারোক্তি অথবা সাক্ষ্য-প্রমাণ। কাজি তাঁর নিজস্ব অবগতির ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে; ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) তাঁদের দুটি মতের মধ্যে বিশুদ্ধতর মতানুসারে একে বৈধ বলেছেন, আর অন্য মতে তা নিষিদ্ধ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন: কাজি তাঁর দায়িত্ব পালনকালে যা জেনেছেন, সে বিষয়ে তাঁর জানাশোনার ভিত্তিতে ফয়সালা দেওয়া বৈধ, তবে দায়িত্ব লাভের আগে যা জেনেছেন তার ভিত্তিতে ফয়সালা দেবেন না।১

---

১ এ বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদের মাযহাবে এ ব্যাপারে তিনটি বর্ণনা আছে। এর মধ্যে একটি হলো তাঁর প্রসিদ্ধ বর্ণনা যা তাঁর অনুসারীদের নিকট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত: পক্ষপাতিত্ব বা অপবাদের আশঙ্কায় কাজি তাঁর ব্যক্তিগত জানাশোনার ভিত্তিতে ফয়সালা দেবেন না। দ্বিতীয়টি হলো: হুদুদ (নির্ধারিত দণ্ডবিধি) ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই এটি সাধারণভাবে বৈধ। তৃতীয়টি হলো: হুদুদ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈধ। তবে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা ও অযোগ্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জানাশোনার ওপর ভিত্তি করবেন এবং এ বিষয়ে যা তিনি জানেন, সে সম্পর্কে অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করা তাঁর জন্য আবশ্যক নয়।

ইমাম শাফিঈর অনুসারীদের এ বিষয়ে দুটি পদ্ধতি রয়েছে:

প্রথমটি: তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জানাশোনার ভিত্তিতে ফয়সালা দেবেন। দ্বিতীয়টি: এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে, যার মধ্যে অধিকতর স্পষ্ট মতটি অধিকাংশ সাহাবীর অনুসরণে প্রদান করা হয়েছে যে, তিনি এর ভিত্তিতে ফয়সালা দেবেন।

তাঁরা বলেন: যেহেতু তিনি দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফয়সালা দেন যা কেবল প্রবল ধারণা প্রদান করে, সেহেতু ব্যক্তিগত নিশ্চিত জ্ঞান ফয়সালার জন্য অধিকতর উপযোগী। যারা পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কায় এটি নিষেধ করেন, তাঁদের যুক্তির জবাবে তাঁরা বলেন যে, কাজি যদি বলেন, 'আমার নিকট অমুক বিষয়টি প্রমাণিত ও সঠিক হয়েছে', তবে কোনো দ্বিমত ছাড়াই তা গ্রহণ করা আবশ্যক হয় এবং সেটি কিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে তা নিয়ে কোনো অনুসন্ধান করা হয় না, যদিও সেখানে পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে।

এর কারণ হলো, যখন তিনি কোনো বিষয় প্রবর্তনের ক্ষমতার অধিকারী হলেন, তখন তিনি তা সংবাদ হিসেবে প্রদানেরও ক্ষমতার অধিকারী হলেন। অতঃপর তাঁরা এই দুই মতের ওপর ভিত্তি করে সেই বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন যা কাজি তাঁর দায়িত্ব পালনকালে ও কর্মস্থলে জেনেছেন এবং যা তার বাইরে জেনেছেন।

তাঁরা বলেন: যদি আমরা বলি যে তিনি তাঁর জানাশোনার ভিত্তিতে ফয়সালা দেবেন না, তবে তা তখন প্রযোজ্য হবে যখন তাঁর ভিত্তি হবে কেবলই ব্যক্তিগত জ্ঞান। কিন্তু যদি এমন দুজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যাদের ন্যায়পরায়ণতা তিনি জানেন, তবে তিনি ফয়সালা দিতে পারবেন এবং তাদের সম্পর্কে তাঁর জানাশোনাই তাদেরকে বিশুদ্ধ ঘোষণার জন্য যথেষ্ট হবে। তবে এ ক্ষেত্রে একটি দুর্বল মতও রয়েছে যে, পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কায় তাঁর ব্যক্তিগত জানাশোনা তাদের বিশুদ্ধ ঘোষণার জন্য যথেষ্ট হবে না।

তাঁরা আরও বলেন: যদি বিবাদী বিচারকের মজলিসে দাবিকৃত বিষয় স্বীকার করে নেয়, তবে তিনি রায় দেবেন; এটি হবে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায়, কেবল জানাশোনার ভিত্তিতে নয়। কিন্তু যদি বিবাদী তাঁর নিকট গোপনে স্বীকারোক্তি দেয়, তবে এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত দুটি মত প্রযোজ্য হবে। কেউ কেউ বলেছেন, এ ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চিতভাবেই রায় দেবেন। আর যদি তাঁর নিকট একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, তবে তাঁর ব্যক্তিগত জানাশোনা কি অপর সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হবে কি না—এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে =

وَالثَّالِثُ: ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ كَانَ مَمْنُوعَ التَّصَرُّفِ بِجُنُونٍ أَوْ صِغَرٍ، وَالْحَجْرُ عَلَى مَنْ يَرَى الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ حِفْظًا لِلْأَمْوَالِ عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا، وَتَصْحِيحًا لِأَحْكَامِ الْعُقُودِ فِيهَا.

وَالرَّابِعُ: النَّظَرُ فِي الْأَوْقَاتِ بِحِفْظِ أُصُولِهَا وَتَنْمِيَةِ فُرُوعِهَا، وَالْقَبْضِ عَلَيْهَا وَصَرْفِهَا فِي سَبِيلِهَا، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُسْتَحِقٌّ لِلنَّظَرِ فِيهَا رَاعَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَلَّاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْخَاصِّ

= المنع فيه وجهان، وهذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه. وأمَّا مذهب مالك فإنه لا يقضي بعلمه في المدّعى به بحال سواء علمه قبل التولية أو بعدها في مجلس قضائه أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع فهو أشد أذنًا في ذلك.

وقال عبد الملك وسحنون: يحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في المحاكمة، قالوا: فإن حكم بعلمه حيث قلنا: لا يحكم، فقال أبو الحسن اللخمي: لا ينقض عند بعض أصحابنا، وعندي أنه ينقض.

قالوا: ولا خلاف في أنَّ ما رآه القاضي أو سمعه في مجلس قضائه أنه لا يحكم به، وأنه ينقض إن حكم به وينقضه هو وغيره، وإنما فيما يتقارر به الخصمان في مجلسه، فإن حكم به ينقضه هو، ولا ينقضه غيره.

قال اللخمي: وقد اختلف إذا أقرَّ بعد أن جلسا للخصومة ثم أنكر، فقال مالك وابن القاسم: لا يحكم بعلمه، وقال عبد الملك وسحنون: يحكم أنّ الخصمين إذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه، ولذلك قصداه هذا تحصيل مذهب مالك.

وأمَّا مذهب أبي حنيفة فقالوا: إذا علم الحاكم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به؛ لأنَّ علمه كشهادة الشاهدين؛ بل أولى؛ لأنَّ اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة أو السماع، والحاصل بالشهادة غلبة الظن، وأما ما

علمه قبل ولايته أو محل ولايته فلا يقضي به، ثم أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يقضي به كما في حال ولايته ومحلها.

قال المنتصرون لقول أبي حنيفة: هو في مصره وغير ولايته شاهد لا حاكم، وشهادة الفرد لا تقبل، وصار كما إذا علم بالبينة العادلة، ثم ولي القضاء فإنه لا يعمل بها.

قالوا: وأمَّا في الحدود فلا يقضي بعلمه فيها؛ لأنه خصم فيها؛ ولأنه حق لله تعالى وهو نائبه، إلّا حدّ القذف فإنه يعمل بعلمه لما فيه من حق العبد، وإلّا في السكر إذا وجد سكرانًا، أو من به أمارات السكر فإنه يعذر، هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة.

أما أهل الظاهر: فقال أبو محمد بن حزم: وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والأموال والقصاص والفروج والحدود، سواء أعلم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. قال: وأقوى ما حكم بعلمه ثم بالإقرار ثم بالبينة. [الطرق الحكمية: ص285-287] .

তৃতীয়ত: উন্মাদনা বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কারণে যারা আইনগত লেনদেনে অক্ষম, তাদের ওপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করা; এবং সম্পদসমূহকে এর প্রকৃত হকদারদের জন্য সংরক্ষণ এবং চুক্তির বিধানসমূহকে ত্রুটিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে নির্বুদ্ধিতা বা দেউলিয়াত্বের কারণে যাদের ওপর সম্পদ ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রয়োজন মনে হয়, তাদের ওপর তা কার্যকর করা।

চতুর্থত: ওয়াকফকৃত সম্পদসমূহ তত্ত্বাবধান করা; এর মূল সম্পদ সংরক্ষণ ও এর লভ্যাংশ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং তা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা। যদি ওয়াকফের ক্ষেত্রে কোনো তত্ত্বাবধায়ক (মুতাওয়াল্লি) নিযুক্ত থাকে, তবে বিচারক তার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন; আর যদি কেউ না থাকে, তবে বিচারক নিজেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন; কারণ এটি কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট নয়...

= এ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে; এটি ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীদের মাজহাবের সারসংক্ষেপ। আর ইমাম মালিকের মাজহাব হলো, তিনি কোনো অবস্থাতেই নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার করবেন না—চাই তিনি তা পদ লাভের

আগে জেনে থাকেন বা পরে, বিচার মজলিসে জেনে থাকেন বা অন্য কোথাও, মামলা শুরু হওয়ার আগে বা পরে; এক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান অত্যন্ত কঠোর।

আবদুল মালিক এবং সাহনুন বলেন: মামলা শুরু হওয়ার পর তিনি যা জেনেছেন, সেই অনুযায়ী বিচার করবেন। তারা বলেন: যেখানে আমরা বলেছি যে তিনি বিচার করবেন না, সেখানে যদি তিনি বিচার করে ফেলেন, তবে আবু হাসান আল-লাখমি বলেন: আমাদের কোনো কোনো সাথীর মতে তা বাতিল করা হবে না, তবে আমার মতে তা বাতিল করা আবশ্যক।

তারা বলেন: এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, বিচারক তাঁর বিচার মজলিসে যা দেখেছেন বা শুনেছেন, তার ভিত্তিতে বিচার করতে পারবেন না এবং তিনি বিচার করলে তা বাতিল করা হবে। তিনি নিজে বা অন্য কেউ তা বাতিল করবেন। তবে বিবাদমান পক্ষদ্বয় যদি তাঁর মজলিসে কোনো বিষয়ে একমত হয় এবং তিনি তার ভিত্তিতে বিচার করেন, তবে তিনি নিজে তা বাতিল করবেন, অন্য কেউ নয়।

আল-লাখমি বলেন: বিবাদমান পক্ষদ্বয় বিচারের জন্য বসার পর যদি একজন স্বীকারোক্তি দেয় এবং পরে তা অস্বীকার করে, তবে সে ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। মালিক ও ইবনে আল-কাসিম বলেন: বিচারক তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার করবেন না। আবদুল মালিক ও সাহনুন বলেন: তিনি বিচার করবেন; কারণ বিবাদমান পক্ষদ্বয় যখন বিচারের জন্য বসেছে, তখন তারা যা বলবে তার ভিত্তিতে বিচার করার বিষয়ে তারা সম্মতি প্রকাশ করেছে এবং এটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এটিই ইমাম মালিকের মাজহাবের সারাংশ।

আর ইমাম আবু হানিফার মাজহাব সম্পর্কে তাঁরা বলেন: বিচারক যদি তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় এবং নিজ কর্মস্থলে থাকা অবস্থায় বান্দার হক সংক্রান্ত কোনো বিষয় জানতে পারেন, তবে তাঁর জন্য সেই অনুযায়ী ফয়সালা করা জায়েজ। কারণ তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞান দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের মতো, বরং তার চেয়েও অগ্রগণ্য; কেননা স্বচক্ষে দেখা বা কানে শোনার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান হলো ধ্রুব সত্য (ইয়াকিন), আর সাক্ষ্যের মাধ্যমে অর্জিত হয় প্রবল ধারণা। তবে দায়িত্ব লাভের আগে বা নিজ কর্মস্থলের বাইরের কোনো বিষয় সম্পর্কে জানলে তিনি বিচার করবেন না—এটি ইমাম আবু হানিফার অভিমত। তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রাহ.) বলেন: দায়িত্ব পালন ও কর্মস্থলের সময়ের মতো অন্য সময়ে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতেও তিনি বিচার করতে পারবেন।

ইমাম আবু হানিফার মতের সমর্থকরা বলেন: তিনি তাঁর শহরের বাইরে বা কর্মস্থলের সীমানার বাইরে একজন সাক্ষী হিসেবে গণ্য হন, বিচারক হিসেবে নয়; আর একক ব্যক্তির সাক্ষ্য

গ্রহণযোগ্য নয়। এটি তেমন হলো—যেমন কেউ ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীর মাধ্যমে কোনো বিষয় জানতে পারলেন এবং তারপর তিনি বিচারক নিযুক্ত হলেন, তবে তিনি সেই তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করতে পারবেন না।

তারা বলেন: হুদুদের (আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধি) ক্ষেত্রে বিচারক নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার করবেন না; কারণ তিনি এখানে বাদীপক্ষ হিসেবে গণ্য এবং তিনি মহান আল্লাহর প্রতিনিধি। তবে অপবাদের শাস্তি (হাদ্দে কাযফ) এর ব্যতিক্রম; কারণ এতে বান্দার হক রয়েছে। তেমনিভাবে মদ্যপানের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম—যদি কাউকে মাতাল অবস্থায় পান অথবা কারো মাঝে মাতাল হওয়ার লক্ষণসমূহ দেখেন, তবে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। এটি ইমাম আবু হানিফার মাজহাবের সারাংশ।

আহলে জাহেরদের সম্পর্কে আবু মুহাম্মদ ইবনে হাজম বলেন: বিচারকের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে রক্তপাত (হত্যা), সম্পদ, কিসাস, বৈবাহিক সম্পর্ক ও হুদুদের বিচার করা ফরজ—চাই তিনি তা দায়িত্ব লাভের আগে জেনে থাকেন বা পরে। তিনি বলেন: ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার করা সবচেয়ে শক্তিশালী, এরপর স্বীকৃতির ভিত্তিতে, অতঃপর সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে। [আত-তুরুক আল-হুকমিয়া: পৃষ্ঠা ২৮৫-২৮৭]।

(ص: 121)الأحكام السلطانية للماوردي

فِيهَا إِنْ عَمَّتْ، وَيَجُوزُ أَنْ يُفْضِيَ إِلَى الْعُمُومِ وَإِنْ خُصَّتْ.

وَالْخَامِسُ: تَنْفِيذُ الْوَصَايَا عَلَى شُرُوطِ الْمُوصِي فِيمَا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ وَلَمْ يَحْظُرْهُ، وَإِنْ كَانَتْ لِمُعَيَّنِينَ كَانَ تَنْفِيذُهَا بِالْإِقْبَاضِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مَوْصُوفِينَ كَانَ تَنْفِيذُهَا أَنْ يَتَعَيَّنَ مُسْتَحِقُّوهَا بِالِاجْتِهَادِ وَيَمْلِكُوا بِالْإِقْبَاضِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَصِيٌّ رَاعَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَلَّاهُ.

وَالسَّادِسُ: تَزْوِيجُ الْأَيَامَى بِالْأَكْفَاءِ إِذَا عَدِمْنَ الْأَوْلِيَاءَ وَدُعِينَ إِلَى النِّكَاحِ، وَلَا يَجْعَلُهُ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه مِنْ حُقُوقِ وِلَايَتِهِ؛ لِتَجْوِيزِهِ تُفْرَدُ الْأَيِّمُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ.

وَالسَّابِعُ: إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا، فَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى تَفَرَّدَ بِاسْتِيفَائِهِ مِنْ غَيْرِ طَالِبٍ إِذَا ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى طَلَبِ مُسْتَحِقِّهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَسْتَوْفِيهَا مَعًا إِلَّا بِخَصْمٍ مَطَالِبٍ.

وَالثَّامِنُ: النَّظَرُ فِي مَصَالِحِ عَمَلِهِ مِنَ الْكَفِّ عَنِ التَّعَدِّي فِي الطُّرُقَاتِ وَالْأَفْنِيَةِ، وَإِخْرَاجِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الْأَجْنِحَةِ وَالْأَبْنِيَةِ، وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالنَّظَرِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ خَصْمٌ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ فِيهَا إِلَّا بِحُضُورِ خَصْمٍ مُسْتَعْدٍ، وَهِيَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي يَسْتَوِي فِيهَا الْمُسْتَعْدِي وَغَيْرُ الْمُسْتَعْدِي، فَكَانَ تَفَرُّدُ الْوِلَايَةِ بِهَا أَخَصَّ.

وَالتَّاسِعُ: تَصَفُّحُ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ، وَاخْتِيَارُ النَّائِبِينَ عَنْهُ مِنْ خُلَفَائِهِ فِي إِقْرَارِهِمْ، وَالتَّعْوِيلِ عَلَيْهِمْ، مَعَ ظُهُورِ السَّلَامَةِ وَالِاسْتِقَامَةِ وَصَرْفِهِمْ، وَالِاسْتِبْدَالِ بِهِمْ مَعَ ظُهُورِ الْجُرْحِ وَالْخِيَانَةِ.

وَمَنْ ضَعُفَ مِنْهُمْ عَمَّا يُعَانِيهِ كَانَ مُوَلِّيهِ بِالْخِيَارِ مِنْ أَصْلَحِ الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَأَكْفَى، وَإِمَّا أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ مَنْ يَكُونُ اجْتِمَاعُهُ عَلَيْهِ أَنْفَذَ وَأَمْضَى.

وَالْعَاشِرُ: التَّسْوِيَةُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ وَالْعَدْلُ فِي الْقَضَاءِ بَيْنَ الْمَشْرُوفِ وَالشَّرِيفِ، وَلَا يَتَّبِعُ هَوَاهُ فِي تَقْصِيرِ الْمُحِقِّ أَوْ مُمَايَلَةِ مُبْطِلٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا دَاوُد إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص: 26] .

وَقَدْ اسْتَوْفَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي عَهْدِهِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ شُرُوطَ الْقَضَاءِ، وَبَيَّنَ أَحْكَامَ التَّقْلِيدِ، فَقَالَ فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ،

এতে যদি তা সাধারণ হয়, তবে তা সাধারণত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে যদিও তা বিশেষায়িত করা হয়েছিল।

পঞ্চম: শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত এবং নিষিদ্ধ নয় এমন বিষয়ে অসিয়তকারীর শর্তানুযায়ী অসিয়তসমূহ বাস্তবায়ন করা। যদি তা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য হয়, তবে হস্তান্তরের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হবে। আর যদি তা অনির্ধারিত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য হয়, তবে ইজতিহাদের মাধ্যমে এর হকদারদের নির্ধারণ করে হস্তান্তরের মাধ্যমে তাদের মালিকানা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। যদি এতে কোনো অসি (অসিয়ত বাস্তবায়নকারী) নিযুক্ত থাকে, তবে বিচারক তার তদারকি করবেন; আর যদি না থাকে, তবে তিনি নিজেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

ষষ্ঠ: অভিভাবকহীন নারীদের বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হলে উপযুক্ত পাত্রের সাথে তাদের বিবাহ দেওয়া। ইমাম আবু হানিফা (রা.) একে বিচারকের বিচারিক ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেন না; কারণ তিনি অভিভাবক ছাড়াই নারীর এককভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ মনে করেন।

সপ্তম: দণ্ডপ্রাপ্তদের ওপর হদ বা দণ্ডবিধি কার্যকর করা। যদি তা মহান আল্লাহর হক সংশ্লিষ্ট হয় এবং স্বীকারোক্তি বা প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, তবে কোনো দাবিদার ছাড়াই বিচারক এককভাবে তা কার্যকর করবেন। আর যদি তা মানুষের হক সংশ্লিষ্ট হয়, তবে তা হকদারের দাবির ওপর স্থগিত থাকবে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন: কোনো দাবিদার বা বিবাদী ছাড়া তিনি কোনো দণ্ডই কার্যকর করতে পারবেন না।

অষ্টম: বিচারকের কর্মক্ষেত্রের জনস্বার্থ দেখাশোনা করা; যেমন রাস্তা ও আঙিনায় সীমালঙ্ঘন রোধ করা এবং রাস্তা বা জনপরিসরে অননুমোদিত বর্ধিত অংশ বা স্থাপনা অপসারণ করা। বিবাদীর উপস্থিতি ছাড়াও তিনি এককভাবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন: অভিযোগকারীর উপস্থিতি ছাড়া তার জন্য এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা জায়েজ নয়। তবে এগুলো আল্লাহর হকের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে অভিযোগকারী ও সাধারণ মানুষ সমান; তাই বিচারকের একক কর্তৃত্বই এখানে অধিক প্রযোজ্য।

নবম: বিচারকের সাক্ষী ও আমানতদারদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং তার স্থলাভিষিক্ত নায়েবদের মধ্য থেকে যোগ্যদের নির্বাচন করে তাদের নিয়োগ দান করা ও তাদের ওপর নির্ভর করা, যতক্ষণ তাদের মধ্যে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রকাশ পায়। আর যদি তাদের মাঝে কোনো ত্রুটি বা খিয়ানত পরিলক্ষিত হয়, তবে তাদের অপসারণ করা ও অন্য কাউকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা।

তাদের মধ্যে যারা অর্পিত দায়িত্ব পালনে দুর্বল হয়ে পড়বে, তাদের নিয়োগকর্তা কল্যাণকর পন্থায় দুটি বিকল্পের যেকোনো একটি গ্রহণ করবেন: হয় তাকে অপসারিত করে তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও যোগ্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অথবা তার সাথে এমন কাউকে যুক্ত করে দেবেন যার সহযোগিতায় কাজটি আরও নিপুণ ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন হবে।
দশম: বিচারের ক্ষেত্রে সবল ও দুর্বলের মধ্যে সমতা বজায় রাখা এবং সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মাঝে ন্যায়বিচার করা। সত্যপন্থীর প্রাপ্য কমিয়ে দিতে বা মিথ্যাবাদীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে নিজের খেয়াল-খুশির অনুসরণ না করা। মহান আল্লাহ বলেন: "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছি; সুতরাং তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়ের সাথে বিচার করো এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি; কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গেছে।" [সূরা সোয়াদ: ২৬]
উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর নিকট প্রেরিত পত্রে বিচারকার্যের শর্তাবলি পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন এবং বিচারক নিয়োগের বিধানসমূহ স্পষ্ট করেছেন। তাতে তিনি বলেন: "অতঃপর, বিচারকার্য একটি সুনিশ্চিত ফরজ এবং অনুসরণীয় আদর্শ।"

(ص: 122)الأحكام السلطانية للماوردي

فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ وَمَجْلِسِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ.
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا؛ وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ أَمْسِ فَرَاجَعْتَ الْيَوْمَ فِيهِ عَقْلَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ، أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا تَلَجْلَجَ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ، ثُمَّ اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ، وَقِسِ الْأُمُورَ بِنَظَائِرِهَا، وَاجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى

حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَمَنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ، وَإِلَّا اسْتَحْلَلْتَ الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْفَى لِلشَّكِّ وَأَجْلَى لِلْعَمَى، وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، أَوْ ظِنِّينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ نَسَبٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عَفَا عَنِ الْأَيْمَانِ وَدَرَأَ بِالْبَيِّنَاتِ. وَإِيَّاكَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَفُّفَ بِالْخُصُومِ، فَإِنَّ الْحَقَّ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ يُعَظِّمُ اللَّهُ بِهِ الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ بِهِ الذِّكْرَ، وَالسَّلَامُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَفِي هَذَا الْعَهْدِ خَلَلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدِهِمَا: خُلُوُّهُ مِنْ لَفْظِ التَّقْلِيدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْوِلَايَةُ.

وَالثَّانِي: اعْتِبَارُهُ فِي الشُّهُودِ عَدَالَةَ الظَّاهِرِ وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَالَةُ الْبَاطِنِ بَعْدَ الْكَشْفِ وَالْمَسْأَلَةِ.

قِيلَ: أَمَّا خُلُوُّهُ عَنْ لَفْظِ التَّقْلِيدِ فَفِيهِ جَوَابَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّقْلِيدَ تَقَدَّمَهُ لَفْظًا وَجُعِلَ الْعَهْدُ مَقْصُورًا عَلَى الْوِصَايَةِ وَالْأَحْكَامِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ أَلْفَاظَ الْعَهْدِ تَتَضَمَّنُ مَعَانِيَ التَّقْلِيدِ مِثْلَ قَوْلِهِ: "فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ"، وَكَقَوْلِهِ: "فَمَنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَإِلَّا اسْتَحْلَلْتَ الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ"، فَصَارَ فَحْوَى هَذِهِ الْأَوَامِرِ مَعَ شَوَاهِدِ الْحَالِ مُغْنِيًا عَنْ لَفْظِ التَّقْلِيدِ.

وَأَمَّا اعْتِبَارُهُ فِي الشُّهُودِ عَدَالَةَ الظَّاهِرِ فَفِيهِ جَوَابَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَرَى ذَلِكَ فَذَكَرَهُ إِخْبَارًا عَنِ اعْتِقَادِهِ فِيهِ لَا أَمْرًا بِهِ.

وَالثَّانِي: مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ بَعْدَ الْكَشْفِ وَالْمَسْأَلَةِ عُدُولٌ مَا لَمْ يَظْهَرْ جُرْحٌ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، وَلَيْسَ لِهَذَا الْقَاضِي وَإِنْ عَمَّتْ وِلَايَتُهُ جِبَايَةُ الْخَرَاجِ؛ لِأَنَّ مَصْرِفَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى رَأْيِ غَيْرِهِ مِنْ وُلَاةِ الْجُيُوشِ، فَأَمَّا أَمْوَالُ الصَّدَقَاتِ فَإِنِ اخْتُصَّتْ بِنَاظِرٍ خَرَجَتْ عَنْ عُمُومِ وِلَايَتِهِ، وَإِنْ لَمْ

যখন তোমার কাছে কোনো বিষয় উত্থাপন করা হয় তখন তা গভীরভাবে অনুধাবন করো, কারণ কার্যকর করা যায় না এমন সত্য উচ্চারণ করে কোনো লাভ নেই। তোমার দৃষ্টি, তোমার

ন্যায়বিচার এবং তোমার মজলিসে মানুষের মাঝে সমতা রক্ষা করো, যাতে কোনো উচ্চবংশীয় ব্যক্তি তোমার পক্ষপাতের লালসা না করে এবং কোনো দুর্বল ব্যক্তি তোমার ন্যায়বিচার থেকে নিরাশ না হয়। প্রমাণের ভার দাবিকারীর ওপর এবং শপথের দায় অস্বীকারকারীর ওপর। মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা বৈধ, তবে এমন কোনো সন্ধি নয় যা হারামকে হালাল করে কিংবা হালালকে হারাম করে। গতকাল কোনো বিচার করার পর আজ যদি তোমার বিবেক তোমাকে ভিন্ন কিছু বলে এবং তুমি সঠিক পথ খুঁজে পাও, তবে তা যেন তোমাকে সত্যের দিকে ফিরে আসতে বাধা না দেয়; কারণ সত্য হচ্ছে শাশ্বত এবং মিথ্যার ওপর অটল থাকার চেয়ে সত্যের দিকে ফিরে আসা অনেক শ্রেয়। কুরআন এবং সুন্নাহতে নেই এমন যেসব বিষয় তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে, তা বারবার বোঝার চেষ্টা করো। অতঃপর সমজাতীয় ও সদৃশ বিষয়গুলো চিনে নাও এবং বিষয়গুলোকে সেগুলোর নজির ও দৃষ্টান্তের আলোকে বিচার করো। যে ব্যক্তি কোনো অনুপস্থিত অধিকারের দাবি করে অথবা সাক্ষ্য প্রমাণের অবকাশ চায়, তার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দাও। সে যদি প্রমাণ হাজির করতে পারে তবে তাকে তার অধিকার পাইয়ে দাও, অন্যথায় তার বিপক্ষে চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়ে দাও; এটি সন্দেহের অবসান ঘটাতে এবং দ্বিধা দূর করতে অধিকতর সহায়ক। মুসলমানগণ একে অপরের ওপর ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী হিসেবে গণ্য, তবে তারা ব্যতীত যাদের ওপর হদ জারির মাধ্যমে বেত্রাঘাত করা হয়েছে, অথবা যাদের মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিজ্ঞতা রয়েছে, কিংবা যাদের আনুগত্য বা বংশপরিচয় বিতর্কিত; কারণ আল্লাহ তাআলা শপথের মাধ্যমে বিষয়টি এড়িয়ে যান এবং প্রমাণের মাধ্যমে ফয়সালা নির্ধারণ করেন। বিবাদীদের সাথে বিরক্তি প্রকাশ, খিটখিটে মেজাজ এবং উষ্মা প্রকাশ করা থেকে সতর্ক থেকো; কারণ সত্যের ক্ষেত্রে সত্যের প্রতিফলন ঘটানো হলে আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে দেন এবং সুনাম বৃদ্ধি করেন। ওয়াসসালাম।

যদি প্রশ্ন করা হয়: এই অঙ্গীকারনামায় দুই দিক থেকে বিচ্যুতি রয়েছে:

প্রথমত: এতে ‘নিয়োগ’ শব্দের উল্লেখ নেই যার মাধ্যমে শাসনক্ষমতা বা কর্তৃত্ব অর্পিত হয়।

দ্বিতীয়ত: এতে সাক্ষীদের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ন্যায়নিষ্ঠতাকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, অথচ তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের পর অভ্যন্তরীণ ন্যায়নিষ্ঠাই বিচার্য হওয়ার কথা।

এর উত্তরে বলা হয়: ‘নিয়োগ’ শব্দ না থাকার পেছনে দুটি জবাব রয়েছে:

এক: নিয়োগের বিষয়টি ভাষাগতভাবে আগেই সম্পন্ন হয়েছে এবং এই অঙ্গীকারনামাটিকে কেবল উপদেশ ও বিচারিক বিধিনিষেধের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

দুই: এই অঙ্গীকারনামার শব্দাবলির মধ্যেই নিয়োগের অর্থ নিহিত রয়েছে, যেমন তাঁর এই কথা: "যখন তোমার কাছে কোনো বিষয় উত্থাপন করা হয় তখন তা অনুধাবন করো", এবং তাঁর এই উক্তি: "সে যদি প্রমাণ হাজির করতে পারে তবে তাকে তার অধিকার পাইয়ে দাও, অন্যথায় তার বিপক্ষে ফয়সালা দাও।" সুতরাং উদ্ভূত পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণের সাথে এই নির্দেশগুলোর অন্তর্নিহিত গুরুত্বই নিয়োগ শব্দের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে দিয়েছে।
আর সাক্ষীদের বাহ্যিক ন্যায়নিষ্ঠা বিবেচনার বিষয়েও দুটি উত্তর রয়েছে:
এক: হতে পারে এটি এমন ব্যক্তির অভিমত যিনি একে বৈধ মনে করেন, তাই তিনি নিজের বিশ্বাসের ভিত্তিতে এটি বর্ণনা করেছেন, আদেশ হিসেবে নয়।
দুই: এর অর্থ হলো—তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ বলে গণ্য হবেন যতক্ষণ না তাদের কোনো ত্রুটি প্রকাশ পায়, তবে হদ জারির কারণে বেত্রাঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম। এই বিচারকের বিচারিক ক্ষমতা ব্যাপক হলেও তার জন্য ভূমি কর বা খারাজ আদায়ের কোনো এখতিয়ার নেই; কারণ এর ব্যয়ভার সামরিক প্রশাসকদের মতো অন্য কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। আর যাকাতের অর্থের ক্ষেত্রে, যদি তার জন্য আলাদা কোনো তত্ত্বাবধায়ক নির্দিষ্ট থাকে, তবে তা বিচারকের সাধারণ বিচারিক ক্ষমতার আওতাভুক্ত থাকবে না; আর যদি না থাকে...

(ص: 123)الأحكام السلطانية للماوردي

يُنْدَبُ لَهَا نَاظِرٌ فَقَدْ قِيلَ: تَدْخُلُ فِي عُمُومِ وِلَايَتِهِ فَيَقْبِضُهَا مِنْ أَهْلِهَا وَيَصْرِفُهَا فِي مُسْتَحَقِّيهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَنْ سَمَّاهُ لَهَا. وَقِيلَ: لَا تَدْخُلُ فِي وِلَايَتِهِ، وَيَكُونُ مَمْنُوعًا مِنَ التَّعَرُّضِ لَهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تُحْمَلُ عَلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي إِمَامَةِ الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ. فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ خَاصَّةً فَهِيَ مُنْعَقِدَةٌ عَلَى خُصُوصِهَا، وَمَقْصُورَةُ النَّظَرِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ، كَمَنْ قُلِّدَ الْقَضَاءَ فِي بَعْضِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَحْكَامِ، أَوْ فِي الْحُكْمِ بِإِقْرَارٍ دُونَ الْبَيِّنَةِ، أَوْ فِي الدُّيُونِ دُونَ الْمَنَاكِحِ، أَوْ

فِي مُقَدَّرٍ بِنِصَابٍ، فَيَصِحُّ هَذَا التَّقْلِيدُ وَلَا يَصِحُّ لِلْمُوَلِّي أَنْ يَتَعَدَّاهُ؛ لِأَنَّهَا اسْتِنَابَةٌ فَصَحَّتْ عُمُومًا وخُصُوصًا كَالْوَكَالَةِ.

فصل:

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي عَامَّ النَّظَرِ خَاصَّ الْعَمَلِ، فَيُقَلَّدُ النَّظَرَ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْبَلَدِ أَوْ فِي مَحَلَّةٍ مِنْهُ، فَيَنْفُذُ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ فِي الْجَانِبِ الَّذِي قَلَّدَهُ، وَالْمَحَلَّةِ الَّتِي عُيِّنَتْ لَهُ، وَيَنْظُرُ فِيهِ بَيْنَ سَاكِنِيهِ وَبَيْنَ الطَّارِئِينَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الطَّارِئَ إلَيْهِ كَالسَّاكِنِ فِيهِ، إلَّا أَنْ يَقْتَصِرَ بِهِ عَلَى النَّظَرِ بَيْنَ سَاكِنِيهِ دُونَ الْغَرِيبِينَ وَالطَّارِئِينَ إلَيْهِ فَلَا يَتَعَدَّاهُمْ.

وَلَوْ قُلِّدَ جَمِيعَ الْبَلَدِ لِيَحْكُمَ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ أَوْ فِي مَحَلَّةٍ مِنْهُ أَوْ فِي دَارٍ مِنْ دُورِهِ جَازَ لَهُ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعِ جُلُوسِهِ مَعَ عُمُومِ وِلَايَتِهِ، فَإِنْ أُخْرِجَ ذَلِكَ مَخْرَجَ الشَّرْطِ فِي عَقْدِ الْوِلَايَةِ أَبْطَلَهَا، وَكَانَ مَرْدُودَ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَغَيْرِهِ، وَلَوْ قُلِّدَ الْحُكْمَ فِيمَنْ وَرَدَ إلَيْهِ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مَسْجِدِهِ صَحَّ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَحْكُمَ فِي غَيْرِ دَارِهِ، وَلَا فِي غَيْرِ مَسْجِدِهِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ وِلَايَتَهُ مَقْصُورَةً عَلَى مَنْ وَرَدَ إلَى دَارِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ، وَهُمْ لَا يَتَعَيَّنُونَ إلَّا بِالْوُرُودِ إلَيْهِمَا، فَلِذَلِكَ صَارَ حُكْمُهُ فِيهِمَا شَرْطًا.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ: لَمْ تَزَلِ الْأُمَرَاءُ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ بُرْهَةً مِنَ الدَّهْرِ يَسْتَقْضُونَ قَاضِيًا عَلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ يُسَمُّونَهُ قَاضِيَ الْمَسْجِدِ، يَحْكُمُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا فَمَا دُونَهَا، وَيَفْرِضُ النَّفَقَاتِ وَلَا يَتَعَدَّى مَوْضِعَهُ وَلَا مَا قُدِّرَ لَهُ.

এর জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা মুস্তাহাব। বলা হয়েছে যে, এটি তার সাধারণ কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে, ফলে তিনি পাওনাদারদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করবেন এবং হকদারদের মধ্যে বণ্টন করবেন; কারণ এটি মহান আল্লাহর নির্ধারিত হকসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আবার বলা হয়েছে যে, এটি তার কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং তিনি এতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবেন; কারণ এটি সম্পদের সেই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত যা ইমামদের ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল। জুমুআ এবং ঈদের ইমামতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তবে যদি তার কর্তৃত্ব বিশেষায়িত হয়, তবে তা সেই বিশেষ বিষয়ের ওপরই সাব্যস্ত হবে এবং এর আওতা কেবল তাতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যেমন—যাকে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি এমন কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ে বিচারিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, অথবা সাক্ষী ছাড়াই কেবল স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, অথবা বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া কেবল ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে, কিংবা নিসাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিষয়ে বিচার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের নিয়োগ বৈধ এবং নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য এর সীমা লঙ্ঘন করা বৈধ নয়; কারণ এটি একটি প্রতিনিধিত্ব, তাই ওকালতের ন্যায় এটি সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে উভয়ভাবেই বৈধ।

পরিচ্ছেদ:

বিচারকের জন্য সাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা কিন্তু বিশেষ কার্যপরিধি থাকা জায়েজ। যেমন তাকে শহরের কোনো এক পাশে বা কোনো এক মহল্লায় সকল প্রকার বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হলো। এমতাবস্থায় তার নির্ধারিত এলাকায় এবং নির্ধারিত মহল্লায় তার সকল বিচারিক রায় কার্যকর হবে। তিনি সেখানে বসবাসকারী এবং সেখানে আগত ব্যক্তিদের মধ্যে বিচার করবেন; কারণ আগত ব্যক্তিও সেখানে বসবাসকারীর ন্যায়। তবে যদি তাকে কেবল স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে বিচারের অনুমতি দেওয়া হয় এবং বহিরাগত বা নবাগতদের ক্ষেত্রে অনুমতি না দেওয়া হয়, তবে তিনি তাদের বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন করতে পারবেন না।

যদি তাকে পুরো শহরের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় কিন্তু শহরের কোনো এক অংশে বা কোনো এক মহল্লায় অথবা কোনো একটি বাড়িতে বিচারকার্য পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে তার জন্য শহরের যেকোনো স্থানে বিচারকার্য পরিচালনা করা জায়েজ। কারণ তার কর্তৃত্ব সাধারণ হওয়ার কারণে তার বসার স্থানের ওপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি বিষয়টি নিয়োগ চুক্তিতে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়, তবে তা নিয়োগটিকেই বাতিল করে দেবে এবং ওই স্থানে বা অন্য কোথাও তার বিচারিক রায় অগ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি তাকে তার নিজের বাড়িতে বা মসজিদে আগতদের মধ্যে বিচার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে তা সঠিক হবে। সেক্ষেত্রে তার নিজের বাড়ি বা ওই মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও বিচার করা তার জন্য বৈধ হবে না; কারণ তার কর্তৃত্ব কেবল তার বাড়িতে বা মসজিদে আগতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, আর তারা সেখানে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত চিহ্নিত হয় না। তাই সেক্ষেত্রে ওই স্থানগুলোতে বিচারকার্য পরিচালনা করা একটি শর্ত হিসেবে গণ্য হবে।

আবু আবদুল্লাহ আল-জুবায়রী বলেন: আমাদের বসরায় দীর্ঘকাল ধরে আমিরগণ জামে মসজিদের জন্য একজন বিচারক নিয়োগ করতেন, যাকে তারা 'মসজিদের বিচারক' বলতেন। তিনি দুইশত দিরহাম বা বিশ দিনার অথবা তার চেয়ে কম পরিমাণের বিষয়ে বিচার করতেন এবং ভরণপোষণ নির্ধারণ করতেন। তিনি তার নির্ধারিত স্থান এবং নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতেন না।

(ص: 124)الأحكام السلطانية للماوردي

فَصْلٌ:

وَإِذَا قُلِّدَ قَاضِيَانِ عَلَى بَلَدٍ لَمْ يَخْلُ حَالُ تَقْلِيدِهِمَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَرِدَ إِلَى أَحَدِهِمَا مَوْضِعًا مِنْهُ، وَإِلَى الْآخَرِ غَيْرُهُ فَيَصِحُّ، وَيَقْتَصِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى النَّظَرِ فِي مَوْضِعِهِ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَرِدَ إِلَى أَحَدِهِمَا نَوْعٌ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَإِلَى الْآخَرِ غَيْرُهُ؛ كَرَدِّ الْمُدَايَنَاتِ إِلَى أَحَدِهِمَا وَالْمَنَاكِحِ إِلَى الْآخَرِ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ، وَيَقْتَصِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى النَّظَرِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ الْخَاصِّ فِي الْبَلَدِ كُلِّهِ.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَرِدَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَمِيعُ الْأَحْكَامِ فِي جَمِيعِ الْبَلَدِ، فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي جَوَازِهِ، فَمَنَعَتْ مِنْهُ طَائِفَةٌ لِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ أَمْرُهُمَا مِنَ التَّشَاجُرِ فِي تَجَاذُبِ الْخُصُومِ إِلَيْهِمَا، وَتَبْطُلُ وِلَايَتُهُمَا إِنِ اجْتَمَعَتْ، وَتَصِحُّ وِلَايَةُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا إِنِ افْتَرَقَتْ، وَأَجَازَتْهُ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ؛ لِأَنَّهَا اسْتِنَابَةٌ كَالْوَكَالَةِ، وَيَكُونُ الْقَوْلُ عِنْدَ تَجَاذُبِ الْخُصُومِ قَوْلَ الطَّالِبِ دُونَ الْمَطْلُوبِ، فَإِنْ تَسَاوَيَا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْحَاكِمَيْنِ إِلَيْهِمَا، فَإِنْ اسْتَوَيَا فَقَدْ قِيلَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ: يُمْنَعَانِ مِنَ التَّحَاكُمِ حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى أَحَدِهِمَا.

পরিচ্ছেদ:

যখন একটি শহরে দুইজন বিচারক নিযুক্ত করা হয়, তখন তাদের নিয়োগের বিষয়টি তিনটি অবস্থার বাইরে থাকে না:

প্রথমটি: শহরের একটি এলাকা একজনের জন্য এবং অন্য এলাকাটি অপরজনের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া। এটি বৈধ এবং তারা প্রত্যেকে কেবল স্বীয় এলাকায় বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

দ্বিতীয় প্রকার: একজনের নিকট এক ধরণের বিচার্য বিষয় অর্পণ করা এবং অপরজনের নিকট অন্যটি; যেমন ঋণ সংক্রান্ত বিরোধের ভার একজনের ওপর এবং বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ের ভার অপরজনের ওপর ন্যস্ত করা। এটি বৈধ এবং তারা প্রত্যেকেই সমগ্র শহরে কেবল সেই বিশেষ বিষয়েই বিচারিক এখতিয়ার রাখবেন।

তৃতীয় প্রকার: তাদের প্রত্যেকের ওপর শহরের সমস্ত বিচারিক বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা। এর বৈধতার ব্যাপারে আমাদের ফকিহগণ মতভেদ করেছেন। একদল এটি নিষিদ্ধ করেছেন, কারণ এর ফলে বিবাদমান পক্ষগুলোকে নিজ দিকে টানার ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। যদি তাদের উভয়কে একসাথে নিয়োগ দেওয়া হয় তবে উভয়ের নিয়োগ বাতিল গণ্য হবে, আর যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিয়োগ দেওয়া হয় তবে প্রথমজনের নিয়োগ সঠিক বলে গণ্য হবে। অন্য একদল এটি বৈধ বলেছেন এবং তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ; কেননা এটি ওকালতির মতো এক ধরণের প্রতিনিধিত্ব। বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে মতানৈক্যের ক্ষেত্রে বিবাদীর পরিবর্তে বাদীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি তারা সমপর্যায়ের হয় তবে বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের নিকটবর্তী বিচারককে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর যদি তাতেও সমান হয় তবে বলা হয়েছে: লটারির মাধ্যমে ফয়সালা করা হবে; আবার বলা হয়েছে: তারা কোনো একজনের বিষয়ে একমত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিচারপ্রক্রিয়া থেকে বিরত রাখা হবে।

(ص: 125)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل:

وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وِلَايَةُ الْقَاضِي مَقْصُورَةً عَلَى حُكُومَةٍ مُعَيَّنَةٍ بَيْنَ خَصْمَيْنِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفُذَ النَّظَرُ بَيْنَهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الْخُصُومِ، وَتَكُونُ وِلَايَتُهُ عَلَى النَّظَرِ بَيْنَهُمَا بَاقِيَةً مَا كَانَ التَّشَاجُرُ بَيْنَهُمَا بَاقِيًا، فَإِذَا بَتَّ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا زَالَتْ وِلَايَتُهُ، وَإِنْ تَجَدَّدَتْ بَيْنَهُمَا مُشَاجَرَةٌ أُخْرَى لَمْ يَنْظُرْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِإِذْنٍ مُسْتَجَدٍّ، فَلَوْ لَمْ يُعَيِّنِ الْخُصُومَ وَجَعَلَ النَّظَرَ مَقْصُورًا عَلَى الْأَيَّامِ، وَقَالَ: قَلَّدْتُكَ النَّظَرَ بَيْنَ الْخُصُومِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ وَحْدَهُ، جَازَ نَظَرُهُ فِيهِ بَيْنَ الْخُصُومِ فِي جَمِيعِ الدَّعَاوَى، وَتَزُولُ وِلَايَتُهُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْهُ، وَلَوْ قَالَ: قَلَّدْتُكَ النَّظَرَ فِي كُلِّ يَوْمِ سَبْتٍ جَازَ أَيْضًا، وَكَانَ مَقْصُورَ النَّظَرِ فِيهِ.

فَإِذَا خَرَجَ يَوْمُ السَّبْتِ لَمْ تَزُلْ وِلَايَتُهُ لِبَقَائِهَا عَلَى أَمْثَالِهِ مِنَ الْأَيَّامِ، وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنَ النَّظَرِ فِيمَا عَدَاهُ، وَلَوْ قَالَ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا: مَنْ نَظَرَ فِي يَوْمِ السَّبْتِ بَيْنَ الْخُصُومِ فَهُوَ خَلِيفَتِي، لَمْ يَجُزْ لِلْجَهْلِ بِالْمُوَلَّى؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، فَلَوْ قَالَ: مَنْ نَظَرَ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فَهُوَ خَلِيفَتِي، لَمْ يَجُزْ أَيْضًا لِلْجَهْلِ بِهِ، وَلِأَنَّهُ يُصَيِّرُ تَمْيِيزَ الْمُجْتَهِدِ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ غَيْرِهِ مِنَ الْخُصُومِ.

وَلَوْ قَالَ: مَنْ نَظَرَ فِيهِ مِنْ مُدَرِّسِي أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَوْ مُفْتِيِّي أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ لَمْ يَجُزْ، وَكَذَلِكَ لَوْ سَمَّى عَدَدًا فَقَالَ: مَنْ نَظَرَ فِيهِ مِنْ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ فَهُوَ خَلِيفَتِي لَمْ يَجُزْ، سَوَاءٌ قَلَّ الْعَدَدُ أَوْ كَثُرَ؛ لِأَنَّ الْمُوَلَّى مِنْهُمْ مَجْهُولٌ، لَكِنْ إِذَا قَالَ: قَدْ رَدَدْتُ النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، جَازَ سَوَاءٌ قَلَّ الْعَدَدُ أَوْ كَثُرَ؛ لِأَنَّ جَمِيعَهُمْ مُوَلًّى فَإِذَا نَظَرَ فِيهِ أَحَدُهُمْ تَعَيَّنَ وَزَالَ نَظَرُ الْبَاقِينَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْهُمْ عَلَى النَّظَرِ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَ بِهِ أَحَدَهُمْ، فَإِنْ جَمَعَهُمْ عَلَى النَّظَرِ فِيهِ لَمْ يَجُزْ إِنْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ، وَفِي جَوَازِهِمْ إِنْ قَلَّ وَجْهَانِ مِنِ اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ قَاضِيَيْنِ.

পরিচ্ছেদ:

বিচারকের বিচারিক এখতিয়ার দুই বিবাদমান পক্ষের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট মামলার ফয়সালার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বৈধ। এমতাবস্থায় ওই দুইজন ব্যতীত অন্য কোনো বিবাদমান পক্ষের বিচার করা তার জন্য বৈধ হবে না। তাদের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত

তার বিচারিক এখতিয়ার বহাল থাকবে। যখন তিনি তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন, তখন তার বিচারিক এখতিয়ার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এরপর যদি তাদের মাঝে নতুন কোনো বিবাদের উদ্ভব হয়, তবে নতুন অনুমতি ব্যতীত তিনি তাদের বিচার করতে পারবেন না। কিন্তু যদি তিনি বিবাদমান পক্ষগুলোকে নির্দিষ্ট না করে বিচারিক কার্যক্রমকে নির্দিষ্ট দিনগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন এবং বলেন: 'আমি তোমাকে শুধু শনিবারের দিন বিবাদীদের বিচার করার দায়িত্ব প্রদান করলাম', তবে সেই দিনে সকল মামলার বিবাদীদের বিচার করা তার জন্য বৈধ হবে এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথে তার বিচারিক এখতিয়ার বিলুপ্ত হবে। আর যদি তিনি বলেন: 'আমি তোমাকে প্রতি শনিবারে বিচার করার দায়িত্ব দিলাম', তবে তাও বৈধ হবে এবং তার বিচারিক ক্ষমতা কেবল ওই দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

শনিবার শেষ হয়ে গেলে তার বিচারিক এখতিয়ার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে না, কারণ পরবর্তী শনিবারগুলোতে তা বহাল থাকবে; যদিও ওই দিন ব্যতীত অন্য দিনগুলোতে তিনি বিচার করার অধিকার পাবেন না। আর যদি তিনি (নিয়োগকর্তা) কাউকে নির্দিষ্ট না করে বলেন: 'শনিবার যে ব্যক্তি বিবাদমান পক্ষগুলোর বিচার করবে সেই আমার প্রতিনিধি', তবে নিযুক্ত ব্যক্তি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে তা বৈধ হবে না। কারণ, যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করার যোগ্য নয়, সে-ও বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারে। আবার যদি তিনি বলেন: 'মুজতাহিদগণের মধ্যে যে ব্যক্তি এই দিনে বিচারকার্য পরিচালনা করবে সে-ই আমার প্রতিনিধি', তবে তাও বৈধ হবে না; কারণ এতে নিযুক্ত ব্যক্তি অজ্ঞাত থেকে যায় এবং মুজতাহিদ নির্ধারণের বিষয়টি বিবাদমান পক্ষগুলোর মতামতের ওপর ন্যস্ত হয়।

আর যদি তিনি বলেন: 'শাফিঈ মাযহাবের শিক্ষকগণের মধ্য থেকে অথবা হানাফী মাযহাবের মুফতীগণের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি বিচার করবে (সে আমার প্রতিনিধি)', তবে তা বৈধ হবে না। একইভাবে যদি তিনি নির্দিষ্ট কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে বলেন: 'অমুক অথবা অমুকের মধ্যে যে ব্যক্তি এতে বিচার করবে সে আমার প্রতিনিধি', তবে তাও বৈধ হবে না—চাই সেই সংখ্যা কম হোক বা বেশি; কারণ তাদের মধ্যে কে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত তা অজ্ঞাত। কিন্তু যদি তিনি বলেন: 'আমি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অমুক, অমুক ও অমুকের ওপর অর্পণ করলাম', তবে তা বৈধ হবে—চাই সেই সংখ্যা কম হোক বা বেশি; কারণ তারা সকলেই এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত। সুতরাং যখন তাদের মধ্যে কেউ একজন বিচারে প্রবৃত্ত হবেন, তখন তিনিই নির্দিষ্ট বিচারক হিসেবে গণ্য হবেন এবং অন্যদের বিচারিক এখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে। কেননা তিনি সকলকে একত্রে বিচার করতে বলেননি, বরং তাদের মধ্যে একজনকে

এককভাবে দায়িত্ব দিয়েছেন। আর যদি তিনি সকলকে একত্রে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন, তবে তাদের সংখ্যা অধিক হলে তা বৈধ হবে না। আর সংখ্যায় কম হলে তা বৈধ কি না, সে বিষয়ে আমাদের (শাফিঈ) মাযহাবের আলেমদের মাঝে দুইজন বিচারককে একত্রে নিয়োগ দান বিষয়ক মতপার্থক্যের ভিত্তিতে দুইটি অভিমত রয়েছে।

(ص: 126)الأحكام السلطانية للماوردي

فَصْلٌ:

فَأَمَّا طَلَبُ الْقَضَاءِ وَخُطْبَةُ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ: فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِيهِ كَانَ تَعَرُّضُهُ لِطَلَبِهِ مَحْظُورًا، وَصَارَ بِالطَّلَبِ مَجْرُوحًا، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَجُوزُ مَعَهَا نَظَرُهُ فَلَهُ فِي طَلَبِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ، إِمَّا لِنَقْصِ عِلْمِهِ، وَإِمَّا لِظُهُورِ جَوْرِهِ فَيَخْطُبُ الْقَضَاءَ دَفْعًا لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ؛ لِيَكُونَ فِيمَنْ هُوَ بِالْقَضَاءِ أَحَقُّ، فَهَذَا سَائِغٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ دَفْعِ مُنْكَرٍ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ قَصْدِهِ إِزَالَةَ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ كَانَ مَأْجُورًا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ اخْتِصَاصَهُ بِالنَّظَرِ فِيهِ كَانَ مُبَاحًا.

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ فِي مُسْتَحِقِّهِ وَمَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَيُرِيدُ أَنْ يَعْزِلَهُ عَنْهُ، إِمَّا لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا، وَإِمَّا لِيَجُرَّ بِالْقَضَاءِ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا؛ فَهَذَا الطَّلَبُ مَحْظُورٌ، وَهُوَ بِهَذَا الطَّلَبِ مَجْرُوحٌ.

وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْقَضَاءِ نَاظِرٌ وَهُوَ خَالٍ مِنْ وَالٍ عَلَيْهِ؛ فَيُرَاعِي فِي طَلَبِهِ؛ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَتِهِ إِلَى رِزْقِ الْقَضَاءِ الْمُسْتَحَقِّ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَانَ طَلَبُهُ مُبَاحًا، وَإِنْ كَانَ لِرَغْبَةٍ فِي إِقَامَةِ الْحَقِّ وَخَوْفِهِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ كَانَ طَلَبُهُ مُسْتَحَبًّا، فَإِنْ قَصَدَ بِطَلَبِهِ الْمُبَاهَاةَ وَالْمَنْزِلَةَ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ، مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِهِ،

فَكَرِهَتْهُ طَائِفَةٌ؛ لِأَنَّ طَلَبَ الْمُبَاهَاةِ وَالْمَنْزِلَةِ فِي الدُّنْيَا مَكْرُوهٌ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص: 83] .

وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى إِلَى أَنَّ طَلَبَهُ لِذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ لِأَنَّ طَلَبَ الْمَنْزِلَةِ مِمَّا أُبِيحَ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ. وَقَدْ رَغِبَ نَبِيُّ اللَّهِ يُوسُفَ عليه السلام إِلَى فِرْعَوْنَ1 فِي الْوِلَايَةِ وَالْخِلَافَةِ فَقَالَ: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55] .

---

1 قلت: في سورة يوسف لم يستخدم القرآن الكريم كلمة فرعون أبدًا، وإنما استخدم كلمة الملك كثيرًا، وأغلب المؤرِّخين على أن يوسف كان في عهد الهكسوس وليس في عهد الفراعنة.

পরিচ্ছেদ:

বিচারকের পদের আবেদন করা এবং এ বিষয়ে শাসকদের নিকট প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে বিধান হলো: যদি আবেদনকারী এই পদের জন্য প্রয়োজনীয় ইজতিহাদ বা আইনগত প্রজ্ঞার অধিকারী না হয়, তবে তার জন্য এই পদের আবেদন করা নিষিদ্ধ এবং এই আবেদনের কারণেই সে অযোগ্য ও বিতর্কিত হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে সে যদি এই পদের যোগ্য হয় এবং বিচারকার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে তার আবেদনের ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা রয়েছে:

প্রথমত: বিচারকের পদটি যদি এমন কোনো ব্যক্তির অধীনে থাকে যে তার যোগ্য নয়—হয় তার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে অথবা তার অবিচার প্রকাশ পাওয়ার কারণে—এমতাবস্থায় অযোগ্য ব্যক্তিকে সরিয়ে যোগ্যতর কাউকে স্থলাভিষিক্ত করার উদ্দেশ্যে বিচারক পদ প্রার্থনা করা জায়েজ। কারণ এর মধ্যে মন্দ কাজ প্রতিরোধের উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। এরপর লক্ষ্য করতে হবে যে, তার প্রধান উদ্দেশ্য যদি অযোগ্য ব্যক্তিকে অপসারণ করা হয়, তবে সে সওয়াব লাভ করবে। আর যদি তার প্রধান উদ্দেশ্য কেবল নিজের জন্য বিচারিক ক্ষমতা লাভ করা হয়, তবে তা বৈধ হিসেবে গণ্য হবে।

দ্বিতীয়ত: বিচারক পদটি যদি এমন এক যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তির অধীনে থাকে যাকে সরিয়ে আবেদনকারী নিজে সেই পদে বসতে চায়—তা হতে পারে তাদের মধ্যকার শত্রুতার কারণে অথবা পদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে—তবে এই ধরনের আবেদন করা নিষিদ্ধ এবং এর ফলে আবেদনকারী অযোগ্য হিসেবে গণ্য হবে।

তৃতীয়ত: যদি বিচারকের পদটি শূন্য থাকে এবং সেখানে কোনো বিচারক নিযুক্ত না থাকে, তবে আবেদনের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হবে। আবেদনটি যদি বায়তুল মাল থেকে বিচারকের প্রাপ্য ভাতার প্রয়োজনের কারণে হয়, তবে তা বৈধ। আর যদি সত্য প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা এবং অযোগ্য কেউ এই পদে আসীন হওয়ার আশঙ্কায় করা হয়, তবে তা মুস্তাহাব বা উত্তম। কিন্তু যদি সে এই পদের মাধ্যমে আভিজাত্য ও মর্যাদা প্রদর্শনের ইচ্ছা করে, তবে এর অপছন্দনীয় বা মাকরূহ হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, যদিও তা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। একদল আলিম একে মাকরূহ বলেছেন; কারণ দুনিয়াতে আভিজাত্য ও উচ্চ মর্যাদা প্রার্থনা করা নিন্দনীয়। মহান আল্লাহ বলেন: "এই পরকাল আমি তাদের জন্যই নির্ধারণ করি, যারা পৃথিবীতে উদ্ধত হতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য।" [সূরা আল-কাসাস: ৮৩]।

অন্য একদল আলিমের মতে, এই উদ্দেশ্যে আবেদন করা মাকরূহ নয়; কারণ বৈধ বিষয়ের ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদা আকাঙ্ক্ষা করা দোষণীয় নয়। আল্লাহর নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরের অধিপতির কাছে শাসনক্ষমতা ও প্রতিনিধিত্বের আগ্রহ প্রকাশ করে বলেছিলেন: "আপনি আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন, আমি অবশ্যই বিশ্বস্ত সংরক্ষক ও অভিজ্ঞ।" [সূরা ইউসুফ: ৫৫]।

---

১. আমি বলি: সূরা ইউসুফে পবিত্র কুরআন কখনোই 'ফিরআউন' শব্দটি ব্যবহার করেনি, বরং বারবার 'মালিক' বা 'রাজা' শব্দটি ব্যবহার করেছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম হিকসোস রাজবংশের রাজত্বকালে ছিলেন, ফিরআউনদের আমলে নয়।

فَطَلَبُ الْوِلَايَةِ وَوَصْفُ نَفْسِهِ بِمَا يَسْتَحِقُّهَا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: {إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} وَفِيهِ تَأْوِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: حَفِيظٌ لِمَا اسْتَوْدَعْتَنِي عَلِيمٌ بِمَا وَلَّيْتَنِي، وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ حَفِيظٌ لِلْحِسَابِ عَلِيمٌ بِالْأَلْسُنِ، وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ سُفْيَانَ، وَخَرَجَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ حَدِّ التَّزْكِيَةِ لِنَفْسِهِ وَالْمَدْحِ لَهَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِسَبَبٍ دَعَا إِلَيْهِ، وَاخْتُلِفَ لِأَجْلِ ذَلِكَ فِي جَوَازِ الْوِلَايَةِ مِنْ قِبَلِ الظَّالِمِ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى جَوَازِهَا إِذَا عَمِلَ بِالْحَقِّ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ؛ لِأَنَّ يُوسُفَ عليه السلام تَوَلَّى مِنْ قِبَلِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ بِعَدْلِهِ دَافِعًا لِجَوْرِهِ.

وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى إِلَى حَظْرِهَا وَالْمَنْعِ مِنَ التَّعَرُّضِ لَهَا لِمَا فِيهَا مِنْ تَوَلِّي الظَّالِمِينَ وَالْمَعُونَةِ لَهُمْ وَتَزْكِيَتِهِمْ بِالتَّقْلِيدِ أَوْ أَمْرِهِمْ.

وَأَجَابُوا عَنْ وِلَايَةِ يُوسُفَ عليه السلام مِنْ قِبَلِ فِرْعَوْنَ بِجَوَابَيْنِ:

أَحَدِهِمَا: أَنَّ فِرْعَوْنَ يُوسُفَ كَانَ صَالِحًا، وَإِنَّمَا الطَّاغِي فِرْعَوْن مُوسَى.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ نَظَرَ فِي أَمْلَاكِهِ دُونَ أَعْمَالِهِ.

فَأَمَّا بَذْلُ الْمَالِ عَلَى طَلَبِ الْقَضَاءِ فَمِنَ الْمَحْظُورَاتِ؛ لِأَنَّهَا رِشْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ يَصِيرُ الْبَاذِلُ لَهَا وَالْقَابِلُ لَهَا مَجْرُوحَيْنِ.

رَوَى ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ1.

وَالرَّاشِي: بَاذِلُ الرِّشْوَةِ، وَالْمُرْتَشِي: قَابِلُهَا، وَالرَّائِشُ: الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُمَا.

---

1 صحيح دون قوله: والرائش.

সুতরাং দায়িত্ব প্রার্থনা করা এবং নিজেকে সে পদের যোগ্য হিসেবে বর্ণনা করা—যেমন তাঁর উক্তি: "নিশ্চয়ই আমি হিফাজতকারী ও জ্ঞানবান"—এর ব্যাপারে দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

প্রথমটি: আপনি আমাকে যে বিষয়ের আমানত দেবেন আমি তার রক্ষক এবং আপনি আমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করবেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। এটি আবদুর রহমান ইবনে যায়িদের অভিমত।

দ্বিতীয়টি: তিনি হিসাব রক্ষায় পটু এবং বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ। এটি ইসহাক ইবনে সুফিয়ানের বক্তব্য। এই বক্তব্যটি আত্ম-প্রশংসা বা নিজের গুণকীর্তনের গণ্ডি বহির্ভূত; কারণ এটি একটি বিশেষ প্রয়োজনে উচ্চারিত হয়েছিল। আর এ কারণেই জালেম শাসকের পক্ষ থেকে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করার বৈধতা নিয়ে মতভেদ তৈরি হয়েছে। একদল আলিম একে জায়েজ বলেছেন যখন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁর ওপর অর্পিত কার্যাবলিতে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন; কারণ ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ফেরাউনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন যাতে নিজের ইনসাফের মাধ্যমে তার জুলুম প্রতিহত করতে পারেন।

অন্য একদল আলিম এটি নিষিদ্ধ গণ্য করেছেন এবং জালেমের নিকট হতে পদ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে বলেছেন। কারণ এতে জালেমদের কর্তৃত্ব স্বীকার করা, তাদের সহায়তা করা এবং তাদের নিয়োগ বা আদেশের মাধ্যমে তাদের বৈধতা দান করার বিষয়টি বিদ্যমান থাকে।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক ফেরাউনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা দুটি উত্তর দিয়েছেন:

প্রথমত: ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সময়কার ফেরাউন সৎ ব্যক্তি ছিলেন, আর পাপিষ্ঠ তো ছিল মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর সময়কার ফেরাউন।

দ্বিতীয়ত: তিনি কেবল তাঁর ধন-সম্পদ তদারকি করেছেন, তাঁর প্রশাসনিক কর্ম নয়।

তবে বিচারকের পদ লাভের আশায় অর্থ ব্যয় করা নিষিদ্ধ কাজের অন্তর্ভুক্ত; কেননা এটি একটি হারাম ঘুষ, যার ফলে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই অযোগ্য বলে বিবেচিত হন।

সাবিত (রহ.) আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুষ দাতা, ঘুষ গ্রহীতা এবং উভয়ের মধ্যস্থতাকারীর ওপর লানত করেছেন ১।

'রাশি' হলো ঘুষ প্রদানকারী, 'মুরতাশি' হলো ঘুষ গ্রহণকারী এবং 'রায়িশ' হলো তাদের উভয়ের মধ্যস্থতাকারী।

---

১ সহীহ, তবে "এবং মধ্যস্থতাকারী" কথাটি ব্যতীত।

فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء"

وَلَيْسَ لِمَنْ تَقَلَّدَ الْقَضَاءَ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّةً مِنْ خَصْمٍ وَلَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَصْمٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَعْدِيهِ فِيمَا يَلِيهِ1.

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ"2.

فَإِنْ قَبِلَهَا وَعَجَّلَ الْمُكَافَأَةَ عَلَيْهَا مَلَكَهَا، وَإِنْ لَمْ يُعَجِّلِ الْمُكَافَأَةَ عَلَيْهَا كَانَ بَيْتُ الْمَالِ أَحَقَّ بِهَا إِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا عَلَى الْمُهْدِي؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْخُصُومِ إِذَا تَنَازَعُوا إِلَيْهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْجَبَ إِلَّا فِي أَوْقَاتِ الِاسْتِرَاحَةِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لِأَحَدٍ مِنْ وَالِدَيْهِ وَلَا مِنْ أَوْلَادِهِ لِأَجْلِ التُّهْمَةِ وَيَحْكُمُ عَلَيْهِمْ لِارْتِفَاعِهَا، وَكَذَلِكَ لَا يَشْهَدُ لَهُمْ

---

1 قال كعب الأحبار: قرأت فيما أنزل الله على أنبيائه: الهدية تفقأ عين الحكم بخلاف مفت فلا يحرم قبول الهدية. وتقدَّم في الباب قبله مفصلًا وهي -أي: الهدية- الدفع إليه ابتداء طلب، وظاهره أنه يحرم على القاضي قبوله الهدية، ولو كان القضي لعموم الخبر، إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته إن لم يكن له -أي: المهدي- حكومة؛ لأن التهمة منتفية؛ لأن المنع إنما يكون من أجل الاستمالة، أو من أجل الحكومة، وكلاهما منتف. أو كانت الهدية من ذوي رحم محرم منه، أي من الحاكم؛ لأنه لا يصح أن يحكم له، هذا واضح في عمودي نسبه دون من عداهم من أقاربه، مع أنه يحتمل أن يهدي لئلَّا يحكم عليه.

قال القاضي في الجامع الصغير: لا ينبغي أن يقبل هدية إلّا من صديق كان يلاطفه، أو ذي رحم محرم منه بعد أن لا يكون له خصم، وردها -أي: رد القاضي الهدية؛ حيث جاز له أخذها أولى؛ لأنه لا يأمن أن يكون لحكومة منتظرة، واستعارته -أي

القاضي- من غيره كالهدية؛ لأنَّ المنافع كالأعيان، ومثله لو ختن القاضي ولده ونحوه فأهدي له، ولو قلنا: إنها للولد؛ لأن ذلك وسيلة إلى الرشوة. [كشف القناع: 6/ 317]

.

2 رواه البيهقي في السنن الكبرى "10/ 138"، وأبو عوانة في مسنده "7073"، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد "4/ 200"، وقال: رواه البزار من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي كمال.

قال الحافظ ابن حجر: حديث "هدايا الأمراء غلول" البيهقي وابن عدي من حديث أبي حميد، وإسناده ضعيف، والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وإسناده أشد ضعفًا، وفيه عن جابر أخرجه سنيد بن داود في تفسيره عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر وإسماعيل ضعيف. [تلخيص الحبير:4/ 190] .

পরিচ্ছেদ: বিচারকার্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণকারীর জন্য কোনো বিবাদমান পক্ষ কিংবা তার কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত কারো কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করা বৈধ নয়, যদিও তার কোনো মামলা বিদ্যমান না থাকে; কারণ এর ফলে ভবিষ্যতে তার নিকট বিচারপ্রার্থী হয়ে প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে।১

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের উপহার হলো আত্মসাৎ (বা অবৈধ সম্পদ)।"২

যদি তিনি উপহার গ্রহণ করেন এবং তৎক্ষণাৎ তার বিনিময় প্রদান করেন, তবে তিনি তার মালিক হবেন। আর যদি তৎক্ষণাৎ বিনিময় প্রদান না করেন, তবে দাতার কাছে তা ফেরত দেওয়া অসম্ভব হলে বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) তার অধিক হকদার হবে; কারণ তিনি নিজে এর পাওনাদার নন। বিচারপ্রার্থীগণ বিরোধ মীমাংসার জন্য উপস্থিত হলে কোনো ওজর ছাড়া তাদের বিলম্বিত করা বিচারকের জন্য জায়েজ নয়।

বিশ্রামকাল ব্যতীত অন্য সময় তার জন্য জনবিচ্ছিন্ন থাকা বা পর্দা রাখা বৈধ নয়। পক্ষপাতের সন্দেহের কারণে তিনি তার পিতামাতা বা সন্তানদের কারো অনুকূলে বিচার করতে পারবেন না,

তবে তাদের প্রতিকূলে বিচার করতে পারবেন কারণ সেক্ষেত্রে পক্ষপাতের উর্ধ্বতন কারণ থাকে না। একইভাবে তিনি তাদের পক্ষে সাক্ষ্যও প্রদান করতে পারবেন না।

---

১ কাব আল-আহবার বলেন: আমি আল্লাহ তাঁর নবীদের ওপর যা নাযিল করেছেন তাতে পড়েছি: উপহার বিচারকের চোখ অন্ধ করে দেয়। মুফতির বিষয়টি ভিন্ন, তার জন্য উপহার গ্রহণ হারাম নয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এটি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। আর উপহার হলো কিছু চাওয়ার পূর্বেই কাউকে কিছু প্রদান করা। এর বাহ্যিক অর্থ হলো বিচারকের জন্য উপহার গ্রহণ হারাম, যদিও বিষয়টি সাধারণ বা ব্যাপক হয়। তবে বিচারক হওয়ার পূর্বে যিনি তাকে উপহার দিতেন, তিনি যদি বিবাদমান পক্ষ না হন, তবে তার উপহার গ্রহণ করা যাবে; কারণ এক্ষেত্রে কোনো কু-ধারণা বা সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কেননা উপহারের নিষেধাজ্ঞা মূলত মন জয়ের জন্য বা বিচারের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, আর এখানে তার কোনটিই নেই। অথবা উপহারটি যদি বিচারকের এমন কোনো নিকটাত্মীয়ের (মাহরাম) পক্ষ থেকে হয় যার অনুকূলে বিচার করা বৈধ নয়; এটি তার বংশীয় উর্ধ্বতন ও নিম্নতনদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট, অন্যদের ক্ষেত্রে নয়। যদিও সম্ভাবনা থাকে যে উপহারটি এ জন্য দেওয়া হয়েছে যাতে তার বিপক্ষে রায় না দেওয়া হয়।

'আল-জামি আস-সগির' গ্রন্থে কাজী বলেছেন: কোনো বন্ধু যিনি তাকে ইতিপূর্বে উপহার দিতেন কিংবা কোনো নিকটাত্মীয় (মাহরাম) ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে তার উপহার গ্রহণ করা উচিত নয়, যদি কোনো মামলা না থাকে। আর যে ক্ষেত্রে বিচারকের উপহার গ্রহণ করা জায়েজ, সে ক্ষেত্রেও তা বর্জন করাই শ্রেয়; কারণ ভবিষ্যতে কোনো মামলার আশঙ্কা থেকে তিনি মুক্ত নন। বিচারকের কোনো কিছু ধার নেওয়াও উপহারের সমতুল্য; কেননা উপকারভোগ করা মূল সম্পদের মতোই। অনুরূপভাবে বিচারক যদি তার সন্তানের খতনা বা অনুরূপ কোনো অনুষ্ঠান করেন এবং তাকে উপহার দেওয়া হয়, যদিও আমরা বলি এটি সন্তানের জন্য, তবুও তা ঘুষের একটি মাধ্যম হিসেবে গণ্য হতে পারে। [কাশফুল কিনা: ৬/৩১৭]।

২ বায়হাকি 'সুনানে কুবরা' (১০/১৩৮), আবু আওয়ানা তার 'মুসনাদ' (৭০৭৩)-এ বর্ণনা করেছেন। হাইসামি 'মাজমাউয যাওয়াইদ' (৪/২০০)-এ এটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: বাজ্জার এটি ইসমাইল বিন আইয়াশের সূত্রে হিজাজীদের থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: "রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের উপহার হলো আত্মসাৎ" হাদিসটি বায়হাকি ও ইবনে আদি আবু হুমায়দের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ দুর্বল। তাবারানি 'আল-আওসাত'-এ আবু হুরাইরার সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ অধিকতর দুর্বল। এতে জাবির থেকেও একটি বর্ণনা রয়েছে যা সুনাইদ বিন দাউদ তার তাফসিরে আবদাহ বিন সুলাইমান থেকে, তিনি ইসমাইল বিন মুসলিম থেকে, তিনি হাসান থেকে এবং তিনি জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন; আর ইসমাইল দুর্বল। [তালখিসুল হাবির: ৪/১৯০]।

(ص: 129)الأحكام السلطانية للماوردي

وَيَشْهَدُ عَلَيْهِمْ، وَيَشْهَدُ لِعَدُوِّهِ وَلَا يَشْهَدُ عَلَيْهِ.
وَيَحْكُمُ لِعَدُوِّهِ وَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ أَسْبَابَ الْحُكْمِ ظَاهِرَةٌ وَأَسْبَابَ الشَّهَادَةِ خَافِيَةٌ، فَانْتَفَتْ التُّهْمَةُ عَنْهُ فِي الْحُكْمِ، وَتَوَجَّهَتْ إِلَيْهِ فِي الشَّهَادَةِ، وَإِذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ، وَلَوْ مَاتَ الْإِمَامُ لَمْ تَنْعَزِلْ قُضَاتُهُ.
وَلَوْ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ قَدْ خَلَا مِنْ قَاضٍ عَلَى أَنْ يُقَلِّدُوا عَلَيْهِمْ قَاضِيًا، فَإِنْ كَانَ إِمَامُ الْوَقْتِ مَوْجُودًا بَطَلَ التَّقْلِيدُ، وَإِنْ كَانَ مَفْقُودًا صَحَّ التَّقْلِيدُ، وَنَفَذَتْ أَحْكَامُهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ نَظَرِهِ إِمَامٌ لَمْ يَسْتَدِمْ النَّظَرَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَمْ يَنْقُضْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُكْمِهِ.

তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবেন; এবং তিনি তার শত্রুর অনুকূলে সাক্ষ্য দিতে পারেন, তবে তার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিতে পারেন না।
তিনি তার শত্রুর অনুকূলে বিচার করতে পারেন, কিন্তু তার প্রতিকূলে বিচার করতে পারেন না; কারণ বিচারের কারণসমূহ প্রকাশ্য এবং সাক্ষ্যের কারণসমূহ প্রচ্ছন্ন। ফলে বিচারের ক্ষেত্রে তার ওপর থেকে (পক্ষপাতিত্বের) অপবাদ দূরীভূত হয়, কিন্তু সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে তার প্রতি তা

ধাবিত হয়। আর যখন প্রধান বিচারক মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার প্রতিনিধিগণ পদচ্যুত হন; কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান (ইমাম) মৃত্যুবরণ করলে তার নিযুক্ত বিচারকগণ পদচ্যুত হন না।
যদি বিচারকশূন্য কোনো জনপদের অধিবাসীরা নিজেদের জন্য একজন বিচারক নিযুক্ত করার ব্যাপারে একমত হয়, তবে সমকালীন রাষ্ট্রপ্রধান বিদ্যমান থাকলে এই নিযুক্তি বাতিল হবে; কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান না থাকলে এই নিযুক্তি বৈধ হবে এবং তাদের ওপর তার বিচারিক রায়সমূহ কার্যকর হবে। অতঃপর তার বিচারকার্য পরিচালনার পর যদি কোনো নতুন রাষ্ট্রপ্রধানের আবির্ভাব ঘটে, তবে তার (রাষ্ট্রপ্রধানের) অনুমতি ব্যতীত তিনি বিচারকার্য অব্যাহত রাখতে পারবেন না; তবে তার ইতিপূর্বে প্রদত্ত কোনো রায় বাতিল করা হবে না।

(ص: 130)الأحكام السلطانية للماوردي

الباب السابع: في ولاية المظالم

وَنَظَرُ الْمَظَالِمِ هُوَ قَوْدُ الْمُتَظَالِمَيْنِ إِلَى التَّنَاصُفِ بِالرَّهْبَةِ، وَزَجْرُ الْمُتَنَازِعَيْنِ عَنِ التَّجَاحُدِ بِالْهَيْبَةِ، فَكَانَ مِنْ شُرُوطِ النَّاظِرِ فِيهَا أَنْ يَكُونَ جَلِيلَ الْقَدْرِ، نَافِذَ الْأَمْرِ، عَظِيمَ الْهَيْبَةِ، ظَاهِرَ الْعِفَّةِ، قَلِيلَ الطَّمَعِ، كَثِيرَ الْوَرَعِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي نَظَرِهِ إِلَى سَطْوَةِ الْحُمَاةِ وَثَبْتِ الْقُضَاةِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ صِفَاتِ الْفَرِيقَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ بِجَلَالَةِ الْقَدْرِ نَافِذَ الْأَمْرِ فِي الْجِهَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَمْلِكُ الْأُمُورَ الْعَامَّةَ -كَالْوُزَرَاءِ وَالْأُمَرَاءِ- لَمْ يَحْتَجِ النَّظَرُ فِيهَا إِلَى تَقْلِيدٍ، وَكَانَ لَهُ بِعُمُومِ وِلَايَتِهِ النَّظَرُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَمْ يُفَوَّضْ إِلَيْهِ عُمُومُ النَّظَرِ احْتَاجَ إِلَى تَقْلِيدٍ، وَتَوْلِيَةٍ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ، وَهَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ فِيمَنْ يَجُوزُ أَنْ يُخْتَارَ لِوِلَايَةِ الْعَهْدِ، أَوْ لِوِزَارَةِ التَّفْوِيضِ، أَوْ لِإِمَارَةِ الْأَقَالِيمِ إِذَا كَانَ نَظَرُهُ فِي الْمَظَالِمِ عَامًّا، فَإِنْ اقْتَصَرَ بِهِ عَلَى تَنْفِيذِ مَا عَجَزَ الْقُضَاةُ عَنْ تَنْفِيذِهِ، وَإِمْضَاءِ مَا قَصُرَتْ يَدُهُمْ عَنْ إِمْضَائِهِ، جَازَ أَنْ يَكُونَ دُونَ هَذِهِ الرُّتْبَةِ فِي الْقَدْرِ وَالْخَطَرِ بَعْدَ أَنْ لَا تَأْخُذَهُ فِي الْحَقِّ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَلَا يَسْتَشِفُّهُ الطَّمَعُ إِلَى رِشْوَةٍ.

فَقَدْ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَظَالِمَ فِي الشُّرْبِ الَّذِي تَنَازَعَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رضي الله عنه وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَحَضَرَهُ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ لِلزُّبَيْرِ: "اسْقِ أَنْتَ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ الْأَنْصَارِيُّ"، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ لَابْنُ عَمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَغَضِبَ مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ: "يَا زُبَيْرُ أَجْرِهِ عَلَى بَطْنِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" 1.

وَإِنَّمَا قَالَ: أَجْرِهِ عَلَى بَطْنِهِ أَدَبًا لَهُ لِجُرْأَتِهِ عَلَيْهِ، وَاخْتُلِفَ لِمَ أَمَرَهُ بِإِجْرَاءِ الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، هَلْ كَانَ حَقًّا بَيَّنَهُ لَهُمَا حُكْمًا، أَوْ كَانَ مُبَاحًا، فَأَمَرَهُ بِهِ زَجْرًا عَلَى جَوَابَيْنِ، وَلَمْ يُنْتَدَبْ لِلْمَظَالِمِ مِنَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَحَدٌ؛ لِأَنَّهُمْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مَعَ ظُهُورِ الدِّينِ عَلَيْهِمْ بَيْنَ مَنْ يَقُودُهُ التَّنَاصُفُ إِلَى الْحَقِّ، أَوْ يَزْجُرُهُ الْوَعْظُ عَنِ الظُّلْمِ، وَإِنَّمَا كَانَتِ الْمُنَازَعَاتُ تَجْرِي بَيْنَهُمْ فِي أُمُورٍ مُشْتَبِهَةٍ يُوَضِّحُهَا حُكْمُ الْقَضَاءِ، فَإِنْ تَجَوَّرَ مِنْ جُفَاةِ أَعْرَابِهِمْ مُتَجَوِّرٌ ثَنَاهُ الْوَعْظُ أَنْ يُدْبِرَ،

---

1 رواه البخاري في كتاب المساقاة "2360"، ومسلم في كتاب الفضائل "2357".

সপ্তম অধ্যায়: মাজালিম (অবিচার ও অভিযোগ) বিচারব্যবস্থা প্রসঙ্গে

মাজালিম বা অভিযোগের বিচার হলো ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে বিবদমান পক্ষসমূহকে ন্যায়বিচারে বাধ্য করা এবং স্বীয় গাম্ভীর্যের মাধ্যমে বিবাদীদের অস্বীকার ও হঠকারিতা থেকে বিরত রাখা। তাই এই পদের বিচারকের অন্যতম শর্ত হলো—তাঁকে সুউচ্চ মর্যাদা ও প্রভাবশালী আদেশের অধিকারী হতে হবে, অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও প্রকাশ্য চারিত্রিক পবিত্রতায় ভূষিত হতে হবে এবং নির্লোভ ও পরম পরহেযগার হতে হবে। কারণ এই বিচারকার্য পরিচালনার জন্য তাঁকে একদিকে যেমন শক্তিমান রক্ষকদের তেজস্বিতা ধারণ করতে হয়, তেমনি বিচারকদের প্রজ্ঞা ও স্থৈর্য বজায় রাখতে হয়। ফলে তাঁকে উভয় শ্রেণীর গুণের সমন্বয় করতে হয় এবং এমন মর্যাদাবান হতে হয় যেন তাঁর আদেশ উভয় পক্ষেই কার্যকর হয়। যদি তিনি এমন ব্যক্তি হন যিনি রাষ্ট্রীয় সাধারণ কার্যাবলীর দায়িত্বপ্রাপ্ত—যেমন উজির বা আমীর—তবে এই পদের জন্য তাঁর পৃথক নিয়োগের প্রয়োজন নেই; বরং তাঁর সাধারণ কর্তৃত্বের কারণেই তিনি এই বিচার পরিচালনা করতে পারবেন। আর যদি তিনি এমন ব্যক্তি হন যাঁকে সাধারণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়নি, তবে পূর্বোক্ত শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে তাঁর জন্য

সুনির্দিষ্ট নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদানের প্রয়োজন হবে। এটি কেবল এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যাঁকে খিলাফতের উত্তরসূরি, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত উজির কিংবা কোনো প্রদেশের গভর্নর হিসেবে মনোনীত করা বৈধ, যদি তাঁর মাজালিম বা অভিযোগ নিষ্পত্তির পরিধি ব্যাপক হয়। তবে যদি তাঁর দায়িত্ব কেবল সাধারণ বিচারকদের (কাযী) সাধ্যাতীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন এবং যে সকল ক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমতা সীমিত সেগুলোর নিষ্পত্তি করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তিনি পদমর্যাদায় উপরোক্ত স্তরের নিচে হলেও বৈধ হবে; তবে শর্ত হলো সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় পাবেন না এবং কোনো লোভ বা উৎকোচ তাঁকে সংকুচিত করতে পারবে না।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং জনৈক আনসারী ব্যক্তির মধ্যে সেচকার্যের বিরোধ নিয়ে মাজালিম বা অভিযোগের বিচার করেছিলেন। তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হলেন এবং জুবাইরকে বললেন: "হে জুবাইর! প্রথমে তুমি সেচ দাও, তারপর তোমার আনসারী প্রতিবেশীকে সুযোগ দাও।" তখন আনসারী ব্যক্তিটি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! সে আপনার ফুফাতো ভাই হওয়ার কারণেই কি এমনটি বললেন?" এতে তিনি ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন: "হে জুবাইর! তুমি পানি আটকে রাখো যতক্ষণ না তা গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছে।"

তিনি যে পানি আটকে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা ছিল আনসারী ব্যক্তির ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের কারণে তাঁকে আদব শেখানোর জন্য। কেন তিনি পানি গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন—সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে; তা কি আইনগতভাবে তাঁদের হক হিসেবে স্পষ্ট করেছিলেন নাকি ধমক স্বরূপ সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন—এ নিয়ে দুটি উত্তর রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মাজালিম বিচারের জন্য স্বতন্ত্র কাউকে নিযুক্ত করা হয়নি। কারণ ইসলামের প্রথম যুগে দ্বীনের প্রভাব প্রবল থাকায় মানুষ ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই সত্যের দিকে ধাবিত হতো অথবা কেবল সদুপদেশের মাধ্যমেই জুলুম থেকে বিরত থাকত। তখন তাঁদের মধ্যে বিবাদ কেবল অস্পষ্ট ও জটিল বিষয়গুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল যা সাধারণ বিচারিক রায়ের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যেত। যদি গ্রাম্য অসভ্য বেদুইনদের কেউ কোনো অবিচার করত, তবে সদুপদেশই তাকে তা থেকে ফিরিয়ে আনত।

---

১. বুখারী, কিতাবুল মুসাকাত (২৩৬০); মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল (২৩৫৭)।

وَقَادَهُ الْعُنْفُ أَنْ يُحْسِنَ، فَاقْتَصَرَ خُلَفَاءُ السَّلَفِ عَلَى فَصْلِ التَّشَاجُرِ بَيْنَهُمْ بِالْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ تَعْيِينًا لِلْحَقِّ فِي جِهَتِهِ؛ لِانْقِيَادِهِمْ إِلَى الْتِزَامِهِ، وَاحْتَاجَ عَلِيٌّ رضي الله عنه حِينَ تَأَخَّرَتْ إِمَامَتُهُ وَاخْتَلَطَ النَّاسُ فِيهَا، وَتَجَوَّزوا إِلَى فَصْلِ صَرَامَةٍ فِي السِّيَاسَةِ، وَزِيَادَةِ تَيَقُّظٍ فِي الْوُصُولِ إِلَى غَوَامِضِ الْأَحْكَامِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ وَاسْتَقَلَّ بِهَا، وَلَمْ يَخْرُجْ فِيهَا إِلَى نَظَرِ الْمَظَالِمِ الْمَحْضِ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ.

وَقَالَ فِي الْمِنْبَرِيَّةِ1: صَارَ ثَمَنُهَا تِسْعًا، وَقَضَى فِي الْقَارِصَةِ وَالْقَامِصَةِ وَالْوَاقِصَةِ بِالدِّيَةِ أَثْلَاثًا2.

وَقَضَى فِي وَلَدٍ تَنَازَعَتْهُ امْرَأَتَانِ بِمَا أَدَّى إِلَى فَصْلِ الْقَضَاءِ، ثُمَّ انْتَشَرَ الْأَمْرُ بَعْدَهُ حَتَّى تَجَاهَرَ النَّاسُ بِالظُّلْمِ وَالتَّغَالُبِ، وَلَمْ يَكْفِهِمْ زَوَاجِرُ الْعِظَةِ عَنِ التَّمَانُعِ وَالتَّجَاذُبِ، فَاحْتَاجُوا فِي رَدْعِ الْمُتَغَلِّبِينَ وَإِنْصَافِ الْمَغْلُوبِينَ إِلَى نَظَرِ الْمَظَالِمِ الَّذِي يَمْتَزِجُ بِهِ قُوَّةُ السَّلْطَنَةِ بِنِصْفِ الْقَضَاءِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَفْرَدَ لِلظُّلَامَاتِ يَوْمًا يَتَصَفَّحُ فِيهِ قَصَصَ الْمُتَظَلِّمِينَ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ لِلنَّظَرِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، فَكَانَ إِذَا وَقَفَ مِنْهَا عَلَى مُشْكِلٍ، أَوْ احْتَاجَ فِيهَا إِلَى حُكْمٍ مُنَفَّذٍ رَدَّهُ إِلَى قَاضِيهِ أَبِي إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، فَنَفَّذَ فِيهِ أَحْكَامَهُ لِرَهْبَةِ التَّجَارِبِ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي عِلْمِهِ بِالْحَالِ، وَوُقُوفِهِ عَلَى السَّبَبِ، فَكَانَ أَبُو إِدْرِيسَ هُوَ الْمُبَاشِرُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ الْآمِرُ.

ثُمَّ زَادَ مِنْ جَوْرِ الْوُلَاةِ وَظُلْمِ الْعُتَاةِ مَا لَمْ يَكْفِهِمْ عَنْهُ إِلَّا أَقْوَى الْأَيْدِي وَأَنْفَذُ الْأَوَامِرِ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله أَوَّلَ مَنْ نَدَبَ نَفْسَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْمَظَالِمِ، فَرَدَّهَا وَرَاعَى السُّنَنَ الْعَادِلَةَ وَأَعَادَهَا، وَرَدَّ مَظَالِمَ بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى أَهْلِهَا، حَتَّى قِيلَ لَهُ - وَقَدْ شَدَّدَ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَأَغْلَظَ: إِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ مِنْ رَدِّهَا الْعَوَاقِبَ، فَقَالَ: كُلُّ يَوْمٍ أَتَّقِيهِ وَأَخَافُهُ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا وُقِيتُهُ.

ثُمَّ جَلَسَ لَهَا مِنْ خُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ جَمَاعَةٌ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَلَسَ لَهَا الْمَهْدِيُّ، ثُمَّ الْهَادِي،

---

1 يعني: المسألة المنبرية، وتسمَّى المنبرية، وذلك أنَّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه سُئِلَ عن ميراث الزوجة من هذه المسألة وهو يخطب على المنبر، فقال: عاد ثمنها تسعًا، ومضى في خطبته.

2 رواه البيهقي في السنن الكبرى "8/ 112"، وقال: قال ابن أبي زائدة: وتفسيره أن ثلاث جوار كنَّ يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت، فسقطت الراكبة فوقصت عنقها، فجعل علي رضي الله عنه على القارصة ثلث الدية، وعلى القامصة الثلث، وأسقط الثلث، يقول: لأنه حصة الراكبة؛ لأنها أعانت على نفسها. وانظر: تأويل مختلف الحديث [ص 161] .

এবং পরিস্থিতির কঠোরতা তাঁকে উত্তম পন্থা অবলম্বনে পরিচালিত করেছিল, ফলে পূর্বসূরি খলিফাগণ বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে কেবল বিচার ও ফয়সালার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন যাতে করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে হক বা অধিকার সুনিশ্চিত হয়; যেহেতু তাঁরা হকের অনুসারী হতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত যখন প্রলম্বিত হলো এবং মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল ও তারা শিথিলতা প্রদর্শন শুরু করল, তখন তিনি রাজনীতিতে কঠোরতা অবলম্বন এবং বিধানাবলির নিগূঢ় রহস্য উদঘাটনে অধিকতর সজাগ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তিনিই প্রথম এই পথ অনুসরণ করেন এবং এর মাধ্যমে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন। তবে তিনি কেবল অভিযোগ প্রতিকার (মাজালিম) সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করেননি, কারণ তাঁর জন্য এর প্রয়োজন ছিল না।

এবং তিনি মিম্বরিয়া মাসআলা১ প্রসঙ্গে বলেছিলেন: তার এক-অষ্টমাংশ অংশটি তখন এক-নবমাংশে পরিণত হয়েছিল। আর তিনি চিমটি প্রদানকারী (কারিসা), লাফ প্রদানকারী (কামিসা) এবং ঘাড় মটকানো ব্যক্তির (ওয়াকিসা) ক্ষেত্রে রক্তপণকে তিন ভাগে বণ্টন করার ফয়সালা দেন২।

এবং তিনি একটি সন্তান নিয়ে বিবাদমান দুই মহিলার ক্ষেত্রে এমন ফয়সালা করেন যা চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছে দিয়েছিল। অতঃপর তাঁর পরবর্তী সময়ে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি মানুষ প্রকাশ্যে জুলুম ও আধিপত্য বিস্তারে লিপ্ত হয়। উপদেশের শাসানি তাদের পারস্পরিক বাধা ও কাড়াকাড়ি থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল না। ফলে আধিপত্য বিস্তারকারীদের দমন এবং মজলুমদের ইনসাফ প্রদানের জন্য তারা অভিযোগ প্রতিকার বা 'নাজারুল মাজালিম' ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল, যেখানে বিচার ব্যবস্থার সাথে শাসনতান্ত্রিক শক্তি মিশ্রিত থাকে। প্রথম ব্যক্তি হিসেবে যিনি অভিযোগকারীদের কাহিনীগুলো পর্যালোচনার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করেছিলেন—যদিও তিনি সরাসরি বিচারের দায়িত্ব পালন করতেন না—তিনি ছিলেন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান। যখন তাঁর কাছে কোনো জটিল বিষয় আসত অথবা কোনো কার্যকর ফয়সালার প্রয়োজন হতো, তখন তিনি তা তাঁর বিচারক আবু ইদরিস আল-আওদির কাছে পাঠিয়ে দিতেন। অতঃপর আবু ইদরিস সেখানে তাঁর রায় কার্যকর করতেন, কারণ আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন এবং ঘটনার মূল কারণ উদঘাটন করতে পারতেন। ফলে আবু ইদরিস ছিলেন প্রত্যক্ষ সম্পাদনকারী এবং আব্দুল মালিক ছিলেন আদেশ দাতা।

এরপর শাসকদের অন্যায় এবং উদ্ধতদের জুলুম এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, শক্তিশালী শাসন ও কার্যকর নির্দেশ ছাড়া তাদের দমন করা সম্ভব ছিল না। তখন ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রথম ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে অভিযোগ প্রতিকার বা মাজালিম পর্যালোচনার জন্য উৎসর্গ করেন। তিনি সেগুলোকে সংশোধন করেন এবং ইনসাফপূর্ণ রীতিসমূহ পর্যবেক্ষণ ও পুনর্বহাল করেন। তিনি বনু উমাইয়্যাদের জুলুম করে দখল করা সম্পদসমূহ তাদের প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেন। এমনকি যখন তাঁকে এ বিষয়ে কঠোরতা প্রদর্শনের কারণে সতর্ক করা হলো যে, আমরা এর পরিণাম সম্পর্কে আপনার ব্যাপারে আশঙ্কিত; তখন তিনি বলেছিলেন: কিয়ামতের দিন ব্যতীত অন্য যে কোনো দিনকে আমি ভয় পাই, আল্লাহ যেন আমাকে সেই ভয় থেকে রক্ষা না করেন।

এরপর বনু আব্বাসের খলিফাদের মধ্য থেকে একটি দল এই বিচারকার্যের জন্য বসেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম যিনি বসেন তিনি ছিলেন আল-মাহদী, অতঃপর আল-হাদী।

---

১ অর্থাৎ: মিম্বরিয়া মাসআলা। এর নামকরণ মিম্বরিয়া করা হয়েছে কারণ আলী ইবনে আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মিম্বরে খুতবা দিচ্ছিলেন তখন তাঁকে এই মাসআলায় স্ত্রীর

উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন: তার এক-অষ্টমাংশ এখন এক-নবমাংশে পরিণত হয়েছে। অতঃপর তিনি খুতবা চালিয়ে যান।
২ বায়হাকি এটি 'সুনানুল কুবরা' (৮/১১২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবি যাইদাহ বলেন: এর ব্যাখ্যা হলো, তিনটি কিশোরী খেলা করছিল। তাদের একজন অন্যজনের পিঠে চড়ে বসল। তখন তৃতীয়জন যাকে বহন করা হচ্ছিল তাকে চিমটি কাটল, ফলে সে লাফিয়ে উঠল। এতে পিঠে থাকা মেয়েটি পড়ে গিয়ে তার ঘাড় মটকে মারা গেল। তখন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চিমটি প্রদানকারীর ওপর এক-তৃতীয়াংশ রক্তপণ এবং লাফ প্রদানকারীর ওপর এক-তৃতীয়াংশ রক্তপণ ধার্য করেন। আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ বাতিল করে দেন। তিনি বলেন: কারণ এটি ওই আরোহীর নিজের অংশের দায়, যেহেতু সে নিজেই নিজের দুর্ঘটনায় সহায়তা করেছে। দেখুন: 'তাওয়িলু মুখতালিফিল হাদিস' [পৃষ্ঠা ১৬১]।

(ص: 132)الأحكام السلطانية للماوردي

ثُمَّ الرَّشِيدُ، ثُمَّ الْمَأْمُونُ، فَآخِرُ مَنْ جَلَسَ لَهَا الْمُهْتَدِي حَتَّى عَادَتِ الْأَمْلَاكُ إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا.

وَقَدْ كَانَ مُلُوكُ الْفُرْسِ يَرَوْنَ ذَلِكَ مِنْ قَوَاعِدِ الْمُلْكِ وَقَوَانِينِ الْعَدْلِ الَّذِي لَا يَعُمُّ الصَّلَاحُ إِلَّا بِمُرَاعَاتِهِ، وَلَا يَتِمُّ التَّنَاصُفُ إِلَّا بِمُبَاشَرَتِهِ. وَكَانَتْ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِينَ كَثُرَ فِيهِمُ الزُّعَمَاءُ، وَانْتَشَرَتْ فِيهِمُ الرِّيَاسَةُ، وَشَاهَدُوا مِنَ التَّغَالُبِ وَالتَّجَاذُبِ مَا لَمْ يَكْفِهِمْ عَنْهُ سُلْطَانٌ قَاهِرٌ، عَقَدُوا حِلْفًا عَلَى رَدِّ الْمَظَالِمِ وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ، وَكَانَ سَبَبُهُ مَا حَكَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَمَنِ مِنْ بَنِي زُبَيْدٍ قَدِمَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا بِبِضَاعَةٍ، فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ، وَقِيلَ: إِنَّهُ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ، فَلَوَى الرَّجُلُ بِحَقِّهِ، فَسَأَلَهُ مَالَهُ أَوْ مَتَاعَهُ فَامْتَنَعَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عَلَى الْحَجَرِ وَأَنْشَدَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ

"مِنَ الْبَسِيطِ":

يال قُصَيّ لِمَظْلُومٍ بِضَاعَتُهُ ... بِبَطْنِ مَكَّةَ نَائِيَ الدَّارِ وَالنَّفَرِ

وَأَشْعَثٍ مُحْرِمٍ لَمْ تُقْضَ حُرْمَتُهُ ... بَيْنَ الْمَقَامِ وَبَيْنَ الْحِجْرِ وَالْحَجَرِ

أَقَائِمٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ بِذِمَّتِهِمْ ... أَوْ ذَاهِبٌ فِي ضَلَالٍ مَالُ مُعْتَمِرِ

ثُمَّ قَيْسُ بْنُ شَيْبَةَ السُّلَمِيُّ بَاعَ مَتَاعًا عَلَى أُبَيّ بْنِ خَلَفٍ فَلَوَاهُ وَذَهَبَ بِحَقِّهِ، فَاسْتَجَارَ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي جُمَحٍ فَلَمْ يُجِرْهُ، فَقَالَ قَيْسٌ مِنَ الرَّجَزِ:

يال قُصَيّ كَيْفَ هَذَا فِي الْحَرَمْ

...

وَحُرْمَةِ الْبَيْتِ وَأَحْلَافِ الْكَرَمْ

أُظْلَمُ لَا يُمْنَعُ عَنِّي مَنْ ظَلَمْ

فَأَجَابَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ1 "مِنَ الْبَسِيطِ":

إِنْ كَانَ جَارُكَ لَمْ تَنْفَعْكَ ذِمَّتُهُ ... وَقَدْ شَرِبْتَ بِكَأْسِ الذُّلِّ أَنْفَاسَا

فَأْتِ الْبُيُوتَ وَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا صَدَدًا ... لَا تَلْقَ تَأْدِيبَهُمْ فُحْشًا وَلَا بَاسَا

---

1 هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن جارية بن عبد بن عباس، أبو الفضل السلمي، وقيل: أبو الهيثم، أسلم قبل فتح مكة بيسير، وكان أبوه مرداس شريكًا ومصافيًا لحرب بن أمية، وقتلهما جميعًا الجن، وخبرهما مشهور عند الأخباريين، وكان العباس بن مرداس ممن حرَّم الخمر على نفسه في الجاهلية وأبو بكر أيضًا وعثمان بن عفان وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف وقيس بن عاصم، وحرَّمها قبل هؤلاء عبد المطلب بن هاشم وعبد الله بن جدعان وشيبة بن ربيعة وورقة بن نوفل، وغيرهم.

অতঃপর রশিদ, এরপর মামুন, আর এ কাজের জন্য সবশেষে উপবেশন করেন মুহতাদি, যার ফলে সম্পদসমূহ তাদের প্রকৃত মালিকদের নিকট ফিরে আসে।

পারস্যের রাজন্যবর্গ একে রাজত্বের অন্যতম মূলনীতি এবং ইনসাফের এমন কানুন মনে করতেন, যা পরিপালন করা ব্যতিরেকে সামগ্রিক সংস্কার সম্ভব নয় এবং যা সরাসরি পরিচালনা করা ব্যতিরেকে ইনসাফের পূর্ণতা পায় না। জাহেলী যুগে কুরাইশদের মধ্যে যখন নেতৃত্বের আধিক্য ঘটে এবং বিভিন্ন নেতার কর্তৃত্ব ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারা পারস্পরিক আধিপত্য ও বিবাদের এমন এক পর্যায় প্রত্যক্ষ করে যেখানে কোনো পরাক্রমশালী শাসক তাদের নিবৃত্ত করতে পারছিল না। এমতাবস্থায় তারা জুলুম প্রতিহত করা এবং জালিমের হাত থেকে মজলুমের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এর কারণ সম্পর্কে জুবাইর ইবনে বাক্কার বর্ণনা করেন যে, ইয়ামেনের বনু জুবাইদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য নিয়ে ওমরাহ পালন করতে মক্কায় আগমন করেন। বনু সাহম গোত্রের এক ব্যক্তি তা ক্রয় করে, বলা হয়ে থাকে সে ছিল আস ইবনে ওয়ায়েল। কিন্তু লোকটি তার প্রাপ্য প্রদানে টালবাহানা শুরু করে। ভুক্তভোগী লোকটি তার পাওনা বা পণ্য ফেরত চাইলে সে অস্বীকার করে। তখন সে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতে শুরু করে:

"আল-বাসীত ছন্দ হতে":

হে কুসাই বংশীয়গণ! সেই মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে এসো যার পণ্য … মক্কার অভ্যন্তরে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, অথচ সে তার ঘর ও স্বজন থেকে বহুদূরে।

সে উস্কোখুস্কো চুলে ইহরাম অবস্থায় রয়েছে, অথচ তার পবিত্রতা রক্ষা করা হয়নি … মকামে ইব্রাহিম ও হিজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী পুণ্যস্থানে।

বনু সাহম কি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে … নাকি ওমরাহকারীর সম্পদ ভ্রষ্টতায় হারিয়ে যাবে?

অতঃপর কায়স ইবনে শায়বা আল-সুলামি উবাই ইবনে খালাফের কাছে কিছু পণ্য বিক্রি করেন, কিন্তু সে তা নিয়ে টালবাহানা করে এবং তার প্রাপ্য আত্মসাৎ করে। তিনি বনু জুমাহ গোত্রের এক ব্যক্তির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন, কিন্তু সে তাকে আশ্রয় দেয়নি। তখন কায়স ‘রাজায’ ছন্দে বলেন:

হে কুসাই বংশীয়গণ! হারামের সীমানায় একি অবস্থা!

…

কাবার মর্যাদা ও মহানুভবদের মৈত্রী চুক্তির কসম!

আমার ওপর জুলুম করা হচ্ছে, অথচ যে জুলুম করেছে তাকে কেউ বাধা দিচ্ছে না।

এর জবাবে আব্বাস ইবনে মিরদাস আল-সুলামি (১) "আল-বাসীত ছন্দে" বলেন:

যদি তোমার প্রতিবেশীর প্রতিশ্রুতি তোমার উপকারে না আসে ... আর তোমাকে অপমানের বিষ পান করতে হয়;
তবে (প্রকৃত সাহায্যকারীদের) ঘরগুলোতে যাও এবং তাদের সমীপবর্তী হও ... তাদের সদাচারে তুমি কোনো অশ্লীলতা বা অনিষ্টের সম্মুখীন হবে না।

---

১. তিনি হলেন আব্বাস ইবনে মিরদাস ইবনে আবি আমির ইবনে জারিয়া ইবনে আবদ ইবনে আব্বাস, আবু আল-ফজল আল-সুলামি। মতান্তরে আবু আল-হায়সাম। তিনি মক্কা বিজয়ের অল্পকাল আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মিরদাস হারব ইবনে উমাইয়ার অংশীদার ও অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। জিনরা তাদের উভয়কেই হত্যা করেছিল এবং ইতিহাসবিদদের কাছে তাদের এ সংবাদটি সুপ্রসিদ্ধ। আব্বাস ইবনে মিরদাস জাহেলী যুগেও নিজের ওপর মদ হারাম করেছিলেন। অনুরূপভাবে আবু বকর (রা.), উসমান ইবনে আফফান (রা.), উসমান ইবনে মাজউন (রা.), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এবং কায়স ইবনে আসিমও তা করেছিলেন। তাঁদের পূর্বে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম, আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআন, শায়বা ইবনে রাবিয়া, ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল এবং আরও অনেকে মদ হারাম করেছিলেন।

(ص: 133)الأحكام السلطانية للماوردي

وَمَنْ يَكُنْ بِفِنَاءِ الْبَيْتِ مُعْتَصِمًا ... يَلْقَ ابْنَ حَرْبٍ وَيَلْقَ الْمَرْءَ عَبَّاسَا
قَوْمِي قُرَيْشٌ بِأَخْلَاقٍ مُكَمَّلَةٍ ... بِالْمَجْدِ وَالْحَزْمِ مَا عَاشَا وَمَا سَاسَا
سَاقُ الْحَجِيجِ وَهَذَا نَاشِرٌ فَلِجٌ ... وَالْمَجْدُ يُورَثُ أَخْمَاسًا وَأَسْدَاسَا

فَقَامَ أَبُو سُفْيَانَ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَرَدَّا عَلَيْهِ مَالَهُ، وَاجْتَمَعَتْ بُطُونُ قُرَيْشٍ فَتَحَالَفُوا فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ عَلَى رَدِّ الْمَظَالِمِ بِمَكَّةَ، وَأَنْ لَا يَظْلِمَ أَحَدٌ إِلَّا مَنَعُوهُ وَأَخَذُوا لِلْمَظْلُومِ حَقَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ مَعَهُمْ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، فَعَقَدُوا حِلْفَ الْفُضُولِ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

جُدْعَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاكِرًا لِلْحَالِ: "لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفَ الْفُضُولِ مَا لَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ لَأَجَبْتُ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ".

وَإِنِّي بِقِصَّتِهِ وَمَا يَزِيدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، فَقَالَ بَعْضُ قُرَيْشٍ فِي هَذَا الْحِلْفِ "مِنَ الْبَسِيطِ":

تَيْمُ بْنُ رُّةَ إِنْ سَأَلْتَ وَهَاشِمًا ... وَزُهْرَةُ الْخَيْرِ فِي دَارِ ابْنِ جُدْعَانِ

مُتَحَالِفِينَ عَلَى النَّدَى مَا غَرَّدَتْ ... وَرْقَاءُ فِي فَنَنٍ مِنْ جِذْعِ كِتْمَانِ

وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِعْلًا جَاهِلِيًّا دَعَتْهُمْ إِلَيْهِ السِّيَاسَةُ، فَقَدْ صَارَ بِحُضُورِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ، وَمَا قَالَهُ فِي تَأْكِيدِ أَمْرِهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَفِعْلًا نَبَوِيًّا.

যে ব্যক্তি কা'বা প্রাঙ্গণে আশ্রয় প্রার্থনা করে ... সে ইবনে হারব ও আব্বাস সদৃশ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পায়।

আমার সম্প্রদায় কুরাইশ এমন পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের অধিকারী ... যারা যতদিন বেঁচে ছিল এবং শাসন করেছে, মর্যাদা ও সংকল্পের সাথেই করেছে।

তিনি হাজীদের পানীয় পরিবেশনকারী এবং এই ব্যক্তি একজন সফল বিজয়ী ... আর মর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ণ মাত্রায় অর্জিত হয়।

অতঃপর আবু সুফিয়ান এবং আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব উঠে দাঁড়ালেন এবং তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দিলেন। কুরাইশের বিভিন্ন শাখা গোত্র আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের ঘরে একত্রিত হলো এবং মক্কায় জুলুম ও অবিচার দূর করার লক্ষ্যে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো যে, কারো ওপর জুলুম করা হলে তারা তা প্রতিহত করবে এবং মজলুমের অধিকার আদায় করে দেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তখন তাদের সাথে ছিলেন এবং তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের ঘরে তারা 'হিলফুল ফুদুল' (ফজিলতের অঙ্গীকার) সম্পাদন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই অবস্থার স্মৃতিচারণ করে বলেন: "আমি আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের গৃহে এমন এক মৈত্রীতে উপস্থিত ছিলাম, যার পরিবর্তে আমাকে যদি লাল রঙের মহামূল্যবান উটও দেওয়া হতো তবে আমি তা পছন্দ করতাম না; আর যদি (বর্তমানে) ইসলামেও আমাকে সেই মৈত্রীর দিকে আহ্বান জানানো হতো, তবে অবশ্যই আমি তাতে সাড়া দিতাম।"

আর আমি এই কাহিনীর গুরুত্ব বর্ণনা করছি যা ইসলাম কেবল বৃদ্ধিই করেছে। এই মৈত্রী সম্পর্কে কুরাইশদের কেউ কেউ 'বাসিত' ছন্দে বলেন:
যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো, তবে তাইম ইবনে মুররাহ এবং হাশিম ... আর কল্যাণময় জুহরাহ গোত্র ইবনে জুদআনের ঘরে একত্রিত।
তারা উদারতা ও দানশীলতার ওপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে যতক্ষণ না ... কিতমান বৃক্ষের শাখায় কোনো কপোত কূজন করবে।
যদিও এটি ছিল জাহেলী যুগের একটি কাজ যা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে সম্পাদিত হয়েছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতি এবং এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ় সমর্থনমূলক বক্তব্যের কারণে এটি একটি শরয়ী বিধান এবং নববী আদর্শে পরিণত হয়েছে।

(ص: 134)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل:

فَإِذَا نَظَرَ فِي الْمَظَالِمِ مَنِ انْتُدِبَ لَهَا، جُعِلَ لِنَظَرِهِ يَوْمًا مَعْرُوفًا يَقْصِدُهُ فِيهِ الْمُتَظَلِّمُونَ، وَيُرَاجِعُهُ فِيهِ الْمُتَنَازِعُونَ؛ لِيَكُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَيَّامِ لِمَا هُوَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ مِنَ السِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ عُمَّالِ الْمَظَالِمِ الْمُنْفَرِدِينَ لَهَا، فَيَكُونُ مَنْدُوبًا لِلنَّظَرِ فِي جَمِيعِ الْأَيَّامِ، وَلْيَكُنْ سَهْلَ الْحِجَابِ نَزِهَ الْأَصْحَابِ، وَيُسْتَكْمَلُ مَجْلِسُ نَظَرِهِ بِحُضُورِ خَمْسَةِ أَصْنَافٍ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُمْ وَلَا يَنْتَظِمُ نَظَرُهُ إِلَّا بِهِمْ:

أَحَدُهُمْ: الْحُمَاةُ وَالْأَعْوَانُ لِجَذْبِ الْقَوِيِّ وَتَقْوِيمِ الْجَرِيءِ.

وَالصِّنْفُ الثَّانِي: الْقُضَاةُ وَالْحُكَّامُ؛ لِاسْتِعْلَامِ مَا يَثْبُتُ عِنْدَهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ، وَمَعْرِفَةِ مَا يَجْرِي فِي مَجَالِسِهِمْ بَيْنَ الْخُصُومِ.

وَالصِّنْفُ الثَّالِثُ: الْفُقَهَاءُ؛ لِيَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فِيمَا أَشْكَلَ، وَيَسْأَلَهُمْ عَمَّا اشْتَبَهَ وَأَعْضَلَ.

وَالصِّنْفُ الرَّابِعُ: الْكُتَّابُ؛ لِيُثْبِتُوا مَا جَرَى بَيْنَ الْخُصُومِ، وَمَا تَوَجَّبَ لَهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحُقُوقِ.

وَالصِّنْفُ الْخَامِسُ: الشُّهُودُ لِيُشْهِدَهُمْ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ مِنْ حَقٍّ وَأَمْضَاهُ مِنْ حُكْمٍ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ مَجْلِسَ الْمَظَالِمِ بِمَنْ ذَكَرْنَا مِنَ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ شَرَعَ حِينَئِذٍ فِي نَظَرِهَا.

وَالَّذِي يَخْتَصُّ بِنَظَرِ الْمَظَالِمِ يَشْتَمِلُ عَلَى عَشَرَةِ أَقْسَامٍ:

فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ: النَّظَرُ فِي تَعَدِّي الْوُلَاةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَأَخْذِهِمْ بِالْعَسْفِ فِي السِّيرَةِ، فَهَذَا مِنْ لَوَازِمِ النَّظَرِ فِي الْمَظَالِمِ الَّذِي لَا يَقِفُ عَلَى ظُلَامَةِ مُتَظَلِّمٍ؛ فَيَكُونُ لِسِيرَةِ الْوُلَاةِ مُتَصَفِّحًا عَنْ أَحْوَالِهِمْ، مُسْتَكْشِفًا لِيُقَوِّيَهُمْ إِنْ أَنْصَفُوا، وَيَكُفَّهُمْ إِنْ عَسَفُوا، وَيَسْتَبْدِلَ بِهِمْ إِنْ لَمْ يُنْصِفُوا.

حُكِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَطَبَ عَلَى النَّاسِ فِي أَوَّلِ خِلَافَتِهِ، وَكَانَتْ مِنْ أَوَّلِ خُطْبَةٍ فَقَالَ لَهُمْ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهَا، وَلَا يُرَحِّبُ إِلَّا أَهْلَهَا، وَقَدْ كَانَ قَوْمٌ مِنَ الْوُلَاةِ مَنَعُوا الْحَقَّ حَتَّى اشْتَرَى مِنْهُمْ شِرَاءً، وَبَذَلُوا الْبَاطِلَ حَتَّى افْتَدَى مِنْهُمْ فِدَاءً، وَاللَّهِ لَوْلَا سُنَّةٌ مِنَ الْحَقِّ أُمِيتَتْ فَأَحْيَيْتُهَا، وَسُنَّةٌ مِنَ الْبَاطِلِ أُحْيِيَتْ فَأَمَتُّهَا، مَا بَالَيْتُ أَنْ أَعِيشَ وَقْتًا وَاحِدًا.

পরিচ্ছেদ:

অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য যিনি নিযুক্ত হন, তিনি অভিযোগকারীদের আবেদন শোনার জন্য এবং বিবাদমান পক্ষগুলোর পর্যালোচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য করবেন; যেন বাকি দিনগুলো তার ওপর অর্পিত শাসনকার্য ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যয় করা যায়। তবে তিনি যদি কেবল অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্যই এককভাবে নিযুক্ত হন, তবে সব দিনই পর্যালোচনার জন্য নির্ধারিত থাকবে। তার সান্নিধ্য লাভ যেন সহজ হয় এবং তার সহচররা যেন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হন। তার বিচারিক মজলিস পাঁচটি শ্রেণির উপস্থিতির মাধ্যমে পূর্ণতা পায়, যাদের ছাড়া তার কাজ চলবে না এবং যাদের উপস্থিতি ব্যতীত বিচারিক কার্য সুসংগঠিত হবে না:

প্রথম শ্রেণি: রক্ষী ও সাহায্যকারী বাহিনী; যারা ক্ষমতাশালীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের শায়েস্তা করতে কাজ করবে।

দ্বিতীয় শ্রেণি: বিচারক ও শাসকগণ; তাদের নিকট সাব্যস্ত হওয়া অধিকারসমূহ অবগত হওয়ার জন্য এবং তাদের বিচারিক মজলিসে বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে কী ঘটছে তা জানার জন্য।
তৃতীয় শ্রেণি: ফকীহ বা আইনজ্ঞগণ; যেন কোনো জটিল বিষয়ে তাদের শরণাপন্ন হওয়া যায় এবং কোনো অস্পষ্ট ও দুরূহ বিষয়ে তাদের নিকট সমাধান চাওয়া যায়।
চতুর্থ শ্রেণি: লেখক বা মোহরারগণ; বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে যা সংঘটিত হয়েছে এবং তাদের প্রাপ্য বা প্রদেয় অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য।
পঞ্চম শ্রেণি: সাক্ষীগণ; কোনো সাব্যস্ত হওয়া অধিকার বা কার্যকর করা রায়ের ওপর তাদের সাক্ষী রাখার জন্য। যখন উল্লিখিত এই পাঁচ শ্রেণির উপস্থিতির মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তির মজলিস পূর্ণতা পাবে, তখনই তিনি অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা শুরু করবেন।
অভিযোগ নিষ্পত্তির বিশেষ এখতিয়ার দশটি বিষয়ের ওপর বিস্তৃত:
প্রথম বিষয়: প্রজাসাধারণের ওপর প্রশাসকদের অন্যায় হস্তক্ষেপ এবং শাসনকার্যে তাদের নিষ্ঠুর আচরণের বিচার করা। এটি অভিযোগ নিষ্পত্তির এমন এক আবশ্যিক কাজ যা কোনো অভিযোগকারীর অভিযোগ পেশ করার ওপর নির্ভর করে না; বরং বিচারক নিজেই প্রশাসকদের কর্মপদ্ধতি ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং অনুসন্ধান চালাবেন; যেন তারা ন্যায়বিচার করলে তাদের শক্তিশালী করতে পারেন, জুলুম করলে তাদের নিবৃত্ত করতে পারেন এবং ন্যায়বিচার না করলে তাদের স্থলে অন্যকে স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন।
বর্ণিত আছে যে, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. তার খিলাফতের শুরুতে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। এটি ছিল তার প্রথম দিককার একটি ভাষণ। সেখানে তিনি বলেন: আমি তোমাদের আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি, কারণ তিনি তাকওয়া ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না এবং তাকওয়াবানদের ব্যতীত অন্য কাউকে সমাদর করেন না। ইতিপূর্বে এমন একদল প্রশাসক ছিল যারা মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণ করেছিল, এমনকি তা তাদের কাছ থেকে মূল্য দিয়ে কিনে নিতে হতো; আর তারা অন্যায়কে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে, তা থেকে রেহাই পেতে মুক্তিপণ দিতে হতো। আল্লাহর কসম! সত্যের কোনো বিলুপ্ত সুন্নাত যদি আমি পুনর্জীবিত করতে না পারি এবং বাতিলের কোনো প্রচলিত প্রথা যদি আমি মিটিয়ে দিতে না পারি, তবে আমি এক মুহূর্ত বেঁচে থাকাকেও পরোয়া করি না।

أَصْلِحُوا آخِرَتَكُمْ تَصْلُحْ لَكُمْ دُنْيَاكُمْ، إِنَّ امْرَأً لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آدَمَ إِلَّا الْمَوْتُ لَمُعْرِقٌ لَهُ فِي الْمَوْتِ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: جَوْرُ الْعُمَّالِ فِيمَا يَجْبُونَهُ مِنَ الْأَمْوَالِ، فَيَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْقَوَانِينِ الْعَادِلَةِ فِي دَوَاوِينِ الْأَئِمَّةِ، فَيَحْمِلُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَيَأْخُذُ الْعُمَّالَ بِهَا، وَيَنْظُرُ فِيمَا اسْتَزَادُوهُ، فَإِنْ رَفَعُوهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ أَمَرَ بِرَدِّهِ، وَإِنْ أَخَذُوهُ لِأَنْفُسِهِمُ اسْتَرْجَعَهُ لِأَرْبَابِهِ.

"فَقَدْ حُكِيَ" عَنِ الْمُهْتَدِي رضي الله عنه أَنَّهُ جَلَسَ يَوْمًا لِلْمَظَالِمِ، فَرُفِعَتْ إِلَيْهِ قَصَصٌ فِي الْكُسُورِ فَسَأَلَ عَنْهَا، فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ وَهْبٍ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَسَّطَ الْخَرَاجَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ، وَمَا فُتِحَ مِنْ نَوَاحِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَرَقًا وَعَيْنًا، وَكَانَتِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ مَضْرُوبَةً عَلَى وَزْنِ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَكَانَ أَهْلُ الْبُلْدَانِ يُؤَدُّونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْمَالِ عَدَدًا، وَلَا يَنْظُرُونَ فِي فَضْلِ بَعْضِ الْأَوْزَانِ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ فَسَدَ النَّاسُ، فَصَارَ أَرْبَابُ الْخَرَاجِ يُؤَدُّونَ الطَّبَرِيَّةَ الَّتِي هِيَ أَرْبَعَةُ دَوَانِقَ، وَتَمَسَّكُوا بِالْوَافِي الَّذِي وَزْنُهُ وَزْنُ الْمِثْقَالِ، فَلَمَّا وَلِيَ زِيَادٌ الْعِرَاقَ طَالَبَ بِأَدَاءِ الْوَافِي، وَأَلْزَمَهُمُ الْكُسُورَ، وَجَارَ فِيهِ عُمَّالُ بَنِي أُمَيَّةَ، إِلَى أَنْ وَلِيَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، فَنَظَرَ بَيْنَ الْوَزْنَيْنِ، وَقَدَّرَ وَزْنَ الدَّرَاهِمِ عَلَى نِصْفٍ وَخُمُسِ الْمِثْقَالِ، وَتَرَكَ الْمِثْقَالَ عَلَى حَالِهِ، ثُمَّ إِنَّ الْحَجَّاجَ مِنْ بَعْدِهِ أَعَادَ الْمُطَالَبَةَ بِالْكُسُورِ حَتَّى أَسْقَطَهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَعَادَهَا مِنْ بَعْدِهِ إِلَى أَيَّامِ الْمَنْصُورِ إِلَى أَنْ خَرِبَ السَّوَادُ، فَأَزَالَ الْمَنْصُورُ الْخَرَاجَ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَرِقًا، وَصَيَّرَهُ مُقَاسَمَةً، وَهُمَا أَكْثَرُ غَلَّاتِ السَّوَادِ، وَأَبْقَى الْيَسِيرَ مِنَ الْحُبُوبِ وَالنَّخْلِ وَالشَّجَرِ عَلَى رَسْمِ الْخَرَاجِ، وَهُوَ كَمَا يُلْزَمُونَ الْآنَ الْكُسُورَ وَالْمُؤَنَ، فَقَالَ الْمُهْتَدِي: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أُلْزِمَ النَّاسَ ظُلْمًا تَقَدَّمَ الْعَمَلُ بِهِ أَوْ تَأَخَّرَ، أَسْقِطُوهُ عَنِ النَّاسِ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَخْلَدٍ1: إِنْ أَسْقَطَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا ذَهَبَ مِنْ أَمْوَالِ

السُّلْطَانِ فِي السَّنَةِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ الْمُهْتَدِي: عَلَيَّ أَنْ أُقَرِّرَ حَقًّا وَأُزِيلَ ظُلْمًا، وَإِنْ أَجْحَفَ بَيْتُ الْمَالِ.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: كُتَّابُ الدَّوَاوِينِ؛ لِأَنَّهُمْ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثُبُوتِ أَمْوَالِهِمْ فِيمَا

---

1 هو الحسن بن مخلد بن الجراح، أبو محمد الكاتب، وكان الحسن عظيم الجسم، مهيب المنظر، قوي الحجة، شديد العارضة، لا يقدم في وقته أحد عليه، ولا يقاس به، وكان يقال: "ما لا يعلمه الحسن بن مخلد من الخراج فليس في الدنيا"، وكان جوادًا ممدحًا، ومدحه البحتري، وغيره.

তোমাদের পরকাল সংশোধন করো, তোমাদের ইহকালও সংশোধন হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তির মধ্যে ও আদমের মধ্যে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো ব্যবধান নেই, সে তো মৃত্যুর গভীরেই নিমজ্জিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্য সম্পদ বা কর আদায়ে সংঘটিত জুলুম বা অবিচার। এ ক্ষেত্রে ইমামগণের (শাসকদের) দপ্তরের ইনসাফপূর্ণ কানুন বা নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে। তিনি জনগণকে সেই অনুযায়ী পরিচালিত করবেন এবং কর্মকর্তাদের তা মেনে চলতে বাধ্য করবেন। আর অতিরিক্ত যা কিছু তারা আদায় করেছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন; যদি তা কোষাগারে জমা দেওয়া হয়ে থাকে তবে তিনি তা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেবেন, আর যদি তারা তা নিজেদের জন্য রেখে দেয় তবে তিনি তা প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন।

বর্ণিত হয়েছে যে, আল-মুহতাদী (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) একদিন প্রজাদের অভিযোগ বা মাজালিম নিষ্পত্তির জন্য বসলেন। তখন তাঁর নিকট মুদ্রার ঘাটতি বা হ্রাসের (কুসুর) বিষয়ে কিছু আবেদন পেশ করা হলো এবং তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সুলায়মান ইবনে ওয়াহাব বললেন: উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আস-সাওয়াদ অঞ্চল এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিজিত এলাকাগুলোতে রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রার ওপর 'খারাজ' বা ভূমি-কর নির্ধারণ করেছিলেন। দিরহাম ও দিনারগুলো তখন কিসরা (পারস্য সম্রাট) ও কায়সারের (রোমান সম্রাট) ওজনে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীরা তাদের নিকট রক্ষিত মুদ্রাগুলো সংখ্যায় পরিশোধ করত এবং একটির ওজনের ওপর অন্যটির ওজনের আধিক্য বিবেচনা করত

না। অতঃপর জনগণের মধ্যে বিপর্যয় দেখা দিল এবং করদাতারা 'তাবারী' দিরহাম দিয়ে কর পরিশোধ করতে শুরু করল যা ছিল চার দাওনাক ওজনের। কিন্তু তারা 'ওয়াফী' দিরহাম আঁকড়ে ধরল যার ওজন ছিল এক মিসকাল। যখন যিয়াদ ইরাকের শাসনভার গ্রহণ করলেন, তিনি 'ওয়াফী' দিরহামে কর পরিশোধের দাবি জানালেন এবং তাদের ওপর ঘাটতি বা 'কুসুর' পরিশোধ বাধ্যতামূলক করলেন। উমাইয়া আমলের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে জুলুম করতে থাকে, পরিশেষে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান ক্ষমতায় আসীন হলেন। তিনি উভয় প্রকার ওজনের মধ্যে সমতা বিধান করলেন এবং দিরহামের ওজন এক মিসকালের অর্ধেক ও পাঁচ ভাগের এক ভাগ (সাত-দশমাংশ) নির্ধারণ করলেন এবং মিসকালকে তার পূর্বের অবস্থাতেই বহাল রাখলেন। অতঃপর তাঁর পরবর্তী সময়ে হাজ্জাজ পুনরায় কুসুর বা ঘাটতি আদায়ের দাবি তোলেন, যতক্ষণ না উমর ইবনে আব্দুল আজিজ তা বাতিল করেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে আল-মানসুরের আমল পর্যন্ত তা পুনরায় চালু থাকে এবং এক পর্যায়ে আস-সাওয়াদ অঞ্চল বিরান হয়ে পড়ে। তখন আল-মানসুর গম ও যবের ওপর রৌপ্যমুদ্রায় ধার্যকৃত কর রহিত করে তা উৎপাদিত ফসলের ভাগাভাগিতে (মুকাসামাহ) রূপান্তরিত করেন—কেননা এ দুটিই ছিল আস-সাওয়াদ অঞ্চলের প্রধান ফসল। আর যৎসামান্য শস্য, খেজুরগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের ওপর আগের নিয়মেই খারাজ বহাল রাখেন। এটি এখন তাদের ওপর চাপানো 'কুসুর' ও অতিরিক্ত ব্যয়ের মতোই। তখন আল-মুহতাদী বললেন: আল্লাহর পানাহ! মানুষের ওপর এমন জুলুম চাপাতে আমি রাজি নই, তা আগে থেকেই প্রচলিত থাকুক বা পরে আসুক। তোমরা জনগণের ওপর থেকে এটি তুলে নাও। তখন হাসান ইবনে মাখলাদ১ বললেন: আমিরুল মুমিনিন যদি এটি তুলে নেন, তবে সুলতানের রাজকোষ থেকে বছরে এক কোটি বিশ লক্ষ দিরহাম কমে যাবে। তখন আল-মুহতাদী বললেন: আমার দায়িত্ব হলো হক প্রতিষ্ঠা করা এবং জুলুম দূর করা, তাতে বাইতুল মাল বা রাজকোষ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আমার কিছু করার নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: দপ্তরের সচিব বা লেখকবৃন্দ; কারণ তারা মুসলিমদের সম্পদের স্থিতি নিশ্চিতকরণে বিশ্বস্ত আমানতদার...

---

১ তিনি হলেন হাসান ইবনে মাখলাদ ইবনুল জাররাহ, আবু মুহাম্মদ আল-কাতিব। হাসান ছিলেন বিশাল দেহী, গাম্ভীর্যপূর্ণ অবয়ব ও শক্তিশালী যুক্তিসম্পন্ন একজন বাগ্মী ব্যক্তিত্ব। তাঁর সমসাময়িক কালে কেউ তাঁর অগ্রবর্তী হতে পারেনি এবং কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। বলা হতো: "খারাজ বা ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত যে বিষয়ে হাসান ইবনে মাখলাদ জানেন না, তা

পৃথিবীতে নেই।" তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল এবং প্রশংসিত ব্যক্তি। বুহতরী ও অন্যান্য কবিরা তাঁর প্রশংসা করেছেন।

يَسْتَوْفُونَهُ لَهُ وَيُوفُونَهُ مِنْهُ أَعَادَهُ؛ فَيَتَصَفَّحُ أَحْوَالَ مَا وُكِلَ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ عَدَلُوا بِحَقِّ مَنْ دَخَلَ أَوْ خَرَجَ إِلَى زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ إِلَى قَوَانِينِهِ، وَقَابَلَ عَلَى تَجَاوُزِهِ.

حُكِيَ أَنَّ الْمَنْصُورَ رضي الله عنه بَلَغَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ كُتَّابِ دَوَاوِينِهِ زَوَّرُوا فِيهِ وَغَيَّرُوا، فَأَمَرَ بِإِحْضَارِهِمْ وَتَقَدَّمَ تَأْدِيبُهُمْ، فَقَالَ: حَدَثَ مِنْهُمْ وَهُوَ يَضْرِبُ، "مِنَ الْوَافِرِ":

أَطَالَ اللَّهُ عُمْرَكَ فِي صَلَاحٍ ... وَعِزٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَا

بِعَفْوِكَ نَسْتَجِيرُ فَإِنْ تُجِزْنَا ... فَإِنَّكَ عِصْمَةٌ لِلْعَالَمِينَا

وَنَحْنُ الْكَاتِبُونَ وَقَدْ أَسَأْنَا ... فَهَبْنَا لِلْكِرَامِ الْكَاتِبِينَا

فَأَمَرَ بِتَخْلِيَتِهِمْ، وَوَصَلَ الْفَتَى وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ وَبَانَتْ فِيهِ النَّجَابَةُ؛ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ لَا يَحْتَاجُ وَالِي الْمَظَالِمِ تَصَفُّحَهَا إِلَى مُتَظَلِّمٍ.

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: تَظَلُّمُ الْمُسْتَرْزِقَةِ مِنْ نَقْصِ أَرْزَاقِهِمْ أَوْ تَأَخُّرِهَا عَنْهُمْ، وَإِجْحَافِ النَّظَرِ بِهِمْ، فَيَرْجِعُ إِلَى دِيوَانِهِ فِي فَرْضِ الْعَطَاءِ الْعَادِلِ فَيُجْرِيهِمْ عَلَيْهِ، وَيَنْظُرُ فِيمَا نَقَصُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ مِنْ قَبْلُ، فَإِنْ أَخَذَهُ وُلَاةُ أُمُورِهِمْ اسْتَرْجَعَهُ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ قَضَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. كَتَبَ بَعْضُ وُلَاةِ الْأَجْنَادِ إِلَى الْمَأْمُونِ أَنَّ الْجُنْدَ شَغَّبُوا وَنَهَبُوا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: لَوْ عَدَلْتَ لَمْ يُشَغِّبُوا، وَلَوْ وَفَّيْتَ لَمْ يَنْهَبُوا، وَعَزَلَهُ عَنْهُمْ وَأَدَرَّ عَلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ.

وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ: رَدُّ الْغُصُوبِ، وَهِيَ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: غُصُوبٌ سُلْطَانِيَّةٌ قَدْ تَغَلَّبَ عَلَيْهَا وُلَاةُ الْجَوْرِ؛ كَالْأَمْلَاكِ الْمَقْبُوضَةِ عَنْ أَرْبَابِهَا، إِمَّا لِرَغْبَةٍ فِيهَا، وَإِمَّا لِتَعَدٍّ عَلَى أَهْلِهَا، فَهَذَا إِنْ عَلِمَ بِهِ وَالِي الْمَظَالِمِ عِنْدَ تَصَفُّحِ الْأُمُورِ أَمَرَ بِرَدِّهِ قَبْلَ التَّظَلُّمِ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلُّمِ أَرْبَابِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ عِنْدَ تَظَلُّمِهِمْ إِلَى دِيوَانِ السَّلْطَنَةِ، فَإِذَا وَجَدَ فِيهِ ذِكْرَ قَبْضِهَا عَلَى مَالِكِهَا عَمِلَ عَلَيْهِ وَأَمَرَ بِرَدِّهَا إِلَيْهِ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِهِ، وَكَانَ مَا وَجَدَهُ فِي الدِّيوَانِ كَافِيًا.

كَمَا حُكِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَادَفَهُ رَجُلٌ وَرَدَ مِنَ الْيَمَنِ مُتَظَلِّمًا فَقَالَ -مِنَ الْبَسِيطِ:

تَدْعُونَ حَيْرَانَ مَظْلُومًا بِبَابِكُمْ ... فَقَدْ أَتَاكَ بَعِيدُ الدَّارِ مَظْلُومُ

তারা তাঁর জন্য তা পূর্ণভাবে আদায় করে এবং তা থেকে তাঁকে প্রদান করে, তিনি তা পুনরায় পর্যালোচনা করেন; অতঃপর তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের বিষয়াবলী তিনি খতিয়ে দেখেন। যদি তারা ভেতরে প্রবেশকারী বা বাইরে গমনকারীর পাওনা হকের ক্ষেত্রে কম বা বেশি করার মাধ্যমে ইনসাফ থেকে বিচ্যুত হয়, তবে তিনি তা বিধিবদ্ধ নিয়মের দিকে ফিরিয়ে আনেন এবং সীমালঙ্ঘনের জন্য শাস্তি প্রদান করেন।

বর্ণিত আছে যে, মনসুর (রা.) তাঁর দপ্তরের একদল লেখকের ব্যাপারে জানতে পারলেন যে, তারা নথিপত্রে জালিয়াতি ও পরিবর্তন করেছে। তিনি তাদের উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। তখন তাদের একজন প্রহারের সময় "ওয়াফির" ছন্দে বলে উঠল:

হে আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ যেন নেক আমল ও সম্মানের সাথে আপনার হায়াত দীর্ঘ করেন। আপনার ক্ষমার আশ্রয়ে আমরা পানাহ চাই, আপনি যদি আমাদের নিরাপত্তা দেন তবে নিশ্চয়ই আপনি বিশ্ববাসীর জন্য আশ্রয়স্থল।

আমরা তো লেখক এবং আমরা অপরাধ করে ফেলেছি, তাই ‘সম্মানিত লেখক’ ফেরেশতাদের সম্মানে আমাদের ক্ষমা করে দিন।

তখন তিনি তাদের মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং সেই যুবককে পুরস্কার দিলেন ও তার সাথে সদাচরণ করলেন; কারণ তার মাঝে আমানতদারিতা ও আভিজাত্য প্রকাশ

পেয়েছিল। আর এই তিনটি প্রকারের ক্ষেত্রে মজালিম (অবিচার নিরসন) কর্তৃপক্ষকে তদন্তের জন্য কোনো অভিযোগকারীর অপেক্ষায় থাকতে হয় না।

চতুর্থ প্রকার: সরকারি ভাতাভোগীদের পক্ষ থেকে তাদের ভাতার পরিমাণ হ্রাস পাওয়া বা তা পরিশোধে বিলম্ব হওয়া এবং তাদের প্রতি অবিচার করা সংক্রান্ত অভিযোগ। এমতাবস্থায় তিনি ন্যায়সঙ্গত ভাতা নির্ধারণের দপ্তরে ফিরে যাবেন এবং তাদের সেই অনুযায়ী ভাতা প্রদান করবেন। ইতিপূর্বে যে অংশ তারা কম পেয়েছে বা যা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি দৃষ্টি দেবেন। যদি তাদের কর্মকর্তাদের কেউ তা আত্মসাৎ করে থাকে তবে তিনি তা তাদের থেকে পুনরুদ্ধার করবেন, আর যদি তারা তা গ্রহণ না করে থাকে তবে তিনি বায়তুল মাল থেকে তা পরিশোধ করবেন। লশকর বা সেনাবাহিনীর জনৈক কর্মকর্তা মামুনের কাছে লিখে পাঠালেন যে, সৈন্যরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে এবং লুণ্ঠন চালাচ্ছে। উত্তরে মামুন তাকে লিখে পাঠালেন: “তুমি যদি ইনসাফ করতে তবে তারা বিশৃঙ্খলা করত না, আর তুমি যদি তাদের পাওনা পূর্ণভাবে পরিশোধ করতে তবে তারা লুণ্ঠন চালাত না।” অতঃপর তিনি তাকে পদচ্যুত করলেন এবং সৈন্যদের নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করলেন।

পঞ্চম প্রকার: জবরদখলকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া; এটি দুই প্রকারের:

প্রথমটি হলো: রাষ্ট্রীয় জবরদখল যা জালেম শাসকরা ক্ষমতার জোরে দখল করেছে; যেমন মালিকদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সম্পত্তি—হয়তো সেই সম্পদের প্রতি লোভের কারণে অথবা মালিকদের ওপর শত্রুতার বশবর্তী হয়ে। মজালিম বা অভিযোগ নিরসনকারী শাসক যদি বিষয়াবলি পর্যালোচনার সময় এ সম্পর্কে জানতে পারেন, তবে অভিযোগ দায়েরের পূর্বেই তিনি তা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেবেন। আর যদি তিনি এ সম্পর্কে অবগত না থাকেন, তবে তা মালিকপক্ষের অভিযোগের ওপর নির্ভরশীল থাকবে। এক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করা হলে তিনি সালতানাত বা রাষ্ট্রীয় দপ্তরের নথিপত্র যাচাই করতে পারেন। যদি সেখানে মালিকের কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে তিনি সে অনুযায়ী আমল করবেন এবং তা মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেবেন; এক্ষেত্রে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হবে না এবং দপ্তরে যা পাওয়া গেছে তা-ই যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।

যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) একদিন নামাজের উদ্দেশ্যে বের হলেন, তখন ইয়ামেন থেকে আসা অভিযোগকারী এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। সে "বাসিত" ছন্দে বলল:

আপনার দ্বারে এক দিশেহারা মজলুমকে আহ্বান করছেন, দূর প্রবাস থেকে এক মজলুম আপনার নিকট এসেছে।

فَقَالَ: مَا ظُلَامَتُكَ؟ فَقَالَ: غَصَبَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ضَيْعَتِي، فَقَالَ: يَا مُرَاجِمُ ائْتِنِي بِدَفْتَرِ الصَّوَافِي، فَوَجَدَ فِيهِ: أَصْفَى عَبْدُ اللَّهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ضَيْعَةَ فُلَانٍ، فَقَالَ: أَخْرِجْهَا مِنَ الدَّفْتَرِ، وَلْيَكْتُبْ بِرَدِّ ضَيْعَتِهِ إِلَيْهِ، وَيُطْلِقْ لَهُ ضِعْفَ نَفَقَتِهِ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مِنَ الْغُصُوبِ مَا تَغَلَّبَ عَلَيْهَا ذَوُو الْأَيْدِي الْقَوِيَّةِ، وَتَصَرَّفُوا فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، فَهَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلُّمِ أَرْبَابِهِ، وَلَا يُنْتَزَعُ مِنْ يَدِ غَاصِبِهِ إِلَّا بِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ، إِمَّا بِاعْتِرَافِ الْغَاصِبِ وَإِقْرَارِهِ، إِمَّا بِعِلْمِ وَالِي الْمَظَالِمِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ لِعِلْمِهِ، وَإِمَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَى الْغَاصِبِ بِغَصْبِهِ، أَوْ تَشْهَدُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ بِمِلْكِهِ، وَإِمَّا بِتَظَاهُرِ الْأَخْبَارِ الَّذِي يَنْفِي عَنْهَا التَّوَاطُؤَ، وَلَا يَخْتَلِجُ فِيهَا الشُّكُوكُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا فِي الْأَمْلَاكِ بِتَظَاهُرِ الْأَخْبَارِ، كَانَ حُكْمُ وُلَاةِ الْمَظَالِمِ بِذَلِكَ أَحَقَّ.

وَالْقِسْمُ السَّادِسُ: مُشَارَفَةُ الْوُقُوفِ وَهِيَ ضَرْبَانِ:

عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ، فَأَمَّا الْعَامَّةُ فَيَبْدَأُ بِتَصَفُّحِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُتَظَلِّمٌ لِيُجْرِيَهَا عَلَى سَبِيلِهَا، وَيُمْضِيَهَا عَلَى شُرُوطِ وَاقِفِهَا إِذَا عَرَفَهَا مِنْ أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

إِمَّا مِنْ دَوَاوِينِ الْحُكَّامِ الْمَنْدُوبِينَ لِحِرَاسَةِ الْأَحْكَامِ، وَإِمَّا مِنْ دَوَاوِينِ السَّلْطَنَةِ عَلَى مَا جَرَى فِيهَا مِنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ ثَبَتَ لَهَا مِنْ ذِكْرٍ وَتَسْمِيَةٍ، وَإِمَّا مِنْ كُتُبٍ فِيهَا قَدِيمَةٍ تَقَعُ فِي النَّفْسِ صِحَّتُهَا وَإِنْ لَمْ يَشْهَدِ الشُّهُودُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَتَعَيَّنُ الْخَصْمُ فِيهَا، فَكَانَ الْحُكْمُ أَوْسَعَ مِنْهُ فِي الْوُقُوفِ الْخَاصَّةِ.

وَأَمَّا الْوُقُوفُ الْخَاصَّةُ فَإِنَّ نَظَرَهُ فِيهَا مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلُّمِ أَهْلِهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ فِيهَا؛ لِوَقْفِهَا عَلَى خُصُومٍ مُتَعَيِّنِينَ، فَيَعْمَلُ عِنْدَ التَّشَاجُرِ فِيهَا عَلَى مَا تَثْبُتُ بِهِ الْحُقُوقُ عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى دِيوَانِ السَّلْطَنَةِ، وَلَا إِلَى مَا يَثْبُتُ مِنْ ذِكْرِهَا فِي الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ إِذَا لَمْ يَشْهَدْ بِهَا شُهُودٌ مُعَدَّلُونَ.

وَالْقِسْمُ السَّابِعُ: تَنْفِيذُ مَا وَقَفَ الْقُضَاةُ مِنْ أَحْكَامِهَا لِضَعْفِهِمْ عَنْ إِنْفَاذِهَا، وَعَجْزِهِمْ عَنِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ؛ لِتَعَزُّزِهِ وَقُوَّةِ يَدِهِ، أَوْ لِعُلُوِّ قَدْرِهِ وَعِظَمِ خَطَرِهِ، فَيَكُونُ نَاظِرُ الْمَظَالِمِ أَقْوَى يَدًا وَأَنْفَذَ أَمْرًا، فَيُنَفِّذُ الْحُكْمَ عَلَى مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ بِانْتِزَاعِ مَا فِي يَدِهِ، أَوْ بِإِلْزَامِهِ الْخُرُوجَ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ.

وَالْقِسْمُ الثَّامِنُ: النَّظَرُ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ النَّاظِرُونَ مِنَ الْحِسْبَةِ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، كَالْمُجَاهَرَةِ بِمُنْكَرٍ ضَعُفَ عَنْ دَفْعِهِ، وَالتَّعَدِّي فِي طَرِيقٍ عَجَزَ عَنْ مَنْعِهِ، وَالتَّحَيُّفِ فِي حَقٍّ لَمْ

তিনি বললেন: "তোমার অভিযোগ কী?" সে উত্তর দিল: "ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক আমার কৃষিভূমি জবরদখল করেছেন।" তিনি বললেন: "হে মুরাজিম! আমার কাছে সরকারি খাস জমির খাতা নিয়ে এসো।" তিনি সেখানে লিপিবদ্ধ পেলেন: "আব্দুল্লাহর পুত্র ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক অমুকের জমি সরকারি খাসভুক্ত করেছেন।" তখন তিনি বললেন: "খাতা থেকে এটি মুছে ফেলো এবং তার জমি তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ লিখে দাও এবং তাকে তার ব্যয়ের দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করো।"

দ্বিতীয় প্রকার: ঐ সকল জবরদখল যা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জবরদস্তি ও ক্ষমতার দাপটে কবজা করেছে এবং মালিকের ন্যায় তাতে যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করেছে। এই বিষয়টি এর প্রকৃত মালিকদের অভিযোগের ওপর নির্ভরশীল এবং চারটি বিষয়ের কোনো একটি ছাড়া তা দখলকারীর হাত থেকে উদ্ধার করা যাবে না: হয় দখলকারীর স্বীকারোক্তি ও স্বীকৃতির মাধ্যমে; অথবা মাজালিম (অবিচার প্রতিরোধক) কর্মকর্তার স্বীয় অবগতির মাধ্যমে—ফলে তিনি তার জ্ঞানের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে রায় দিতে পারেন; অথবা এমন প্রমাণের মাধ্যমে যা দখলকারীর জবরদখলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, কিংবা যার থেকে জবরদখল করা হয়েছে তার মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়; অথবা এমন ব্যাপক জনশ্রুতির মাধ্যমে যা ষড়যন্ত্রের সন্দেহ দূর করে এবং

যাতে কোনো সংশয় থাকে না। কারণ সাক্ষীদের জন্য যখন ব্যাপক জনশ্রুতির ভিত্তিতে মালিকানার সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ, তখন মাজালিম কর্মকর্তাদের জন্য সে ভিত্তিতে বিচার করা আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত।

ষষ্ঠ বিভাগ: ওয়াকফসমূহের তদারকি করা। এটি দুই প্রকার:

সাধারণ এবং বিশেষ। সাধারণ ওয়াকফসমূহের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা কোনো অভিযোগকারী না থাকলেও সেগুলোর পর্যালোচনার মাধ্যমে কাজ শুরু করবেন, যাতে সেগুলোকে সঠিক খাতে পরিচালিত করা যায় এবং ওয়াকফকারীর শর্তানুসারে তা কার্যকর করা যায়, যখন তিনি তিনটি মাধ্যমের কোনো একটির দ্বারা তা অবগত হবেন:

হয় বিচার বিভাগীয় নথিপত্র থেকে যা আইনি সুরক্ষার জন্য সংরক্ষিত, অথবা রাষ্ট্রীয় নথিপত্র থেকে যাতে সেগুলোর লেনদেন বা সুনির্দিষ্ট উল্লেখ ও নামকরণ রয়েছে, অথবা এমন কোনো প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে যার সত্যতা মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যদিও সাক্ষী দ্বারা তা প্রমাণিত না হয়; কারণ এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট বিবাদী থাকে না, তাই বিশেষ ওয়াকফের তুলনায় এক্ষেত্রে বিচারের পরিধি অধিক প্রশস্ত।

আর বিশেষ ওয়াকফসমূহের ক্ষেত্রে তার তদারকি বিরোধের সময় এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিযোগের ওপর নির্ভরশীল; কারণ এটি নির্দিষ্ট বিবাদীদের জন্য ওয়াকফকৃত। ফলে এ সংক্রান্ত বিরোধের সময় তিনি ঐ সকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবেন যার মাধ্যমে বিচারকের নিকট অধিকারসমূহ সাব্যস্ত হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নথিপত্র বা প্রাচীন কিতাবের তথ্যের দিকে ফিরে যাওয়া বৈধ হবে না যদি না নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের দ্বারা তা প্রমাণিত হয়।

সপ্তম বিভাগ: বিচারকগণ যেসব রায় কার্যকর করতে তাদের দুর্বলতার কারণে অপারগ হন তা বাস্তবায়ন করা। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার কারণে কিংবা তার উচ্চ পদমর্যাদা ও বিশাল শ্রেষ্ঠত্বের কারণে বিচারকগণ যখন রায় কার্যকর করতে অক্ষম হন, তখন মাজালিম কর্মকর্তা অধিক প্রভাবশালী এবং তার আদেশ অধিক কার্যকর হওয়ার কারণে তিনি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় কার্যকর করবেন—তার দখলে থাকা সম্পদ উদ্ধারের মাধ্যমে অথবা তার জিম্মায় থাকা পাওনা পরিশোধে তাকে বাধ্য করার মাধ্যমে।

অষ্টম বিভাগ: জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সেই সকল তদারকি (হিসবাহ) বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া যা সাধারণ তদারককারীগণ সমাধান করতে অক্ষম হয়েছেন। যেমন প্রকাশ্যে কোনো মন্দ কাজ সংঘটিত হওয়া যা দূর করতে তারা দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন, কিংবা সর্বসাধারণের চলাচলের

পথে কোনো সীমালঙ্ঘন যা প্রতিরোধ করতে তারা অক্ষম হয়েছেন, অথবা এমন কোনো হকের ক্ষেত্রে অন্যায় করা যা...

(ص: 138)الأحكام السلطانية للماوردي

يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ، فَيَأْخُذُهُمْ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِهِ، وَيَأْمُرُ بِحَمْلِهِمْ عَلَى مُوجَبِهِ.

وَالْقِسْمُ التَّاسِعُ: مُرَاعَاةُ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ؛ كَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ مِنْ تَقْصِيرٍ فِيهَا وَإِخْلَالٍ بِشُرُوطِهَا، فَإِنَّ حُقُوقَ اللَّهِ أَوْلَى أَنْ تُسْتَوْفَى، وَفُرُوضَهُ أَحَقُّ أَنْ تُؤَدَّى.

وَالْقِسْمُ الْعَاشِرُ: النَّظَرُ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَالْحُكْمُ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ، فَلَا يَخْرُجُ فِي النَّظَرِ بَيْنَهُمْ عَنْ مُوجَبِ الْحَقِّ وَمُقْتَضَاهُ، وَلَا يَسُوغُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِمَا يَحْكُمُ بِهِ الْحُكَّامُ وَالْقُضَاةُ، وَرُبَّمَا اشْتَبَهَ حُكْمُ الْمَظَالِمِ عَلَى النَّاظِرِينَ فِيهَا، فَيَجُورُونَ فِي أَحْكَامِهَا، وَيَخْرُجُونَ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي لَا يَسُوغُ فِيهَا.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَظَرِ الْمَظَالِمِ وَنَظَرِ الْقُضَاةِ مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ لِنَاظِرِ الْمَظَالِمِ مِنْ فَضْلِ الْهَيْبَةِ وَقُوَّةِ الْيَدِ مَا لَيْسَ لِلْقُضَاةِ فِي كَفِّ الْخُصُومِ عَنِ التَّجَاحُدِ، وَمَنْعِ الظَّلَمَةِ مِنَ التَّغَالُبِ وَالتَّجَاذُبِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ نَظَرَ الْمَظَالِمِ يَخْرُجُ مِنْ ضِيقِ الْوُجُوبِ إِلَى سِعَةِ الْجَوَازِ، فَيَكُونُ النَّاظِرُ فِيهِ أَفْسَحَ مَجَالًا وَأَوْسَعَ مَقَالًا.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ مِنْ فَضْلِ الْإِرْهَابِ وَكَشْفِ الْأَسْبَابِ بِالْأَمَارَاتِ الدَّالَّةِ وَشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ اللَّائِحَةِ مَا يُضَيِّقُ عَلَى الْحُكَّامِ، فَيَصِلُ بِهِ إِلَى ظُهُورِ الْحَقِّ وَمَعْرِفَةِ الْمُبْطِلِ مِنَ الْمُحِقِّ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يُقَابِلَ مَنْ ظَهَرَ ظُلْمُهُ بِالتَّأْدِيبِ، وَيَأْخُذَ مَنْ بَانَ عِدْوَانُهُ بِالتَّقْوِيمِ وَالتَّهْذِيبِ.

وَالْخَامِسُ: أَنَّ لَهُ مِنَ التَّأَنِّي فِي تَرْدَادِ الْخُصُومِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ أُمُورِهِمْ وَاسْتِبْهَامِ حُقُوقِهِمْ؛ لِيُمْعِنَ فِي الْكَشْفِ عَنْ أَسْبَابِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ مَا لَيْسَ لِلْحُكَّامِ إِذَا سَأَلَهُمْ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ فَصْلَ الْحُكْمِ. فَلَا يَسُوغُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ الْحَاكِمُ وَيَسُوغُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَالِي الْمَظَالِمِ.

وَالسَّادِسُ: أَنَّ لَهُ رَدَّ الْخُصُومِ إِذَا أَعْضَلُوا وَسَاطَةَ الْأُمَنَاءِ؛ لِيَفْصِلُوا التَّنَازُعَ بَيْنَهُمْ صُلْحًا عَنْ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رِضَا الْخَصْمَيْنِ بِالرَّدِّ.

وَالسَّابِعُ: أَنْ يُفْسِحَ فِي مُلَازَمَةِ الْخَصْمَيْنِ إِذَا وَضَحَتْ أَمَارَاتُ التَّجَاحُدِ، وَيَأْذَنَ فِي إِلْزَامِ الْكَفَالَةِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ التَّكَفُّلُ؛ لِيَنْقَادَ الْخُصُومُ إِلَى التَّنَاصُفِ، وَيَعْدِلُوا عَنِ التَّجَاحُدِ وَالتَّكَاذُبِ.

তিনি তা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন, ফলে তিনি মহান আল্লাহর হকের প্রেক্ষিতে তাদের নিকট থেকে তা পুরোপুরি আদায় করেন এবং এর দাবি অনুযায়ী তাদের পরিচালিত করার আদেশ প্রদান করেন।

নবম বিভাগ: প্রকাশ্য ইবাদতসমূহের তত্ত্বাবধান করা; যেমন জুমুআ, দুই ঈদ, হজ ও জিহাদ—এগুলোতে কোনো প্রকার শিথিলতা বা শর্তাবলির লঙ্ঘন হচ্ছে কি না তা দেখা। কারণ আল্লাহর হকসমূহ পূর্ণরূপে আদায় হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয় এবং তাঁর নির্ধারিত ফরজসমূহ পালন করা অধিকতর অগ্রগণ্য।

দশম বিভাগ: বিবাদমান পক্ষসমূহের কলহ নিরসন এবং বিবাদকারীদের মধ্যে মীমাংসা করা। তাদের মধ্যকার বিচারিক পর্যবেক্ষণে তিনি সত্যের দাবি ও আবশ্যকীয় বিষয় থেকে বিচ্যুত হবেন না। বিচারক ও কাজীগণ যেভাবে বিচার করেন, সে পদ্ধতি ছাড়া তাদের মাঝে বিচার করা বৈধ নয়। অনেক সময় অভিযোগ প্রতিকারকারী (মাযালিম) কর্মকর্তাদের নিকট এ সংক্রান্ত বিচারকার্যের বিধান অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, ফলে তারা বিচারে জুলুম করেন এবং এমন সীমায় পৌঁছে যান যা বৈধ নয়।

মাযালিম (প্রশাসনিক বিচার) এবং সাধারণ কাজী বা বিচারকদের বিচারিক এখতিয়ারের মধ্যে পার্থক্য দশটি দিক থেকে পরিলক্ষিত হয়:

প্রথমত: বিবাদমান পক্ষসমূহকে সত্য অস্বীকার করার প্রবণতা থেকে বিরত রাখতে এবং জালিমদের পারস্পরিক আধিপত্য বিস্তার ও কলহ থেকে প্রতিহত করতে মাযালিম বিচারকের এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রশাসনিক শক্তি রয়েছে, যা সাধারণ বিচারকদের নেই।
দ্বিতীয়ত: মাযালিম বিচারব্যবস্থা আবশ্যকতার সংকীর্ণতা থেকে বৈধতার প্রশস্ততার দিকে প্রসারিত। ফলে এতে সংশ্লিষ্ট বিচারকের জন্য কাজের ক্ষেত্র ও বক্তব্য প্রদানের সুযোগ অধিকতর বিস্তৃত হয়।
তৃতীয়ত: তিনি অতিরিক্ত ভীতি প্রদর্শন এবং নির্দেশক আলামত ও প্রকাশ্য পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে প্রকৃত কারণ উদঘাটন করেন, যা সাধারণ বিচারকদের জন্য সীমাবদ্ধ। এর মাধ্যমে তিনি সত্যের প্রকাশ ঘটান এবং হকদার ও বাতিলপন্থীর মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করেন।
চতুর্থত: যার জুলুম প্রকাশ পেয়ে যায় তাকে দণ্ড প্রদান করা এবং যার সীমালঙ্ঘন স্পষ্ট হয়ে যায় তাকে সংশোধন ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানের মাধ্যমে পাকড়াও করা।
পঞ্চমত: বিবাদমান পক্ষসমূহের বিষয়াদি অস্পষ্ট হলে এবং তাদের অধিকারসমূহ সংশয়াচ্ছন্ন থাকলে প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানে গভীর মনোনিবেশ করার নিমিত্তে তিনি তাদের পুনঃপুন তলব করার ক্ষেত্রে যে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতে পারেন, সাধারণ বিচারকগণ তা পারেন না। যখন বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের কেউ চূড়ান্ত ফয়সালা দাবি করে, তখন সাধারণ বিচারকের জন্য তা বিলম্বিত করা বৈধ নয়, কিন্তু মাযালিম কর্মকর্তার জন্য বিলম্ব করা বৈধ।
ষষ্ঠত: বিবাদ যদি জটিল আকার ধারণ করে, তবে তিনি বিবাদমান পক্ষসমূহকে কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির মধ্যস্থতায় পাঠিয়ে দিতে পারেন, যাতে তারা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে আপসের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করে; সাধারণ কাজীর জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি ব্যতীত এমনটি করার অধিকার নেই।
সপ্তমত: যখন সত্য অস্বীকার করার আলামত স্পষ্ট হয় তখন বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে নজরদারিতে রাখা এবং যেসব ক্ষেত্রে জামিন গ্রহণ করা বৈধ সেখানে জামিনদার বাধ্যতামূলক করার অনুমতি প্রদান করা; যাতে পক্ষসমূহ ন্যায়পরায়ণতার দিকে ধাবিত হয় এবং অস্বীকার ও মিথ্যাচারের পথ পরিহার করে।

وَالثَّامِنُ: أَنَّهُ يَسْمَعُ مِنْ شَهَادَاتِ الْمَسْتُورِينَ مَا يَخْرُجُ عَنْ عُرْفِ الْقُضَاةِ فِي شَهَادَةِ الْمُعَدَّلِينَ.

وَالتَّاسِعُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إِحْلَافُ الشُّهُودِ عِنْدَ ارْتِيَابِهِ بِهِمْ إِذَا بَدَّلُوا أَيْمَانَهُمْ طَوْعًا، وَيَسْتَكْثِرُ مِنْ عَدَدِهِمْ لِيَزُولَ عَنْهُ الشَّكُّ وَيَنْفِيَ عَنْهُ الِارْتِيَابَ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ.

وَالْعَاشِرُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِاسْتِدْعَاءِ الشُّهُودِ، وَيَسْأَلَهُمْ عَمَّا عِنْدَهُمْ فِي تَنَازُعِ الْخُصُومِ، وَعَادَةُ الْقُضَاةِ تَكْلِيفُ الْمُدَّعِي إِحْضَارَ بَيِّنَةٍ وَلَا يَسْمَعُونَهَا إِلَّا بَعْدَ مَسْأَلَتِهِ؛ فَهَذِهِ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ يَقَعُ بِهَا الْفَرْقُ بَيْنَ نَظَرِ الْمَظَالِمِ وَنَظَرِ الْقَضَاءِ فِي التَّشَاجُرِ وَالتَّنَازُعِ وَهُمَا فِيمَا عَدَاهُمَا مُتَسَاوِيَانِ، وَسَنُوَضِّحُ مِنْ تَفْصِيلِهِمَا مَا نُبَيِّنُ بِهِ إِطْلَاقَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ هَذِهِ الْفُرُوقِ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

فَصْلٌ:

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخْلُ حَالُ الدَّعْوَى عِنْدَ التَّرَافُعِ فِيهَا إِلَى وَالِي الْمَظَالِمِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:

إِمَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا مَا يُقَوِّيهَا، أَوْ يَقْتَرِنَ بِهَا مَا يُضْعِفُهَا، أَوْ تَخْلُوَ مِنَ الْأَمْرَيْنِ، فَإِنْ اقْتَرَنَ بِهَا مَا يُقَوِّيهَا فَلِمَا اقْتَرَنَ بِهَا مِنَ الْقُوَّةِ سِتَّةُ أَحْوَالٍ، تَخْتَلِفُ بِهَا قُوَّةُ الدَّعْوَى عَلَى التَّدْرِيجِ.

فَأَوَّلُ أَحْوَالِهَا: أَنْ يَظْهَرَ مَعَهَا كِتَابٌ فِيهِ شُهُودٌ مُعَدَّلُونَ حُضُورٌ، وَالَّذِي يَخْتَصُّ نَظَرَ الْمَظَالِمِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الدَّعْوَى شَيْئَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَبْتَدِئُ النَّاظِرُ فِيهَا بِاسْتِدْعَاءِ الشُّهُودِ لِلشَّهَادَةِ.

وَالثَّانِي: الْإِنْكَارُ عَلَى الْجَاحِدِ بِحَسَبِ حَالِهِ وَشَوَاهِدِ أَحْوَالِهِ، فَإِذَا أُحْضِرَ الشُّهُودُ، فَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ فِي الْمَظَالِمِ مِمَّنْ يُجَلُّ قَدْرُهُ؛ كَالْخَلِيفَةِ أَوْ وَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَوْ أَمِيرِ إِقْلِيمٍ، رَاعَى مِنْ أَحْوَالِ الْمُتَنَازِعِينَ مَا تَقْتَضِيهِ السِّيَاسَةُ مِنْ مُبَاشَرَةِ النَّاظِرِ بَيْنَهُمَا إِنْ جَلَّ

قَدْرُهُمَا، أَوْ رَدَّ ذَلِكَ إِلَى قَاضِيهِ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ إِنْ كَانَا مُتَوَسِّطَيْنِ، أَوْ عَلَى بُعْدٍ مِنْهُ إِنْ كَانَا خَامِلَيْنِ.

حُكِيَ أَنَّ الْمَأْمُونَ رضي الله عنه كَانَ يَجْلِسُ لِلْمَظَالِمِ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ، فَنَهَضَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ مَجْلِسٍ نَظَرَهُ، فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ فِي ثِيَابٍ رَثَّةٍ فَقَالَتْ "مِنَ الْبَسِيطِ":

يَا خَيْرَ مُنْتَصِفٍ يُهْدَى لَهُ الرَّشَدُ ... وَيَا إِمَامًا بِهِ قَدْ أَشْرَقَ الْبَلَدُ

অষ্টমত: তিনি (মাজালিম প্রধান) এমন সব সাধারণ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, যা সাধারণ বিচারকদের নিকট ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীদের সাক্ষ্যের প্রচলিত রীতির বাইরে।

নবমত: সাক্ষীদের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ হলে তিনি তাদের দিয়ে শপথ গ্রহণ করাতে পারেন, যদি তারা স্বেচ্ছায় শপথ করতে রাজি হয়। এছাড়া তিনি সাক্ষীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে পারেন যাতে তার মন থেকে সন্দেহ দূর হয় এবং সংশয় নিরাসন হয়; সাধারণ বিচারকের এই এখতিয়ার নেই।

দশমত: তিনি নিজেই সাক্ষীদের তলব করে বিচার শুরু করতে পারেন এবং বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে বিরোধের বিষয়ে তাদের কাছে কী তথ্য আছে তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। পক্ষান্তরে বিচারকদের প্রচলিত রীতি হলো বাদীকে প্রমাণ উপস্থিত করার নির্দেশ দেওয়া এবং বাদীর আবেদনের আগে তারা সাক্ষ্য গ্রহণ করেন না। বিরোধ ও ঝগড়া মীমাংসার ক্ষেত্রে মাজালিম (অবিচার নিরসন আদালত) এবং সাধারণ বিচার ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যের এই দশটি দিক রয়েছে। এ দুটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে উভয় ব্যবস্থা সমান। আমরা সামনে এই পার্থক্যগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব যা এদের মধ্যকার অবারিত ব্যবধানকে স্পষ্ট করবে—ইনশাআল্লাহ তায়ালা।

পরিচ্ছেদ:

বিষয়টি যখন এরূপ, তখন মাজালিম প্রধানের কাছে অভিযোগ উত্থাপনের সময় মামলার অবস্থা তিনটির যেকোনো একটি থেকে মুক্ত হবে না:

হয় মামলার সাথে এমন কিছু যুক্ত থাকবে যা একে শক্তিশালী করে, অথবা এমন কিছু যা একে দুর্বল করে, কিংবা এর কোনটিই থাকবে না। যদি মামলার সাথে শক্তি সঞ্চারকারী কোনো বিষয় যুক্ত থাকে, তবে সেই শক্তির বিচারে মামলার অবস্থার ছয়টি পর্যায় রয়েছে, যার ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে মামলার শক্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়।

প্রথম পর্যায়: মামলার সাথে এমন কোনো লিখিত দলিল প্রকাশ পায় যাতে ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীদের দস্তখত থাকে। এই ধরনের মামলায় মাজালিম বিচার ব্যবস্থার বিশেষত্ব হলো দুটি বিষয়:

প্রথমটি হলো: বিচারক নিজেই সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সাক্ষীদের তলব করবেন।

দ্বিতীয়টি হলো: অস্বীকারকারীর প্রতি তার অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে কঠোরতা প্রদর্শন করা। যখন সাক্ষীদের উপস্থিত করা হবে, তখন মাজালিম প্রধান যদি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হন; যেমন খলিফা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত উজির কিংবা প্রদেশের আমির, তবে তিনি বিবাদমান পক্ষগুলোর অবস্থা অনুযায়ী প্রশাসনিক নীতির প্রতিফলন ঘটাবেন। যদি তারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন, তবে তিনি নিজেই তাদের মাঝে বিচার কার্য পরিচালনা করবেন। যদি তারা মধ্যম শ্রেণির হন, তবে তিনি নিজের উপস্থিতিতেই তার বিচারকের মাধ্যমে ফয়সালা করাবেন। আর যদি তারা সাধারণ নিম্নবিত্ত লোক হন, তবে তিনি তাদের তার কাছ থেকে দূরে (সাধারণ আদালতে) বিচারকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

বর্ণিত আছে যে, মামুনুর রশিদ (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) প্রতি রবিবার মাজালিম সভার জন্য বসতেন। একদিন তিনি বিচার সভা শেষ করে উঠে দাঁড়ালে জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত এক নারী তাঁর সাথে দেখা করেন এবং ‘বাসিত’ ছন্দে বলেন:

হে সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক, যাঁর নিকট সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায় … হে ইমাম, যাঁর দ্বারা গোটা জনপদ আজ আলোকিত।

(ص: 140)الأحكام السلطانية للماوردي

تَشْكُو إِلَيْكَ عَمِيدَ الْمُلْكِ أَرَمَلَةٌ … عَدَا عَلَيْهَا فَمَا تَقْوَى بِهِ أَسَدُ

فَابْتَزَّ مِنْهَا ضِيَاعًا بَعْدَ مَنْعَتِهَا … لَمَّا تَفَرَّقَ عَنْهَا الْأَهْلُ وَالْوَلَدُ

فَأَطْرَقَ الْمَأْمُونُ يَسِيرًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ "مِنَ الْبَسِيطِ":

مِنْ دُونِ مَا قُلْتِ عِيلَ الصَّبْرُ وَالْجَلَدُ … وَأَقْرَحَ الْقَلْبَ هَذَا الْحُزْنُ وَالْكَمَدُ

هَذَا أَوَانُ صَلَاةِ الظُّهرِ فَانْصَرِفِي ... وَأَحْضِرِي الْخَصْمَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَعِدُ
الْمَجْلِسُ السَّبْتُ إِنْ يُقْضَ الْجُلُوسُ لَنَا ... أُنْصِفْكِ مِنْهُ وَإِلَّا الْمَجْلِسُ الْأَحَدُ

فَانْصَرَفَتْ وَحَضَرَتْ يَوْمَ الْأَحَدِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ، فَقَالَ لَهَا الْمَأْمُونُ: مَنْ خَصْمُكِ؟ فَقَالَتْ: الْقَائِمُ عَلَى رَأْسِكَ الْعَبَّاسُ بْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ الْمَأْمُونُ لِقَاضِيهِ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ1، وَقِيلَ: لِوَزِيرِهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ: أَجْلِسْهَا مَعَهُ وَانْظُرْ بَيْنَهُمَا، فَأَجْلَسَهَا مَعَهُ وَنَظَرَ بَيْنَهُمَا بِحَضْرَةِ الْمَأْمُونِ، وَجَعَلَ كَلَامُهَا يَعْلُو، فَزَجَرَهَا بَعْضُ حُجَّابِهِ، فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ: دَعْهَا، فَإِنَّ الْحَقَّ أَنْطَقَهَا، وَالْبَاطِلَ أَخْرَسَهُ، وَأَمَرَ بِرَدِّ ضِيَاعِهَا عَلَيْهَا، فَفَعَلَ الْمَأْمُونُ فِي النَّظَرِ بَيْنَهُمَا حَيْثُ كَانَ بِمَشْهَدِهِ، وَلَمْ يُبَاشِرْهُ بِنَفْسِهِ لِمَا اقْتَضَتْهُ السِّيَاسَةُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ حُكْمَهُ رُبَّمَا تَوَجَّهَ لِوَلَدِهِ، وَرُبَّمَا كَانَ عَلَيْهِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ لِوَلَدِهِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْخَصْمَ امْرَأَةٌ يَجِلُّ الْمَأْمُونُ عَنْ مُحَاوَرَتِهَا، وَابْنُهُ مِنْ جَلَالَةِ الْقَدْرِ بِالْمَكَانِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ غَيْرُهُ عَلَى إِلْزَامِهِ الْحَقَّ، فَرَدَّ النَّظَرَ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ إِلَى مَنْ كَفَاهُ مُحَاوَرَةَ الْمَرْأَةِ فِي اسْتِيفَاءِ الدَّعْوَى وَاسْتِيضَاحِ الْحُجَّةِ، وَبَاشَرَ الْمَأْمُونُ رضي الله عنه تَنْفِيذَ الْحُكْمِ وَإِلْزَامَ الْحَقِّ.

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي قُوَّةِ الدَّعْوَى أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا كِتَابٌ فِيهِ مِنَ الشُّهُودِ الْمُعَدَّلِينَ مَنْ

---

1 هو أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن مشنج، التميمي الأسيدي المروزي، من ولد أكثم بن صيفي التميمي حكيم العرب، وعالمًا بالفقه بصيرًا بالأحكام، ذكره الدارقطني في أصحاب الشافعي رضي الله عنه.

وقال الخطيب في "تاريخ بغداد": كان يحيى بن أكثم سليمًا من البدعة، ينتحل مذهب أهل السنة، سمع عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة وغيرهما.

হে রাষ্ট্রের স্তম্ভ! আপনার নিকট এক বিধবা অভিযোগ পেশ করছে ... যার ওপর এমন এক সিংহ চড়াও হয়েছে যার মুকাবিলা করার শক্তি তার নেই।
সে তার জমিজমা ছিনিয়ে নিয়েছে তার শক্তিশালী অবস্থানের পর ... যখন তার পরিবার ও সন্তানরা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
অতঃপর মামুন কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন, তারপর মাথা তুললেন এবং 'বাসীত' ছন্দে বললেন:
তুমি যা বললে তা শুনে আমার ধৈর্য ও সহনশীলতা নিঃশেষ হয়ে গেছে ... এবং এই দুঃখ ও বিষাদ অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে।
এখন জোহরের নামাজের সময়, সুতরাং তুমি ফিরে যাও ... এবং আমি যে দিনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সেদিন বিবাদীকে উপস্থিত করো।
আমাদের বসা সম্ভব হলে আদালত হবে শনিবার ... সেদিন আমি তাকে শাস্তি দিয়ে তোমাকে ইনসাফ দেব, নতুবা রবিবার হবে বিচার দিবস।
অতঃপর মহিলাটি ফিরে গেল এবং রবিবার দিন সবার আগে উপস্থিত হলো। মামুন তাকে জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার প্রতিপক্ষ কে?" সে বলল: "আপনার শিয়রে দণ্ডায়মান আপনার পুত্র আব্বাস ইবনে আমিরুল মুমিনিন।" মামুন তখন তার বিচারক ইয়াহিয়া ইবনে আকসামকে১, অথবা বলা হয় তার উজির আহমদ ইবনে আবি খালিদকে বললেন: "মহিলাটিকে তার পাশে বসাও এবং তাদের উভয়ের মাঝে বিচার করো।" তিনি তাকে বিবাদীর পাশে বসালেন এবং মামুনের উপস্থিতিতেই বিচার কাজ পরিচালনা করলেন। এক পর্যায়ে মহিলার কণ্ঠস্বর উচ্চ হতে থাকলে মামুনের কোনো এক দ্বাররক্ষী তাকে ধমক দিল। তখন মামুন তাকে বললেন: "তাকে ছেড়ে দাও, কারণ সত্য তাকে বাকপটু করেছে আর অসত্য বিবাদীকে নির্বাক করে দিয়েছে।" অতঃপর তিনি মহিলার জমিজমা তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। মামুন নিজেই উপস্থিত থেকে তাদের বিচার প্রক্রিয়া তদারকি করেছেন কিন্তু নিজে সরাসরি বিচার পরিচালনা করেননি, মূলত রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দুটি কারণে:
প্রথমত: তার রায় হয়তো তার সন্তানের সপক্ষে যেত অথবা বিপক্ষে। আর নিজের সন্তানের সপক্ষে রায় দেওয়া বিচারকের জন্য বৈধ নয়, যদিও তার বিপক্ষে রায় দেওয়া বৈধ।
দ্বিতীয়ত: প্রতিপক্ষ একজন নারী, যার সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া মামুনের মর্যাদার অনুকূল নয়; অথচ তার পুত্র এমন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন যে, অন্য কেউ তাকে সত্য মানতে বাধ্য করার ক্ষমতা রাখত না। তাই তিনি বিচার প্রক্রিয়া নিজের সামনেই এমন একজনের ওপর অর্পণ

করলেন যিনি মহিলার সাথে বাদানুবাদ করা, দাবির পূর্ণ বিবরণ নেওয়া এবং দলিলের ব্যাখ্যা চাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলেন। আর মামুন (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) রায় বাস্তবায়ন ও সত্য প্রতিষ্ঠায় নিজে সরাসরি তদারকি করলেন।
দাবির শক্তি বা প্রমাণের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থা হলো এর সাথে এমন কোনো দালিলিক লিখন থাকা যাতে নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের স্বাক্ষর রয়েছে যারা

---

১. তিনি হলেন আবু মুহাম্মদ ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কাতান ইবনে সামআন ইবনে মুশান্নাজ, আত-তামিমি আল-আসাদি আল-মারওয়াজি। তিনি আরবদের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব আকসাম ইবনে সাইফি আত-তামিমির বংশধর। তিনি ফিকহ শাস্ত্রে পণ্ডিত ও বিচারকার্যে দূরদর্শী ছিলেন। দারা কুতনি তাকে ইমাম শাফেয়ি (রা.)-এর অনুসারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।
খতিব বাগদাদি 'তারিখে বাগদাদ'-এ বলেছেন: ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম বিদআত থেকে মুক্ত ছিলেন এবং আহলুস সুন্নাহর পথ অনুসরণ করতেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা এবং আরও অনেকের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(ص: 141)الأحكام السلطانية للماوردي

هُوَ غَائِبٌ، فَالَّذِي يَخْتَصُّ بِنَظَرِ الْمَظَالِمِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الدَّعْوَى أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:
أَحَدُهَا: إِرْهَابُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَرُبَّمَا تُعَجِّلُ مِنْ إِقْرَارِهِ بِقُوَّةِ الْهَيْبَةِ مَا يُغْنِي عَنْ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ.
وَالثَّانِي: التَّقَدُّمُ بِإِحْضَارِ الشُّهُودِ إِذَا عَرَفَ مَكَانَهُمْ وَلَمْ يُدْخِلِ الضَّرَرَ الشَّاقَّ عَلَيْهِمْ.
وَالثَّالِثُ: الْأَمْرُ بِمُلَازَمَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلَاثًا، وَيُجْهِدُ رَأْيَهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الْحَالِ مِنْ قُوَّةِ الْإِمَارَةِ وَدَلَائِلِ الصِّحَّةِ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَنْظُرَ فِي الدَّعْوَى، فَإِنْ كَانَتْ مَالًا فِي الذِّمَّةِ كَلَّفَهُ إِقَامَةَ كَفِيلٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا قَائِمًا كَالْعَقَارِ حَجَرَ عَلَيْهَا فِيهَا حَجْرًا لَا يُرْفَعُ بِهِ حُكْمُ يَدِهِ، وَرَدَّ اسْتِغْلَالَهَا إِلَى أَمِينٍ يَحْفَظُهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ مِنْهُمَا.

فَإِنْ تَطَاوَلَتِ الْمُدَّةُ وَوَقَعَ الْإِيَاسُ مِنْ حُضُورِ الشُّهُودِ، جَازَ لِوَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يَسْأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ دُخُولِ يَدِهِ مَعَ تَجْدِيدِ إِرْهَابِهِ، فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ رضي الله عنه يَرَى فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ سُؤَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ سَبَبِ دُخُولِ يَدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَلِلنَّاظِرِ فِي الْمَظَالِمِ اسْتِعْمَالُ الْجَائِزِ، وَلَا يَلْزَمُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبِ، فَإِنْ أَجَابَ بِمَا يَقْطَعُ التَّنَازُعَ أَمْضَاهُ وَإِلَّا فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ.

وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: فِي قُوَّةِ الدَّعْوَى: أَنْ يَكُونَ فِي الْكِتَابِ الْمُقْتَرِنِ بِهَا شُهُودٌ حُضُورٌ، لَكِنَّهُمْ غَيْرُ مُعَدَّلِينَ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَالَّذِي يَخْتَصُّ بِنَظَرِ الْمَظَالِمِ أَنْ يَتَقَدَّمَ النَّاظِرُ فِيهَا بِإِحْضَارِهِمْ وَسَبْرِ أَحْوَالِهِمْ فَإِنَّهُ يَجِدُهُمْ عَلَى أَحْوَالٍ ثَلَاثَةٍ:

إِمَّا أَنْ يَكُونُوا مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ وَأَهْلِ الصِّيَانَاتِ فَالثِّقَةُ بِشَهَادَاتِهِمْ أَقْوَى، وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا أَرْذَالًا فَلَا يَقْوَى عَلَيْهِمْ، لَكِنْ يُقَوَّى بِهِمْ إِرْهَابُ الْخَصْمِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا أَوْسَاطًا فَيَجُوزُ لَهُ بَعْدَ الْكَشْفِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ أَنْ يَسْتَظْهِرَ بِإِحْلَافِهِمْ إِنْ رَأَى قَبْلَ الشَّهَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا.

ثُمَّ هُوَ فِي سَمَاعِ شَهَادَةِ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:

أَحَدُهَا: إِمَّا أَنْ يَسْمَعَهَا بِنَفْسِهِ فَيَحْكُمُ بِهَا.

وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْقَاضِي سَمَاعَهَا لِيُؤَدِّيَهَا الْقَاضِي إِلَيْهِ، وَيَكُونُ الْحُكْمُ بِهَا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ إِلَّا بِشَهَادَةِ مَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُ.

وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ سَمَاعَهَا إِلَى الشُّهُودِ الْمُعَدَّلِينَ، فَإِنْ رَدَّ إِلَيْهِمْ نَقْلَ شَهَادَتِهِمْ إِلَيْهِ لَمْ يُلْزِمْهُمْ

তিনি অনুপস্থিত, এমতাবস্থায় এ জাতীয় মামলায় অভিযোগ প্রতিকারকারীর (নাযিরুল মাজালিম) বিশেষ এখতিয়ারভুক্ত বিষয় হলো চারটি:

প্রথমটি: বিবাদীকে প্রভাবিত করা বা ভীতি প্রদর্শন করা; কেননা অনেক সময় প্রশাসনিক গাম্ভীর্যের প্রভাবে বিবাদী দ্রুত স্বীকারোক্তি প্রদান করে, যার ফলে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়।

দ্বিতীয়টি: সাক্ষীদের অবস্থানের কথা জানা থাকলে এবং তাদের উপস্থিত করায় কোনো চরম কষ্টের আশঙ্কা না থাকলে তাদের হাজির করার নির্দেশ প্রদান করা।

তৃতীয়টি: বিবাদীকে তিন দিন পর্যন্ত নজরদারিতে বা আটকে রাখার নির্দেশ দেওয়া; এবং মামলার আলামত ও সত্যতার নিরিখে প্রয়োজনবোধে নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে এর চেয়ে বেশি সময়ও নির্ধারণ করা।

চতুর্থটি: দাবিকৃত বিষয়টি পর্যালোচনা করা; যদি তা কোনো দেনা বা দায়বদ্ধ মাল হয়, তবে তাকে জামিনদার উপস্থিত করতে বাধ্য করা। আর যদি তা কোনো স্থাবর সম্পত্তি বা বিদ্যমান বস্তু হয়, তবে তাতে এমনভাবে বিধি-নিষেধ আরোপ করা যা তার দখলকে সম্পূর্ণরূপে খর্ব করবে না, বরং এর আয় ও মুনাফা একজন বিশ্বস্ত আমানতদারের কাছে সমর্পণ করা, যাতে তিনি প্রকৃত হকদারের জন্য তা সংরক্ষণ করেন।

যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় এবং সাক্ষীদের উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়তে হয়, তবে অভিযোগ প্রতিকারকারীর জন্য সমীচীন হলো বিবাদীকে পুনরায় সতর্ক করে তার দখল বা মালিকানার ভিত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। ইমাম মালিক বিন আনাস (রা.) এমন পরিস্থিতিতে বিবাদীকে তার দখলের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বৈধ মনে করেন, যদিও ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আবু হানিফা তা মনে করেন না। অভিযোগ প্রতিকারকারী (নাযির) এক্ষেত্রে যা বৈধ তা প্রয়োগ করতে পারেন এবং কেবল যা ওয়াজিব তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা তার জন্য আবশ্যক নয়। যদি বিবাদী এমন উত্তর দেয় যা বিবাদের নিষ্পত্তি করে দেয়, তবে তিনি তা কার্যকর করবেন; অন্যথায় শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন।

দাবির প্রমাণের তৃতীয় অবস্থা: মামলার দলিলে এমন কিছু সাক্ষী উপস্থিত থাকা যারা বিচারকের নিকট এখনো নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত নন। এমতাবস্থায় অভিযোগ প্রতিকারকারীর বিশেষ কাজ হলো তাদের হাজির করা এবং তাদের অবস্থা যাচাই করা। তিনি তাদের তিন স্তরে দেখতে পাবেন:

প্রথমত: তারা যদি মর্যাদাশীল ও সৎ চরিত্রের অধিকারী হন, তবে তাদের সাক্ষ্যের ওপর আস্থা রাখা অধিক যুক্তিসঙ্গত। দ্বিতীয়ত: তারা যদি নিম্নস্তরের বা অসাধু হন, তবে তাদের সাক্ষ্যের

ওপর ভিত্তি করা যাবে না, তবে তাদের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে চাপের মুখে ফেলা যেতে পারে।
তৃতীয়ত: তারা যদি মধ্যম মানের হন, তবে তাদের অবস্থা অনুসন্ধানের পর বিচারক সমীচীন মনে করলে সাক্ষ্য প্রদানের আগে বা পরে তাদের শপথ পাঠ করাতে পারেন।
অতঃপর এই দুই শ্রেণির সাক্ষ্য গ্রহণের বিষয়ে তার সামনে তিনটি পথ খোলা থাকে:
এক: তিনি স্বয়ং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন এবং সে অনুযায়ী রায় প্রদান করবেন।
দুই: অথবা তিনি সাক্ষ্য গ্রহণের বিষয়টি কাজীর কাছে পাঠাবেন, যাতে কাজী তা শুনে তাকে অবহিত করেন এবং এর ভিত্তিতে রায় প্রদানের বিষয়টি নাযিরের ওপর ন্যস্ত থাকে। কারণ, কাজীর পক্ষে এমন কারও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেওয়া বৈধ নয় যার ন্যায়পরায়ণতা তার নিকট প্রমাণিত হয়নি।
তিন: অথবা তিনি তাদের সাক্ষ্য শ্রবণ নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের কাছে সোপর্দ করবেন। এমতাবস্থায় যদি তিনি সেই সাক্ষীদের সাক্ষ্য তার কাছে পেশ করতে বলেন, তবে এটি তাদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে না।

(ص: 142)الأحكام السلطانية للماوردي

اسْتِكْشَافَ أَحْوَالِهِمْ، وَإِنْ رَدَّ الشَّهَادَةَ عِنْدَهُ بِمَا يَصِحُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ لَزِمَهُمُ الْكَشْفُ عَمَّا يَقْتَضِي قَبُولَ شَهَادَتِهِمْ؛ لِيَشْهَدُوا بِهَا بَعْدَ الْعِلْمِ لِصِحَّتِهَا؛ لِيَكُونَ تَنْفِيذُ الْحُكْمِ بِحَسَبِهَا.

وَالْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: فِي قُوَّةِ الدَّعْوَى: أَنْ يَكُونَ فِي الْكِتَابِ الْمُقْتَرِنِ بِهَا شَهَادَةُ شُهُودٍ مَوْتَى مُعَدَّلِينَ، وَالْكِتَابُ مَوْثُوقٌ بِصِحَّتِهِ، فَالَّذِي يَخْتَصُّ بِنَظَرِ الْمَظَالِمِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: إِرْهَابُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا يَضْطَرُّهُ إِلَى الصِّدْقِ وَالِاعْتِرَافِ بِالْحَقِّ.

وَالثَّانِي: سُؤَالُهُ عَنْ دُخُولِ يَدِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مِنْ جَوَابِهِ مَا يَتَّضِحُ بِهِ الْحَقُّ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكْشِفَ عَنِ الْحَالِ مِنْ جِيرَانِ الْمِلْكِ وَمِنْ جِيرَانِ الْمُتَنَازِعِينَ فِيهِ؛ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى وُضُوحِ الْحَقِّ وَمَعْرِفَةِ الْمُحِقِّ، فَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ

الثَّلَاثَةِ رَدَّهَا إِلَى وَسَاطَةِ مُحْتَشَمٍ مُطَاعٍ، لَهُ بِهِمَا مَعْرِفَةٌ وَبِمَا تَنَازَعَاهُ خِبْرَةٌ؛ لِيَضْطَرَّهُمَا بِكَثْرَةِ التَّرْدَادِ وَطُولِ الْمَدَى إِلَى التَّصَادُقِ وَالتَّصَالُحِ، فَإِنْ أَفْضَى الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا إِلَى أَحَدِهِمَا، وَإِلَّا بَتَّ الْحُكْمَ عَلَى مَا يُوجِبُهُ حُكْمُ الْقَضَاءِ.

وَالْحَالَةُ الْخَامِسَةُ: فِي قُوَّةِ الدَّعْوَى: أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُدَّعِي خَطُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا تَضَمَّنَتْهُ الدَّعْوَى، فَنَظَرُ الْمَظَالِمِ فِيهِ يَقْتَضِي سُؤَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْخَطِّ؛ وَأَنْ يُقَالَ لَهُ أَهَذَا خَطُّكَ، فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ يُسْأَلُ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ عَنْ صِحَّةِ مَا تَضَمَّنَهُ، فَإِنِ اعْتَرَفَ بِصِحَّتِهِ صَارَ مُقِرًّا وَأُلْزِمَ حُكْمَ إِقْرَارِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِصِحَّتِهِ، فَمِنْ وُلَاةِ الْمَظَالِمِ مَنْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِخَطِّهِ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِصِحَّتِهِ، وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شَوَاهِدِ الْحُقُوقِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ مُحَقِّقُوهُمْ، وَمَا يَرَاهُ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ مِنْهُمْ أَنْ يَحْكُمَ بِمُجَرَّدِ الْخَطِّ حَتَّى يَعْتَرِفَ بِصِحَّةِ مَا فِيهِ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْمَظَالِمِ لَا يُبِيحُ مِنَ الْأَحْكَامِ مَا حَظَرَهُ الشَّرْعُ، وَنَظَرُ الْمَظَالِمِ فِيهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَا يَذْكُرُهُ مِنْ خَطِّهِ، فَإِنْ قَالَ: كَتَبْتُهُ لِيُقْرِضَنِي وَمَا أَقْرَضَنِي، أَوْ لِيَدْفَعَ إِلَيَّ ثَمَنَ مَا بِعْتُهُ وَمَا دَفَعَ، فَهَذَا مِمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ أَحْيَانًا، وَنَظَرُ الْمَظَالِمِ فِي مِثْلِهِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ مِنَ الْإِرْهَابِ بِحَسَبِ مَا يَشْهَدُ بِهِ الْحَالُ وَتَقْوَى بِهِ الْأَمَارَةُ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى الْوَسَاطَةِ، فَإِنْ أَفْضَتْ إِلَى الصُّلْحِ وَإِلَّا بَتَّ الْقَاضِي الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا بِالتَّحَالُفِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْخَطَّ، فَمِنْ وُلَاةِ الْمَظَالِمِ مَنْ يَخْتَبِرُ الْخَطَّ بِخُطُوطِهِ الَّتِي كَتَبَهَا، وَيُكَلِّفُهُ مِنْ كَثْرَةِ الْكِتَابَةِ مَا يَمْنَعُ مِنَ التَّصَنُّعِ فِيهَا، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَ الْخَطَّيْنِ، فَإِذَا تَشَابَهَا حَكَمَ بِهِ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ مَنْ جَعَلَ اعْتِرَافَهُ الْخَطَّ مُوجِبًا لِلْحُكْمِ بِهِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ لِإِرْهَابِهِ،

তাদের অবস্থা অনুসন্ধান করা; আর যদি বিচারক তাদের এমন সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন যা তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী সঠিক ছিল, তবে তাদের জন্য এমন বিষয় প্রকাশ করা আবশ্যক যা তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের দাবি রাখে, যাতে তারা এর সঠিকতা জানার পর সাক্ষ্য দিতে পারে এবং সেই অনুযায়ী রায় কার্যকর হয়।

চতুর্থ অবস্থা: দাবির শক্তি বা গুরুত্বের ক্ষেত্রে: দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট দলিলে এমন মৃত সাক্ষীদের সাক্ষ্য থাকা যাদের ন্যায়পরায়ণতা (তাদিল) প্রমাণিত ছিল এবং দলিলটির বিশুদ্ধতাও নির্ভরযোগ্য। এমতাবস্থায় 'মাজালিম' (প্রশাসনিক বিচার বিভাগ) পরিদর্শকের জন্য তিনটি বিশেষ করণীয় রয়েছে:

প্রথমটি: বিবাদীকে এমনভাবে প্রভাবিত করা বা ভীতি প্রদর্শন করা যা তাকে সত্য বলতে এবং হকের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করে।

দ্বিতীয়টি: বিতর্কিত বিষয়টি তার অধিকারে কীভাবে এল সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা; কারণ তার উত্তরের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়টি: বিতর্কিত সম্পত্তির প্রতিবেশী এবং বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের প্রতিবেশীদের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করা; যাতে সত্য স্পষ্ট হয় এবং হকদারকে চেনা যায়। যদি এই তিনটির কোনোটির মাধ্যমেই সত্য উদঘাটিত না হয়, তবে তিনি বিষয়টি এমন এক প্রভাবশালী ও মান্যবর মধ্যস্থতাকারীর কাছে ন্যস্ত করবেন যার উভয় পক্ষ সম্পর্কে জানাশোনা আছে এবং বিবাদমান বিষয়টি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে; যাতে তিনি বারংবার আলোচনার মাধ্যমে এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে তাদের সত্য স্বীকার করতে অথবা আপস করতে বাধ্য করেন। যদি এতে বিষয়টি কোনো এক পক্ষের অনুকূলে মীমাংসিত হয় তবে ভালো, অন্যথায় তিনি বিচার বিভাগীয় মূল বিধান অনুযায়ী চূড়ান্ত ফয়সালা দেবেন।

পঞ্চম অবস্থা: দাবির গুরুত্বের ক্ষেত্রে: দাবির বিষয়বস্তু সংবলিত বিবাদীর নিজ হাতের লেখা বাদীর নিকট থাকা। এমতাবস্থায় 'মাজালিম' বিচারকের দায়িত্ব হলো বিবাদীকে সেই হাতের লেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং তাকে বলা যে, "এটি কি আপনার হাতের লেখা?" যদি সে তা স্বীকার করে, তবে স্বীকৃতির পর তাতে যা লিখিত আছে তার সত্যতা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি সে তার সত্যতা স্বীকার করে তবে সে স্বীকৃতিদানকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং তার স্বীকৃতির বিধান তার ওপর আবশ্যক হবে। আর যদি সে এর বিষয়বস্তুর সত্যতা স্বীকার না করে, তবে 'মাজালিম' কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ কেবল হাতের লেখার ভিত্তিতেই তার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেন যদি সে সেটি তার নিজের লেখা বলে স্বীকার করে—যদিও সে তার বিষয়বস্তুর সত্যতা স্বীকার না করে; তারা একে প্রচলিত প্রথার নিরিখে হকের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেন। তবে তাদের মধ্য হতে যারা সত্যনিষ্ঠ গবেষক এবং সকল ফকিহদের অভিমত হলো, বিচারকের জন্য কেবল হাতের লেখার ভিত্তিতে রায় দেওয়া জায়েজ নয় যতক্ষণ না বিবাদী এর বিষয়বস্তুর সত্যতা স্বীকার করে। কারণ 'মাজালিম' বিচার পদ্ধতি

শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কোনো বিষয়কে বৈধ করে না। এক্ষেত্রে 'মাজালিম' বিচারকের করণীয় হলো তার হাতের লেখার কারণের দিকে দৃষ্টিপাত করা। যদি সে বলে: "আমি এটি লিখেছিলাম যাতে সে আমাকে ঋণ দেয়, কিন্তু সে আমাকে ঋণ দেয়নি" অথবা "আমি যা বিক্রি করেছি তার মূল্য পরিশোধের জন্য এটি লিখেছিলাম কিন্তু সে তা দেয়নি"—তবে এটি এমন কাজ যা মানুষ মাঝেমধ্যে করে থাকে। এক্ষেত্রে 'মাজালিম' বিচারকের কাজ হলো পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জোরালো আলামত অনুযায়ী তাকে প্রভাবিত করা, অতঃপর বিষয়টি মধ্যস্থতার জন্য পাঠানো। যদি তা আপসের দিকে নিয়ে যায় তবে ভালো, অন্যথায় বিচারক শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা দেবেন। আর যদি সে হাতের লেখাই অস্বীকার করে, তবে কোনো কোনো 'মাজালিম' কর্মকর্তা তার লিখিত অন্য হাতের লেখার সাথে এটি পরীক্ষা করে দেখেন এবং তাকে দিয়ে অধিক পরিমাণে লেখান যা তাকে কৃত্রিমতা থেকে বিরত রাখে। অতঃপর দুই লেখার মধ্যে তুলনা করেন; যদি তা মিলে যায় তবে তার বিরুদ্ধে রায় দেন। এটি তাদের মত যারা হাতের লেখার স্বীকৃতিকে রায় প্রদানের কারণ হিসেবে গণ্য করেন। তবে দক্ষ গবেষকদের অভিমত হলো, তারা এটি তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার জন্য করেন না, বরং তাকে প্রভাবিত করার জন্য করেন।

(ص: 143)الأحكام السلطانية للماوردي

وَتَكُونُ الشُّبْهَةُ مَعَ إِنْكَارِهِ لِلْخَطِّ أَضْعَفَ مِنْهَا مَعَ اعْتِرَافِهِ بِهِ، وَتُرْفَعُ الشُّبْهَةُ إِنْ كَانَ الْخَطُّ مُنَافِيًا لِخَطِّهِ، وَيَعُودُ الْإِرْهَابُ عَلَى الْمُدَّعِي، ثُمَّ يُرَدَّانِ إِلَى الْوَسَاطَةِ، فَإِنْ أَفْضَتِ الْحَالُ إِلَى الصُّلْحِ وَإِلَّا بَتَّ الْقَاضِي الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا بِالْأَيْمَانِ.

وَالْحَالَةُ السَّادِسَةُ: فِي قُوَّةِ الدَّعْوَى: إِظْهَارُ الْحِسَابِ بِمَا تَضَمَّنَتِ الدَّعْوَى، وَهَذَا يَكُونُ فِي الْمُعَامَلَاتِ، وَلَا يَخْلُو حَالُ الْحِسَابِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ:

إِمَّا أَنْ يَكُونَ حِسَابَ الْمُدَّعِي أَوْ حِسَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ حِسَابَ الْمُدَّعِي فَالشُّبْهَةُ فِيهِ أَضْعَفُ، وَنَظَرُ الْمَظَالِمِ يَرْجِعُ فِي مِثْلِهِ إِلَى مُرَاعَاةِ نَظْمِ الْحِسَابِ، فَإِنْ كَانَ

مُخْتَلًّا يُحْتَمَلُ فِيهِ الْإِدْغَالُ كَانَ مُطْرَحًا، وَهُوَ بِضَعْفِ الدَّعْوَى أَشْبَهُ مِنْهُ بِقُوَّتِهَا، وَإِنْ كَانَ نَظْمُهُ مُتَّسِقًا وَنَقْلُهُ صَحِيحًا فَالثِّقَةُ بِهِ أَقْوَى، فَيَقْتَضِي مِنَ الْإِرْهَابِ بِحَسَبِ شَوَاهِدِهِ، ثُمَّ يُرَدَّانِ إِلَى الْوَسَاطَةِ، ثُمَّ إِلَى الْحُكْمِ الْبَاتِّ.

وَإِنْ كَانَ الْحِسَابُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَتْ الدَّعْوَى بِهِ أَقْوَى، وَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى خَطِّهِ أَوْ خَطِّ كَاتِبِهِ، فَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى خَطِّهِ فَلِنَاظِرِ الْمَظَالِمِ فِيهِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَهَذَا خَطُّكَ، فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ قِيلَ: أَتَعْلَمُ مَا هُوَ، فَإِنْ أَقَرَّ بِمَعْرِفَتِهِ قِيلَ: أَتَعْلَمُ صِحَّتَهُ؟ فَإِنْ أَقَرَّ بِصِحَّتِهِ صَارَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ مُقِرًّا بِمَضْمُونِ الْحِسَابِ، فَيُؤْخَذُ بِمَا فِيهِ، فَإِنِ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ خَطُّهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ مَا فِيهِ، وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِصِحَّتِهِ، فَمَنْ حَكَمَ بِالْخَطِّ مِنْ وُلَاةِ الْمَظَالِمِ حَكَمَ عَلَيْهِ بِمُوجَبِ حِسَابِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِصِحَّتِهِ، وَجَعَلَ الثِّقَةَ بِهَذَا أَقْوَى مِنَ الثِّقَةِ بِالْخَطِّ الْمُرْسَلِ؛ لِأَنَّ الْحِسَابَ لَا يَثْبُتُ فِيهِ قَبْضُ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْحِسَابِ الَّذِي لَمْ يَعْتَرِفْ بِصِحَّةِ مَا فِيهِ، وَلَكِنْ يَقْتَضِي مِنْ فَضْلِ الْإِرْهَابِ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَاهُ الْخَطُّ الْمُرْسَلُ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي الْعُرْفِ، ثُمَّ يُرَدَّانِ بَعْدَهُ إِلَى الْوَسَاطَةِ، ثُمَّ إِلَى بَتِّ الْقَضَاءِ.

وَإِنْ كَانَ الْخَطُّ مَنْسُوبًا إِلَى كَاتِبِهِ سُئِلَ عَنْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ سُؤَالِ كَاتِبِهِ، فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمَا فِيهِ أُخِذَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ يُسْأَلْ عَنْهُ كَاتِبُهُ، فَإِنْ أَنْكَرَهُ ضَعُفَتْ الشُّبْهَةُ بِإِنْكَارِهِ وَأُرْهِبَ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا، وَلَمْ يُرْهَبْ إِنْ كَانَ مَأْمُونًا، فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ وَبِصِحَّتِهِ صَارَ شَاهِدًا بِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِ إِنْ كَانَ عَدْلًا، وَيَقْضِي بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ إِمَّا مَذْهَبًا وَإِمَّا سِيَاسَةً تَقْتَضِيهَا شَوَاهِدُ الْحَالِ، فَإِنَّ لِشَوَاهِدِ الْحَالِ فِي الْمَظَالِمِ تَأْثِيرًا فِي اخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ، وَلِكُلِّ حَالٍ مِنْهَا فِي الْإِرْهَابِ حَدٌّ لَا يَتَجَاوَزُهُ تَمْيِيزًا بَيْنَ الْأَحْوَالِ بِمُقْتَضَى شَوَاهِدِهَا1.

---

1 قال ابن قدامة من الحنابلة: وإن كان للمدعي شاهد واحد عدل في المال أو ما يقصد به المال حلف =

হস্তাক্ষর অস্বীকার করলে সন্দেহ হস্তাক্ষর স্বীকার করার চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। যদি হস্তাক্ষরটি তার নিজের হস্তাক্ষরের বিপরীত হয় তবে সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং আইনি কঠোরতা বা ভীতিরূপ ব্যবস্থা (ইরহাব) দাবিদারের ওপর আপতিত হয়। অতঃপর উভয় পক্ষকে মধ্যস্থতার কাছে পাঠানো হয়। যদি পরিস্থিতি আপস-নিষ্পত্তির দিকে যায় তবে তো ভালো, অন্যথায় বিচারক শপথের মাধ্যমে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন।
ষষ্ঠ অবস্থা: দাবির সবলতার ক্ষেত্রে—দাবিকৃত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হিসাব প্রকাশ করা। এটি লেনদেনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। হিসাবের বিষয়টি দুটি অবস্থার বাইরে নয়:
হয় তা দাবিদারের হিসাব হবে অথবা বিবাদীর। যদি তা দাবিদারের হিসাব হয় তবে এতে সন্দেহের মাত্রা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এক্ষেত্রে মাজালিম (অন্যায়ের প্রতিকার বিষয়ক) কর্তৃপক্ষ হিসাবের বিন্যাস পর্যবেক্ষণের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। যদি তা বিশৃঙ্খল হয় এবং এতে জালিয়াতির সম্ভাবনা থাকে, তবে তা বর্জনীয় হবে; এটি দাবির সবলতার চেয়ে দুর্বলতারই বেশি সদৃশ। আর যদি তার বিন্যাস সুসংগত হয় এবং তার পাঠ সঠিক হয়, তবে তার প্রতি আস্থা অধিক হবে। এমতাবস্থায় প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কঠোরতা অবলম্বন করা হবে। এরপর উভয়কে মধ্যস্থতার দিকে এবং পরিশেষে চূড়ান্ত রায়ের দিকে পাঠানো হবে।
আর যদি হিসাবটি বিবাদীর হয়, তবে এর মাধ্যমে দাবিটি অধিক শক্তিশালী হবে। এক্ষেত্রে হস্তাক্ষরটি হয় তার নিজের অথবা তার লিপিকারের হবে। যদি তা তার নিজের হস্তাক্ষর হিসেবে স্বীকৃত হয়, তবে মাজালিম বিচারক বিবাদীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন—এটি কি আপনার হাতের লেখা? যদি সে স্বীকার করে, তবে বলা হবে: আপনি কি জানেন এতে কী আছে? যদি সে জানার কথা স্বীকার করে, তবে তাকে বলা হবে: আপনি কি এর সঠিকতা স্বীকার করেন? সে যদি এর সঠিকতাও স্বীকার করে নেয়, তবে এই তিনটি বিষয়ের স্বীকৃতির মাধ্যমে সে হিসাবের বিষয়বস্তুর ওপর স্বীকারোক্তি প্রদানকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং তাতে যা আছে সে অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর সে যদি স্বীকার করে যে এটি তার হাতের লেখা কিন্তু সে জানে না এতে কী আছে এবং এর সঠিকতাও স্বীকার না করে, তবে মাজালিম কর্তৃপক্ষের মধ্যে যারা কেবল হস্তাক্ষরের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন, তারা তার হিসাবের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে রায় দেবেন; যদিও সে এর সঠিকতা স্বীকার করেনি। তারা একে সাধারণ

চিঠিপত্রের হস্তাক্ষরের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য মনে করেন; কারণ হিসাবে সাধারণত এমন কিছু প্রদানের কথা লেখা হয় না যা প্রদান করা হয়নি। তবে বিশেষজ্ঞ গবেষক ও ফকিহগণের অভিমত হলো, বিবাদী যে হিসাবের বিষয়বস্তুর সঠিকতা স্বীকার করেনি, তার ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ফয়সালা দেওয়া যাবে না। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথাগত পার্থক্যের কারণে সাধারণ চিঠিপত্রের তুলনায় অধিক কঠোরতা (ইরহাব) অবলম্বন করা প্রয়োজন হবে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর উভয়কে মধ্যস্থতার দিকে এবং পরিশেষে চূড়ান্ত বিচারিক ফয়সালার দিকে পাঠানো হবে।

যদি হস্তাক্ষরটি তার লিপিকারের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হয়, তবে লিপিকারকে জিজ্ঞাসাবাদের আগে বিবাদীকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সে যদি এর বিষয়বস্তু স্বীকার করে নেয় তবে তা গ্রহণ করা হবে। আর সে যদি স্বীকার না করে তবে তার লিপিকারকে জিজ্ঞাসা করা হবে। লিপিকার যদি তা অস্বীকার করে তবে তার অস্বীকারের কারণে সন্দেহ দুর্বল হয়ে পড়বে; লিপিকার অভিযুক্ত ব্যক্তি হলে তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হবে, আর বিশ্বস্ত হলে করা হবে না। কিন্তু লিপিকার যদি হস্তাক্ষর এবং তার সঠিকতা স্বীকার করে নেয়, তবে সে বিবাদীর বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় সে ন্যায়পরায়ণ হলে তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে বিচারক একজন সাক্ষী ও শপথের ভিত্তিতে ফয়সালা দেবেন—চাই তা কোনো মাযহাবের অনুসরণে হোক কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচারিক প্রজ্ঞার (সিয়াসা) তাগিদে হোক। কেননা মাজালিম বিচারে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাক্ষ্যের একটি প্রভাব রয়েছে যা রায়ের ভিন্নতা ঘটায়। পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী পার্থক্য নিরূপণের স্বার্থে কঠোরতা (ইরহাব) প্রদর্শনের প্রতিটি অবস্থার একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে যা অতিক্রম করা হবে না।১

---

১ হাম্বলি মাযহাবের ইবনে কুদামা বলেন: যদি দাবিদারের পক্ষে সম্পদ বা সম্পদের উদ্দেশ্যে কৃত বিষয়ের ওপর একজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী থাকে, তবে সে শপথ করবে...

فَصْلٌ:

وَأَمَّا إِنِ اقْتَرَنَ بِالدَّعْوَى مَا يُضْعِفُهَا، فَلِمَا اقْتَرَنَ بِهَا مِنَ الضَّعْفِ سِتَّةُ أَحْوَالٍ تُنَافِي أَحْوَالَ الْقُوَّةِ، فَيَنْتَقِلُ الْإِرْهَابُ بِهَا مِنْ جَنْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَى جَنْبَةِ الْمُدَّعِي.

فَالْحَالَةُ الْأُولَى: أَنْ يُقَابِلَ الدَّعْوَى بِكِتَابٍ شُهُودُهُ حُضُورٌ مُعَدَّلُونَ يَشْهَدُونَ بِمَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الدَّعْوَى، وَذَلِكَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِبَيْعِ مَا ادَّعَاهُ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى إِقْرَارِهِ بِأَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا ادَّعَاهُ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى إِقْرَارِ أَبِيهِ الَّذِي ذَكَرَ انْتِقَالَ الْمِلْكِ عَنْهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا ادَّعَاهُ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَشْهَدُوا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ، فَبَطَلَ دَعْوَاهُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَيَقْتَضِي نَظَرُ تَأْدِيبِهِ بِحَسَبِ حَالِهِ.

فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالِابْتِيَاعِ كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ رَهَبٍ وَإِلْجَاءٍ، وَهَذَا قَدْ يَفْعَلُهُ النَّاسُ أَحْيَانًا، فَيُنْظَرُ فِي كِتَابِ الِابْتِيَاعِ، فَإِنْ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ رَهَبٍ وَلَا إِلْجَاءٍ ضَعُفَتْ شُبْهَةُ هَذِهِ الدَّعْوَى، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِيهِ قَوِيَتْ شُبْهَةُ الدَّعْوَى، وَكَانَ الْإِرْهَابُ فِي الْجِهَتَيْنِ بِمُقْتَضَى شَوَاهِدِ الْحَالَيْنِ، وَرَجَعَ إِلَى الْكَشْفِ بِالْمُجَاوِرِينَ وَالْخُلَطَاءِ، فَإِنْ بَانَ مَا يُوجِبُ الْعُدُولَ عَنْ

= المدعي مع شهادته وحكم له به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. رواه مسلم. فإن أبي أن يحلف وقال: أريد يمين المدَّعَى عليه حلَّفنَاه، فإن نكل المدَّعَى عليه قضي عليه، ومن قال: ترد اليمين، فهل ترد ههنا، يحتمل وجهين: أحدهما: لا ترد؛ لأنها كانت في جنبته وقد أسقطها بنكوله عنها، وكانت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدَّعَى عليه إذا نكل عن اليمين فردت على المدَّعِي فنكل عنها.

والثاني: ترد عليه؛ لأن اليمين الأولى؛ ولأنَّ سبب الأولى قوة جنبة المدعي بالشاهد، وسبب الثانية نكول المدَّعَى عليه، فبسقوط إحداهما لا يوجب سقوط الأخرى، فإن سكت المدَّعَى عليه فلم ينكر ولم يقر حبسه الحاكم حتى يجيب، ولم يجعله بذلك ناكلًا. ذكره القاضي في المجرّد، وذكر أبو الخطاب أنَّ الحاكم يقول له: إن أجبت وإلّا جعلتك ناكلًا وحكمت عليك، ويكرّر ذلك ثلاثًا، فإن أجاب وإلّا حكم عليه؛ لأنه ناكل عمَّا يلزمه جوابه، فأشبه الناكل عن اليمين. [الكافي في فقه أحمد بن حنبل: 4/ 465] .

পরিচ্ছেদ:

আর যদি দাবির সাথে এমন কিছু যুক্ত হয় যা সেটিকে দুর্বল করে দেয়, তবে উক্ত দুর্বলতার ছয়টি অবস্থা রয়েছে যা সবলতার অবস্থাগুলোর বিপরীত; এর ফলে চাপের বিষয়টি বিবাদী থেকে বাদীর দিকে স্থানান্তরিত হয়।

প্রথম অবস্থা: দাবির বিপরীতে এমন কোনো দলিল পেশ করা যার সাক্ষীরা উপস্থিত ও নির্ভরযোগ্য, যারা এমন সাক্ষ্য প্রদান করেন যা দাবির অসারতা প্রমাণ করে; আর এটি চারটি দিক থেকে হতে পারে:

এক: তারা বাদীর বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি তার দাবিকৃত বস্তুটি বিক্রি করে দিয়েছেন।

দুই: তারা বাদীর এই স্বীকারোক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন যে, তার দাবিকৃত বস্তুতে তার কোনো অধিকার নেই।

তিন: তারা বাদীর পিতার এমন স্বীকারোক্তির সাক্ষ্য দেবেন—যাঁর থেকে মালিকানা হস্তান্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—যে, দাবিকৃত বিষয়ে তার (পিতার) কোনো অধিকার ছিল না।

চার: তারা বিবাদীর পক্ষে এই সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি (বিবাদী) দাবিকৃত বস্তুর মালিক। ফলে এই সাক্ষ্যের দ্বারা বাদীর দাবি বাতিল হয়ে যাবে এবং বাদীর অবস্থা অনুযায়ী তাকে শাসনমূলক শাস্তি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

যদি বাদী উল্লেখ করেন যে, বিক্রয় সংক্রান্ত সাক্ষ্যটি ভীতি প্রদর্শন ও বাধ্যবাধকতার মুখে ছিল—যা মানুষ কখনো কখনো করে থাকে—তবে ক্রয়-বিক্রয় দলিলটি দেখা হবে; যদি তাতে উল্লেখ থাকে যে এটি ভীতি প্রদর্শন বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই হয়েছে, তবে এই দাবির সংশয়টি

দুর্বল হয়ে পড়বে। আর যদি তাতে এমনটি উল্লেখ না থাকে, তবে দাবির সংশয়টি শক্তিশালী হবে এবং উভয় ক্ষেত্রে পরিস্থিতির সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অতঃপর প্রতিবেশী ও সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে বিষয়টি অনুসন্ধান করা হবে। যদি এমন কিছু প্রকাশ পায় যা পরিবর্তনের কারণ হয়...

= বাদীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার অনুকূলে ফয়সালা করা হবে; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন সাক্ষী ও শপথের ভিত্তিতে বিচার করেছেন। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। যদি বাদী শপথ করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন: আমি বিবাদীর শপথ চাই, তবে আমরা বিবাদীকে শপথ করাব। যদি বিবাদী শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হবে। আর যারা বলেন যে শপথ ফিরিয়ে দেওয়া হবে, সে ক্ষেত্রে কি এখানে তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে? এর দুটি সম্ভাবনা রয়েছে:
প্রথমত: ফিরিয়ে দেওয়া হবে না; কারণ এটি তার পক্ষেই ছিল এবং সে শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতির মাধ্যমে তা বাতিল করেছে। এটি অন্যের পক্ষে ছিল বিধায় তার কাছে আর ফিরে আসবে না, যেমন বিবাদী যদি শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং শপথটি বাদীর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, অতঃপর বাদীও যদি তা করতে অস্বীকৃতি জানায়।
দ্বিতীয়ত: তার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে; কারণ প্রথম শপথ এবং প্রথমটির কারণ ছিল সাক্ষীর উপস্থিতিতে বাদীর পক্ষের সবলতা, আর দ্বিতীয়টির কারণ হলো বিবাদীর শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি। সুতরাং একটির পতন অন্যটির পতনকে অনিবার্য করে না। যদি বিবাদী চুপ থাকে এবং অস্বীকার বা স্বীকার কোনোটিই না করে, তবে বিচারক তাকে জবাব না দেওয়া পর্যন্ত কারারুদ্ধ রাখবেন, তবে এর মাধ্যমেই তাকে সরাসরি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী গণ্য করবেন না। আল-কাদি এটি 'আল-মুজাররাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবু আল-খাত্তাব উল্লেখ করেছেন যে, বিচারক তাকে বলবেন: হয় তুমি জবাব দাও, অন্যথায় আমি তোমাকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী গণ্য করে তোমার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করব। তিনি এর তিনবার পুনরাবৃত্তি করবেন। যদি সে জবাব দেয় তবে ভালো, অন্যথায় তার বিরুদ্ধে রায় দেবেন; কারণ সে এমন বিষয়ে বিমুখতা দেখাচ্ছে যার উত্তর দেওয়া তার জন্য আবশ্যক, ফলে সে শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীর সদৃশ। [আল-কাফি ফি ফিকহি আহমাদ বিন হানবাল: ৪/৪৬৫]

ظَاهِرِ الْكِتَابِ عَمِلَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْنِ كَانَ إِمْضَاءُ الْحُكْمِ بِمَا شَهِدَ بِهِ شُهُودُ الِابْتِيَاعِ أَحَقَّ، فَإِنْ سَأَلَ إِحْلَافَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ ابْتِيَاعَهُ كَانَ حَقًّا، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ الرَّهَبِ وَالْإِلْجَاءِ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ إِحْلَافِهِ لِاخْتِلَافِ مَا ادَّعَاهُ؛ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى جَوَازِ إِحْلَافِهِ؛ لِاحْتِمَالِ مَا ادَّعَاهُ وَإِمْكَانِهِ، وَامْتَنَعَ آخَرُونَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مِنْ إِحْلَافِهِ؛ لِأَنَّ مُتَقَدِّمَ إِقْرَارِهِ مُكَذِّبٌ لِمُتَأَخِّرِ دَعْوَاهُ.

وَلِوَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يَعْمَلَ مِنَ الْقَوَانِينِ بِمَا تَقْتَضِيهِ شَوَاهِدُ الْحَالَيْنِ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ، فَأَظْهَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كِتَابَ بَرَاءَةٍ مِنْهُ، فَذَكَرَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ، وَلَمْ يَقْبِضْ كَانَ إِحْلَافُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ شُهُودُ الْكِتَابِ الْمُقَابِلِ لِلدَّعْوَى عُدُولًا غَائِبِينَ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَضَمَّنَ إِنْكَارُهُ اعْتِرَافًا بِالسَّبَبِ كَقَوْلِهِ: لَا حَقَّ لَهُ فِي هَذِهِ الضَّيْعَةِ؛ لِأَنِّي ابْتَعْتُهَا مِنْهُ وَدَفَعْتُ ثَمَنَهَا إِلَيْهِ، وَهَذَا كِتَابُ عَهْدِي بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ، فَيَصِيرُ الْمُدَّعِي مُدَّعِيًا بِكِتَابٍ قَدْ غَابَ

شُهُودُهُ، فَيَكُونُ عَلَى مَا مَضَى، وَلَهُ زِيَادَةُ يَدٍ وَتَصَرُّفٍ، فَتَكُونُ الْأَمَارَةُ أَقْوَى، وَشَاهِدُ الْحَالِ أَظْهَرَ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهَا الْمِلْكُ فَيُرْهِبُهُمَا بِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ شَوَاهِدُ أَحْوَالِهِمَا، وَيَأْمُرُ بِإِحْضَارِ الشُّهُودِ إِنْ أَمْكَنَ، وَيَضْرِبُ لِحُضُورِهِمْ أَجَلًا يَرُدُّهُمَا فِيهِ إِلَى الْوَسَاطَةِ، فَإِنْ أَفْضَتْ إِلَى صُلْحٍ عَنْ تَرَاضٍ اسْتَقَرَّ بِهِ الْحُكْمُ، وَعَدَلَ عَنِ اسْتِمَاعِ الشَّهَادَةِ إِذَا حَضَرَتْ، وَإِنْ لَمْ يَنْبَرِمْ مَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا أَمْعَنَ فِي الْكَشْفِ عَنْ جِيرَانِهِمَا وَجِيرَانِ الْمِلْكِ، وَكَانَ لِوَالِي الْمَظَالِمِ رَأْيُهُ فِي زَمَانِ الْكَشْفِ فِي خَصْلَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ: مِنْهَا مَا يُؤَدِّيهِ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ بِحَسَبِ الْأَمَارَاتِ وَشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ.

إِمَّا أَنْ يَرَى انْتِزَاعَ الضَّيْعَةِ مِنْ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَسْلِيمَهَا إِلَى الْمُدَّعِي، إِلَى أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْبَيْعِ، وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَهَا إِلَى أَمِينٍ تَكُونُ فِي يَدِهِ، وَيَحْفَظُ اسْتِغْلَالَهَا عَلَى مُسْتَحَقِّهِ، وَإِمَّا أَنْ يُقِرَّهَا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَحْجُرَ عَلَيْهِ فِيهَا، وَيُنَصِّبَ أَمِينًا يَحْفَظُ اسْتِغْلَالَهَا، وَيَكُونُ حَالُهُمَا عَلَى مَا يَرَاهُ وَالِي الْمَظَالِمِ فِي خَصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ مَا كَانَ رَاجِيًا أَحَدَ أَمْرَيْنِ:

مِنْ ظُهُورِ الْحَقِّ بِالْكَشْفِ، أَوْ حُضُورِ الشُّهُودِ لِلْأَدَاءِ، فَإِنْ وَقَعَ الْإِيَاسُ مِنْهُمْ بَتَّ الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا، فَلَوْ سَأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِحْلَافَ الْمُدَّعِي أَحْلَفَهُ لَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ بَتًّا لِلْحُكْمِ بَيْنَهُمَا.

দলিলের প্রকাশ্য বিষয়াবলি অনুযায়ী আমল করা হবে; আর যদি তিনি এর ওপর ভিত্তি না করেন, তবে ক্রয়-বিক্রয়ের সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় কার্যকর করা অধিকতর সমীচীন হবে। এমতাবস্থায় যদি বিবাদী এই মর্মে বাদীর শপথ দাবি করে যে, তার ক্রয়টি সঠিক ছিল এবং তা ভীতি প্রদর্শন বা বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে হয়নি, তবে এক্ষেত্রে বিবাদীর দাবির ভিন্নতার কারণে তাকে শপথ করানোর বৈধতা নিয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং শাফেঈ মাযহাবের একদল অনুসারী তার দাবির সম্ভাবনা ও যুক্তিসঙ্গত হওয়ার কারণে তাকে শপথ করানো বৈধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে শাফেঈ মাযহাবের অপর একদল ফকীহ তাকে শপথ করানো থেকে বিরত থেকেছেন; কারণ তার পূর্ববর্তী স্বীকৃতি তার পরবর্তী দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

অভিযোগ প্রতিকারকারী কর্মকর্তা (ওয়ালিউল মাজালিম) উভয় অবস্থার পারিপার্শ্বিক আলামত অনুযায়ী নিয়ম-নীতি প্রয়োগ করতে পারেন। একইভাবে যদি দাবিটি ঋণের হয় এবং বিবাদী দায়মুক্তির দলিল পেশ করে, আর বাদী দাবি করে যে সে অর্থ গ্রহণের আগেই দলিলের সাক্ষী হয়েছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থ গ্রহণ করেনি, তবে পূর্বোল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী বিবাদীকে শপথ করানো হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: দাবির বিপরীতে পেশকৃত দলিলের সাক্ষীরা ন্যায়পরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও অনুপস্থিত থাকা। এটি আবার দুই প্রকার:

প্রথমত: বিবাদীর অস্বীকৃতির মধ্যে দাবির কারণের স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকা। যেমন তার উক্তি: "এই ভূসম্পত্তিতে তার কোনো অধিকার নেই; কারণ আমি তার কাছ থেকে এটি ক্রয় করেছি

এবং তাকে এর মূল্য পরিশোধ করেছি। আর এটি হলো সাক্ষী সম্বলিত আমার ক্রয়চুক্তিপত্র।"
এমতাবস্থায় বাদী এমন এক দলিলের মাধ্যমে দাবিদারে পরিণত হন যার সাক্ষীরা অনুপস্থিত। এর বিধান পূর্বের মতোই হবে। তবে এক্ষেত্রে দখল ও ব্যবহারের অতিরিক্ত সুবিধা থাকায় আলামত অধিকতর শক্তিশালী এবং পরিস্থিতির সাক্ষ্য অধিকতর স্পষ্ট হবে। যদি এর মাধ্যমে মালিকানা প্রমাণিত না হয়, তবে বিচারক তাদের উভয়ের অবস্থার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তাদের শাসাবেন এবং সম্ভব হলে সাক্ষীদের উপস্থিত করার নির্দেশ দেবেন। তাদের উপস্থিতির জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দেবেন যাতে এই সময়ের মধ্যে তিনি তাদের মধ্যস্থতার দিকে ফিরিয়ে নিতে পারেন। যদি তারা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে আপস-নিষ্পত্তিতে পৌঁছায়, তবে সেই অনুযায়ী রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং সাক্ষীরা উপস্থিত হলেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা হবে। আর যদি তাদের মধ্যে কোনো আপস না হয়, তবে তিনি প্রতিবেশী ও সংশ্লিষ্ট ভূসম্পত্তির প্রতিবেশীদের মাধ্যমে নিবিড় অনুসন্ধান চালাবেন। অভিযোগ প্রতিকারকারী কর্মকর্তা অনুসন্ধানের সময়কালীন অবস্থার জন্য তিনটি বিষয়ের মধ্য থেকে যেকোনো একটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখবেন; তিনি আলামত ও পরিস্থিতির সাক্ষ্য অনুযায়ী স্বীয় ইজতিহাদ বা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে সে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। বিকল্পগুলো হলো: হয় তিনি বিবাদীর দখল থেকে ভূসম্পত্তিটি নিয়ে বাদীর হাতে হস্তান্তর করবেন যতক্ষণ না বিবাদীর পক্ষে বিক্রয়ের প্রমাণ উপস্থাপিত হয়; অথবা তিনি এটি কোনো আমানতদারের (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) হাতে সমর্পণ করবেন এবং এর থেকে অর্জিত আয় প্রকৃত হকদারের জন্য সংরক্ষণ করবেন; অথবা তিনি এটি বিবাদীর দখলেই বহাল রাখবেন কিন্তু সেখানে তার অধিকারে বিধিনিষেধ আরোপ করবেন এবং এর আয় সংরক্ষণের জন্য একজন আমানতদার নিয়োগ করবেন। অভিযোগ প্রতিকারকারী কর্মকর্তার নিকট এই তিনটি বিকল্পের মধ্যে যেটি উপযুক্ত মনে হবে, সেই অনুযায়ী তাদের অবস্থা নির্ধারিত হবে—ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তিনি নিচের দুটি বিষয়ের কোনো একটির আশা রাখবেন:
অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্য প্রকাশ পাওয়া অথবা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সাক্ষীদের উপস্থিতি। যদি সাক্ষীদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যান, তবে তিনি তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন। এমতাবস্থায় যদি বিবাদী বাদীর শপথ দাবি করে, তবে বিচারক তাকে শপথ করাবেন এবং এটিই হবে তাদের মধ্যবর্তী মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَتَضَمَّنَ إِنْكَارُهُ اعْتِرَافًا بِالسَّبَبِ، وَيَقُولُ: هَذِهِ الضَّيْعَةُ لِي لَا حَقَّ لِهَذَا الْمُدَّعِي فِيهَا، وَتَكُونُ شَهَادَةُ الْكِتَابِ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا عَلَى إِقْرَارِهِ بِأَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا، وَإِمَّا عَلَى إِقْرَارِهِ بِأَنَّهَا مِلْكُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَالضَّيْعَةُ مُقَرَّةٌ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ انْتِزَاعُهَا مِنْهُ، فَأَمَّا الْحَجْرُ عَلَيْهِ فِيهَا وَحِفْظُ اسْتِغْلَالِهَا مُدَّةَ الْكَشْفِ وَالْوَسَاطَةِ فَمُعْتَبَرٌ بِشَوَاهِدِ أَحْوَالِهِمَا، وَاجْتِهَادِ وَالِي الْمَظَالِمِ فِيمَا يَرَاهُ بَيْنَهُمَا إِلَى أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا.

وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ شُهُودَ الْكِتَابِ الْمُقَابِلِ لِهَذِهِ الدَّعْوَى حُضُورٌ غَيْرُ مُعَدَّلِينَ فَيُرَاعِي وَالِي الْمَظَالِمِ فِيهِمْ مَا قَدَّمْنَا فِي جَنْبَةِ الْمُدَّعِي مِنْ أَحْوَالِهِمُ الثَّلَاثِ، وَيُرَاعَى حَالُ إِنْكَارِهِ هَلْ يَتَضَمَّنُ اعْتِرَافًا بِالسَّبَبِ أَمْ لَا، فَيَعْمَلُ وَالِي الْمَظَالِمِ فِي ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ تَعْوِيلًا عَلَى اجْتِهَادِهِ بِرَأْيِهِ فِي شَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ.

وَالْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ شُهُودُ الْكِتَابِ مَوْتَى مُعَدَّلِينَ، فَلَيْسَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ إِلَّا فِي الْإِرْهَابِ الْمُجَرَّدِ الَّذِي يَقْتَضِي فَضْلَ الْكَشْفِ، ثُمَّ فِي بَتِّ الْحُكْمِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْإِنْكَارُ مِنَ الِاعْتِرَافِ بِالسَّبَبِ أَمْ لَا.

وَالْحَالَةُ الْخَامِسَةُ: أَنْ يُقَابِلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِخَطِّ الْمُدَّعِي بِمَا يُوجِبُ إِكْذَابَهُ فِي الدَّعْوَى، فَيَعْمَلُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخَطِّ، وَيَكُونُ الْإِرْهَابُ مُعْتَبَرًا بِشَاهِدِ الْحَالِ.

وَالْحَالَةُ السَّادِسَةُ: أَنْ يَظْهَرَ فِي الدَّعْوَى حِسَابٌ يَقْتَضِي بُطْلَانَ الدَّعْوَى، فَيَعْمَلُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْحِسَابِ، وَيَكُونُ الْكَشْفُ وَالْإِرْهَابُ وَالْمُطَاوَلَةُ مُعْتَبَرًا بِشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ، ثُمَّ يَبُتُّ الْحُكْمَ بَعْدَ الْإِيَاسِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ.

দ্বিতীয় প্রকার হলো: তার অস্বীকারের মধ্যে দাবির মূল কারণের কোনো স্বীকৃতি থাকবে না। সে বলবে: "এই ভূসম্পত্তি আমার, এতে এই বাদীর কোনো অধিকার নেই।" এমতাবস্থায় বাদীর বিরুদ্ধে দলিলের সাক্ষ্য দুই প্রকারের হতে পারে: হয় তার এই স্বীকৃতির ওপর যে এতে তার

কোনো অধিকার নেই, অথবা তার এই স্বীকৃতির ওপর যে এটি বিবাদীর মালিকানাধীন। সুতরাং ভূসম্পত্তিটি বিবাদীর দখলেই বহাল রাখা হবে এবং তার নিকট থেকে তা কেড়ে নেওয়া বৈধ হবে না। তবে তদন্ত ও মধ্যস্থতার সময়কালে এটি হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা এবং এর লভ্যাংশ সংরক্ষণ করা তাদের উভয়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অভিযোগ নিরসনকারী বিচারকের ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল হবে, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে চূড়ান্ত বিচারিক রায় নির্ধারিত হয়।

তৃতীয় অবস্থা হলো: এই দাবির বিপরীতে পেশকৃত দলিলের সাক্ষীগণ উপস্থিত আছেন, কিন্তু তারা নির্ভরযোগ্য হিসেবে স্বীকৃত নন। এমতাবস্থায় অভিযোগ নিরসনকারী বিচারক তাদের ক্ষেত্রে সেই তিনটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যা আমরা ইতিপূর্বে বাদীর ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছি। এছাড়া বিবাদীর অস্বীকারের ধরনে দাবির মূল কারণের কোনো স্বীকৃতি নিহিত আছে কি না তাও বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে অভিযোগ নিরসনকারী বিচারক পরিস্থিতির নিরিখে তার নিজস্ব প্রজ্ঞা ও ইজতিহাদের ওপর ভিত্তি করে ইতিপূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

চতুর্থ অবস্থা হলো: দলিলের সাক্ষীগণ মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু তারা নির্ভরযোগ্য ছিলেন। এমতাবস্থায় নিছক ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমেই কেবল বিচারিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট হবে যা অধিকতর তদন্তের দাবি রাখে। অতঃপর বিবাদীর অস্বীকারের ধরনের মধ্যে দাবির মূল কারণের স্বীকৃতি বিদ্যমান কি না, তার ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত ফয়সালা প্রদান করা হবে।

পঞ্চম অবস্থা হলো: বিবাদী কর্তৃক বাদীর এমন কোনো স্বহস্তে লিখিত দলিল পেশ করা যা বাদীর দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এমতাবস্থায় হস্তাক্ষর বা দলিলের বিষয়ে আমাদের ইতিপূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী আমল করা হবে এবং পরিস্থিতির আলোকে সত্য উদঘাটনে চাপ বা ভয় প্রদর্শনের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

ষষ্ঠ অবস্থা হলো: বিচার প্রক্রিয়ায় এমন কোনো হিসাব বা গাণিতিক তথ্য প্রকাশ পাওয়া যা দাবির অসারতা প্রমাণ করে। এমতাবস্থায় হিসাবের বিষয়ে ইতিপূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী আমল করা হবে। আর তদন্ত, চাপ প্রয়োগ ও সময়ক্ষেপণের বিষয়টি পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিরিখে বিবেচনা করা হবে। অতঃপর বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে সত্য পাওয়ার আশা না থাকলে চূড়ান্ত রায় প্রদান করা হবে।

فصل:

فَأَمَّا إِنْ تَجَرَّدَتِ الدَّعْوَى عَنْ أَسْبَابِ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، فَلَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا مَا يُقَوِّيهَا وَلَا مَا يُضْعِفُهَا، فَنَظَرُ الْمَظَالِمِ يَقْتَضِي مُرَاعَاةَ حَالِ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِي غَلَبَةِ الظَّنِّ، وَلَا يَخْلُو حَالُهُمَا فِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِي جَنْبَةِ الْمُدَّعِي.

وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ فِي جَنْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَتَعَدَّلَا فِيهِ، وَالَّذِي يُؤْثِرُهُ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِي إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ هُوَ إِرْهَابُهُمَا، وَتَغْلِيبُ الْكَشْفِ مِنْ جِهَتِهِمَا، وَلَيْسَ لِفَصْلِ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا تَأْثِيرٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ الظُّنُونُ الْغَالِبَةُ، فَإِنْ كَانَتْ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِي جَنْبَةِ الْمُدَّعِي، وَكَانَتِ الرِّيبَةُ مُتَوَجِّهَةً إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَقَدْ يَكُونُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مَعَ خُلُوِّهِ مِنْ حُجَّةٍ يَظْهَرُ بِهَا مَضْعُوفَ الْيَدِ مُسْتَلَانَ الْجَنْبَةِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا بَأْسٍ وَقُدْرَةٍ، فَإِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ غَصْبَ دَارٍ أَوْ ضَيْعَةٍ غَلَبَ فِي الظَّنِّ أَنَّ مِثْلَهُ مَعَ لِينِهِ وَاسْتِضْعَافِهِ لَا يَتَجَوَّزُ فِي دَعْوَاهُ عَلَى مَنْ كَانَ ذَا بَأْسٍ وَذَا سَطْوَةٍ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مَشْهُورًا بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَشْهُورًا بِالْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ، فَيَغْلِبُ فِي الظَّنِّ صِدْقُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ تَتَسَاوَى أَحْوَالُهُمَا، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ عُرِفَ لِلْمُدَّعِي يَدٌ مُتَقَدِّمَةٌ، وَلَيْسَ يُعْرَفُ لِدُخُولِ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَبَبٌ حَادِثٌ، فَالَّذِي يَقْتَضِيهِ نَظَرُ الْمَظَالِمِ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ شَيْئَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِرْهَابُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِتَوَجُّهِ الرِّيبَةِ.

وَالثَّانِي: سُؤَالُهُ عَنْ سَبَبِ دُخُولِ يَدِهِ وَحُدُوثِ مِلْكِهِ، فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ رضي الله عنه يَرَى ذَلِكَ مَذْهَبًا فِي الْقَضَاءِ مَعَ الِارْتِيَابِ، فَكَانَ نَظَرُ الْمَظَالِمِ بِذَلِكَ أَوْلَى، وَرُبَّمَا أَلِفَ

الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ عُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ عَنْ مُسَاوَاةِ خَصْمِهِ فِي الْمُحَاكَمَةِ، فَيَنْزِلُ عَمَّا فِي يَدِهِ لِخَصْمِهِ عَفْوًا، كَالَّذِي حُكِيَ عَنْ مُوسَى الْهَادِي أنه جَلَسَ يَوْمًا لِلْمَظَالِمِ وَعُمَارَةُ بْنُ حَمْزَةَ قَائِمٌ عَلَى

পরিচ্ছেদ:

পক্ষান্তরে, যদি দাবিটি সবলতা বা দুর্বলতার কারণসমূহ থেকে মুক্ত থাকে, অর্থাৎ এর সাথে এমন কিছু যুক্ত না থাকে যা একে শক্তিশালী করে কিংবা দুর্বল করে, তবে মাজালিম (অন্যায় প্রতিকার) আদালতের দৃষ্টিতে বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রবল ধারণার (গালাবা-ই-জান্ন) বিষয়টি বিবেচনা করা আবশ্যক। এমতাবস্থায় তাদের অবস্থা তিনটি পরিস্থিতির বাইরে হবে না:

প্রথমত: প্রবল ধারণাটি বাদীর অনুকূলে হওয়া।

দ্বিতীয়ত: প্রবল ধারণাটি বিবাদীর অনুকূলে হওয়া।

তৃতীয়ত: উভয় পক্ষ এক্ষেত্রে সমপর্যায়ের হওয়া। যে ক্ষেত্রে কোনো এক পক্ষের প্রতি প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়, তার প্রভাব হলো উভয়কে সতর্ক করা এবং তাদের অবস্থা উদঘাটনের চেষ্টা করা। তবে চূড়ান্ত ফয়সালার ক্ষেত্রে প্রবল ধারণার এমন কোনো প্রভাব নেই যা বিচারিক মানদণ্ড হিসেবে গণ্য হবে। যদি প্রবল ধারণা বাদীর অনুকূলে হয় এবং বিবাদীর প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তবে তা তিনটি পদ্ধতিতে হতে পারে:

প্রথমত: কোনো অকাট্য প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও বাদী দৃশ্যত দুর্বল ও প্রভাবহীন প্রতীয়মান হন, পক্ষান্তরে বিবাদী প্রতিপত্তিশালী ও ক্ষমতাবান হন। এমতাবস্থায় বাদী যদি বিবাদীর বিরুদ্ধে ঘরবাড়ি বা ভূসম্পত্তি জবরদখলের দাবি করেন, তবে প্রবল ধারণা এটাই হয় যে, এমন কোমল ও দুর্বল ব্যক্তি তার মতো প্রতিপত্তিশালী ও দাপুটে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা দাবি উত্থাপন করার সাহস করবে না।

দ্বিতীয়ত: বাদী সত্যবাদিতা ও আমানতদারির জন্য সুপরিচিত হওয়া এবং বিবাদী মিথ্যাচার ও খিয়ানতের জন্য কুখ্যাত হওয়া। এক্ষেত্রে বাদীর দাবির সত্যতার প্রতি প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত: উভয় পক্ষের অবস্থা সমান হওয়া, তবে বাদীর পূর্বদখল প্রমাণিত থাকা এবং বিবাদীর বর্তমানে দখলে যাওয়ার কোনো কারণ বা ভিত্তি জানা না থাকা। এই তিনটি অবস্থায় মাজালিম আদালতের বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গির দাবি হলো দুটি কাজ করা:

এক: বিবাদীর প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে তাকে সতর্ক বা ভীত করা।

দুই: বিবাদীকে তার দখলে যাওয়ার কারণ এবং মালিকানা অর্জনের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা। কেননা ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সন্দেহের ক্ষেত্রে বিচারিক প্রক্রিয়ায় একে একটি পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করেন। সুতরাং মাজালিম আদালতের ক্ষেত্রে এটি অধিকতর উপযোগী। অনেক সময় বিবাদী উচ্চমর্যাদার অধিকারী হওয়ার কারণে বিচারে প্রতিপক্ষের সাথে সমাসীন হতে লজ্জাবোধ করেন, ফলে তিনি স্বেচ্ছায় তার দখলে থাকা বস্তু প্রতিপক্ষের অনুকূলে ছেড়ে দেন। যেমনটি মুসা আল-হাদি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন মাজালিম আদালতে বিচারকার্যে বসেছিলেন এবং উমারা ইবনে হামজা সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন...

(ص: 148)الأحكام السلطانية للماوردي

رَأْسِهِ وَلَهُ مَنْزِلٌ، فَحَضَرَ رَجُلٌ فِي جُمْلَةِ الْمُتَظَلِّمِينَ يَدَّعِي أَنَّ عُمَارَةَ غَصَبَ ضَيْعَةً لَهُ، فَأَمَرَهُ الْهَادِي بِالْجُلُوسِ مَعَهُ لِلْمُحَاكِمَةِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَتْ الضَّيْعَةُ لَهُ فَمَا أُعَارِضُهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ لِي فَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، وَمَا أَبِيعُ مَوْضِعِي مِنْ مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

وَرُبَّمَا تَلَطَّفَ وَالِي الْمَظَالِمِ فِي إِيصَالِ الْمُتَظَلِّمِ إِلَى حَقِّهِ بِمَا يَحْفَظُ مَعَهُ حِشْمَةَ الْمَطْلُوبِ، أَوْ مُوَاضَعَةَ الْمَطْلُوبِ عَلَى مَا يَحْفَظُ بِهِ حِشْمَةَ نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى تَخْيِيفٍ وَمَنْعٍ مِنْ حَقٍّ، كَالَّذِي حَكَاهُ عَوْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَهْلَ نَهْرِ الْمَرْغَابِ بِالْبَصْرَةِ خَاصَمُوا فِيهِ الْمَهْدِيُّ إِلَى قَاضِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ1، فَلَمْ يُسَلِّمْهُ إِلَيْهِمْ وَلَا الْهَادِي بَعْدَهُ، ثُمَّ قَامَ الرَّشِيدُ فَتَظَلَّمُوا إِلَيْهِ، وَجَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى نَاظِرٌ فِي الْمَظَالِمِ فَلَمْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ، فَاشْتَرَاهُ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى مِنَ الرَّشِيدِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَوَهَبَهُ لَهُمْ، وَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَعْلَمُوا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَحِقَهُ لَجَاجٌ فِيهِ، وَأَنَّ عَبْدَهُ اشْتَرَاهُ فَوَهَبَهُ لَكُمْ، فَقَالَ فِيهِ أَشْجَعُ السُّلَمِيُّ2 "مِنَ الْكَامِلِ":

رَدَّ السِّبَاحَ بِذِي يَدَيْهِ وَأَهْلُهَا ... فِيهَا بِمَنْزِلَةِ السِّمَاكِ الْأَعْزَلِ
قَدْ أَيْقَنُوا بِذَهَابِهَا وَهَلَاكِهِمْ ... وَالدَّهْرُ يَرْعَاهَا بِيَوْمٍ أَعْضَلِ
فَافْتَكَّهَا لَهُمْ وَهُمْ مِنْ دَهْرِهِمْ ... بَيْنَ الْجِرَانِ وَبَيْنَ حَدِّ الْكَلْكَلِ
مَا كَانَ يُرْجَى غَيْرُهُ لِفَكَاكِهَا ... إِنَّ الْكَرِيمَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُعْضِلِ

فَاحْتَمَلَ مَا فَعَلَهُ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ ابْتَدَأَهُ مِنْ نَفْسِهِ، تَنْزِيهًا لِلرَّشِيدِ عَنِ التَّظَلُّمِ فِيهِ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الرَّشِيدُ وَاضَعَهُ عَلَى هَذَا؛ لِئَلَّا يُنْسَبَ أَبُوهُ وَأَخُوهُ إِلَى جَوْرٍ فِي حَقٍّ وَهُوَ الْأَشْبَهُ، وَلِأَيِّهِمَا كَانَ فَقَدْ عَادَ بِهِ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ مَعَ حِفْظِ الْحِشْمَةِ وَحَسْمِ الْبِذْلَةِ، أَمَّا إِنْ كَانَ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِي جَنْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مَشْهُورًا بِالظُّلْمِ وَالْخِيَانَةِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَشْهُورًا بِالنَّصَفَةِ وَالْأَمَانَةِ.

---

1 هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن مالك بن الخشخاش بن الحارث بن مجفر بن كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم العنبري. قاضي البصرة وخطيبها، وُلِدَ سنة مائة، ولي قضاء البصرة بعد سوار، وروى له مسلم، وتوفّي سنة ثمان وستين ومائة.

2 هو أشجع بن عمرو السلمي، من ولد الشريد بن مطرود، ربي ونشأ بالبصرة، ثم خرج إلى الرقة والرشيد بها، فمدح البرامكة وانقطع إلى جعفر خاصة وأصفاء مدحه، ووصله الرشيد وأعجبه.

তাঁর মর্যাদাপূর্ণ স্থান ছিল, অতঃপর অভিযোগকারীদের ভিড়ে একজন লোক উপস্থিত হয়ে দাবি করল যে, উমারা তার একটি ভূসম্পত্তি দখল করে নিয়েছেন। তখন আল-হাদী তাকে বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য উমারার পাশে বসতে নির্দেশ দিলেন। উমারা বললেন: হে আমীরুল মু'মিনীন, যদি এই ভূসম্পত্তি তার হয়ে থাকে তবে এ নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই। আর যদি এটি

আমার হয়ে থাকে তবে আমি তাকে তা দান করে দিলাম; কেননা আমীরুল মু'মিনীনের মজলিসে আমার এই সম্মানজনক স্থানটি আমি কোনো কিছুর বিনিময়ে বিক্রয় করতে চাই না। কখনও কখনও অভিযোগের বিচারক (ওয়ালি আল-মাযালিম) অভিযোগকারীর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন সূক্ষ্ম ও নম্র কৌশল অবলম্বন করেন যাতে বিবাদীপক্ষের মর্যাদা রক্ষা পায়, অথবা বিবাদীর সাথে এমন কোনো সমঝোতা করেন যাতে তার নিজের সম্মান অক্ষুণ্ন থাকে এবং তার ওপর কোনো অধিকার হরণ বা জুলুমের অপবাদ না আসে। যেমনটি আউন ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেছেন যে, বসরার নহরুল মারগাব এলাকার বাসিন্দারা এটি নিয়ে খলিফা আল-মাহদীর বিরুদ্ধে তাঁর বিচারক উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান আল-আনবারীর নিকট মামলা করেন। কিন্তু তিনি তা তাদের নিকট ফিরিয়ে দেননি এবং তাঁর পরবর্তী শাসক আল-হাদীও তা করেননি। অতঃপর হারুন আল-রশীদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তারা তাঁর কাছে প্রতিকার চায়। তখন জাফর ইবনে ইয়াহইয়া অভিযোগ বিভাগের (মাযালিম) দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু তিনিও তা তাদের নিকট ফিরিয়ে দেননি। অতঃপর জাফর ইবনে ইয়াহইয়া খলিফা আল-রশীদের নিকট থেকে বিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তা ক্রয় করেন এবং তাদেরকে দান করে দেন। তিনি বললেন: আমি এটি কেবল এজন্যই করেছি যাতে তোমরা জানতে পার যে, আমীরুল মু'মিনীন এ বিষয়ে অনমনীয় ছিলেন এবং তাঁর ভৃত্য তা ক্রয় করে তোমাদের দান করেছে। এ প্রসঙ্গে আশজা' আস-সুলামী 'কামিল' ছন্দে কবিতা আবৃত্তি করেছেন:

তিনি আপন হাতে অনুর্বর ভূমিগুলো ফিরিয়ে দিলেন এমতাবস্থায় যে এর বাসিন্দারা … সেখানে 'সিমাকুল আজাল' নক্ষত্রের ন্যায় উচ্চ মর্যাদায় ছিল।

তারা এটি হারিয়ে যাওয়া এবং নিজেদের ধ্বংস সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল … আর মহাকাল এক কঠিন দিনে তা পর্যবেক্ষণ করছিল।

অতঃপর তিনি তাদের জন্য তা মুক্ত করলেন যখন তারা সময়ের নিষ্ঠুরতায় … পশুর গলার নিচে এবং বুকের হাড়ের মাঝে পিষ্ট হচ্ছিল।

এটি উদ্ধারের জন্য তিনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশা করা যেত না … নিশ্চয়ই মহানুভব ব্যক্তিরাই প্রতিটি কঠিন কাজের সমাধানের আশ্রয়স্থল।

জাফর ইবনে ইয়াহইয়ার এই পদক্ষেপের দুটি সম্ভাবনা থাকতে পারে: প্রথমত, তিনি খলিফা আল-রশীদকে অবিচারের অপবাদ থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে স্বপ্রণোদিত হয়ে এটি করেছেন। দ্বিতীয়ত, হতে পারে খলিফা আল-রশীদই তাকে এ বিষয়ে প্ররোচিত করেছিলেন

যাতে তাঁর পিতা এবং ভ্রাতার ওপর জুলুমের দায় না আসে—আর এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কারণ যাই হোক না কেন, এর মাধ্যমে সম্মান রক্ষা ও অপবাদ দূর করার পাশাপাশি প্রকৃত হকদারের কাছে তার অধিকার ফিরে এসেছে। তবে যদি প্রবল ধারণা বিবাদীপক্ষের অনুকূলে থাকে, তবে তা তিনটি দিক থেকে হতে পারে:
প্রথমত: দাবিদার যদি জুলুম ও খিয়ানতের জন্য কুখ্যাত হয় এবং বিবাদী যদি ন্যায়পরায়ণতা ও আমানতদারির জন্য সুপরিচিত হয়।

---

১. তিনি হলেন উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবনুল হুসাইন ইবনে মালিক ইবনুল খুশখাশ ইবনুল হারিস ইবনে মুজাফফার ইবনে কাব ইবনে আনবার ইবনে আমর ইবনে তামীম আল-আনবারী। তিনি বসরার বিচারক ও খতিব ছিলেন। ১০০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। সাওয়ারের পর তিনি বসরার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। ইমাম মুসলিম তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং ১৬৮ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
২. তিনি হলেন আশজা' ইবনে আমর আস-সুলামী, আশ-শারীদ ইবনে মাতরুদের বংশধর। তিনি বসরায় লালিত-পালিত ও বর্ধিত হন। অতঃপর আর-রাক্কাহ শহরে গমন করেন যখন খলিফা আল-রশীদ সেখানে অবস্থান করছিলেন। তিনি বারমাকি বংশের প্রশংসা করেন এবং বিশেষ করে জাফরের ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁর একান্ত প্রশংসায় লিপ্ত হন। আল-রশীদ তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন এবং তাঁর কাব্যপ্রতিভা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

(ص: 149)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي دَنِيئًا مُبْتَذَلًا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَزِهًا مَنْصُوبًا، فَيَطْلُبُ إِحْلَافَهُ قَصْدًا لِبِذْلَتِهِ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ لِدُخُولِ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَبَبٌ مَعْرُوفٌ، وَلَيْسَ يُعْرَفُ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي سَبَبٌ، فَيَكُونُ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي جَنْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ،

وَالرِّيبَةُ مُتَوَجِّهَةٌ إِلَى الْمُدَّعِي، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ رحمه الله: إِنْ كَانَتْ دَعْوَاهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ بِعَيْنٍ قَائِمَةٍ لَمْ يَسْمَعْهَا إِلَّا بَعْدَ ذِكْرِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي مَالِ الذِّمَّةِ لَمْ يَسْمَعْهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُعَامَلَةٌ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنهما لَا يَرَيَانِ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْقُضَاةِ.

فَأَمَّا نَظَرُ الْمَظَالِمِ الْمَوْضُوعُ عَلَى الْأَصْلَحِ، فَعَلَى الْجَائِزِ دُونَ الْوَاجِبِ، فَيَسُوغُ فِيهِ مِثْلُ هَذَا عِنْدَ ظُهُورِ الرِّيبَةِ وَقَصْدِ الْعِنَادِ، وَيُبَالِغُ فِي الْكَشْفِ بِالْأَسْبَابِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى ظُهُورِ الْحَقِّ، وَيَصُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا اتَّسَعَ فِي الْحُكْمِ، فَإِنْ وَقَعَ الْأَمْرُ عَلَى التَّحَالُفِ، وَهُوَ غَايَةُ الْحُكْمِ الْبَاتِّ الَّذِي لَا يَجُوزُ دَفْعُ طَالِبٍ عَنْهُ فِي نَظَرِ الْقَضَاءِ، وَلَا فِي نَظَرِ الْمَظَالِمِ إِذَا لَمْ يَكْفِهِ عَنْهُ الْإِرْهَابُ وَلَا الْوَعْظُ، فَإِنْ فَرَّقَ دَعَاوِيَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ مِنْهَا عَلَى بَعْضِهَا قَصْدًا لِإِعَانَتِهِ وَبِذْلَتِهِ، فَالَّذِي يُوجِبُهُ حُكْمُ الْقَضَاءِ أَنْ لَا يُمْتَنَعَ مِنْ تَبْعِيضِ الدَّعَاوَى وَتَفْرِيقِ الْأَيْمَانِ، وَالَّذِي يُنْتِجُهُ نَظَرُ الْمَظَالِمِ أَنْ يُؤْمَرَ الْمُدَّعِي بِجَمْعِ دَعَاوِيهِ عِنْدَ ظُهُورِ الْإِعْنَاتِ مِنْهُ، وَإِحْلَافِ الْخَصْمِ عَلَى جَمِيعِهَا يَمِينًا وَاحِدَةً.

فَأَمَّا إِنِ اعْتَدَلَتْ حَالُ الْمُتَنَازِعَيْنِ وَتَقَابَلَتْ بَيِّنَةُ الْمُتَشَاجِرَيْنِ وَلَمْ يَتَرَجَّحْ حُجَّةُ أَحَدِهِمَا: بِأَمَارَةٍ أَوْ مَظِنَّةٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِظَةِ، وَهَذَا مِمَّا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الْقُضَاةُ وَوُلَاةُ الْمَظَالِمِ، ثُمَّ يَخْتَصُّ وُلَاةُ الْمَظَالِمِ بَعْدَ الْعِظَةِ بِالْإِرْهَابِ لَهُمَا مَعًا لِتَسَاوِيهِمَا، ثُمَّ بِالْكَشْفِ عَنْ أَصْلِ الدَّعْوَى وَانْتِقَالِ الْمِلْكِ، فَإِنْ ظَهَرَ بِالْكَشْفِ مَا يَعْرِفُ بِهِ الْمُحِقَّ مِنْهُمَا عَمِلَ عَلَيْهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ بِالْكَشْفِ مَا يَنْفَصِلُ بِهِ تَنَازُعُهُمَا رَدَّهُمَا إِلَى وَسَاطَةِ وُجُوهِ الْجِيرَانِ وَأَكَابِرِ الْعَشَائِرِ، فَإِنْ نَجَزَ بِهَا مَا بَيْنَهُمَا، وَإِلَّا كَانَ فَصْلُ الْقَضَاءِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ خَاتِمَةُ أَمْرِهِمَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ لِبَتِّ الْحُكْمِ وَالِاسْتِنَابَةِ فِيهِ.

وَرُبَّمَا تَرَافَعَ إِلَى وُلَاةِ الْمَظَالِمِ فِي غَوَامِضِ الْأَحْكَامِ وَمُشْكِلَاتِ الْخِصَامِ مَا يُرْشِدُهُ إِلَى

দ্বিতীয়ত: বাদী যদি নীচ ও হীন প্রকৃতির হয় এবং বিবাদী হয় সচ্চরিত্র ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব, এমতাবস্থায় বাদী তাকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে শপথ গ্রহণ করানোর দাবি জানায়।

তৃতীয়ত: বিবাদীর দখলে থাকার একটি সুপরিচিত কারণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু বাদীর দাবির স্বপক্ষে কোনো কারণ জানা থাকে না। এই তিনটি অবস্থায় প্রবল ধারণা বিবাদীর অনুকূলে থাকে এবং সন্দেহ বাদীর দিকে ধাবিত হয়। এমতাবস্থায় ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত হলো: যদি বিষয়টি কোনো বিদ্যমান বস্তু সম্পর্কিত হয়, তবে দাবির স্বপক্ষে আবশ্যকীয় কারণ উল্লেখ না করা পর্যন্ত তা শোনা হবে না। আর যদি তা দেনা-পাওনা সংক্রান্ত হয়, তবে বাদী ও বিবাদীর মধ্যে লেনদেন ছিল—এমন প্রমাণ উপস্থাপনের আগে সেই দাবি শোনা হবে না। তবে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আবু হানিফা (রা.) সাধারণ বিচারিক ফয়সালার ক্ষেত্রে এমনটি আবশ্যক মনে করেন না।

জনকল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 'নাযাউল মাজালিম' (অন্যায় ও অবিচার নিরসন বিষয়ক আদালত)-এর ক্ষেত্রে কেবল ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় বিষয়ের ওপর নির্ভর না করে জায়িয বা বৈধ পন্থায় ফয়সালা করা হয়। যখন সন্দেহ এবং হঠকারিতা প্রকাশ পায়, তখন এই পদ্ধতিতে বিচারকার্য পরিচালনা সংগত হয়। এখানে সত্য উন্মোচনের লক্ষ্যে যাবতীয় উপকরণের মাধ্যমে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান চালানো হয় এবং বিচারের বিস্তৃত এখতিয়ার প্রয়োগ করে বিবাদীকে সুরক্ষা দেওয়া হয়। যদি বিষয়টি পারস্পরিক শপথ গ্রহণের পর্যায়ে পৌঁছায়—যা হলো চূড়ান্ত মীমাংসার শেষ স্তর এবং সাধারণ বিচারালয় বা মাজালিম আদালতের কোনো বিচারপ্রার্থীকে তা থেকে বঞ্চিত করা বৈধ নয় যদি ভয় প্রদর্শন বা উপদেশ দ্বারা কাজ না হয়—সেক্ষেত্রে বাদী যদি তার দাবিগুলোকে খণ্ডিত করে এবং বিবাদীকে পর্যুদস্ত ও অপমান করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি অধিবেশনে পৃথক পৃথক শপথ করানোর ইচ্ছা পোষণ করে, তবে সাধারণ বিচারিক বিধান অনুযায়ী দাবি খণ্ডন ও শপথের বিভাজনে বাধা দেওয়া যায় না। কিন্তু মাজালিম আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, বাদীর পক্ষ থেকে হয়রানির উদ্দেশ্য প্রকাশ পেলে তাকে সমস্ত দাবি একত্রিত করার নির্দেশ দেওয়া হবে এবং বিবাদীকে সবগুলোর জন্য মাত্র একটি শপথ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে, যদি বিবাদমান দুই পক্ষের অবস্থা সমান হয় এবং উভয়ের উপস্থাপিত প্রমাণও সমপর্যায়ের হয়, আর কোনো নিদর্শন বা অনুমানের ভিত্তিতে কোনো এক পক্ষের দলিলকে অগ্রগণ্য মনে না হয়, তবে উভয়কে নসিহত করার ক্ষেত্রে সমান আচরণ করতে হবে। বিচারক এবং মাজালিম আদালতের প্রশাসকগণ এই বিষয়ে একমত। অতঃপর মাজালিম আদালতের প্রশাসকগণ সমমর্যাদার কারণে উভয়কে নসিহতের পর ভয় প্রদর্শন করবেন। এরপর দাবির উৎস এবং মালিকানা হস্তান্তরের বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। যদি তদন্তে সত্যনিষ্ঠ পক্ষটি চিহ্নিত

হয়, তবে সেই অনুযায়ী ফয়সালা হবে। আর যদি তদন্তের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি না হয়, তবে তাদেরকে গণ্যমান্য প্রতিবেশী ও বংশীয় প্রবীণদের মধ্যস্থতায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে ফয়সালা হয়ে গেলে ভালো, নতুবা সাধারণ বিচারিক পন্থায় তাদের চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে। আর এটিই হবে তাদের বিষয়ের পরিসমাপ্তি, যা প্রশাসক নিজে সরাসরি বা প্রতিনিধির মাধ্যমে কার্যকর করবেন।

মাঝেমধ্যে মাজালিম আদালতের প্রশাসকদের কাছে এমন কিছু জটিল বিধান ও সংশয়পূর্ণ বিবাদ উপস্থাপিত হয়, যা তাকে নির্দেশনা প্রদান করে...

(ص: 150)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي دَنِيئًا مُبْتَذَلًا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَزِهًا مَنْصُوبًا، فَيَطْلُبُ إِحْلَافَهُ قَصْدًا لِبِذْلَتِهِ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ لِدُخُولِ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَبَبٌ مَعْرُوفٌ، وَلَيْسَ يُعْرَفُ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي سَبَبٌ، فَيَكُونُ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي جَنْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالرِّيبَةُ مُتَوَجِّهَةٌ إِلَى الْمُدَّعِي، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ رحمه الله: إِنْ كَانَتْ دَعْوَاهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ بِعَيْنٍ قَائِمَةٍ لَمْ يَسْمَعْهَا إِلَّا بَعْدَ ذِكْرِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي مَالِ الذِّمَّةِ لَمْ يَسْمَعْهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُعَامَلَةٌ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنهما لَا يَرَيَانِ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْقُضَاةِ.

فَأَمَّا نَظَرُ الْمَظَالِمِ الْمَوْضُوعُ عَلَى الْأَصْلَحِ، فَعَلَى الْجَائِزِ دُونَ الْوَاجِبِ، فَيَسُوغُ فِيهِ مِثْلُ هَذَا عِنْدَ ظُهُورِ الرِّيبَةِ وَقَصْدِ الْعِنَادِ، وَيُبَالِغُ فِي الْكَشْفِ بِالْأَسْبَابِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى ظُهُورِ الْحَقِّ، وَيَصُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا اتَّسَعَ فِي الْحُكْمِ، فَإِنْ وَقَعَ الْأَمْرُ عَلَى التَّحَالُفِ، وَهُوَ غَايَةُ الْحُكْمِ الْبَاتِّ الَّذِي لَا يَجُوزُ دَفْعُ طَالِبٍ عَنْهُ فِي نَظَرِ الْقَضَاءِ، وَلَا فِي نَظَرِ الْمَظَالِمِ إِذَا لَمْ يَكْفِهِ عَنْهُ الْإِرْهَابُ وَلَا الْوَعْظُ، فَإِنْ فَرَّقَ دَعَاوِيَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ

مِنْهَا عَلَى بَعْضِهَا قَصْدًا لِإِعَانَتِهِ وَبِذْلَتِهِ. فَالَّذِي يُوجِبُهُ حُكْمُ الْقَضَاءِ أَنْ لَا يُمْتَنَعَ مِنْ تَبْعِيضِ الدَّعَاوَى وَتَفْرِيقِ الْأَيْمَانِ، وَالَّذِي يُنْتِجُهُ نَظَرُ الْمَظَالِمِ أَنْ يُؤْمَرَ الْمُدَّعِي بِجَمْعِ دَعَاوِيهِ عِنْدَ ظُهُورِ الْإِعْنَاتِ مِنْهُ، وَإِحْلَافِ الْخَصْمِ عَلَى جَمِيعِهَا يَمِينًا وَاحِدَةً.

فَأَمَّا إِنِ اعْتَدَلَتْ حَالُ الْمُتَنَازِعَيْنِ وَتَقَابَلَتْ بَيِّنَةُ الْمُتَشَاجِرَيْنِ وَلَمْ يَتَرَجَّحْ حُجَّةُ أَحَدِهِمَا: بِأَمَارَةٍ أَوْ مَظِنَّةٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِظَةِ، وَهَذَا مِمَّا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الْقُضَاةُ وَوُلَاةُ الْمَظَالِمِ، ثُمَّ يَخْتَصُّ وُلَاةُ الْمَظَالِمِ بَعْدَ الْعِظَةِ بِالْإِرْهَابِ لَهُمَا مَعًا لِتَسَاوِيهِمَا، ثُمَّ بِالْكَشْفِ عَنْ أَصْلِ الدَّعْوَى وَانْتِقَالِ الْمِلْكِ، فَإِنْ ظَهَرَ بِالْكَشْفِ مَا يَعْرِفُ بِهِ الْمُحَقِّقُ مِنْهُمَا عَمِلَ عَلَيْهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ بِالْكَشْفِ مَا يَنْفَصِلُ بِهِ تَنَازُعُهُمَا رَدَّهُمَا إِلَى وَسَاطَةِ وُجُوهِ الْجِيرَانِ وَأَكَابِرِ الْعَشَائِرِ، فَإِنْ نَجَزَ بِهَا مَا بَيْنَهُمَا، وَإِلَّا كَانَ فَصْلُ الْقَضَاءِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ خَاتِمَةُ أَمْرِهِمَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ لِبَتِّ الْحُكْمِ وَالِاسْتِنَابَةِ فِيهِ.

وَرُبَّمَا تَرَافَعَ إِلَى وُلَاةِ الْمَظَالِمِ فِي غَوَامِضِ الْأَحْكَامِ وَمُشْكِلَاتِ الْخِصَامِ مَا يُرْشِدُهُ إِلَى

দ্বিতীয়ত: যদি দাবিদার ব্যক্তি নীচ ও কুরুচিপূর্ণ হয় এবং বিবাদী ব্যক্তি নিষ্কলঙ্ক ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হয়, আর দাবিদার কেবল বিবাদীকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যেই তার শপথ দাবি করে।

তৃতীয়ত: যদি বিবাদীর কাছে বিষয়টি অর্পিত হওয়ার পেছনে কোনো সুস্পষ্ট ও জানা কারণ থাকে, কিন্তু দাবিদারের দাবির পেছনে কোনো জানা কারণ না থাকে। এমতাবস্থায় এই তিন ক্ষেত্রে বিবাদীর পক্ষেই প্রবল ধারণা বিদ্যমান থাকে এবং দাবিদারের প্রতি সন্দেহ ঘনীভূত হয়। এমতাবস্থায় ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মাযহাব হলো: যদি তার দাবিটি এই অবস্থায় কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু সংক্রান্ত হয়, তবে দাবির স্বপক্ষে এর কারণ দর্শানো ব্যতীত তা শোনা হবে না। আর যদি তা দেনা-পাওনা সংক্রান্ত হয়, তবে দাবিদার ব্যক্তি বিবাদীর সঙ্গে তার কারবারের প্রমাণ উপস্থাপনের আগে সেই দাবি শোনা হবে না। তবে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আবু হানীফা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সাধারণ বিচারকদের রায়ের ক্ষেত্রে একে আবশ্যক মনে করেন না।

পক্ষান্তরে, জনকল্যাণ ও সংশোধনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত 'নাযারুল মাজালিম' বা অন্যায় প্রতিকার আদালতের বিচারব্যবস্থা কেবল যা ওয়াজিব বা আবশ্যক তার ওপর নয়, বরং যা জায়েয বা অনুমোদিত তার ওপরও পরিচালিত হয়। সুতরাং যখন কোনো সন্দেহ ও একগুঁয়েমি প্রকাশ পায়, তখন সেখানে এমন ব্যবস্থা নেওয়া বৈধ হয়। এছাড়া সত্য প্রকাশের সহায়ক কারণগুলো উদঘাটনে তিনি ব্যাপক অনুসন্ধান করেন এবং বিচারের প্রশস্ত সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিবাদীকে রক্ষা করেন। যদি বিষয়টি পারস্পরিক শপথ পর্যন্ত গড়ায়—যা হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালার পর্যায় এবং যেখান থেকে কোনো দাবিদারকে বিরত রাখা সাধারণ আদালত কিংবা মাজালিম আদালত কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, যখন ভয় দেখানো বা উপদেশের মাধ্যমে তাকে নিবৃত্ত করা যায় না—সেক্ষেত্রে দাবিদার যদি তার দাবিগুলোকে খণ্ডিত করে এবং বিবাদীকে হয়রানি ও লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি অধিবেশনে পৃথকভাবে শপথ করাতে চায়, তবে সাধারণ বিচারিক বিধান অনুযায়ী দাবিকে খণ্ডিত করা এবং পৃথক পৃথক শপথ গ্রহণ থেকে তাকে বিরত রাখা যায় না। কিন্তু মাজালিম আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যখন দাবিদারের পক্ষ থেকে হয়রানির উদ্দেশ্য প্রকাশ পাবে, তখন তাকে তার সকল দাবি একত্রিত করার আদেশ দেওয়া হবে এবং প্রতিপক্ষকে সবগুলোর জন্য একবারই শপথ করানো হবে।

আর যদি বিবদমান উভয় পক্ষের সামাজিক অবস্থা সমান হয় এবং উভয় পক্ষের প্রমাণাদি পরস্পর বিরোধী হয়, আর কোনো আলামত বা সম্ভাবনার ভিত্তিতে কারো দলিলই প্রাধান্য না পায়, তবে নসিহত বা উপদেশের ক্ষেত্রে উভয়ের প্রতি সমান আচরণ করা উচিত। সাধারণ বিচারক এবং মাজালিম আদালত—উভয়ই এ বিষয়ে একমত। এরপর মাজালিম আদালত উপদেশের পর উভয়ের সমতার কারণে উভয়কেই কঠোরভাবে সতর্ক করবে; অতঃপর দাবির মূল উৎস এবং মালিকানা হস্তান্তরের বিষয়টি নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান করবে। যদি অনুসন্ধানে প্রকৃত সত্য প্রকাশ পায়, তবে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আর যদি অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার কোনো পথ বের না হয়, তবে তিনি বিষয়টি স্থানীয় গণ্যমান্য প্রতিবেশী এবং বংশীয় প্রবীণদের মধ্যস্থতায় মীমাংসার জন্য পাঠিয়ে দেবেন। যদি এর মাধ্যমে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি হয় তবে ভালো, অন্যথায় সাধারণ বিচারিক ফয়সালাই হবে তাদের চূড়ান্ত সমাধান; যা তিনি নিজে সরাসরি কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত নেবেন।

মাঝে মাঝে মাজালিম কর্তৃপক্ষের নিকট এমন সব জটিল আইনি বিষয় এবং অস্পষ্ট বিরোধ উত্থাপিত হয়, যা তাকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে—

تَعْبُدُ فِيهِنَّ رَبَّكَ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ رضي الله عنه: وَاَللَّهِ مَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ أَمْرَيْكَ أَعْجَبُ، أَمِنْ فَهْمِكَ أَمْرَهُمَا؟ أَمْ مِنْ حُكْمِكَ بَيْنَهُمَا؟ اذْهَبْ فَقَدْ وَلَّيْتُكَ الْقَضَاءَ بِالْبَصْرَةِ، وَهَذَا الْقَضَاءُ مِنْ كَعْبٍ وَالْإِمْضَاءُ مِنْ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ حُكْمًا بِالْجَائِزِ دُونَ الْوَاجِبِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْسِمَ لِلزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَا يُجِيبُهَا إِلَى الْفِرَاشِ إِذْ أَصَابَهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ لِوَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْجَائِزِ دُونَ الْوَاجِبِ.

فَصْلٌ: فِي تَوْقِيعَاتِ النَّاظِرِ فِي الْمَظَالِمِ

وَإِذَا وَقَّعَ النَّاظِرُ فِي الْمَظَالِمِ فِي قَصَصِ الْمُتَظَلِّمِينَ إِلَيْهِ بِالنَّظَرِ بَيْنَهُمْ، لَمْ يَخْلُ حَالُ الْمُوَقَّعِ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَالِيًا عَلَى مَا وُقِّعَ بِهِ إِلَيْهِ، أَوْ غَيْرَ وَالٍ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ وَالِيًا عَلَيْهِ كَتَوْقِيعِهِ إِلَى الْقَاضِي بِالنَّظَرِ بَيْنَهُمَا.

فَلَا يَخْلُو حَالُ مَا تَضَمَّنَهُ التَّوْقِيعُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ:

إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِذْنًا بِالْحُكْمِ، أَوْ إِذْنًا بِالْكَشْفِ وَالْوَسَاطَةِ، فَإِنْ كَانَ إِذْنًا بِالْحُكْمِ جَازَ لَهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا بِأَصْلِ الْوِلَايَةِ، وَيَكُونُ التَّوْقِيعُ تَأْكِيدًا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ قُصُورُ مَعَانِيهِ، وَإِنْ كَانَ إِذْنًا بِالْكَشْفِ لِلصُّورَةِ أَوْ التَّوَسُّطِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، فَإِنْ كَانَ فِي التَّوْقِيعِ بِذَلِكَ نَهْيُهُ عَنِ الْحُكْمِ فِيهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ هَذَا النَّهْيُ عَزْلًا لَهُ عَنِ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ عَلَى عُمُومِ وِلَايَتِهِ فِيمَا عَدَاهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ أَنْ تَكُونَ الْوِلَايَةُ نَوْعَيْنِ عَامَّةً وَخَاصَّةً، جَازَ أَنْ يَكُونَ الْعَزْلُ نَوْعَيْنِ عَامًّا وَخَاصًّا، وَإِنْ لَمْ يَنْهَهُ فِي التَّوْقِيعِ عَنِ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا حِينَ أَمَرَهُ بِالْكَشْفِ، فَقَدْ قِيلَ: يَكُونُ نَذْرُهُ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَوَازِ حُكْمِهِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِبَعْضِ مَا إِلَيْهِ لَا يَكُونُ مَنْعًا مِنْ خَيْرِهِ، وَقِيلَ: بَلْ يَكُونُ مَنْعًا مِنْ غَيْرِهِ، وَقِيلَ: بَلْ يَكُونُ مَمْنُوعًا مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا مَقْصُورًا عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ التَّوْقِيعُ مِنَ الْكَشْفِ وَالْوَسَاطَةِ؛ لِأَنَّ فَحْوَى التَّوْقِيعِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ ثُمَّ يُنْظَرُ؛ فَإِنْ كَانَ التَّوْقِيعُ

بِالْوَسَاطَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِنْهَاءُ الْحَالِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْوَسَاطَةِ. وَإِنْ كَانَ بِكَشْفِ الصُّورَةِ لَزِمَهُ إِنْهَاءُ حَالِهِمَا إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتِخْبَارٌ مِنْهُ. فَلَزِمَهُ إِجَابَتُهُ عَنْهُ. فَهَذَا حُكْمُ تَوْقِيعِهِ إِلَى مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ.

وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: وَهُوَ أَنْ يُوَقِّعَ إِلَى مَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ؛ كَتَوْقِيعِهِ إِلَى فَقِيهٍ أَوْ شَاهِدٍ. فَلَا يَخْلُو

আপনি সেই দিনগুলোতে আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করবেন এবং তাঁর (স্ত্রীর) জন্য রয়েছে একদিন ও একরাত। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন: আল্লাহর কসম! আমি জানি না আপনার কোন বিষয়টি আমাকে অধিক বিস্মিত করেছে—বিষয়টি নিয়ে আপনার সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা নাকি তাদের মধ্যে আপনার প্রদত্ত ফয়সালা? আপনি যান, আমি আপনাকে বসরার বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করলাম। কাবের এই ফয়সালা এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে এর অনুমোদন মূলত ইনসাফ ও বৈধতার (জায়েজ) ভিত্তিতে ছিল, যা কোনো আইনগত অপরিহার্য (ওয়াজিব) বিধান ছিল না। কারণ স্বামীর জন্য একজন স্ত্রীর হক পালনে দিন বণ্টন করা কিংবা একবার সহবাসের পর পুনরায় স্ত্রীর শয্যায় যাওয়া আইনত বাধ্যতামূলক নয়। এটি একথার প্রমাণ বহন করে যে, অভিযোগ প্রতিকারকারী (ওয়ালিউল মাজালিম) কর্মকর্তার জন্য বাধ্যতামূলক বিষয়ের বাইরে গিয়ে কেবল ইনসাফ ও বৈধতার ভিত্তিতেও ফয়সালা করার অবকাশ রয়েছে।

পরিচ্ছেদ: মাজালিম বা অভিযোগ প্রতিকার বিভাগের পরিদর্শকের পক্ষ থেকে জারি করা নির্দেশনাবলী প্রসঙ্গে

যখন অভিযোগ প্রতিকারকারী পরিদর্শক তাঁর নিকট অভিযোগ পেশকারী ব্যক্তিদের ফরিয়াদের প্রেক্ষিতে তাদের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য কোনো নির্দেশনা জারি করেন, তখন যাঁর প্রতি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে তাঁর অবস্থা দুই প্রকারের যেকোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হবে: হয় তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্তৃত্বের (বিলায়াত) অধিকারী হবেন, অথবা তাঁর কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। যদি তিনি কর্তৃত্বের অধিকারী হন—যেমন পরিদর্শক কর্তৃক কোনো বিচারকের (কাযী) প্রতি তাদের উভয়ের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা—

সেক্ষেত্রে নির্দেশনার বিষয়বস্তু দুই প্রকারের যেকোনো একটি হতে পারে:

হয় তা বিচারকার্য সম্পাদন করার অনুমতি হবে, অথবা তা কেবল রহস্য উদঘাটন ও মধ্যস্থতা করার অনুমতি হবে। যদি তা বিচারকার্য সম্পাদন করার অনুমতি হয়, তবে তাঁর জন্য নিজের মূল প্রশাসনিক কর্তৃত্বের ভিত্তিতেই বিচার করা বৈধ হবে। এমতাবস্থায় এই নির্দেশনাটি হবে কেবল একটি সমর্থনসূচক দলিল, যার ওপর এর শব্দগত সীমাবদ্ধতা কোনো প্রভাব ফেলবে না। আর যদি নির্দেশনাটি প্রকৃত অবস্থা উদঘাটন কিংবা দুই বিবাদমান পক্ষের মাঝে মধ্যস্থতার অনুমতি স্বরূপ হয়, এবং নির্দেশনায় যদি তাঁকে বিচার করতে নিষেধ করা হয়, তবে তাঁর জন্য বিচার করা বৈধ হবে না। এমতাবস্থায় এই নিষেধাজ্ঞাটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁকে বিচারকের পদ থেকে অপসারিত করার শামিল বলে গণ্য হবে, যদিও অন্য সব ক্ষেত্রে তাঁর সাধারণ বিচারিক কর্তৃত্ব বহাল থাকবে। কারণ প্রশাসনিক কর্তৃত্ব যেমন সাধারণ ও বিশেষ—এই দুই প্রকার হতে পারে, তেমনি পদচ্যুতিও সাধারণ ও বিশেষ—উভয় প্রকার হতে পারে। আর তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার সময় যদি তিনি নির্দেশনামায় বিচার করতে নিষেধ না করেন, তবে এক মতে বলা হয়েছে: তাঁর বিচার করার সাধারণ অধিকারটি বহাল থাকবে; কারণ তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বের কিয়দাংশ পালনের নির্দেশ দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাঁকে অন্য কাজ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। অন্য মতে বলা হয়েছে: এটি তাঁকে অন্যান্য কাজ থেকে বিরত রাখারই নামান্তর। আবার কারো মতে: তাঁকে বিচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং নির্দেশনামায় উল্লিখিত তদন্ত ও মধ্যস্থতার গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে; কেননা নির্দেশনামার সারমর্ম একথাই নির্দেশ করে। অতঃপর লক্ষ্য করতে হবে: যদি নির্দেশনাটি কেবল মধ্যস্থতার জন্য হয়, তবে মধ্যস্থতা শেষে তাঁর জন্য বিস্তারিত রিপোর্ট করা আবশ্যক নয়। কিন্তু যদি তা প্রকৃত অবস্থা উদঘাটনের জন্য হয়, তবে তাদের উভয়ের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট করা আবশ্যক; কারণ এটি ছিল তাঁর পক্ষ থেকে তথ্য অনুসন্ধান, যার উত্তর প্রদান করা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক। এটি হলো সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে নির্দেশনার বিধান যার পূর্ব থেকে বিচারিক কর্তৃত্ব বিদ্যমান রয়েছে।
দ্বিতীয় অবস্থা: আর যদি তিনি এমন ব্যক্তির প্রতি নির্দেশনা জারি করেন যার কোনো প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নেই; যেমন কোনো ফকীহ বা সাক্ষীর প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা—সেক্ষেত্রে বিষয়টি...

حَالُ تَوْقِيعِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ بِكَشْفِ الصُّورَةِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بِالْوَسَاطَةِ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ بِالْحُكْمِ، فَإِنْ كَانَ التَّوْقِيعُ بِكَشْفِ الصُّورَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكْشِفَهَا وَيُنْهِيَ مِنْهَا مَا يَصِحُّ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ لِيَجُوزَ لِلْمُوَقِّعِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ، فَإِنْ أَنْهَى مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ كَانَ خَبَرًا لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْمُوَقِّعُ، وَلَكِنْ يَجْعَلُهُ فِي نَظَرِ الْمَظَالِمِ مِنَ الْأَمَارَاتِ الَّتِي يَغْلِبُ بِهَا حَالُ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ فِي الْإِرْهَابِ وَفَضْلِ الْكَشْفِ، فَإِنْ كَانَ التَّوْقِيعُ بِالْوَسَاطَةِ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَقِفْ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ التَّوْقِيعُ مِنْ تَخْصِيصِ الْوَسَاطَةِ؛ لِأَنَّ الْوَسَاطَةَ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى تَقْلِيدٍ وَلَا وِلَايَةٍ، وَإِنَّمَا يُفِيدُ التَّوْقِيعُ بِالْوَسَاطَةِ تَعْيِينَ الْوَسِيطِ بِاخْتِيَارِ الْمُوَقِّعِ، وَقَوَدِ الْخَصْمَيْنِ إِلَيْهِ اخْتِيَارًا، فَإِنْ أَفْضَتْ الْوَسَاطَةُ إِلَى صُلْحِ الْخَصْمَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِنْهَاؤُهَا، وَكَانَ شَاهِدًا فِيهَا مَتَى اُسْتُدْعِيَ لِلشَّهَادَةِ أَدَّاهَا، وَإِنْ لَمْ تُفْضِ الْوَسَاطَةُ إِلَى صُلْحِهِمَا كَانَ شَاهِدًا عَلَيْهِمَا فِيمَا اعْتَرَفَا بِهِ عِنْدَهُ، يُؤَدِّيهِ إِلَى النَّاظِرِ فِي الْمَظَالِمِ إِنْ عَادَ الْخَصْمَانِ إِلَى التَّظَلُّمِ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ إِنْ لَمْ يَعُودَا، وَإِنْ كَانَ التَّوْقِيعُ بِالْحُكْمِ بَيْنَهُمَا، فَهَذِهِ وِلَايَةٌ يُرَاعَى فِيهَا مَعَانِي التَّوْقِيعِ؛ لِيَكُونَ نَظَرُهُ مَحْمُولًا عَلَى مُوجَبِهِ.

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلِلتَّوْقِيعِ حَالَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُحَالَ بِهِ عَلَى إِجَابَةِ الْخَصْمِ إِلَى مُلْتَمِسِهِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ حِينَئِذٍ مَا سَأَلَ الْخَصْمُ فِي ظُلَامَتِهِ، وَيَصِيرُ النَّظَرُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ، فَإِنْ سَأَلَ الْوَسَاطَةَ أَوْ الْكَشْفَ لِلصُّورَةِ كَانَ التَّوْقِيعُ مُوجِبًا لَهُ، وَكَانَ النَّظَرُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ خَرَجَ التَّوْقِيعُ مَخْرَجَ الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ: أَجِبْهُ إِلَى مُلْتَمَسِهِ، أَوْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْحِكَايَةِ كَقَوْلِهِ: رَأْيُكَ فِي إِجَابَتِهِ إِلَى مُلْتَمَسِهِ، كَانَ مُوَقَّعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي وِلَايَةً يَلْزَمُ حُكْمُهَا، فَكَانَ أَمْرُهَا أَخَفَّ، فَإِنْ سَأَلَ الْمُتَظَلِّمُ فِي قِصَّتِهِ الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْخَصْمُ مُسَمًّى، وَالْخُصُومَةُ مَذْكُورَةً؛ لِتَصِحَّ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ الْخَصْمُ وَلَمْ تُذْكَرْ الْخُصُومَةُ لَمْ تَصِحَّ

الْوِلَايَةُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ وِلَايَةً عَامَّةً، فَيُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهَا، وَلَا خَاصَّةً لِلْجَهْلِ بِهَا، وَإِنْ سَمَّى رَافِعُ الْقِصَّةِ خَصْمَهُ وَذَكَرَ خُصُومَتَهُ نُظِرَ فِي التَّوْقِيعِ بِإِجَابَتِهِ إِلَى مُلْتَمَسِهِ، فَإِنْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْأَمْرِ فَوَقَّعَ وَأَجَابَ إِلَى مُلْتَمَسِهِ وَعَمِلَ بِمَا الْتَمَسَهُ صَحَّتْ وِلَايَتُهُ فِي

তাঁর স্বাক্ষরের অবস্থা তিন প্রকারের:

প্রথমটি: ঘটনার স্বরূপ উন্মোচন বা তদন্তের মাধ্যমে হওয়া।

দ্বিতীয়টি: মধ্যস্থতার মাধ্যমে হওয়া।

তৃতীয়টি: বিচার বিভাগীয় ফয়সালার মাধ্যমে হওয়া। যদি স্বাক্ষরটি ঘটনার স্বরূপ উন্মোচনের জন্য হয়, তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্তব্য হলো বিষয়টি তদন্ত করা এবং এর মধ্য থেকে যা সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য তা উপস্থাপন করা, যাতে স্বাক্ষরকারী (উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা) সে অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারেন। কিন্তু যদি তিনি এমন কিছু পেশ করেন যা সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, তবে তা কেবল একটি সংবাদ হিসেবে গণ্য হবে যা দিয়ে স্বাক্ষরকারী ফয়সালা দিতে পারবেন না। তবে অভিযোগ প্রতিকার (মাজালিম) বিভাগে একে এমন একটি আলামত বা চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হবে, যার মাধ্যমে বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের একজনের অবস্থা ভীতি প্রদর্শন ও তথ্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। আর যদি স্বাক্ষরটি মধ্যস্থতার জন্য হয়, তবে তিনি উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতা করবেন। এক্ষেত্রে মধ্যস্থতার সুনির্দিষ্ট সীমা সম্পর্কে স্বাক্ষরে যা বর্ণিত হয়েছে কেবল তাতেই সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই; কারণ মধ্যস্থতা করার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বা বিচারিক নিয়োগের প্রয়োজন হয় না। বরং মধ্যস্থতার জন্য স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য হলো—স্বাক্ষরকারীর পছন্দে একজন মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করা এবং বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনা। যদি মধ্যস্থতার ফলে বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আপস হয়ে যায়, তবে তা উচ্চপদস্থকে জানানো তাঁর জন্য আবশ্যক নয়। তিনি এক্ষেত্রে একজন সাক্ষী হিসেবে গণ্য হবেন এবং যখনই সাক্ষ্য প্রদানের জন্য তাকে ডাকা হবে, তিনি তা প্রদান করবেন। আর যদি মধ্যস্থতার মাধ্যমে তাদের মধ্যে আপস না হয়, তবে তারা তাঁর কাছে যা স্বীকার করেছে, সে বিষয়ে তিনি তাদের বিপক্ষে সাক্ষী হিসেবে গণ্য হবেন। বিবাদমান পক্ষদ্বয় যদি পুনরায় অভিযোগ প্রতিকার বিভাগে ফিরে আসে, তবে তিনি অভিযোগ প্রতিকারকারী বিচারকের নিকট সেই সাক্ষ্য পেশ করবেন। আর যদি তারা ফিরে না আসে, তবে তা পেশ করা তাঁর জন্য আবশ্যক নয়। আর যদি স্বাক্ষরটি তাদের মধ্যে বিচার বিভাগীয় ফয়সালার জন্য হয়, তবে এটি একটি প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হিসেবে গণ্য হবে, যেখানে স্বাক্ষরের

মর্মার্থসমূহ বিবেচনা করা আবশ্যক; যাতে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত সেই স্বাক্ষরের দাবি অনুযায়ী হয়।
যখন বিষয়টি এমন, তখন স্বাক্ষরের দুটি অবস্থা থাকে:
একটি হলো: বিবাদীর আবেদন মঞ্জুর করার বিষয়ে অর্পণ করা। এমতাবস্থায় বিবাদী তার অভিযোগে যা প্রার্থনা করেছে তা বিবেচনা করা হবে এবং পর্যবেক্ষণ কেবল সেটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যদি সে মধ্যস্থতা বা ঘটনার স্বরূপ উন্মোচনের প্রার্থনা করে, তবে স্বাক্ষরটি তা মঞ্জুর করবে এবং পর্যবেক্ষণ কেবল সেটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। স্বাক্ষরটি আদেশের ভঙ্গিতে হোক—যেমন তাঁর কথা: "তার প্রার্থনা মঞ্জুর করো"—অথবা বর্ণনামূলক ভঙ্গিতে হোক—যেমন তাঁর কথা: "তার প্রার্থনা মঞ্জুর করার বিষয়ে তোমার যা অভিমত"—তা স্বাক্ষরিত আদেশ হিসেবেই গণ্য হবে; কারণ এটি এমন কোনো প্রশাসনিক কর্তৃত্ব দাবি করে না যার রায় মানা বাধ্যতামূলক। ফলে এর বিষয়টি কিছুটা নমনীয়। কিন্তু যদি অভিযোগকারী তার আবেদনে তাদের মধ্যে বিচারের প্রার্থনা করে, তবে বিবাদী পক্ষকে সুনির্দিষ্টভাবে নামসহ উল্লেখ করতে হবে এবং বিরোধের বিষয়টি বর্ণিত থাকতে হবে, যাতে তার ওপর বিচারিক কর্তৃত্ব সঠিক হয়। যদি বিবাদীর নাম উল্লেখ না করা হয় এবং বিরোধের বিষয়টি বর্ণিত না থাকে, তবে বিচারিক কর্তৃত্ব সঠিক হবে না; কারণ এটি কোনো সাধারণ প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নয় যে একে ব্যাপক অর্থে ধরা হবে, আবার এটি কোনো বিশেষ কর্তৃত্বও হতে পারে না যেহেতু এর বিষয়বস্তু অজ্ঞাত। আর যদি আবেদনকারী তার বিবাদী পক্ষকে নামজাদা করে এবং বিবাদের বিষয় উল্লেখ করে, তবে তার আবেদন মঞ্জুর করার বিষয়ে স্বাক্ষরের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে। যদি তা আদেশের ভঙ্গিতে আসে এবং তিনি স্বাক্ষর করেন ও তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং আবেদন অনুযায়ী কাজ করেন, তবে তার বিচারিক কর্তৃত্ব সঠিক হবে সেটির ক্ষেত্রে:

(ص: 153)الأحكام السلطانية للماوردي

الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا، فَهَذَا التَّوْقِيعُ، وَإِنْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْحِكَايَةِ لِلْحَالِ فَوَقَّعَ رَأْيُكَ فِي إِجَابَتِهِ إِلَى مُلْتَمَسِهِ، فَهَذَا التَّوْقِيعُ خَارِجٌ فِي الْأَعْمَالِ السُّلْطَانِيَّةِ مَخْرَجَ الْأَمْرِ، وَالْعُرْفُ

بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهَا مُعْتَادٌ. فَأَمَّا فِي الْأَحْكَامِ الدِّينِيَّةِ فَقَدْ جَوَّزَتْهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ اعْتِبَارًا فِي الْعُرْفِ فِيهِ، وَصَحَّتْ بِهِ الْوِلَايَةُ، وَمَنَعَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى مِنْ جَوَازِهِ وَانْعِقَادِ الْوِلَايَةِ بِهِ، حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهِ أَمْرٌ تَنْعَقِدُ وِلَايَتُهُ بِهِ اعْتِبَارًا بِمَعَانِي الْأَلْفَاظِ. فَلَوْ كَانَ رَافِعُ الْقِصَّةِ سَأَلَ التَّوْقِيعَ بِالْحُكْمِ بَيْنَهُمَا فَوَقَّعَ بِإِجَابَتِهِ إِلَى مُلْتَمَسِهِ مَنْ يَعْتَبِرُ الْعُرْفَ الْمُعْتَادَ صَحَّتْ الْوِلَايَةُ بِهَذَا التَّوْقِيعِ، وَإِنْ وَقَّعَ مَنْ يَعْتَبِرُ مَعَانِيَ الْأَلْفَاظِ لَمْ تَصِحَّ بِهِ الْوِلَايَةُ؛ لِأَنَّهُ سَأَلَ التَّوْقِيعَ بِالْحُكْمِ وَلَمْ يَسْأَلْ الْحُكْمَ.

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: فِي التَّوْقِيعَاتِ أَنْ يُحَالَ فِيهِ عَلَى إِجَابَةِ الْخَصْمِ إِلَى مَا سَأَلَ وَيُسْتَأْنَفَ فِيهِ الْأَمْرُ بِمَا تَضَمَّنَهُ، فَيَصِيرُ مَا تَضَمَّنَهُ التَّوْقِيعُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْوِلَايَةِ. فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:

حَالُ كَمَالٍ.

وَحَالُ جَوَازٍ.

وَحَالٌ يَخْلُو مِنَ الْأَمْرَيْنِ.

فَأَمَّا الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ التَّوْقِيعُ فِيهَا كَمَالًا فِي صِحَّةِ الْوِلَايَةِ فَهُوَ أَنْ يَتَضَمَّنَ شَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا الْأَمْرُ بِالنَّظَرِ.

وَالثَّانِي: الْأَمْرُ بِالْحُكْمِ، فَيَذْكُرُ فِيهِ: انْظُرْ بَيْنَ رَافِعِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَبَيْنَ خَصْمِهِ، وَاحْكُمْ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ وَمُوجَبِ الشَّرْعِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْحَقِّ الَّذِي يُوَجِّهُهُ حُكْمُ الشَّرْعِ، وَإِنَّمَا يَذْكُرُ ذَلِكَ فِي التَّوْقِيعَاتِ وَصْفًا لَا شَرْطًا، فَإِنْ كَانَ هَذَا التَّوْقِيعُ جَامِعًا لِهَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ النَّظَرِ وَالْحُكْمِ، فَهُوَ التَّوْقِيعُ الْكَامِلُ وَيَصِحُّ بِهِ التَّقْلِيدُ وَالْوِلَايَةُ.

وَأَمَّا الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا التَّوْقِيعُ جَائِزًا مَعَ قُصُورِهِ عَنْ حَالِ الْكَمَالِ، فَهُوَ أَنْ يَتَضَمَّنَ الْأَمْرَ بِالْحُكْمِ دُونَ النَّظَرِ فَيَذْكُرُ فِي تَوْقِيعِهِ: احْكُمْ بَيْنَ رَافِعِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَبَيْنَ خَصْمِهِ، أَوْ يَقُولُ: اقْضِ بَيْنَهُمَا، فَتَصِحُّ الْوِلَايَةُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ وَالْقَضَاءَ

بَيْنَهُمَا لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَقَدُّمِ النَّظَرِ، فَصَارَ الْأَمْرُ بِهِ مُتَضَمِّنًا لِلنَّظَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْهُ.

তাদের উভয়ের মধ্যে ফয়সালা প্রদানের জন্য প্রদত্ত এই অনুস্বাক্ষরটি (তওকী‘), যদিও বর্তমান অবস্থার বর্ণনা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে—যেমন তিনি তার আবেদন মঞ্জুর করার বিষয়ে আপনার অভিমত স্বাক্ষর করেছেন—তবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে এই অনুস্বাক্ষরটি 'আদেশ' হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার একটি প্রতিষ্ঠিত প্রথা। তবে ধর্মীয় বিধান বা আহকামের ক্ষেত্রে একদল ফকিহ একে বৈধ বলেছেন এর প্রচলিত প্রথার বিবেচনায়, এবং এর মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পণ (বিলায়াত) সঠিক হবে। অন্য একদল ফকিহ একে বৈধ মনে করেন না এবং এর মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পণ সম্পন্ন হয় না বলে মনে করেন, যতক্ষণ না এর সাথে এমন কোনো স্পষ্ট আদেশ যুক্ত হয় যার মাধ্যমে শব্দের অর্থের বিবেচনায় দায়িত্ব অর্পণ সুনিশ্চিত হয়। সুতরাং আরজি পেশকারী যদি উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করার প্রার্থনা জানিয়ে অনুস্বাক্ষর কামনা করে আর স্বাক্ষরকারী প্রচলিত প্রথাকে বিবেচনায় নিয়ে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করে স্বাক্ষর করেন, তবে এই অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পণ সঠিক হবে। আর যদি স্বাক্ষরকারী শব্দের আভিধানিক অর্থকে প্রাধান্য দেন, তবে এর মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পণ সঠিক হবে না; কারণ আবেদনকারী ফয়সালা সম্বলিত অনুস্বাক্ষর প্রার্থনা করেছে, সরাসরি ফয়সালা প্রার্থনা করেনি।

অনুস্বাক্ষরের দ্বিতীয় অবস্থা হলো—এতে বিবাদীর প্রার্থনা মঞ্জুর করার বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত থাকে এবং তাতে যা সন্নিবেশিত রয়েছে সে অনুযায়ী নতুনভাবে আদেশ জারি করা হয়। ফলে অনুস্বাক্ষরে যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে সেটিই বিবেচ্য বিষয় হবে। এমতাবস্থায় এর তিনটি অবস্থা রয়েছে:

পূর্ণাঙ্গ অবস্থা।

বৈধ অবস্থা।

এবং এমন অবস্থা যা এই উভয়টি থেকে মুক্ত।

যে অবস্থায় অনুস্বাক্ষরটি দায়িত্ব অর্পণের সঠিকত্বের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ বলে গণ্য হয়, তা হলো এতে দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা:

প্রথমটি হলো—পর্যবেক্ষণ বা তদন্তের আদেশ।

দ্বিতীয়টি হলো—ফয়সালা বা রায়ের আদেশ। অর্থাৎ এতে এভাবে উল্লেখ করা হবে: "এই আরজি পেশকারী ও তার প্রতিপক্ষের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করুন এবং তাদের মধ্যে সত্য ও শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করুন।" যদি বিষয়টি এমন হয় তবে তা বৈধ; কারণ শরীয়তের বিধান যে সত্যকে নির্দেশ করে, তা ছাড়া প্রকৃত ফয়সালা সম্ভব নয়। অনুস্বাক্ষরে এটি বর্ণনামূলক অনুষঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, শর্ত হিসেবে নয়। যদি এই অনুস্বাক্ষরটি পর্যবেক্ষণ ও ফয়সালা—এই উভয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, তবে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ অনুস্বাক্ষর এবং এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব প্রদান ও দায়িত্ব অর্পণ সঠিক হবে।
আর যে অবস্থায় অনুস্বাক্ষরটি পূর্ণাঙ্গ স্তরের চেয়ে কিছুটা অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বৈধ বলে গণ্য হয়, তা হলো এতে পর্যবেক্ষণের উল্লেখ ছাড়াই কেবল ফয়সালার আদেশ অন্তর্ভুক্ত থাকা। যেমন তিনি তার অনুস্বাক্ষরে উল্লেখ করেন: "এই আরজি পেশকারী ও তার প্রতিপক্ষের মধ্যে ফয়সালা করুন," অথবা বলেন: "তাদের মাঝে বিচার নিষ্পত্তি করুন।" এর মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পণ সঠিক হবে; কারণ উভয়ের মধ্যে ফয়সালা ও বিচার নিষ্পত্তি কেবল পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণের পরেই সম্ভব। ফলে ফয়সালার আদেশটি পরোক্ষভাবে পর্যবেক্ষণের বিষয়টিকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, যেহেতু পর্যবেক্ষণ ছাড়া বিচার সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

(ص: 154)الأحكام السلطانية للماوردي

وَأَمَّا الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ التَّوْقِيعُ فِيهَا خَالِيًا مِنْ كَمَالٍ وَجَوَازٍ، فَهُوَ أَنْ يَذْكُرَ فِي التَّوْقِيعِ: اُنْظُرْ بَيْنَهُمَا، فَلَا تَنْعَقِدُ بِهَذَا التَّوْقِيعِ وِلَايَةٌ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ بَيْنَهُمَا قَدْ يَحْتَمِلُ الْوَسَاطَةَ الْجَائِزَةَ وَيَحْتَمِلُ الْحُكْمَ اللَّازِمَ وَهُمَا فِي الِاحْتِمَالِ سَوَاءٌ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ مَعَ الِاحْتِمَالِ فِي الْوِلَايَةِ، وَإِنْ ذَكَرَ فِيهِ: اُنْظُرْ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ، فَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْوِلَايَةَ بِهِ مُنْعَقِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ مَا لَزِمَ، وَقِيلَ: لَا تَنْعَقِدُ بِهِ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ وَالْوَسَاطَةَ حَقٌّ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

আর যে ক্ষেত্রে নিয়োগপত্রটি পূর্ণতা ও বৈধতা বর্জিত হয়, তা হলো নিয়োগপত্রে এই উল্লেখ থাকা:
"তাদের উভয়ের মাঝে ফয়সালা করো", তবে এই নিয়োগপত্রের মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না; কারণ "উভয়ের মাঝে ফয়সালা করা" শব্দটির দ্বারা বৈধ মধ্যস্থতা এবং বাধ্যতামূলক রায় উভয়ই বোঝানো সম্ভব এবং উভয় সম্ভাবনার দিকটি সমান। সুতরাং বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে এই অস্পষ্টতা থাকায় তা সাব্যস্ত হবে না। আর যদি তাতে উল্লেখ করা হয়: "ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের উভয়ের মাঝে ফয়সালা করো", তবে এক মতে বলা হয়েছে: এর দ্বারা বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে; কারণ যা বাধ্যতামূলক তাই ন্যায়। অন্য মতে বলা হয়েছে: এর দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত হবে না; কারণ আপস-নিষ্পত্তি ও মধ্যস্থতাও ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, যদিও তা পালন করা বাধ্যতামূলক নয়।
আর আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

(ص: 155)الأحكام السلطانية للماوردي

الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب

...

الفصل الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب

وَهَذِهِ النِّقَابَةُ1 مَوْضُوعَةٌ عَلَى صِيَانَةِ ذَوِي الْأَنْسَابِ الشَّرِيفَةِ عَنْ وِلَايَةِ مَنْ لَا يُكَافِئُهُمْ فِي النَّسَبِ، وَلَا يُسَاوِيهِمْ فِي الشَّرَفِ؛ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ أَحْنَى وَأَمْرُهُ فِيهِمْ أَمْضَى.

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "اعْرَفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّهُ لَا قُرْبَ بِالرَّحِمِ إِذَا قُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً، وَلَا بُعْدَ بِهَا إِذَا وُصِلَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً" 2.

وَوِلَايَةُ هَذِهِ النِّقَابَةِ تَصِحُّ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثِ جِهَاتٍ:

إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْخَلِيفَةِ الْمُسْتَوْلِي عَلَى كُلِّ الْأُمُورِ.
وَإِمَّا مِمَّنْ فَوَّضَ الْخَلِيفَةُ إِلَيْهِ تَدْبِيرَ الْأُمُورِ؛ كَوَزِيرِ التَّفْوِيضِ وَأَمِيرِ الْإِقْلِيمِ.
وَإِمَّا مِنْ نَقِيبٍ عَامِّ الْوِلَايَةِ اسْتَخْلَفَ نَقِيبًا خَاصَّ الْوِلَايَةِ. فَإِذَا أَرَادَ الْمَوْلَى أَنْ يُوَلِّيَ عَلَى الطَّالِبِيِّينَ نَقِيبًا أَوْ عَلَى الْعَبَّاسِيِّينَ نَقِيبًا يُخَيِّرُ مِنْهُمْ أَجَلَّهُمْ بَيْتًا وَأَكْثَرَهُمْ فَضْلًا وَأَجْزَلَهُمْ رَأْيًا فَيُوَلَّى عَلَيْهِمْ؛ لِتَجْتَمِعَ فِيهِ شُرُوطُ الرِّيَاسَةِ وَالسِّيَاسَةِ. فَيُسْرِعُوا إِلَى طَاعَتِهِ بِرِيَاسَتِهِ. وَتَسْتَقِيمُ أُمُورُهُمْ بِسِيَاسَتِهِ.
وَالنِّقَابَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: خَاصَّةٌ وَعَامَّةٌ. فَأَمَّا الْخَاصَّةُ فَهُوَ أَنْ يَقْتَصِرَ بِنَظَرِهِ عَلَى مُجَرَّدِ النِّقَابَةِ مِنْ غَيْرِ تَجَاوُزٍ لَهَا إِلَى حُكْمٍ وَإِقَامَةِ حَدٍّ. فَلَا يَكُونُ الْعِلْمُ مُعْتَبَرًا فِي شُرُوطِهَا.

---

1 النقابة -بالكسر، الاسم، وبالفتح المصدر، مثل الولاية والولاية، وفي حديث عبادة بن الصامت -وكان من النقباء؛ جمع نقيب، وهو كالعريف على القوم، المقدَّم عليهم، الذي يتعرف أخبارهم، وينقب عن أحوالهم، أي: يفتش، وكان النبي قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبًا على قومه وجماعته؛ ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفوهم شرائطه، وكانوا اثني عشر نقيبًا كلهم من الأنصار، وكان عبادة بن الصامت منهم. وقيل: النقيب: الرئيس الأكبر. وقولهم: في فلان مناقب جميلة، أي: أخلاق، وهو حسن النقيبة، أي: جميل الخليقة، وإنما قيل: للنقيب نقيب؛ لأنه يعلم دخيلة أمر القوم، ويعرف مناقبهم، وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. [اللسان: 1/ 770] .
2 صحيح: رواه الحاكم في المستدرك "301"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه أحد منهما، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع "1051".

অষ্টম অনুচ্ছেদ: উচ্চবংশীয়দের ওপর তত্ত্বাবধানের (নিকাবাহ) কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে

এই তত্ত্বাবধানের (নিকাবাহ) পদটি প্রবর্তন করা হয়েছে উচ্চবংশীয়দের মর্যাদা রক্ষার জন্য, যাতে তাদের ওপর এমন ব্যক্তি কর্তৃত্ব না করে যে বংশমর্যাদায় তাদের সমতুল্য নয় কিংবা সম্মানের দিক থেকে তাদের সমান নয়; যাতে তত্ত্বাবধায়ক তাদের প্রতি অধিক স্নেহশীল হন এবং তাদের মধ্যে তার নির্দেশ অধিক কার্যকর হয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "তোমরা তোমাদের বংশপরিচয় জানো যাতে তোমরা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে পারো; কেননা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হলে তা নিকটবর্তী হলেও কোনো নৈকট্য থাকে না, আর যদি তা রক্ষা করা হয় তবে তা দূরবর্তী হলেও কোনো দূরত্ব থাকে না।" ২।

এই তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব তিনটি উৎসের যেকোনো একটির মাধ্যমে বৈধ হতে পারে:

হয় সকল বিষয়ের ওপর কর্তৃত্বশীল খলিফার পক্ষ থেকে।

অথবা খলিফা যাকে বিষয়াবলি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তার পক্ষ থেকে; যেমন ক্ষমতাপ্রাপ্ত উজির এবং প্রদেশের আমির।

অথবা সাধারণ কর্তৃত্বসম্পন্ন প্রধান নকিবের পক্ষ থেকে, যিনি বিশেষ কোনো অঞ্চলের জন্য একজন নকিবকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন। অতএব, যখন কোনো কর্তৃপক্ষ তালিব বংশীয়দের ওপর বা আব্বাসীয়দের ওপর কোনো নকিব নিযুক্ত করতে চান, তখন তিনি তাদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ পরিবারভুক্ত, সর্বাধিক গুণী এবং সুচিন্তিত রায় প্রদানের অধিকারী ব্যক্তিকে বাছাই করবেন এবং তাদের ওপর নিযুক্ত করবেন; যাতে তার মধ্যে নেতৃত্ব ও পরিচালনার গুণাবলি একত্রিত হয়, ফলে তার নেতৃত্বের কারণে তারা দ্রুত তার আনুগত্য করে এবং তার বিচক্ষণ পরিচালনার মাধ্যমে তাদের বিষয়াবলি সুসংহত হয়।

এই তত্ত্বাবধান (নিকাবাহ) দুই প্রকার: বিশেষ এবং সাধারণ। বিশেষ তত্ত্বাবধান হলো—তার দৃষ্টি বা কাজ কেবল তত্ত্বাবধানের কার্যাবলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, বিচারকার্য পরিচালনা বা দণ্ডবিধি কার্যকরের পর্যায় পর্যন্ত তা অতিক্রম করবে না। এমতাবস্থায় গভীর পাণ্ডিত্য বা ইলম এর শর্তাবলির মধ্যে গণ্য হবে না।

---

১ নিকাবাহ—শব্দটি ইসম বা বিশেষ্য হিসেবে এবং মাসদার বা ক্রিয়ামূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন বিলায়াহ এবং ওয়ালায়াহ। উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)-এর হাদিসে এসেছে—তিনি ছিলেন নুকাবা বা নকিবদের একজন। নকিব হলেন কওমের প্রধান বা নেতার মতো, যিনি

তাদের খবরাখবর রাখেন এবং তাদের অবস্থা অনুসন্ধান করেন। নবী (সা.) আকাবার রাতে বায়আত গ্রহণকারী দলের প্রত্যেকের মধ্য থেকে একজন করে নকিব নিযুক্ত করেছিলেন তাদের গোত্র ও দলের ওপর, যাতে তারা তাদের ইসলাম গ্রহণের তদারকি করেন এবং ইসলামের শর্তসমূহ শিক্ষা দেন। তারা ছিলেন বারোজন নকিব এবং তারা সকলেই আনসার ছিলেন, যাদের মধ্যে উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) একজন ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন: নকিব অর্থ সর্বোচ্চ নেতা। প্রবাদ আছে যে, অমুক ব্যক্তির মধ্যে চমৎকার মানাকিব রয়েছে, যার অর্থ উত্তম গুণাবলি বা স্বভাবচরিত্র। তাকে নকিব বলা হয় কারণ তিনি দলের গোপন বিষয়াবলি জানেন এবং তাদের গুণাবলি সম্পর্কে অবহিত থাকেন, আর তিনিই তাদের বিষয়াদি জানার মাধ্যম। [লিসানুল আরব: ১/৭৭০]।
২ সহিহ: হাকেম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে (৩০১) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এই হাদিসটি বুখারির শর্তানুযায়ী সহিহ কিন্তু তারা কেউই এটি বর্ণনা করেননি। শেখ আলবানি সহিহুল জামে গ্রন্থে (১০৫১) একে সহিহ বলেছেন।

(ص: 156)الأحكام السلطانية للماوردي

وَيَلْزَمُهُ فِي النِّقَابَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ حُقُوقِ النَّظَرِ اثْنَا عَشَرَ حَقًّا:
أَحَدُهَا: حِفْظُ أَنْسَابِهِمْ مَنْ دَاخِلٍ فِيهَا وَلَيْسَ مِنْهَا، أَوْ خَارِجٍ عَنْهَا وَهُوَ مِنْهَا، فَيَلْزَمُهُ حِفْظُ الْخَارِجِ مِنْهَا كَمَا يَلْزَمُهُ حِفْظُ الدَّاخِلِ فِيهَا؛ لِيَكُونَ النَّسَبُ مَحْفُوظًا عَلَى صِحَّتِهِ مَعْزُوًّا إِلَى جِهَتِهِ.
وَالثَّانِي: تَمْيِيزُ بُطُونِهِمْ وَمَعْرِفَةُ أَنْسَابِهِمْ، حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ بِسَنَوَاتٍ، وَلَا يَتَدَاخَلَ نَسَبٌ فِي نَسَبٍ، وَيُثْبِتُهُمْ فِي دِيوَانِهِ عَلَى تَمْيِيزِ أَنْسَابِهِمْ.
وَالثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ مَنْ وُلِدَ مِنْهُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَيُثْبِتُهُ، وَمَعْرِفَةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَيَذْكُرُهُ حَتَّى لَا يَضِيعَ نَسَبُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ، وَلَا يَدَّعِي نَسَبَ الْمَيِّتِ غَيْرُهُ إِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَأْخُذَهُمْ مِنَ الْآدَابِ بِمَا يُضَاهِي شَرَفَ أَنْسَابِهِمْ وَكَرَمَ مُحْتَدِّهِمْ؛ لِتَكُونَ حِشْمَتُهُمْ فِي النُّفُوسِ مَوْفُورَةً، وَحُرْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ مَحْفُوظَةً.

وَالْخَامِسُ: أَنْ يُنَزِّهَهُمْ عَنِ الْمَكَاسِبِ الدَّنِيئَةِ، وَيَمْنَعَهُمْ مِنَ الْمَطَالِبِ الْخَبِيثَةِ، حَتَّى لَا يُسْتَقَلَّ مِنْهُمْ مُبْتَذَلٌ، وَلَا يُسْتَضَامَ مِنْهُمْ مُتَذَلِّلٌ.

وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُفَّهُمْ عَنِ ارْتِكَابِ الْمَآثِمِ، وَيَمْنَعَهُمْ مِنِ انْتِهَاكِ الْمَحَارِمِ؛ لِيَكُونُوا عَلَى الدِّينِ الَّذِي نَصَرُوهُ أَغْيَرَ، وَلِلْمُنْكَرِ الَّذِي أَزَالُوهُ أَنْكَرَ، حَتَّى لَا يَنْطَلِقَ بِدَمِهِمْ لِسَانٌ، وَلَا يَشْنَأَهُمْ إِنْسَانٌ.

وَالسَّابِعُ: أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنَ التَّسَلُّطِ عَلَى الْعَامَّةِ لِشَرَفِهِمْ، وَالتَّشَطُّطِ عَلَيْهِمْ لِنَسَبِهِمْ، فَيَدْعُوهُمْ ذَلِكَ إِلَى الْمَقْتِ وَالْبُغْضِ، وَيَبْعَثُهُمْ عَلَى الْمُنَاكَرَةِ وَالْبُعْدِ، وَيَنْدُبُهُمْ إِلَى اسْتِعْطَافِ الْقُلُوبِ وَتَأْلِيفِ النُّفُوسِ؛ لِيَكُونَ الْمَيْلُ إِلَيْهِمْ أَوْفَى وَالْقُلُوبُ لَهُمْ أَصْفَى.

وَالثَّامِنُ: أَنْ يَكُونَ عَوْنًا لَهُمْ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ حَتَّى لَا يَضْعُفُوا عَنْهَا، وَعَوْنًا عَلَيْهِمْ فِي أَخْذِ الْحُقُوقِ مِنْهُمْ حَتَّى لَا يُمْنَعُوا مِنْهَا؛ لِيَصِيرُوا بِالْمَعُونَةِ فَهُمْ مُنْتَصِفِينَ، وَبِالْمَعُونَةِ عَلَيْهِمْ مُنْصِفِينَ، فَإِنَّ عَدْلَ السِّيرَةِ فِيهِ إِنْصَافُهُمْ وَانْتِصَافُهُمْ.

وَالتَّاسِعُ: أَنْ يَنُوبَ عَنْهُمْ فِي الْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِمُ الْعَامَّةِ فِي سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ الَّذِي لَا يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمْ، حَتَّى يُقَسَّمَ بَيْنَهُمْ بِحَسَبِ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ.

নিজ বংশ বা গোত্রের অভিভাবকত্ব (নিকাবাত) পালনের ক্ষেত্রে তাঁর ওপর তদারকি সংক্রান্ত বারোটি দায়িত্ব বা অধিকার অর্পিত হয়:

প্রথমত: তাদের বংশলতিকার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা; যাতে এমন কেউ তাতে অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে যে প্রকৃতপক্ষে সেই বংশের নয়, আবার যে বংশের অন্তর্ভুক্ত তাকে যেন বাইরে রাখা না হয়। বংশের বাইরের কাউকে যেমন অন্তর্ভুক্ত হতে দেওয়া যাবে না, তেমনি ভেতরের কাউকেও বাদ দেওয়া যাবে না; যাতে বংশধারা তার সঠিকরূপে সংরক্ষিত থাকে এবং প্রকৃত উৎসের সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

দ্বিতীয়ত: তাদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা পৃথকভাবে চেনা এবং তাদের বংশলতিকা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা, যাতে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও তাদের পরিচয় অস্পষ্ট না হয়ে যায় এবং এক বংশের সাথে অন্য বংশের সংমিশ্রণ না ঘটে। তিনি তাঁর দপ্তরে তাদের বংশগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সকলকে লিপিবদ্ধ করবেন।

তৃতীয়ত: তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী পুত্র ও কন্যা সন্তানদের পরিচয় রাখা ও তা লিপিবদ্ধ করা এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের তালিকা সংরক্ষণ করা। এতে নবজাতকের বংশ পরিচয় হারিয়ে যাবে না এবং মৃত ব্যক্তির স্থলে অন্য কেউ যেন তাঁর বংশের দাবিদার হতে না পারে।

চতুর্থত: তাদেরকে এমন শিষ্টাচার ও আদব শিক্ষা দেওয়া যা তাদের বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; যাতে জনমানসে তাদের গাম্ভীর্য ও মর্যাদা অটুট থাকে এবং তাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান সুরক্ষিত থাকে।

পঞ্চমত: তাদেরকে নীচ ও তুচ্ছ পেশা থেকে পবিত্র রাখা এবং মন্দ উপার্জনকে নিরুৎসাহিত করা; যাতে বংশের কোনো ব্যক্তি জনসম্মুখে অবজ্ঞার পাত্র না হয় এবং অভাবগ্রস্ত হলেও কাউকে যেন লাঞ্ছিত হতে না হয়।

ষষ্ঠত: তাদেরকে পাপাচার থেকে নিবৃত্ত রাখা এবং নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত রাখা; যাতে তারা সেই দ্বীনের ব্যাপারে অধিকতর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয় যাকে তারা সাহায্য করেছে এবং সেই অন্যায়ের কঠোর বিরোধী হয় যা তারা দূর করেছে। এতে কেউ তাদের নিয়ে কুৎসা রটানোর সুযোগ পাবে না এবং কোনো মানুষ তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে না।

সপ্তমত: বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের কারণে সাধারণ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব ফলানো এবং আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত রাখা। কারণ এ ধরনের আচরণ মানুষের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ তৈরি করে এবং তাদের মধ্যে শত্রুতা ও দূরত্বের জন্ম দেয়। পরিবর্তে তাদেরকে মানুষের মন জয় করা এবং হৃদ্যতা সৃষ্টির পরামর্শ দেওয়া; যাতে মানুষের ভালোবাসা ও অনুরাগ তাদের প্রতি অধিকতর ও অকৃত্রিম হয়।

অষ্টমত: তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে তাদের সহযোগী হওয়া যাতে তারা দুর্বল হয়ে না পড়ে এবং তাদের ওপর অন্যের কোনো পাওনা থাকলে তা আদায়ে সহায়তা করা যাতে তারা তা প্রদানে বিরত না থাকে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে তারা একদিকে যেমন নিজ অধিকার আদায়ে সক্ষম হবে, অন্যদিকে অন্যের প্রতি ইনসাফ করতেও অভ্যস্ত হবে। কেননা পরিচালনার ন্যায়পরায়ণতার মূল ভিত্তি হলো তাদের ইনসাফ প্রদান ও অধিকার প্রাপ্তি।

নবমত: ফায় এবং গনিমতের মালে 'নিকটাত্মীয়দের জন্য নির্ধারিত অংশে'র মতো তাদের সামষ্টিক অধিকারসমূহ আদায়ের জন্য তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করা, যা কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যেভাবে অবধারিত করেছেন সেই অনুযায়ী যেন তা সবার মধ্যে বণ্টিত হয়।

(ص: 157)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالْعَاشِرُ: أَنْ يَمْنَعَ أَيَامَاهُمُ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ لِشَرَفِهِنَّ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ؛ صِيَانَةً لِأَنْسَابِهِنَّ، وَتَعْظِيمًا لِحُرْمَتِهِنَّ أَنْ يُزَوِّجَهُنَّ غَيْرَ الْوُلَاةِ أَوْ يُنْكِحَهُنَّ غَيْرَ الْكُفَاةِ.

وَالْحَادِيَ عَشَرَ: أَنْ يُقَوِّمَ ذَوِي الْهَفَوَاتِ مِنْهُمْ فِيمَا سِوَى الْحُدُودِ بِمَا لَا يَبْلُغُ بِهِ حَدًّا، وَلَا يَنْهَرُ بِهِ دَمًا، وَيُقِيلُ ذُو الْهَيْئَةِ مِنْهُمْ عَثْرَتَهُ، وَيَغْفِرُ بَعْدَ الْوَعْظِ زَلَّتَهُ.

وَالثَّانِيَ عَشَرَ: مُرَاعَاةُ وُقُوفِهِمْ بِحِفْظِ أُصُولِهَا وَتَنْمِيَةِ فُرُوعِهَا، وَإِذَا لَمْ يُرَدَّ إِلَيْهِ جِبَايَتُهَا رَاعَى الْجُبَاةَ لَهَا فِيمَا أَخَذُوهُ، وَرَاعَى قِسْمَتَهَا إِذَا قَسَّمُوهُ، وَمَيَّزَ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا إِذَا خُصَّتْ، وَرَاعَى أَوْصَافَهُمْ فِيهَا إِذَا شُرِطَتْ، حَتَّى لَا يَخْرُجَ مِنْهُمْ مُسْتَحِقٌّ وَلَا يَدْخُلَ فِيهَا غَيْرُ مُحِقٍّ.

فَصْلٌ:

وَأَمَّا النِّقَابَةُ الْعَامَّةُ فَعُمُومُهَا أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ فِي النِّقَابَةِ عَلَيْهِمْ مَعَ مَا قَدَّمْنَا مِنْ حُقُوقِ النَّظَرِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا تَنَازَعُوا فِيهِ.

وَالثَّانِي: الْوِلَايَةُ عَلَى أَيْتَامِهِمْ فِيمَا مَلَكُوهُ.

وَالثَّالِثُ: إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ فِيمَا ارْتَكَبُوهُ.

وَالرَّابِعُ: تَزْوِيجُ الْأَيَامَى اللَّاتِي لَا يَتَعَيَّنُ أَوْلِيَاؤُهُنَّ أَوْ قَدْ تَعَيَّنُوا فَعَضَلُوهُنَّ.

وَالْخَامِسُ: إِيقَاعُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ عَتَهَ مِنْهُمْ أَوْ سَفِهَ، وَفَكُّهُ إِذَا أَفَاقَ وَرَشَدَ، فَيَصِيرُ بِهَذِهِ الْخَمْسَةِ عَامَّةَ النِّقَابَةِ، فَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ فِي صِحَّةِ نِقَابَتِهِ وَعَقْدِ وِلَايَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ؛ لِيَصِحَّ حُكْمُهُ وَيَنْفُذَ قَضَاؤُهُ، فَإِذَا انْعَقَدَتْ وِلَايَتُهُ لَمْ يَخْلُ حَالُهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ:

إِمَّا أَنْ يَتَضَمَّنَ صَرْفَ الْقَاضِي عَنِ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِهِ أَوْ لَا يَتَضَمَّنُ، فَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ مُطْلَقَةَ الْعُمُومِ لَا تَتَضَمَّنُ صَرْفَ الْقَاضِي عَنِ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ تَقْلِيدُ النَّقِيبِ لِلنَّظَرِ فِي أَحْكَامِهِمْ مُوجِبًا لِصَرْفِ الْقَاضِي عَنْهَا، جَازَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّقِيبِ وَالْقَاضِي النَّظَرُ فِي أَحْكَامِهِمْ، أَمَّا النَّقِيبُ فَخُصُوصُ وِلَايَتِهِ الَّتِي أُوجِبَ دُخُولُهُمْ فِيهَا، وَأَمَّا الْقَاضِي فَعُمُومُ وِلَايَتِهِ الَّتِي أُوجِبَ دُخُولُهُمْ فِيهَا، فَأَيُّهُمَا حَكَمَ فِي تَنَازُعِهِمْ وَتَشَاجُرِهِمْ، وَفِي تَزْوِيجِ أَيَامَاهُمْ نَفَذَ

দশম: তাদের অবিবাহিত নারীরা যেন কেবল সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তা নিশ্চিত করা, যাতে অন্য সকল নারীর ওপর তাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তার প্রেক্ষিতে তাদের বংশীয় আভিজাত্য সংরক্ষিত থাকে এবং তাদের মর্যাদার পবিত্রতা বজায় থাকে; ফলে অভিভাবক কিংবা সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ তাদের বিয়ে করতে পারবে না।

একাদশ: তাদের মধ্যে যারা বিচ্যুতি ঘটায়, নির্ধারিত দণ্ড ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের সংশোধন করা; তবে তা যেন নির্ধারিত দণ্ডের পর্যায়ে না পৌঁছায় এবং তাতে যেন রক্তপাত না ঘটে। এছাড়া তাদের মধ্যকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করা এবং উপদেশের পর তাদের পদস্খলন ক্ষমা করা।

দ্বাদশ: তাদের ওয়াকফসমূহ তদারকি করা—সেগুলোর মূল সম্পদ রক্ষা এবং লভ্যাংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে। যদি এর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত না থাকে, তবে যারা তা আদায় করে তাদের তদারকি করা। আর যখন তা বণ্টন করা হয়, তখন বণ্টন প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করা। যদি কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য তা নির্দিষ্ট থাকে, তবে প্রকৃত হকদারদের চিহ্নিত করা এবং

শর্তারোপ করা থাকলে গুণাগুণ অনুযায়ী তা তদারকি করা; যাতে কোনো হকদার বঞ্চিত না হয় এবং কোনো অযোগ্য ব্যক্তি তাতে অন্তর্ভুক্ত না হতে পারে।

পরিচ্ছেদ:

সাধারণ নেতৃত্ব বা নিযাবত প্রসঙ্গে: সাধারণ নেতৃত্বের পরিধি হলো—পূর্বে বর্ণিত তদারকির অধিকারগুলোর পাশাপাশি নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ও তার ওপর ন্যস্ত করা হবে:

প্রথমত: তাদের মধ্যকার বিবাদসমূহের মীমাংসা করা।

দ্বিতীয়ত: তাদের এতিমদের মালিকানাধীন সম্পদের ওপর অভিভাবকত্ব প্রদান করা।

তৃতীয়ত: তাদের কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে নির্ধারিত দণ্ড কার্যকর করা।

চতুর্থত: সেই সকল অবিবাহিত নারীদের বিবাহের ব্যবস্থা করা যাদের সুনির্দিষ্ট কোনো অভিভাবক নেই, অথবা অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের বিয়েতে অন্যায়ভাবে বাধা প্রদান করছে।

পঞ্চমত: তাদের মধ্যে যারা মানসিক ভারসাম্যহীন বা নির্বোধ, তাদের ওপর আইনি বিধিনিষেধ আরোপ করা এবং তারা যখন সুস্থ ও বিবেকবান হবে তখন সেই বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া। এই পাঁচটি বিষয়ের কারণে তার নেতৃত্ব সাধারণ নেতৃত্বে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় তার নেতৃত্বের বৈধতা এবং নিয়োগের চুক্তির ক্ষেত্রে শর্ত হলো—তাকে গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত দানে সক্ষম একজন আলেম হতে হবে; যাতে তার বিচারকার্য সঠিক হয় এবং রায় কার্যকর হয়। যখন তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন বিষয়টি দুটি অবস্থার কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হবে:

হয় এটি কাজীকে তাদের বিচারকার্য থেকে অব্যাহতি দেওয়ার নামান্তর হবে, অথবা হবে না। যদি তার নেতৃত্ব নিরঙ্কুশ ও সাধারণ হয় এবং কাজীকে তাদের বিচারকার্য থেকে অব্যাহতি না দেয়, আর নকিবের নিয়োগ যদি কাজীকে সেই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়াকে আবশ্যক না করে, তবে নকিব এবং কাজী উভয়ের জন্যই তাদের বিচারকার্য পরিচালনা করা বৈধ হবে। নকিবের ক্ষেত্রে এটি তার বিশেষ কর্তৃত্বের কারণে যা তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, আর কাজীর ক্ষেত্রে এটি তার সাধারণ কর্তৃত্বের কারণে যা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমতাবস্থায় তাদের বিবাদ-বিসংবাদ নিষ্পত্তি এবং অবিবাহিত নারীদের বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের দুজনের যে কেউ ফয়সালা প্রদান করলে তা কার্যকর হবে।

حُكْمُهُ، وَجَرَى أَمْرُهُمَا فِي الْحُكْمِ عَلَى أَهْلِ هَذَا النَّسَبِ مَجْرَى قَاضِيَيْنِ فِي بَلَدٍ، فَأَيُّهُمَا حَكَمَ نَفَذَ حُكْمُهُ بَيْنَ مُتَنَازِعَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ إِذَا كَانَ بِحُكْمِهِ فِي الِاجْتِهَادِ مَسَاغٌ أَنْ يَنْقُضَهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَ مُتَنَازِعَانِ مِنْهُمْ، فَدَعَا أَحَدُهُمَا إِلَى حُكْمِ النَّقِيبِ، وَدَعَا الْآخَرُ إِلَى حُكْمِ الْقَاضِي، فَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الدَّاعِيَ إِلَى نَظَرِ النَّقِيبِ أَوْلَى لِخُصُوصِ وِلَايَتِهِ، وَقِيلَ: بَلْ هُمَا سَوَاءٌ، فَيَكُونَانِ كَالْمُتَنَازِعِينَ فِي التَّحَاكُمِ إِلَى قَاضِيَيْنِ فِي بَلَدٍ، فَيُغَلَّبُ قَوْلُ الطَّالِبِ عَلَى الْمَطْلُوبِ؛ فَإِنْ تَسَاوَيَا كَانَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُعْمَلُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَرَعَ مِنْهُمَا.

وَالثَّانِي: يُقْطَعُ التَّنَازُعُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى أَحَدِهِمَا، فَإِنْ كَانَ فِي وِلَايَةِ النَّقِيبِ صَرْفُ الْقَاضِي عَنِ النَّظَرِ بَيْنَ أَهْلِ هَذَا النَّسَبِ، لَمْ يَجُزْ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلنَّظَرِ فِي أَحْكَامِهِمْ، سَوَاءٌ اسْتَعْدَى إِلَيْهِ مِنْهُمْ مُسْتَعْدٍ أَوْ لَمْ يَسْتَعْدِ، وَخَالَفَ ذَلِكَ حَالَ الْقَاضِيَيْنِ فِي جَانِبَيْ بَلَدٍ إِذَا اسْتَعْدَى إِلَيْهِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ مُسْتَعْدٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعَدِّيَهُ عَلَى خَصْمِهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وَذَلِكَ أَنَّ وِلَايَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَاضِيَيْنِ مَحْصُورَةٌ بِمَكَانِهِ، فَاسْتَوَى حُكْمُ الطَّارِئِ إِلَيْهِ وَالْقَاطِنِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُمَا يَصِيرَانِ مِنْ أَهْلِهِ.

وَوِلَايَةُ النِّقَابَةِ مَحْصُورَةٌ بِالنَّسَبِ الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ حَالُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ؛ فَلَوْ تَرَاضَى الْمُتَنَازِعَانِ مِنْ أَهْلِ هَذَا النَّسَبِ بِحُكْمِ الْقَاضِي، لَمْ يَكُنْ لَهُ النَّظَرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا أَنْ يَحْكُمَ لَهُمَا أَوْ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ بِالصَّرْفِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَكَانَ النَّقِيبُ أَحَقَّ بِالنَّظَرِ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ التَّنَازُعُ بَيْنَهُمْ لَا يَتَعَدَّاهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَإِنْ تَعَدَّاهُمْ فَتَنَازَعَ طَالِبِيٌّ وَعَبَّاسِيٌّ، فَدَعَا الطَّالِبِيُّ إِلَى حُكْمِ نَقِيبِهِ، وَدَعَا الْعَبَّاسِيُّ إِلَى حُكْمِ نَقِيبِهِ، لَمْ تَجِبْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْإِجَابَةُ إِلَى حُكْمِ غَيْرِ نَقِيبِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ وِلَايَتِهِ، فَإِذَا أَقَامَا عَلَى تَمَانُعِهِمَا مِنَ الْإِجَابَةِ إِلَى نَقِيبِ أَحَدِهِمَا فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَرْجِعَانِ إِلَى حُكْمِ السُّلْطَانِ الَّذِي هُوَ عَامُّ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِمَا، إِذَا كَانَ الْقَاضِي مَصْرُوفًا عَنِ النَّظَرِ بَيْنَهُمَا؛ لِيَكُونَ السُّلْطَانُ هُوَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، إِمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَسْتَنِيبُهُ عَلَى الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ أَشْبَهُ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّقِيبَانِ وَيُحْضِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَيَشْتَرِكَانِ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى، وَيَنْفَرِدُ بِالْحُكْمِ بَيْنَهُمَا نَقِيبُ الْمَطْلُوبِ دُونَ الطَّالِبِ؛ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى أَنْ

তাঁর ফয়সালা; এবং এই বংশের লোকেদের ওপর বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের বিষয়টি একই শহরের দুইজন বিচারকের ন্যায় গণ্য হবে। ফলে বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে তাঁদের যে কেউ বিচার করলে তাঁর রায় কার্যকর হবে। আর যদি ইজতিহাদের ভিত্তিতে সেই রায়ের অবকাশ থাকে, তবে অন্য বিচারকের জন্য তা বাতিল করার কোনো সুযোগ থাকবে না। যদি তাদের মধ্য থেকে দুই বিবাদমান পক্ষ মতবিরোধ করে এবং একজন নকীবের বিচারের দিকে আহ্বান জানায় আর অন্যজন বিচারকের বিচারের দিকে আহ্বান জানায়, তবে বলা হয়েছে: নকীবের বিচারের প্রতি আহ্বানকারীর দাবিই অগ্রগণ্য হবে, যেহেতু তাঁর কর্তৃত্ব বিশেষায়িত। আবার কেউ কেউ বলেছেন: বরং তারা উভয়েই সমান। এমতাবস্থায় তারা একই শহরের দুইজন বিচারকের কাছে বিচারপ্রার্থী দুই বিবাদীর ন্যায় গণ্য হবে। ফলে বিবাদীর ওপর বাদীর বক্তব্য প্রাধান্য পাবে। আর যদি তারা সমান হয়, তবে তা পূর্বে উল্লেখিত দুটি পন্থার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে:

প্রথমটি: তাদের মধ্যে লটারি করা হবে এবং যার লটারি উঠবে তার বক্তব্য অনুযায়ী আমল করা হবে।

দ্বিতীয়টি: তাদের মধ্যস্থ বিবাদ স্থগিত রাখা হবে যতক্ষণ না তারা কোনো একজনের ব্যাপারে একমত হয়। যদি নকীবের কর্তৃত্বের পরিধিতে এই বংশের লোকেদের বিচারকার্য থেকে বিচারককে বিরত রাখার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে সেই বিচারকের জন্য তাদের বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ হবে না; চাই তাদের মধ্য থেকে কেউ বিচার প্রার্থনা করুক বা না করুক। এটি একটি শহরের দুই প্রান্তের দুইজন বিচারকের অবস্থার বিপরীত; যখন অন্য প্রান্ত থেকে কোনো বিচারপ্রার্থী আসে, তখন তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিচারকার্য পরিচালনা করা বিচারকের জন্য আবশ্যক হয়ে যায়। এর কারণ হলো, শহরের সেই দুই বিচারকের

প্রত্যেকের কর্তৃত্ব নিজ নিজ স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই আগন্তুক এবং স্থায়ী অধিবাসী উভয়ের ক্ষেত্রে বিচারের বিধান সমান; কেননা তারা উভয়েই সেখানকার অধিবাসী হিসেবে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে আভিজাত্য রক্ষাকারী নকীবের কর্তৃত্ব বংশের সাথে সীমাবদ্ধ, যা স্থান পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং যদি এই বংশের দুই বিবাদমান ব্যক্তি বিচারকের রায়ে সন্তুষ্ট হয়, তবুও বিচারকের জন্য তাদের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করা অথবা তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেওয়া বৈধ হবে না; কারণ তাকে এই দায়িত্ব থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় নকীবই তাদের মধ্যে বিচার করার অধিক হকদার, যদি বিবাদটি শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং অন্য কারও ওপর না বর্তায়। কিন্তু যদি বিবাদটি তাদের ছাড়িয়ে অন্যের দিকে গড়ায়, যেমন একজন তালিবী এবং একজন আব্বাসী বংশীয় ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং তালিবী ব্যক্তি তার নকীবের কাছে আর আব্বাসী ব্যক্তি তার নকীবের কাছে বিচার চায়, তবে তাদের কারও জন্যই নিজ নকীব ব্যতীত অন্যের বিচারে সাড়া দেওয়া আবশ্যক নয়; কারণ তা সংশ্লিষ্ট নকীবের কর্তৃত্বের বহির্ভূত। এমতাবস্থায় তারা যদি নিজ নিজ নকীব ছাড়া অন্য নকীবের কাছে বিচারের ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করতে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে:

প্রথমটি: তারা সুলতানের বিচারের দিকে ফিরে যাবে, যার কর্তৃত্ব তাদের উভয়ের ওপরই ব্যাপক ও সাধারণ। যদি সাধারণ বিচারককে তাদের বিচারকার্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সুলতান নিজেই তাদের মধ্যে বিচারক হবেন; হয় তিনি স্বয়ং বিচার করবেন অথবা তাদের মধ্যে বিচারের জন্য কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন।

দ্বিতীয় মত এবং এটিই অধিক যুক্তিসঙ্গত: উভয় নকীব একত্রিত হবেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ পক্ষকে উপস্থিত করবেন। তাঁরা যৌথভাবে অভিযোগ শ্রবণ করবেন এবং বিবাদী পক্ষের নকীব একাই বিচার ফয়সালা করবেন, বাদী পক্ষের নকীব নয়; কারণ তিনি এ জন্য নিয়োজিত যে...

يَسْتَوْفِيَ مِنْ أَهْلِهِ حُقُوقَ مُسْتَحِقِّيهَا، فَإِنْ تَعَلَّقَ ثُبُوتُ الْحَقِّ بِبَيِّنَةٍ تُسْمَعُ عَلَى أَحَدِهِمَا، أَوْ يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا أَحَدُهُمَا، سَمِعَ الْبَيِّنَةَ نَقِيبُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ دُونَ نَقِيبِ الْمَشْهُودِ لَهُ، وَأَحْلَفَ نَقِيبَ الْحَالِفِ دُونَ نَقِيبِ الْمُسْتَحْلِفِ؛ لِيَصِيرَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا هُوَ نَقِيبَ الْمَطْلُوبِ دُونَ الطَّالِبِ، وَإِنْ تَمَانَعَ النَّقِيبَانِ أَنْ يَجْتَمِعَا، لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِمَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مَأْثَمٌ، وَتَوَجَّهَ عَلَيْهِمَا الْمَأْثَمُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي، وَكَانَ أَغْلَظَ النَّقِيبَيْنِ مَأْثَمًا نَقِيبُ الْمَطْلُوبِ مِنْهُمَا؛ لِاخْتِصَاصِهِ بِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ.

فَلَوْ تَرَاضَى الطَّالِبِيُّ وَالْعَبَّاسِيُّ بِالتَّحَاكُمِ إِلَى أَحَدِ النَّقِيبَيْنِ، فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا نَقِيبُ أَحَدِهِمَا نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا نَقِيبَ الْمَطْلُوبِ صَحَّ حُكْمُهُ وَأَخَذَ بِهِ خَصْمُهُ، وَإِنْ حَكَمَ بَيْنَهُمَا نَقِيبُ الطَّالِبِ، فَفِي نُفُوذِ حُكْمِهِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ:

يَنْفُذُ حُكْمُهُ فِي أَحَدِهِمَا وَيُرَدُّ فِي الْآخَرِ، وَلَوْ أَحْضَرَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً عِنْدَ الْقَاضِي لِيَسْمَعَهَا عَلَى خَصْمِهِ، وَيَكْتُبَ بِهَا إِلَى نَقِيبِهِ وَهُوَ مُنْصَرِفٌ عَنِ النَّظَرِ بَيْنَهُمَا، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْمَعَ بَيِّنَةً، وَإِنْ كَانَ يَرَى الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يَنْفُذُ عَلَى مَنْ تَقُومُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ لَوْ حَضَرَ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَنْفُذَ حُكْمُهُ عَلَيْهِ مَعَ الْغَيْبَةِ.

وَلَوْ أَرَادَ الْقَاضِي الَّذِي يَرَى الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ سَمَاعَ بَيِّنَةٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ عَمَلِهِ؛ لِيَكْتُبَ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْهَا إِلَى قَاضِي بَلَدِهِ جَازَ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ لَوْ حَضَرَ عِنْدَهُ نَفَذَ حُكْمُهُ عَلَيْهِ، فَلِذَلِكَ جَازَ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، وَأَهْلُ هَذَيْنِ النَّسَبَيْنِ إِنْ حَضَرَ أَحَدُهُمْ عِنْدَهُ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْمَعَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ هَذَيْنِ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي لِصَاحِبِهِ بِحَقٍّ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي شَاهِدًا بِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ نَقِيبِهِ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْبَرَ بِهِ حُكْمًا؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ غَيْرِ النَّقِيبَيْنِ كَانَ شَاهِدًا فِيهِ عِنْدَ نَقِيبِهِ، جَازَ وَكَانَ حَاكِمًا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ نَقِيبِ خَصْمِهِ فَفِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، يَكُونُ فِي أَحَدِهِمَا شَاهِدًا، وَيَكُونُ فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ حَاكِمًا فِيهِ؛ لِمَا

بَيَّنَّاهُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ نَقِيبِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي وِلَايَاتِ زُعَمَاءِ الْعَشَائِرِ وَوُلَاةِ الْقَبَائِلِ الْمُنْفَرِدِينَ بِالْوِلَايَاتِ عَلَى عَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ.

যাতে তিনি নিজ গোত্রের লোকদের থেকে হকদারদের পাওনা পুরোপুরি আদায় করতে পারেন। যদি কোনো অধিকার সাব্যস্ত হওয়া এমন কোনো প্রমাণের (বাইয়িনাহ) ওপর নির্ভর করে যা তাদের কোনো একজনের বিরুদ্ধে শোনা হবে, অথবা এমন কোনো শপথের ওপর যা তাদের কেউ পাঠ করবে, তবে যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে তার নাকীব (গোত্রপ্রধান) সেই সাক্ষ্য শুনবেন, যার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে তার নাকীব নয়। একইভাবে, যে শপথ করবে তার নাকীব তাকে শপথ করাবেন, যে শপথ তলব করছে তার নাকীব নয়; যাতে তাদের উভয়ের মধ্যে বিচারক হিসেবে গণ্য ব্যক্তিটি বাদীর নাকীব না হয়ে বিবাদীর নাকীব হন। যদি দুই নাকীব একত্রে বসতে অস্বীকৃতি জানান, তবে প্রথম অবস্থায় তাদের ওপর কোনো গুনাহ হবে না, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় তারা গুনাহগার হবেন। আর বিবাদীর নাকীবের গুনাহ অধিকতর গুরুতর হবে; কারণ বিচার কার্যকর করার বিষয়টি বিশেষভাবে তার সাথেই সংশ্লিষ্ট।
যদি কোনো তালিবী এবং আব্বাসী বংশের ব্যক্তি তাদের দুই নাকীবের কোনো একজনের মাধ্যমে বিচার করতে সম্মত হয় এবং তাদের একজনের নাকীব তাদের মধ্যে বিচার করেন, তবে লক্ষ্য করতে হবে: যদি বিচারক বিবাদীর নাকীব হন, তবে তার বিচার সঠিক হবে এবং তার প্রতিপক্ষ তা গ্রহণ করবে। আর যদি বাদীর নাকীব তাদের মধ্যে বিচার করেন, তবে তার বিচার কার্যকর হওয়ার বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে:
কারো মতে তার বিচার কার্যকর হবে এবং অন্য মতে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। যদি তাদের কেউ কোনো কাজীর (বিচারক) নিকট এই উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে যে, কাজী যেন তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তা শোনেন এবং তার নাকীবের কাছে এ ব্যাপারে পত্র লেখেন—অথচ কাজী তাদের মধ্যকার বিষয়াদি দেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত নন—তবে কাজীর পক্ষে সেই সাক্ষ্য শোনা বৈধ হবে না, যদিও তিনি অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার করা বৈধ মনে করেন। কারণ, যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে সে উপস্থিত থাকলেও যেখানে তার ওপর কাজীর বিচার কার্যকর হতো না, সেখানে অনুপস্থিত অবস্থায় তার ওপর বিচার কার্যকর না হওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত।

যে কাজী অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফয়সালা দেওয়া বৈধ মনে করেন, তিনি যদি তার বিচারিক এলাকার বাইরের কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য শুনতে চান—যাতে তার কাছে প্রমাণিত বিষয়টি ওই ব্যক্তির এলাকার কাজীর কাছে লিখে পাঠাতে পারেন—তবে তা জায়েজ।
এই দুই বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো: কর্মক্ষেত্রের বাইরের ব্যক্তিটি যদি তার কাছে উপস্থিত হতো, তবে তার ওপর কাজীর বিচার কার্যকর হতো; তাই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য শোনা জায়েজ হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত দুই বংশের লোকদের কেউ যদি কাজীর সামনে উপস্থিত হয়, তবে তার ওপর কাজীর বিচার কার্যকর হয় না; তাই একইভাবে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য শোনাও বৈধ হবে না। যদি এই দুই বংশের কেউ কাজীর কাছে তার প্রতিপক্ষের কোনো পাওনার স্বীকৃতি প্রদান করে, তবে কাজী তার নাকীবের নিকট সেই স্বীকৃতির সাক্ষী হতে পারবেন। কিন্তু বিচারক হিসেবে তিনি তা বলপূর্বক কার্যকর করতে পারবেন না; কারণ তার ওপর কাজীর বিচার কার্যকর হয় না। একইভাবে, যদি সে দুই নাকীব ব্যতীত অন্য কারো কাছে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ওই ব্যক্তি নাকীবের কাছে সে বিষয়ে সাক্ষী হয়, তবে তা জায়েজ হবে এবং নাকীব তার স্বীকৃতির ভিত্তিতে তার ওপর বিচারক হবেন। আর যদি সে তার প্রতিপক্ষের নাকীবের কাছে স্বীকৃতি দেয়, তবে এতে পূর্বে বর্ণিত দুটি অভিমত প্রযোজ্য হবে: একটি মতে তিনি সাক্ষী হবেন এবং অন্য মতে তিনি বিচারক হবেন। এটি আমরা বাদীর নাকীব ও বিবাদীর নাকীবের মধ্যে পার্থক্যের যে কারণ বর্ণনা করেছি তার ভিত্তিতে। বিভিন্ন গোত্র ও কুলের নেতৃবৃন্দের শাসনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য হবে, যারা তাদের নিজ নিজ গোত্র ও কুলের ওপর স্বতন্ত্র শাসনক্ষমতা লাভ করেছেন।

(ص: 160)الأحكام السلطانية للماوردي

الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات

وَالْإِمَامَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: الْإِمَامَةُ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.

وَالثَّانِي: الْإِمَامَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

وَالثَّالِثُ: الْإِمَامَةُ فِي صَلَوَاتِ النَّدْبِ.

فَأَمَّا الْإِمَامَةُ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَنَصْبُ الْإِمَامِ فِيهَا مُعْتَبَرٌ بِحَالِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الصَّلَوَاتُ، وَهِيَ ضَرْبَانِ: مَسَاجِدُ سُلْطَانِيَّةٌ وَمَسَاجِدُ عَامِّيَّةٌ.

فَأَمَّا الْمَسَاجِدُ السُّلْطَانِيَّةُ فَهِيَ الْمَسَاجِدُ وَالْجَوَامِعُ وَالْمَشَاهِدُ، وَمَا عَظُمَ وَكَثُرَ أَهْلُهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ الَّتِي يَقُومُ السُّلْطَانُ بِمُرَاعَاتِهَا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْتَدَبَ لِلْإِمَامَةِ فِيهَا إِلَّا مَنْ نَدَبَهُ السُّلْطَانُ لَهَا وَقَلَّدَهُ الْإِمَامَةَ فِيهَا؛ لِئَلَّا يَفْتَئِتَ الرَّعِيَّةُ عَلَيْهِ فِيمَا هُوَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ، فَإِذَا قَلَّدَ السُّلْطَانُ فِيهَا إِمَامًا كَانَ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ فِيهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ وَأَعْلَمَ.

وَهَذِهِ الْوِلَايَةُ طَرِيقُهَا طَرِيقُ الْأَوْلَى لَا طَرِيقُ اللُّزُومِ وَالْوُجُوبِ، بِخِلَافِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالنِّقَابَةِ لِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ لَوْ تَرَاضَى النَّاسُ بِإِمَامٍ وَصَلَّى بِهِمْ أَجْزَأَهُمْ وَصَحَّتْ جَمَاعَتُهُمْ.

وَالثَّانِي: إِنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِنَ السُّنَنِ الْمُخْتَارَةِ وَالْفَضَائِلِ الْمُسْتَحْسَنَةِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْفُرُوضِ الْوَاجِبَةِ فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، إِلَّا دَاوُد، فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِإِيجَابِهَا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَإِذَا كَانَتْ مِنَ النَّدْبِ الْمُؤَكَّدِ، وَنَدَبَ السُّلْطَانُ لِهَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِمَامًا، لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهَا مَعَ حُضُورِهِ؛ فَإِنْ غَابَ وَاسْتَنَابَ كَانَ مَنِ اسْتَنَابَهُ فِيهَا أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَنِبْ فِي غَيْبَتِهِ اُسْتُؤْذِنَ الْإِمَامُ فِيمَنْ تَقَدَّمَ فِيهَا إِنْ أَمْكَنَ.

وَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُهُ تَرَاضَى أَهْلُ الْبَلَدِ فِيمَنْ يَؤُمُّهُمْ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ جَمَاعَتُهُمْ، فَإِذَا حَضَرَتْ

নবম পরিচ্ছেদ: সালাতের ইমামতির দায়িত্ব ও নিয়োগ প্রসঙ্গে

সালাতের ইমামতি তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথমত: পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ইমামতি।

দ্বিতীয়ত: জুমার সালাতের ইমামতি।

তৃতীয়ত: নফল সালাতসমূহের ইমামতি।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ইমামতির ক্ষেত্রে ইমাম নিয়োগের বিষয়টি সেই সকল মসজিদের অবস্থার উপর নির্ভরশীল যেখানে সালাত কায়েম করা হয়। মসজিদগুলো দুই প্রকার: সুলতানি (রাষ্ট্রীয়) মসজিদ এবং সাধারণ মসজিদ।

সুলতানি মসজিদ বলতে সেই সকল মসজিদ, জামে মসজিদ ও স্মৃতিস্থল-সংলগ্ন ইবাদতগাহসমূহকে বুঝায়, যেগুলোর আয়তন বিশাল ও মুসল্লি সংখ্যা অনেক এবং সুলতান (রাষ্ট্রপ্রধান) স্বয়ং যেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন। সুলতান যাকে মনোনীত করেন এবং ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ করেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য সেখানে ইমামতি করা বৈধ নয়; যাতে প্রজাসাধারণ সুলতানের উপর ন্যস্ত বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ বা স্বেচ্ছাচারিতা করতে না পারে। সুতরাং যখন সুলতান সেখানে কোনো ইমাম নিযুক্ত করেন, তখন তিনিই সেখানে ইমামতির জন্য অন্য সবার চেয়ে অধিক হকদার হন, যদিও অন্য কেউ তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা অধিক জ্ঞানী হন।

এই নিয়োগ বা কর্তৃত্বের প্রকৃতি হলো উত্তম ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে, আবশ্যকতা বা ফরজের ভিত্তিতে নয়; যা বিচার বিভাগীয় নিয়োগ (কাযা) বা জননেতৃত্বের (নিকাবাত) চেয়ে দুটি কারণে ভিন্ন:

প্রথমত: যদি মানুষ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কোনো ইমাম নির্ধারণ করে এবং তিনি তাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন, তবে তা যথেষ্ট হবে এবং তাদের জামাত সহীহ বা শুদ্ধ হবে।

দ্বিতীয়ত: সকল ফকীহ বা আইনবিশারদের মতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জামাত হলো সুন্নতে মুয়াক্কাদা ও একটি পছন্দনীয় ফযিলতপূর্ণ কাজ, এটি সরাসরি ওয়াজিব বা ফরজের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাউদ জাহিরি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম; তিনি ওযর ছাড়া জামাতকে ওয়াজিব বলে একক মত পোষণ করেছেন। যেহেতু এটি একটি তাকিদপূর্ণ নফল বা সুন্নাত আমল এবং সুলতান এসব মসজিদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করেছেন, তাই তাঁর উপস্থিতিতে অন্য কারও পক্ষে ইমামতির জন্য অগ্রবর্তী হওয়া সমীচীন নয়। তবে তিনি যদি অনুপস্থিত থাকেন এবং কাউকে স্থলাভিষিক্ত করেন, তবে সেই প্রতিনিধি ইমামতির জন্য অধিক হকদার হবেন। আর যদি তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে কাউকে স্থলাভিষিক্ত না করেন, তবে সম্ভব হলে সালাতে ইমামতির জন্য মূল ইমামের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

যদি অনুমতি নেওয়া অসম্ভব হয়, তবে এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে ইমামতির জন্য সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারণ করে নেবেন, যাতে তাদের জামাত স্থগিত না হয়ে যায়। অতঃপর যখন সালাতের সময় উপস্থিত হবে...

(ص: 161)الأحكام السلطانية للماوردي

صَلَاةٌ أُخْرَى وَالْإِمَامُ عَلَى غَيْبَتِهِ، فَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْمُرْتَضَى لِلصَّلَاةِ الْأُولَى يَتَقَدَّمُ فِي الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا، إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمُوَلَّى، وَقِيلَ: بَلْ يُخْتَارُ لِلصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ ثَانٍ يُرْتَضَى لَهَا غَيْرَ الْأَوَّلِ؛ لِئَلَّا يَصِيرَ هَذَا الِاخْتِيَارُ تَقَلُّدًا سُلْطَانِيًّا، وَالَّذِي أَرَاهُ أَوْلَى مِنْ إِطْلَاقِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ:

أَنْ يُرَاعَى حَالُ الْجَمَاعَةِ فِي الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ حَضَرَ لَهَا مَنْ حَضَرَ فِي الْأُولَى كَانَ الْمُرْتَضَى فِي الْجَمَاعَةِ الْأُولَى أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ حَضَرَهَا غَيْرُهُمْ كَانَ الْأَوَّلُ كَأَحَدِهِمْ، وَاسْتَأْنَفُوا اخْتِيَارَ إِمَامٍ يَتَقَدَّمُهُمْ، فَإِذَا صَلَّى إِمَامُ هَذَا الْمَسْجِدِ بِجَمَاعَةٍ، وَحَضَرَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً، وَصَلَّوْا فِيهِ فُرَادَى، لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ الْمُبَايَنَةِ وَالتُّهْمَةِ بِالْمُشَاقَّةِ وَالْمُخَالَفَةِ.

وَإِذَا قَلَّدَ السُّلْطَانُ لِهَذَا الْمَسْجِدِ إِمَامَيْنِ، فَإِنْ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ جَازَ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُورًا عَلَى مَا خُصَّ بِهِ؛ كَتَقْلِيدِ أَحَدِهِمَا صَلَاةَ النَّهَارِ، وَتَقْلِيدِ الْآخَرِ صَلَاةَ اللَّيْلِ، فَلَا يَتَجَاوَزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّدَ الْإِمَامَةَ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ لَكِنْ رَدَّ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَوْمًا غَيْرَ يَوْمِ صَاحِبِهِ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي يَوْمِهِ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ فِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ، فَإِنْ أَطْلَقَ تَقْلِيدَهُمَا مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ كَانَا فِي الْإِمَامَةِ سَوَاءً، وَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَيْهَا كَانَ

أَحَقَّ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَؤُمَّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِقَوْمٍ آخَرِينَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَامَ فِي الْمَسَاجِدِ السُّلْطَانِيَّةِ جَمَاعَتَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ.

وَاخْتُلِفَ فِي السَّبْقِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّقَدُّمُ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: سَبْقُهُ بِالْحُضُورِ فِي الْمَسْجِدِ.

وَالثَّانِي: سَبْقُهُ بِالْإِمَامَةِ فِيهِ، فَإِنْ حَضَرَ الْإِمَامَانِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى تَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا كَانَ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ، وَإِنْ تَنَازَعَا فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا وَيَتَقَدَّمُ مَنْ قَرَعَ مِنْهُمَا.

وَالثَّانِي: يَرْجِعُ إِلَى اخْتِيَارِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ لِأَحَدِهِمَا.

وَيَدْخُلُ فِي وِلَايَةِ هَذَا الْإِمَامِ تَقْلِيدُ الْمُؤَذِّنِينَ مَا لَمْ يُصَرَّحْ لَهُ بِالصَّرْفِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ مِنْ سُنَنِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي وَلِيَ الْقِيَامَ بِهَا

ইমাম অনুপস্থিত থাকাকালীন যদি অন্য ওয়াক্তের সালাত উপস্থিত হয়, তবে বলা হয়েছে: প্রথম সালাতের জন্য যিনি মনোনীত হয়েছিলেন, তিনিই দ্বিতীয় এবং পরবর্তী সালাতগুলোতে ইমামতি করবেন, যতক্ষণ না নিযুক্ত ইমাম উপস্থিত হন। আবার বলা হয়েছে: বরং দ্বিতীয় সালাতের জন্য প্রথম ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য একজনকে মনোনীত করা হবে; যাতে এই নির্বাচন কোনো স্থায়ী সুলতানি নিয়োগের রূপ লাভ না করে। এই দুই অভিমতকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করার চেয়ে আমি যা অধিকতর উত্তম মনে করি তা হলো:

দ্বিতীয় সালাতে জামাতের অবস্থা বিবেচনা করা। যদি প্রথম সালাতে যারা উপস্থিত ছিলেন তারাই দ্বিতীয় সালাতেও উপস্থিত থাকেন, তবে প্রথম জামাতে মনোনীত ব্যক্তিই দ্বিতীয় সালাতে ইমামতির অধিক হকদার হবেন। আর যদি অন্যরা উপস্থিত হন, তবে প্রথম ইমাম তাদেরই একজনের মতো গণ্য হবেন এবং তারা নিজেদের মধ্য থেকে ইমামতি করার জন্য নতুনভাবে একজনকে নির্বাচন করবেন। যখন কোনো মসজিদের (নিযুক্ত) ইমাম একটি জামাতের সাথে সালাত আদায় করে ফেলেন এবং এরপর এমন কেউ উপস্থিত হয় যারা সেই জামাত পায়নি, তবে তাদের জন্য সেখানে পুনরায় জামাত করার অনুমতি নেই; বরং তারা একাকী সালাত আদায় করবে। কারণ এতে বিভেদ প্রকাশ পায় এবং বিরোধিতা ও অবাধ্যতার অভিযোগ ওঠার আশঙ্কা থাকে।

যদি সুলতান কোনো মসজিদের জন্য দুজন ইমাম নিযুক্ত করেন, তবে যদি তিনি তাদের প্রত্যেককে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দিষ্ট কিছু ওয়াক্তের জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন তবে তা বৈধ হবে এবং প্রত্যেকেই কেবল তার জন্য নির্ধারিত ওয়াক্তের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে। যেমন—তাদের একজনকে দিনের সালাতগুলোর জন্য এবং অন্যজনকে রাতের সালাতগুলোর জন্য নিযুক্ত করা। এমতাবস্থায় তাদের কেউই তার উপর অর্পিত দায়িত্বের সীমা লঙ্ঘন করবে না। আর যদি তিনি সালাতের ওয়াক্ত সুনির্দিষ্ট না করে ইমামতি অর্পণ করেন, তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিন নির্ধারিত করে দেন, তবে প্রত্যেকেই তার নির্ধারিত দিনে ইমামতির ক্ষেত্রে তার সঙ্গীর তুলনায় অধিক হকদার হবে। আর যদি তিনি কোনো নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই সাধারণভাবে তাদের দুজনকে নিযুক্ত করেন, তবে ইমামতির ক্ষেত্রে তারা সমান বলে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে যে আগে উপস্থিত হবে সেই ইমামতির অধিক হকদার হবে।

এমতাবস্থায় অন্য ইমামের জন্য অন্য কোনো দলের সাথে সেই সালাতে ইমামতি করা বৈধ হবে না; কারণ সরকারি মসজিদগুলোতে একই সালাতের জন্য দুটি জামাত কায়েম করা জায়েজ নয়।

অগ্রগামী হওয়ার কারণে কে ইমামতির অগ্রাধিকার পাবেন, সে বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি: মসজিদে আগে উপস্থিত হওয়া।

দ্বিতীয়টি: ইমামতি শুরু করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়া। যদি দুই ইমাম একই সময়ে উপস্থিত হন তবে তাদের কেউই অপরজনের চেয়ে অগ্রগামী বলে বিবেচিত হবেন না। এমতাবস্থায় তারা যদি কোনো একজনকে ইমামতি করার বিষয়ে একমত হন তবে সেই ব্যক্তিই ইমামতির জন্য অগ্রাধিকার পাবেন। আর যদি তারা বিবাদে লিপ্ত হন তবে এ ক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে:

প্রথমটি: তাদের মধ্যে লটারি করা হবে এবং লটারিতে যার নাম আসবে সেই ইমামতি করবে।

দ্বিতীয়টি: মসজিদ সংশ্লিষ্ট মুসল্লিদের পছন্দের ওপর বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া হবে।

ইমামের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অধীনে মুয়াজ্জিন নিয়োগের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যদি না তাকে এ দায়িত্ব থেকে স্পষ্টভাবে অপসারিত রাখা হয়। কারণ আযান হলো সালাতের সেই সকল সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত, যা সম্পাদনের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

فَصَارَ دَاخِلًا فِي الْوِلَايَةِ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنِينَ بِمَا يُؤَدِّيهِ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ وَالْأَذَانِ.

فَإِنْ كَانَ شَافِعِيًّا يَرَى تَعْجِيلَ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ، وَتَرْجِيعَ الْأَذَانِ وَإِفْرَادَ الْإِقَامَةِ أَخَذَ الْمُؤَذِّنِينَ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُمْ بِخِلَافِهِ، وَإِنْ كَانَ حَنَفِيًّا يَرَى تَأْخِيرَ الصَّلَوَاتِ إِلَى آخِرِ الْأَوْقَاتِ إِلَّا الْمَغْرِبَ، وَيَرَى تَرْكَ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ وَتَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ أَخَذَهُمْ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُمْ بِخِلَافِهِ.

ثُمَّ يَعْمَلُ الْإِمَامُ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ فِي أَحْكَامِ صَلَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ شَافِعِيًّا يَرَى الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ، لَمْ يَكُنْ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يُنْكِرُوهُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ حَنَفِيًّا يَرَى تَرْكَ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ وَتَرْكَ الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ عُمِلَ عَلَى رَأْيِهِ وَلَمْ يُعَارَضْ فِيهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالْأَذَانِ أَنَّهُ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَارَضَ فِي اجْتِهَادِهِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، فَجَازَ أَنْ يُعَارَضَ فِي اجْتِهَادِهِ، فَإِنْ أَحَبَّ الْمُؤَذِّنُ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ عَلَى اجْتِهَادِهِ أَذَّنَ بَعْدَ الْأَذَانِ الْعَامِّ أَذَانًا خَاصًّا لِنَفْسِهِ عَلَى رَأْيِهِ يُسِرُّ بِهِ وَلَا يَجْهَرُ.

فَصْلٌ: "في إمامة الصلاة"

وَالصِّفَاتُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي تَقْلِيدِ هَذَا الْإِمَامِ خَمْسٌ: أَنْ يَكُونَ رَجُلًا عَادِلًا قَارِئًا فَقِيهًا سَلِيمَ اللَّفْظِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ لَثَغٍ، فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ فَاسِقًا صَحَّتْ إِمَامَتُهُ وَلَمْ تَنْعَقِدْ وِلَايَتُهُ؛ لِأَنَّ الصِّغَرَ وَالرِّقَّ وَالْفِسْقَ يَمْنَعُ مِنَ الْوِلَايَةِ وَلَا يَمْنَعُ مِنَ الْإِمَامَةِ.

قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمْرَو بْنَ مَسْلَمَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِقَوْمِهِ وَكَانَ صَغِيرًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَقْرَأَهُمْ، وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ مَوْلًى لَهُ، وَقَالَ: "صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَارٍّ وَفَاجِرٍ"1.

---

1 ضعيف: رواه البيهقي في السنن الكبرى "4/ 19" "6623"، والدارقطني في سننه "2/ 57".

وقال ابن حجر: قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة ورجاله ثقات، وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ: "الجهاد واجب مع كل أمير برًّا كان أو فاجرًا، والصلاة واجبة خلف كل مسلم برًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر"، وله طريق أخرى عند الدارقطني موصولًا، إلَّا أن فيها عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو ضعيف، ولفظه: "سيليكم بعدي البر والفاجر فاسمعوا وأطيعوا وصلوا =

ফলে তিনি এই কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হলেন, আর সময় ও আযানের বিষয়ে তাঁর ইজতিহাদ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সে অনুযায়ী মুয়াজ্জিনদের বাধ্য করার অধিকার তাঁর রয়েছে।
যদি তিনি শাফিঈ হন এবং নামায ওয়াক্তের শুরুতে দ্রুত আদায় করা, আযানে 'তারজী' (শাহাদাতাইন নিচু স্বরে বলার পর উচ্চস্বরে বলা) করা এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলাকে সঙ্গত মনে করেন, তবে তিনি মুয়াজ্জিনদের সে অনুযায়ী পরিচালিত করবেন, যদিও তাদের অভিমত এর বিপরীতে হয়। আর যদি তিনি হানাফী হন এবং মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য নামায ওয়াক্তের শেষ দিকে বিলম্ব করে আদায় করা, আযানে 'তারজী' বর্জন করা এবং ইকামতের বাক্যগুলো দুবার করে বলাকে সঙ্গত মনে করেন, তবে তিনি তাদের সে অনুযায়ী পরিচালিত করবেন, যদিও তাদের অভিমত এর বিপরীতে হয়।
অতঃপর ইমাম তাঁর নামাযের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে নিজের অভিমত ও ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করবেন। যদি তিনি শাফিঈ হন এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম উচ্চস্বরে পাঠ করা ও ফজরের নামাযে কুনুত পাঠ করাকে সঙ্গত মনে করেন, তবে সুলতানের জন্য তাঁকে তা থেকে বিরত রাখা বৈধ নয় এবং মুক্তাদীদের জন্যও তাঁর ওপর আপত্তি তোলা জায়েয নয়।
অনুরূপভাবে তিনি যদি হানাফী হন এবং ফজরে কুনুত বর্জন ও বিসমিল্লাহ অনুচ্চস্বরে পাঠ করা সমীচীন মনে করেন, তবে তিনি স্বীয় মতানুসারেই আমল করবেন এবং এতে কোনো বিরোধিতা করা যাবে না। নামায ও আযানের মধ্যে পার্থক্য হলো—নামায তিনি নিজের পক্ষ থেকে আদায় করছেন, তাই তাঁর ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিরোধিতা করা জায়েয নয়; কিন্তু মুয়াজ্জিন অন্যের হকে আযান দেয়, তাই তার ইজতিহাদের বিরোধিতা করা জায়েয। যদি

মুয়াজ্জিন নিজের ইজতিহাদ অনুযায়ী আযান দিতে চান, তবে তিনি সাধারণ আযানের পর নিজের জন্য নিচু স্বরে আযান দিতে পারেন, উচ্চস্বরে নয়।

পরিচ্ছেদ: "নামাযের ইমামতি প্রসঙ্গে"

এই ইমামতি প্রদানের ক্ষেত্রে পাঁচটি গুণাবলী বিচার্য: তাঁকে পুরুষ, ন্যায়পরায়ণ, ক্বারী (কুরআন পাঠে দক্ষ), ফকীহ এবং উচ্চারণের ত্রুটি বা তোতলামিমুক্ত শুদ্ধভাষী হতে হবে। যদি ইমাম অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, দাস কিংবা ফাসিক (পাপাচারী) হন, তবে তাঁর ইমামতি শুদ্ধ হবে কিন্তু তাঁর নিয়োগ বা কর্তৃত্ব (বিলায়াত) কার্যকর হবে না; কারণ শৈশব, দাসত্ব ও পাপাচার বিলায়াতের ক্ষেত্রে অন্তরায় হলেও ইমামতির জন্য অন্তরায় নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে মাসলামাহকে তাঁর কওমের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যখন তিনি অল্পবয়স্ক ছিলেন; কারণ তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কুরআন পাঠক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জনৈক মুক্ত দাসের পেছনে নামায আদায় করেছেন এবং বলেছেন: "তোমরা প্রত্যেক পুণ্যবান ও পাপাচারীর পেছনে নামায আদায় করো।"১

---

১. যঈফ (দুর্বল): বায়হাকী এটি ‘আস-সুনানুল কুবরা’ (৪/১৯) (৬৬২৩) এবং দারা কুতনী তাঁর ‘সুনান’ (২/৫৭) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে হাজার বলেন: দারা কুতনী বলেছেন—মাকহুল আবু হুরায়রা থেকে সরাসরি শোনেননি, তবে বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আবু দাউদে এই সূত্রেই শব্দগুলো নিম্নরূপ: "জিহাদ প্রত্যেক আমীরের অধীনে আবশ্যক, সে পুণ্যবান হোক কিংবা পাপাচারী। আর নামায প্রত্যেক মুসলমানের পেছনে পড়া আবশ্যক, সে পুণ্যবান হোক কিংবা পাপাচারী, যদিও সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত থাকে।" দারা কুতনীতে এর একটি সংযুক্ত (মাওসুল) সূত্র রয়েছে, তবে তাতে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে উরওয়াহ রয়েছেন, যিনি দুর্বল। বর্ণনার শব্দগুলো হলো: "আমার পরে পুণ্যবান ও পাপাচারীরা তোমাদের শাসন করবে, সুতরাং তোমরা তাদের কথা শোনো ও আনুগত্য করো এবং নামায আদায় করো ="

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِمَامُ امْرَأَةً وَلَا خُنْثَى وَلَا أَخْرَسَ وَلَا أَلْثَغَ، وَإِنْ أَمَّتْ امْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنِ ائْتَمَّ بِهِمَا مِنَ الرِّجَالِ وَالْخَنَاثَى، وَإِنْ أَمَّ أَلْثَغُ أَوْ أَخْرَسُ يُبَدِّلُ الْحُرُوفَ بِأَغْيَارِهَا بَطَلَتْ صَلَاةُ مَنِ ائْتَمَّ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مِثْلِ خَرَسِهِ أَوْ لَثَغِهِ1.

وَأَقَلُّ مَا عَلَى هَذَا الْإِمَامِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِأُمِّ الْقُرْآنِ، عَالِمًا بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُسْتَحَقُّ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ حَافِظًا لِجَمِيعِ الْقُرْآنِ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ كَانَ أَوْلَى.

وَإِذَا اجْتَمَعَ فَقِيهٌ لَيْسَ بِقَارِئٍ، وَقَارِئٌ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، فَالْفَقِيهُ أَوْلَى مِنَ الْقَارِئِ إِذَا كَانَ يَفْهَمُ الْفَاتِحَةَ؛ لِأَنَّ مَا يَلْزَمُ مِنَ الْقُرْآنِ مَحْصُورٌ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الْحَوَادِثِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مَحْصُورٍ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ هَذَا الْإِمَامُ وَمَأْذُونُهُ رِزْقًا عَلَى الْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ ذَلِكَ2.

= وراءهم"، وفي الباب عن واثلة بن الأسقع رفعه: "لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، وصلوا على كل ميت من أهل القبلة". أخرجه ابن ماجه بإسناد واهٍ، وعن ابن عمر رفعه: "وصلوا على من قال: لا إله الله، وصلوا وراء من قال: لا إله إلا الله" أخرجه الدارقطني وأبو نعيم في الحلية، وإسناده ضعيف، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى واهية.

وأخرجه أيضًا عن ابن مسعود رفعه قال: "ثلاث من السنة: الصلاة خلف كل إمام لك صلاته وعليه إثمه" أخرجه الدارقطني وإسناده ساقط، وأخرجه من حديث عليّ رفعه: "من أصل الدين الصلاة خلف كل برّ وفاجر" وإسناده واهٍ، قال الدارقطني: ليس في هذه الأحاديث شيء يثبت، وعن أبي الدرداء رفعه: "لا تكفروا أحدًا من أهل

القبلة، وصلوا خلف كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير" وإسناده ضعيف، وضعَّفه الشيخ الألباني في تخريج أحاديث العقيدة الطحاوية.

1 قال الشافعي: ولو كانت بالرجل تمتمة لا تبين معها القراءة إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر منه، وأكره أن يكون إمامًا، وإن أمَّ أجزأ إذا أيقن أنه قد قرأ ما تجزئه به صلاته، وكذلك الفأفاء أكره أن يؤم، فإن أمَّ أجزأه، وأحب أن لا يكون الإمام آرت ولا ألثغ، وإن صلى لنفسه أجزأه صلاته، وإن لحن في أمِّ القرآن لحَّانًا؛ لأن اللحان قد يحيل معاني القرآن، فإن لم يلحن لحنًا يحيل معنى القرآن أجزأته صلاته، وغن لحن في أم القرآن لحانًا يحيل معن شيء منها لم أر صلاته مجزاة عنه، ولا عمن خلفه، وإن لحن في غيرها كرهتع ولم أر عليه إعادة؛ لأنه لو ترك أم القرآن وأتى بأمّ القرآن رجوت أن تجزئه صلاته، وإذا أجزأته أجزأت من خلفه -إن شاء الله تعالى، وإنَّ لحنه في أمِّ القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته، وأكره أن يكون إمامًا بحال [الأم: 1/ 110] .

2 قال ابن قدامة من الحنابلة: ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب، وكرهه القاسم بن عبد الرحمن والأوزاعي وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ =

এই ইমামের জন্য নারী, হিজড়া, বোবা কিংবা তোতলা হওয়া বৈধ নয়। যদি কোনো নারী বা হিজড়া ইমামতি করে, তবে তাদের পেছনে ইক্তিদা করা পুরুষ ও হিজড়াদের সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি এমন কোনো তোতলা বা বোবা ইমামতি করে যে বর্ণসমূহকে অন্য বর্ণ দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলে, তবে তার পেছনে ইক্তিদাকারীদের সালাত বাতিল হবে; তবে যদি মুকতাদি তার মতো একই ধরনের বোবা বা তোতলামি যুক্ত হয় (তবে তা জায়েজ হবে)। কিরাত ও ফিকহ্ বিষয়ে এই ইমামের সর্বনিম্ন যোগ্যতা হলো তাকে সুরা ফাতিহা মুখস্থ রাখা এবং সালাতের বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়া; কারণ সালাতে এই পরিমাণ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। আর যদি তিনি সম্পূর্ণ কুরআন হিফজকারী হন এবং সকল বিধিবিধান সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হন, তবে তা হবে অধিকতর উত্তম।

যখন এমন একজন ফকিহ (যিনি উত্তম কারী নন) এবং একজন কারী (যিনি ফকিহ নন) একত্র হন, তখন ফকিহ কারীর চেয়ে ইমামতির জন্য বেশি যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, যদি তিনি সুরা ফাতিহা অনুধাবন করতে পারেন; কারণ কুরআনের যতটুকু অংশ সালাতে আবশ্যক তা নির্দিষ্ট, কিন্তু সালাতে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতি বা সমস্যার সমাধান অনির্দিষ্ট।
এই ইমাম এবং তার মুয়াজ্জিনের জন্য ইমামতি ও আজানের বিনিময়ে বাইতুল মাল বা জনকল্যাণ খাত থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ। তবে ইমাম আবু হানিফা এটি নিষিদ্ধ করেছেন।২

...তাদের পেছনে; এবং এই অনুচ্ছেদে ওয়াছিলা বিন আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "তোমরা তোমাদের কিবলাপন্থীদের কাফির বলো না, যদিও তারা কবিরা গুনাহ করে। প্রত্যেক ইমামের পেছনে সালাত আদায় করো, প্রত্যেক আমিরের সাথে জিহাদ করো এবং আহলে কিবলার প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির জানাজা আদায় করো।" এটি ইবনে মাজাহ দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত: "যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তার জানাজা পড়ো এবং যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তার পেছনে সালাত পড়ো।" এটি দারা কুতনী এবং আবু নুয়াইম আল-হিলইয়াতে বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ দুর্বল। দারা কুতনী এটি অন্য এক অগ্রহণযোগ্য সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ সূত্রে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "তিনটি বিষয় সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত: প্রত্যেক ইমামের পেছনে সালাত আদায় করা, তোমার সালাত তোমার জন্য আর তার গুনাহ তার ওপর।" এটি দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত: "দীনের মূল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো প্রত্যেক নেককার ও বদকারের পেছনে সালাত আদায় করা।" এর সনদও দুর্বল। দারা কুতনী বলেন: এসব হাদিসের কোনোটিই সাব্যস্ত বা সুদৃঢ় নয়। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত: "আহলে কিবলার কাউকে কাফির বলো না, প্রত্যেক ইমামের পেছনে সালাত আদায় করো এবং প্রত্যেক আমিরের সাথে জিহাদ করো।" এর সনদ দুর্বল এবং শায়খ আলবানী রহ. আকিদাহ ত্বহাবিয়ার হাদিসসমূহের তাহকিকে একে দুর্বল বলেছেন।
১ ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন: যদি কোনো ব্যক্তির তোতলামি এমন হয় যে কিরাত স্পষ্ট বোঝা যায় না, কিন্তু সে এর চেয়ে বেশি করতে সক্ষম নয়, তবে আমি তার ইমামতি করাকে অপছন্দ করি। তবে সে যদি ইমামতি করে, তবে তা যথেষ্ট হবে যখন সে নিশ্চিত হবে যে সে ততটুকু

কিরাত পড়েছে যা দ্বারা সালাত শুদ্ধ হয়। অনুরূপভাবে উচ্চারণে জড়তাগ্রস্ত (ফাফা) ব্যক্তির ইমামতি করাকেও আমি অপছন্দ করি, তবে সে যদি ইমামতি করে তবে তা যথেষ্ট হবে। আমি পছন্দ করি ইমাম যেন এমন না হন যার উচ্চারণে জড়তা বা তোতলামি আছে। সে যদি নিজের সালাত একা পড়ে তবে তা শুদ্ধ হবে। যদি সে সুরা ফাতিহায় এমন বড় ধরনের ভুল (লাহনে জালি) করে যা অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, তবে আমি তার ও তার পেছনের মুক্তাদিদের সালাত শুদ্ধ মনে করি না। আর যদি সুরা ফাতিহা ছাড়া অন্য স্থানে ভুল করে তবে তা অপছন্দনীয়, কিন্তু তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না; কারণ সে যদি সুরা ফাতিহা ছাড়া অন্য অংশ ছেড়েও দেয় এবং শুধু সুরা ফাতিহা সঠিকভাবে পড়ে তবে আশা করি তার সালাত হয়ে যাবে। আর যখন তার সালাত হয়ে যাবে তখন তার পেছনের লোকদের সালাতও হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি সুরা ফাতিহা বা অন্য কোথাও তার ভুল এমন হয় যা অর্থ পরিবর্তন করে না, তবে তার সালাত হয়ে যাবে, তবে তাকে ইমাম বানানো আমি সর্বাবস্থায় অপছন্দ করি। [আল-উম্ম: ১/১১০]।

২ হাম্বলি মাজহাবের ইবনে কুদামা রহ. বলেন: মাজহাবের প্রকাশ্য মত অনুযায়ী আজানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নয়। কাসিম ইবনুর রহমান, আওজায়ি, আসহাবে রায় (হানাফিগণ) এবং ইবনুল মুনজির একে অপছন্দ করেছেন; কারণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান বিন আবিল আসকে বলেছিলেন: "এবং তুমি এমন একজন মুয়াজ্জিন গ্রহণ করো যে...

(ص: 164)الأحكام السلطانية للماوردي

وَأَمَّا الْمَسَاجِدُ الْعَامَّةُ الَّتِي يَبْنِيهَا أَهْلُ الشَّوَارِعِ وَالْقَبَائِلِ فِي شَوَارِعِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، فَلَا اعْتِرَاضَ لِلسُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ فِي أَئِمَّةِ مَسَاجِدِهِمْ، وَتَكُونُ الْإِمَامَةُ فِيهَا لِمَنْ اتَّفَقُوا عَلَى الرِّضَا بِإِمَامَتِهِ، وَلَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ الرِّضَا بِهِ أَنْ يَصْرِفُوهُ عَنِ الْإِمَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ

حَالُهُ، وَلَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ رِضَاهُمْ بِهِ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا مَكَانَهُ نَائِبًا عَنْهُ، وَيَكُونُ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حَقٌّ بِالِاخْتِيَارِ.

وَإِذَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فِي اخْتِيَارِ إِمَامٍ عُمِلَ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ، فَإِنْ تَكَافَأَ الْمُخْتَلِفُونَ اخْتَارَ السُّلْطَانُ لَهُمْ؛ قَطْعًا لِتَشَاجُرِهِمْ مَنْ هُوَ أَدْيَنُ وَأَسَنُّ وَأَقْرَأُ وَأَفْقَهُ، وَهَلْ يَكُونُ اخْتِيَارُهُ مَقْصُورًا عَلَى الْعَدَدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، أَوْ يَكُونُ عَامًّا فِي جَمِيعِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ يَكُونُ مَقْصُورًا عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمُخْتَلِفِ فِي اخْتِيَارِهِ أَحَدُهُمْ، وَلَا يَتَعَدَّاهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ؛ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى تَرْكِ مَنْ عَدَاهُمْ.

وَالثَّانِي: إِنَّهُ يَخْتَارُ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مَنْ يَرَاهُ لِإِمَامَتِهِ مُسْتَحِقًّا؛ لِأَنَّ السُّلْطَانَ لَا يُضَيَّقُ عَلَيْهِ الِاخْتِيَارُ.

وَإِذَا بَنَى رَجُلٌ مَسْجِدًا لَمْ يَسْتَحِقَّ الْإِمَامَةَ فِيهِ، كَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ سَوَاءً فِي إِمَامَتِهِ وَأَذَانِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ فِيهِ.

وَإِذَا حَضَرَتْ جَمَاعَةٌ مَنْزِلَ رَجُلٍ لِلصَّلَاةِ فِيهِ كَانَ مَالِكُ الْمَنْزِلِ أَحَقَّهُمْ بِالْإِمَامَةِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ دُونَهُمْ فِي الْفَضْلِ، فَإِنْ حَضَرَهُ السُّلْطَانُ كَانَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَحَقَّ مِنَ الْمَالِكِ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ، وَالْمَالِكُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي أَحَقُّ لِاخْتِصَاصِهِ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ.

= مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا". رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن.

ولأنه قربة لفاعله لا يصح إلّا من مسلم، فلم يستأجره عليه كالإمامة. وحكي عن أحمد رواية أخرى أنَّه يجوز أخذ الأجرة عليه، ورخص فيه مالك وبعض الشافعية؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال، ولا نعلم فيه خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه، وهذا قول الأوزاعي والشافعي؛ لأنَّ المسلمين حاجة إليه، وقد لا يوجد متطوع به وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل،

ويرزقه الإمام من الفيء؛ لأنه المعد للمصالح، فهو كأرزاق القضاة والغزاة، وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره؛ لعدم الحاجة. [المغني: 1/ 249] .

আর যে সকল সাধারণ মসজিদ মহল্লাবাসী এবং গোত্রসমূহ তাদের নিজ নিজ এলাকায় ও গোত্রে নির্মাণ করে, তাতে মসজিদের ইমাম নির্ধারণের বিষয়ে সুলতানের হস্তক্ষেপের কোনো অবকাশ নেই। এসব মসজিদে ইমামতি তাঁরই হবে যার ইমামতির বিষয়ে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সন্তুষ্ট হয়েছে। একবার তাঁর ইমামতির বিষয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পর তারা তাঁকে পদচ্যুত করতে পারবে না, যদি না তাঁর অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে। তারা তাঁর সম্মতির পর তাঁর পরিবর্তে কোনো প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবে না। মসজিদের অধিবাসীদেরই ইমাম নির্বাচনের অধিকার থাকবে।

আর যদি মসজিদের অধিবাসীরা ইমাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে মতভেদে লিপ্ত হয়, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে আমল করা হবে। যদি মতবিরোধকারীরা সংখ্যায় সমান হয়, তবে সুলতান তাদের বিবাদ নিরসনের লক্ষ্যে তাদের জন্য একজনকে নির্বাচন করবেন; যিনি অধিক পরহেযগার, বয়োজ্যেষ্ঠ, উত্তম ক্বারী এবং ফকীহ। এখন সুলতানের এই নির্বাচন কি কেবল বিতর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি মসজিদের সকল অধিবাসীদের ক্ষেত্রে সাধারণ হবে? এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি হলো: এটি কেবল সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে যাদের নির্বাচনের বিষয়ে মতভেদ তৈরি হয়েছে এবং অন্যদের মধ্যে তা সম্প্রসারিত হবে না; কারণ তারা অন্যদের বাদ দেওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে।

দ্বিতীয়টি হলো: তিনি মসজিদের সকল অধিবাসীদের মধ্য থেকে যাকেই ইমামতির যোগ্য মনে করবেন তাকেই নির্বাচন করবেন; কারণ সুলতানের নির্বাচনের পরিধি সংকীর্ণ করা যায় না।

আর যদি কোনো ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করে, তবে সে সেখানে ইমামতির ক্ষেত্রে এককভাবে কোনো অগ্রাধিকার পাবে না। বরং সে এবং মসজিদের অন্যান্য প্রতিবেশীরা ইমামতি ও আযানের ক্ষেত্রে সমান বলে গণ্য হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন: সে সেখানে ইমামতি ও আযানের ক্ষেত্রে অধিক হকদার।

যখন কোনো জামাত কারো বাড়িতে নামাজ পড়ার জন্য একত্রিত হয়, তখন সেই গৃহকর্তাই সেখানে ইমামতির সবচেয়ে বেশি হকদার, যদিও গুণের বিচারে সে অন্যদের তুলনায় কম মর্যাদার অধিকারী হয়। আর যদি সেখানে সুলতান উপস্থিত থাকেন, তবে দুটি মতের মধ্যে

একটি অনুযায়ী সুলতানই গৃহকর্তার চেয়ে অধিক হকদার, কারণ তাঁর কর্তৃত্ব ব্যাপক। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী গৃহকর্তাই অধিক হকদার, কারণ নিজের মালিকানাধীন সম্পদে হস্তক্ষেপের বিশেষ অধিকার তাঁরই রয়েছে।

"...এমন মুয়াজ্জিন (নিযুক্ত করো) যে তার আযানের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না।" এটি আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিজি একে হাসান হাদিস বলেছেন।

আর যেহেতু এটি একটি ইবাদত যা মুসলিম হওয়া ছাড়া শুদ্ধ হয় না, তাই ইমামতির মতো এর বিনিময়েও পারিশ্রমিক গ্রহণ সঠিক নয়। ইমাম আহমাদ থেকে অন্য একটি বর্ণনা বর্ণিত আছে যে, এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েজ। ইমাম মালেক এবং কিছু শাফেয়ী আলেমও এতে শিথিলতা দেখিয়েছেন; কারণ এটি একটি সুনির্ধারিত কাজ যার বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় ভাতা নেওয়া জায়েজ, ফলে অন্যান্য কাজের মতো এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণও জায়েজ হবে। তবে এর বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় ভাতা গ্রহণের বৈধতার ক্ষেত্রে আমাদের জানা মতে কোনো মতভেদ নেই। এটি ইমাম আওজায়ি ও শাফেয়ির অভিমত; কারণ মুসলমানদের এর প্রয়োজন রয়েছে, আর অনেক সময় স্বেচ্ছাসেবী পাওয়া যায় না। যদি ভাতা না দেওয়া হয় তবে আযান ব্যবস্থা অকেজো হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ইমাম তাকে 'ফাই' (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে ভাতা প্রদান করবেন; কারণ এটি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য নির্ধারিত। এটি বিচারক ও যোদ্ধাদের ভাতার মতোই। তবে যদি কোনো স্বেচ্ছাসেবী পাওয়া যায়, তবে অন্য কাউকে ভাতা দেওয়া হবে না; কারণ তখন আর প্রয়োজন নেই। [আল-মুগনি: ১/২৪৯]।

(ص: 165)الأحكام السلطانية للماوردي

فَصْلٌ:

وَأَمَّا الْإِمَامَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ تَقْلِيدِهَا. فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ إِلَى أَنَّهَا مِنَ الْوِلَايَاتِ الْوَاجِبَاتِ. وَأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لَا تَصِحُّ إِلَّا

بِحُضُورِ السُّلْطَانِ، أَوْ مَنْ يَسْتَنِيبُهُ فِيهَا، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه، وَفُقَهَاءُ الْحِجَازِ إِلَى أَنَّ التَّقْلِيدَ فِيهَا نَدْبٌ، وَأَنَّ حُضُورَ السُّلْطَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهَا.

فَإِنْ أَقَامَهَا الْمُصَلُّونَ عَلَى شَرَائِطِهَا انْعَقَدَتْ وَصَحَّتْ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِيهَا عَبْدًا وَإِنْ لَمْ تَنْعَقِدْ وِلَايَتُهُ.

وَفِي جَوَازِ إِمَامَةِ الصَّبِيِّ قَوْلَانِ، وَلَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا فِي وَطَنٍ مُجْتَمِعِ الْمَنَازِلِ يَسْكُنُهُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ، لَا يَظْعَنُونَ عَنْهُ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا، إِلَّا ظَعْنَ حَاجَةٍ سَوَاءٌ كَانَ مِصْرًا أَوْ قَرْيَةً.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَخْتَصُّ الْجُمُعَةُ بِالْأَمْصَارِ، وَلَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِي الْقُرَى، وَاعْتُبِرَ الْمِصْرُ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ سُلْطَانٌ يُقِيمُ الْحُدُودَ.

وَقَاضٍ يُنَفِّذُ الْأَحْكَامَ، وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ؛ فَأَسْقَطَهَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُمْ، وَأَوْجَبَهَا الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِمْ إِذَا سَمِعُوا نِدَاءَهَا مِنْهُ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه إِلَى أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ، لَيْسَ فِيهِمُ امْرَأَةٌ وَلَا عَبْدٌ وَلَا مُسَافِرٌ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي إِمَامِهِمْ، هَلْ يَكُونُ زَائِدًا عَلَى الْعَدَدِ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ سِوَى الْإِمَامِ، وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ مَعَ الْإِمَامِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ1 وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ2: تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْ عَشَرَ سِوَى الْإِمَامِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

---

1 هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الزهري، أحد الفقهاء والمحدثين، والأعلام التابعين بالمدينة.

رأى عشرة من الصحابة -رضوان الله عليهم، وروى عنه جماعة من الأئمة، منهم: مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري.

2 هو أبو عبد الله محمد بن فرقد الشيباني بالولاء، الفقيه الحنفي، أصله من قرية على باب دمشق في وسط الغوطة اسمها حرستا، وقدم أبوه من الشام إلى العراق، وأقام بواسط، فولد له بها محمد المذكور، ونشأ بالكوفة، وطلب الحديث، ولقي جماعة من أعلام الأئمة، وحضر مجلس أبي حنيفة سنتين، ثم تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وصنَّف الكتب الكثيرة النادرة، منها الجامع الكبير والجامع الصغير وغيرهما، =

পরিচ্ছেদ:

জুমার সালাতে ইমামতির বিষয়ে ফকিহগণ এর জন্য ইমাম নিয়োগের আবশ্যকতা নিয়ে মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা এবং ইরাকের আলেমগণের মতে এটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক শাসনতান্ত্রিক দায়িত্বের (বিলায়াত) অন্তর্ভুক্ত এবং সুলতান বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতি ছাড়া জুমার সালাত সহিহ হবে না। ইমাম শাফিয়ি (রা.) এবং হিজাজের ফকিহগণের মতে এতে ইমাম নিয়োগ করা মুস্তাহাব এবং এতে সুলতানের উপস্থিতি শর্ত নয়।

যদি মুসল্লিগণ জুমার শর্তাবলি মেনে সালাত কায়েম করেন, তবে তা যথাযথভাবে আদায় হবে এবং সহিহ বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় ইমাম ক্রীতদাস হওয়াও জায়েজ, যদিও তার শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব (বিলায়াত) সাব্যস্ত হয় না।

নাবালকের ইমামতির বৈধতা নিয়ে দুটি মত রয়েছে। জুমার সালাত কেবল এমন লোকালয়ে কায়েম করা জায়েজ যেখানে ঘরবাড়ি পুঞ্জীভূত এবং যেখানে জুমার যোগ্য ব্যক্তিরা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন; তারা প্রয়োজন ছাড়া শীত বা গ্রীষ্মে সেখান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হন না, চাই তা শহর হোক বা গ্রাম।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: জুমা কেবল বড় শহরের সাথে নির্দিষ্ট, গ্রামে জুমা কায়েম করা জায়েজ নয়। তার মতে শহর হওয়ার মাপকাঠি হলো সেখানে এমন সুলতান বা শাসক থাকতে হবে যিনি দণ্ডবিধি কার্যকর করবেন।

এবং এমন বিচারক থাকবেন যিনি বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। শহরের বাইরে বসবাসকারীদের ওপর জুমা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে; আবু হানিফা তাদের

ওপর থেকে জুমার আবশ্যকতা তুলে দিয়েছেন, আর শাফিয়ি তাদের ওপর এটি ওয়াজিব করেছেন যদি তারা শহর থেকে আজান শুনতে পায়।
কতজন সদস্যের উপস্থিতিতে জুমা সংঘটিত হবে সে বিষয়ে ফকিহগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফিয়ি (রা.)-এর মতে জুমার যোগ্য কমপক্ষে চল্লিশজন পুরুষ না হলে জুমা হবে না, যাদের মধ্যে কোনো নারী, ক্রীতদাস বা মুসাফির থাকবে না।
ইমাম শাফিয়ি-এর অনুসারীগণ তাদের ইমামের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, ইমাম কি এই সংখ্যার অতিরিক্ত হবেন নাকি তাদেরই একজন হবেন। তাদের কেউ কেউ মনে করেন ইমাম ছাড়া চল্লিশজন হওয়া জরুরি, তবে তাদের অধিকাংশের মতে ইমামসহ চল্লিশজন হওয়া জায়েজ।
যুহরী এবং মুহাম্মদ ইবনুল হাসান বলেছেন: ইমাম ছাড়া বারোজন লোক হলে জুমা সহিহ হবে।
আবু হানিফা...

---

১. তিনি হলেন আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আল-হারিস ইবনে যুহরা আল-যুহরী। তিনি মদিনার অন্যতম ফকিহ, মুহাদ্দিস এবং প্রখ্যাত তাবেয়ি। তিনি দশজন সাহাবিকে (রা.) দেখেছেন। ইমাম মালিক ইবনে আনাস, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ এবং সুফিয়ান সাওরীসহ একদল ইমাম তার থেকে বর্ণনা করেছেন।
২. তিনি হলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ফারকাদ আশ-শাইবানি (বিলায়াতের সূত্রে), প্রখ্যাত হানাফি ফকিহ। তার আদি নিবাস দামেস্কের ফটকের কাছে গুতার মধ্যবর্তী 'হারাসতা' নামক গ্রামে। তার পিতা সিরিয়া থেকে ইরাকে এসে ওয়াসিতে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই মুহাম্মদের জন্ম হয়। তিনি কুফায় লালিত-পালিত হন এবং হাদিস অন্বেষণ করেন। তিনি প্রখ্যাত ইমামদের এক জামাতের সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি দুই বছর আবু হানিফার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন এবং এরপর আবু হানিফার ছাত্র আবু ইউসুফের নিকট ফিকহ শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি অনেক দুর্লভ গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে আল-জামি আল-কাবীর এবং আল-জামি আস-সাগীর অন্যতম।

وَالْمُزَنِيُّ: تَنْعَقِدُ بِأَرْبَعَةٍ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ، وَقَالَ اللَّيْثُ1 وَأَبُو يُوسُفَ: تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ.

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ2: تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ كَسَائِرِ الْجَمَاعَاتِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا اعْتِبَارَ بِالْعَدَدِ فِي انْعِقَادِهَا، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ أَنْ يَكُونُوا عَدَدًا تُبْنَى لَهُ الْأَوْطَانُ غَالِبًا.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُقَامَ الْجُمُعَةُ فِي السَّفَرِ وَلَا خَارِجَ الْمِصْرِ إِلَّا أَنْ يَتَّصِلَ بِنَاؤُهُ.

وَإِذَا كَانَ الْمِصْرُ جَامِعًا لِقُرًى قَدِ اتَّصَلَ بِنَاؤُهَا حَتَّى اتَّسَعَ بِكَثْرَةٍ كَبَغْدَادَ، جَازَ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مَوَاضِعِهِ الْقَدِيمَةِ، وَلَا يَمْنَعُ اتِّصَالُ الْبُنْيَانِ مِنْ إِقَامَتِهَا فِي مَوَاضِعِهَا.

وَإِنْ كَانَ الْمِصْرُ وَاحِدًا فِي مَوْضُوعِ الْأَصْلِ وَجَامِعُهُ يَسَعُ جَمِيعَ أَهْلِهِ كَمَكَّةَ، لَمْ يَجُزْ أَنْ تُقَامَ الْجُمُعَةُ فِيهِ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْهُ.

وَإِنْ كَانَ الْمِصْرُ وَاحِدًا مُتَّصِلَ الْأَبْنِيَةِ لَا يَسَعُ جَامِعُهُ جَمِيعَ أَهْلِهِ لِكَثْرَتِهِمْ كَالْبَصْرَةِ، فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي جَوَازِ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ بِكَثْرَةِ أَهْلِهِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَوَازِهَا، وَأَبَاهُ آخَرُونَ وَقَالُوا: إِنْ ضَاقَ بِهِمُ اتَّسَعَتْ لَهُمُ الطُّرُقَاتُ، فَلَمْ يُضْطَرُّوا إِلَى تَفْرِيقِ الْجُمُعَةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهُ.

= وله في مصنفاته المسائل المشكلة خصوصًا المتعلقة بالعربية. ونشر علم أبي حنيفة، وكان من أفصح الناس، وكان إذا تكلَّم خُيِّلَ لسامعه أنَّ القرآن نزل بلغته، ولما دخل الإمام الشافعي رضي الله عنه بغداد كان بها، وجرى بينهما مجالس ومسائل بحضرة هارون الرشيد، وقال الشافعي: ما رأيت أحدًا يسأل عن مسألة فيها نظر إلّا تبينت الكراهة في وجهه، إلّا محمد بن الحسن، وقال أيضًا: حملت من علم محمد بن الحسن وقر بعير.

1 هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، مولاهم الأصبهاني المصري الأصل، أحد الأعلام، شيخ إقليم مصر، ولد سنة أربع وتسعين، وتوفّي سنة خمس وأربعين ومائة، كان كبير مصر ورئيسها ومحتشمها وأميز من بها في عصره؛ بحيث إن النائب والقاضي تحت أمره ومشورته، وكان الشافعي يتأسَّف على فوات لقيه، وكان يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الشعر والحديث، حسن المذاكرة. وقال أحمد ابن أخي وهب: سمعت الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك إلّا أنَّ أصحابه لم يقوموا به؛ ومثله عن ابن بكير.

2 هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه البغدادي صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وناقل الأقوال القديمة عنه، وكان أحد الفقهاء الأعلام، والثقات المأمونين في الدين، له الكتب المصنَّفة في الأحكام، جمع فيها بين الحديث والفقه، وكان أول اشتغاله بمذهب أهل الرأي حتى قدِمَ الشافعي العراق، فاختلف إليه واتبعه، ورفض مذهبه الأول، ولم يزل على ذلك إلى أن توفّي لثلاث بقين من صفر سنة ست وأربعين ومائتين ببغداد. قال أحمد بن حنبل: هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري، أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة.

ইমাম আল-মুযানী বলেন: জুমুআ চারজন ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়, যাদের একজন ইমাম। আর ইমাম আল-লায়স এবং আবু ইউসুফ বলেন: জুমুআ তিনজনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়, যাদের একজন ইমাম।

আবু সাওর বলেন: অন্যান্য সাধারণ জামাতের মতো জুমুআও দুজনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। ইমাম মালিক বলেন: জুমুআ অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার আবশ্যকতা নেই; বরং ধর্তব্য হলো এমন একদল জনসমষ্টির উপস্থিতি, যাদের দ্বারা সাধারণত স্থায়ী জনপদ গড়ে ওঠে।

সফর অবস্থায় কিংবা শহরের সীমানার বাইরে জুমুআ কায়েম করা বৈধ নয়, যদি না শহরের স্থাপনাগুলো তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত থাকে।

যদি কোনো শহর এমন হয় যে তা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে এবং তার স্থাপনাগুলো অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত হয়ে বাগদাদের মতো বিশাল আকার ধারণ করেছে, তবে

তার প্রাচীন স্থানগুলোতে জুমুআ কায়েম করা জায়েজ। আর স্থাপনাগুলোর অবিচ্ছিন্নতা ঐ সকল প্রাচীন স্থানে জুমুআ কায়েমের পথে কোনো বাধা হবে না।

যদি কোনো শহর তার মূল কাঠামোর দিক থেকে একক হয় এবং তার জামে মসজিদ মক্কার মতো সকল অধিবাসীকে সংকুলান করতে সক্ষম হয়, তবে সেখানে একটি স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোথাও জুমুআ কায়েম করা জায়েজ নয়।

শহরটি যদি অবিচ্ছিন্ন স্থাপনাবিশিষ্ট একটি একক শহর হয় কিন্তু জনবাহুল্যের কারণে তার জামে মসজিদ সকল অধিবাসীকে সংকুলান করতে না পারে যেমন বসরা, তবে প্রয়োজনের খাতিরে সেখানে একাধিক স্থানে জুমুআ কায়েম করার বৈধতা নিয়ে ইমাম শাফেয়ীর অনুসারীগণ মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ একে জায়েজ বলেছেন, আবার অন্যরা তা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন: যদি মসজিদ তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়, তবে রাস্তাঘাট তো তাদের জন্য প্রশস্ত রয়েছে; সুতরাং তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে জুমুআকে বিভক্ত করতে বাধ্য নন।

তাঁর রচনাবলীতে বিশেষ করে আরবি ভাষা সংক্রান্ত জটিল মাসআলাসমূহ বিদ্যমান। তিনি ইমাম আবু হানিফার ইলম প্রচার করেছেন এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাবলীল ও স্পষ্টভাষী। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন শ্রোতাদের মনে হতো যেন কুরআন তাঁর ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রা.) যখন বাগদাদে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সেখানে অবস্থান করছিলেন এবং খলিফা হারুনুর রশিদের উপস্থিতিতে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন বৈঠক ও ইলমি মাসআলা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ইমাম শাফেয়ী বলেন: আমি এমন কোনো ব্যক্তি দেখিনি যাকে গবেষণামূলক কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তাঁর চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটে ওঠেনি, কেবল মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ব্যতীত। তিনি আরও বলেন: আমি মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের কাছ থেকে এক উট বোঝাই ইলম অর্জন করেছি।

১. তিনি হলেন আল-লায়স ইবন সাদ ইবন আবদুর রহমান আল-ফাহমি, তাঁদের মুক্তদাস, মূলত আসফাহানি ও মিশরীয়। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ইমামদের একজন এবং মিশরের প্রধান শায়খ। তিনি ৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন মিশরের নেতৃস্থানীয় এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব; এমনকি তৎকালীন নায়েব ও কাজীও তাঁর নির্দেশ ও পরামর্শের অনুগত ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে না পারায় আফসোস করতেন। তিনি কুরআন ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং প্রচুর

হাদিস ও কবিতা মুখস্থ রাখতেন। তাঁর আলোচনা করার শৈলী ছিল অত্যন্ত চমৎকার। ইবনে আখি ওয়াহাব বলেন: আমি শাফেয়ীকে বলতে শুনেছি যে, ইমাম লায়স ইমাম মালিকের চেয়েও বড় ফকিহ ছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুসারীরা তাঁর ইলমকে সঠিকভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি; ইবনে বুকাইর থেকেও অনুরুপ বর্ণিত হয়েছে।
২. তিনি হলেন ইব্রাহিম ইবন খালিদ ইবন আবিল ইয়ামান আল-কালবি, বাগদাদের প্রখ্যাত ফকিহ এবং ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য ও তাঁর কাদীম (পুরাতন) মতের বর্ণনাকারী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চমর্যাদার ফকিহ এবং দ্বীনের বিষয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব। আহকাম বা বিধিবিধান বিষয়ে তাঁর সংকলিত বহু কিতাব রয়েছে যেখানে তিনি হাদিস ও ফিকহের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। শুরুতে তিনি 'আহলুর রায়'-এর মাজহাবের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ইরাকে আসার পর তিনি তাঁর সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর অনুসারী হয়ে পূর্বের মাজহাব ত্যাগ করেন। ২৪৬ হিজরীর সফর মাসের শেষ তিন দিন বাকি থাকতে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত তিনি এই পথেই অবিচল ছিলেন। আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন: তিনি আমার কাছে সুফিয়ান সাওরির সমতুল্য; আমি তাকে গত পঞ্চাশ বছর ধরে সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে জানি।

(ص: 167)الأحكام السلطانية للماوردي

وَإِنْ أُقِيمَتِ الْجُمُعَةُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي مِصْرٍ قَدْ مُنِعَ أَهْلُهُ مِنْ تَفْرِيقِ الْجُمُعَةِ، فِيهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: إِنَّ الْجُمُعَةَ لِأَسْبَقِهِمَا بِإِقَامَتِهَا، وَعَلَى الْمَسْبُوقِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ظُهْرًا.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّ الْجُمُعَةَ لِلْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ الَّذِي يَحْضُرُهُ السُّلْطَانُ سَابِقًا كَانَ أَوْ مَسْبُوقًا، وَعَلَى مَنْ صَلَّوْا فِي الْأَصْغَرِ إِعَادَةُ صَلَاتِهِمْ ظُهْرًا، وَلَيْسَ لِمَنْ قُلِّدَ إِمَامَةَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَؤُمَّ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.

وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ قُلِّدَ إِمَامَةَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، هَلْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنَعَهُ مِنْهَا مَنْ جَعَلَ الْجُمُعَةَ فَرْدًا مُبْتَدَأً، وَجَوَّزَهَا لَهُ مَنْ جَعَلَهَا ظُهْرًا مَقْصُورًا.

وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ يَرَى أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا، وَكَانَ الْمَأْمُومُونَ وَهُمْ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا يَرَوْنَ انْعِقَادَ الْجُمُعَةِ بِهِمْ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّهُمْ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا، وَالْمَأْمُومُونَ لَا يَرَوْنَهُ وَهُمْ أَقَلُّ، لَمْ يَلْزَمْ الْإِمَامَ وَلَا الْمَأْمُومِينَ إِقَامَتُهَا؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ لَا يَرَوْنَهُ، وَالْإِمَامَ لَمْ يَجِدْ مَعَهُ مَنْ يُصَلِّيهَا.

وَإِذَا أَمَرَ السُّلْطَانُ الْإِمَامَ فِي الْجُمُعَةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ، وَإِنْ كَانَ يَرَاهُ مَذْهَبًا؛ لِأَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَرْبَعِينَ، وَمَصْرُوفٌ عَمَّا دُونَهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُصَلِّيهَا لِصَرْفِ وِلَايَتِهِ عَنْهَا، وَإِذَا أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يُصَلِّيَ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ، وَهُوَ لَا يَرَاهُ، فَفِي وِلَايَتِهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا إِنَّهَا بَاطِلَةٌ لِتَعَذُّرِهَا مِنْ جِهَتِهِ.

وَالثَّانِي: إِنَّهَا صَحِيحَةٌ، وَيَسْتَخْلِفُ عَلَيْهَا مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمْ.

এবং যদি এমন কোনো নগরের দুই স্থানে জুমুআ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে অধিবাসীদের জন্য জুমুআ বিভক্ত করা নিষিদ্ধ, তবে এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি হলো: জুমুআ তাদের জন্য বৈধ হবে যারা তা সম্পাদনে অগ্রগামী হয়েছে, আর যারা পরে শুরু করেছে তাদের জন্য যুহরের সালাত পুনরায় আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অভিমত: জুমুআ সেই জামে মসজিদের জন্য নির্ধারিত হবে যেখানে সুলতান উপস্থিত থাকেন, তা আগে অনুষ্ঠিত হোক বা পরে। আর যারা অপেক্ষাকৃত ছোট মসজিদে সালাত আদায় করেছে, তাদের ওপর সালাত যুহর হিসেবে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। আর যাকে কেবল জুমুআর ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ইমামতি করার অধিকার নেই।

আর যাকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে জুমুআর সালাতে ইমামতির অধিকার পাবে কি না সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যারা জুমুআকে একটি স্বতন্ত্র ও

নতুন ইবাদত মনে করেন তারা তাকে ইমামতি থেকে বিরত রেখেছেন, আর যারা একে সংক্ষিপ্ত যুহর হিসেবে গণ্য করেন তারা তার জন্য এটি বৈধ বলেছেন।

যদি জুমুআর ইমাম মনে করেন যে চল্লিশ জন পুরুষের কম উপস্থিতিতে জুমুআ সম্পন্ন হয় না, অথচ মুক্তাদিগণ—যাদের সংখ্যা চল্লিশের কম—মনে করেন যে তাদের মাধ্যমেই জুমুআ সম্পন্ন হবে, তবে ইমামের জন্য তাদের ইমামতি করা বৈধ নয়। এমতাবস্থায় ইমামের ওপর ওয়াজিব হলো তাদের মধ্য থেকে একজনকে ইমাম হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করা। আর যদি ইমাম মনে করেন যে চল্লিশ জনের কম লোক থাকলেও জুমুআ সম্পন্ন হয়, কিন্তু মুক্তাদিগণ—যারা সংখ্যায় কম—তা মনে না করেন, তবে ইমাম বা মুক্তাদি কারো ওপরই তা কায়েম করা আবশ্যক নয়; কারণ মুক্তাদিগণ একে বৈধ মনে করেন না, আর ইমাম তার সাথে সালাত আদায় করার মতো কাউকে পাচ্ছেন না।

যদি সুলতান জুমুআর ইমামকে নির্দেশ দেন যে তিনি যেন চল্লিশ জনের কম লোক নিয়ে সালাত আদায় না করেন, তবে তার জন্য চল্লিশের কম লোক নিয়ে সালাত আদায় করা বৈধ হবে না, যদিও এটি তার ব্যক্তিগত মাযহাব অনুযায়ী বৈধ হয়; কারণ তার কর্তৃত্ব কেবল চল্লিশ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং এর কম সংখ্যার ক্ষেত্রে তা রহিত করা হয়েছে। তবে তিনি তাদের মধ্য থেকে এমন কাউকে স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন যিনি তা পড়াবেন, কারণ এক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব অপসারিত হয়েছে। আর যদি সুলতান তাকে চল্লিশ জনের কম লোক নিয়ে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দেন অথচ ইমাম নিজে তা বৈধ মনে না করেন, তবে তার কর্তৃত্বের বিষয়ে দুটি দিক রয়েছে:

প্রথমটি হলো: এটি বাতিল, কারণ তার পক্ষ থেকে তা সম্পাদন করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়টি হলো: এটি সঠিক, এবং তিনি তাদের মধ্য থেকে এমন একজনকে স্থলাভিষিক্ত করবেন যিনি একে বৈধ মনে করেন।

فَصْلٌ:

وَأَمَّا الْإِمَامَةُ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ مِثْلِ الْجُمُعَةِ فَخَمْسٌ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ، وَالْخُسُوفَيْنِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَتَقْلِيدُ الْإِمَامَةِ فِيمَا نُدِبَ لِجَوَازِهَا جَمَاعَةً وَفُرَادَى، وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِهَا، فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهَا مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ.

وَذَهَبَ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ، وَلَيْسَ لِمَنْ قُلِّدَ إِمَامَةَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْ إِمَامَةَ الْجُمُعَةِ حَقٌّ فِي إِقَامَتِهَا، إِلَّا أَنْ يُقَلَّدَ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ فَتَدْخُلُ فِي غَيْرِهَا.

فَأَمَّا صَلَاةُ الْعِيدِ: فَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا، وَيُخْتَارُ تَعْجِيلُ الْأَضْحَى وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى حِينِ أَخْذِهِمْ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ، وَيَخْتَصُّ عِيدُ الْأَضْحَى بِالتَّكْبِيرِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ؛ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى بَعْدِ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُصَلِّي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَالْجُمُعَةَ بَعْدَهَا اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ فِيهِمَا.

وَيَخْتَصُّ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ بِالتَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَدَدِهَا؛ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه إِلَى أَنَّهُ يَزِيدُ فِي الْأُولَى سَبْعًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا. وَقَالَ مَالِكٌ: يَزِيدُ فِي الْأُولَى سِتًّا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى ثَلَاثًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَيَعْمَلُ الْإِمَامُ فِي هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ، وَلَيْسَ لِمَنْ وَلَّاهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ، بِخِلَافِ الْعَدَدِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّ الْوِلَايَةِ، وَلَا يَصِيرُ بِذِكْرِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ خَاصَّ الْوِلَايَةِ فَافْتَرَقَا.

فَأَمَّا صَلَاةُ الْخُسُوفَيْنِ1: فَيُصَلِّيهِمَا مَنْ نَدَبَهُ السُّلْطَانُ لَهُمَا أَوْ مَنْ عَمَّتْ وِلَايَتُهُ فَاشْتَمَلَتْ عَلَيْهِمَا، وَهِيَ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَقِيَامَانِ، يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا، فَيَقْرَأُ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى سِرًّا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ بِقَدْرِهَا

مِنْ غَيْرِهَا، وَيَرْكَعُ مُسَبِّحًا بِقَدْرِ مِائَةِ آيَةٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ مُنْتَصِبًا وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ أَوْ بِقَدْرِهَا، وَيَرْكَعُ مُسَبِّحًا بِقَدْرِ

---

1 يعني: صلاة الخسوف وصلاة الكسوف.

পরিচ্ছেদ:

আর জুমুআর ন্যায় সুন্নাত নামাজসমূহে ইমামতির দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি পাঁচ প্রকার: দুই ঈদের নামাজ, দুই গ্রহণের (সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ) নামাজ, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনার (ইসতিসকা) নামাজ, এবং সেই সকল সুন্নাত নামাজের ইমামতি যা জামাতে বা একাকী উভয়ভাবে আদায় করা বৈধ। এই নামাজগুলোর বিধানের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। শাফিঈর একদল অনুসারী মনে করেন যে, এগুলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

তাদের মধ্যে অন্য একদল মনে করেন যে, এগুলো ফরযে কিফায়া। যাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা জুমুআর নামাজের ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এই নামাজগুলো আদায় করার কোনো অধিকার তার নেই, যদি না তাকে সকল নামাজের সাধারণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়; সেক্ষেত্রে এগুলো অন্যান্য নামাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

ঈদের নামাজের বিষয় হলো: এর সময় সূর্যোদয় থেকে দ্বিপ্রহর (সূর্য ঢলে পড়া) পর্যন্ত। ঈদুল আযহার নামাজ দ্রুত আদায় করা এবং ঈদুল ফিতরের নামাজ বিলম্ব করা পছন্দনীয়। মানুষ দুই ঈদের রাতে সূর্যাস্তের পর থেকে ঈদের নামাজ শুরু করা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করবে। ঈদুল আযহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ফরয নামাজসমূহের পরে তাকবীর পাঠ করা; যা নহরের দিন যোহরের নামাজের পর থেকে আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিনের ফজরের নামাজের পর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। উভয় ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণে দুই ঈদের নামাজ খুতবার আগে এবং জুমুআর নামাজ খুতবার পরে আদায় করা হবে।

দুই ঈদের নামাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ। এগুলোর সংখ্যার ব্যাপারে ফকীহগণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (রাযি.) মনে করেন যে, তিনি প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অতিরিক্ত সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে কিয়ামের তাকবীর ছাড়া কিরাআতের পূর্বে অতিরিক্ত পাঁচটি তাকবীর পাঠ করবেন। ইমাম মালিক বলেন: প্রথম রাকআতে অতিরিক্ত ছয়টি এবং দ্বিতীয় রাকআতে কিয়ামের তাকবীর ছাড়া পাঁচটি তাকবীর পাঠ করবেন। ইমাম আবু হানীফা বলেন: তিনি প্রথম রাকআতে

কিরাআতের আগে তিনটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে কিরাআতের আগে কিয়ামের তাকবীর ছাড়া আরও চারটি তাকবীর পাঠ করবেন। ইমাম এই অতিরিক্ত তাকবীরগুলোর ক্ষেত্রে তার নিজস্ব রায় ও ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করবেন। যিনি তাকে নিয়োগ দিয়েছেন তার নিজের অভিমত অনুযায়ী ইমামকে বাধ্য করার অধিকার নেই; জুমুআর নামাজের সংখ্যার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কারণ জুমুআর নামাজের ক্ষেত্রে সংখ্যার উল্লেখ করার দ্বারা সেটি একটি বিশেষ দায়িত্ব বা বিশেষ এখতিয়ারে পরিণত হয়, কিন্তু ঈদের নামাজের তাকবীরের উল্লেখ করার দ্বারা তা বিশেষ এখতিয়ারে পরিণত হয় না। ফলে এই দুইয়ের বিধান পৃথক হয়ে গেছে। আর দুই গ্রহণের নামাজের বিষয় হলো: সুলতান যাকে এই নামাজের জন্য মনোনীত করেছেন অথবা যার দায়িত্ব ব্যাপক ও সাধারণ এবং যার অধীনে এই নামাজগুলোও অন্তর্ভুক্ত, তিনি তা আদায় করবেন। এটি দুই রাকআত নামাজ, যার প্রতি রাকআতে দুটি রুকু ও দুটি কিয়াম রয়েছে। তিনি এতে কিরাআত দীর্ঘ করবেন। প্রথম রাকআতের প্রথম কিয়ামে সূরা ফাতিহার পর সূরা বাকারাহ অথবা অন্য সূরা থেকে তার সমপরিমাণ অংশ নীরবে পাঠ করবেন। এরপর রুকু করবেন এবং প্রায় একশত আয়াত পাঠ করার সময় পরিমাণ তাসবীহ পাঠ করবেন। অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়াবেন এবং সূরা ফাতিহার পর সূরা আলে ইমরান অথবা তার সমপরিমাণ অংশ পাঠ করবেন। এরপর তাসবীহ পাঠরত অবস্থায় রুকু করবেন প্রায়...

---

১ অর্থাৎ: চন্দ্রগ্রহণের নামাজ এবং সূর্যগ্রহণের নামাজ।

(ص: 169)الأحكام السلطانية للماوردي

ثَمَانِينَ آيَةً يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ، يَقْرَأُ فِي قِيَامِهَا وَيُسَبِّحُ فِي رُكُوعِهَا بِثُلُثَيْ مَا قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَهَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَيُصَلِّي لِخُسُوفِ الْقَمَرِ كَصَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ جَهْرًا؛ لِأَنَّهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلِّي لِخُسُوفِ الْقَمَرِ كَصَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ1.

فَأَمَّا صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ: فَمَذْهُوبٌ إِلَيْهَا عِنْدَ انْقِطَاعِ الْمَطَرِ وَخَوْفِ الْجَدْبِ يَتَقَدَّمُ مَنْ قُلِّدَهَا بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَهَا، وَالْكَفِّ فِيهَا عَنِ التَّظَالُمِ وَالتَّخَاصُمِ، وَيُصْلِحُ فِيهَا بَيْنَ الْمُتَشَاجِرَيْنِ وَالْمُتَخَاصِمِينَ وَالْمُتَهَاجِرَيْنِ، وَهِيَ كَصَلَاةِ الْعِيدِ فِي وَقْتِهَا.

وَإِذَا قُلِّدَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي عَامٍ جَازَ مَعَ إِطْلَاقِ وِلَايَتِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ عَامٍ مَا لَمْ يُصْرَفْ.

وَإِذَا قُلِّدَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ فِي عَامٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعَ إِطْلَاقِ وِلَايَتِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ يُقَلَّدَ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ رَاتِبَةٌ وَصَلَاةَ الْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ عَارِضَةٌ.

وَإِذَا مُطِرُوا وَهُمْ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ أَتَمُّوهَا، وَخَطَبَ بَعْدَهَا شُكْرًا، وَلَوْ مُطِرُوا قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا لَمْ يُصَلُّوا، وَشَكَرُوا اللَّهَ تَعَالَى بِغَيْرِ خُطْبَةٍ، وَكَذَلِكَ فِي الْخُسُوفِ إِذَا انْجَلَى، وَلَوْ اقْتَصَرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

---

1 قال ابن قدامة في المغني: الكسوف والخسوف شيء واحد، وكلاهما قد وردت به الأخبار، وجاء القرآن بلفظ الخسوف.

مسألة: قال أبو القاسم: وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى، وصلاة الكسوف ثابتة، ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافًا، وأكثر أهل العلم على أنَّها مشروعة لخسوف القمر، فعله ابن عباس، وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق. وقال مالك: ليس لكسوف القمر سُنَّة. وحكى ابن عبد البر عنه وعن أبي حنيفة أنهما قالا: يصلي الناس لخسوف القمر وحدانًا ركعتين ركعتين، ولا يصلون جماعة؛ لأن في خروجهم إليها مشقة.

ولنا أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا" متفق عليه، فأمر بالصلاة لهما أمرًا واحدًا، وعن ابن عباس أَنَّه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: إنما صليت لأنِّي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.

ولأنه أحد الكسوفين فأشبه كسوف الشمس، ويسنّ فعلها جماعة وفرادى، وبهذا قال مالك والشافعي.

وحكي عن الثوري أنه قال: إن صلاها الإمام صلوها معه وإلا فلا تصلوا. [المغني: 2/ 142] .

আশিটি আয়াত (পাঠ করবেন) এবং অন্যান্য নামাজের ন্যায় দুটি সিজদা করবেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাআতে অনুরূপ করবেন; এর কিয়ামে (কিরাত) পাঠ করবেন এবং রুকুতে তাসবিহ পাঠ করবেন প্রথম রাকাআতে যা পাঠ বা তাসবিহ করেছেন তার দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ। এরপর খুতবা প্রদান করবেন।

আবু হানিফা রহ. বলেন: অন্যান্য নামাজের ন্যায় দুই রাকাআত নামাজ পড়বেন। আর চন্দ্রগ্রহণের নামাজ সূর্যগ্রহণের নামাজের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে পড়বেন; কারণ এটি রাতের নামাজের অন্তর্ভুক্ত। মালিক রহ. বলেন: চন্দ্রগ্রহণের জন্য সূর্যগ্রহণের নামাজের ন্যায় নামাজ পড়া হবে না।১

আর ইসতিসকার (বৃষ্টি প্রার্থনার) নামাজ: বৃষ্টি বন্ধ হলে এবং দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিলে এই বিধানের দিকে ধাবিত হওয়া হয়। যাকে এর দায়িত্ব দেওয়া হবে তিনি এর তিন দিন আগে থেকে রোজা রাখার নির্দেশ দেবেন, এ সময়ে একে অপরের প্রতি জুলুম এবং বিবাদ থেকে বিরত থাকতে বলবেন এবং বিবাদমান ও সম্পর্ক ছিন্নকারীদের মধ্যে মীমাংসা করবেন। এটি সময়ের দিক থেকে ঈদের নামাজের ন্যায়।

যদি কোনো ব্যক্তিকে এক বছরের জন্য ঈদের নামাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে তার সাধারণ নিয়োগের কারণে প্রতি বছর তা আদায় করা তার জন্য জায়েজ হবে যতক্ষণ না তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

আর যদি তাকে এক বছরের জন্য সূর্যগ্রহণ ও ইসতিসকার নামাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে তার সাধারণ নিয়োগের কারণে পরবর্তী বছরগুলোতে তা আদায় করার সুযোগ থাকবে না যদি

না তাকে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়; কারণ ঈদের নামাজ নিয়মিত আর সূর্যগ্রহণ ও ইসতিসকার নামাজ আকস্মিক। যদি নামাজেরত অবস্থায় বৃষ্টি নামে তবে তারা তা পূর্ণ করবেন এবং শুকরিয়া স্বরূপ খুতবা দেবেন। আর যদি নামাজে প্রবেশের আগেই বৃষ্টি নামে তবে তারা নামাজ পড়বেন না, বরং খুতবা ছাড়াই মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন। একইভাবে সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রেও যদি তা কেটে যায়। আর যদি ইসতিসকার ক্ষেত্রে সংক্ষেপ করা হয়...

---

১. ইবন কুদামা আল-মুগনি গ্রন্থে বলেছেন: কুসুফ ও খুসুফ একই বিষয়, এবং উভয় শব্দই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আর কুরআন খুসুফ শব্দে এসেছে।

মাসআলা: আবু কাসিম বলেছেন: যখন সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ লাগে, তখন মানুষ নামাজের দিকে ধাবিত হয়, তারা চাইলে জামাতের সাথে অথবা চাইলে একাকী পড়তে পারে। কুসুফের নামাজ সুসাব্যস্ত, আর সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে এর বিধানগত বৈধতার বিষয়ে আলেমদের মাঝে কোনো মতভেদ আছে বলে আমাদের জানা নেই। অধিকাংশ আলেম মনে করেন চন্দ্রগ্রহণের জন্যও এটি বিধিবদ্ধ, ইবন আব্বাস এটি করেছেন এবং আতা, হাসান, নাখয়ী, শাফেয়ী ও ইসহাক একই মত দিয়েছেন। মালিক বলেছেন: চন্দ্রগ্রহণের কোনো সুন্নাহ নেই। ইবন আবদিল বার তার থেকে এবং আবু হানিফা থেকে বর্ণনা করেছেন যে তারা উভয়ে বলেছেন: চন্দ্রগ্রহণের জন্য মানুষ একাকী দুই দুই রাকাত করে নামাজ পড়বে, জামাতে পড়বে না; কারণ এতে বের হওয়াতে কষ্ট রয়েছে।

আমাদের দলিল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন, কারো মৃত্যু বা জীবনের কারণে এদের গ্রহণ লাগে না, সুতরাং যখন তোমরা তা দেখবে তখন নামাজ পড়ো" (একমত পোষণকৃত)। এখানে তিনি উভয়টির জন্য একইভাবে নামাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত যে তিনি বসরার অধিবাসীদের নিয়ে চন্দ্রগ্রহণের নামাজ দুই রাকাত পড়েছেন এবং বলেছেন: আমি কেবল নামাজ পড়েছি কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজ পড়তে দেখেছি।

আর যেহেতু এটিও একটি গ্রহণ তাই এটি সূর্যগ্রহণের সদৃশ, এবং এটি জামাতে বা একাকী পড়া সুন্নাত, আর মালিক ও শাফেয়ীও এই কথা বলেছেন।

সাওরী থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: যদি ইমাম নামাজ পড়ান তবে তার সাথে পড়ো, অন্যথায় নামাজ পড়ো না। [আল-মুগনি: ২/১৪২] ।

عَلَى الدُّعَاءِ أَجْزَأَ.

وَرَوَى أَبُو مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ أَتَيْنَاكَ وَمَا لَنَا بَعِيرٌ يَئِطُّ، وَلَا صَبِيٌّ يَصْطَبِحُ، ثُمَّ أَنْشَدَهُ من "الطويل":

أَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَاءُ يَدْمَى لَبَانُهَا ... وَقَدْ شُغِلَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَنِ الطِّفْلِ

وَأَلْقَى بِكَفَّيْهِ الصَّبِيُّ اسْتِكَانَةً ... مِنَ الْجُوعِ ضَعْفًا لَا يُمِرُّ وَلَا يُحْلِي

وَلَا شَيْءَ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ عِنْدَنَا ... سِوَى الْحَنْظَلِ الْعَامِّيِّ وَالْعِلْهِزِ الْغِسْلِ

وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا ... وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا غَدَقًا مُغِيثًا سَحًّا طَبَقًا غَيْرَ رَائِثٍ، يَنْبُتُ بِهِ الزَّرْعُ، وَيُمْلَى بِهِ الضَّرْعُ، وَتَحْيَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ".

فَمَا اسْتَتَمَّ الدُّعَاءَ حَتَّى أَلْقَتِ السَّمَاءُ بِأَرْوَاقِهَا، فَجَاءَ أَهْلُ الْبِطَانَةِ يَصِيحُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَرَقُ، فَقَالَ: "حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا".

فَانْجَابَتِ السَّحَابُ عَنِ الْمَدِينَةِ كَالْإِبِلِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: "لِلَّهِ دَرُّ أَبِي طَالِبٍ، لَوْ كَانَ حَيًّا لَقَرَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الَّذِي يَنْشُدُ شِعْرَهُ".

فَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: كَأَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتَ قَوْلَهُ مِنْ "الطَّوِيلِ":

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ... ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاكُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ ... فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نَبْزِي مُحَمَّدًا ... وَلَمَّا نُقَاتِلْ دُونَهُ وَنُنَاضِلْ

وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ ... وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ كِنَانَةَ فَأَنْشَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "مِنَ الْمُتَقَارَبِ":

لَكَ الْحَمْدُ وَالْحَمْدُ مِمَّنْ شَكَرْ ... سُقِينَا بِوَجْهِ النَّبِيِّ الْمَطَرْ

دَعَا اللَّهَ خَالِقَهُ دَعْوَةً ... وَأَشْخَصَ مَعَهَا إِلَيْهِ الْبَصَرْ

فَلَمْ يَكُ إِلَّا كَإِلْقَاءِ الرِّدَاءِ ... وَأَسْرَعَ حَتَّى رَأَيْنَا الْمَطَرْ

دِفَاقَ الْعَزَالِي جَمَّ الْبُعَا ... قِ أَغَاثَ بِهِ اللَّهُ عَلِيًّا مُضَرْ

وَكَانَ كَمَا قَالَهُ عَمُّهُ ... أَبُو طَالِبٍ أَبْيَضَ ذَا غُرَرْ

দোয়ার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হয়েছে।

আবু মুসলিম আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একজন মরুবাসী আরব (বেদুইন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন এবং তাঁকে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকট এমন এক অবস্থায় এসেছি যখন আমাদের এমন কোনো উট নেই যা ক্ষুধার তাড়নায় শব্দ করবে, আর এমন কোনো শিশু নেই যে সকালে পানীয় পান করবে।" অতঃপর তিনি 'তাওয়ীল' ছন্দে তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন:

আমরা আপনার সমীপে এসেছি এমতাবস্থায় যে কুমারী কন্যার বক্ষদেশ [শুষ্কতায়] রক্তরঞ্জিত হচ্ছে ... আর দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা তার সন্তান থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে।

ক্ষুধার তাড়নায় দুর্বল হয়ে শিশুটি কাতর হয়ে হাত দুটি লুটিয়ে দিয়েছে ... তার মধ্যে তিক্ততা বা মিষ্টতার কোনো অনুভূতিও অবশিষ্ট নেই।

মানুষের খাদ্য হিসেবে গণ্য হতে পারে এমন কিছুই আমাদের নিকট অবশিষ্ট নেই ... কেবল পুরনো তিতা ইন্দ্রায়ণ ফল আর রক্ত ও পশম মিশ্রিত অখাদ্য ছাড়া।

আপনার আশ্রয় ব্যতীত আমাদের আর কোনো পলায়নস্থল নেই ... আর মানুষের আশ্রয়স্থল তো রাসূলগণ ভিন্ন আর কোথাও নয়।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাদর টানতে টানতে দাঁড়ালেন এবং মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বললেন: "হে আল্লাহ! আমাদের ওপর প্রচুর, জীবনদানকারী, অতিশয় বর্ষণশীল ও সর্বব্যাপী বৃষ্টি বর্ষণ করুন যা বিলম্বিত হবে না; যা দ্বারা শস্য উৎপাদিত হবে, ওলান দুধে ভরে যাবে এবং যমীনের মৃত্যুর পর তার পুনর্জীবন ঘটবে। আর এভাবেই তোমাদের পুনরুত্থান ঘটানো হবে।"

দোয়া শেষ হওয়ার আগেই আকাশ মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করল। তখন উপত্যকার অধিবাসীরা চিৎকার করে বলতে লাগলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! সব ডুবে যাচ্ছে।" তখন তিনি বললেন: "আমাদের চারপাশে বর্ষিত হোক, আমাদের ওপর নয়।"

অমনি মদিনার আকাশ থেকে মেঘমালা উটের পালের মতো সরে গেল। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত দৃশ্যমান হলো। অতঃপর তিনি বললেন: "আল্লাহ আবু তালিবের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন; তিনি যদি জীবিত থাকতেন তবে তাঁর কবিতা পঠিত হতে দেখে তাঁর চক্ষু শীতল হতো।"

তখন আলী ইবনে আবু তালিব দাঁড়িয়ে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে আপনি 'তাওয়ীল' ছন্দের তাঁর এই উক্তিটি বুঝিয়েছেন:"

সেই শ্বেতশুভ্র মুখমণ্ডল, যাঁর অসিলায় মেঘের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয় … যিনি ইয়াতীমদের আশ্রয় এবং বিধবাদের রক্ষক।

বনু হাশিমের দুর্দশাগ্রস্ত লোকেরা তাঁর নিকট আশ্রয় নেয় … তারা তাঁর সান্নিধ্যে এসে সুখ ও অনুগ্রহ লাভ করে।

আল্লাহর ঘরের কসম! তোমরা মিথ্যা বলেছ যে আমরা মুহাম্মদকে শত্রুর হাতে সঁপে দেব … অথচ আমরা এখনো তাঁর স্বপক্ষে যুদ্ধ ও লড়াই করিনি।

তাঁকে ততক্ষণ সমর্পণ করব না যতক্ষণ না আমরা তাঁর চারপাশে ধরাশায়ী হই … এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পত্নীদের কথা বিস্মৃত হই।

এরপর কিনানা গোত্রের একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে 'মুতাকারিব' ছন্দে আবৃত্তি করলেন:

আপনারই প্রশংসা, আর সেই প্রশংসা সকল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষ থেকে … নবীর পবিত্র চেহারার অসিলায় আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

তিনি তাঁর স্রষ্টা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন … আর প্রার্থনার সাথে সাথে তাঁর দৃষ্টি আসমানের দিকে নিবদ্ধ করেছেন।

চাদর পরিধান করার মতোই তা দ্রুততর ছিল … বরং তার চেয়েও দ্রুত আমরা বৃষ্টি বর্ষিত হতে দেখলাম।

মশক থেকে পানি পড়ার মতো প্রবল বেগে বর্ষিত বৃষ্টি … যার মাধ্যমে আল্লাহ মুদার গোত্রের উচ্চবংশীয়দের উদ্ধার করেছেন।

তিনি তেমনই ছিলেন যেমনটি তাঁর চাচা বলেছিলেন ... আবু তালিবের বর্ণনায় তিনি ছিলেন শ্বেতশুভ্র ও জ্যোতির্ময় চেহারার অধিকারী।

(ص: 171)الأحكام السلطانية للماوردي

بِهِ اللَّهُ أَرْسَلَ صَوْبَ الْغَمَا ... مِ وَهَذَا الْعِيَانُ وَذَاكَ الْخَبَرْ

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ يَكُنْ شَاعِرٌ يُحْسِنُ فَقَدْ أَحْسَنْتَ" 1.

وَلِبْسُ السَّوَادِ مُخْتَصٌّ بِالْأَئِمَّةِ فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا دَعْوَةُ السُّلْطَانِ اتِّبَاعًا لِشِعَارِهِ الْآنَ.

وَتُكْرَهُ مُخَالَفَتُهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِهِ شَرْعٌ تَحَرُّزًا مِنْ مُبَايَنَتِهِ، وَإِذَا تَغَلَّبَ مَنْ مُنِعَ الْجَمَاعَةَ كَانَ عُذْرًا فِي تَرْكِ الْمُجَاهَرَةِ بِهَا، وَإِذَا أَقَامَهَا الْمُتَغَلِّبُ مَعَ سُوءِ مُعْتَقَدِهِ اُتُّبِعَ فِيهَا، وَلَا يُتَّبَعُ عَلَى بِدْعَةٍ يُحْدِثُهَا.

---

1 قلت: وأصل الحديث في الصحيحين والسنن.

তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ মেঘের বারিধারা প্রেরণ করেছেন ... আর এটি প্রত্যক্ষ দর্শন এবং ওটি শ্রুত সংবাদ।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "যদি কোনো কবি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে থাকে, তবে তুমি অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেছ।" ১।

আর বর্তমানে সুলতানের প্রতীকের অনুসরণে সেই সমস্ত সালাতে ইমামগণের জন্য কালো পোশাক পরিধান করা নির্দিষ্ট, যেগুলোতে সুলতানের জন্য দোয়া (খুতবা) পরিচালিত হয়।

এ বিষয়ে তাঁর বিরোধিতা করা অপছন্দনীয়, যদিও এ সম্পর্কে সরাসরি কোনো শারয়ী বিধান আসেনি, যাতে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্নতা এড়িয়ে চলা যায়। আর যদি এমন কেউ ক্ষমতা দখল করে যে জামাআত নিষিদ্ধ করে, তবে তা প্রকাশ্যে সম্পাদন বর্জনের ক্ষেত্রে ওজর হিসেবে গণ্য হবে।

আর যদি বিজয়ী দখলদার ব্যক্তি তার ভ্রান্ত আকিদা সত্ত্বেও জামাআত কায়েম করে, তবে সে ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা হবে, কিন্তু তার প্রবর্তিত কোনো বিদআতের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা যাবে না।

---

১ আমি বলছি: হাদিসটির মূল উৎস সহীহাইন (বুখারি ও মুসলিম) এবং সুনান গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান।

(ص: 172)الأحكام السلطانية للماوردي

الباب العاشر: الولاية على الحج

هَذِهِ الْوِلَايَةُ عَلَى الْحَجِّ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ عَلَى تَسْيِيرِ الْحَجِيجِ.

وَالثَّانِي: عَلَى إِقَامَةِ الْحَجِّ. فَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ فَهُوَ وِلَايَةُ سِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ وَتَدْبِيرٍ.

وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمُوَلَّى أَنْ يَكُونَ مُطَاعًا ذَا رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ وَهَيْبَةٍ وَهِدَايَةٍ.

وَالَّذِي عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: جَمْعُ النَّاسِ فِي مَسِيرِهِمْ وَنُزُولِهِمْ حَتَّى لَا يَتَفَرَّقُوا، فَيَخَافُ النَّوَى وَالتَّغْرِيرَ.

وَالثَّانِي: تَرْتِيبُهُمْ فِي الْمَسِيرِ وَالنُّزُولِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ مُقَادًا، حَتَّى يَعْرِفَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مُقَادَهُ إِذَا سَارَ، وَيَأْلَفَ مَكَانَهُ إِذَا نَزَلَ، فَلَا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ وَلَا يَضِلُّونَ عَنْهُ.

وَالثَّالِثُ: يَرْفُقُ بِهِمْ فِي السَّيْرِ حَتَّى لَا يَعْجِزَ عَنْهُ ضَعِيفُهُمْ وَلَا يَضِلَّ عَنْهُ مُنْقَطِعُهُمْ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "الضَّعِيفُ أَمِيرُ الرُّفْقَةِ" 1، يُرِيدُ أَنَّ مَنْ ضَعُفَتْ دَوَابُّهُ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَسِيرُوا بِسَيْرِهِ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَسْلُكَ بِهِمْ أَوْضَحَ الطُّرُقِ وَأَخْصَبَهَا، وَيَتَجَنَّبَ أَجْدَبَهَا وَأَوْعَرَهَا.

وَالْخَامِسُ: أَنْ يَرْتَادَ لَهُمُ الْمِيَاهَ إِذَا انْقَطَعَتْ، وَالْمَرَاعِيَ إِذَا قَلَّتْ.

وَالسَّادِسُ: أَنْ يَحْرُسَهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَيَحُوطَهُمْ إِذَا رَحَلُوا، حَتَّى لَا يَتَخَطَّفَهُمْ دَاعِرٌ، وَلَا يَطْمَعَ فِيهِمْ مُتَلَصِّصٌ.

وَالسَّابِعُ: أَنْ يَمْنَعَ عَنْهُمْ مَنْ يَصُدُّهُمْ عَنِ الْمَسِيرِ، وَيَدْفَعَ عَنْهُمْ مَنْ يَحْصُرُهُمْ عَنِ الْحَجِّ بِقِتَالٍ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، أَوْ بِبَذْلِ مَالٍ إِنْ أَجَابَ الْحَجِيجُ إِلَيْهِ، وَلَا يَسَعُهُ أَنْ يُجْبِرَ أَحَدًا عَلَى بَذْلِ الْخَفَارَةِ إِنِ امْتَنَعَ مِنْهَا، حَتَّى يَكُونَ بَاذِلًا لَهَا عَفْوًا، وَمُجِيبًا إِلَيْهَا طَوْعًا، فَإِنْ بَذَلَ الْمَالَ عَلَى التَّمْكِينِ مِنَ الْحَجِّ لَا يَجِبُ.

وَالثَّامِنُ: أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ، وَيُتَوَسَّطَ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ، وَلَا يَتَعَرَّضَ لِلْحُكْمِ

---

1 سبق تخريجه.

দশম পরিচ্ছেদ: হজ পরিচালনা সংক্রান্ত কর্তৃত্ব

হজের এই দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব দুই প্রকার:

প্রথমটি হলো: হাজীদের কাফেলা পরিচালনার দায়িত্ব।

দ্বিতীয়টি হলো: হজ পালনের (আহকাম ও কার্যাবলি সম্পাদনের) দায়িত্ব। হাজীদের কাফেলা পরিচালনার বিষয়টি হলো মূলত রাজনৈতিক নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং সুকৌশল ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত।

এই পদে নিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিবেচ্য শর্তাবলি হলো—তাঁকে এমন হতে হবে যাঁর আনুগত্য করা হয়, তিনি যেন প্রাজ্ঞ, সাহসী, প্রভাবশালী এবং সঠিক পথনির্দেশনায় পারদর্শী হন।

এই দায়িত্বের অধিকার ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হলো দশটি বিষয়:

প্রথমত: যাত্রাপথে এবং যাত্রাবিরতির সময় হাজীদের একত্রিত রাখা যাতে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়েন, অন্যথায় তাঁরা পথ হারানোর বা বিপদে পড়ার আশঙ্কায় থাকবেন।

দ্বিতীয়ত: যাত্রা ও যাত্রাবিরতির সময় তাঁদের সুশৃঙ্খল রাখা এবং প্রতিটি দলকে একজন নেতা বা চালক প্রদান করা, যাতে প্রতিটি দল যাত্রাকালে তাদের চালককে চিনতে পারে এবং যাত্রাবিরতির সময় নিজ নিজ স্থান সম্পর্কে পরিচিত থাকে; ফলে তাঁরা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হবেন না এবং পথও হারাবেন না।

তৃতীয়ত: যাত্রাপথে তাঁদের সাথে কোমল আচরণ করা, যাতে তাঁদের মধ্য থেকে দুর্বল ব্যক্তিরা চলতে অক্ষম হয়ে না পড়ে এবং দলছুট ব্যক্তিরা হারিয়ে না যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "দুর্বল ব্যক্তিই হলো কাফেলার নেতা।" এর উদ্দেশ্য হলো—যাঁদের সওয়ারি বা বাহন দুর্বল, কাফেলার অন্যান্যদের উচিত হবে তাঁদের গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পথ চলা।

চতুর্থত: তাঁদের নিয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট এবং উর্বর পথ দিয়ে গমন করা এবং অত্যন্ত শুষ্ক ও দুর্গম পথ পরিহার করা।

পঞ্চমত: পানি ফুরিয়ে গেলে তাঁদের জন্য পানির উৎস সন্ধান করা এবং চারণভূমি কমে গেলে তার ব্যবস্থা করা।

ষষ্ঠত: যাত্রাবিরতির সময় তাঁদের পাহারার ব্যবস্থা করা এবং যাত্রাকালে তাঁদের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে রাখা, যাতে কোনো দুষ্কৃতকারী তাঁদের ওপর চড়াও হতে না পারে এবং কোনো চোর তাঁদের মালামালের প্রতি প্রলুব্ধ না হয়।

সপ্তমত: যারা তাঁদের যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করে তাঁদের প্রতিহত করা এবং যারা তাঁদের হজে বাধা দেয়, ক্ষমতা থাকলে যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁদের দমন করা। অথবা যদি হাজীরা সম্মত হন, তবে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে সেই বাধা দূর করা। তবে যাত্রাপথের নিরাপত্তা ফি (খাফারা) দেওয়ার জন্য তিনি কাউকে বাধ্য করতে পারবেন না, যতক্ষণ না কেউ তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সানন্দে প্রদান করে। কারণ, হজের সুযোগ পাওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়।

অষ্টমত: বিবাদমান ব্যক্তিদের মধ্যে মীমাংসা করা এবং বিবাদকারীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করা। তবে তিনি আইনি বিচার বা দণ্ড প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না...

---

১. ইতিপূর্বে এর সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

بَيْنَهُمْ إِجْبَارًا، إِلَّا أَنْ يُفَوَّضَ الْحُكْمُ إِلَيْهِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ، فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ دَخَلُوا بَلَدًا فِيهِ حَاكِمٌ جَازَ لَهُ وَلِحَاكِمِ الْبَلَدِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، فَأَيُّهُمَا حَكَمَ نَفَذَ حُكْمُهُ، وَلَوْ كَانَ التَّنَازُعُ بَيْنَ الْحَجِيجِ وَأَهْلِ الْبَلَدِ لَمْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَاكِمُ الْبَلَدِ.

وَالتَّاسِعُ: أَنْ يُقَوِّمَ زَائِغَهُمْ وَيُؤَدِّبَ خَائِنَهُمْ، وَلَا يَتَجَاوَزَ التَّعْزِيرَ إِلَى الْحَدِّ، إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِيهِ، فَيَسْتَوْفِيَهُ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِيهِ.

فَإِنْ دَخَلَ بَلَدًا فِيهِ مَنْ يَتَوَلَّى إِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَى أَهْلِهِ نَظَرَ، فَإِنْ كَانَ مَا أَتَاهُ الْمَحْدُودُ قَبْلَ دُخُولِ الْبَلَدِ؛ فَوَالِي الْحَجِيجِ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِي الْبَلَدِ، وَإِنْ كَانَ مَا أَتَاهُ الْمَحْدُودُ فِي الْبَلَدِ فَوَالِي الْبَلَدِ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِي الْحَجِيجِ.

وَالْعَاشِرُ: أَنْ يُرَاعِيَ اتِّسَاعَ الْوَقْتِ حَتَّى يُؤْمَنَ الْفَوَاتَ، وَلَا يُلْجِئَهُمْ ضِيقُهُ إِلَى الْحَثِّ فِي السَّيْرِ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمِيقَاتِ أَمْهَلَهُمْ لِلْإِحْرَامِ وَإِقَامَةِ سُنَنِهِ، فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا عَدَلَ بِهِمْ إِلَى مَكَّةَ؛ لِيَخْرُجُوا مَعَ أَهْلِهَا إِلَى الْمَوَاقِفِ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا عَدَلَ بِهِمْ عَنْ مَكَّةَ إِلَى عَرَفَةَ؛ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِهَا فَيَفُوتَ الْحَجُّ بِهَا، فَإِنَّ زَمَانَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، فَمَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِهَا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الزَّمَانِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَإِنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِهَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَعَلَيْهِ إِتْمَامُ مَا بَقِيَ مِنْ أَرْكَانِهِ وَجُبْرَانِهِ بِدَمٍ وَقَضَاؤُهُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ إِنْ أَمْكَنَهُ، وَفِيمَا بَعْدَهُ إِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ، وَلَا يَصِيرُ حَجُّهُ عُمْرَةً بِالْفَوَاتِ وَلَا يَتَحَلَّلُ بَعْدَ الْفَوَاتِ إِلَّا بِإِحْلَالِ الْحَجِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: يَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَصِيرُ إِحْرَامُهُ بِالْفَوَاتِ عُمْرَةً، وَإِذَا أَوْصَلَ الْحَجِيجَ إِلَى مَكَّةَ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَوْدِ مِنْهُمْ، فَقَدْ زَالَتْ عَنْهُ وِلَايَةُ الْوَالِي عَلَى الْحَجِيجِ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ عَلَى الْعَوْدِ فَهُوَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ، وَمُلْتَزِمٌ أَحْكَامَ طَاعَتِهِ، فَإِذَا قَضَى النَّاسُ حَجَّهُمْ أَمْهَلَهُمُ الْأَيَّامَ الَّتِي جَرَتْ بِهَا الْعَادَةُ فِي إِنْجَازِ عَلَائِقِهِمْ، وَلَا يُرْهِقُهُمْ فِي

الْخُرُوجِ فَيَضُرَّ بِهِمْ، فَإِذَا عَادَ بِهِمْ سَارَ بِهِمْ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ لِزِيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِيَجْمَعَ لَهُمْ بَيْنَ حَجِّ بَيْتِ اللَّهِ عز وجل، وَزِيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رِعَايَةً لِحُرْمَتِهِ، وَقِيَامًا بِحُقُوقِ طَاعَتِهِ، وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِ الْحَجِّ، فَهُوَ مَنْ نُدِبَ الشَّرْعِ الْمُسْتَحَبَّةِ، وَعَادَاتِ الْحَجِيجِ الْمُسْتَحْسَنَةِ.

তাদের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করা যাবে না, যদি না বিচারকার্য তাকে অর্পণ করা হয়। এমতাবস্থায় শর্ত হলো তাকে বিচারকার্য পরিচালনার যোগ্য হতে হবে। তখন তিনি তাদের মধ্যে বিচার করার অধিকার লাভ করবেন। তারা যদি এমন কোনো জনপদে প্রবেশ করে যেখানে স্থানীয় শাসক রয়েছে, তবে তার জন্য এবং ওই জনপদের শাসকের জন্য তাদের মাঝে বিচার করা বৈধ। তাদের মধ্যে যিনিই ফয়সালা করবেন, তা কার্যকর হবে। তবে বিবাদ যদি হাজি এবং স্থানীয় অধিবাসীর মধ্যে হয়, তবে স্থানীয় শাসক ছাড়া অন্য কেউ বিচার করতে পারবেন না।

নবম দায়িত্ব: বিপথগামীদের সংশোধন করা এবং বিশ্বাসঘাতকদের শাসন করা। তবে 'তা'যির' বা সংশোধনমূলক শাস্তি যেন 'হদ' বা শরয়ি নির্ধারিত সীমার ঊর্ধ্বে না যায়, যদি না তাকে এর অনুমতি প্রদান করা হয়। যদি তিনি এ বিষয়ে ইজতিহাদ করার যোগ্য হন, তবে অনুমতি সাপেক্ষে তা কার্যকর করবেন।

যদি তিনি এমন কোনো জনপদে প্রবেশ করেন যেখানে দণ্ডবিধি কার্যকর করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকেন, তবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি দণ্ডযোগ্য অপরাধটি জনপদে প্রবেশের পূর্বে সংঘটিত হয়, তবে হাজিদের শাসক দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্থানীয় শাসকের চেয়ে অধিকতর যোগ্য হবেন। আর যদি অপরাধটি জনপদের ভেতরে সংঘটিত হয়, তবে স্থানীয় শাসক হাজিদের শাসকের চেয়ে দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হবেন।

দশম দায়িত্ব: সময়ের পর্যাপ্ততার প্রতি লক্ষ রাখা যেন হজ ছুটে যাওয়ার ভয় না থাকে। সময়ের সংকীর্ণতা যেন তাদের অতি দ্রুত চলতে বাধ্য না করে। যখন তারা মিকাতে পৌঁছাবে, তখন তাদের ইহরাম বাঁধার এবং এর সুন্নাতগুলো পালনের সুযোগ দিতে হবে। যদি পর্যাপ্ত সময় থাকে, তবে তাদের মক্কায় নিয়ে যাবেন যেন তারা মক্কাবাসীদের সাথে নিয়ে উকুফে আরাফায় যেতে পারে। আর যদি সময় কম থাকে, তবে আরাফাত ছুটে যাওয়ার ভয়ে মক্কার পরিবর্তে সরাসরি আরাফাতের দিকে তাদের নিয়ে যাবেন; কারণ আরাফাত ছুটে গেলে হজ হাতছাড়া হয়ে যায়। কেননা আরাফাতে অবস্থানের সময় হলো আরাফার দিনের সূর্য ঢলে পড়ার পর

থেকে কুরবানির দিনের (১০ই জিলহজ) সুবহে সাদিক পর্যন্ত। যে ব্যক্তি এই সময়ের কোনো একটি অংশে রাতে বা দিনে আরাফাতে অবস্থান করতে পারবে, সে হজ লাভ করল। আর যার আরাফাতে অবস্থান করা সম্ভব হলো না এমনকি কুরবানির দিনের সুবহে সাদিক হয়ে গেল, তার হজ হাতছাড়া হয়ে গেল। তার ওপর হজের বাকি রুকনগুলো সম্পন্ন করা, কুরবানি (দম) দিয়ে এর ক্ষতিপূরণ করা এবং সম্ভব হলে পরবর্তী বছর তা কাজা করা আবশ্যক। যদি পরবর্তী বছর সম্ভব না হয় তবে এর পরবর্তী সময়ে তা সম্পন্ন করতে হবে। হজ ছুটে যাওয়ার কারণে তা উমরায় পরিণত হবে না এবং হজের নির্দিষ্ট কার্যাবলি সমাপ্তি ব্যতীত সে ইহরামমুক্ত হবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন: সে উমরার আমল করার মাধ্যমে হালাল হবে।
ইমাম আবু ইউসুফ বলেন: হজ ছুটে যাওয়ার ফলে তার ইহরাম উমরায় রূপান্তরিত হবে। যখন তিনি হাজিদের মক্কায় পৌঁছে দেবেন, তখন তাদের মধ্যে যারা ফিরে যাবে না, তাদের ওপর হাজিদের শাসকের কর্তৃত্ব রহিত হয়ে যাবে এবং তাদের ওপর তার কোনো শাসন থাকবে না। আর যারা ফিরে যাওয়ার দলে থাকবে, তারা তার কর্তৃত্বাধীন থাকবে এবং তার আনুগত্যের বিধান মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। হাজিরা যখন হজ সম্পন্ন করবে, তখন তিনি তাদের প্রয়োজনীয় কাজ ও লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু দিন সময় দেবেন। তাদের মক্কা ত্যাগের জন্য অতিশয় চাপ দেবেন না যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়। যখন তিনি তাদের নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মোবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনার পথ ধরে নিয়ে যাবেন; যেন তাদের জন্য আল্লাহর ঘরের হজ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা যিয়ারত—উভয়টি একত্রিত হয়। এটি তাঁর সম্মানের প্রতি বিশেষ যত্ন এবং তাঁর আনুগত্যের হক আদায়ের নামান্তর। যদিও এটি হজের ফরযসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়, তথাপি এটি শরয়ি মুস্তাহাব কার্যাবলি এবং হাজিদের উত্তম প্রথা হিসেবে সুপরিগণিত।

رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي"1.

وَحَكَى الْعُتْبِيُّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَقْبَلَ وَسَلَّمَ فَأَحْسَنَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَجَدْتُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء: 64] .

وَقَدْ جِئْتُكَ تَائِبًا مِنْ ذَنْبِي، مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي، ثُمَّ بَكَى وَأَنْشَأَ يَقُولُ "مِنَ الْبَسِيطِ":

#يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ

فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ

فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ#

ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَانْصَرَفَ، قَالَ الْعُتْبِيُّ: فَأَغْفَيْتُ إِغْفَاءَةً فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: يَا عُتْبِيُّ الْحَقِ الْأَعْرَابِيَّ وَأَخْبِرْهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ غَفَرَ لَهُ.

ثُمَّ يَكُونُ فِي عَوْدِهِ بِهِمْ مُلْتَزِمًا فِيهِمْ مِنَ الْحُقُوقِ مَا الْتَزَمَهُ فِي صَدْرِهِمْ، حَتَّى يَصِلَ بِهِمْ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي سَارَ بِهِمْ مِنْهُ، فَتَنْقَطِعُ وِلَايَتُهُ عَنْهُمْ بِالْعَوْدِ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ الْوِلَايَةُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَجِّ فَهُوَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ فِي إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ، فَمِنْ شُرُوطِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ مَعَ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي أَئِمَّةِ الصَّلَوَاتِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ وَأَحْكَامِهِ، عَارِفًا بِمَوَاقِيتِهِ وَأَيَّامِهِ، وَتَكُونُ مُدَّةُ وِلَايَتِهِ مُقَدَّرَةً بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ أَوَّلُهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَآخِرُهَا يَوْمُ الْحَلَّاقِ، وَهُوَ النَّفْرُ الثَّانِي فِي الْيَوْمِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ فِيمَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا أَحَدُ الرَّعَايَا وَلَيْسَ مِنَ الْوُلَاةِ، وَإِذَا كَانَ مُطْلَقَ الْوِلَايَةِ عَلَى إِقَامَةِ الْحَجِّ فَلَهُ إِقَامَتُهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَا لَمْ يُصْرَفْ عَنْهُ، وَإِنْ عُقِدَتْ لَهُ خَاصَّةً عَلَى عَامٍ وَاحِدٍ لَمْ يَتَعَدَّ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا عَنْ وِلَايَةٍ.

وَالَّذِي يَخْتَصُّ بِوِلَايَتِهِ وَيَكُونُ نَظَرُهُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَسَادِسٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ:

---

1 موضوع: رواه البيهقي في السنن الكبرى "5/ 245"، والدارقطني في سننه "2/ 278".

قال الحافظ ابن حجر: ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه، وقال: إن صحَّ الخبر فإنَّ في القلب من إسناده، ثم رجَّح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف لا المصغر الثقة، وصرَّح بأن الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر، وقال: إنه لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه، ولا يصح في هذا الباب شيء، وفي قوله: لا يتابع عليه نظر فقد... وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع "5607": موضوع.

নাফে ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে গেল।"১

উতবি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কবরের পাশে ছিলাম, তখন জনৈক বেদুইন সেখানে আসল এবং খুব সুন্দরভাবে সালাম পেশ করল। এরপর সে বলল: হে আল্লাহর রাসুল! আমি মহান আল্লাহকে বলতে দেখেছি: {আর তারা যখন নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু হিসেবে পেত} [আন-নিসা: ৬৪]।

আর আমি আপনার কাছে আমার গুনাহ থেকে তওবা করে এবং আমার রবের দরবারে আপনাকে সুপারিশকারী হিসেবে পেশ করে উপস্থিত হয়েছি। এরপর সে কেঁদে ফেলল এবং ‘বসীত’ ছন্দে এই পংক্তিগুলো আবৃত্তি করতে লাগল:

হে শ্রেষ্ঠতম সত্তা, যাঁর দেহাবশেষ এই সমতলে সমাহিত হয়েছে,
যাঁদের সুবাসে এই সমতল ও টিলাসমূহ সুরভিত হয়েছে।
আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক সেই কবরের প্রতি যেথায় আপনি শায়িত আছেন,

তাতে রয়েছে পবিত্রতা এবং তাতে রয়েছে দানশীলতা ও মহানুভবতা।
অতঃপর সে তার সওয়ারিতে চড়ে চলে গেল। উতবি বলেন: আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম এবং স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন: হে উতবি! সেই বেদুইনের কাছে যাও এবং তাকে সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।
অতঃপর সে যখন তাদের নিয়ে ফিরে আসবে, তখন তাদের প্রতি সেই সব হক পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে যা সে যাত্রার শুরুতে গ্রহণ করেছিল, যতক্ষণ না সে তাদের সেই শহরে ফিরিয়ে আনে যেখান থেকে তাদের নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। ফিরে আসার মাধ্যমে তাদের ওপর তার কর্তৃত্ব সমাপ্ত হবে। আর যদি তার কর্তৃত্ব হজ পালনের ব্যবস্থাপনার ওপর হয়, তবে হজ পালনের ক্ষেত্রে তার মর্যাদা হবে জামাতে নামাজ কায়েমকারী ইমামের মতো। সুতরাং এই পদের জন্য শর্তাবলি ইমামতির জন্য বিচার্য শর্তাবলির সাথে সাথে তাকে হজের নিয়মকানুন ও বিধিবিধান সম্পর্কে বিজ্ঞ হতে হবে এবং হজের সময়সূচি ও দিনগুলো সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। তার এই কর্তৃত্বের সময়কাল সাত দিন নির্ধারিত থাকবে, যার সূচনা জিলহজ মাসের সপ্তম তারিখের জোহরের নামাজ থেকে এবং শেষ হবে মাথা মুণ্ডনের দিন অর্থাৎ জিলহজ মাসের তেরো তারিখের দ্বিতীয় প্রস্থান (নাফরে সানি) পর্যন্ত। এর আগে ও পরে সে সাধারণ প্রজাদের একজন গণ্য হবে এবং শাসকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। আর যদি হজের ব্যবস্থা করার জন্য তার কর্তৃত্ব সাধারণ বা নিরঙ্কুশ হয়, তবে প্রতি বছরই সে তা পরিচালনা করার অধিকার রাখবে যতক্ষণ না তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তা বিশেষ কোনো এক বছরের জন্য নির্ধারিত হয়, তবে নতুন নিয়োগ ছাড়া তা অন্য বছরে কার্যকর হবে না।
আর যা তার এই কর্তৃত্বের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট এবং যার ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে, তা হলো পাঁচটি বিষয়ে সর্বসম্মত বিধান এবং ষষ্ঠ একটি বিষয়ে মতভেদপূর্ণ বিধান:
---
১. জাল বা মওজু: এটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকি ‘আস-সুনানুল কুবরা’ গ্রন্থে (৫/ ২৪৫) এবং দারাকুতনি তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে (২/ ২৭৮)।
হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: ইবনে খুজাইমা তাঁর ‘সহিহ’ গ্রন্থে তাঁর সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: যদি বর্ণনাটি সঠিক হয় তবে এর সনদের ব্যাপারে অন্তরে সংশয় রয়েছে।
অতঃপর তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল-উমরি ‘আল-মুকাব্বার’-এর বর্ণনা, যিনি একজন দুর্বল রাবি, ‘আল-মুসাগগার’ (নির্ভরযোগ্য) নন। তিনি স্পষ্ট করেছেন

যে, কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এই ‘মুনকার’ (অপ্রসিদ্ধ ও দুর্বল) বর্ণনাটি বর্ণনা করেন না। তিনি আরও বলেছেন যে, মুসার হাদিসটি সহিহ নয় এবং এর কোনো সমর্থক বর্ণনা (মুতাবিয়াত) নেই, আর এই অধ্যায়ে কোনো কিছুই সহিহ প্রমাণিত নয়। তবে তাঁর এই উক্তি ‘এর কোনো সমর্থক বর্ণনা নেই’ এটি পর্যালোচনার দাবি রাখে...। শেখ আলবানি ‘জয়িফুল জামে’ (৫৬০৭) গ্রন্থে একে ‘মওজু’ (জাল) বলেছেন।

(ص: 175)الأحكام السلطانية للماوردي

أَحَدُهَا: إِشْعَارُ النَّاسِ بِوَقْتِ إِحْرَامِهِمْ، وَالْخُرُوجُ إِلَى مَشَاعِرِهِمْ؛ لِيَكُونُوا لَهُ مُتَّبِعِينَ، وَبِأَفْعَالِهِ مُقْتَدِينَ.

وَالثَّانِي: تَرْتِيبُهُمْ لِلْمَنَاسِكِ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ الشَّرْعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَتْبُوعٌ فِيهَا فَلَا يُقَدِّمُ مُؤَخَّرًا وَلَا يُؤَخِّرُ مُقَدَّمًا، سَوَاءٌ كَانَ التَّرْتِيبُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مُسْتَحَبًّا.

وَالثَّالِثُ: تَقْدِيرُ الْمَوَاقِفِ بِمَقَامِهِ فِيهَا وَمَسِيرِهِ عَنْهَا، كَمَا تُقَدَّرُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ.

وَالرَّابِعُ: اتِّبَاعُهُ فِي الْأَرْكَانِ الْمَشْرُوعَةِ فِيهَا، وَالتَّأْمِينُ عَلَى أَدْعِيَتِهِ بِهَا؛ لِيَتَّبِعُوهُ فِي الْقَوْلِ كَمَا اتَّبَعُوهُ فِي الْعَمَلِ، وَلِيَكُونَ اجْتِمَاعُ أَدْعِيَتِهِمْ أَفْتَحَ لِأَبْوَابِ الْإِجَابَةِ.

وَالْخَامِسُ: إِمَامَتُهُمْ فِي الصَّلَوَاتِ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي شُرِعَتْ خُطَبُ الْحَجِّ وَجَمْعُ الْحَجِيجِ عَلَيْهَا، وَهُنَّ أَرْبَعٌ: فَالْأُولَى مِنْهُنَّ وَهِيَ أَوَّلُ شُرُوعِهِ فِي مَسْنُونَاتِهِ وَمَنْدُوبَاتِهِ بَعْدَ تَقَدُّمِ إِحْرَامِهِ، وَإِنْ كَانَ لَوْ أَخَّرَ إِحْرَامَهُ أَجْزَأَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ بِمَكَّةَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، وَيَخْطُبَ بَعْدَهَا، وَهِيَ الْأُولَى مِنْ خُطَبِ الْحَجِّ الْأَرْبَعِ مُفْتَتِحًا لَهَا بِالتَّلْبِيَةِ إِنْ كَانَ مُحْرِمًا، وَالتَّكْبِيرِ إِنْ كَانَ مُحِلًّا، وَيُعَلِّمُ النَّاسَ أَنَّ مَسِيرَهُمْ فِي غَدٍ إِلَى مِنًى؛ لِيَخْرُجُوا إِلَيْهَا فِيهِ وَهُوَ الثَّامِنُ مِنَ الْعَشْرِ، فَيَنْزِلُ بِخَيْفِ مِنًى بِبَنِي كِنَانَةَ؛ حَيْثُ

نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ، وَيَبِيتُ بِهَا وَيَسِيرُ بِهِمْ مِنْ غَدِهِ وَهُوَ التَّاسِعُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى عَرَفَةَ عَلَى طَرِيقِ ضَبٍّ، وَيَعُودُ عَلَى طَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلْيَكُنْ عَائِدًا مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ؛ فَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى عَرَفَةَ نَزَلَ بِبَطْنِ عَرَفَةَ وَأَقَامَ بِهِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، ثُمَّ سَارَ مِنْهُ إِلَى مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ- بِوَادِي عَرَفَةَ، يَخْطُبُ بِهِمُ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ خُطَبِ الْحَجِّ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَالْجُمُعَةِ، فَإِنَّ جَمِيعَ الْخُطَبِ مَشْرُوعَةٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِلَّا خُطْبَتَيْنِ: خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ وَخُطْبَةُ عَرَفَةَ، فَإِذَا خَطَبَهَا ذَكَّرَ النَّاسَ فِيهَا مَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَمَنَاسِكِهِ، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَحْظُورَاتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ بَعْدَ الْخُطْبَةِ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَامِعًا بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، وَيَقْصُرُهُمَا الْمُسَافِرُونَ وَيُتِمُّهَا الْمُقِيمُونَ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَمْعِهِ وَقَصْرِهِ، ثُمَّ يَسِيرُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُمَا إِلَى عَرَفَةَ وَهُوَ الْمَوْقِفُ الْمَفْرُوضُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْحَجُّ عَرَفَةَ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ أَدْرَكَ الْحَجَّ".

প্রথমটি হলো: মানুষকে তাদের ইহরামের সময় এবং হজ্জের পবিত্র স্থানসমূহের অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার বিষয়ে অবহিত করা; যাতে তারা তার অনুগামী হতে পারে এবং তার কর্মসমূহকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয়টি হলো: শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের হজ্জের কার্যাবলি বিন্যস্ত করা; কেননা এসব ক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করা হয়। সুতরাং তিনি পরবর্তী কাজকে আগে করবেন না এবং পূর্ববর্তী কাজকে পেছনে নেবেন না, চাই সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব হোক বা মুস্তাহাব।

তৃতীয়টি হলো: হজ্জের স্থানসমূহে তার অবস্থান এবং সেখান থেকে প্রস্থানের মাধ্যমে মানুষের অবস্থানকাল নির্ধারণ করা, যেমনটি ইমামের নামাজের মাধ্যমে মুক্তাদিদের নামাজ নির্ধারিত হয়।

চতুর্থটি হলো: হজ্জের রুকনসমূহে তার অনুসরণ করা এবং তার দোয়াগুলোতে 'আমিন' বলা; যাতে তারা কর্মের ন্যায় কথার ক্ষেত্রেও তার অনুগামী হতে পারে এবং তাদের সম্মিলিত দোয়া যেন কবুলিয়াতের দ্বারসমূহ উন্মোচনে অধিকতর সহায়ক হয়।

পঞ্চমটি হলো: হজ্জের খুতবা এবং হাজীদের সমাবেশের জন্য নির্ধারিত দিনগুলোতে নামাজে তাদের ইমামতি করা। এই খুতবা হলো চারটি: প্রথমটি হলো হজ্জের সুন্নত ও মুস্তাহাব কাজসমূহ শুরুর প্রাক্কালে ইহরাম গ্রহণের পর। তবে তিনি যদি ইহরাম গ্রহণে দেরিও করেন, তবুও সপ্তম দিনে মক্কায় তাদের নিয়ে জোহরের নামাজ পড়া এবং এরপর খুতবা দেওয়া তার জন্য যথেষ্ট হবে। এটি হজ্জের চারটি খুতবার মধ্যে প্রথম, যা তিনি ইহরাম অবস্থায় থাকলে 'তালবিয়া'র মাধ্যমে এবং ইহরাম অবস্থায় না থাকলে 'তাকবির' দিয়ে শুরু করবেন। তিনি মানুষকে জানিয়ে দেবেন যে, পরদিন তাদের যাত্রা হবে মিনার উদ্দেশ্যে; যাতে তারা অষ্টম দিনে সেখানে যেতে পারে। এরপর তিনি মিনার খাইফ নামক স্থানে বনু কেনানার এলাকায় অবস্থান করবেন, যেখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেছিলেন। সেখানে তিনি রাত যাপন করবেন এবং পরদিন অর্থাৎ নবম তারিখ সূর্যোদয়ের পর 'দব' নামক পথ ধরে তাদের নিয়ে আরাফাতের দিকে যাত্রা করবেন। ফেরার সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে 'মা'জিমাইন' এর পথ ধরে ফিরবেন। তিনি যেন যাওয়ার পথ ভিন্ন অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসেন। যখন তিনি আরাফাতের নিকটবর্তী হবেন, তখন আরাফাতের সমতলে অবতরণ করবেন এবং সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবেন। এরপর সেখান থেকে আরাফাত উপত্যকায় অবস্থিত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মসজিদে গমন করবেন। সেখানে নামাজের পূর্বে জুমার খুতবার ন্যায় হজ্জের দ্বিতীয় খুতবা প্রদান করবেন। কারণ হজ্জের সকল খুতবা নামাজের পরে হওয়াই শরীয়তসম্মত, কেবল দুটি ব্যতীত: জুমার খুতবা এবং আরাফাতের খুতবা। যখন তিনি খুতবা দেবেন, তখন তাতে মানুষকে হজ্জের রুকন ও কার্যাবলির মধ্যে যা তাদের জন্য পালনীয় এবং হজ্জের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের মধ্যে যা তাদের জন্য বর্জনীয়, তা স্মরণ করিয়ে দেবেন। খুতবা শেষে তিনি তাদের নিয়ে জোহর ও আসরের নামাজ জোহরের ওয়াক্তে একত্রিত করে পড়াবেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একত্রিত করা ও সংক্ষেপ করার অনুসরণে মুসাফিররা নামাজ সংক্ষেপ করবেন এবং স্থায়ী বাসিন্দারা পূর্ণ নামাজ আদায় করবেন। নামাজ শেষে তিনি আরাফাতের মূল সীমানার দিকে যাত্রা করবেন, যা হলো হজ্জের ফরজ অবস্থানের স্থান। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আরাফাতই হলো হজ্জ, সুতরাং যে ব্যক্তি আরাফাত পেল, সে হজ্জ পেল।"

وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ" 1.

وَحَدُّ عَرَفَةَ مَا جَاوَزَ وَادِي عَرَفَةَ الَّذِي فِيهِ الْمَسْجِدُ، وَلَيْسَ الْمَسْجِدُ وَلَا وَادِي عَرَفَةَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْجِبَالِ الْمُقَابِلَةِ عَلَى عَرَفَةَ كُلِّهَا، فَيَقِفُ مِنْهَا عِنْدَ الْجِبَالِ الثَّلَاثَةِ: النَّبْعَةُ وَالنُّبَيْعَةُ وَالثَّائِبُ، فَقَدْ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضِرْسٍ مِنَ الثَّائِبِ، وَجَعَلَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الْمِحْرَابِ، فَهَذَا أَحَبُّ الْمَوَاقِفِ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ فِيهِ، وَأَيْنَمَا وَقَفَ مِنْ عَرَفَةَ وَالنَّاسُ أَجْزَأَهُمْ، وَوُقُوفُهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ لِيَقْتَدِيَ بِهِ النَّاسُ أَوْلَى، ثُمَّ يَسِيرُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ مُؤَخِّرًا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَيَؤُمُّ النَّاسَ فِيهِمَا، وَيَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَحَدُّهَا مِنْ حَيْثُ يَفِيضُ مِنْ مَأْزِمَيْ عَرَفَةَ، وَلَيْسَ الْمَأْزِمَانِ مِنْهَا إِلَى أَنْ يَأْتِيَ إِلَى قَرْنِ مُحَسِّرٍ، وَلَيْسَ الْقَرْنُ مِنْهَا، وَيَلْتَقِطُ النَّاسُ مِنْهَا حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ الْأَنَامِلِ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ، وَيَسِيرُ مِنْهَا بَعْدَ الْفَجْرِ، وَلَوْ سَارَ قَبْلَهُ وَبَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَجْزَأَ، وَلَيْسَ الْمَبِيتُ بِهَا رُكْنًا، وَيَجْبُرُهُ دَمٌ إِنْ تَرَكَهُ، وَجَعَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْأَرْكَانِ الْوَاجِبَةِ، ثُمَّ سَارَ مِنْهَا إِلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فَيَقِفُ مِنْهُ بِقُزَحَ دَاعِيًا، وَلَيْسَ الْوُقُوفُ بِهِ فَرْضًا، ثُمَّ يَسِيرُ إِلَى مِنًى فَيَبْدَأُ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ تِسْعَ حَصَيَاتٍ ثُمَّ يَنْحَر.

وَمَنْ سَاقَ مَعَهُ هَدْيًا مِنَ الْحَجِيجِ ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ يَفْعَلُ مِنْهُمَا مَا شَاءَ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ، ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِهَا طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَهُوَ الْفَرْضُ، وَيَسْعَى بَعْدَ طَوَافِهِ إِنْ لَمْ يَسْعَ قَبْلَ عَرَفَةَ، وَيُجْزِئُهُ سَعْيُهُ قَبْلَ عَرَفَةَ، وَلَا يُجْزِئُهُ طَوَافُهُ قَبْلَهَا، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مِنًى فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الظُّهْرَ، وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا وَهِيَ الْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ خُطَبِ الْحَجِّ الْأَرْبَعِ، وَيَذْكُرُ لِلنَّاسِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَنَاسِكِهِمْ، وَحُكْمِ إِحْلَالِهِمُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي، وَمَا يَسْتَبِيحُونَهُ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ بِكُلِّ وَاحِدٍ

---

1 رواه مالك في موطئه، كتاب الحج "886".
قال الحافظ ابن حجر: حديث: "الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج"؛ رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد، والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج، فقال: "الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تمَّ حجه" لفظ أحمد، وفي رواية لأبي داود: "من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج"، وألفاظ الباقين نحوه، وفي رواية للدارقطني والبيهقي: "الحج عرفة الحج عرفة". [تلخيص الحبير: 2/ 255] .

"আর যার আরাফাহ (অবস্থান) ছুটে গেল, তার হজ্জ ছুটে গেল।" ১.
আর আরাফাহর সীমানা হলো আরাফাহ উপত্যকা অতিক্রম করার পর থেকে যেখানে মসজিদটি অবস্থিত; তবে মসজিদ এবং আরাফাহ উপত্যকা আরাফাহর অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং আরাফাহর বিপরীতে অবস্থিত পাহাড়সমূহ পর্যন্ত সমস্ত এলাকাই আরাফাহ। সুতরাং হাজ্বী এই পাহাড়ত্রয়ের নিকট অবস্থান করবেন: আন-নাবাহ, আন-নুবায়আহ এবং আত-তায়িব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত-তায়িব পাহাড়ের একটি প্রস্তরখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর সওয়ারিকে মেহরাবের দিকে মুখ করে রেখেছিলেন। ইমামের অবস্থানের জন্য এটিই সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান। তবে তিনি এবং সাধারণ মানুষ আরাফাহর যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। আর মানুষের অনুসরণের সুবিধার্থে সওয়ারির ওপর আরোহণ করে অবস্থান করা উত্তম। অতঃপর সূর্যাস্তের পর তিনি মুজদালিফার দিকে রওয়ানা হবেন এবং মাগরিবের সালাত বিলম্বিত করবেন, যাতে মুজদালিফায় গিয়ে মাগরিব ও শেষ এশার সালাত একত্রে আদায় করা যায়। তিনি সেখানে উভয় সালাতে মানুষের ইমামতি করবেন এবং মুজদালিফায় রাত যাপন করবেন। মুজদালিফার সীমানা শুরু হয় সেখান থেকে যেখান থেকে হাজ্বীগণ আরাফাহর দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ (মাজিমাইন) দিয়ে প্রস্থান করেন; তবে মাজিমাইন মুজদালিফার অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি ‘ক্বরন মুহাসসির’ পর্যন্ত বিস্তৃত, তবে ক্বরন মুহাসসির এর অন্তর্ভুক্ত নয়। মানুষ সেখান থেকে জামরাতের জন্য কঙ্কর সংগ্রহ করবে যা আঙুলের অগ্রভাগের ন্যায় ছোট হবে (খাজফ-এর

কঙ্করের মতো)। সেখান থেকে ফজর সালাতের পর রওয়ানা হবে; তবে কেউ যদি ফজর সালাতের পূর্বে এবং মধ্যরাতের পর রওয়ানা হয়, তবে তা যথেষ্ট হবে। সেখানে রাত যাপন করা হজ্জের রুকন নয়; যদি কেউ তা পরিত্যাগ করে তবে দমের (পশু কোরবানি) মাধ্যমে তার প্রতিকার করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা একে ওয়াজিব রুকনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে মাশআরুল হারামের দিকে যাত্রা করবেন এবং কুযাহ নামক স্থানে দোয়ারত অবস্থায় অবস্থান করবেন। সেখানে অবস্থান করা ফরজ নয়। এরপর তিনি মিনার দিকে অগ্রসর হবেন এবং জাওয়াল (সূর্য ঢলে পড়া) এর পূর্বে জামরাতুল আকাবায় নয়টি কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমে শুরু করবেন, অতঃপর কোরবানি করবেন।
আর হাজীদের মধ্যে যারা সাথে করে হাদই (কোরবানির পশু) নিয়ে এসেছেন তারা কোরবানি করবেন, অতঃপর মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা চুল ছোট করবেন। এই দুটির মধ্যে যা ইচ্ছা করতে পারেন, তবে মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। অতঃপর মক্কার দিকে মনোনিবেশ করবেন এবং সেখানে তাওয়াফে ইফাজাহ পালন করবেন, যা হজ্জের একটি ফরজ রুকন। যদি আরাফাহর পূর্বে সাঈ না করে থাকেন, তবে এই তাওয়াফের পর সাঈ করবেন। আরাফাহর পূর্বের সাঈ যথেষ্ট হবে, তবে আরাফাহর পূর্বের তাওয়াফ যথেষ্ট হবে না। এরপর পুনরায় মিনায় ফিরে আসবেন এবং লোকজনকে নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করবেন। অতঃপর খুতবা প্রদান করবেন; এটি হজ্জের চারটি খুতবার মধ্যে তৃতীয় খুতবা। সেখানে তিনি মানুষের জন্য তাদের হজ্জের অবশিষ্ট আহকামসমূহ এবং প্রথম ও দ্বিতীয়বার হালাল হওয়ার বিধান এবং প্রতিটির মাধ্যমে ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের মধ্য থেকে কোনগুলো বৈধ হবে তা বর্ণনা করবেন।

---

১. এটি ইমাম মালিক তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থের কিতাবুল হাজ্জ-এ (৮৮৬) বর্ণনা করেছেন।
হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন: হাদীস: "হজ্জ হলো আরাফাহ, সুতরাং যে ব্যক্তি আরাফাহ পেল, সে হজ্জ পেল"; এটি ইমাম আহমাদ, সুনান গ্রন্থকারগণ, ইবনে হিব্বান এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেছেন: এর সনদ সহীহ। এছাড়াও দারাকুতনী ও বায়হাকী এটি আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামুর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত অবস্থায় দেখেছি। তখন নজদ অঞ্চলের কিছু লোক তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, হজ্জ কী? তিনি বললেন: "হজ্জ হলো আরাফাহ। যে ব্যক্তি 'জমা' এর রাতের (মুজদালিফার রাত) ফজর সালাতের পূর্বে উপস্থিত হবে, তার হজ্জ পূর্ণ হবে।" এটি ইমাম আহমাদের শব্দ। আবু দাউদের এক বর্ণনায়

রয়েছে: "যে ব্যক্তি ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে আরাফাহ পেল, সে হজ্জ পেল।" অন্যান্যদের শব্দাবলীও এর কাছাকাছি। দারাকুতনী ও বায়হাকীর এক বর্ণনায় রয়েছে: "হজ্জ হলো আরাফাহ, হজ্জ হলো আরাফাহ।" [তালখিসুল হাবীর: ২/২৫৫]।

(ص: 177)الأحكام السلطانية للماوردي

مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ، إِنْ كَانَ فَقِيهًا قَالَ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلسُّؤَالِ، وَيَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَتَهُ وَيَرْمِي مِنْ غَدِهِ -وَهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ يَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ- الْجِمَارَ الثَّلَاثَ بِإِحْدَى وَعِشْرِينَ حَصَاةٍ، كُلُّ جَمْرَةٍ سَبْعُ حَصَيَاتٍ، وَيَبِيتُ بِهَا لَيْلَتَهُ الثَّانِيَةَ، وَيَرْمِي مِنْ غَدِهَا -وَهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ- الْجِمَارَ الثَّلَاثَ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ الْخُطْبَةَ الرَّابِعَةَ، وَهِيَ آخِرُ الْخُطَبِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الْحَجِّ، وَيُعْلِمُ النَّاسَ أَنَّ لَهُمْ فِي الْحَجِّ نَفْرَتَيْنِ خَيَّرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمَا بِقَوْلِهِ: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة: 203] .

وَيُعْلِمُهُمْ أَنَّ مَنْ نَفَرَ مِنْ مِنًى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِهِ هَذَا سَقَطَ عَنْهُ الْمَبِيتُ بِهَا، وَالرَّمْيُ لِلْجِمَارِ مِنْ غَدِهِ، وَمَنْ أَقَامَ بِهَا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ لَزِمَهُ الْمَبِيتُ بِهَا وَالرَّمْيُ فِي غَدِهِ، وَلَيْسَ لِهَذَا الْإِمَامِ بِحُكْمِ وِلَايَتِهِ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَيُقِيمَ لِيَبِيتَ بِهَا، وَيَنْفِرُ فِي النَّفْرِ الثَّانِي مِنْ غَدِهِ فِي يَوْمِ الْحَلَّاقِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثَ عَشَرَ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهُ مَتْبُوعٌ، فَلَمْ يَنْفِرْ إِلَّا بَعْدَ اسْتِكْمَالِ الْمَنَاسِكِ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ حُكْمُ النَّفْرِ الثَّانِي انْقَضَتْ وِلَايَتُهُ، وَقَدْ أَدَّى مَا لَزِمَهُ، فَهَذِهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوِلَايَتِهِ.

وَأَمَّا السَّادِسُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: إِنْ فَعَلَ أَحَدُ الْحَجِيجِ مَا يَقْتَضِي تَعْزِيرًا أَوْ يُوجِبُ فِعْلُهُ حَدًّا، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعْزِيرُهُ وَلَا حَدُّهُ؛ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ فَلَهُ تَعْزِيرُهُ - زَجْرًا وَتَأْدِيبًا، وَفِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَحُدُّهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجِّ، وَفِي الْآخَرِ لَا يَحُدُّهُ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ الْحَجِيجِ فِيمَا تَنَازَعُوهُ مِنْ غَيْرِ أَحْكَامِ الْحَجِّ، وَفِي حُكْمِهِ بَيْنَهُمَا فِيمَا تَنَازَعُوهُ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجِّ؛ كَالزَّوْجَيْنِ إِذَا تَنَازَعَا فِي إِيجَابِ كَفَّارَةٍ لِلْوَطْءِ وَمُؤْنَةِ الْقَضَاءِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا.

وَالثَّانِي: لَا يَحْكُمُ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُ الْحَجِيجِ مَا يُوجِبُ الْفِدْيَةَ، فَلَهُ أَنْ يُجْبِرَهُ بِوُجُوبِهَا، وَيَأْمُرَهُ بِإِخْرَاجِهَا، وَهَلْ يَسْتَحِقُّ إِلْزَامَهُ لَهَا، وَيَصِيرُ خَصْمًا لَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ كَمَا فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ،

তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এককভাবে; যদি তিনি (আমীর) ফকীহ বা বিজ্ঞ আইনজ্ঞ হন, তবে তিনি বলবেন: 'কারো কি কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করার আছে?' আর যদি তিনি ফকীহ না হন, তবে তিনি কোনো জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হবেন না। তিনি মিনায় রাত যাপন করবেন এবং পরের দিন—যা প্রস্থানের দিন, অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের একাদশ দিন—সূর্য ঢলে পড়ার পর একুশটি পাথরের মাধ্যমে তিনটি জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবেন; প্রতিটি জামরায় সাতটি করে পাথর। তিনি সেখানে দ্বিতীয় রাতও যাপন করবেন এবং তার পরের দিন—যা প্রস্থানের দিন—তিনটি জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর জোহরের নামাযের পর চতুর্থ খুতবা প্রদান করবেন, যা হজ্জে বিধিবদ্ধ খুতবাসমূহের মধ্যে সর্বশেষ। তিনি মানুষকে অবহিত করবেন যে, হজ্জে তাদের জন্য দুইবার প্রস্থানের সুযোগ রয়েছে, যেখানে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর বাণীর মাধ্যমে ইখতিয়ার বা পছন্দ করার সুযোগ দিয়েছেন: {আর তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো নির্দিষ্ট দিনগুলিতে। অতঃপর যে ব্যক্তি দুই দিনের মধ্যে দ্রুত চলে যায়, তার কোনো পাপ নেই; আর যে বিলম্ব করে, তারও কোনো পাপ নেই—এ বিধান তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে} [সূরা আল-বাকারা: ২০৩]।

তিনি তাদেরকে আরও জানাবেন যে, যে ব্যক্তি আজ সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা থেকে প্রস্থান করবে, তার জন্য সেখানে রাত যাপন করা এবং পরের দিন পাথর নিক্ষেপ করার আবশ্যকতা রহিত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে, তার জন্য সেখানে রাত যাপন করা এবং পরের দিন পাথর নিক্ষেপ করা আবশ্যক হবে। এই আমীরের জন্য তার প্রশাসনিক কর্তৃত্বের কারণে প্রথম প্রস্থানের সময় প্রস্থান করা বৈধ নয়; বরং তিনি সেখানে রাত যাপনের জন্য অবস্থান করবেন এবং পরের দিন—যা মাথা মুণ্ডনের দিন, অর্থাৎ তেরোতম দিন—তিনটি জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর দ্বিতীয় প্রস্থানের সময় প্রস্থান করবেন। কারণ তিনি জনগণের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, তাই হজ্জের সমস্ত বিধান সম্পন্ন করার আগে তিনি প্রস্থান করবেন না। যখন দ্বিতীয় প্রস্থানের বিধান নির্ধারিত হবে, তখন তার প্রশাসনিক দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটবে এবং তিনি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন বলে গণ্য হবে। এই পাঁচটি বিধান তার প্রশাসনিক দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আর ষষ্ঠ বিষয়টি—যাতে মতভেদ রয়েছে—তা তিনটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত:

প্রথমটি: যদি কোনো হাজী এমন কোনো কাজ করেন যা তা'যীর বা বিবেচনামূলক শাস্তি অথবা হদ বা নির্ধারিত দণ্ডবিধি প্রয়োগের দাবি রাখে; তবে তা যদি হজ্জের কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়, তবে আমীরের জন্য তাকে তা'যীর প্রদান বা হদ কার্যকর করার অধিকার নেই। আর যদি তা হজ্জের কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় হয়, তবে অবাধ্যতা রোধ ও শাসনের উদ্দেশ্যে তিনি তাকে তা'যীর প্রদান করতে পারেন। তবে তার উপর হদ কার্যকর করার বিষয়ে দুইটি অভিমত রয়েছে:

একটি হলো: তিনি হদ কার্যকর করবেন; কারণ এটি হজ্জের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অন্যটি হলো: তিনি হদ কার্যকর করবেন না; কারণ এটি হজ্জের কার্যাবলীর বহির্ভূত বিষয়।

দ্বিতীয়টি: হজ্জের বিধান বহির্ভূত কোনো বিষয়ে হাজীদের পারস্পরিক বিরোধে আমীরের জন্য বিচার করা জায়েয নেই। তবে হজ্জের বিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের বিরোধের ক্ষেত্রে ফয়সালা করা—যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহবাসের কারণে কাফফারা ওয়াজিব হওয়া এবং কাযা পালনের ব্যয়ভার নিয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে—দুটি অভিমত রয়েছে:

একটি হলো: তিনি তাদের মধ্যে বিচার করবেন।

অন্যটি হলো: তিনি বিচার করবেন না।

তৃতীয়টি: যদি কোনো হাজী এমন কোনো কাজ করেন যার ফলে ফিদিয়া বা জরিমানা ওয়াজিব হয়, তবে আমীরের অধিকার রয়েছে তাকে তা প্রদানে বাধ্য করার এবং তা আদায়ের নির্দেশ

দেওয়ার। এখন, তাকে সেই ফিদিয়া দিতে বাধ্য করার বিষয়ে তিনি কি আইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং এই দাবির ক্ষেত্রে তিনি কি তার প্রতিপক্ষ হিসেবে গণ্য হবেন? এ বিষয়ে হদ কার্যকর করার মতো দুইটি অভিমত রয়েছে।

(ص: 178)الأحكام السلطانية للماوردي

وَيَجُوزُ لِوَالِي الْحَجِّ أَنْ يُفْتِيَ مَنِ اسْتَفْتَاهُ إِذَا كَانَ فَقِيهًا، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَحْكُمَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ مَا يَسُوغُ فِعْلُهُ إِلَّا فِيمَا يَخَافُ أَنْ يَجْعَلَهُ الْجَاهِلُ قُدْوَةً، فَقَدْ أَنْكَرَ عُمَرُ رضي الله عنه عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ لُبْسَ الْمُضَرَّجِ فِي الْحَجِّ، وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِكَ الْجَاهِلُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ فِي الْمَنَاسِكِ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَلَوْ أَقَامَ لِلنَّاسِ الْحَجَّ وَهُوَ حَالٌّ غَيْرُ مُحْرِمٍ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَصَحَّ الْحَجُّ مَعَهُ، وَهُوَ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ فِيهَا وَهُوَ غَيْرُ مُصَلٍّ لَهَا، وَلَوْ قَصَدَ النَّاسُ فِي الْحَجِّ التَّقَدُّمَ عَلَى إِمَامِهِمْ فِيهِ وَالتَّأْخِيرَ عَنْهُ جَازَ، وَإِنْ كَانَتْ مُخَالَفَةُ الْمَتْبُوعِ مَكْرُوهَةً، وَلَوْ قَصَدُوا مُخَالَفَتَهُ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ صَلَاتُهُمْ؛ لِارْتِبَاطِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَانْفِصَالِ حَجِّ النَّاسِ عَنْ حَجِّ الْإِمَامِ.

হজের আমিরের জন্য ফতোয়া প্রার্থীকে ফতোয়া প্রদান করা জায়েজ যদি তিনি ফকিহ হন, যদিও তার জন্য বিচারকার্য পরিচালনা করা জায়েজ নয়। আর যেসব কাজ করা বৈধ, তা করার ক্ষেত্রে মানুষের ওপর আপত্তি করার অধিকার তার নেই; তবে সেসব বিষয়ের কথা ভিন্ন যে ক্ষেত্রে আশঙ্কা থাকে যে কোনো মূর্খ ব্যক্তি সেটিকে অনুসরণযোগ্য আদর্শ বানিয়ে নেবে। যেমন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর হজের সময় মুদাররাজ (রঞ্জিত) বস্ত্র পরিধানের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমি আশঙ্কা করছি যে কোনো মূর্খ ব্যক্তি আপনাকে অনুসরণ করবে।" হজের আহকামের ক্ষেত্রে মানুষকে স্বীয় মাযহাব পালনে বাধ্য করার অধিকারও তার নেই। যদি তিনি ইহরামমুক্ত অবস্থায় মানুষের হজ

পরিচালনা করেন, তবে তার জন্য তা মাকরূহ হবে, কিন্তু তার সাথে সম্পাদিত হজ সহিহ হয়ে যাবে। বিষয়টি নামাজের বিপরীত, যেখানে নিজে নামাজ আদায় না করে ইমামতি করা শুদ্ধ নয়। হজের কার্যাবলিতে মানুষ যদি তাদের ইমামের আগে চলে যাওয়ার বা তার থেকে পিছিয়ে থাকার ইচ্ছা করে, তবে তা জায়েজ হবে; যদিও অনুসরণীয় ব্যক্তির বিরোধিতা করা মাকরূহ। পক্ষান্তরে যদি তারা নামাজে ইমামের বিরোধিতা করার ইচ্ছা করে, তবে তাদের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে; কারণ মুক্তাদির নামাজ ইমামের নামাজের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু মানুষের হজ ইমামের হজের থেকে স্বতন্ত্র।

(ص: 179)الأحكام السلطانية للماوردي

الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات

مدخل

...

الباب الحادى عشر: ولاية الصدقات

الصَّدَقَةُ زَكَاةٌ، وَالزَّكَاةُ صَدَقَةٌ، يَفْتَرِقُ الِاسْمُ وَيَتَّفِقُ الْمُسَمَّى، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي مَالِهِ حَقٌّ سِوَاهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ"1.

---

1 ضعيف: ضعَّفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع "4909".

الزكاة هي الحق الواجب في المال، متى قامت بحاجة الفقراء، وسدت خلة الموازين وكَفَت البائسين، وأطعمتهم من جوع وآمنتهم من خوف، وقامت بكفاية الجهاد والمجاهدين في سبيل الله.

فإذا لم تكف الزكاة، ولم تف بحاجة المحتاجين وجب في المال حق آخر سوى الزكاة، ويتحدَّد هذا الحق ويتقيّد بالكفاية.

قال تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177] .

قال الإمام القرطبيّ مستدلًّا بأن المراد بـ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} حقوق أخرى غير الزكاة بدليل ذكر الزكاة، وبها كمال البر، وقيل: المراد: الزكاة المفروضة، والأول أصح لما أخرجه الدارقطني عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: "إن في المال لحقًّا سوى الزكاة" ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآية".

قلت: والحديث -وإن كان فيه مقال فقد دلَّ على صحته معنى ما في الآية نفسها من قوله تعالى: {وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} ، فذكر الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقوله: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك يكون تكرارًا، والله أعلم.

"واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنَّه يجب صرف المال إليها، وقال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا إجماع أيضًا، وهو يقوي ما اخترناه والموفق الإله".

ويقول الإمام محمد عبده مبينًا الحكمة من فرض هذه الحقوق الأخرى غير الزكاة عند قوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} : "وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآتي، وهو ركن من أركان البر وواجب =

উপক্রমণিকা

...

একাদশ অধ্যায়: সদাকাত পরিচালনা

সদাকাহ হলো জাকাত, আর জাকাত হলো সদাকাহ। এ ক্ষেত্রে নাম ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য অভিন্ন। একজন মুসলমানের ওপর তার সম্পদের ক্ষেত্রে জাকাত ব্যতিরেকে অন্য কোনো (আবশ্যিক) হক নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জাকাত ব্যতীত সম্পদের ওপর অন্য কোনো হক নেই।"১

---

১ দুর্বল: শেখ আলবানী 'জইফ আল-জামি' (৪৯০৯) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।

জাকাত হলো সম্পদের ওপর নির্ধারিত একটি আবশ্যিক হক, যা দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণ করে, অভাবীদের দৈন্যদশা দূর করে, নিঃস্বদের জন্য যথেষ্ট হয়, তাদের ক্ষুধা নিবারণ করে ও ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য পর্যাপ্ত সংস্থানের ব্যবস্থা করে।

অতঃপর যদি জাকাত পর্যাপ্ত না হয় এবং অভাবীদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম না হয়, তবে সম্পদের ওপর জাকাত ছাড়া অন্য হক আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই হকের পরিমাণ অভাব মোচনের প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত ও সীমাবদ্ধ।

আল্লাহ তাআলা বলেন: {সততা কেবল পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোর মধ্যে নিহিত নয়; বরং সততা হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতামণ্ডলী, কিতাবসমূহ ও নবীগণের ওপর ঈমান আনল এবং সম্পদের প্রতি মায়া থাকা সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য অর্থ প্রদান করল; আর নামাজ কায়েম করল ও জাকাত প্রদান করল। এবং যারা অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করে এবং অর্থকষ্ট, দুঃখ-কষ্ট ও যুদ্ধের সময়ে ধৈর্য ধারণ করে। তারাই হলো সত্যবাদী আর তারাই মুত্তাকি।} [বাকারা: ১৭৭]।

ইমাম কুরতুবি এই দলিল পেশ করে বলেন যে, {সম্পদের প্রতি মায়া থাকা সত্ত্বেও অর্থ প্রদান করল}—এখানে জাকাত ছাড়া অন্যান্য হকের কথা বোঝানো হয়েছে; কারণ এর পরেই জাকাতের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এর মাধ্যমেই পুণ্যের পূর্ণতা অর্জিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন: এখানে ফরজ জাকাতই উদ্দেশ্য। তবে প্রথম মতটিই অধিকতর সঠিক, কারণ দারা কুতনি ফাতিমা বিনতে কায়স থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (অথবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো), তখন তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই সম্পদে জাকাত ছাড়াও হক রয়েছে।" এরপর তিনি আল-বাকারার এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: {সততা কেবল তোমাদের মুখ ফেরানোর মধ্যে নিহিত নয়...} আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

আমি (গ্রন্থকার) বলি: এই হাদিসটির সনদ নিয়ে যদিও কথা আছে, তবে আয়াতের পরবর্তী অংশ {নামাজ কায়েম করল ও জাকাত প্রদান করল}—এর অর্থই হাদিসটির সঠিকতা প্রমাণ করে। এখানে নামাজের সাথে জাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, {সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তা দান করা} দ্বারা ফরজ জাকাত উদ্দেশ্য নয়; অন্যথায় একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হতো। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

"উলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, জাকাত আদায়ের পরেও যদি মুসলমানদের ওপর কোনো চরম অভাব বা সংকট নেমে আসে, তবে সম্পদ সেদিকে ব্যয় করা ওয়াজিব। ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন: মানুষের ওপর তাদের বন্দীদের মুক্ত করা ওয়াজিব, এমনকি এতে যদি তাদের সমস্ত সম্পদও শেষ হয়ে যায়। এটিও একটি ইজমা (ঐক্যমত), যা আমাদের গৃহীত মতকে শক্তিশালী করে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।"

ইমাম মুহাম্মদ আবদুহ জাকাত ছাড়া অন্যান্য হক ফরজ করার হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে {সম্পদের প্রতি মায়া থাকা সত্ত্বেও সম্পদ দান করা} আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন: "এই দান পরবর্তী অংশে উল্লিখিত জাকাত প্রদানের চেয়ে ভিন্ন। এটি পুণ্যের অন্যতম রকন এবং এটি একটি ওয়াজিব..."

(ص: 180)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي الْأَمْوَالِ الْمُرْصَدَةِ لِلنَّمَاءِ، إِمَّا بِأَنْفُسِهَا أَوْ بِالْعَمَلِ فِيهَا؛ طُهْرَةً لِأَهْلِهَا وَمَعُونَةً لِأَهْلِ السُّهْمَانِ.

وَالْأَمْوَالُ الْمُزَكَّاةُ ضَرْبَانِ: ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ. فَالظَّاهِرَةُ: مَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ؛ كَالزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَوَاشِي، وَالْبَاطِنَةُ: مَا أَمْكَنَ إِخْفَاؤُهُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَلَيْسَ

لِوَالِي الصَّدَقَاتِ نَظَرٌ فِي زَكَاةِ الْمَالِ الْبَاطِنِ، وَأَرْبَابُهُ أَحَقُّ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَبْذُلَهَا أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ طَوْعًا فَيَقْبَلُهَا مِنْهُمْ، وَيَكُونُ فِي تَفْرِيقِهَا عَوْنًا لَهُمْ؛ وَنَظَرُهُ مُخْتَصٌّ بِزَكَاةِ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ يُؤْمَرُ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ.

وَفِي هَذَا الْأَمْرِ إِذَا كَانَ عَادِلًا فِيهَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِيجَابِ، وَلَيْسَ لَهُمُ التَّفَرُّدُ بِإِخْرَاجِهَا وَلَا تُجْزِئُهُمْ إِنْ أَخْرَجُوهَا.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إِظْهَارًا لِلطَّاعَةِ، وَإِنْ تَفَرَّدُوا بِإِخْرَاجِهَا أَجْزَأَتْهُمْ، وَلَهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا أَنْ يُقَاتِلَهُمْ عَلَيْهَا إِذَا امْتَنَعُوا مِنْ دَفْعِهَا، كَمَا قَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه مَانِعِي الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَصِيرُونَ بِالِامْتِنَاعِ مِنْ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأَمْرِ إِذَا عَدَلُوا بُغَاةً، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه مِنْ قِتَالِهِمْ إِذَا أَجَابُوا إِلَى إِخْرَاجِهَا بِأَنْفُسِهِمْ.

وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي هَذِهِ الْوِلَايَةِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا عَادِلًا عَالِمًا بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ إِنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ، وَإِنْ كَانَ مُنَفِّذًا قَدْ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ عَلَى قَدْرٍ يَأْخُذُهُ جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَلَّدَهَا مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَاتُ مِنْ ذِي الْقُرْبَى، وَلَكِنْ يَكُونُ رِزْقُهُ عَنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ.

وَلَهُ إِذَا قُلِّدَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يُقَلَّدَ أَخْذَهَا وَقَسْمَهَا، فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا سَنَشْرَحُ.

= كالزكاة، وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل في غير وقت أداء الزكاة، بأن يرى الواحد مضطرًا بعد أداء الزكاة أو قبل تمام الحول، وهو لا يشترط فيه نصاب معين، بل هو حسب الاستطاعة، فإذا كان لا يملك إلا رغيفًا، ورأى مضطرًا إليه في حال استغنائه عنه بأن لم يكن محتاجًا إليه لنفسه، أو لمن تجب عليه نفقته، وجب عليه بذله، وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في ذلك، بل أمر الله تعالى المؤمن

أن يعطى من غير الزكاة". [يراجع في ذلك فقه الزكاة لشيخنا الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله تعالي] .

জাকাত ওই সকল সম্পদের ওপর আবশ্যক হয় যা বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত, তা প্রাকৃতিকভাবেই হোক কিংবা তাতে শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে হোক; যা এর মালিকদের জন্য পবিত্রতা এবং হকদারগণের জন্য সহায়তা স্বরূপ।

জাকাতযোগ্য সম্পদ দুই প্রকার: প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য সম্পদ হলো যা গোপন রাখা সম্ভব নয়; যেমন শস্য, ফলমূল এবং গবাদি পশু। আর অপ্রকাশ্য সম্পদ হলো যা গোপন রাখা সম্ভব, যেমন সোনা, রুপা এবং বাণিজ্যিক পণ্য। অপ্রকাশ্য সম্পদের জাকাত তদারকির ক্ষেত্রে জাকাত কর্মকর্তার কোনো এখতিয়ার নেই, বরং এর মালিকগণই তা নিজ উদ্যোগে প্রদান করার অধিক হকদার; তবে সম্পদের মালিকগণ যদি স্বেচ্ছায় তা প্রদান করেন, তবে তিনি তাদের থেকে তা গ্রহণ করবেন এবং তা বণ্টনের ক্ষেত্রে তাদের জন্য সহায়ক হবেন। আর তার তদারকি কেবল প্রকাশ্য সম্পদের জাকাতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, যা মালিকগণকে তার নিকট সোপর্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আর এই বিষয়ে—যদি শাসক ন্যায়পরায়ণ হন—দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি: এটি আবশ্যিকতার পর্যায়ভুক্ত, তাদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তা প্রদান করার অবকাশ নেই এবং তারা নিজেরা তা প্রদান করলে তা যথেষ্ট হবে না।

দ্বিতীয় অভিমত: এটি আনুগত্য প্রকাশের খাতিরে মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় হিসেবে গণ্য হবে; আর যদি তারা স্বতন্ত্রভাবে তা আদায় করে দেয়, তবে তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে উভয় মতানুসারেই, তারা যদি তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তবে শাসকের অধিকার রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার; যেমনটি আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কারণ ন্যায়পরায়ণ কর্তৃপক্ষের আনুগত্য থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তারা বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য হয়। তবে ইমাম আবু হানিফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন, যদি তারা নিজেরা জাকাত প্রদানের বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দেয়।

এই পদের জন্য বিবেচিত শর্তাবলি হলো—ব্যক্তিকে স্বাধীন, মুসলিম, ন্যায়পরায়ণ এবং জাকাতের বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হবে, যদি সে পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যদি সে কেবল একজন নির্বাহী হয় যাকে ইমাম নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেছেন, তবে তার জন্য এ বিষয়ে জ্ঞান রাখা অপরিহার্য নয়। আর যাদের জন্য সদকা

গ্রহণ করা হারাম (যেমন নবী পরিবারের নিকটাত্মীয়), তাদের পক্ষেও এই দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ, তবে তাদের পারিশ্রমিক জনকল্যাণমূলক খাত থেকে প্রদান করা হবে।
যখন তাকে এই দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তখন তার তিনটি অবস্থা হতে পারে:
প্রথমটি: তাকে জাকাত গ্রহণ এবং বণ্টন—উভয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে; এমতাবস্থায় তিনি উভয় কাজই আঞ্জাম দেবেন যেভাবে আমরা সামনে ব্যাখ্যা করব।

= জাকাতের ন্যায় অন্যান্য দান, আর তা হচ্ছে যখন জাকাত আদায়ের সময় ছাড়াও দানের প্রয়োজন দেখা দেয়; যেমন কেউ জাকাত দেওয়ার পরে বা বছর পূর্ণ হওয়ার আগে কাউকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত দেখল। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট নিসাব বা ন্যূনতম সম্পদের পরিমাণ শর্ত নয়, বরং তা সামর্থ্য অনুযায়ী হবে। সুতরাং যদি কারো কাছে কেবল একটি রুটি থাকে এবং সে অন্যকে এর প্রতি মুখাপেক্ষী দেখে এমতাবস্থায় যে সে নিজে তা থেকে অমুখাপেক্ষী অথবা যাদের ভরণপোষণ তার ওপর আবশ্যক তাদেরও এর প্রয়োজন নেই, তবে তা দান করা তার জন্য আবশ্যক। কেবল অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিই যে এর হকদার তা নয়, বরং আল্লাহ তাআলা মুমিনকে জাকাত ছাড়াও দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। [দ্রষ্টব্য: আমাদের শায়খ ড. ইউসুফ আল-কারজাভি—আল্লাহ তাআলা তাকে হিফাজত করুন—এর ‘ফিকহুয জাকাত’]।

(ص: 181)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالثَّانِي: أَنْ يُقَلَّدَ أَخْذَهَا، وَيُنْهَى عَنْ قِسْمَتِهَا، فَنَظَرُهُ مَقْصُورٌ عَنِ الْأَخْذِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنَ الْقَسْمِ، وَالْمُقَلَّدُ بِهِمَا بِتَأْخِيرِ قَسْمِهَا مَأْثُومٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ تَقْلِيدَهَا لِمَنْ يَنْفَرِدُ بِتَعْجِيلِ قَسْمِهَا.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يُطْلَقَ تَقْلِيدُهُ عَلَيْهَا، فَلَا يُؤْمَرُ بِقَسْمِهَا، وَلَا يُنْهَى عَنْهُ، فَيَكُونُ بِإِطْلَاقِهِ مَحْمُولًا عَلَى عُمُومِهِ فِي الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَخْذِهَا وَقَسْمِهَا، فَصَارَتِ الصَّدَقَاتُ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْأَخْذِ وَالْقَسْمِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ، وَسَنَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الِاخْتِصَارِ.

"زكاة المواشي":

وَنَبْدَأُ بِأَحْكَامِ أَخْذِهَا فَنَقُولُ: إِنَّ الْأَمْوَالَ الْمُزَكَّاةَ أَرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَا: الْمَوَاشِي وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، وَسُمِّيَتْ مَاشِيَةً لِرَعْيِهَا وَهِيَ مَاشِيَةٌ.

فَأَمَّا الْإِبِلُ: فَأَوَّلُ نِصَابِهَا خَمْسٌ، وَفِيهَا إِلَى تِسْعٍ شَاةٌ جَذَعَةٌ[1] مِنَ الضَّأْنِ أَوْ ثَنِيَّةٌ[2] مِنَ الْمَعْزِ، وَالْجَذَعُ مِنَ الْغَنَمِ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالثَّنِيُّ مِنْهَا مَا اسْتَكْمَلَ سَنَةً، فَإِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ عَشْرًا فَفِيهَا إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْعِشْرِينَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ عَدَلَ فِي فَرْضِهَا عَنِ الْغَنَمِ، وَكَانَ فِيهَا إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ الَّتِي اسْتَكْمَلَتِ السَّنَةَ، فَإِنْ عُدِمَتْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَهِيَ مَا اسْتَكْمَلَتْ سَنَتَيْنِ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ[3]، وَهِيَ مَا اسْتَكْمَلَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَاسْتَحَقَّتْ

---

1 الجذعة من ولد المعز: التي قاربت الحمل. [المطلع: ص182] .

2 الثني من الإبل: الذي يلقي ثنيته، وذلك في السادسة، ومنَ الغنم الداخل في السنة الثالثة، تيسًا كان أو كبشًا. [اللسان: 14/ 123] .

3 إذا وضعت الناقة ولدًا في أول النتاج فولدها ربع والأنثى ربعة، وإن كان في آخره فهو هبع والأنثى هبعة، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، فإذا استكمل الحول ودخل في الثانية فهو ابن مخاض، والأنثى بنت مخاض، وواحدة المخاض خلفة جنس اسمها، وإنما سمي بذلك لأنَّ أمه قد ضربها الفحل فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل وهي الحوامل، فلا يزال ابن مخاض السنة الثانية كلها، فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون، فإذا مضت الثالثة ودخل في الرابعة فهو حق والأنثى حقة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تركب، ويحمل عليها، فإذا دخلت في الخامسة فالذكر ثني والأنثى ثنية، وهما أدنى ما يجزئ في الأضاحي من الإبل

والبقر والمعز، فإذا دخل في السابعة فالذكر رباع والأنثى رباعية، فإذا دخل في الثامنة فالذكر السدس وسديس لفظ الذكر والأنثى فيه سواء، فإذا دخل في التاسعة فهو بازل، والأنثى بازل بغير هاء، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، ثم ليس له اسم، لكن يقال: مخلف عام ومخلف عامين وبازل عامين؛ لطلوع بازله وهو نابه، ثم لا اسم له بعد ذلك. [المطلع: 1/ 124] .

দ্বিতীয়ত: তাকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করা এবং তা বণ্টনে নিষেধ করা। সেক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব কেবল আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তিনি তা বণ্টনে নিষিদ্ধ থাকবেন। আর এই দুই কাজের (আদায় ও বণ্টন) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি যাকাত বণ্টনে বিলম্ব করেন তবে তিনি গুনাহগার হবেন, যদি না তিনি যাকাত বণ্টনের দায়িত্ব এমন কাউকে প্রদান করেন যিনি এককভাবে তা দ্রুত বণ্টনের দায়িত্ব পালন করবেন।

তৃতীয়ত: তার উপর যাকাতের দায়িত্ব নিরঙ্কুশভাবে অর্পণ করা, অর্থাৎ তাকে বণ্টনের আদেশও দেওয়া হবে না আবার তা থেকে নিষেধও করা হবে না। এক্ষেত্রে তার নিরঙ্কুশ দায়িত্ব আদায় ও বণ্টন—উভয় বিষয়ের ওপরই সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং যাকাত আদায় ও বণ্টন—উভয় বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং এদের প্রত্যেকেরই পৃথক বিধান রয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে এ দুটি বিষয় একত্রে আলোচনা করব।

"গবাদি পশুর যাকাত":

আমরা যাকাত আদায়ের বিধানাবলী দিয়ে শুরু করছি এবং বলছি যে: যাকাতযোগ্য সম্পদ চার প্রকার:

প্রথমত: গবাদি পশু। আর তা হলো উট, গরু এবং ছাগল বা ভেড়া। বিচরণ করার সময় এগুলো হেঁটে বেড়ায় বলে একে 'মাশিয়া' (বিচরণশীল পশু) নামকরণ করা হয়েছে।

উটের ক্ষেত্রে: এর প্রথম নিসাব হলো পাঁচটি। পাঁচটি থেকে নয়টি উট পর্যন্ত যাকাত হলো ভেড়ার মধ্য থেকে একটি 'জাযা' (ছয় মাস বয়সী) অথবা ছাগলের মধ্য থেকে একটি 'সানিয়্যাহ' (এক বছর পূর্ণকারী)। ভেড়ার ক্ষেত্রে 'জাযা' হলো যার বয়স ছয় মাস হয়েছে, আর 'সানি' হলো যার এক বছর পূর্ণ হয়েছে। যখন উটের সংখ্যা দশটিতে পৌঁছাবে, তখন চৌদ্দটি পর্যন্ত দু'টি ভেড়া বা ছাগল দিতে হবে। পনেরো থেকে উনিশটি পর্যন্ত তিনটি ভেড়া বা ছাগল এবং বিশ থেকে চব্বিশটি পর্যন্ত চারটি ভেড়া বা ছাগল দিতে হবে। যখন পঁচিশটিতে পৌঁছাবে, তখন এর

নির্ধারিত ফরয বিধান ভেড়া বা ছাগল থেকে পরিবর্তিত হবে। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশটি পর্যন্ত একটি 'বিনতে মাখাদ' (এক বছর পূর্ণকারী মাদী উট) দিতে হবে। যদি তা না পাওয়া যায়, তবে একটি পুরুষ 'ইবনে লাবুন' (দুই বছর পূর্ণকারী পুরুষ উট) দিতে হবে। যখন উটের সংখ্যা ছত্রিশটিতে পৌঁছাবে, তখন পঁয়তাল্লিশটি পর্যন্ত একটি 'বিনতে লাবুন' (দুই বছর পূর্ণকারী মাদী উট) দিতে হবে। যখন ছেচল্লিশটিতে পৌঁছাবে, তখন ষাটটি পর্যন্ত একটি 'হিক্কাহ' (তিন বছর পূর্ণকারী মাদী উট) দিতে হবে, যা উপযুক্ত হয়েছে...

---

১ ছাগী বাচ্চার মধ্যে 'জাযা' হলো: যা গর্ভধারণের নিকটবর্তী হয়েছে।

২ উটের মধ্যে 'সানি' হলো: যার সামনের দাঁত পড়ে গেছে, আর এটি ষষ্ঠ বছরে ঘটে। আর ছাগল বা ভেড়ার মধ্যে 'সানি' হলো যা তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে, তা পাঠা হোক বা ভেড়া হোক।

৩ উষ্ট্রী যদি প্রজনন ঋতুর শুরুতে বাচ্চা প্রসব করে, তবে তার বাচ্চাকে 'রুব' এবং মাদী হলে 'রুবা' বলা হয়। আর যদি শেষে হয় তবে তাকে 'হাবা' এবং মাদী হলে 'হাবা' বলা হয়। যখন বাচ্চাটি মায়ের থেকে আলাদা হয়, তখন তাকে 'ফাসিল' বলা হয়। যখন তার এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করে, তখন তাকে 'ইবনে মাখাদ' এবং মাদীকে 'বিনতে মাখাদ' বলা হয়। 'মাখাদ' শব্দটি মূলত গর্ভবতী উটের একটি সমষ্টিগত নাম; এর নামকরণ এ জন্য করা হয়েছে যে, তার মা পুনরায় গর্ভবতী হয়েছে এবং গর্ভবতী উটের দলে শামিল হয়েছে। দ্বিতীয় বছর পুরোটা সময় তাকে 'ইবনে মাখাদ' বলা হয়। যখন দুই বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করে, তখন তাকে 'ইবনে লাবুন' এবং মাদীকে 'বিনতে লাবুন' বলা হয়। যখন তৃতীয় বছর অতিক্রান্ত হয়ে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করে, তখন তাকে 'হিক' এবং মাদীকে 'হিক্কাহ' বলা হয়। এই নামকরণ করা হয়েছে কারণ সে তখন আরোহন বা পিঠে বোঝা বহনের উপযুক্ত হয়েছে। যখন পঞ্চম বছরে পদার্পণ করে, তখন পুরুষকে 'সানি' এবং মাদীকে 'সানিয়্যাহ' বলা হয়; আর উট, গরু ও ছাগলের মধ্যে কুরবানীর জন্য এটিই সর্বনিম্ন বয়স যা যথেষ্ট হয়। যখন সপ্তম বছরে পদার্পণ করে, তখন পুরুষকে 'রাবা' এবং মাদীকে 'রাবাইয়্যাহ' বলা হয়। যখন অষ্টম বছরে পদার্পণ করে, তখন পুরুষকে 'সাদাস' বলা হয় এবং 'সাদিস' শব্দটি নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে ব্যবহৃত হয়। যখন নবম বছরে পদার্পণ করে, তখন তাকে 'বাযিল' বলা হয় এবং মাদীর ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত বর্ণ ছাড়াই 'বাযিল' বলা হয়। যখন দশম বছরে পদার্পণ করে, তখন তাকে 'মুখলিফ' বলা হয়, এরপর আর কোনো বিশেষ নাম নেই। তবে বলা হয়:

'এক বছরের মুখলিফ', 'দুই বছরের মুখলিফ' বা 'দুই বছরের বাযিল'; তার 'বাযিল' তথা সামনের দাঁত ওঠার কারণে। এরপর এর আর কোনো নাম নেই।

الرُّكُوبَ وَطُرُوقَ الْفَحْلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ، وَهِيَ مَا اسْتَكْمَلَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا إِلَى تِسْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ حِقَّتَانِ، وَهَذَا مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ وَانْعَقَدَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ ذَلِكَ؛ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْفَرْضُ الْمُبْتَدَأُ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا اعْتِبَارَ بِالزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَثَلَاثِينَ فَيَكُونَ بِهَا حِقَّةٌ وَابْنَتَا لَبُونٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً كَانَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَيَكُونُ فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ، وَفِي مِائَةٍ وَسِتِّينَ أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَسَبْعِينَ حِقَّةٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَثَمَانِينَ حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَتِسْعِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَحَدُ فَرْضَيْنِ إِمَّا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا إِلَّا أَحَدُ الْفَرْضَيْنِ أُخِذَ، وَإِنْ وُجِدَا مَعًا أَخَذَ الْعَامِلُ أَفْضَلَهُمَا، وَقِيلَ: يَأْخُذُ الْحِقَاقَ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَنْفَعَةً وَأَقَلُّ مُؤْنَةً، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فِيمَا زَادَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ؛ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

وَأَمَّا الْبَقَرُ: فَأَوَّلُ نِصَابِهَا ثَلَاثُونَ، وَفِيهَا تَبِيعٌ ذَكَرٌ، وَهُوَ مَا اسْتَكْمَلَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَقَدَرَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ، فَإِنْ أَعْطَى تَبِيعَةً أُنْثَى قُبِلَتْ مِنْهُ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ

أُنْثَى، وَهِيَ الَّتِي قَدِ اسْتَكْمَلَتْ سَنَةً، فَإِنْ أَعْطَى مُسِنًّا ذَكَرًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِنْ كَانَ فِي بَقَرِهِ أُنْثَى، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُورًا فَقَدْ قِيلَ: يُقْبَلُ الْمُسِنُّ الذَّكَرُ وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ.

وَاخْتُلِفَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي إِحْدَى رِوَايَاتِهِ: يُؤْخَذُ مِنْ خَمْسِينَ بَقَرَةٍ مُسِنَّةٌ وَرُبُعٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شَيْءَ فِيهَا بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَيَجِبُ فِيهَا تَبِيعَانِ، ثُمَّ فِيمَا بَعْدَ السِّتِّينَ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ؛ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، فَيَكُونُ فِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثَةُ أَتْبِعَةٍ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ وَفِي مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ مُسِنَّتَانِ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَحَدُ فَرْضَيْنِ كَالْمِائَتَيْنِ مِنَ الْإِبِلِ، إِمَّا أَرْبَعَةُ أَتْبِعَةٍ أَوْ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ الْعَامِلُ مِنْهُمَا مَا وَجَدَ،

আরোহণ এবং প্রজননক্ষম হওয়া; অতঃপর উটের সংখ্যা যখন একষট্টিতে পৌঁছাবে, তখন পঁচাত্তর পর্যন্ত তাতে একটি ‘জাযআহ’ ওয়াজিব হবে, যা চার বছর পূর্ণ করেছে। যখন ছিয়াত্তরে পৌঁছাবে, তখন নব্বই পর্যন্ত তাতে দুটি ‘বিন্তে লাবুন’ দিতে হবে। যখন একানব্বই হবে, তখন একশ বিশ পর্যন্ত দুটি ‘হিক্কাহ’ প্রদান করতে হবে। এটিই শরয়ি দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত এবং এর ওপর ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে সংখ্যা একশ বিশের অধিক হলে সে ক্ষেত্রে বিধান কী হবে, তা নিয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা বলেন: নতুন করে প্রাথমিক ফরযের নিয়ম শুরু হবে। ইমাম মালিক বলেন: একশ ত্রিশে না পৌঁছানো পর্যন্ত অতিরিক্ত সংখ্যার কোনো বিচার হবে না; একশ ত্রিশে পৌঁছালে একটি হিক্কাহ ও দুটি বিন্তে লাবুন দিতে হবে। ইমাম শাফেঈ বলেন: একশ বিশের ওপর এক বৃদ্ধি পেলেই প্রতি চল্লিশে একটি বিন্তে লাবুন এবং প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কাহ ওয়াজিব হবে। সেই হিসেবে একশ একুশটিতে তিনটি বিন্তে লাবুন, একশ ত্রিশটিতে একটি হিক্কাহ ও দুটি বিন্তে লাবুন, একশ পঞ্চাশটিতে তিনটি হিক্কাহ, একশ ষাটটিতে চারটি বিন্তে লাবুন, একশ সত্তরটিতে একটি হিক্কাহ ও তিনটি বিন্তে লাবুন, একশ আশিটিতে দুটি হিক্কাহ ও দুটি বিন্তে লাবুন এবং একশ নব্বইটিতে তিনটি হিক্কাহ ও একটি বিন্তে লাবুন ওয়াজিব হবে। অতঃপর যখন দুইশতে পৌঁছাবে, তখন দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি ফরয হবে—হয় চারটি হিক্কাহ অথবা পাঁচটি বিন্তে লাবুন। যদি পালের মধ্যে দুটির মধ্যে যেকোনো একটির অস্তিত্ব থাকে, তবে সেটিই গ্রহণ করা হবে। আর যদি উভয় প্রকারই বিদ্যমান থাকে, তবে যাকাত আদায়কারী যেটি অধিক উত্তম সেটি গ্রহণ

করবেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হিক্কাহ গ্রহণ করবেন; কারণ এর উপযোগিতা বেশি এবং লালন-পালনের ব্যয় কম। অতঃপর এই একই নিয়মে অতিরিক্তের ক্ষেত্রে প্রতি চল্লিশে একটি বিন্তে লাবুন এবং প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কাহ গণ্য হবে।

আর গরুর যাকাতের ক্ষেত্রে: এর প্রথম নিসাব হলো ত্রিশটি, যাতে একটি পুরুষ 'তাবি' (বাছুর) ওয়াজিব হয়, যা ছয় মাস বয়স পূর্ণ করেছে এবং মায়ের অনুসরণ করে চলার সামর্থ্য রাখে। যদি মালিক মাদী 'তাবিয়াহ' দান করে, তবে তাও গ্রহণ করা হবে। যখন সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছাবে, তখন একটি মাদী 'মুসিন্নাহ' ওয়াজিব হবে, যা এক বছর পূর্ণ করেছে। যদি মালিক পুরুষ 'মুসিন' দেয়, তবে তা গ্রহণ করা হবে না যদি তার গরুর পালে মাদী গরু থাকে। আর যদি পালের সবগুলোই পুরুষ গরু হয়, তবে কেউ বলেছেন: পুরুষ মুসিন গ্রহণ করা হবে, আবার কেউ বলেছেন: তা গ্রহণ করা হবে না।

চল্লিশের অতিরিক্ত গরুর যাকাত নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা তাঁর একটি বর্ণনা অনুযায়ী বলেন: পঞ্চাশটি গরু থেকে একটি মুসিন্নাহ এবং এর এক-চতুর্থাংশ (মূল্য হিসেবে) নেওয়া হবে। ইমাম শাফেঈ বলেন: চল্লিশের পর থেকে ষাট পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মাঝখানের সংখ্যায় কিছু ওয়াজিব হবে না। ষাট পূর্ণ হলে তাতে দুটি 'তাবি' ওয়াজিব হবে। অতঃপর ষাটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রতি ত্রিশটিতে একটি 'তাবি' এবং প্রতি চল্লিশটিতে একটি 'মুসিন্নাহ' দিতে হবে। সেই হিসেবে সত্তরটিতে একটি মুসিন্নাহ ও একটি তাবি, আশিটিতে দুটি মুসিন্নাহ, নব্বইটিতে তিনটি তাবি, একশটিতে দুটি তাবি ও একটি মুসিন্নাহ, একশ দশটিতে দুটি মুসিন্নাহ এবং একশ বিশটিতে উটের দুইশর বিধানের মতো দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি ফরয হবে—হয় চারটি তাবি অথবা তিনটি মুসিন্নাহ। বলা হয়েছে: যাকাত আদায়কারী এর মধ্যে যা বিদ্যমান পাবেন, তাই গ্রহণ করবেন।

(ص: 183)الأحكام السلطانية للماوردي

فَإِنْ وَجَدَهُمَا أَخَذَ أَفْضَلَهُمَا وَقِيلَ: يَأْخُذُ الْمُسِنَّاتِ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْقِيَاسُ فِيمَا زَادَ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.

وَأَمَّا الْغَنَمُ: فَأَوَّلُ نِصَابِهَا أَرْبَعُونَ، وَفِيهَا إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنَ الْمَعْزِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا صِغَارًا دُونَ الْجِذَاعِ وَالثَّنَايَا، فَيُؤْخَذُ مِنْهَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ صَغِيرَةٌ دُونَ الْجَذَعِ وَالثَّنِيَّةِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُؤْخَذُ إِلَّا جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ، فَإِذَا صَارَتْ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْ شَاةٍ، فَإِذَا صَارَتْ مِائَتَيْ شَاةٍ وَشَاةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ اسْتَكْمَلَهَا مِنْ بَعْدِ الْأَرْبَعِمِائَةِ شَاةٌ، وَيُضَمُّ الضَّأْنُ إِلَى الْمَعْزِ، وَالْجَوَامِيسُ إِلَى الْبَقَرِ، وَالْبَخَاتِيُّ إِلَى الْعِرَابِ؛ لِأَنَّهُمَا نَوْعَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَا يُضَمُّ الْإِبِلُ إِلَى الْبَقَرِ، وَلَا الْبَقَرُ إِلَى الْغَنَمِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَيُجْمَعُ مَالُ الْإِنْسَانِ فِي الزَّكَاةِ وَإِنْ تَفَرَّقَتْ أَمْوَالُهُ، وَالْخُلَطَاءُ يُزَكُّونَ زَكَاةَ الْوَاحِدِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهَا شَرَائِطُ الْخُلْطَةِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَأْثِيرَ لِلْخُلْطَةِ حَتَّى يَمْلِكَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نِصَابًا، فَيُزَكُّونَ زَكَاةَ الْخُلْطَةِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا اعْتِبَارَ بِالْخُلْطَةِ، وَيُزَكِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَالَهُ عَلَى انْفِرَادِهِ1.

وَزَكَاةُ الْمَوَاشِي تَجِبُ بِشَرْطَيْنِ2:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ سَائِمَةً تَرْعَى الْكَلَأَ فَتَقِلُّ مُؤْنَتُهَا وَيَتَوَفَّرُ دَرُّهَا وَنَسْلُهَا، فَإِنْ كَانَتْ

---

1 قال ابن مفلح المقدسي من الحنابلة: الخلطة مؤثرة في الزكاة، ولو لم يبلغ مال كل خليط، ولا أثر خلطة لمن ليس من أهل الزكاة، ولا في دون نصاب، ولا خلطة لغاصب بمغصوب، فإذا خلط نفسان فأكثر من أهل الزكاة ماشية لهم جميع الحول، فأكثر خلطة أعيان بأن يملكا مالًا مشاعًا بإرث أو بشراء أو غيره، أو خلطة أوصاف بأن يتميز مال كل واحد عن الآخر، فلو استأجر لرعي غنمه بشاة منها فحال ولم يفردها، فهما خليطان، وإن أفردها فنقص النصاب فلا زكاة، لكن يعتبر في خلطة الأوصاف أن لا يتميز في المرعى والمسرح والمبيت وهو المراح والمحلب وهو الموضع الذي تحلب فيه، وقيل: وآنيته والفجل. ذكره الخرقي والمحرّر، وقدم في المستوعب

إسقاط المحلب وزاد الراعي وفسر المسرح بموضع رعيها وشربها، وأن أحمد نصَّ على ما ذكروه وفسر في منتهي الغاية، والمسرح بموضع الرعي، مع أنه جمع بينهما في المحرر متابعة للخرقي. [الفروع: 2/ 293] :

2 قلت: بل هناك شرطان آخران هما:

أن تبلغ النصاب.

ألا تكون عاملة.

যদি তিনি উভয়কে (তবি’ ও মুসিন্নাহ) পান, তবে তাদের মধ্যে যা অধিক উত্তম তা গ্রহণ করবেন। আর কারো কারো মতে, তিনি মুসিন্নাহগুলো গ্রহণ করবেন। অতঃপর এই অনুপাত অনুসারে এর অতিরিক্ত সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রতি ত্রিশটিতে একটি তবি’ এবং প্রতি চল্লিশটিতে একটি মুসিন্নাহ ওয়াজিব হবে।

আর বকরির (ভেড়া ও ছাগল) ক্ষেত্রে: এর প্রথম নিসাব হলো চল্লিশটি। চল্লিশ থেকে একশ বিশটি পর্যন্ত একটি জাযআহ (ভেড়া) অথবা ছাগলের মধ্য থেকে একটি ছানিয়াহ ওয়াজিব। তবে যদি সবকটিই ছোট হয় যা জাযআহ বা ছানিয়াহর বয়সের নিচে, তবে ইমাম শাফিঈর মাযহাব অনুযায়ী জাযআহ বা ছানিয়াহর চেয়ে ছোট একটি বকরি গ্রহণ করা হবে।

ইমাম মালিক রহ. বলেন: জাযআহ অথবা ছানিয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না। যখন বকরির সংখ্যা একশ একুশটি হবে, তখন থেকে দুইশ পর্যন্ত দুটি বকরি ওয়াজিব। যখন দুইশ একটি হবে, তখন তিনটি বকরি ওয়াজিব—যতক্ষণ না চারশতে পৌঁছায়। যখন চারশতে পৌঁছাবে তখন চারটি বকরি ওয়াজিব হবে। অতঃপর চারশর পর প্রতি পূর্ণ একশতে একটি করে বকরি ওয়াজিব হবে। এবং ভেড়াকে ছাগলের সাথে, মহিষকে গরুর সাথে এবং খুরাসানি উটকে আরবি উটের সাথে একত্র করা হবে; কেননা তারা একই প্রজাতির দুটি প্রকার। কিন্তু উটকে গরুর সাথে এবং গরুকে বকরির সাথে একত্র করা হবে না প্রজাতির ভিন্নতার কারণে। আর জাকাতের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির সম্পদ একত্র করা হবে যদিও তার সম্পদ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকে। আর অংশীদারগণ (খুলতা) একজন ব্যক্তির জাকাতের ন্যায় জাকাত প্রদান করবে যদি তাতে অংশীদারিত্বের শর্তাবলি বিদ্যমান থাকে। ইমাম মালিক রহ. বলেন: অংশীদারিত্বের কোনো প্রভাব নেই যতক্ষণ না তাদের মধ্যে কেউ একজন নিসাবের মালিক হয়, অতঃপর তারা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জাকাত প্রদান করবে। আর ইমাম আবু হানিফা রহ.

বলেন: অংশীদারিত্বের কোনো ধর্তব্য নেই, বরং তাদের প্রত্যেকে পৃথকভাবে নিজ নিজ মালের জাকাত আদায় করবে।১

আর গবাদি পশুর জাকাত দুটি শর্তে ওয়াজিব হয়:২

তার মধ্যে একটি হলো: সেগুলোকে 'সায়িমা' বা মুক্তচারী হতে হবে, যা চারণভূমিতে ঘাস খেয়ে বিচরণ করে, ফলে তার ভরণপোষণের খরচ কম হয় এবং তার দুধ ও বংশবৃদ্ধি বেশি হয়। যদি তা...

---

১ হাম্বলি মাযহাবের ইবনে মুফলিহ আল-মাকদিসি রহ. বলেন: জাকাতের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব (খুলতা) প্রভাব বিস্তারকারী, যদিও প্রত্যেক অংশীদারের মাল পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না হয়। আর জাকাত প্রদানের অযোগ্য ব্যক্তি এবং নিসাবের কম মালের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের কোনো প্রভাব নেই। তেমনিভাবে জবরদখলকারীর মালের সাথে জবরদখলকৃত মালের কোনো অংশীদারিত্ব কার্যকর হবে না। সুতরাং যখন জাকাত প্রদানের যোগ্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সারা বছর তাদের গবাদি পশু একত্র রাখে—চাই তা মূল সম্পদে অংশীদারিত্বের (খুলতাতুল আ'ইয়ান) মাধ্যমে হোক, যেমন উত্তরাধিকার বা ক্রয়ের মাধ্যমে কোনো অবিভক্ত মালের মালিক হওয়া, অথবা বৈশিষ্ট্যে অংশীদারিত্বের (খুলতাতুল আওসাফ) মাধ্যমে হোক যেখানে প্রত্যেকের মাল পৃথক থাকে কিন্তু কিছু বিষয়ে একত্র থাকে। যেমন কেউ যদি তার বকরি চরানোর জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে একটি বকরি প্রদান করে এবং বছর অতিক্রান্ত হয় কিন্তু সেটিকে পৃথক না করে, তবে তারা উভয় অংশীদার হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সেটিকে পৃথক করে ফেলে এবং নিসাব অপূর্ণ হয়ে যায় তবে জাকাত নেই। তবে বৈশিষ্ট্যের অংশীদারিত্বে শর্ত হলো চারণভূমি, যাতায়াতের পথ, রাত্রি যাপনের স্থান (গোয়াল), দোহনের স্থান যেন পৃথক না হয়। বলা হয়েছে: পাত্র এবং রাখালও। এটি আল-খিরাকি এবং আল-মুহাররার গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আল-মুসতাউআব গ্রন্থে দোহনের স্থান বাদ দেওয়া হয়েছে এবং রাখালকে যুক্ত করা হয়েছে। আল-মাসরাহ (যাতায়াতের পথ) এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে চরা ও পানি পানের স্থান হিসেবে। ইমাম আহমাদ রহ. তাদের উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপরই মত দিয়েছেন। মুনতাহাল গায়াহ গ্রন্থে আল-মাসরাহ-কে চারণভূমি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যদিও মুহাররার গ্রন্থে খিরাকিকে অনুসরণ করে উভয়কে একত্র করা হয়েছে। [আল-ফুরু: ২/২৯৩] :

২ আমি (সম্পাদক) বলছি: বরং এখানে আরও দুটি শর্ত রয়েছে, তা হলো:

নিসাব পরিমাণ হওয়া।

কাজের পশু (শ্রমজীবী) না হওয়া।

(ص: 184)الأحكام السلطانية للماوردي

عَامِلَةً أَوْ مَعْلُوفَةً لَمْ تَجِبْ فِيهَا زَكَاةٌ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيّ، وَأَوْجَبَهَا مَالِكٌ كَالسَّائِمَةِ1، وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ الَّذِي يُسْتَكْمَلُ فِيهِ النَّسْلُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" 2.

وَالسِّخَالُ3 تُزَكَّى بِحَوْلِ أُمَّهَاتِهَا إِذَا وُلِدَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ وَكَانَتْ الْأُمَّهَاتُ نِصَابًا، فَإِنْ نَقَصَتِ الْأُمَّهَاتُ عَنِ النِّصَابِ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تُزَكَّى بِحَوْلِ الْأُمَّهَاتِ إِذَا بَلَغَتَا نِصَابًا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيّ أَنَّهَا يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْحَوْلُ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ النِّصَابِ.

وَلَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَأَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي إِنَاثِ الْخَيْلِ السَّائِمَةِ دِينَارًا عَنْ كُلِّ فَرَسٍ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ" 4.

---

1 قال ابن تيمية: ومن شرطها أن تكون سائمة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "ليس في العوامل صدقة" رواه أبو داود، وروى عن علي ومعاذ وجابر أنهم قالوا: لا صدقة في البقر العوامل، ومالك والليث يقولان: فيها الصدقة. [كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: 25/ 38]

.

قال فضيلة الشيخ القرضاوي: هذا ما ذهب إليه الجمهور، وخالفهم في ذلك ربيعة ومالك والليث، فأوجبوا الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقر والغنم، كما أوجبوا في

السائمة سواء بسواء عملًا بالأحاديث المطلقة التي لم يذكر فيها السوم. [فقه الزكاة:1/ 170] .

2 صحيح: رواه ابن ماجه في كتاب الزكاة "1792"، وقال ابن حجر في التلخيص: حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود وأحمد والبيهقي من رواية الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي، والدارقطني من حديث أنس، وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف، وقد تفرَّد به عن ثابت وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء من حديث عائشة، وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف، ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر، وفيه إسماعيل بن عياش، وحديثه في أهل الشام ضعيف، وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما عن شيخة فيه، وهو عبيد الله بن عمر الراوي له عن نافع، فوقفه بكذا الدارقطني في العلل الموقوف، وله طريق أخرى، وصحَّحه الشيخ الألباني.

3 السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن ذكرًا كان أو أنثى، والجمع: سخل وسخال وسخلة وسخلان. [اللسان: 11/ 332] .

4 رواه أبو داود في كتاب الزكاة "1574"، والترمذي في كتاب الزكاة "620"، والنسائي في كتاب الزكاة "2477"، وابن ماجه في كتاب الزكاة "1790"، وأحمد "713".

কর্মক্ষম বা পালিত (খাওয়ানো হয় এমন) পশুর ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফিঈর মাযহাব অনুযায়ী জাকাত ওয়াজিব নয়। তবে ইমাম মালিক একে বিচরণশীল পশুর ন্যায় ওয়াজিব গণ্য করেছেন। দ্বিতীয় শর্ত হলো: এর ওপর এক বছর পূর্ণ হওয়া যার মধ্যে বংশবৃদ্ধি পূর্ণতা পায়; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সম্পদের ওপর এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাতে কোনো জাকাত নেই।"

ছাগল বা ভেড়ার বাচ্ছাদের জাকাত তাদের মায়েদের বর্ষপূর্তির সময় আদায় করতে হবে যদি তারা বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে জন্ম নেয় এবং মায়েরা নিসাব পরিমাণ হয়। যদি মায়েরা নিসাব পরিমাণের কম হয়, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তারা যখন নিসাব পূর্ণ করবে তখন

মায়েদের বর্ষপূর্তির হিসেবেই জাকাত দিতে হবে। আর ইমাম শাফিঈর মতে, নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর থেকে তাদের জন্য নতুন করে বছর গণনা শুরু হবে।
ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার ওপর কোনো জাকাত নেই। তবে ইমাম আবু হানিফা বিচরণশীল মাদি ঘোড়ার ক্ষেত্রে প্রতি ঘোড়ার বিনিময়ে এক দিনার জাকাত ওয়াজিব করেছেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি তোমাদের ঘোড়া ও দাসের জাকাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছি।"

---

১. ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন: জাকাত ওয়াজিব হওয়ার একটি শর্ত হলো পশুটি বিচরণশীল হতে হবে, যেমনটি আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কর্মক্ষম পশুর ওপর কোনো সদকা (জাকাত) নেই।" এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। আলী, মুআয এবং জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তারা বলেছেন: "কর্মক্ষম গরুর ওপর কোনো সদকা নেই।" তবে ইমাম মালিক ও লাইস বলেন: এতে জাকাত রয়েছে। [ইবনে তাইমিয়্যার কিতাব, রাসাইল ও ফাতাওয়া: ২৫/৩৮]।
ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেছেন: জমহুর বা অধিকাংশ ফকিহ এই মত গ্রহণ করেছেন। তবে রবীআহ, মালিক ও লাইস তাদের বিরোধিতা করেছেন। তারা উট, গরু ও ছাগল যদি পালিত (খাওয়ানো হয় এমন) হয়, তাতেও বিচরণশীল পশুর ন্যায় সমানভাবে জাকাত ওয়াজিব করেছেন। তারা সেই সকল সাধারণ হাদিসের ওপর আমল করেছেন যেখানে বিচরণশীল হওয়ার শর্তটি উল্লেখ করা হয়নি। [ফিকহুজ জাকাত: ১/১৭০]।
২. সহিহ: ইবনে মাজাহ জাকাত অধ্যায়ে (১৭৯২) এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার 'আত-তালখিস' গ্রন্থে বলেছেন: "সম্পদের ওপর এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে জাকাত নেই" হাদিসটি আবু দাউদ, আহমাদ ও বায়হাকি হারিস ও আসিম বিন দামরাহ-এর সূত্রে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া দারাকুতনি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদিস থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, যার বর্ণনাকারীদের মধ্যে হাসসান বিন সিয়াহ রয়েছেন এবং তিনি দুর্বল। এই বর্ণনাটি সাবেত থেকে তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ, দারাকুতনি, বায়হাকি ও উকাইলি 'আদ-দুআফা' গ্রন্থে এটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে হারিসাহ বিন আবি আল-রিজাল রয়েছেন এবং তিনি দুর্বল। দারাকুতনি ও বায়হাকি এটি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদিস থেকে বর্ণনা

করেছেন, যাতে ইসমাইল বিন আইয়াশ রয়েছেন, আর সিরিয়াবাসীদের বিষয়ে তার হাদিস দুর্বল। ইবনে নুমাইর, মুতামির এবং অন্যান্যরা তাদের শাইখ উবায়দুল্লাহ বিন উমর থেকে, তিনি নাফি থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনি 'আল-ইলাল' গ্রন্থে একে মাওকুফ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর অন্যান্য সূত্রও রয়েছে এবং শাইখ আলবানী একে সহিহ বলেছেন।
৩. সাখলাহ: ছাগল বা ভেড়ার বাচ্ছা, তা পুরুষ হোক বা স্ত্রী। এর বহুবচন হলো: সাখল, সিখাল, সাখলাহ ও সাখলান। [লিসানুল আরব: ১১/৩৩২]।
৪. আবু দাউদ জাকাত অধ্যায়ে (১৫৭৪), তিরমিজি জাকাত অধ্যায়ে (৬২০), নাসাঈ জাকাত অধ্যায়ে (২৪৭৭), ইবনে মাজাহ জাকাত অধ্যায়ে (১৭৯০) এবং আহমাদ (৭১৩) এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 185)الأحكام السلطانية للماوردي

وَإِذَا كَانَ وَالِي الصَّدَقَاتِ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ أَخَذَهَا فِيمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ، لَا عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، وَلَا عَلَى اجْتِهَادِ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ، وَلَمْ يَجُزْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَأْخُذُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّنْفِيذِ عَمِلَ فِيمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ دُونَ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ، وَلَمْ يَجُزْ لِهَذَا الْعَامِلِ أَنْ يَجْتَهِدَ، وَلَزِمَ الْإِمَامَ أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ، وَيَكُونَ رَسُولًا فِي الْقَبْضِ مُنَفِّذًا لِاجْتِهَادِ الْإِمَامِ، فَعَلَى هَذَا إِنْ كَانَ هَذَا الْعَامِلُ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا جَازَ، فَإِنْ كَانَ فِي زَكَاةٍ عَامَّةٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ فِيهَا وِلَايَةً لَا يَصِحُّ ثُبُوتُهَا مَعَ الْكُفْرِ وَالرِّقِّ، وَإِنْ كَانَ فِي زَكَاةٍ خَاصَّةٍ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ فِي مَالٍ قَدْ عَرَفَ مَبْلَغَ أَصْلِهِ وَقَدْرَ زَكَاتِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَأْمُورُ بِقَبْضِهِ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّهُ تَجَرَّدَ مِنْ حُكْمِ الْوِلَايَةِ وَتَخَصَّصَ بِأَحْكَامِ الرِّسَالَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي مَالٍ لَمْ يَعْرِفْ مَبْلَغَهُ وَلَا قَدْرَ زَكَاتِهِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِقَبْضِهِ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّهُ أُؤْتُمِنَ عَلَى مَالٍ لَا يُعْمَلُ فِيهِ عَلَى خَبَرِهِ، وَجَازَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْعَبْدِ مَقْبُولٌ.

وَإِذَا تَأَخَّرَ عَامِلُ الصَّدَقَاتِ عَنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ بَعْدَ وُجُوبِ زَكَاتِهِمْ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ وُرُودِ عَمَلِهِ وَتَشَاغُلِهِ بِغَيْرِهِمْ انْتَظَرُوهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا إِلَّا مِنْ طَائِفَةٍ بَعْدَ طَائِفَةٍ، وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ جَمِيعِهِمْ وَتَجَاوَزَ الْعُرْفَ فِي وَقْتِ زَكَاتِهِمْ أَخْرَجُوهَا بِأَنْفُسِهِمْ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ مَشْرُوطٌ بِالْمُكْنَةِ، وَسَاقِطٌ مَعَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ، وَجَازَ لِمَنْ يَتَوَلَّى إِخْرَاجَهَا مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا عَلَى اجْتِهَادِهِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ اسْتَفْتَى مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَأْخُذُ بِقَوْلِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ غَيْرَهُ، وَإِنْ اسْتَفْتَى فَقِيهَيْنِ فَأَفْتَاهُ أَحَدُهُمَا بِإِيجَابِهَا، وَأَفْتَاهُ الْآخَرُ بِإِسْقَاطِهَا، أَوْ أَفْتَاهُ أَحَدُهُمَا بِقَدْرٍ، وَأَفْتَاهُ الْآخَرُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِيمَا يَعْمَلُ بِهِ مِنْهُمَا، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَأْخُذُ بِأَغْلَظِ الْقَوْلَيْنِ حُكْمًا، وَقَالَ آخَرُونَ: يَكُونُ مُخَيَّرًا فِي الْأَخْذِ بِقَوْلِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.

فَلَوْ حَضَرَ الْعَامِلُ بَعْدَ أَنْ عَمِلَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى اجْتِهَادِ نَفْسِهِ أَوْ اجْتِهَادِ مَنِ اسْتَفْتَاهُ، وَكَانَ اجْتِهَادُ الْعَامِلِ مُؤَدِّيًا إِلَى إِيجَابِ مَا أَسْقَطَهُ، أَوِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَخْرَجَهُ، كَانَ اجْتِهَادُ الْعَامِلِ أَمْضَى إِنْ كَانَ وَقْتُ الْإِمْكَانِ بَاقِيًا، وَاجْتِهَادُ رَبِّ الْمَالِ أَنْفَذَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْإِمْكَانِ فَائِتًا، وَلَوْ أَخَذَ الْعَامِلُ الزَّكَاةَ بِاجْتِهَادِهِ، وَعَمِلَ فِي وُجُوبِهَا، وَأَسْقَطَهَا عَلَى رَأْيِهِ، وَأَدَّى اجْتِهَادُ رَبِّ الْمَالِ إِلَى إِيجَابِ مَا أَسْقَطَهُ، أَوِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَخَذَهُ، لَزِمَ رَبَّ الْمَالِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى

এবং যখন সদকা (যাকাত) আদায়কারী কর্মকর্তা 'তাফউইয' (পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত) স্তরের কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, তখন তিনি ফকীহগণের মতভেদের ক্ষেত্রে ইমামের ইজতিহাদ বা সম্পদের মালিকের ইজতিহাদের পরিবর্তে নিজের রায় ও ইজতিহাদ অনুযায়ী যাকাত গ্রহণ করবেন। ইমামের জন্য তিনি কী পরিমাণ গ্রহণ করবেন তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া বৈধ নয়। আর যদি তিনি 'তানফীয' (নির্বাহী) স্তরের কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত হন, তবে তিনি মতভেদের ক্ষেত্রে সম্পদের মালিকের পরিবর্তে ইমামের ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করবেন। এই কর্মকর্তার জন্য ইজতিহাদ করা বৈধ নয় এবং ইমামের জন্য আবশ্যক হলো সংগৃহীত মালের পরিমাণ তার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া। তিনি কেবল তা গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন বার্তাবাহক হিসেবে ইমামের

ইজতিহাদ বাস্তবায়ন করবেন। এমতাবস্থায় যদি এই কর্মকর্তা দাস অথবা যিম্মী হন, তবে তা বৈধ; কিন্তু তা যদি সাধারণ যাকাতের ক্ষেত্রে হয়, তবে তা বৈধ নয়। কারণ এতে এমন এক কর্তৃত্ব (বিলায়াত) নিহিত আছে যা কুফরী ও দাসত্বের সাথে সাব্যস্ত হওয়া সঠিক নয়। আর যদি তা বিশেষ যাকাতের ক্ষেত্রে হয়, তবে লক্ষণীয় যে: যদি তা এমন সম্পদ হয় যার মূল পরিমাণ এবং যাকাতের পরিমাণ জানা আছে, তবে তা গ্রহণের নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি দাস বা যিম্মী হওয়া বৈধ; কারণ তিনি এখানে কর্তৃত্বের বিধান থেকে মুক্ত হয়ে বার্তাবাহকের বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আর যদি তা এমন সম্পদ হয় যার পরিমাণ বা যাকাতের মাত্রা জানা নেই, তবে তা গ্রহণের নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিম্মী হওয়া বৈধ নয়; কারণ তাকে এমন মালের ওপর আমানতদার করা হয়েছে যেখানে তার খবরের (বার্তার) ওপর ভিত্তি করে আমল করা যায় না। তবে এক্ষেত্রে দাস হওয়া বৈধ, কারণ দাসের সংবাদ গ্রহণযোগ্য।

যদি যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা সম্পদের মালিকদের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর উপস্থিত হতে বিলম্ব করেন, তবে সেই বিলম্ব যদি তার কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্যদের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে হয়, তবে মালিকগণ তার জন্য অপেক্ষা করবেন। কারণ তিনি পর্যায়ক্রমে এক দলের পর অন্য দলের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করতে সক্ষম। আর যদি তিনি সবার কাছ থেকেই বিলম্ব করেন এবং যাকাত প্রদানের সময়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি (উরফ) অতিক্রম করে যান, তবে মালিকগণ নিজেরাই তা প্রদান করে দেবেন। কারণ তার নিকট যাকাত সোপর্দ করার নির্দেশ সামর্থ্যের সাথে শর্তযুক্ত এবং অসামর্থ্যের ক্ষেত্রে তা রহিত। যারা সম্পদের মালিকদের পক্ষ থেকে যাকাত প্রদানের দায়িত্ব পালন করবেন, তারা যদি ইজতিহাদ করার যোগ্য হন তবে নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করা তাদের জন্য বৈধ। আর যদি তারা ইজতিহাদের যোগ্য না হন, তবে ফকীহগণের মধ্যে যার কথা তিনি গ্রহণ করেন তার কাছ থেকে ফতোয়া গ্রহণ করবেন, এবং অন্য কারো কাছে ফতোয়া চাওয়া তার জন্য আবশ্যক নয়। যদি তিনি দুইজন ফকীহর কাছে ফতোয়া চান এবং তাদের একজন তা ওয়াজিব হওয়ার এবং অন্যজন তা রহিত হওয়ার ফতোয়া দেন, অথবা একজন নির্দিষ্ট পরিমাণের এবং অন্যজন তার চেয়ে বেশি পরিমাণের ফতোয়া দেন, তবে এর মধ্যে কোনটি অনুযায়ী আমল করবেন সে বিষয়ে ইমাম শাফিঈর অনুসারীগণ মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ মনে করেন যে, বিধানের দিক থেকে অধিকতর কঠোর মতটি তিনি গ্রহণ করবেন। আবার অন্যগণ বলেছেন: তিনি তাদের মধ্যে যার ইচ্ছা তার মত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা পাবেন।

সম্পদের মালিক নিজের ইজতিহাদ বা যার কাছ থেকে ফতোয়া নিয়েছেন তার ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করার পর যদি যাকাত কর্মকর্তা উপস্থিত হন এবং কর্মকর্তার ইজতিহাদ এমন হয় যা মালিক কর্তৃক বাদ দেওয়া অংশকে ওয়াজিব করে অথবা তার প্রদানকৃত পরিমাণের ওপর অতিরিক্ত দাবি করে, তবে আদায় করা সম্ভব এমন সময় অবশিষ্ট থাকলে কর্মকর্তার ইজতিহাদ কার্যকর হবে। আর যদি আদায় করার সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তবে সম্পদের মালিকের ইজতিহাদ কার্যকর থাকবে। আর যদি কর্মকর্তা তার ইজতিহাদ অনুযায়ী যাকাত গ্রহণ করেন এবং তার ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে নিজ রায় অনুযায়ী আমল করে কিছু অংশ বাদ দেন, কিন্তু সম্পদের মালিকের ইজতিহাদ সেই বাদ দেওয়া অংশকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে অথবা সংগৃহীত পরিমাণের অতিরিক্ত দাবি করে, তবে সম্পদের মালিকের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট সেই অতিরিক্ত অংশ প্রদান করা আবশ্যক হবে।

(ص: 186)الأحكام السلطانية للماوردي

إِخْرَاجُ مَا أَسْقَطَهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ تَرَكَهُ مِنْ زِيَادَةٍ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ لِأَهْلِ السَّهْمَانِ.

"زكاة الثمار":

وَالْمَالُ الثَّانِي مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ: ثِمَارُ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ. فَأَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ الزَّكَاةَ فِي جَمِيعِهَا. وَأَوْجَبَهَا الشَّافِعِيُّ فِي ثِمَارِ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ خَاصَّةً. وَلَمْ يُوجِبْ فِي غَيْرِهِمَا مِنْ جَمِيعِ الْفَوَاكِهِ وَالثِّمَارِ زَكَاةً. وَزَكَاتُهَا تَجِبُ بِشَرْطَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: بُدُوُّ صَلَاحِهَا وَاسْتِطَابَةُ أَكْلِهَا. وَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَطَعَهَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ زَكَاةٌ. وَيُكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ. وَلَا يُكْرَهُ إِنْ فَعَلَهُ لِحَاجَةٍ.

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ، وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ1.

وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ خَرْصِ الثِّمَارِ عَلَى أَهْلِهَا؛ وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ تَقْدِيرًا لِلزَّكَاةِ وَاسْتِظْهَارًا

---

1 قال ابن قدامة من الحنابلة: قال مالك والشافعي: لا زكاة في ثمر إلَّا التمر والزبيب، ولا في حبٍّ إلّا مال كان قوتًا في حالة الاختيار لذلك، إلّا في الزيتون على اختلافٍ، وحكي عن أحمد إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذا قول ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبي عبيد، والسلت: نوع من الشعير، ووافقهم إبراهيم وزاد الذرة، ووافقهم ابن عباس وزاد الزيتون؛ لأن ما عدا هذا لا نصَّ فيه ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه ولا المجمع عليه، فيبقى على الأصل. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إنما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلّا الحطب والقصب والحشيش؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" وهذا عام؛ ولأن هذا يقصد بزراعته نماء الأرض فأشبه الحب.

ووجه قول الخرقي: إنَّ عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "خذ الحب من الحب" يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله خرج منه ما لا يكال وما ليس بحب، بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في حبٍّ ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" رواه مسلم والنسائي، فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا توسيق فيه وهو مكيال، ففيما هو مكيل

يبقى على العموم، والدليل على انتفاء الزكاة مما سوى ذلك ما ذكرنا من اعتبار التوسيق. [المغني: 2/ 294] .

মূল অংশ থেকে যা বাদ পড়েছে বা অতিরিক্ত অংশ থেকে যা পরিত্যক্ত হয়েছে তা বের করা; কেননা তিনি অংশীদারদের পাওনা হিসেবে তার ওপর এর আবশ্যকতা স্বীকার করেছেন।

"ফলের জাকাত":

জাকাতযোগ্য মালের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার হলো: খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছের ফল। ইমাম আবু হানিফা এই সবকিছুর ওপর জাকাত ফরজ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী বিশেষভাবে খেজুর ও আঙুরের ওপর জাকাত ফরজ করেছেন এবং এ দুটি ব্যতীত অন্য কোনো ফল বা শস্যের ওপর জাকাত ফরজ করেননি। আর এর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে:

প্রথমটি: ফল পরিপক্ব হওয়া এবং তা খাওয়ার উপযোগী হওয়া। পরিপক্ব হওয়ার আগে কেউ যদি তা সংগ্রহ করে, তবে তার ওপর জাকাত বর্তাবে না। জাকাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে এমন করা মাকরুহ; তবে প্রয়োজনের খাতিরে করলে মাকরুহ হবে না।

দ্বিতীয় শর্ত: পরিমাণ পাঁচ 'ওসাক' হওয়া। ইমাম শাফেয়ীর মতে, পাঁচ ওসাকের কম হলে তাতে জাকাত নেই। এক ওসাক সমান ষাট 'সা' এবং এক সা' ইরাকি মাপে পাঁচ রতল এবং এক তৃতীয়াংশ। আর ইমাম আবু হানিফা এর কম-বেশি সব পরিমাণের ওপরই তা ফরজ করেছেন।১

ইমাম আবু হানিফা ফল মালিকদের উপস্থিতিতে ফলন আগাম অনুমান (খারস) করা নিষিদ্ধ করেছেন; কিন্তু ইমাম শাফেয়ী জাকাত নির্ধারণ ও সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে তা জায়েজ বলেছেন।

---

১ হাম্বলি মাযহাবের ইবনে কুদামা বলেন: ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন: খেজুর ও কিশমিশ ছাড়া অন্য কোনো ফলে জাকাত নেই, এবং সাধারণ অবস্থায় যা প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না এমন কোনো শস্যেও জাকাত নেই, তবে জলপাইয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত আছে যে, গম, যব, খেজুর এবং কিশমিশ ছাড়া অন্য কিছুতে জাকাত নেই। এটি ইবনে উমর, মুসা ইবনে তালহা, হাসান, ইবনে সিরিন, শাবি, হাসান ইবনে সালেহ, ইবনে আবু লায়লা, ইবনে মুবারক এবং আবু উবাইদের অভিমত। 'সুলত' হলো এক প্রকার যব। ইব্রাহিম তাদের সাথে একমত হয়েছেন এবং ভুট্টা যোগ করেছেন। ইবনে আব্বাস তাদের সাথে একমত হয়ে জলপাই যোগ করেছেন; কারণ এগুলো ছাড়া অন্য কিছুর ব্যাপারে

কোনো স্পষ্ট দলিল (নস) বা ইজমা নেই, এবং এগুলো সরাসরি বর্ণিত বা ইজমা হওয়া বিষয়ের সমার্থকও নয়; ফলে এগুলো মূল বিধানের (অব্যাহতি) ওপরই বহাল থাকবে। আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল গম, যব, খেজুর ও কিশমিশের ওপর জাকাত প্রবর্তন করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেন: জ্বালানি কাঠ, নলখাগড়া ও ঘাস ব্যতীত ভূমির উৎপাদনের উদ্দেশ্যে চাষ করা হয় এমন সব কিছুতেই জাকাত ওয়াজিব। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "আকাশের পানিতে যা সিঞ্চিত হয় তাতে ওশর (দশমাংশ) দিতে হবে।" এটি একটি সাধারণ নির্দেশ; এবং যেহেতু এগুলো চাষের মাধ্যমে ভূমির উৎপাদন বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য থাকে, তাই এগুলো দানাদার শস্যের সাদৃশ্যপূর্ণ।

খিরাকির মতের ভিত্তি হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সাধারণ অর্থ: "আকাশের পানিতে যা সিঞ্চিত হয় তাতে ওশর দিতে হবে" এবং মুয়াজকে দেয়া তাঁর নির্দেশ: "শস্য থেকে শস্য গ্রহণ করো" - এই নির্দেশগুলো এর আওতাভুক্ত সব কিছুর ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়াকে অপরিহার্য করে। তবে যা পরিমাপ করা যায় না এবং যা শস্য নয়, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর মর্ম অনুযায়ী বাদ পড়বে: "পাঁচ ওসাক না হওয়া পর্যন্ত কোনো শস্য বা খেজুরে সদকা (জাকাত) নেই।" এটি ইমাম মুসলিম ও নাসায়ি বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, যা 'ওসাক' (পরিমাপের একক) দ্বারা পরিমাপ করা যায় না তাতে জাকাত নেই। সুতরাং যা পরিমাপযোগ্য তা পূর্বোক্ত সাধারণ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর এ ব্যতীত অন্য কিছুতে জাকাত না থাকার দলিল হলো ওসাক বা পরিমাপ বিবেচনার শর্তটি যা আমরা উল্লেখ করেছি। [আল-মুগনি: ২/২৯৪]।

(ص: 187)الأحكام السلطانية للماوردي

لِأَهْلِ السَّهْمَانِ؛ فَقَدْ وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى خَرْصِ الثِّمَارِ عُمَّالًا وَقَالَ لَهُمْ: "خَفِّفُوا الْخَرْصَ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْوَصِيَّةَ وَالْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالنَّائِبَةَ".

فَالْوَصِيَّةُ مَا يُوصِي بِهَا أَرْبَابُهَا بَعْدَ الْوَفَاةِ، وَالْعَرِيَّةُ: مَا يُعْرَى لِلصِّلَاتِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ، وَالْوَاطِئَةُ مَا تَأْكُلُهُ السَّابِلَةُ مِنْهُمْ، وَسَمُّوهَا وَاطِئَةً لِوَطْئِهِمُ الْأَرْضَ، وَالنَّائِبَةُ: مَا يَنُوبُ الثِّمَارَ مِنَ الْجَوَائِحِ.

فَأَمَّا ثِمَارُ الْبَصْرَةِ فَيُخْرَصُ كُرُومُهَا وَهُمْ فِي خَرْصِهَا كَغَيْرِهِمْ، وَلَا يُخْرَصُ عَلَيْهِمْ نَخْلُهَا لِكَثْرَتِهِ وَلُحُوقِ الْمَشَقَّةِ فِي خَرْصِهِ، فَإِنَّهُمْ يُبِيحُونَ فِي التَّعَاوُنِ أَكْلَ الْمَارَّةِ مِنْهَا، وَإِنَّمَا مَا قَدَّرَ لَهُمُ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ مِنْ ثَنَايَاهَا فِي يَوْمَيِ الْجُمُعَةِ وَالثُّلَاثَاءِ يُصْرَفُ مُعْظَمُهُ فِي أَهْلِ الصَّدَقَاتِ، وَجُعِلَ لَهُمْ فِي عِوَضِ الثَّنَايَا كِبَارُ الثِّمَارِ، وَحَمْلُهَا إِلَى كُرْسِيِّ الْبَصْرَةِ لِيُسْتَوْفَى أَعْشَارُهَا مِنْهُمْ هُنَاكَ، وَلَيْسَ يَلْزَمُ هَذَا غَيْرَهُمْ، فَصَارُوا بِذَلِكَ مُخَالِفِينَ لِمَنْ سِوَاهُمْ.

وَلَا يَجُوزُ خَرْصُ الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ إِلَّا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، فَيُخْرَصَانِ بُسْرًا وَعِنَبًا، وَيُنْظَرُ مَا يَرْجِعَانِ إِلَيْهِ تَمْرًا وَزَبِيبًا، ثُمَّ يُخَيَّرُ أَرْبَابُهَا إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ بَيْنَ ضَمَانِهَا بِمَبْلَغِ خَرْصِهَا لِيَتَصَرَّفُوا فِيهَا وَيَضْمَنُوا قَدْرَ زَكَاتِهَا؛ وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ فِي أَيْدِيهِمْ أَمَانَةً يُمْنَعُونَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا حَتَّى تَتَنَاهَى، فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهَا إِذَا بَلَغَتْ.

وَقُدِّرَ لِلزَّكَاةِ الْعُشْرُ إِنْ سُقِيَتْ عَذْبًا أَوْ سَيْحًا، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ سُقِيَتْ غَرْبًا أَوْ نَضْحًا؛ فَإِنْ سُقِيَتْ بِهِمَا فَقَدْ قِيلَ: يُعْتَبَرُ أَعْلَاهُمَا، وَقِيلَ: يُؤْخَذُ بِقِسْطِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ فِيمَا سُقِيَتْ بِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّهَا، وَأَحْلَفَهُ الْعَامِلُ اسْتِظْهَارًا، فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا مَا اعْتَرَفَ بِهِ، وَيَضُمُّ أَنْوَاعَ النَّخْلِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَكَذَلِكَ أَنْوَاعُ الْكَرْمِ؛ لِأَنَّ جَمِيعَهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَلَا يُضَمُّ النَّخْلُ إِلَى الْكَرْمِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْجِنْسِ.

وَإِذَا كَانَتْ ثِمَارُ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ تَصِيرُ تَمْرًا وَزَبِيبًا لَمْ تُؤْخَذْ زَكَاتُهُمَا إِلَّا بَعْدَ تَنَاهِي جَفَافِهِمَا تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُؤْخَذُ إِلَّا رُطَبًا أَوْ عِنَبًا أُخِذَ عُشْرُ ثَمَنِهِمَا إِذَا بِيعَا، فَإِنِ احْتَاجَ أَهْلُ السُّهْمَانِ إِلَى حَقِّهِمْ مِنْهُمَا رُطَبًا أَوْ عِنَبًا جَازَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إِذَا قِيلَ: إِنَّ الْقِسْمَةَ تَمْيِيزُ نَصِيبٍ، وَلَمْ يَجُزْ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي إِذَا قِيلَ: إِنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ.

وَإِذَا هَلَكَتْ الثِّمَارُ بَعْدَ خَرْصِهَا بِجَائِحَةٍ مِنْ أَرْضٍ أَوْ سَمَاءٍ قَبْلَ إِمْكَانِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مِنْهَا سَقَطَتْ، وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَائِهَا أُخِذَتْ.

হকের অধিকারীগণের সুবিধার কথা বিবেচনা করে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফলের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আমিল নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন: "তোমরা অনুমানে শিথিলতা করো; কারণ সম্পদের মধ্যে অসিয়ত, আরিয়াহ, পথচারীদের অংশ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে।"

অসিয়ত হলো তা, যা মালিক মৃত্যুর পর কার্যকর করার নির্দেশ দিয়ে যান। আরিয়াহ হলো তা, যা জীবিত অবস্থায় কাউকে ভোগ করার জন্য দান করা হয়। ওয়াতিয়াহ হলো তা, যা পথচারীরা ফল থেকে ভক্ষণ করে; একে ওয়াতিয়াহ বলা হয় কারণ তারা ভূমি পদদলিত করে যাতায়াত করে। আর নায়েবাহ হলো ঐ সমস্ত আপদ যা ফল নষ্ট করে দেয়।

বসরা অঞ্চলের ফলের ক্ষেত্রে, সেখানকার দ্রাক্ষাক্ষেত্রগুলোর পরিমাণ অনুমান করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে তারা অন্যদের মতোই গণ্য হবে। তবে সেখানকার খেজুর গাছগুলোর আধিক্য এবং তা অনুমান করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কষ্টের কারণে সেগুলোর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় না। কেননা তারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পথচারীদের জন্য সেখান থেকে ফল খাওয়া বৈধ মনে করে। প্রাথমিক যুগের মনীষীরা জুমুআ ও মঙ্গলবার দিনগুলোতে তাদের জন্য ফলের যে অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তার অধিকাংশই সদকা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যয় করা হতো। এই নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে বড় আকারের ফলগুলো নির্ধারণ করা হতো এবং সেগুলো বসরার প্রশাসনিক কেন্দ্রে নিয়ে আসা হতো যাতে সেখান থেকে সেগুলোর ওশর (দশমাংশ) পূর্ণরূপে আদায় করা যায়। এই নিয়ম অন্যদের জন্য প্রযোজ্য নয়, তাই তারা এ ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে ভিন্ন।

খেজুর ও আঙুর পরিপক্ব হওয়ার আগে তার পরিমাণ অনুমান করা জায়েজ নয়। ফল যখন কাঁচা থাকে তখনই তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং দেখতে হবে যে শুকানোর পর তা কতটুকু খেজুর বা কিশমিশে রূপান্তরিত হতে পারে। অতঃপর মালিকগণ যদি বিশ্বস্ত হন, তবে তাদেরকে দুটি বিষয়ের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হবে: হয় তারা অনুমিত পরিমাণের জিম্মাদার হবে যাতে তারা সেই ফলে স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং তার জাকাতের পরিমাণের দায়ভার গ্রহণ করে; অথবা সেগুলো তাদের হাতে আমানত হিসেবে থাকবে এবং তা পূর্ণ না

হওয়া পর্যন্ত তারা তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, এরপর যখন তা নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছাবে তখন তার জাকাত গ্রহণ করা হবে।

জাকাতের পরিমাণ হলো দশমাংশ (ওশর) যদি তা বৃষ্টির পানি বা প্রাকৃতিকভাবে প্লাবিত পানি দ্বারা সিক্ত হয়। আর যদি বালতি বা শ্রমসাধ্য সেচ দ্বারা সিক্ত হয় তবে বিশ ভাগের এক ভাগ (অর্ধ-ওশর)। যদি উভয় পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয়, তবে বলা হয়েছে: যেটির প্রভাব বেশি সেটি গণ্য হবে; আবার বলা হয়েছে: প্রত্যেকটির আনুপাতিক হার অনুযায়ী নেওয়া হবে। সেচ পদ্ধতির ব্যাপারে যদি সম্পদের মালিক এবং আমিলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে মালিকের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং সতর্কতাস্বরূপ আমিল তাকে শপথ করাবেন। যদি মালিক শপথ করতে অস্বীকার করেন, তবে তিনি যা স্বীকার করবেন কেবল তাই তার জন্য আবশ্যক হবে। খেজুরের বিভিন্ন জাত একে অপরের সাথে যোগ করা হবে, একইভাবে আঙুরের বিভিন্ন জাতও; কারণ এগুলো একই জাতীয় সম্পদ। তবে খেজুরের সাথে আঙুর যোগ করা যাবে না, কারণ তারা ভিন্ন জাতীয়।

খেজুর ও আঙুর যদি শুকিয়ে সাধারণ খেজুর ও কিশমিশে রূপান্তরিত হওয়ার মতো হয়, তবে তা পুরোপুরি শুকানোর আগে জাকাত নেওয়া হবে না। আর যদি এমন হয় যা কেবল কাঁচা খেজুর বা আঙুর হিসেবেই ব্যবহার করা হয়, তবে বিক্রির পর তার মূল্যের দশমাংশ নেওয়া হবে। যদি হকদার বা প্রাপকগণ কাঁচা খেজুর বা আঙুর অবস্থাতেই তাদের পাওনা পেতে চান, তবে এ বিষয়ে দুটি মতের একটি অনুযায়ী তা জায়েজ—যদি বলা হয় যে, বণ্টন হলো প্রাপ্য অংশ পৃথক করা; আর দ্বিতীয় মত অনুযায়ী তা জায়েজ নয়—যদি বলা হয় যে, বণ্টন হলো এক প্রকার বিক্রয়। ফলের পরিমাণ অনুমানের পর যদি তা জাকাত প্রদানের সক্ষমতা হওয়ার আগেই আসমানি বা জমিনি কোনো দুর্যোগে বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে জাকাতের আবশ্যকতা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তা প্রদানের সক্ষমতা হওয়ার পর বিনষ্ট হয়, তবে জাকাত আদায় করতে হবে।

فَصْلٌ: "في زكاة الزروع"

وَالْمَالُ الثَّالِثُ: الزُّرُوعُ:

أَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ الزَّكَاةَ فِي جَمِيعِهَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَجِبُ إِلَّا فِيمَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّونَ قُوتًا مُدَّخَرًا، وَلَا تَجِبُ عِنْدَهُ فِي الْبُقُولِ وَالْخُضَرِ، وَلَا تَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِيهِمَا، وَلَا فِيمَا لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ، وَلَا فِيمَا يَزْرَعُهُ الْآدَمِيُّونَ مِنْ نَبَاتِ الْأَوْدِيَةِ وَالْجِبَالِ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ عِنْدَهُ مِنْ عَشَرَةِ أَنْوَاعٍ: الْبُرُّ، وَالشَّعِيرُ، وَالْأَرُزُّ، وَالذُّرَةُ، وَالْبَاقِلَّاءُ، وَاللُّوبْيَاءُ، وَالْحِمَّصُ، وَالْعَدَسُ، وَالدُّخْنُ، وَالْجُلْبَانُ.

فَأَمَّا الْعَلَسُ: فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْبُرِّ يُضَمُّ إِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ قِشْرَتَانِ، لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ بِقِشْرَتِهِ إِلَّا إِذَا بَلَغَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، وَكَذَلِكَ الْأَرُزُّ فِي قِشْرَتِهِ، وَأَمَّا السُّلْتُ فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُضَمُّ إِلَيْهِ، وَالْجَاوَرْسُ: نَوْعٌ مِنَ الدُّخْنِ يُضَمُّ إِلَيْهِ، وَمَا عَدَاهُمَا أَجْنَاسٌ لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى غَيْرِهِ، وَضَمَّ مَالِكٌ الشَّعِيرَ إِلَى الْحِنْطَةِ، وَضَمَّ مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْقُطْنِيَّاتِ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ.

وَزَكَاةُ الزَّرْعِ تَجِبُ فِيهِ بَعْدَ قُوَّتِهِ وَاشْتِدَادِهِ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ دِيَاسِهِ وَتَصْفِيَتِهِ إِذَا بَلَغَ النِّصْفَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَهَا، وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ إِذَا جَزَّ الْمَالِكُ زَرْعَهُ بَقْلًا أَوْ قَصِيلًا لَمْ تَجِبْ زَكَاتُهُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ؛ وَلَا يُكْرَهُ إِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ1.

---

1 قال عبد السلام بن تيمية من الحنابلة: كل نبات مكيل مدخر كالحبوب واللوز والفستق والتمر والزبيب والبذور والصعتر والأشنان ونحوها، إذا بلغ صافيًا يابسًا خمسة أوسق ففيه العشر مصفًّى يابسًا إذا سقي بالغيوث والسيوح، وإن سقي بكلفة كالدواليب والنواضح فنصف العشر، وما زاد فبحسابه، فإن سقي نصفه سيحًا ونصفه نضحًا وجب ثلاثة أرباع عشره، وإن كان أحدهما أكثر فالحكم له نصّ عليه. وقال ابن حامد: يجب بالقسط وإن جهل المقدار وجب العشر على المنصوص، وعلى قول

ابن حامد يجعل منه نضحًا المتيقن والباقي سيحًا، ويؤخذ بالقسط ونصاب الأرز والغلس وهو نوع حنطة يدخر في قشره إذا صفِّيَا كغيرهما، وفي قشريهما عشرة أوسق، والوسق ستون صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، ويزكّى الزيتون إذا بلغ خمسة أوسق كيلًا نص عليه، ويخرج منه وإن صفَّاه فأخرج عشر زيته فهو أفضل، وعنه لا زكاة فيه، ولا زكاة مكيل مدخر كالجوز والتين والخضر ونحوها إلا القطن والزعفران، فإنهما على روايتين وفي العصفر والورس وجهان، فإن قلنا: يجب، فنصابهما ما قيمته كقيمة نصاب من أدنى نبات يزكّى، وقال القاضي: العصفر تبع للقرطم ولا يزكى حتى يبلغ، وتضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وعنه: لا يضم جنس إلى غيره، ومنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض كزرعه، ومن كان في ثمره جيد ورديء ووسط أخذ من كل نوع حصته، إلا أن يعسر التمييز فيؤخذ الوسط. [المحرر في الفقه: 1/ 221] .

পরিচ্ছেদ: শস্যের জাকাত প্রসঙ্গে

তৃতীয় প্রকারের সম্পদ হলো: উৎপাদিত শস্য।

ইমাম আবু হানিফা সকল প্রকার শস্যের ওপর জাকাত ওয়াজিব করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফি‘য়ীর মতে, মানুষ কেবল যা প্রধান খাদ্য হিসেবে চাষ করে এবং যা দীর্ঘ সময় সংরক্ষণযোগ্য, কেবল তাতেই জাকাত ওয়াজিব হয়। তাঁর মতে ডাল জাতীয় শস্য ও শাক-সবজিতে জাকাত ওয়াজিব নয়; এমনকি তুলা ও তিসি—যা ভক্ষণযোগ্য নয়—এমন কিছুতেও জাকাত নেই। এছাড়া মানুষ পাহাড় ও উপত্যকায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো উদ্ভিদ থেকে যা সংগ্রহ করে, তাতেও জাকাত নেই। তাঁর মতে জাকাত গ্রহণ করা হবে দশ প্রকারের শস্য থেকে: গম, যব, ধান, ভুট্টা, শিম (বাকিল্লা), বরবটি (লোবিয়া), ছোলা, মসুর ডাল, জোয়ার (বাজরা) এবং মটর (জুলুব্বান)।

আর ‘আলাস’ হলো গমের একটি প্রকার যা গমের সাথেই গণ্য করা হয়; এর ওপর দুটি তুষ থাকে। তুষসহ দশ ওসাক পরিমাণ না পৌঁছানো পর্যন্ত এতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। তুষসহ ধানের ক্ষেত্রেও একই বিধান। ‘সুলত’ হলো এক প্রকার যব যা যবের সাথেই গণ্য হয়। আর

‘জাওয়ারস’ হলো জোয়ারের একটি প্রকার যা জোয়ারের সাথেই যুক্ত হবে। এ দুটি ব্যতীত অন্যান্য শস্য স্বতন্ত্র প্রজাতি হিসেবে গণ্য হবে এবং একটির সাথে অন্যটি যোগ করা হবে না। তবে ইমাম মালিক যবকে গমের সাথে এবং ডাল জাতীয় শস্যের একটিকে অন্যটির সাথে যুক্ত করে নিসাব পূর্ণ করার মত দিয়েছেন।

শস্যের দানা পুষ্ট ও শক্ত হওয়ার পর তাতে জাকাত ওয়াজিব হয়। তবে মাড়াই ও পরিষ্কার করার পর যদি তা পাঁচ ওসাকের অর্ধেক (অর্থাৎ পাঁচ ওসাক) পরিমাণ হয়, কেবল তখনই তা গ্রহণ করা হবে। এর চেয়ে কম পরিমাণের ওপর জাকাত নেই। ইমাম আবু হানিফা অল্প-বিস্তর সব পরিমাণের ওপরই জাকাত ওয়াজিব করেছেন। যদি মালিক তার ফসল কচি অবস্থায় বা পশুখাদ্য হিসেবে কেটে ফেলে, তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। জাকাত এড়ানোর উদ্দেশ্যে এমন করা মাকরূহ; তবে যদি প্রয়োজনের তাগিদে করা হয় তবে তা মাকরূহ নয়।১

---

১ হাম্বলি মাজহাবের ফকিহ আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: পরিমাপযোগ্য এবং সংরক্ষণযোগ্য প্রতিটি উদ্ভিদ যেমন—শস্যদানা, বাদাম, পেস্তা, খেজুর, কিসমিস, বিভিন্ন বীজ, থাইম (সা’তার), উশনান এবং অনুরূপ উদ্ভিদ যদি পরিষ্কার ও শুষ্ক অবস্থায় পাঁচ ওসাক হয়, তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব। যদি বৃষ্টির পানি বা প্রাকৃতিক স্রোতে সিক্ত হয় তবে দশমাংশ (১০%) এবং যদি যান্ত্রিক উপায়ে বা সেচযন্ত্রের মাধ্যমে পানি দিয়ে সেচ দেওয়া হয় তবে বিশমাংশ (৫%) জাকাত দিতে হবে। অতিরিক্ত পরিমাণের হিসাবও আনুপাতিক হারে হবে। যদি অর্ধেক সময় প্রাকৃতিকভাবে এবং অর্ধেক সময় সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তবে দশমাংশের তিন-চতুর্থাংশ (৭.৫%) দিতে হবে। আর যদি কোনো একটি পদ্ধতির প্রাধান্য থাকে তবে সেই অনুযায়ী বিধান কার্যকর হবে—ইমাম আহমদ এই মতটিই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। ইবনে হামিদ বলেন: অনুপাত অনুযায়ী ওয়াজিব হবে; আর যদি পরিমাণ অজানা থাকে তবে বর্ণিত উক্তি অনুযায়ী দশমাংশ ওয়াজিব হবে। ধান ও আলাস (এক প্রকার গম যা তুষসহ সংরক্ষণ করা হয়) যখন অন্য শস্যের ন্যায় পরিষ্কার করা হবে তখন তার নিসাব ৫ ওসাক, আর তুষসহ থাকলে নিসাব হবে ১০ ওসাক। এক ওসাক সমান ৬০ সা‘। এক সা‘ ইরাকি পরিমাপে ৫ রতল ও এক তৃতীয়াংশ রতল। জলপাই যদি পরিমাপে পাঁচ ওসাক হয় তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব—ইমাম আহমদ এই মত ব্যক্ত করেছেন। জলপাই থেকেই জাকাত বের করা হবে, তবে যদি তা থেকে তেল বের করে তেলের দশমাংশ দেওয়া হয় তবে তা উত্তম। ভিন্ন মতে এতে জাকাত নেই। এছাড়া আখরোট, ডুমুর, শাক-সবজি এবং অনুরূপ পরিমাপ ও

সংরক্ষণযোগ্য নয় এমন কিছুতে জাকাত নেই, তবে তুলা ও জাফরানের ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। আর কুসুম ফুল (উসফুর) ও ওয়ারসের (এক প্রকার সুগন্ধি উদ্ভিদ) ব্যাপারে দুটি মত আছে। যদি আমরা বলি জাকাত ওয়াজিব, তবে এগুলোর নিসাব হবে জাকাতযোগ্য সর্বনিম্ন উদ্ভিদের নিসাবের মূল্যের সমান। কাজী আবু ইয়ালা বলেন: কুসুম ফুল বীজের অনুগামী হবে এবং এটি নিসাব পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জাকাতযোগ্য হবে না। নিসাব পূর্ণ করার জন্য এক শস্যকে অন্য শস্যের সাথে যুক্ত করা হবে। ভিন্ন মতে, এক প্রজাতিকে অন্য প্রজাতির সাথে যুক্ত করা হবে না। অন্য এক বর্ণনায় গমকে যবের সাথে এবং ডাল জাতীয় শস্যকে একে অপরের সাথে যুক্ত করা হবে। এক বছরের ফলকে অন্য ফলের সাথে এবং এক বছরের শস্যকে অন্য শস্যের সাথে যুক্ত করা হবে। যদি কারও ফলের মধ্যে উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও মাঝারি—সব ধরণের থাকে, তবে প্রতিটি থেকে তার আনুপাতিক অংশ নেওয়া হবে। যদি পৃথক করা কষ্টসাধ্য হয় তবে মাঝারি মানের ফল থেকে জাকাত নেওয়া হবে। [আল-মুহাররার ফিল ফিকহ: ১/২২১] ।

(ص: 189)الأحكام السلطانية للماوردي

وَإِذَا مَلَكَ الذِّمِّيُّ أَرْضَ عُشْرٍ فَزَرَعَهَا، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهَا، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا عُشْرَ فِيهَا عَلَيْهِ وَلَا خَرَاجَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُوضَعُ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهَا بِإِسْلَامِهِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُؤْخَذُ مِنْهَا ضِعْفُ الصَّدَقَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنَ الْمُسْلِمِ، فَإِذَا أَسْلَمَ سَقَطَ عَنْهَا مُضَاعَفَةُ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُؤْخَذُ مِنْهَا صَدَقَةُ الْمُسْلِمِ وَلَا تُضَاعَفُ1.

وَإِذَا زَرَعَ الْمُسْلِمُ أَرْضَ خَرَاجٍ أُخِذَ مِنْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عُشْرُ الزَّرْعِ مَعَ خَرَاجِ الْأَرْضِ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مَعَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَاقْتَصَرَ عَلَى أَخْذِ الْخَرَاجِ وَحْدَهُ، وَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضَ خَرَاجٍ عَلَى مُؤَجِّرِهَا وَالْعُشْرُ عَلَى مُسْتَأْجِرِهَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عُشْرُ الزَّرْعِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ وَكَذَلِكَ الْمُعْبِرِ؛ فَهَذِهِ الْأَمْوَالُ الثَّلَاثَةُ كُلُّهَا أَمْوَالٌ ظَاهِرَةٌ.

---

1 قال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة: وما وقفه الإمام فهو مخير بين إقرار أهله فيه بالخراج وبين إجلائهم وجلب غيرهم؛ لأن الأرض قد ملكت عليهم. فأمَّا ما جلي عنها أهلها خوفًا من المسلمين فتصير وقفًا بنفس الظهور عليها؛ لأنها ليست غنيمة فتقسم. وعنه لا تصير وقفًا حتى يقفها الإمام؛ لأن الوقف لا يثبت بنفسه. وحكمها حكم العنوة إذا وقفت. وكذلك الحكم فيما صالحونا عليه. على أن الأرض للمسلمين. وتقر في أيديهم بالخروج. فأما إن صالحناهم على أن الأرض لهم ولنا عليها الخراج فهذه ملك لأربابها متى أسلموا سقط عنهم؛ لأنه بمنزلة الجزية فيسقط بالإسلام كالجزية. ولهم بيعها والتصرف فيها. وإن انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها لما ذكرناه. [الكافي في فقه ابن حنبل: 4/ 329] .

যখন কোনো জিম্মি উশরি জমির মালিক হয় এবং তাতে চাষাবাদ করে, তখন এর বিধান সম্পর্কে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেঈর অভিমত হলো, তার ওপর উশর বা খারাজ—কোনোটিই ধার্য হবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: এর ওপর খারাজ ধার্য করা হবে এবং তার ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তা রহিত হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন: তার নিকট থেকে মুসলিমদের নিকট থেকে গৃহীত সদকার দ্বিগুণ গ্রহণ করা হবে; অতঃপর সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সদকার দ্বিগুণ হওয়ার বিধানটি রহিত হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান এবং সুফিয়ান সাওরি বলেছেন: তার কাছ থেকে মুসলিমের সদকাই গ্রহণ করা হবে এবং তা দ্বিগুণ করা হবে না।১

কোনো মুসলিম যদি খারাজি জমিতে চাষাবাদ করে, তবে ইমাম শাফেঈর মতে তার কাছ থেকে জমির খারাজের পাশাপাশি ফসলের উশরও গ্রহণ করা হবে। আর ইমাম আবু হানিফা এই দুইটিকে একত্রে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং শুধুমাত্র খারাজ গ্রহণের ওপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন। যখন কেউ কোনো খারাজি জমি ইজারা নেয়, তখন খারাজ দাতার ওপর এবং উশর ইজারাদারের ওপর বর্তাবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: ফসলের উশর দাতার ওপর এবং একইভাবে আবাদকারীর ওপর বর্তাবে; এই তিন প্রকারের সম্পদই হলো প্রকাশ্য সম্পদ।

---

১ হাম্বলি মাযহাবের ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি বলেন: ইমাম যা ওয়াকফ করবেন, তাতে তিনি সেখানকার অধিবাসীদের খারাজ প্রদানের শর্তে বহাল রাখা অথবা তাদের বহিষ্কার করে অন্যদের নিয়ে আসার ব্যাপারে ইখতিয়ার রাখেন; কারণ জমিটি তাদের ওপর বিজিত হয়েছে। আর যে জমি থেকে অধিবাসীরা মুসলিমদের ভয়ে পলায়ন করেছে, তা বিজিত হওয়ার সাথে সাথেই ওয়াকফ হয়ে যাবে; কারণ এটি গনিমত নয় যে তা বণ্টন করা হবে। তাঁর থেকে অপর একটি বর্ণনা রয়েছে যে, ইমাম ওয়াকফ না করা পর্যন্ত তা ওয়াকফ হবে না; কারণ ওয়াকফ নিজে নিজে সাব্যস্ত হয় না। এটি যখন ওয়াকফ করা হয়, তখন এর বিধান বলপ্রয়োগে বিজিত ভূমির বিধানের মতো হয়। একইভাবে যদি তারা আমাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করে যে ভূমি মুসলিমদের থাকবে এবং খারাজ প্রদানের মাধ্যমে তাদের হাতে বহাল রাখা হবে, তবে বিধান একই। কিন্তু যদি আমরা তাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করি যে ভূমি তাদেরই থাকবে এবং আমাদের জন্য তার ওপর খারাজ থাকবে, তবে এটি তার মালিকদের মালিকানাধীন থাকবে এবং যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবে তখন তাদের থেকে তা রহিত হয়ে যাবে; কারণ এটি জিজিয়ার সমতুল্য, তাই জিজিয়ার মতো ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে এটি রহিত হয়ে যায়। তাদের এটি বিক্রি করা এবং এতে মালিকানাস্বত্ব প্রয়োগের অধিকার থাকবে। আর যদি তা কোনো মুসলিমের কাছে হস্তান্তরিত হয়, তবে আমাদের উল্লিখিত কারণে তার থেকে খারাজ গ্রহণ করা হবে না। [আল-কাফি ফি ফিকহি ইবনে হাম্বল: ৪/৩২৯]।

(ص: 190)الأحكام السلطانية للماوردي

فَصْلٌ: "زكاة الذهب والفضة"

وَأَمَّا الْمَالُ الرَّابِعُ فَهُوَ: الْفِضَّةُ وَالذَّهَبُ، وَهُمَا مِنَ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، وَزَكَاتُهُمَا رُبُعُ الْعُشْرِ، لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "فِي الْوَرِقِ رُبُعُ الْعُشْرِ" 1.

وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ بِوَزْنِ الْإِسْلَامِ الَّذِي وَزْنُ كُلِّ دِرْهَمٍ مِنْهُ سِتَّةُ دَوَانِقَ، وَكُلُّ عَشَرَةٍ مِنْهَا سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ، وَفِيهَا إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ هُوَ رُبُعُ عُشْرِهَا،

وَلَا زَكَاةَ فِيهَا إِذَا نَقَصَتْ عَنْ مِائَتَيْنِ، وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهَا بِحِسَابِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا زَكَاةَ فِيمَا زَادَ عَلَى مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَيَجِبُ فِيهَا دِرْهَمٌ سَادِسٌ، وَالْوَرِقُ الْمَطْبُوعَةُ وَالنِّقَارِ سَوَاءٌ.

وَأَمَّا الذَّهَبُ فَنِصَابُهُ عِشْرُونَ مِثْقَالًا بِمَثَاقِيلِ الْإِسْلَامِ يَجِبُ فِيهِ رُبُعُ عُشْرِهِ وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ خَالِصُهُ وَمَطْبُوعُهُ، وَلَا تُضَمُّ الْفِضَّةُ إِلَى الذَّهَبِ، وَيُعْتَبَرُ نِصَابُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ، وَضَمَّ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ الْأَقَلَّ إِلَى الْأَكْثَرِ وَقَوَّمَاهُ بِقِيمَةِ الْأَكْثَرِ، وَإِذَا اتَّجَرَ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ تَجِبُ زَكَاتُهُمَا، وَرِبْحُهُمَا تَبَعٌ لَهُمَا إِذَا حَالَ الْحَوْلُ؛ لِأَنَّ زَكَاةَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ تَجِبُ بِحَوْلِ الْحَوْلِ عَلَيْهِمَا، وَأَسْقَطَ دَاوُد زَكَاةَ مَالِ التِّجَارَةِ، وَشَذَّ بِهَذَا الْقَوْلِ عَنِ الْجَمَاعَةِ، وَإِذَا اتَّخَذَ مِنَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ حُلِيًّا مُبَاحًا سَقَطَ زَكَاتُهُ فِي أَصَحِّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَوَجَبَتْ فِي أَضْعَفِهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِنِ اتَّخَذَ مِنْهُمَا مَا حَظِرَ مِنَ الْحُلِيِّ وَالْأَوَانِي وَجَبَتْ زَكَاتُهُ فِي قَوْلِ الْجَمِيعِ2.

---

1 لم أقف عليه.

2 قلت: واختلف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي، فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس أنَّهم أوجبوا فيه الزكاة، وهو قول ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري، وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي، وروي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وعن القاسم بن محمد والشعبي أنهم لم يروا فيه زكاة، وإليه ذهب مالك ابن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو أظهر قولي الشافعي.

ذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أنه يجب في الحليّ من الذهب والفضة زكاة إذا بلغت نصاب النقدين: الذهب والفضة: =

চতুর্থ প্রকার সম্পদ হলো: রৌপ্য ও স্বর্ণ। এ দুটি অপ্রকাশ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলোর জাকাত হলো এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ (আড়াই শতাংশ); কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "রৌপ্যের ক্ষেত্রে জাকাত হলো এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ।" ১

রৌপ্যের নিসাব হলো ইসলামী ওজনে দুইশত দিরহাম। সেই ওজন অনুযায়ী প্রতিটি দিরহাম ছয় দানিক সমপরিমাণ এবং প্রতি দশ দিরহাম সাত মিসকাল সমপরিমাণ। রৌপ্য যখন দুইশত দিরহামে পৌঁছাবে, তখন তাতে পাঁচ দিরহাম জাকাত দিতে হবে, যা এর এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ। দুইশত দিরহামের কম হলে তাতে কোনো জাকাত নেই। আর এর অতিরিক্ত অংশের জাকাত হিসাব অনুপাতে আদায় করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন: দুইশত দিরহামের অতিরিক্ত অংশের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত জাকাত নেই যতক্ষণ না তা চল্লিশ দিরহামে পৌঁছায়; যখন চল্লিশ দিরহাম পূর্ণ হবে তখন তাতে ষষ্ঠ দিরহামটি ওয়াজিব হবে। প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা ও রৌপ্যের টুকরো বা পাত—উভয়ই এক্ষেত্রে সমান।

আর স্বর্ণের নিসাব হলো ইসলামী ওজনে বিশ মিসকাল। এতে এর এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ অর্ধ মিসকাল জাকাত ওয়াজিব। অতিরিক্ত পরিমাণের ক্ষেত্রে হিসাব অনুপাতে আদায় করতে হবে। খাঁটি স্বর্ণ এবং মুদ্রা হিসেবে তৈরি স্বর্ণ—উভয়ই এক্ষেত্রে সমান। রৌপ্যকে স্বর্ণের সাথে যোগ করা হবে না, বরং প্রতিটির নিসাব স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা হবে। তবে ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানিফা রহ. কম পরিমাণটিকে বেশি পরিমাণের সাথে যুক্ত করেছেন এবং অধিক মূল্যের ভিত্তিতে তার মূল্য নির্ধারণ করেছেন। যদি দিরহাম ও দিনার দ্বারা ব্যবসা করা হয়, তবে সেগুলোর ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। বছর অতিক্রান্ত হলে এগুলোর লভ্যাংশও মূল মালের অনুগামী হবে; কেননা স্বর্ণ ও রৌপ্যের জাকাত বছর পূর্ণ হওয়ার ভিত্তিতে ওয়াজিব হয়। দাউদ (জাহেরি) ব্যবসায়িক পণ্যের জাকাত রহিত করেছেন এবং এই মতের মাধ্যমে তিনি জমহুর বা মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। যদি স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা বৈধ অলঙ্কার তৈরি করা হয়, তবে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর দুই মতের মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তার ওপর জাকাত রহিত হয়ে যাবে এবং এটিই ইমাম মালিক রহ.-এর মাজহাব। তবে তাঁর দুর্বলতর মত অনুযায়ী জাকাত ওয়াজিব হবে, যা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এরও অভিমত। আর যদি এ দুটি দ্বারা নিষিদ্ধ অলঙ্কার বা পাত্র তৈরি করা হয়, তবে সকলের ঐক্যবদ্ধ মত অনুযায়ী তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে।২

---

১ আমি এই হাদিসটি খুঁজে পাইনি।
২ আমি বলছি: অলঙ্কারের ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। উমর ইবনুল খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা অলঙ্কারের ওপর জাকাত ওয়াজিব করেছেন। এটি ইবনুল মুসায়্যিব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, আতা, ইবনে সিরিন, জাবির ইবনে যায়েদ, মুজাহিদ এবং যুহরি রহ.-এরও অভিমত। সুফিয়ান সাওরি এবং আসহাবে রায় (হানাফি আলিমগণ) এই মত গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে ইবনে উমর, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ও শাবি রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা এতে জাকাত আবশ্যক মনে করতেন না। ইমাম মালিক ইবনে আনাস, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. এই মত পোষণ করেছেন এবং এটিই ইমাম শাফিঈ রহ.-এর দুই মতের মধ্যে অধিকতর প্রকাশ্য মত। ইমাম আবু হানিফা ও ইবনে হাজম রহ. এই মত পোষণ করেছেন যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার যদি এই দুই ধাতুর নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ হয়, তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে।

(ص: 191)الأحكام السلطانية للماوردي

.....

= قال الترمذي: "رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحليّ زكاة، ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك".
وقد رأى شيخنا الدكتور القرضاوي -حفظه الله- أنه لا زكاة في الحلي، وقد أورد أدلة كثيرة في هذا، وفنَّد آراء المخالفين، ونكتفي هنا بإيراد تلخيصه لما ذهب إليه:
يقول أستاذنا الدكتور القرضاوي:

نستطيع تلخيص أحكام هذا المبحث -حسبما رجَّحناه- فيما يلي:

أ- من ملك مصوغًا من الذهب أو الفضة نظر في أمره، فإن كان للاقتناء والاكتناز - ذخيرة للزمن- وجبت فيه الزكاة؛ لأنه مرصد للنماء، فهو كغير المصوغ من السبائك والنقود المضروبة.

ب- وإن كان معدًّا للانتفاع والاستعمال الشخصي، نظرنا في نوع هذا الاستعمال، فإن كان محرَّمًا كأواني الذهب والفضة والتحف والتماثيل، وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب، أو نحو ذلك، وجبت فيه الزكاة؛ لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح، فسقط حكم فعله، وبقي على حكم الأصل.

جـ- ومن الاستعمال المحرّم ما كان فيه سرف ظاهر من حليّ النساء، ويعرف ذلك بمجاوزة المعتاد لمثل هذه المرأة في مثل بيئتها وعصرها وثروة أمتها.

د- وإن كان الحلي معدًّا لاستعمالٍ مباح كحلي النساء -في غير سرف- وما أعد لهن، وخاتم الفضة للرجال، لم تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال غير نام؛ لأنه من حاجات الإنسان وزينته كثيابه، وأثاثه ومتاعه، وقد أعدّ لاستعمال مباح، فلم تجب فيه الزكاة، كالعوامل من الإبل والبقر.

ولهذا اختار الشيخ أبو زهرة أن يكون هناك حَدٌّ أعلى للقدر من التحلّي الذي يعفى من زكاة الذهب والفضة، وهو النصاب الشرعي، يعفى من الزكاة في الحلي ما تكون قيمته عشرين مثقالًا من الذهب "85جرامًا" إذا كانت هذه الحليّ للنساء، ولا يعفى شيء مطلقًا من حلية الرجال منَ الذهب؛ لأنَّ تحلي الرجال بالذهب ممنوع، ولا يشجع الممنوع بالإعفاء من الزكاة؛ ولأنه إذا أوجبت فيه الزكاة كان فيه مدعاة إلى التخلص منه ببيعه.

كما لا يعفى شيء من أواني الذهب، والتحف والتماثيل.

وما وجب فيه الزكاة من الحلي أو الآنية، أو التحف، يزكَّى زكاة النقدين، حتى ولو لم يكن من الذهب أو الفضة، ما دامت له قيمة يمكن أن يدخر ويباع بها، وذلك مثل

عقود الماس والدر والياقوت والبلاتين، فيخرج ربع العشر، منه على حدة، أو مع بقية مال المزكى بشرط أن يكون نصابًا، أو يكمل بمال عنده قدر النصاب، وهو 85 جرامًا من الذهب.

وتعتبر القيمة لا الوزن هنا؛ لأن للصنعة أثرها في زيادة القيمة.

= ইমাম তিরমিযী বলেছেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী এবং তাবিঈগণের মধ্য থেকে একদল আলিম স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার মত পোষণ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী এবং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকও একই কথা বলেছেন।"

আমাদের উস্তায ড. আল-কারযাভী -আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন- মনে করেন যে, অলঙ্কারের ওপর কোনো যাকাত নেই। তিনি এ বিষয়ে অনেক দলীল পেশ করেছেন এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের যুক্তি খণ্ডন করেছেন। আমরা এখানে তাঁর সিদ্ধান্তের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করছি:

আমাদের উস্তায ড. আল-কারযাভী বলেন:

আমরা এই পরিচ্ছেদের বিধানগুলো -আমাদের নিকট যা অগ্রগণ্য সে অনুযায়ী- নিম্নোক্তভাবে সংক্ষেপ করতে পারি:

ক- কেউ যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরি অলঙ্কারের মালিক হয়, তবে তার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। যদি তা নিছক সংগ্রহে রাখা বা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে (ভবিষ্যতের পুঁজি হিসেবে) হয়, তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে; কারণ এটি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত। তাই এটি অলঙ্কারহীন স্বর্ণখণ্ড বা প্রচলিত মুদ্রার মতোই গণ্য হবে।

খ- আর যদি তা ব্যবহার বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়, তবে আমরা সেই ব্যবহারের ধরনটি দেখব। যদি তা নিষিদ্ধ কোনো ব্যবহার হয়, যেমন: স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র, শিল্পকর্ম ও মূর্তি, অথবা কোনো পুরুষ যদি নিজের জন্য স্বর্ণের চুড়ি, হার বা আংটি অথবা এই জাতীয় কিছু গ্রহণ করে, তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ একটি অবৈধ কাজের মাধ্যমে একে তার মূল প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে। ফলে ব্যবহারের হুকুমটি রহিত হয়ে যাবে এবং মূল অবস্থার (সঞ্চয়) হুকুম বহাল থাকবে।

গ- নিষিদ্ধ ব্যবহারের আরেকটি রূপ হলো নারীদের অলঙ্কারের ক্ষেত্রে স্পষ্ট অপচয় বা আতিশয্য। নিজ পরিবেশ, সময় এবং জাতির অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনায় কোনো নারীর ক্ষেত্রে যা অস্বাভাবিক, তার মাধ্যমেই এই আতিশয্য নিরূপিত হয়।

ঘ- অলঙ্কার যদি বৈধ ব্যবহারের জন্য রাখা হয়, যেমন: নারীদের পরিমিত অলঙ্কার এবং পুরুষদের জন্য রূপার আংটি, তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ এটি বর্ধনশীল সম্পদ নয়; বরং এটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ও সাজসজ্জার অন্তর্ভুক্ত, যা তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্রের মতোই। যেহেতু এটি বৈধ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তাই এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, যেমনটি শ্রমজীবী উট বা গরুর ক্ষেত্রে হয় না।

একারণেই শায়খ আবু যাহরা অলঙ্কারের এমন একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের মত দিয়েছেন, যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত থেকে মুক্ত থাকবে। আর সেটি হলো শরয়ি নিসাব। অর্থাৎ নারীদের অলঙ্কারের ক্ষেত্রে বিশ মিসকাল স্বর্ণ (৮৫ গ্রাম) পরিমাণ পর্যন্ত যাকাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। তবে পুরুষদের স্বর্ণের অলঙ্কারের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই; কারণ পুরুষদের স্বর্ণ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। আর নিষিদ্ধ বিষয়কে যাকাত থেকে অব্যাহতি দিয়ে উৎসাহিত করা যায় না। তাছাড়া এতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ফলে তা বিক্রির মাধ্যমে বর্জন করার একটি প্রেরণা তৈরি হয়।

একইভাবে স্বর্ণের পাত্র, শিল্পকর্ম ও মূর্তির ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

অলঙ্কার, পাত্র বা শিল্পকর্মের যেসব ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব, সেগুলোতে স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাতের নিয়মেই যাকাত দিতে হবে। এমনকি তা স্বর্ণ বা রৌপ্যের না হলেও, যদি এর এমন মূল্য থাকে যা সঞ্চয়যোগ্য এবং যা বিক্রি করা সম্ভব—যেমন হীরা, মুক্তা, ইয়াকুত (চুনি) এবং প্লাটিনামের হার—তবে সেগুলোর আলাদাভাবে অথবা ব্যক্তির অবশিষ্ট সম্পদের সাথে মিলিয়ে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (আড়াই শতাংশ) যাকাত দিতে হবে। শর্ত হলো তা নিসাব পরিমাণ হতে হবে অথবা ব্যক্তির নিকট থাকা নিসাব পরিমাণ (৮৫ গ্রাম স্বর্ণ) মালের সাথে যুক্ত হয়ে নিসাব পূর্ণ হতে হবে।

এক্ষেত্রে ওজনের পরিবর্তে মূল্য বিবেচনা করা হবে; কারণ কারুকাজ বা শিল্পশৈলীর কারণে এর মূল্য বৃদ্ধি পায়।

فَصْلٌ: "زكاة المعادن"

وَأَمَّا الْمَعَادِنُ فَهِيَ مِنَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْهَا، فَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي كُلِّ مَا يَنْطَبِعُ مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ وَصُفْرٍ وَنُحَاسٍ، وَأَسْقَطَهَا عَمَّا لَا يَنْطَبِعُ مِنْ مَائِعٍ وَحَجَرٍ؛ وَأَوْجَبَهَا أَبُو يُوسُفَ فِيمَا يُسْتَعْمَلُ مِنْهَا حُلِيًّا كَالْجَوَاهِرِ، وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ فِي مَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خَاصَّةً إِذَا بَلَغَ الْمَأْخُوذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ نِصَابًا، فَفِي قَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْ زَكَاتِهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ:

أَحَدُهَا: رُبُعُ الْعُشْرِ كَالْمُقْتَنَى مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: الْخُمُسُ كَالرِّكَازِ.

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: يُعْتَبَرُ حَالُهُ، فَإِنْ كَثُرَتْ مُؤْنَتُهُ فَفِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ، وَإِنْ قَلَّتْ مُؤْنَتُهُ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ؛ لِأَنَّهَا فَائِدَةٌ تُزَكَّى لِوَقْتِهَا1.

أَمَّا الرِّكَازُ: فَهُوَ كُلُّ مَالٍ وُجِدَ مَدْفُونًا مِنْ ضَرْبِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي مَوَاتٍ أَوْ طَرِيقٍ سَابِلٍ، يَكُونُ لِوَاجِدِهِ، وَعَلَيْهِ خُمُسُهُ يُصْرَفُ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" 2 وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَاجِدُ الرِّكَازِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِظْهَارِهِ وَبَيْنَ إِخْفَائِهِ، وَالْإِمَامُ إِذَا ظَهَرَ لَهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِ الْخُمُسِ أَوْ تَرْكِهِ، وَمَا وُجِدَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَهُوَ فِي الظَّاهِرِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ لَا حَقَّ فِيهِ لِوَاجِدِهِ، وَلَا شَيْءَ فِيهِ عَلَى مَالِكِهِ، إِلَّا مَا يَجِبُ مِنْ زَكَاةٍ إِنْ يَكُنْ قَدْ أَدَّاهَا عَنْهُ، وَمَا وُجِدَ

---

1 قال ابن الجوزي: الواجب في المعدن ربع العشر، وقال أبو حنيفة: الخمس، وعن الشافعي كالمذهبين، وعنه أنَّه إن أصاب المال مجتمعًا ففيه الخمس، وإن كان متفرقًا فربع العشر. وعن مالك كقولنا، وعنه كقول الآخر للشافعي، لنا ما روى مالك عن ربيعة واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية،

وأخذ منه زكاتها، والزكاة لا تكون خمسًا بحال، فإن قيل: قوله واحد يقتضي الإرسال، قلنا: ربيعة قد لقي الصحابة والجهل بالصحابي لا يضر، ولا يقال: هذا مرسل، ثم قد رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن بلال أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة المعادن القبلية. قال ربيعة: وهذه المعادن يؤخذ منها الزكاة إلى هذا الوقت، ورواه ثور عن عكرمة عن ابن عباس مثل حديث بلال. [التحقيق في أحاديث الخلاف: 2/ 48] .

2 صحيح: رواه البخاري في كتاب "1499"، ومسلم في كتاب الحدود "1710".

পরিচ্ছেদ: খনিজ সম্পদের যাকাত

খনিজ সম্পদ হলো প্রকাশ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। কোন ধরনের খনিজ সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হবে, সে বিষয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা সোনা, রূপা, পিতল ও তামার মতো ছাঁচে ঢালাইযোগ্য প্রতিটি ধাতব বস্তুর ওপর যাকাত ওয়াজিব করেছেন; আর তরল বা পাথরের মতো যা ছাঁচে ঢালাইযোগ্য নয়, তাতে যাকাত রহিত করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ সেগুলোর মধ্যে অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত মণি-মুক্তার মতো বস্তুতেও যাকাত ওয়াজিব করেছেন। ইমাম শাফিঈর মাযহাব অনুযায়ী, বিশেষভাবে সোনা ও রূপার খনিতে যাকাত ওয়াজিব হবে, যদি তা থেকে উত্তোলিত সম্পদ গলানো ও পরিশোধন করার পর নিসাব পরিমাণ হয়। খনিজ থেকে উত্তোলিত সম্পদের যাকাতের পরিমাণের বিষয়ে তিনটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমত: চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (২.৫%), যা সঞ্চিত সোনা ও রূপার যাকাতের অনুরূপ।

দ্বিতীয়ত: এক-পঞ্চমাংশ (২০%), যা রিকাজ বা প্রাচীন গুপ্তধনের মতো।

তৃতীয়ত: এর অবস্থার ওপর নির্ভর করবে; যদি তা উত্তোলনে ব্যয় ও পরিশ্রম বেশি হয়, তবে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, আর যদি ব্যয় কম হয়, তবে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে মালিকানায় এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়; কারণ এটি এমন একটি লভ্যাংশ যার যাকাত প্রাপ্তির সময়েই দিতে হয়।

রিকাজ প্রসঙ্গে: রিকাজ হলো জাহেলি যুগের এমন সম্পদ যা অনাবাদী জমি বা জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এটি যে পেয়েছে তার মালিকানাধীন হবে, তবে তার ওপর এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা ওয়াজিব, যা যাকাতের খাতে ব্যয় করা হবে। কেননা নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "রিকাজের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করতে হবে।" ইমাম আবু হানিফা বলেন: রিকাজ লাভকারী ব্যক্তি তা প্রকাশ করা বা গোপন রাখার ক্ষেত্রে ইখতিয়ার রাখেন; আর ইমামের কাছে তা প্রকাশ পেলে তিনি এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা বা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে ইখতিয়ার রাখেন। আর যা কোনো মালিকানাধীন জমিতে পাওয়া যাবে, তা বাহ্যত জমির মালিকের প্রাপ্য বলে গণ্য হবে, এতে সন্ধানকারীর কোনো অধিকার থাকবে না; জমির মালিকের ওপরও এতে কিছু প্রদান করা আবশ্যক হবে না, যদি না তাঁর পক্ষ থেকে যাকাত আদায়ের কোনো ওয়াজিব থাকে যা তিনি আদায় করেননি। আর যা পাওয়া যাবে...

---

১. ইবনুল জাওযী বলেন: খনিজ সম্পদে ওয়াজিব হলো চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আবু হানিফা বলেন: এক-পঞ্চমাংশ। শাফিঈ থেকে উভয় মাযহাবের মতো মত বর্ণিত আছে। তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, যদি সম্পদ পুঞ্জীভূত অবস্থায় পাওয়া যায় তবে এক-পঞ্চমাংশ, আর যদি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে তবে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। ইমাম মালেক থেকে আমাদের মতের অনুরূপ বর্ণনা আছে, আবার শাফিঈর অপর মতের মতোও তাঁর থেকে বর্ণিত আছে। আমাদের দলিল হলো মালেক রাবিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল ইবনুল হারিসকে কাবালিয়া অঞ্চলের খনিসমূহ জায়গির হিসেবে দান করেছিলেন এবং তা থেকে যাকাত গ্রহণ করেছিলেন। আর যাকাত কোনো অবস্থাতেই এক-পঞ্চমাংশ হয় না। যদি বলা হয়: বর্ণনাকারীর কথা 'এক' (ওয়াহিদ) হওয়া বর্ণনাটি মুরসাল হওয়ার দাবি রাখে, আমরা বলব: রাবিয়া সাহাবীদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং সাহাবীর নাম অজ্ঞাত থাকা ক্ষতিকর নয়, আর একে মুরসাল বলা যাবে না। অতঃপর দারাওয়ারদী একে রাবিয়া থেকে, তিনি হারিস ইবনে বিলাল থেকে, তিনি বিলাল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিকট থেকে কাবালিয়া খনির যাকাত গ্রহণ করেছিলেন। রাবিয়া বলেন: এই খনিগুলো থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যাকাত গ্রহণ করা হচ্ছে। সাওরী ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বিলালের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। [আত-তাহকীক ফি আহাদিসিল খিলাফ: ২/৪৮]

২. সহীহ: বুখারী '১৪৯৯' এবং মুসলিম দণ্ডবিধি (হুদুদ) অধ্যায়ে '১৭১০' নম্বর হাদীসে এটি বর্ণনা করেছেন।

مِنْ ضَرْبِ الْإِسْلَامِ مَدْفُونًا أَوْ غَيْرَ مَدْفُونٍ، فَهُوَ لُقَطَةٌ يَجِبُ تَعْرِيفُهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَلِلْوَاجِدِ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا مَضْمُونَةً فِي ذِمَّتِهِ لِمَالِكِهَا إِذَا ظَهَرَ.

فَصْلٌ:

وَعَلَى عَامِلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَدْعُوَ لِأَهْلِهَا عِنْدَ الدَّفْعِ تَرْغِيبًا لَهُمْ فِي الْمُسَارَعَةِ، وَتَمْيِيزًا لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الْجِزْيَةِ، وَامْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103] .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} أَيْ: تُطَهِّرُ ذُنُوبَهُمْ وَتُزَكِّي أَعْمَالَهُمْ، وَفِي قَوْله تَعَالَى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.

وَالثَّانِي: ادْعُ لَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَفِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} أَرْبَعُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: قُرْبَةٌ لَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَالثَّانِي: رَحْمَةٌ لَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ طَلْحَةَ.

وَالثَّالِثُ: تَثْبِيتٌ لَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ قُتَيْبَةَ.

وَالرَّابِعُ: أَمْنٌ لَهُمْ، وَهُوَ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ إِنْ لَمْ يَسْأَلْ، وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ إِذَا سُئِلَ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: مُسْتَحَبٌّ، وَالثَّانِي: مُسْتَحَقٌّ.

وَإِذَا كَتَمَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ وَأَخْفَاهَا عَنِ الْعَامِلِ مَعَ عَدْلِهِ، أَخَذَهَا الْعَامِلُ مِنْهُ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهَا، وَنَظَرَ فِي سَبَبِ إِخْفَائِهَا، فَإِنْ كَانَ لِيَتَوَلَّى إِخْرَاجَهَا بِنَفْسِهِ لَمْ يُعَزِّرْهُ، وَإِنْ أَخْفَاهَا لِيَغُلَّهَا وَيَمْنَعَ حَقَّ اللَّهِ عَزَّرَهُ وَلَمْ يُغَرِّمْهُ زِيَادَةً عَلَيْهَا، وَقَالَ مَالِكٌ: يَأْخُذُ مِنْهُ شَطْرَ مَالِهِ؛ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "مَنْ غَلَّ صَدَقَةً فَأَنَا آخُذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ اللَّهِ، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ فِيهَا نَصِيبٌ" 1.

وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام: "لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ" 2.

مَا يَصْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ظَاهِرِهِ مِنَ الْإِيجَابِ إِلَى الزَّجْرِ وَالْإِرْهَابِ، كَمَا قَالَ: "مَنْ قَتَلَ

---

1 حسن: رواه أبو داود في كتاب الزكاة "1575"، والنسائي في كتاب الزكاة "2449"، والدارمي في كتاب الزكاة "1677"، وأحمد "19534"، وحسَّنه الشيخ الألباني.
2 سبق تخريجه.

যদি তা ইসলামি আমলের মুদ্রা হয়, তা ভূগর্ভে প্রোথিত থাকুক বা উপরিভাগে, সেটি কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু (লুকাতাহ) হিসেবে গণ্য হবে। এক বছর পর্যন্ত তা ঘোষণা দেওয়া ওয়াজিব। যদি এর মালিক আসে (তবে তাকে ফেরত দিতে হবে), অন্যথায় উদ্ধারকারী ব্যক্তি তা মালিকানায় নিতে পারবে, তবে শর্ত হলো পরবর্তীতে মালিকের খোঁজ পাওয়া গেলে তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়ার দায়ভার উদ্ধারকারীর জিম্মায় থাকবে।

পরিচ্ছেদ:

যাকাত আদায়কারীর কর্তব্য হলো যাকাত প্রদানের সময় প্রদানকারীদের জন্য দোয়া করা, যাতে তারা দ্রুত যাকাত প্রদানে উৎসাহিত হয় এবং জিজিয়া প্রদানকারী জিম্মিদের থেকে তাদের পার্থক্য সূচিত হয়। আর এটি মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি আনুগত্য স্বরূপ: "তাদের সম্পদ থেকে সদাকাহ গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক।" [আত-তাওবাহ: ১০৩]।

এবং মহান আল্লাহ তাআলার বাণী: "আপনি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন" এর অর্থ হলো: আপনি তাদের গুনাহসমূহ থেকে পবিত্র করবেন এবং তাদের আমলসমূহকে পরিশুদ্ধ করবেন। আর মহান আল্লাহর বাণী: "তাদের জন্য দোয়া করুন" এর ব্যাখ্যায় দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি: তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এটি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অভিমত।

দ্বিতীয়টি: তাদের জন্য দোয়া করুন। এটি জমহুর বা সংখ্যাগুরু উলামাদের অভিমত। আর মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক" এর ক্ষেত্রে চারটি

ব্যাখ্যা রয়েছে: প্রথমটি: এটি তাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য স্বরূপ। এটি ইবনে আব্বাসের অভিমত।
দ্বিতীয়টি: এটি তাদের জন্য রহমত বা করুণা স্বরূপ। এটি তালহার অভিমত।
তৃতীয়টি: এটি তাদের জন্য চিত্তস্থৈর্য বা দৃঢ়তা স্বরূপ। এটি ইবনে কুতায়বার অভিমত।
চতুর্থটি: এটি তাদের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ। আর যদি যাকাত প্রদানকারী দোয়ার আবেদন না করে, তবে দোয়া করা মুস্তাহাব। কিন্তু যদি সে আবেদন করে, তবে তা পাওয়ার হক বা অধিকার রাখে কি না, সে বিষয়ে দুটি মত রয়েছে:
প্রথমটি: তখনও তা মুস্তাহাব। দ্বিতীয়টি: তখন তা তার প্রাপ্য বা অধিকার।
যদি কোনো ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত গোপন করে এবং তা ন্যায়নিষ্ঠ যাকাত আদায়কারীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে, তবে যাকাত আদায়কারী তা জানতে পারলে তার থেকে তা গ্রহণ করবেন। এরপর তিনি তা গোপন করার কারণ খতিয়ে দেখবেন; যদি তা নিজে বিতরণ করার উদ্দেশ্যে গোপন করে থাকে, তবে তাকে শাস্তি (তাজির) দেবেন না। কিন্তু যদি সে তা আত্মসাৎ করার জন্য এবং আল্লাহর হক থেকে বিরত থাকার জন্য গোপন করে থাকে, তবে তাকে শাস্তি দেবেন, কিন্তু যাকাতের অতিরিক্ত জরিমানা হিসেবে কিছু নেবেন না। ইমাম মালিক বলেন: তার সম্পদের অর্ধেক আদায় করা হবে; কারণ নবি (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সদাকাহ আত্মসাৎ করবে, আমি তা আদায় করব এবং সাথে তার অর্ধেক সম্পদও; এটি আল্লাহর অটল নির্দেশসমূহের একটি। এতে মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবারের কোনো অংশ নেই।" ১
এবং নবি (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর বাণী: "যাকাত ব্যতীত সম্পদে আর কোনো হক (বাধ্যতামূলক পাওনা) নেই" ২।
এই হাদিসটি ওই হাদিসের প্রকাশ্য বাধ্যতামূলক অর্থকে ধমক ও ভীতি প্রদর্শনের অর্থে রূপান্তরিত করে। যেমনটি বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি হত্যা করল...

---

১. হাসান: আবু দাউদ যাকাত অধ্যায়ে (১৫৭৫), নাসাঈ যাকাত অধ্যায়ে (২৪৪৯), দারেমি যাকাত অধ্যায়ে (১৬৭৭), আহমদ (১৯৫৩৪) এটি বর্ণনা করেছেন এবং শায়খ আলবানি একে হাসান বলেছেন।
২. এর সূত্র পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ" وَإِنْ كَانَ لَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ. وَإِذَا كَانَ الْعَامِلُ جَائِرًا فِي الصَّدَقَةِ عَادِلًا فِي قِسْمَتِهَا، جَازَ كَتْمُهَا وَأَجْزَأَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ. وَإِذَا كَانَ عَادِلًا فِي أَخْذِهَا جَائِرًا فِي قِسْمَتِهَا وَجَبَ كِتْمَانُهَا مِنْهُ وَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إِلَيْهِ؛ فَإِنْ أَخَذَهَا طَوْعًا أَوْ جَبْرًا لَمْ يُجْزِهِمْ عَنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَمْوَالِهِمْ، وَلَزِمَهُمْ إِخْرَاجُهَا بِأَنْفُسِهِمْ إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا مِنْ أَهْلِ السَّهْمَانِ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُجْزِئُهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ إِعَادَتُهَا.

وَإِذَا أَقَرَّ عَامِلُ الصَّدَقَاتِ بِقَبْضِهَا مِنْ أَهْلِهَا قُبِلَ قَوْلُهُ وَقُتَ وِلَايَتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ أَوْ مِنْ عُمَّالِ التَّنْفِيذِ، وَفِي قَبُولِ قَوْلِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ وَجْهَانِ تَخْرِيجًا مِنَ الْقَوْلَيْنِ فِي دَفْعِ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ إِلَيْهِ، هَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ أَوْ مُسْتَحَقٌّ؟ فَإِنْ قِيلَ: مُسْتَحَبٌّ قَبِلَ قَوْلَهُ بَعْدَ الْعَزْلِ، وَإِنْ قِيلَ: مُسْتَحَقٌّ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا بِقَبْضِهَا وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، وَإِذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ إِخْرَاجَهَا، فَإِنْ كَانَ مَعَ تَأْخِيرِ الْعَامِلِ عَنْهُ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَائِهَا قُبِلَ قَوْلُهُ، وَأَحْلَفَهُ الْعَامِلُ إِنِ اتَّهَمَهُ.

وَفِي اسْتِحْقَاقِ هَذِهِ الْيَمِينِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: مُسْتَحِقُّهُ إِنْ نَكَلَ عَنْهَا أُخِذَتْ مِنْهُ الزَّكَاةُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: اسْتِظْهَارًا إِنْ نَكَلَ عَنْهَا لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ، وَإِنِ ادَّعَى ذَلِكَ مَعَ حُضُورِ الْعَامِلِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الدَّفْعِ إِنْ قِيلَ: إِنَّ دَفْعَهَا إِلَى الْعَامِلِ مُسْتَحَقٌّ، وَقُبِلَ قَوْلُهُ إِنْ قِيلَ: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.

"তার দাসকে, আমরা তাকে হত্যা করব" যদিও মনিবকে তার দাসের বিনিময়ে হত্যা করা হয় না। যদি জাকাত সংগ্রাহক জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে অন্যায়কারী হয় কিন্তু তা বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হয়, তবে তা গোপন করা বৈধ এবং তাকে তা প্রদান করলে যথেষ্ট হবে। আর যদি সে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হয় কিন্তু বণ্টনের ক্ষেত্রে অন্যায়কারী হয়, তবে তার থেকে তা গোপন করা ওয়াজিব এবং তাকে তা প্রদান করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় সে যদি তা স্বেচ্ছায় বা জোরপূর্বক গ্রহণও করে, তবে তাদের সম্পদের ওপর আল্লাহ তাআলার যে হক

রয়েছে তা আদায় হবে না; বরং তাদের জন্য খাতের অন্তর্ভুক্ত হকদারদের নিকট নিজেদের পক্ষ থেকে তা প্রদান করা আবশ্যক হবে। ইমাম মালিক রহ. বলেন: এটি তাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তাদের জন্য তা পুনরায় প্রদান করা আবশ্যক হবে না।

যখন জাকাত সংগ্রাহক মালিকদের নিকট থেকে জাকাত গ্রহণের কথা স্বীকার করে, তখন তার দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে; সে অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী (তাফবীদ) আমিল হোক কিংবা নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী (তানফীয) আমিল হোক। তাকে পদচ্যুত করার পর তার বক্তব্য গ্রহণের বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে, যা প্রকাশ্য সম্পদের জাকাত আমিলকে প্রদানের হুকুম—তা কি মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) নাকি মুস্তাহাক (আবশ্যক)—এ সংক্রান্ত দুটি মত থেকে গৃহীত। যদি বলা হয় এটি মুস্তাহাব, তবে পদচ্যুতির পর তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। আর যদি বলা হয় এটি মুস্তাহাক, তবে প্রমাণ (বাইয়্যিনাহ) ছাড়া তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে না; এমনকি সে ন্যায়পরায়ণ হলেও তা গ্রহণের ক্ষেত্রে সাক্ষী হিসেবে তার সাক্ষ্য জায়েজ হবে না। আর যদি সম্পদের মালিক জাকাত প্রদানের দাবি করে এবং তা যদি আদায়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমিলের বিলম্ব করার প্রেক্ষাপটে হয়, তবে মালিকের বক্তব্য গ্রহণ করা হবে; এবং আমিল যদি তাকে সন্দেহ করে তবে তাকে দিয়ে শপথ করাবে।

এই শপথটি আবশ্যক হওয়ার বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমত: এটি বাধ্যতামূলক অধিকার (মুস্তাহাক); যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে তার থেকে পুনরায় জাকাত গ্রহণ করা হবে।

দ্বিতীয়ত: এটি কেবল বিষয়টির অধিকতর নিশ্চিতকরণের (ইসতিযহার) জন্য; সুতরাং সে যদি শপথ করতে অস্বীকারও করে, তবুও তার থেকে জাকাত নেওয়া হবে না। আর আমিলের উপস্থিতিতে যদি মালিক জাকাত প্রদানের দাবি করে, তবে তাকে প্রদানের বিষয়ে তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে না যদি এই মত গ্রহণ করা হয় যে আমিলকে প্রদান করা আবশ্যক (মুস্তাহাক); আর যদি বলা হয় যে তা মুস্তাহাব, তবে মালিকের বক্তব্য গ্রহণ করা হবে।

فَصْلٌ: "مصارف الزكاة"

وَأَمَّا قَسْمُ الصَّدَقَاتِ فِي مُسْتَحِقِّيهَا؛ فَهِيَ لِمَنْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِهِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] . بَعْدَ أَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُهَا عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ، حَتَّى لَزِمَهُ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ".

ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ الصَّدَقَاتِ بَعْدُ، فَعِنْدَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ فِي قِسْمَةِ الْأَمْوَالِ بِمَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا بِنَبِيٍّ مُرْسَلٍ حَتَّى تَوَلَّى قِسْمَتَهَا بِنَفْسِهِ"1.

فَوَاجِبٌ أَنْ تُقْسَمَ صَدَقَاتُ الْمَوَاشِي، وَأَعْشَارُ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ، وَزَكَاةُ الْأَمْوَالِ وَالْمَعَادِنِ، وَخُمُسُ الرِّكَازِ، لِأَنَّ جَمِيعَهَا زَكَاةٌ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لِلْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ إِذَا وُجِدُوا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخِلَّ بِصِنْفٍ مِنْهُمْ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى أَحَدِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ مَعَ وُجُودِهِمْ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى جَمِيعِهِمْ، وَفِي تَسْوِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَهُمْ فِي آيَةِ الصَّدَقَاتِ مَا يَمْنَعُ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَوَاجِبٌ عَلَى عَامِلِ الصَّدَقَاتِ بَعْدَ تَكَامُلِهَا وَوُجُودِ جَمِيعِ مَنْ سُمِّيَ لَهَا أَنْ يَقْسِمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ بِالتَّسْوِيَةِ، فَيَدْفَعُ سَهْمًا مِنْهَا إِلَى الْفُقَرَاءِ، وَالْفَقِيرُ هُوَ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ، ثُمَّ يَدْفَعُ السَّهْمَ الثَّانِيَ إِلَى الْمَسَاكِينِ، وَالْمِسْكِينُ هُوَ الَّذِي لَهُ مَا لَا يَكْفِيهِ، فَكَانَ الْفَقِيرُ أَسْوَأَ حَالًا مِنْهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْمِسْكِينُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْفَقِيرِ، وَهُوَ الَّذِي قَدْ أَسْكَنَهُ الْعَدَمُ، فَيَدْفَعُ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا اتَّسَعَتِ الزَّكَاةُ مَا يَخْرُجُ بِهِ مِنِ اسْمِ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَى أَدْنَى مَرَاتِبِ الْغِنَى، وَذَلِكَ مُعْتَبَرٌ بِحَسَبِ حَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَصِيرُ بِالدِّينَارِ الْوَاحِدِ غَنِيًّا إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَسْوَاقِ يَرْبَحُ فِيهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَسْتَغْنِي إِلَّا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ ذَا جَلَدٍ

يَكْتَسِبُ بِصِنَاعَتِهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا، وَقَدَّرَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه أَكْثَرَ مَا يُعْطَاهُ الْفَقِيرُ

---

1 لم أقف عليه.

পরিচ্ছেদ: জাকাতের খাতসমূহ

আর সদকা বা জাকাত এর হকদারদের মধ্যে বণ্টন করার বিষয়টি হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্মানিত কিতাবে যার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন: "সদকা কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়কারী কর্মচারী, যাদের অন্তর জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" [আত-তাওবা: ৬০]। ইতিপূর্বে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মত ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে তা বণ্টন করতেন। এমনকি কোনো এক মুনাফিক তাকে বাধা দিয়ে বলেছিল: হে আল্লাহর রাসুল! ইনসাফ করুন। তখন তিনি বললেন: "তোমার মা তোমাকে হারাক! আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে আর কে ইনসাফ করবে?" অতঃপর তাঁর প্রতি সদকার আয়াত নাজিল হয়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতা কিংবা কোনো প্রেরিত নবীর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হননি, যতক্ষণ না তিনি নিজেই এর বণ্টনভার গ্রহণ করেছেন" ১।

সুতরাং গবাদি পশুর সদকা, শস্য ও ফলের ওশর (দশমাংশ), নগদ অর্থ ও খনিজ সম্পদের জাকাত এবং রিকাযের (গুপ্তধন) এক-পঞ্চমাংশ বণ্টন করা ওয়াজিব। কারণ এ সবই জাকাত হিসেবে গণ্য, যা আটটি শ্রেণির মধ্যে আট ভাগে বণ্টন করতে হবে যদি তাদের পাওয়া যায়। তাদের মধ্য থেকে কোনো শ্রেণিকে বাদ দেওয়া বৈধ নয়। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন: আটটি শ্রেণি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাদের যে কোনো একটি শ্রেণিকে প্রদান করা জায়েজ এবং সবার মাঝে বণ্টন করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু সদকার আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে যে সমতা বজায় রেখেছেন, তা কেবল কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাকে বাধা প্রদান করে। অতএব, জাকাত আদায়কারীর ওপর ওয়াজিব হলো—জাকাত পূর্ণ হওয়ার পর এবং যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সবাইকে পাওয়া গেলে—তা আট ভাগে সমানভাবে বণ্টন করা। সুতরাং এর একটি ভাগ ফকিরদের প্রদান করবে। ফকির হলো ওই ব্যক্তি যার কিছুই

নেই। এরপর দ্বিতীয় ভাগটি মিসকিনদের প্রদান করবে। মিসকিন হলো ওই ব্যক্তি যার সম্পদ আছে কিন্তু তা তার জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং ফকিরের অবস্থা মিসকিনের চেয়েও শোচনীয়। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন: মিসকিনের অবস্থা ফকিরের চেয়েও শোচনীয়, সে হলো ওই ব্যক্তি যাকে চরম অভাব নিশ্চল করে দিয়েছে। জাকাতের পরিমাণ পর্যাপ্ত হলে তাদের প্রত্যেককে এমন পরিমাণ প্রদান করা হবে, যার মাধ্যমে তারা দারিদ্র্য ও অভাবী অবস্থা থেকে বের হয়ে সচ্ছলতার সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছাতে পারে। এটি তাদের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে। তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে এক দিনার পেলেই সচ্ছল হয়ে যায়, যদি সে বাজার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হয় এবং তা থেকে তার প্রয়োজনীয় মুনাফা অর্জন করতে পারে; সুতরাং তাকে এর চেয়ে বেশি দেওয়া জায়েজ নয়। আবার তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে একশ দিনার ছাড়া অভাবমুক্ত হয় না; সুতরাং তাকে এর চেয়ে বেশি দেওয়া জায়েজ। আবার তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে শারীরিকভাবে শক্তিশালী এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জন করতে সক্ষম; সুতরাং তাকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নয়, যদিও তার কাছে একটি দিরহামও না থাকে। আর ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন ফকিরকে সর্বোচ্চ কতটুকু দেওয়া যাবে তার পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন...

---

১ আমি এটি খুঁজে পাইনি।

(ص: 196)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالْمِسْكِينُ بِمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنَ الْوَرِقِ، وَمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا مِنَ الذَّهَبِ؛ لِئَلَّا تَجِبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيمَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ.

ثُمَّ السَّهْمُ الثَّالِثُ سَهْمُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ صِنْفَانِ:

أَحَدُهُمَا: الْمُقِيمُونَ بِأَخْذِهَا وَجِبَايَتِهَا.

وَالثَّانِي: الْمُقِيمُونَ بِقِسْمَتِهَا وَتَفْرِيقِهَا مِنْ أَمِينٍ وَمُبَاشِرٍ مَتْبُوعٍ وَتَابِعٍ.

جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى أُجُورَهُمْ فِي مَالِ الزَّكَاةِ لِئَلَّا يُؤْخَذَ مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ سِوَاهَا، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِمْ قَدْرَ أُجُورِ أَمْثَالِهِمْ؛ فَإِنْ كَانَ سَهْمُهُمْ مِنْهَا أَكْثَرَ رُدَّ الْفَضْلُ عَلَى بَاقِي السِّهَامِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ تُمِّمَتْ أُجُورُهُمْ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَمِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ.

وَالسَّهْمُ الرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ، وَهُمْ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ يَتَأَلَّفُهُمْ لِمَعُونَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَصِنْفٌ يَتَأَلَّفُهُمْ لِلْكَفِّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَصِنْفٌ يَتَأَلَّفُهُمْ لِرَغْبَتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَصِنْفٌ لِتَرْغِيبِ قَوْمِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ، فَمَنْ كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ مُسْلِمًا جَازَ أَنْ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ مِنَ الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُشْرِكًا عَدَلَ بِهِ عَنْ مَالِ الزَّكَاةِ إِلَى سَهْمِ الْمَصَالِحِ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنَائِمِ.

وَالسَّهْمُ الْخَامِسُ: سَهْمُ الرِّقَابِ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ مَصْرُوفٌ فِي الْمُكَاتَبِينَ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يُعْتَقُونَ بِهِ، وَقَالَ مَالِكٌ يُصْرَفُ فِي شِرَاءِ عَبِيدٍ يُعْتَقُونَ.

وَالسَّهْمُ السَّادِسُ: لِلْغَارِمِينَ، وَهُمْ صِنْفَانِ: صِنْفٌ مِنْهُمُ اسْتَدَانُوا فِي مَصَالِحِ أَنْفُسِهِمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مَعَ الْفَقْرِ دُونَ الْغِنَى مَا يَقْضُونَ بِهِ دُيُونَهُمْ، وَصِنْفٌ مِنْهُمُ اسْتَدَانُوا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مَعَ الْفَقْرِ وَالْغِنَى قَدْرَ دُيُونِهِمْ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ.

وَالسَّهْمُ السَّابِعُ: سَهْمُ سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُمُ الْغُزَاةُ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِمْ قَدْرُ حَاجَتِهِمْ فِي جِهَادِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا يُرَابِطُونَ فِي الثَّغْرِ دُفِعَ إِلَيْهِمْ نَفَقَةُ ذَهَابِهِمْ، وَمَا أَمْكَنَ مِنْ نَفَقَاتِ مَقَامِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا يَعُودُونَ إِذَا جَاهَدُوا أُعْطُوا نَفَقَةَ ذَهَابِهِمْ وَعَوْدِهِمْ.

وَالسَّهْمُ الثَّامِنُ: سَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ، وَهُمُ الْمُسَافِرُونَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نَفَقَةَ سَفَرِهِمْ، يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ قَدْرُ كِفَايَتِهِمْ فِي سَفَرِهِمْ، وَسَوَاءٌ مَنْ كَانَ

আর মিসকীন হলো সে ব্যক্তি, যার মালিকানায় দুইশ দিরহামের কম রৌপ্য অথবা বিশ দীনারের কম স্বর্ণ রয়েছে; যাতে করে সে যাকাত হিসেবে যা গ্রহণ করবে, তার ওপর যেন পুনরায় যাকাত ওয়াজিব না হয়ে যায়।

অতঃপর তৃতীয় অংশ হলো যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের অংশ, আর তারা দুই প্রকার:
তাদের প্রথম প্রকার হলো: যারা যাকাত গ্রহণ ও তা উসুল করার কাজে নিয়োজিত।
দ্বিতীয় প্রকার হলো: যারা যাকাত বণ্টন ও বিতরণের কাজে নিয়োজিত; যেমন আমানতদার, প্রধান কর্মকর্তা এবং তাদের অধীনস্থ কর্মচারী।
আল্লাহ তাআলা তাদের পারিশ্রমিক যাকাতের মালের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাতে সম্পদশালীদের থেকে যাকাত ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা না হয়। অতএব, তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে সমপর্যায়ের কাজের পারিশ্রমিক পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে। যদি যাকাতের মালের এই অংশটি তাদের পারিশ্রমিকের চেয়ে বেশি হয়, তবে অতিরিক্ত অংশটুকু অবশিষ্ট অংশগুলোর মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি তা কম হয়, তবে এক মত অনুযায়ী যাকাতের মাল থেকেই তাদের পারিশ্রমিক পূর্ণ করা হবে, আর অন্য মত অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণ তহবিল থেকে তা পূর্ণ করা হবে।
চতুর্থ অংশ হলো: যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন, তারা চার প্রকার: এক প্রকার হলো যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য; দ্বিতীয় প্রকার যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় মুসলমানদের ওপর অনিষ্ট করা থেকে বিরত রাখার জন্য; তৃতীয় প্রকার যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় ইসলামের প্রতি তাদের অনুরাগের কারণে; এবং চতুর্থ প্রকার হলো নিজ জাতি ও গোত্রকে ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য। এই চার প্রকারের মধ্যে যারা মুসলিম, তাদেরকে যাকাতের চিত্তাকর্ষণ (মুআল্লাফাতুল কুলুব) খাত থেকে প্রদান করা বৈধ। আর তাদের মধ্যে যারা মুশরিক, তাদেরকে যাকাতের মাল থেকে না দিয়ে বরং 'ফায়' ও 'গনীমত' এর জনকল্যাণ মূলক খাত থেকে প্রদান করা হবে।
পঞ্চম অংশ হলো: দাসমুক্তির খাত। এটি ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আবু হানীফার মতে মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ) দাসদের জন্য নির্ধারিত, যেন তাদেরকে দাসত্বমুক্ত করার প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা যায়। আর ইমাম মালিক বলেন, এটি এমন দাস ক্রয়ে ব্যয় করা হবে যাদেরকে পরবর্তীতে মুক্ত করে দেওয়া হবে।
ষষ্ঠ অংশ হলো: ঋণগ্রস্তদের জন্য। তারা দুই প্রকার: এক প্রকার হলো যারা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করেছে; তারা সচ্ছল না হয়ে দরিদ্র হলে তাদেরকে ঋণ পরিশোধের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো যারা মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণের স্বার্থে ঋণ গ্রহণ করেছে; তাদেরকে দরিদ্র বা ধনী নির্বিশেষে ঋণের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে, তবে এর অতিরিক্ত কিছু নয়।

সপ্তম অংশ হলো: আল্লাহ তাআলার পথের অংশ। তারা হলেন জিহাদে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধা; তাদের জিহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এই অংশ থেকে অর্থ প্রদান করা হবে। যদি তারা সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত থাকে, তবে তাদের গমনের খরচ এবং সেখানে অবস্থানের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় প্রদান করা হবে। আর যদি তারা জিহাদ শেষে ফিরে আসে, তবে তাদের যাওয়া ও আসার খরচ প্রদান করা হবে।
অষ্টম অংশ হলো: মুসাফিরের অংশ। তারা এমন পর্যটক যাদের কাছে সফরের ব্যয় নির্বাহের সম্বল নেই। তাদের সফর যদি কোনো পাপের উদ্দেশ্যে না হয়, তবে তাদেরকে তাদের সফরের পর্যাপ্ত ব্যয়ভার এই অংশ থেকে প্রদান করা হবে। চাই সে...

(ص: 197)الأحكام السلطانية للماوردي

مِنْهُمْ مُبْتَدِئًا بِالسَّفَرِ أَوْ مُجْتَازًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَدْفَعُهُ إِلَى الْمُجْتَازِ دُونَ الْمُبْتَدِئِ بِالسَّفَرِ.
وَإِذَا قُسِمَتِ الزَّكَاةُ فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ لَمْ يَخْلُ حَالُهُمْ بَعْدَهَا مِنْ خَمْسَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ وَفْقَ كِفَايَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ، فَقَدْ خَرَجُوا بِمَا أَخَذُوهُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ، وَحَرُمَ عَلَيْهِمُ التَّعَرُّضُ لَهَا.
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مُقَصِّرَةً عَنْ كِفَايَتِهِمْ، فَلَا يُخْرَجُونَ مِنْ أَهْلِهَا، وَيُحَالُونَ بِبَاقِي كِفَايَتِهِمْ عَلَى غَيْرِهَا.
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ كَافِيَةً لِبَعْضِهِمْ مُقَصِّرَةً عَنِ الْبَاقِينَ، فَيَخْرُجُ الْمُكْتَفُونَ عَنْ أَهْلِهَا، وَيَكُونُ الْمُقَصِّرُونَ عَلَى حَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ.
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ تَفْضُلَ عَنْ كِفَايَةِ جَمِيعِهِمْ فَيَخْرُجُونَ مِنْ أَهْلِهَا بِالْكِفَايَةِ، وَيُرَدُّ الْفَاضِلُ مِنْ سِهَامِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهِ.

وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ: أَنْ تَفْضُلَ عَنْ كِفَايَاتِ بَعْضِهِمْ وَتَعْجِزُ عَنْ كِفَايَاتِ الْبَاقِينَ، فَيُرَدُّ مَا فَضَلَ عَنِ الْمُكْتَفِينَ عَلَى مَنْ عَجَزَ مِنَ الْمُقَصِّرِينَ حَتَّى يَكْتَفِيَ الْفَرِيقَانِ.

وَإِذَا عُدِمَ بَعْضُ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ قُسِمَتِ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ يُوجَدُ مِنْهُمْ وَلَوْ كَانَ صِنْفًا وَاحِدًا؛ وَلَا يُنْقَلُ سَهْمُ مَنْ عُدِمَ مِنْهُمْ فِي جِيرَانِ الْمَالِ إِلَّا سَهْمَ سَبِيلِ اللَّهِ فِي الْغُزَاةِ، فَإِنَّهُ يُنْقَلُ إِلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْكُنُونَ الثُّغُورَ فِي الْأَغْلَبِ؛ وَتُفَرَّقُ زَكَاةُ كُلِّ نَاحِيَةٍ فِي أَهْلِهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُنْقَلَ زَكَاةُ بَلَدٍ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ أَهْلِ السَّهْمَانِ فِيهِ؛ فَإِنْ نَقَلَهَا عَنْهُ مَعَ وُجُودِهِمْ فِيهِ لَمْ يُجْزِئْهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَأَجْزَأَهُ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ دَفْعَ زَكَاةِ الْفِطْرِ خَاصَّةً إِلَى الذِّمِّيِّ دُونَ الْمُعَاهَدِ، وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى ذَوِي الْقُرْبَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَنْزِيهًا لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ الذُّنُوبِ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ دَفْعَهَا إِلَيْهِمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ إِلَى عَبْدٍ وَلَا مُدَبَّرٍ، وَلَا أُمِّ وَلَدٍ، وَلَا مَنْ رُقَّ بَعْضُهُ؛ وَلَا يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى زَوْجَتِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ الْمَرْأَةُ زَكَاتَهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ ذَلِكَ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ أَحَدٌ زَكَاتَهُ إِلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ لِغِنَاهُمْ بِهِ، إِلَّا مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانُوا مِنْهُمْ، وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أَقَارِبِهِ، وَصَرْفُهَا فِيهِمْ

তাদের মধ্যে যারা সফর শুরুকারী অথবা যারা পথ অতিক্রমকারী। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন: আমি তা পথ অতিক্রমকারীকে প্রদান করব, সফর শুরুকারীকে নয়।

যখন যাকাত আটটি শ্রেণির মধ্যে বণ্টন করা হয়, তখন তাদের অবস্থা পরবর্তী পাঁচটি পরিস্থিতির বাইরে থাকে না:

প্রথমটি: যাকাত তাদের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া, যাতে কোনো ঘাটতি বা আধিক্য নেই। এমতাবস্থায় যা তারা যাকাতদাতাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছে তার মাধ্যমে তারা অভাবগ্রস্তদের তালিকা থেকে বের হয়ে গেছে এবং তাদের জন্য পুনরায় তা যাচ্ঞা করা হারাম।

দ্বিতীয়টি: যাকাত তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত হওয়া। ফলে তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্যদের তালিকা থেকে বের হবে না এবং অবশিষ্ট প্রয়োজনের জন্য তাদের অন্য উৎসের দিকে সোপর্দ করা হবে।
তৃতীয়টি: যাকাত তাদের কারো জন্য পর্যাপ্ত হওয়া এবং অন্যদের জন্য অপর্যাপ্ত হওয়া। এমতাবস্থায় যাদের প্রয়োজন মিটেছে তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্যদের তালিকা থেকে বের হয়ে যাবে এবং যাদের প্রয়োজন অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য হিসেবেই বহাল থাকবে।
চতুর্থটি: যাকাত তাদের সকলের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া। ফলে পর্যাপ্ততার কারণে তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্যদের তালিকা থেকে বের হয়ে যাবে এবং তাদের হিস্যার অতিরিক্ত অংশ নিকটবর্তী এলাকার অন্যদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।
পঞ্চমটি: যাকাত কারো কারো প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া কিন্তু অন্যদের জন্য অপর্যাপ্ত হওয়া। এমতাবস্থায় যাদের জন্য অতিরিক্ত হয়েছে তাদের সেই বাড়তি অংশ যাদের জন্য কম হয়েছে তাদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যাতে উভয় দলই সচ্ছলতা লাভ করে।
যখন আটটি শ্রেণির কোনো কোনোটির অনুপস্থিতি দেখা দেবে, তখন যাকাত বিদ্যমান শ্রেণির মধ্যে বণ্টন করা হবে, যদিও তারা মাত্র একটি শ্রেণি হয়। যে শ্রেণির অনুপস্থিতি দেখা দেবে, সম্পদের এলাকায় বসবাসকারীদের থেকে তাদের হিস্যা অন্য কোথাও স্থানান্তর করা হবে না, তবে গাজীদের (মুজাহিদদের) জন্য বরাদ্দকৃত 'আল্লাহর পথের' অংশ স্থানান্তর করা যাবে; কারণ তারা সাধারণত সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থান করে। প্রত্যেক এলাকার যাকাত সেই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যেই বণ্টন করা হবে। কোনো শহরের যাকাত অন্য শহরে স্থানান্তর করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না সেখানে যাকাত পাওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকে। যদি সেখানে প্রাপক থাকা সত্ত্বেও তা স্থানান্তর করা হয়, তবে একটি মত অনুযায়ী তা আদায় হবে না; আর অন্য মতানুসারে তা আদায় হয়ে যাবে এবং এটিই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব।
কোনো কাফেরকে যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বিশেষভাবে যিম্মিকে (অমুসলিম নাগরিক) সদকায়ে ফিতর প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন, তবে মুয়াহাদকে (চুক্তিভুক্ত অমুসলিম) নয়। বনু হাশিম এবং বনু আব্দুল মুত্তালিবের নিকটাত্মীয়দের যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়, যাতে তাদের মানুষের মালের অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করা যায়। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাদের যাকাত প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন। ক্রীতদাস, মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ এবং আংশিক মুক্ত দাসের ক্ষেত্রে যাকাত প্রদান জায়েয নয়। কোনো ব্যক্তি তার

স্ত্রীকে যাকাত প্রদান করতে পারবে না। তবে স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত প্রদান করতে পারে, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তা নিষেধ করেছেন।
কোনো ব্যক্তির জন্য এমন কাউকে যাকাত প্রদান করা বৈধ নয় যাদের ভরণপোষণ দেওয়া তার ওপর ওয়াজিব, যেমন পিতা-মাতা অথবা সন্তান; কারণ দাতার ওপর নির্ভরশীলতার কারণে তারা সচ্ছল বলে গণ্য হয়। তবে তারা যদি ঋণগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে ঋণগ্রস্তদের খাত থেকে তাদের দেওয়া যাবে। এছাড়া অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে যাকাত প্রদান করা জায়েয এবং তাদের মাঝে তা ব্যয় করা উত্তম।

(ص: 198)الأحكام السلطانية للماوردي

أَفْضَلُ مِنَ الْأَجَانِبِ، وَفِي جِيرَانِ الْمَالِ أَفْضَلُ مِنَ الْأَبَاعِدِ، وَإِذَا أَحْضَرَ رَبُّ الْمَالِ أَقَارِبَهُ إِلَى الْعَامِلِ لِيَخُصَّهُمْ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ تَخْتَلِطْ زَكَاتُهُ بِزَكَاةِ غَيْرِهِ خَصَّهُمْ بِهَا، فَإِنْ اخْتَلَطَتْ كَانُوا فِي الْمُخْتَلَطِ أُسْوَةَ بغَيْرِهِمْ، لَكِنْ لَا يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا؛ لِأَنَّ فِيهَا مَا هُمْ بِهِ أَحَقُّ وَأَخَصُّ.

وَإِذَا اسْتَرَابَ رَبُّ الْمَالِ بِالْعَامِلِ فِي مَصْرِفِ زَكَاتِهِ، وَسَأَلَهُ أَنْ يُشْرِفَ عَلَى قِسْمَتِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إِجَابَتُهُ إِلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَرِئَ مِنْهَا بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ، وَلَوْ سَأَلَ الْعَامِلُ رَبَّ الْمَالِ أَنْ يَحْضُرَ قِسْمَتَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْحُضُورُ لِبَرَاءَتِهِ مِنْهَا بِالدَّفْعِ، وَإِذَا هَلَكَتِ الزَّكَاةُ فِي يَدِ الْعَامِلِ قَبْلَ قِسْمَتِهَا أَجْزَأَتْ رَبَّ الْمَالِ، وَلَمْ يَضْمَنْهَا الْعَامِلُ إِلَّا بِالْعُدْوَانِ، وَإِذَا تَلِفَتِ الزَّكَاةُ فِي يَدِ رَبِّ الْمَالِ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَى الْعَامِلِ لَمْ تُجْزِهِ وَأَعَادَهَا، وَلَوْ تَلِفَ مَالُهُ قَبْلَ إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ، إِنْ كَانَ تَلَفُهُ قَبْلَ إِمْكَانِ أَدَائِهَا، وَلَا تَسْقُطُ إِنْ كَانَ تَلَفُهُ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَائِهَا، وَإِذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ تَلَفَ مَالِهِ قَبْلَ ضَمَانِ زَكَاتِهِ كَانَ قَوْلًا مَقْبُولًا؛ وَإِنِ اتَّهَمَهُ الْعَامِلُ أَحْلَفَهُ اسْتِظْهَارًا، وَلَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يَأْخُذَ رِشْوَةَ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْبَلَ هَدَايَاهُمْ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ" 1.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرِّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ: أَنَّ الرِّشْوَةَ مَا أُخِذَتْ طَلَبًا، وَالْهَدِيَّةَ مَا بُذِلَتْ عَفْوًا، فَإِذَا ظَهَرَتْ عَلَى الْعَامِلِ خِيَانَةٌ، كَانَ الْإِمَامُ هُوَ النَّاظِرُ فِي حَالِهِ، الْمُسْتَدْرِكُ لِخِيَانَتِهِ، دُونَ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ لِأَهْلِ السَّهْمَانِ فِي خُصُومَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَتَظَلَّمُوا إِلَى الْإِمَامِ تَظَلُّمَ الْحَاجَاتِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْعَامِلِ لِلتُّهْمَةِ اللَّاحِقَةِ بِهِمْ، فَأَمَّا شَهَادَةُ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ كَانَتْ فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْهُمْ لَمْ تُسْمَعْ شَهَادَتُهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي وَضْعِهِ لَهَا غَيْرَ حَقِّهَا سُمِعَتْ.

وَإِذَا ادَّعَى أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى الْعَامِلِ وَأَنْكَرَهَا، أَحْلَفَ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ عَلَى مَا ادَّعَوْهُ وَبَرِئُوا، وَأُحْلِفَ الْعَامِلَ عَلَى مَا أَنْكَرَهُ وَبَرِئَ، فَإِنْ شَهِدَ بَعْضُ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ لِبَعْضٍ بِالدَّفْعِ إِلَى الْعَامِلِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّنَاكُرِ وَالتَّخَاصُمِ لَمْ تُسْمَعْ شَهَادَتُهُمْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُمَا سُمِعَتْ، وَحُكِمَ عَلَى الْعَامِلِ بِالْغُرْمِ، فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ الشَّهَادَةِ أَنَّهُ قَسَمَهَا فِي أَهْلِ السَّهْمَانِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَكْذَبَ هَذِهِ الدَّعْوَى بِإِنْكَارِهِ، فَإِنْ شَهِدَ لَهُ أَهْلُ السَّهْمَانِ بِأَخْذِهَا مِنْهُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَكْذَبَهُمْ بِإِنْكَارِ الْأَخْذِ، وَإِذَا أَقَرَّ الْعَامِلُ بِقَبْضِ الزَّكَاةِ وَادَّعَى قِسْمَتَهَا فِي

---

1 حسن: سبق تخريجه.

(আত্মীয়দের প্রদান করা) অনাত্মীয়দের তুলনায় উত্তম, এবং সম্পদের নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের প্রদান করা দূরবর্তীদের তুলনায় উত্তম। আর যখন সম্পদের মালিক তার আত্মীয়-স্বজনকে জাকাত আদায়কারীর কাছে নিয়ে আসেন যাতে তিনি তাদেরকে তার সম্পদের জাকাত বিশেষভাবে প্রদান করেন, তখন যদি তার জাকাত অন্যের জাকাতের সাথে মিশে না গিয়ে থাকে, তবে তিনি তাদেরকেই তা নির্দিষ্ট করে দেবেন। কিন্তু যদি তা মিশে যায়, তবে সেই মিশ্রিত সম্পদে তারা অন্যদের মতোই বিবেচিত হবেন; তবে তিনি তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করবেন না, কারণ এতে এমন অংশ রয়েছে যার প্রতি তারা অধিক হকদার এবং বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

যদি সম্পদের মালিক তার জাকাত বণ্টনের ক্ষেত্রে আদায়কারীর ব্যাপারে সন্দিহান হন এবং বণ্টনের বিষয়টি তদারকি করার আবেদন জানান, তবে আদায়কারীর জন্য সেই আবেদনে সাড়া দেওয়া আবশ্যক নয়; কারণ আদায়কারীর কাছে জাকাত হস্তান্তরের মাধ্যমেই তিনি দায়মুক্ত হয়েছেন। আবার যদি আদায়কারী সম্পদের মালিককে বণ্টনকালে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেন, তবে মালিকের জন্য উপস্থিত থাকা আবশ্যক নয়, কারণ হস্তান্তরের ফলেই তিনি এ থেকে দায়মুক্ত হয়েছেন। যদি বণ্টনের পূর্বে আদায়কারীর হাতে জাকাত বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে সম্পদের মালিকের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে এবং আদায়কারী কোনো সীমালঙ্ঘন বা অবহেলা না করলে এর জন্য দায়ী হবেন না। আর যদি জাকাত আদায়কারীর কাছে পৌঁছানোর আগেই সম্পদের মালিকের হাতে বিনষ্ট হয়, তবে তা যথেষ্ট হবে না এবং তাকে পুনরায় তা আদায় করতে হবে। যদি জাকাত বের করার আগে তার সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে জাকাত প্রদানের সুযোগ লাভের আগে সম্পদ বিনষ্ট হলে তার ওপর থেকে জাকাতের আবশ্যকতা রহিত হয়ে যাবে; কিন্তু প্রদানের সুযোগ লাভের পর বিনষ্ট হলে তা রহিত হবে না। আর সম্পদের মালিক যদি তার জাকাত আবশ্যক হওয়ার আগে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার দাবি করেন, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে; আর আদায়কারী যদি তাকে অভিযুক্ত করেন, তবে অধিকতর নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকে শপথ করাবেন। আদায়কারীর জন্য সম্পদের মালিকদের থেকে ঘুষ গ্রহণ করা বৈধ নয় এবং তাদের উপহার গ্রহণ করাও জায়েজ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কর্মকর্তাদের জন্য (প্রদত্ত) উপহার হলো আত্মসাৎ।" ১

ঘুষ ও উপহারের মধ্যে পার্থক্য হলো: ঘুষ হলো তা যা চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করা হয়, আর উপহার হলো তা যা স্বেচ্ছায় প্রদান করা হয়। যদি আদায়কারীর পক্ষ থেকে কোনো খেয়ানত প্রকাশ পায়, তবে রাষ্ট্রপ্রধানই তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং তার খেয়ানতের প্রতিকার করবেন, সম্পদের মালিকগণ নন। আর জাকাতের হকদারদের জন্য তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া আবশ্যক নয়, তবে তারা অভাবের কারণে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে অভিযোগ পেশ করতে পারে। আদায়কারীর বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ তাদের প্রতি স্বার্থসংশ্লিষ্টতার অভিযোগের আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে, আদায়কারীর বিরুদ্ধে সম্পদের মালিকদের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে—যদি তা তাদের কাছ থেকে জাকাত গ্রহণের বিষয়ে হয় তবে তা শোনা হবে না, কিন্তু যদি তা জাকাত সঠিক খাতের বাইরে ব্যয় করার বিষয়ে হয় তবে তা শোনা হবে।

যদি সম্পদের মালিকরা আদায়কারীর কাছে জাকাত প্রদানের দাবি করেন কিন্তু আদায়কারী তা অস্বীকার করেন, তবে সম্পদের মালিকদের তাদের দাবির স্বপক্ষে শপথ করানো হবে এবং তারা দায়মুক্ত হবেন। এবং আদায়কারীকে তার অস্বীকৃতির ওপর শপথ করানো হবে এবং তিনিও দায়মুক্ত হবেন। যদি সম্পদের মালিকদের কেউ কেউ অন্যদের অনুকূলে আদায়কারীর কাছে জাকাত প্রদানের সাক্ষ্য দেন; তবে যদি তা পারস্পরিক অস্বীকৃতি ও বিবাদের পরে হয়, তবে তার বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্য শোনা হবে না; কিন্তু যদি তা বিবাদ ও অস্বীকৃতির আগে হয় তবে তা শোনা হবে এবং আদায়কারীর ওপর ক্ষতিপূরণ প্রদানের ফায়সালা দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় সাক্ষ্য প্রদানের পর আদায়কারী যদি দাবি করেন যে তিনি তা হকদারদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন, তবে তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না; কারণ তিনি আগে অস্বীকার করার মাধ্যমে নিজের এই দাবিকে নিজেই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন। আর যদি জাকাতের হকদাররা তার অনুকূলে তা গ্রহণের সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না; কারণ তিনি জাকাত গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করে তাদের সাক্ষ্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন। আর যখন আদায়কারী জাকাত গ্রহণের বিষয়টি স্বীকার করেন এবং তা বণ্টনের দাবি করেন...

---

১ হাসান: এর তাখরিজ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(ص: 199)الأحكام السلطانية للماوردي

أَهْلِ السَّهْمَانِ فَأَنْكَرُوهُ، كَانَ قَوْلُهُ فِي قِسْمَتِهَا مَقْبُولًا؛ لِأَنَّهُ مُؤَمَّنٌ فِيهَا؛ وَقَوْلُهُمْ فِي إِنْكَارٍ مَقْبُولٌ فِي بَقَاءِ فَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ، وَمَنِ ادَّعَى مِنْ أَهْلِ السَّهْمَانِ فَقْرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنِ ادَّعَى غُرْمًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَلَا بِبَيِّنَةٍ؟ وَإِذَا أَقَرَّ رَبُّ الْمَالِ عِنْدَ الْعَامِلِ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِمَبْلَغِ مَالِهِ، جَازَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ عَلَى قَوْلِهِ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ بِإِحْضَارِ مَالِهِ جَبْرًا، وَإِذَا أَخْطَأَ الْعَامِلُ فِي قَسْمِ الزَّكَاةِ وَوَضَعَهَا فِي غَيْرِ مُسْتَحِقٍّ لَمْ يَضْمَنْ فِيمَنْ يُخْفَى حاله مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، وَفِي ضَمَانِهِ لَهَا فِيمَنْ لَا يُخْفَى حاله مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْكُفَّارِ

وَالْعَبِيدِ قَوْلَانِ، وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ الْخَاطِئَ فِي قِسْمَتِهَا ضَمِنَهَا فِيمَنْ لَا يَخْفَى حَالُهُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْعَبِيدِ.

وَفِي ضَمَانِهَا فِيمَنْ يَخْفَى حَالُهُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ قَوْلَانِ: وَيَكُونُ حُكْمُ الْعَامِلِ فِي سُقُوطِ الضَّمَانِ أَوْسَعَ؛ لِأَنَّ شُغْلَهُ أَكْثَرُ فَكَانَ فِي الْخَطَإِ أَعْذَرَ.

যাকাতের হকদারগণ যদি বণ্টন অস্বীকার করে, তবে বণ্টনের ক্ষেত্রে দাতার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে; কেননা এ বিষয়ে তাকে আমানতদার মনে করা হয়। তবে তাদের দারিদ্র্য ও অভাব বিদ্যমান থাকার বিষয়ে তাদের অস্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য হবে। হকদারদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে অভাবী বলে দাবি করে, তবে তার দাবি গ্রহণ করা হবে; কিন্তু কেউ যদি ঋণগ্রস্ত হওয়ার দাবি করে, তবে তার দাবি গৃহীত হবে না, এমনকি সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমেও কি (গৃহীত হবে না)? যখন সম্পদের মালিক যাকাত সংগ্রাহকের নিকট তার যাকাতের পরিমাণ স্বীকার করেন কিন্তু তার মোট সম্পদের পরিমাণ তাকে জানান না, তখন তার বক্তব্য অনুযায়ী তা গ্রহণ করা বৈধ এবং তাকে জোরপূর্বক তার সম্পদ উপস্থিত করতে বাধ্য করা হবে না। যদি যাকাত সংগ্রাহক যাকাত বণ্টনে ভুল করেন এবং তা অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রদান করেন, তবে যাদের সচ্ছলতা গোপন থাকে এমন ধনীদের ক্ষেত্রে তিনি দায়বদ্ধ হবেন না। আর যাদের অবস্থা গোপন নয় যেমন—নিকটাত্মীয় (যাদের জন্য যাকাত হারাম), অমুসলিম ও দাসদের ক্ষেত্রে তার দায়বদ্ধ হওয়ার বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে। আর যদি সম্পদের মালিক নিজেই বণ্টনের ক্ষেত্রে ভুল করেন, তবে যাদের অবস্থা গোপন নয় যেমন—নিকটাত্মীয় ও দাসদের ক্ষেত্রে তিনি দায়বদ্ধ হবেন।

আর যাদের সচ্ছলতা গোপন থাকে এমন ধনীদের ক্ষেত্রে তার (মালিকের) দায়বদ্ধ হওয়ার বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে। দায়বদ্ধতা মওকুফের ক্ষেত্রে যাকাত সংগ্রাহকের বিধান অধিক প্রশস্ত বা শিথিল; কেননা তার কাজের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক, তাই ভুলের ক্ষেত্রে তিনি অধিক ওজর বা ক্ষমার যোগ্য।

(ص: 200)الأحكام السلطانية للماوردي

الباب الثاني عشر: "في قسم الفيء والغنيمة"

وَأَمْوَالُ الْفَيْءِ1 وَالْغَنَائِمِ2 مَا وَصَلَتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ كَانُوا سَبَبَ وُصُولِهَا.

وَيَخْتَلِفُ الْمَالَانِ فِي حُكْمِهِمَا، وَهُمَا مُخَالِفَانِ لِأَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: إِنَّ الصَّدَقَاتِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ، وَالْفَيْءَ وَالْغَنِيمَةَ مَأْخُوذَانِ مِنَ الْكُفَّارِ انْتِقَامًا مِنْهُمْ.

وَالثَّانِي: إِنَّ مَصْرِفَ الصَّدَقَاتِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، لَيْسَ لِلْأَئِمَّةِ اجْتِهَادٌ فِيهِ، وَفِي أَمْوَالِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ مَا يَقِفُ مَصْرِفُهُ عَلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ.

وَالثَّالِثُ: إِنَّ أَمْوَالَ الصَّدَقَاتِ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ أَرْبَابُهَا بِقِسْمَتِهَا فِي أَهْلِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ أَنْ يَنْفَرِدُوا بِوَضْعِهِ فِي مُسْتَحِقِّهِ حَتَّى يَتَوَلَّاهُ أَهْلُ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْوُلَاةِ.

وَالرَّابِعُ: اخْتِلَافُ الْمَصْرِفَيْنِ عَلَى مَا سَنُوَضِّحُ.

أَمَّا الْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ فَهُمَا مُتَّفِقَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ، وَمُخْتَلِفَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

فَأَمَّا وَجْهَا اتِّفَاقِهِمَا فَأَحَدُهُمَا: إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَالَيْنِ وَاصِلٌ بِالْكُفْرِ.

وَالثَّانِي: إِنَّ مَصْرِفَ خُمُسِهِمَا وَاحِدٌ.

وَأَمَّا وَجْهَا افْتِرَاقِهِمَا فَأَحَدُهُمَا: إِنَّ مَالَ الْفَيْءِ مَأْخُوذٌ عَفْوًا، وَمَالَ الْغَنِيمَةِ مَأْخُوذٌ قَهْرًا.

وَالثَّانِي: إِنَّ مَصْرِفَ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ مُخَالِفٌ الْغَنِيمَةَ لِمَصْرِفِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ مَا سَنُوَضِّحُ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَسَنَبْدَأُ بِمَالِ الْفَيْءِ فَنَقُولُ: إِنَّ كُلَّ مَالٍ وَصَلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَفْوًا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ، وَلَا بِإِيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَهُوَ كَمَالِ الْهُدْنَةِ وَالْجِزْيَةِ وَأَعْشَارِ مَتَاجِرِهِمْ، أَوْ كَانَ وَاصِلًا بِسَبَبٍ

---

1 الفيء: ما أورده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال، إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها، والغنيمة أخص منه، والنفل أخص منها. [التعريفات: ص 217] .

2 الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى، وحكمه أنَّ يخمَّس، وسائره للغانمين خاصة. [التعريفات: ص 209] .

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: ফাই ও গণিমত বণ্টন প্রসঙ্গে

ফাই ও গণিমত সম্পদ হলো সেসব মাল যা মুশরিকদের নিকট থেকে হস্তগত হয় অথবা যা হস্তগত হওয়ার পেছনে তারা কারণ হয়ে থাকে।

এই দুই প্রকার সম্পদের বিধানে পার্থক্য রয়েছে এবং চারটি দিক থেকে এগুলো সদকার (জাকাত) মালের চেয়ে ভিন্ন:

প্রথমত: সদকা মুসলিমদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হয় তাদের পবিত্র করার উদ্দেশ্যে, আর ফাই ও গণিমত কাফিরদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হয় তাদের শাস্তিস্বরূপ।

দ্বিতীয়ত: সদকার ব্যয়ের খাতসমূহ (শরীয়তের অকাট্য দলীল দ্বারা) নির্ধারিত, এতে ইমামদের (রাষ্ট্রপ্রধান) কোনো ইজতিহাদ বা গবেষণার অবকাশ নেই। কিন্তু ফাই ও গণিমতের ক্ষেত্রে এমন কিছু ব্যয়ের খাত রয়েছে যা ইমামদের ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়ত: সদকার মালের ক্ষেত্রে এর মালিকগণ নিজ উদ্যোগে তা হকদারদের মাঝে বণ্টন করতে পারেন। কিন্তু ফাই ও গণিমতের ক্ষেত্রে এর প্রাপকদের জন্য শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ইজতিহাদ করার যোগ্য ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ ব্যতীত তা নিজেরা পৃথকভাবে বণ্টন করে নেওয়া বৈধ নয়।

চতুর্থত: ব্যয়ের উভয় খাতের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, যা আমরা সামনে স্পষ্ট করব।

ফাই ও গণিমত দুটি বিষয়ে একমত এবং দুটি বিষয়ে ভিন্ন:

ঐকমত্যের দুটি বিষয়ের প্রথমটি হলো: এই উভয় প্রকার সম্পদই কুফর বা কাফিরদের সাথে সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে অর্জিত।

দ্বিতীয়টি হলো: উভয়েরই এক-পঞ্চমাংশের (খুমুস) ব্যয়ের খাত অভিন্ন।

আর পার্থক্যের দুটি বিষয়ের একটি হলো: ফাই-এর সম্পদ যুদ্ধ ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জিত হয়, আর গণিমতের সম্পদ অর্জিত হয় যুদ্ধের মাধ্যমে বলপ্রয়োগ করে।
দ্বিতীয়টি হলো: ফাই-এর চার-পঞ্চমাংশের ব্যয়ের খাত গণিমতের চার-পঞ্চমাংশের ব্যয়ের খাত থেকে ভিন্ন, যা আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা সামনে স্পষ্ট করব।
আমরা ফাই-এর মাল দিয়ে আলোচনা শুরু করছি: যে সম্পদ মুশরিকদের নিকট থেকে কোনো যুদ্ধ ছাড়া এবং ঘোড়া বা উট চালনা ব্যতিরেকে অর্জিত হয়, তাকে ফাই বলা হয়। যেমন—সন্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত মাল, জিযিয়া, তাদের ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর ধার্যকৃত উশর (দশমাংশ), অথবা যা অন্য কোনো কারণে হস্তগত হয়...
---
১. ফাই: আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনের অনুসারীদের জন্য বিজাতীয়দের যে সম্পদ যুদ্ধ ছাড়াই প্রদান করেন, চাই তা দেশান্তরের মাধ্যমে হোক কিংবা জিযিয়া বা অন্য কোনো চুক্তির মাধ্যমে হোক। গণিমত এর চেয়েও সুনির্দিষ্ট এবং নফল (অতিরিক্ত পুরস্কার) তার চেয়েও আরও সুনির্দিষ্ট। [আত-তারিফাত: পৃষ্ঠা ২১৭]
২. গণিমত: সেই সম্পদের নাম যা যোদ্ধাদের শক্তি প্রয়োগে এবং আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে কাফিরদের পরাভূত করে তাদের নিকট থেকে হস্তগত করা হয়। এর বিধান হলো—এর এক-পঞ্চমাংশ করা হবে এবং অবশিষ্টাংশ বিশেষভাবে যোদ্ধাদের প্রাপ্য হবে। [আত-তারিফাত: পৃষ্ঠা ২০৯]

(ص: 201)الأحكام السلطانية للماوردي

مِنْ جِهَتِهِمْ كَمَالِ الْخَرَاجِ، فَفِيهِ إِذَا أُخِذَ مِنْهُمْ أَدَاءَ الْخُمُسِ لِأَهْلِ الْخُمُسِ مَقْسُومًا عَلَى خَمْسَةٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه: لَا خُمُسَ فِي الْفَيْءِ1، وَنَصُّ الْكِتَابِ فِي خُمُسِ الْفَيْءِ يَمْنَعُ مِنْ مُخَالَفَتِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7] .

فَيُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةٍ: سَهْمٌ مِنْهَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَيَاتِهِ، يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَزْوَاجِهِ، وَيَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِهِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ فَذَهَبَ مَنْ يَقُولُ بِمِيرَاثِ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى أَنَّهُ مَوْرُوثٌ عَنْهُ مَصْرُوفٌ إِلَى وَرَثَتِهِ.

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ2: يَكُونُ مِلْكًا لِلْإِمَامِ بَعْدَهُ؛ لِقِيَامِهِ بِأُمُورِ الْأُمَّةِ مَقَامَهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَدْ سَقَطَ بِمَوْتِهِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ مَصْرُوفًا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ؛ كَأَرْزَاقِ الْجَيْشِ وَإِعْدَادِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَالْقَنَاطِرِ، وَأَرْزَاقِ الْقَضَاءِ وَالْأَئِمَّةِ، وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى مِنْ وُجُوهِ الْمَصَالِحِ3.

---

1 قال ابن تيمية -رحمه الله تعالى: ومن الفيء ما ضربه عمر رضي الله عنه على الأرض التي فتحها عنوة ولم يقسمها -كأرض مصر وأرض العراق- إلّا شيئًا يسيرًا منها، وبرّ الشام وغير ذلك، فهذا الفيء لا خمس فيه عند جماهير الأئمة؛ كأبي حنيفة ومالك وأحمد، وإنما يرى تخميسه الشافعي وبعض أصحاب أحمد، وذكر ذلك رواية عنه. قال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خمسًا كخمس الغنيمة. [كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: 28/ 564] .

2 هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي صاحب الشافعي، ناقل الأقوال القديمة عنه، كان أحد الأعلام الثقات، المأمون له في المذهب والكتب المصنَّفة في الأحكام، جمع فيها بين الحديث والفقه، وكان مبدأ اشتغاله بمذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي رضي الله عنه إلى العراق، فاختلف إليه واتبعه ورفض مذهبه الأول، وتوفّي سنة أربعين ومائتين ببغداد.

3 قال ابن تيمية: وهذا الفيء لم يكن ملكًا للنبي في حياته عند أكثر العلماء، وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: كان ملكًا له، وهذا الفيء لم يكن ملكًا للنبي في حياته عند أكثر العلماء. وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: كان ملكًا له.

وأما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار، فإن تقويتهم تذلّ الكفار فيؤخذ منهم الفيء، وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين أن تختص به المقاتلة على قولين للشافعي،

ووجهين في مذهب الإمام أحمد، لكن المشهور في مذهبه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يختص به المقاتلة، بل يصرف في المصالح كلها، وعلى القولين يعطى من =

তাদের পক্ষ থেকে পূর্ণ কর আদায়ের ক্ষেত্রে, যখন তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হয়, তখন খুমুসের (এক-পঞ্চমাংশ) হকদারদের জন্য তা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে প্রদান করতে হবে। আবু হানিফা (রা.) বলেছেন: ফাই-তে কোনো খুমুস নেই, তবে কুরআনের ভাষ্য ফাই-এর খুমুসের ব্যাপারে তাঁর মতের বিরোধিতা করতে বাধা দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু ফাই হিসেবে দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, তাঁর নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য।" [আল-হাশর: ৭]।

সুতরাং খুমুসকে পাঁচটি সমান অংশে ভাগ করা হবে: এর মধ্যে একটি অংশ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল, যা থেকে তিনি নিজের এবং তাঁর স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করতেন এবং নিজের ও মুসলিমদের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে; যারা নবীদের উত্তরাধিকারের কথা বলেন, তারা মনে করেন এটি তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তরিত হবে।

আবু সাওর বলেছেন: এটি তাঁর পরবর্তী ইমাম বা শাসকের মালিকানায় থাকবে; কারণ তিনি উম্মতের বিষয়াবলী পরিচালনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত। আবু হানিফা বলেছেন: তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথে এই অংশটি রহিত হয়ে গেছে। আর শাফিঈ (রা.) এই মত পোষণ করেছেন যে, এটি মুসলিমদের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে; যেমন—সৈন্যবাহিনীর ভাতা, ঘোড়া ও

অস্ত্রশস্ত্রের প্রস্তুতি, দুর্গ ও সেতু নির্মাণ, বিচারক ও ইমামদের ভাতা এবং এই জাতীয় অন্যান্য জনকল্যাণমূলক খাত।

---

১. ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেছেন: ফাই-এর অন্তর্ভুক্ত হলো উমর (রা.) বিজিত ভূমির ওপর যা ধার্য করেছিলেন এবং তিনি তা বণ্টন করেননি—যেমন মিসর ও ইরাকের ভূমি (এর সামান্য অংশ ব্যতীত), শামের গ্রামাঞ্চল এবং অন্যান্য ভূমি। অধিকাংশ ইমাম যেমন আবু হানিফা, মালিক ও আহমাদ-এর মতে এই ফাই-তে কোনো খুমুস নেই। তবে শাফিঈ এবং আহমাদের কিছু অনুসারী এর খুমুস করার পক্ষপাতী এবং এটি আহমাদ থেকে একটি বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনুল মুনজির বলেছেন: শাফিঈর আগে অন্য কারো পক্ষ থেকে গনিমতের খুমুসের মতো ফাই-তেও খুমুস থাকার কথা সংরক্ষিত নেই। [ইবনে তাইমিয়াহর ফিকহী গ্রন্থাবলী, পত্রাবলী ও ফাতাওয়া: ২৮/৫৬৪]।

২. তিনি হলেন ইব্রাহিম ইবন খালিদ ইবন আবিল ইয়ামান আবু সাওর আল-কালবী, বাগদাদী ফকীহ এবং শাফিঈর ছাত্র। তিনি তাঁর (শাফিঈর) পুরাতন মতসমূহ বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ইমামদের একজন ছিলেন। ফিকহী মাযহাব ও আহকাম বিষয়ক কিতাবসমূহে তাঁর বিশেষ স্থান রয়েছে। তিনি তাতে হাদীস ও ফিকহের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। শুরুতে তিনি আহলুর রায়ের মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু যখন শাফিঈ (রা.) ইরাকে আসলেন, তখন তিনি তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁর অনুসরণ করে পূর্বের মাযহাব পরিত্যাগ করেন। তিনি ২৪০ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

৩. ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন: অধিকাংশ আলিমের মতে এই ফাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর মালিকানাধীন ছিল না। তবে শাফিঈ এবং আহমাদের কোনো কোনো অনুসারী বলেছেন এটি তাঁর মালিকানাধীন ছিল। ইবনে তাইমিয়া আরও বলেন: অধিকাংশ আলিমের মতে এই ফাই নবীজির জীবদ্দশায় তাঁর মালিকানাধীন ছিল না। তবে শাফিঈ এবং আহমাদের কোনো কোনো অনুসারী বলেছেন এটি তাঁর মালিকানাধীন ছিল।

আর তাঁর ইন্তেকালের পর এর ব্যয়ের খাত সম্পর্কে আলিমগণ একমত হয়েছেন যে, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত যোদ্ধাদের ভাতা এখান থেকে প্রদান করা হবে। কারণ তাদের শক্তিশালী করার মাধ্যমে কাফিরদের পর্যুদস্ত করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে ফাই গ্রহণ করা হয়। তবে এটি কি কেবল যোদ্ধাদের জন্য নির্দিষ্ট নাকি মুসলিমদের অন্যান্য জনকল্যাণমূলক খাতেও ব্যয় করা যাবে, এ নিয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। শাফিঈর এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে এবং ইমাম

আহমাদের মাযহাবেও দুটি দিক রয়েছে। তবে তাঁর মাযহাবে এবং আবু হানিফা ও মালিকের মাযহাবে প্রসিদ্ধ মত হলো এটি কেবল যোদ্ধাদের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং সকল জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করা হবে। উভয় মত অনুযায়ী এখান থেকে প্রদান করা হবে...

(ص: 202)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالسَّهْمُ الثَّانِي: سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى: زَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَدْ سَقَطَ حَقُّهُمْ مِنْهُ الْيَوْمَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ حَقَّهُمْ فِيهِ ثَابِتٌ، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنَا عَبْدِ مَنَافٍ خَاصَّةً لَا حَقَّ فِيهِ لِمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ كُلِّهَا، يُسَوَّى فِيهِ بَيْنَ صِغَارِهِمْ وَكِبَارِهِمْ، وَأَغْنِيَائِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ، وَيُفَضَّلُ فِيهِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّهُمْ أَعْطَوْهُ بِاسْمِ الْقَرَابَةِ، وَلَا حَقَّ فِيهِ لِمَوَالِيهِمْ وَلَا لِأَوْلَادِ بَنَاتِهِمْ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ حُصُولِ الْمَالِ وَقَبْلَ قَسْمِهِ كَانَ سَهْمُهُ مِنْهُ مُسْتَحَقًّا لِوَرَثَتِهِ1.

وَالسَّهْمُ الثَّالِثُ: لِلْيَتَامَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَاتِ، وَالْيُتْمُ: مَوْتُ الْأَبِ مَعَ الصِّغَرِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ حُكْمُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ؛ فَإِذَا بَلَغَا زَالَ اسْمُ الْيُتْمِ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ" 2.

وَالسَّهْمُ الرَّابِعُ: لِلْمَسَاكِينِ، وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ؛ لِأَنَّ مَسَاكِينَ الْفَيْءِ يَتَمَيَّزُونَ عَنْ مَسَاكِينِ الصَّدَقَاتِ لِاخْتِلَافِ مَصْرِفِهِمَا.

= فيه منفعة عامة الفيء، فإن الشافعي قال: ينبغي للإمام أن يخص من في البلدان من المقاتلة وهو من بلغ، ويحصي الذرية وهي من دون ذلك والنساء، إلى أن قال: ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم، ويعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم. قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال. قال: ولم يختلف أحد ممن

لقيه في أنَّه ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. قال: فإن فضل من الفيء شيء وضعه الإمام في أهل الحصون، والازدياد في الكراع والسلاح، وكل ما قوي به المسلمون. [كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: 28/ 565] .

1 قال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة: وسهم ذوي القربي لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف؛ لما روى جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، جئت أنا وعثمان فقلنا: يا رسول الله، إن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال: "إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" ثم شبك بين أصابعه. رواه أبو داود، ويجب تعميمهم به حيث كانوا لعموم قوله تعالى: {وَلِذِي الْقُرْبَى} ؛ ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى منه العباس وهو غنيّ، وأعطى صفية عمته، ويقسم للذكر والأنثى كذلك؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى منه أشبه الميراث، ويحتمل أن يسوّى بينهما كالمستحق بالوصية للقرابة. [الكافي في فقه ابن حنبل: 4/ 317] .

2 صحيح: رواه أبو داود في كتاب الوصايا "2873"، وصححه الشيخ الألباني.

দ্বিতীয় অংশ: নিকটাত্মীয়দের অংশ। ইমাম আবু হানিফা দাবি করেছেন যে, বর্তমানে তাদের এই অধিকার রহিত হয়ে গিয়েছে। ইমাম শাফিঈর মতে, এতে তাদের অধিকার বহাল রয়েছে; আর তারা হলেন বিশেষভাবে বনু হাশিম ও বনু আবদিল মুত্তালিব—যারা আবদে মানাফের দুই পুত্র। কুরাইশদের অন্য কোনো শাখার এতে কোনো অধিকার নেই। এতে তাদের ছোট-বড় এবং ধনী-দরিদ্রের মাঝে সমতা রক্ষা করা হবে। তবে পুরুষ ও নারীর মাঝে পার্থক্যের ক্ষেত্রে এক পুরুষকে দুই নারীর সমান অংশ প্রদান করা হবে; কারণ তাদের এই অংশ আত্মীয়তার পরিচয়ে প্রদান করা হয়েছে। তাদের মুক্তদাসদের জন্য এবং তাদের কন্যাদের সন্তানদের জন্য

এতে কোনো অধিকার নেই। তাদের মধ্যে যারা সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর কিন্তু বণ্টনের পূর্বে মারা যাবে, তার অংশটি তার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য হবে।১

তৃতীয় অংশ: অভাবী এতিমদের জন্য। এতিম হওয়া হলো: শৈশবে পিতার মৃত্যু হওয়া। এক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের বিধান সমান। যখন তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে, তখন তাদের থেকে এতিম নাম ঘুচে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর আর কোনো এতিমত্ব থাকে না।" ২

চতুর্থ অংশ: মিসকিনদের জন্য। তারা হলেন ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত ঐসব লোক, যাদের কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ নেই; কারণ ফায়-এর মিসকিন এবং সদকার মিসকিনদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে, যেহেতু উভয়ের ব্যয়ের খাত ভিন্ন।

= এতে ফায়ের সাধারণ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ইমাম শাফিঈ বলেছেন: ইমামের উচিত দেশের যোদ্ধাদের—যারা প্রাপ্তবয়স্ক—তাদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া, আর সন্তানদের (যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক) এবং নারীদের গণনা করা... তিনি আরও বলেন: এরপর তিনি প্রতি বছর যোদ্ধাদের তাদের ভাতা প্রদান করবেন এবং সন্তানদের ও নারীদের তাদের বাৎসরিক প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদান করবেন। তিনি বলেন: ফায়ের ভাতা কেবল প্রাপ্তবয়স্ক যুদ্ধসক্ষম ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য। তিনি আরও বলেন: যাদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ এই বিষয়ে দ্বিমত করেননি যে, এতে ক্রীতদাসদের কোনো অধিকার নেই এবং ঐসব বেদুইনদেরও নয় যারা সদকার অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন: ফায় থেকে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে ইমাম তা সীমান্ত রক্ষীদের জন্য, ঘোড়া ও অস্ত্র বৃদ্ধিতে এবং মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এমন কাজে ব্যয় করবেন। [ইবনে তাইমিয়্যাহ-এর ফিকহী কিতাব, পত্র ও ফাতাওয়া: ২৮/৫৬৫]।

১ হাম্বলি মাযহাবের ইমাম ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি বলেছেন: নিকটাত্মীয়দের অংশ হলো বনু হাশিম এবং আবদে মানাফের দুই পুত্র বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের জন্য; কারণ জুবায়ের ইবনে মুতয়িম বর্ণনা করেছেন যে, খয়বরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকটাত্মীয়দের অংশ বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। তখন আমি এবং উসমান গিয়ে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! বনু হাশিম আপনার স্বগোত্রীয় হওয়ার কারণে এবং আল্লাহ আপনাকে তাদের মধ্যে যে মর্যাদা দান করেছেন, সেই কারণে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু আমাদের ভাই বনু মুত্তালিবের কথা বলুন—আপনি তাদের দিয়েছেন অথচ আমাদের বাদ দিয়েছেন, অথচ আমরা ও তারা একই পর্যায়ের অধিকারী? তখন তিনি

বললেন: "তারা জাহেলি যুগে কিংবা ইসলামে কখনো আমাকে ছেড়ে আলাদা হয়নি। নিশ্চয়ই বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব একই সত্তা।" এরপর তিনি তাঁর আঙুলগুলো একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করালেন। এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। তারা যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহর বাণী: "এবং নিকটাত্মীয়দের জন্য" এর ব্যাপকতার কারণে তাদের সকলকে এতে অন্তর্ভুক্ত করা ওয়াজিব। এছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাসকে ধনী হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে দিয়েছিলেন এবং তাঁর ফুফু সাফিয়াকেও দিয়েছিলেন। এতে নারী ও পুরুষের মাঝে উত্তরাধিকারের মতো করে বণ্টন করা হবে; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা উত্তরাধিকারের সাদৃশ্যে প্রদান করেছিলেন। আবার এমন সম্ভাবনাও আছে যে, উভয়ের মাঝে সমতা রক্ষা করা হবে, যেমন আত্মীয়তার অসিয়তের ক্ষেত্রে প্রাপ্য ব্যক্তির মাঝে করা হয়। [আল-কাফি ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ: ৪/৩১৭]।
২ সহিহ: আবু দাউদ অসিয়ত অধ্যায়ে "২৮৭৩" এটি বর্ণনা করেছেন এবং শেখ আলবানী একে সহিহ বলেছেন।

(ص: 203)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالسَّهْمُ الْخَامِسُ: لِبَنِي السَّبِيلِ، وَهُمُ الْمُسَافِرُونَ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ، وَسَوَاءٌ مِنْهُمْ مَنِ ابْتَدَأَ بِالسَّفَرِ أَوْ كَانَ مُجْتَازًا، فَهَذَا حُكْمُ الْخُمُسِ فِي قَسْمِهِ، وَأَمَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ لِلْجَيْشِ خَاصَّةً لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ؛ لِيَكُونَ مُعَدًّا لِأَرْزَاقِهِمْ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّهُ مَصْرُوفٌ فِي الْمَصَالِحِ الَّتِي مِنْهَا أَرْزَاقُ الْجَيْشِ، وَمَا لَا غِنَى لِلْمُسْلِمِينَ عَنْهُ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ الْفَيْءُ فِي أَهْلِ الصَّدَقَاتِ، وَلَا تُصْرَفُ الصَّدَقَاتُ فِي أَهْلِ الْفَيْءِ، وَيُصْرَفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَالَيْنِ فِي أَهْلِهِ، وَأَهْلِ الصَّدَقَةِ مَنْ لَا هِجْرَةَ لَهُ، وَلَيْسَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مِنْ حُمَاةِ الْبَيْضَةِ، وَأَهْلُ الْفَيْءِ هُمْ ذَوُو الْهِجْرَةِ الذَّابُّونَ

عَنَ الْبَيْضَةِ، وَالْمَانِعُونَ عَنِ الْحَرِيمِ، وَالْمُجَاهِدُونَ لِلْعَدُوِّ، وَكَانَ اسْمُ الْهِجْرَةِ لَا يَنْطَلِقُ إِلَّا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ وَطَنِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ لِطَلَبِ الْإِسْلَامِ، وَكَانَتْ كُلُّ قَبِيلَةٍ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ بِأَسْرِهَا تُدْعَى الْبَرَرَةُ، وَكُلُّ قَبِيلَةٍ هَاجَرَ بَعْضُهَا تُدْعَى الْخِيرَةُ، فَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ بَرَرَةٌ وَخِيرَةٌ، ثُمَّ سَقَطَ حُكْمُ الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْفَتْحِ وَصَارَ الْمُسْلِمُونَ مُهَاجِرِينَ وَأَعْرَابًا، فَكَانَ أَهْلُ الصَّدَقَةِ يُسَمَّوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابًا، وَيُسَمَّى أَهْلُ الْفَيْءِ مُهَاجِرِينَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَشْعَارِهِمْ كَمَا قَالَ فِيهِ بَعْضُهُمْ1 "مِنَ السَّرِيعِ":

قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِعَصْلَبِيّ ... أَرْوَعَ خَرَّاجٍ مِنَ الدَّوِيّ

مُهَاجِرٍ لَيْسَ بِأَعْرَابِيّ

وَلِاخْتِلَافِ الْفَرِيقَيْنِ فِي حُكْمِ الْمَالَيْنِ مَا تَمَيَّزَ، وَسَوَّى أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَهُمَا، وَجَوَّزَ صَرْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَالَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ.

وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَصِلَ قَوْمًا لِتَعُودَ صِلَاتُهُمْ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ -كَالرُّسُلِ وَالْمُؤَلَّفَةِ- جَازَ أَنْ يَصِلَهُمْ مِنْ مَالِ الْفَيْءِ؛ فَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤَلَّفَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ الْفَزَارِيَّ مِائَةَ بَعِيرٍ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ مِائَةَ بَعِيرٍ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيَّ خَمْسِينَ بَعِيرًا، فَتَسَخَّطَهَا وَعَتَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ "مِنَ الْمُتَقَارِبِ":

---

1 قلت: هو الحجاج بن يوسف الثقفي.

এবং পঞ্চম অংশটি হলো মুসাফিরদের (ইবনুস সাবীল) জন্য; তারা হলেন ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত এমন পথিক যারা তাদের প্রয়োজনীয় পাথেয় খুঁজে পাচ্ছেন না। তারা সফর শুরুকারী হোন কিংবা পথ অতিক্রমকারী—উভয়ের বিধান একই। খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) বণ্টনের ক্ষেত্রে এটিই তার বিভাজনের বিধান। আর অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশের ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে: প্রথমটি হলো—এটি নির্দিষ্টভাবে সেনাবাহিনীর জন্য, এতে অন্য কেউ তাদের অংশীদার হবে না; যাতে এটি তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

দ্বিতীয় অভিমতটি হলো—এটি জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে, যার অন্তর্ভুক্ত হলো সেনাবাহিনীর বেতন এবং মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য বিষয়সমূহ।

ফায়-এর সম্পদ সদকার (যাকাত) হকদারদের জন্য ব্যয় করা বৈধ নয়, আবার সদকার সম্পদও ফায়-এর হকদারদের মাঝে ব্যয় করা যাবে না। বরং এই দুই প্রকারের মালের প্রত্যেকটি তার নিজস্ব হকদারদের মাঝেই ব্যয় করা হবে। সদকার হকদার তারা—যাদের হিজরত নেই, যারা মুসলিমদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধকারী নয় এবং যারা মুসলিম ভূখণ্ড রক্ষাকারীও নয়। আর ফায়-এর হকদার হলেন হিজরতকারীগণ—যারা মুসলিম ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করেন, মান-সম্মান রক্ষা করেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। 'হিজরত' শব্দটি কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল, যারা ইসলামের অন্বেষণে নিজ স্বদেশ ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। যে গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ করার পর সপরিবারে বা সম্পূর্ণভাবে হিজরত করেছিল, তাদের 'বারারাহ' (সৎকর্মপরায়ণ) বলা হতো। আর যে গোত্রগুলোর মধ্য থেকে আংশিক বা কিছু লোক হিজরত করেছিল, তাদের 'খাইরাহ' (উত্তম বা মনোনীত) বলা হতো। সুতরাং মুহাজিরগণ বারারাহ ও খাইরাহ—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের বিধান রহিত হয়ে যায় এবং মুসলমানগণ 'মুহাজির' ও 'আরাবি' (পল্লীবাসী বা বেদুইন)—এই দুই ভাগে বিভক্ত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সদকার হকদারদের 'আরাবি' বলা হতো এবং ফায়-এর হকদারদের 'মুহাজির' বলা হতো। এটি তাদের কবিতাগুলোতেও সুস্পষ্ট, যেমনটি তাদের কেউ একজন 'সারী' ছন্দে বলেছিলেন:

রজনী তাকে এক সুদৃঢ় পুরুষের সাথে ঘিরে ধরেছে … এক বীর, যে নির্জন মরুপ্রান্তর থেকে বেরিয়ে আসে

সে একজন মুহাজির, কোনো বেদুইন (আরাবি) নয়

উভয় দলের মাঝে পার্থক্যের কারণেই দুই প্রকারের সম্পদের বিধানে স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। তবে ইমাম আবু হানিফা উভয়কে সমান গণ্য করেছেন এবং দুই প্রকারের মালের প্রত্যেকটি উভয় দলের যেকোনোটির পেছনে ব্যয় করা বৈধ বলেছেন।

যদি ইমাম কোনো জনগোষ্ঠীকে দান করার ইচ্ছা পোষণ করেন যাতে তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হয়—যেমন দূত এবং মুআল্লাফাতুল কুলুব (যাদের অন্তর জয় করা কাম্য)—তবে ফায়-এর সম্পদ থেকে তাদের দান করা বৈধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধের দিন মুআল্লাফাতুল কুলুবদের দান করেছিলেন। তিনি

উয়াইনা ইবনে হিসন আল-ফাজারীকে একশটি উট, আকরা ইবনে হাবিস আল-তামিমীকে একশটি উট এবং আব্বাস ইবনে মিরদাস আল-সুলামীকে পঞ্চাশটি উট প্রদান করেন। এতে তিনি (আব্বাস) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অনুযোগ করে 'মুতাকারিব' ছন্দে বলেন:

---

১. আমি বলছি: তিনি হলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফী।

(ص: 204)الأحكام السلطانية للماوردي

كَانَتْ نِهَابًا تَلَافَيْتُهَا ... بِكَرِّي عَلَى الْمُهْرِ فِي الْأَجْرَعِ

وَإِيقَاظِي الْقَوْمَ أَنْ يَرْقُدُوا ... إِذَا هَجَعَ الْقَوْمُ لَمْ أَهْجَعْ

فَأَصْبَحَ نَهْبِي وَنَهْبُ الْعَبِيـ ... ـدِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ

وَقَدْ كُنْتُ فِي الْحَرْبِ ذَا قُدْرَةٍ ... فَلَمْ أُعْطَ شَيْئًا وَلَمْ أُمْنَعْ

وَإِلَّا أُقَاتِلْ أُعْطِيتُهَا ... عَدِيدَ قَوَائِمِهَا الْأَرْبَعِ

فَمَا كَانَ حِصْنٌ وَلَا حَابِسٌ ... يَفُوقَانِ مِرْدَاسًا فِي مَجْمَعِ

وَلَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا ... وَمَنْ تَضَعُ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعْ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: "اذْهَبْ فَاقْطَعْ عَنِّي لِسَانَهُ".

فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ قَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تَقْطَعَ لِسَانِي؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ أُعْطِيكَ حَتَّى تَرْضَى، فَأَعْطَاهُ

فَكَانَ ذَلِكَ قَطْعَ لِسَانِهِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ صِلَةُ الْإِمَامِ لَا تَعُودُ بِمَصْلَحَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ،

وَكَانَ الْمَقْصُودُ بِهَا نَفْعَ الْمُعْطِي خَاصَّةً، كَانَتْ صِلَاتُهُمْ مِنْ مَالِهِ.

رُوِيَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ "مِنَ السَّرِيعِ":

يَا عُمَرَ الْخَيْرِ جُزِيتَ الْجَنَّهْ ... اُكْسُ بُنَيَّاتِي وَأُمَّهُنَّهْ

وَكُنْ لَنَا مِنَ الزَّمَانِ جُنَّهْ ... أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتَفْعَلَنَّهْ

فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ يَكُونُ مَاذَا؟ فَقَالَ:

إِذًا أَبَا حَفْصٍ لَأَذْهَبَنَّهُ

فَقَالَ: وَإِذَا ذَهَبْتَ يَكُونُ مَاذَا؟ فَقَالَ:

يَكُونُ عَنْ حَالِي لَتُسْأَلَنَّهُ ... يَوْمَ تَكُونُ الْأَعْطِيَاتُ هَنَّهُ

وَمَوْقِفُ الْمَسْئُولِ بَيْنَهُنَّهُ ... إِمَّا إِلَى نَارٍ وَإِمَّا جَنَّهُ

قَالَ: فَبَكَى عُمَرُ رضي الله عنه حَتَّى خَضَبَتْ لِحْيَتُهُ وَقَالَ: يَا غُلَامُ، أَعْطِهِ قَمِيصِي هَذَا لِذَلِكَ الْيَوْمِ لَا لِشِعْرِهِ، أَنَا وَاَللَّهِ لَا أَمْلِكُ غَيْرَهُ، فَجَعَلَ مَا وَصَلَ بِهِ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ صِلَتَهُ لَا تَعُودُ بِنَفْعٍ عَلَى غَيْرِهِ، فَخَرَجَتْ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، وَمِثْلُ هَذَا

সেগুলো ছিল লুটের মাল, যা আমি উদ্ধার করেছি ... বালুকাময় প্রান্তরে আমার ঘোড়ার পিঠে চড়ে আক্রমণ চালিয়ে।

এবং আমিই লোকজনকে জাগিয়েছি যেন তারা ঘুমিয়ে না পড়ে ... যখন সবাই ঘুমে বিভোর ছিল, আমি তখন জাগরণে ছিলাম।

অথচ আমার এবং আমার দাসের লুণ্ঠিত মালের অংশ ... উয়াইনা এবং আল-আকরা'র মধ্যে বণ্টিত হলো।

আমি যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ সামর্থ্যের অধিকারী ছিলাম ... অথচ আমাকে কিছুই দেওয়া হলো না, আবার পুরোপুরি বঞ্চিতও করা হলো না।

এমনকি আমি যদি যুদ্ধ না-ও করতাম, তবে আমাকে দান করা হতো ... চার পা বিশিষ্ট পশুদের সমান সংখ্যক অংশ।

হিসন কিংবা হাবিস কেউই কোনো সমাবেশে ... মিরদাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল না।

এবং আমি তাদের দুজনের কারো চেয়ে হীন ছিলাম না ... আর যাকে আজ নিচু করা হলো, তাকে আর উপরে তোলা হয় না।

তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলী ইবনে আবি তালিবকে বললেন: "যাও এবং আমার পক্ষ হতে ওর জিহ্বা কেটে দাও (অর্থাৎ তাকে উপঢৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট ও শান্ত করো)।"

যখন তিনি তাকে নিয়ে গেলেন, তখন সে বলল: আপনি কি আমার জিহ্বা কাটতে চান? তিনি বললেন: না, বরং আমি তোমাকে দেব যতক্ষণ না তুমি সন্তুষ্ট হও। অতঃপর তিনি তাকে দান করলেন এবং তা-ই ছিল তার "জিহ্বা কর্তন" করা। আর শাসক বা ইমামের দান যদি মুসলমানদের কোনো সাধারণ কল্যাণে না আসে এবং তার উদ্দেশ্য যদি কেবল গ্রহীতার ব্যক্তিগত লাভ হয়, তবে সেই অনুদান শাসকের নিজস্ব সম্পদ থেকে হতে হবে।

বর্ণিত আছে যে, এক বেদুইন উমর ইবনুল খাত্তাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিকট এসে "সারী" ছন্দে কবিতা আবৃত্তি করল:

হে কল্যাণের আধার উমর, আপনি জান্নাত লাভ করুন ... আমার কন্যাদের এবং তাদের জননীকে পোশাক দান করুন।

এবং এই দুঃসময়ে আপনি আমাদের জন্য ঢাল স্বরূপ হয়ে যান ... আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনি অবশ্যই তা করবেন।

তখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: যদি আমি না করি, তবে কী হবে? সে বলল:

তবে হে আবু হাফস, আমি অবশ্যই চলে যাব!

তিনি বললেন: আর তুমি চলে গেলে কী হবে? সে বলল:

সেদিন আমার অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে ... যেদিন দান-অনুদানের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব হবে।

এবং জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির অবস্থান হবে তাদের মাঝে ... হয় সে জাহান্নামের দিকে যাবে, নতুবা জান্নাতের দিকে।

বর্ণনাকারী বলেন: তখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এত বেশি কাঁদলেন যে তার দাড়ি ভিজে গেল এবং বললেন: হে বালক, তাকে আমার এই জামাটি দিয়ে দাও সেই কঠিন দিনের স্মরণে, তার কবিতার জন্য নয়। আল্লাহর কসম, আমার কাছে এটি ছাড়া আর কোনো জামা নেই। ফলে তিনি তাকে যা দান করেছিলেন তা তার নিজস্ব সম্পদ থেকে দিয়েছিলেন, মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে নয়; কারণ তার এই দান অন্য কারো কল্যাণে আসছিল না এবং এটি জনস্বার্থের আওতাভুক্ত ছিল না। আর এ জাতীয় দৃষ্টান্ত...

(ص: 205)الأحكام السلطانية للماوردي

الْأَعْرَابِيِّ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، غَيْرَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا، إِمَّا لِأَجْلِ شِعْرِهِ الَّذِي اسْتَزَلَّهُ فِيهِ، وَإِمَّا لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مَصْرُوفَةٌ فِي جِيرَانِهَا، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ، وَكَانَ مِمَّا نَقَمَهُ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه أَنْ جَعَلَ كُلَّ الصِّلَاتِ مِنْ مَالِ الْفَيْءِ وَلَمْ يَرَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.

وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ ذُكُورَ أَوْلَادِهِ مَالَ الْفَيْءِ1؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنْ كَانُوا صِغَارًا كَانُوا فِي إِعْطَاءِ الذَّرَارِيِّ مِنْ ذَوِي السَّابِقَةِ وَالتَّقَدُّمِ، وَإِنْ كَانُوا كِبَارًا فَفِي إِعْطَاءِ الْمُقَاتِلَةِ مِنْ أَمْثَالِهِمْ.

حَكَى ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما لَمَّا بَلَغَ أَتَى أَبَاهُ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَسَأَلَهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهُ، فَفَرَضَ لَهُ فَيْءَ أَلْفَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ غُلَامٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ قَدْ بَلَغَ، فَسَأَلَهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهُ، فَفَرَضَ لَهُ فَيْءَ ثَلَاثَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَرَضْتَ لِي فَيْءَ أَلْفَيْنِ وَفَرَضْتَ لِهَذَا فَيْءَ ثَلَاثَةِ آلَافٍ، وَلَمْ يَشْهَدْ أَبُو هَذَا مَا قَدْ شَهِدْتُ، قَالَ: أَجَلْ، لَكِنِّي رَأَيْتُ أَبَا أُمِّكَ يُقَاتِلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَأَيْتُ أَبَا أُمِّ هَذَا يُقَاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلِلْأُمِّ أَكْثَرُ مِنَ الْأَلْفِ.

وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ أَوْلَادَهُ مِنْ مَالِ الْفَيْءِ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ ذُرِّيَّتِهِ الدَّاخِلِينَ فِي عَطَائِهِ، وَأَمَّا عَبِيدُهُ وَعَبِيدُ غَيْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُقَاتِلَةً فَنَفَقَاتُهُمْ فِي مَالِهِ وَمَالِ سَادَاتِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا مُقَاتِلَةً فَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَفْرِضُ لَهُمْ فِي الْعَطَاءِ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه، وَالشَّافِعِيُّ رحمه الله يَأْخُذُ فِيهِمْ بِقَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه، فَلَا يَفْرِضُ لَهُمْ فِي الْعَطَاءِ، وَلَكِنْ تُزَادُ سَادَاتُهُمْ فِي الْعَطَاءِ لِأَجْلِهِمْ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْعَطَاءِ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ الذُّرِّيَّةِ؛ فَإِنْ عَتَقُوا جَازَ أَنْ يَفْرِضَ لَهُمْ فِي الْعَطَاءِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَفْرِضَ لِنُقَبَاءِ أَهْلِ الْفَيْءِ فِي عَطَايَاهُمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَفْرِضَ لِعُمَّالِهِمْ؛ لِأَنَّ النُّقَبَاءَ مِنْهُمْ وَالْعُمَّالَ يَأْخُذُونَ أَجْرًا عَلَى عَمَلِهِمْ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلُ الْفَيْءِ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلُ الصَّدَقَاتِ مِنْهُمَا إِذَا أَرَادَ سَهْمَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ؛ لِأَنَّ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَاتُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْفَيْءُ، وَلَا يَجُوزُ لِعَامِلِ الْفَيْءِ أَنْ يَقْسِمَ مَا جَبَاهُ إِلَّا بِإِذْنٍ.

وَيَجُوزُ لِعَامِلِ الصَّدَقَاتِ أَنْ يَقْسِمَ مَا جَبَاهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ مَا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ، لِمَا

---

1 قلت: أما أن يعطوا من مال الفيء كغيرهم فنعم، أمّا أن يعطوا مال الفيء كما قال المصنّف فلا، بل إنَّ الحكام مطالبون بالابتعاد عن كل ما فيه شبهة ومحاباة.

মরুবাসী ব্যক্তিটি সদকার হকদার হওয়া সত্ত্বেও উমর (রা.) তাকে তা প্রদান করেননি। সম্ভবত এর কারণ ছিল তার সেই কাব্য যার দ্বারা সে তাকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল, অথবা সদকা তার পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদের প্রাপ্য ছিল এবং সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মানুষের কাছে উসমান (রা.)-এর যে বিষয়গুলো সমালোচিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল তিনি সকল দানকে ‘ফাই’ বা রাষ্ট্রীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং উভয় বিষয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি।

ইমামের জন্য তাঁর পুত্র সন্তানদের ‘ফাই’-এর সম্পদ থেকে প্রদান করা বৈধ; কেননা তারা তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তারা যদি ছোট হয় তবে তাদের অগ্রগামীদের সন্তানদের পর্যায়ভুক্ত করা হবে, আর যদি বড় হয় তবে তাদের সমপর্যায়ের যোদ্ধাদের মতো প্রদান করা হবে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) যখন প্রাপ্তবয়স্ক হলেন তখন তিনি তাঁর পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর কাছে এসে তাঁর জন্য ভাতা নির্ধারণের অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁর জন্য দুই হাজার ‘ফাই’ নির্ধারণ করলেন। এরপর জনৈক আনসারি যুবক এলো যে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে এবং ভাতা চাইল। উমর (রা.) তার জন্য তিন হাজার ‘ফাই’ নির্ধারণ করলেন। তখন আব্দুল্লাহ বললেন: হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি আমার জন্য দুই হাজার নির্ধারণ করলেন আর এর জন্য তিন হাজার, অথচ এর পিতা সেই সব যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না যেগুলোতে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন: হ্যাঁ, তবে আমি দেখেছি যে তোমার মাতামহ (নানা) রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, আর এই যুবকের মাতামহ

(নানা) রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করেছেন। আর মাতামহের এই মর্যাদার কারণে সে এক হাজারের চেয়েও অধিক পাওনাদার।

আর ইমামের জন্য তাঁর সন্তানদের 'ফাই'-এর সম্পদ থেকে প্রদান করা বৈধ নয়; কারণ তারা তাঁর ভাতার অন্তর্ভুক্ত বংশধরদের শামিল। আর তাঁর দাস ও অন্যদের দাসদের ক্ষেত্রে কথা হলো, তারা যদি যোদ্ধা না হয় তবে তাদের ভরণপোষণ তাদের নিজেদের ও তাদের মনিবদের সম্পদের ওপর ন্যস্ত। আর তারা যদি যোদ্ধা হয়, তবে আবু বকর (রা.) তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করতেন, কিন্তু উমর (রা.) তা করেননি। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এক্ষেত্রে উমর (রা.)-এর মত গ্রহণ করেছেন, ফলে তিনি তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন না; বরং তাদের কারণে তাদের মনিবদের ভাতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ ভাতার বৃদ্ধি বংশধরদের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। তারা যদি মুক্ত হয়ে যায় তবে তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা বৈধ। এছাড়া 'ফাই' ভোগীদের নেতাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা বৈধ, তবে তাদের কর্মচারীদের জন্য নয়। কারণ নেতারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, আর কর্মচারীরা তাদের কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্তালিবের নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে 'ফাই' সংগ্রাহক নিযুক্ত করা বৈধ। তবে তাদের মধ্য থেকে সদকা বা জাকাত সংগ্রাহক হওয়া বৈধ নয় যদি তারা সেখান থেকে নির্ধারিত অংশ নিতে চায়, তবে স্বেচ্ছায় কাজ করলে ভিন্ন কথা। কেননা বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্তালিবের জন্য সদকা গ্রহণ নিষিদ্ধ, কিন্তু 'ফাই' নিষিদ্ধ নয়। 'ফাই' সংগ্রাহকের জন্য অনুমতি ব্যতীত সংগৃহীত সম্পদ বণ্টন করা বৈধ নয়।

আর জাকাত সংগ্রাহকের জন্য অনুমতি ছাড়াই সংগৃহীত সম্পদ বণ্টন করা বৈধ, যতক্ষণ না তাকে তা করতে নিষেধ করা হয়।

---

১ আমি বলছি: অন্যদের মতো তাদেরও ফাই-এর সম্পদ থেকে প্রদান করা যাবে—এ কথাটি ঠিক। কিন্তু লেখক যেভাবে বলেছেন যে তাদের 'ফাই'-এর সম্পদ প্রদান করা হবে, সেভাবে নয়; বরং শাসকদের উচিত পক্ষপাতিত্ব ও সন্দেহের উদ্রেক করে এমন সব বিষয় থেকে দূরে থাকা।

قَدَّمْنَاهُ مِنْ صَرْفِ مَالِ الْفَيْءِ عَنِ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، وَمَصْرِفِ الصَّدَقَةِ نَصٌّ بِالْكِتَابِ.

وَصِفَةُ عَامِلِ الْفَيْءِ مَعَ وُجُودِ أَمَانَتِهِ وَشَهَامَتِهِ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ وِلَايَتِهِ فِيهِ:

هِيَ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَحَدُهَا: أَنْ يَتَوَلَّى تَقْدِيرَ أَمْوَالِ الْفَيْءِ، وَتَقْدِيرَ وَضْعِهَا فِي الْجِهَاتِ الْمُسْتَحَقَّةِ مِنْهَا؛ كَوَضْعِ الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ. فَمِنْ شُرُوطِ وِلَايَةِ هَذَا الْعَامِلِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا مُجْتَهِدًا فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مُضْطَلِعًا بِالْحِسَابِ وَالْمِسَاحَةِ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عَامَّ الْوِلَايَةِ عَلَى جِبَايَةِ مَا اسْتَقَرَّ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ كُلِّهَا، فَالْمُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ وِلَايَتِهِ شُرُوطُ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالِاضْطِلَاعِ بِالْحِسَابِ وَالْمِسَاحَةِ، وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا مُجْتَهِدًا؛ لِأَنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ مَا اسْتَقَرَّ بِوَضْعِ غَيْرِهِ.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ خَاصَّ الْوِلَايَةِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ خَاصٍّ فَيُعْتَبَرُ مَا وَلِيَهُ مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ فِيهِ عَنِ اسْتِنَابَةٍ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ، مَعَ اضْطِلَاعِهِ بِشُرُوطِ مَا وَلِيَ مِنْ مِسَاحَةٍ أَوْ حِسَابٍ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا وَلَا عَبْدًا؛ لِأَنَّ فِيهَا وِلَايَةً، وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنِ الِاسْتِنَابَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا؛ لِأَنَّهُ كَالرَّسُولِ الْمَأْمُورِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ ذِمِّيًّا فَيَنْظُرُ فِيمَا رَدَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ الْفَيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ مُعَامَلَتُهُ فِيهِ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ كَالْجِزْيَةِ وَأَخْذِ الْعُشْرِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ؛ جَازَ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا، وَإِنْ كَانَتْ مُعَامَلَتُهُ فِيهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ كَالْخَرَاجِ الْمَوْضُوعِ عَلَى رِقَابِ الْأَرَضِينَ إِذَا صَارَتْ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَفِي جَوَازِ كَوْنِهِ ذِمِّيًّا وَجْهَانِ.

وَإِذَا بَطَلَتْ وِلَايَةُ الْعَامِلِ فَقَبَضَ مَالَ الْفَيْءِ مَعَ فَسَادِ وِلَايَتِهِ بَرِئَ الدَّافِعُ مِمَّا عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنِ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ مِنْهُ مَأْذُونٌ لَهُ، وَإِنْ فَسَدَتْ وِلَايَتُهُ وَجَرَى فِي الْقَبْضِ مَجْرَى الرَّسُولِ، وَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ صِحَّةِ وِلَايَتِهِ وَفَسَادِهَا، أَنَّ لَهُ الْإِجْبَارَ عَلَى الدَّفْعِ مَعَ صِحَّةِ الْوِلَايَةِ، وَلَهُ الْإِجْبَارُ مَعَ فَسَادِهَا، فَإِنْ نُهِيَ عَنِ الْقَبْضِ مَعَ فَسَادِ

وِلَايَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقَبْضُ وَلَا الْإِجْبَارُ، وَلَمْ يَبْرَأِ الدَّافِعُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ إِذَا عَلِمَ بِنَهْيِهِ، وَفِي بَرَاءَتِهِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالنَّهْيِ وَجْهَانِ كَالْوَكِيلِ.

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ফাই বা রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যয় ইমামের ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল, আর সদকা ব্যয়ের খাতসমূহ কিতাব (কুরআন) দ্বারা সুনির্ধারিত।

ফাই সংগ্রহের আমিলের বিশ্বস্ততা ও কর্মদক্ষতার পাশাপাশি তার গুণাবলি তার প্রশাসনিক দায়িত্বের ভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে থাকে; আর তা তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথম বিভাগ: যিনি ফাই বা রাষ্ট্রীয় সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ এবং তা প্রাপ্য খাতে ব্যবহারের দায়িত্ব পালন করেন; যেমন খরাজ ও জিজিয়া নির্ধারণ। এই আমিলের নিয়োগের শর্ত হলো তাকে স্বাধীন, মুসলিম এবং শরীয়তের বিধি-বিধানে মুজতাহিদ হতে হবে, সেই সাথে হিসাব ও ভূমি জরিপ বিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে।

দ্বিতীয় বিভাগ: যিনি নির্ধারিত সকল প্রকার ফাই বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আদায়ের সাধারণ দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তার নিয়োগ বৈধ হওয়ার জন্য ইসলাম, স্বাধীনতা এবং হিসাব ও ভূমি জরিপ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার শর্তসমূহ বিবেচিত হবে। তবে তার জন্য ফকীহ বা মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়; কেননা তিনি অন্য কর্তৃক নির্ধারিত ও ধার্যকৃত সম্পদ সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করেন মাত্র।

তৃতীয় বিভাগ: যিনি বিশেষ কোনো প্রকার ফাই বা রাষ্ট্রীয় সম্পদের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, সে ক্ষেত্রে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের প্রকৃতি বিচার্য হবে। যদি সেই কার্যে অন্যকে প্রতিনিধি নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়, তবে সেক্ষেত্রে তার মুসলিম ও স্বাধীন হওয়া এবং জরিপ ও হিসাব সংক্রান্ত নির্ধারিত শর্তাবলীতে পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। তখন জিম্মি বা ক্রীতদাস হওয়া বৈধ নয়, কারণ এতে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব (বিলায়াত) বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যদি প্রতিনিধি নিয়োগের প্রয়োজন না হয়, তবে ক্রীতদাস হওয়া জায়েজ, কারণ তখন সে আদিষ্ট দূতের মতো গণ্য হবে। আর জিম্মি হওয়ার ক্ষেত্রে তার অর্পিত ফাই সম্পদের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করতে হবে; যদি তার লেনদেন জিম্মিদের সাথে হয় যেমন জিজিয়া বা তাদের সম্পদ থেকে উশর গ্রহণ করা, তবে জিম্মি হওয়া জায়েজ। আর যদি তার লেনদেন মুসলমানদের সাথে হয় যেমন ভূমির ওপর ধার্যকৃত খরাজ যা মুসলমানদের অধিকারে রয়েছে, তবে সেক্ষেত্রে জিম্মি হওয়া জায়েজ কি না সে বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে।

যখন আমিলের প্রশাসনিক ক্ষমতা বাতিল হয়ে যায় এবং তার নিয়োগ অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও সে ফাই-এর সম্পদ গ্রহণ করে, তখন প্রদানকারী তার দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে যদি তাকে (আমিলকে) সম্পদ গ্রহণে নিষেধ করা না হয়ে থাকে; কারণ গ্রহণকারী ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে অনুমোদিত এবং নিয়োগ ত্রুটিপূর্ণ হলেও সে সম্পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে দূতের ন্যায় গণ্য হবে। আর নিয়োগের বৈধতা ও অবৈধতার মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, নিয়োগ বৈধ হলে তার বাধ্য করার অধিকার থাকে এবং নিয়োগ অবৈধ হলেও তার বাধ্য করার অধিকার থাকে। তবে যদি তাকে গ্রহণে নিষেধ করা হয় এবং তার নিয়োগও অবৈধ হয়, তবে তার গ্রহণ করার বা বাধ্য করার কোনো অধিকার থাকে না। এমতাবস্থায় যদি প্রদানকারী তার নিষেধাজ্ঞার কথা জেনেও তাকে প্রদান করে তবে সে দায়মুক্ত হবে না। আর যদি নিষেধাজ্ঞার কথা না জেনেই প্রদান করে, তবে সে দায়মুক্ত হবে কি না সে বিষয়ে প্রতিনিধির (ওয়াকিল) ন্যায় দুটি অভিমত রয়েছে।

(ص: 207)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل: "أحكام الغنيمة"

فَأَمَّا الْغَنِيمَةُ فَهِيَ أَكْثَرُ أَقْسَامًا وَأَحْكَامًا؛ لِأَنَّهَا أَصْلٌ تَفَرَّعَ عَنْهُ الْفَيْءُ، فَكَانَ حُكْمُهَا أَعَمَّ.

وَتَشْتَمِلُ عَلَى أَقْسَامٍ: أَسْرَى، وَسَبْيٌ، وَأَرْضِينَ، وَأَمْوَالٌ.

فَأَمَّا الْأَسْرَى: فَهُمُ الْمُقَاتِلُونَ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا ظَفَرَ الْمُسْلِمُونَ بِأَسْرِهِمْ أَحْيَاءً، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِمْ؛ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله إِلَى أَنَّ الْإِمَامَ أَوْ مَنِ اسْتَنَابَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْرِ الْجِهَادِ مُخَيَّرٌ فِيهِمْ، إِذَا أَقَامُوا عَلَى كُفْرِهِمْ فِي الْأَصْلَحِ مِنْ أَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: إِمَّا الْقَتْلُ، وَإِمَّا الِاسْتِرْقَاقُ، وَإِمَّا الْفِدَاءُ بِمَالٍ أَوْ أَسْرَى، وَإِمَّا الْمَنُّ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ فِدَاءٍ1.

فَإِنْ أَسْلَمُوا سَقَطَ الْقَتْلُ عَنْهُمْ، وَكَانَ عَلَى خِيَارِهِ فِي أَحَدِ الثَّلَاثَةِ3، وَقَالَ مَالِكٌ: يَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْقَتْلُ أَوِ الِاسْتِرْقَاقُ أَوِ الْمُفَادَاةُ بِالرِّجَالِ دُونَ الْمَالِ، وَلَيْسَ لَهُ الْمَنُّ،

قال أبو الحسن المالكي: ويتخيّر الإمام فيهم بين ثلاثة أوجه: الاسترقاق والعتق والفداء، ويجتنب قتل الرهبان، وقتل الأحبار، ويشترط في عدم قتل الأوالين على المشهور أن ينقطِعَا عن أهل ملتهمًا حبسًا في دير أو صومعة، ومعنى: فلا يخالطاهم في رأي ولا يعيناهم في تدبير ومشورة، ويكونان حرين لا يسترقان، ويترك لهما ما يقوم بهما. [كفاية الطالب: 2/ 9] .

وقال الرجراجي: إذا غنم من العدو ذوي القوة من الرجال فالإمام مخيَّر فيهم في خمسة أشياء: القتل او الجزية أو الفداء أو المنّ أو الاسترقاق، وأمَّا النساء فإن كففن أذاهم عن المسلمين ولزمن من قعر بيوتهن فلا خوف في تحريم قتلهن، وإن شرعن في مدح القتال وذم الفرار، فإن قاتلن وباشرن السلاح فلا خلاف في جواز قتلهنّ، في حين القتل في المسايفة لوجود المعنى المبيح لقتلهن، وكذلك أيضًا يباح قتلهن بعد الأسر إذا قتلن، فإن رمين بالحجارة ولم يظهرن النكاية ولا قتلن أحدًا فلا يقتلن بعد الأسر اتفاقًا. [مواهب الجليل: 3/ 351] .

2 يقول الفيروزابادي الشيرازي من الشافعية: وإن أسر حرّ فللإمام أن يختار فيه ما يرى المصلحة من القتل والاسترقاق والمن والمفاداة بمال أو بمن أسر من المسلمين، فإن استرقَّه وكان له زوجة انفسخ نكاحها، وإن أسلم في الأسر سقط قتله، وبقي الخيار في الباقي في أحد القولين، ويرقّ في القول الآخر، وإن غرر بنفسه في أسره فقتله الإمام أو من عليه ففي سلبه قولان: أحدهما أنه لمن أسره، والثاني أنه ليس له، وإن استرقه أو فاداه بمال فهل يستحق من أسره رقبته، أو المال المفادى به فيه قولان، وإن حاصر قلعة فنزل أهلها على حكم حاكم جاز، ويجب أن يكون

الحاكم حرًّا مسلمًا ثقة من أهل الاجتهاد ولا يحكم الحاكم إلّا بما فيه الحظ للمسلمين منَ القتل والاسترقاق والمنّ والفداء. [التنبيه: ص 234] .

পরিচ্ছেদ: "গনিমতের বিধান"
গনিমতের প্রকারভেদ ও হুকুম অধিক; কারণ এটি এমন এক মূল যা থেকে 'ফাই' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) উদ্ভূত হয়েছে, ফলে এর বিধান অধিক ব্যাপক।
এটি কয়েকটি প্রকারের ওপর অন্তর্ভুক্ত: যুদ্ধবন্দী, সাধারণ বন্দী, ভূমি এবং ধন-সম্পদ।
যুদ্ধবন্দীদের (আসরা) ক্ষেত্রে: তারা হলেন কাফিরদের মধ্য থেকে যুদ্ধকারী ব্যক্তিবর্গ, যখন মুসলিমরা তাদের জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে সক্ষম হয়। তাদের হুকুমের বিষয়ে ফকিহগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মতে, ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) অথবা জিহাদের বিষয়ে ইমাম কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি তাদের ব্যাপারে চারটি বিষয়ের মধ্যে যা অধিক কল্যাণকর, তা বেছে নেওয়ার অধিকার রাখেন (যদি তারা নিজ কুফরিতে অটল থাকে): হয় হত্যা করা, নয়তো দাস বানানো, অথবা সম্পদের বিনিময়ে কিংবা মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে মুক্তিপণ গ্রহণ করা, অথবা কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই দয়া প্রদর্শন করে মুক্তি দেওয়া।
যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাদের ওপর থেকে হত্যার দণ্ড রহিত হয়ে যাবে এবং ইমাম বাকি তিনটি বিষয়ের মধ্য থেকে যেকোনোটি বেছে নেওয়ার অধিকার রাখবেন। ইমাম মালিক বলেন: ইমাম তিনটি বিষয়ের মধ্যে বেছে নেওয়ার অধিকার রাখেন: হত্যা করা, দাস বানানো অথবা পুরুষ বন্দীদের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া (সম্পদের বিনিময়ে নয়); তবে দয়া প্রদর্শন করে (বিনা মুক্তিপণে) মুক্তি দেওয়ার অধিকার তার নেই।

আবু আল-হাসান আল-মালিকি বলেন: ইমাম তাদের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের মধ্যে পছন্দের ক্ষমতা রাখেন: দাস বানানো, মুক্তি দান এবং মুক্তিপণ গ্রহণ। তিনি সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজকদের হত্যা করা পরিহার করবেন। মাশহুর (প্রসিদ্ধ) মতানুযায়ী এই দুই শ্রেণীকে হত্যা না করার শর্ত হলো তারা যেন তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে—গির্জা বা নির্জন উপাসনালয়ে তারা আবদ্ধ থাকে। এর অর্থ হলো: তারা তাদের সাথে কোনো মতবিনিময়ে লিপ্ত হবে না এবং পরামর্শ বা যুদ্ধকৌশলে সহায়তা করবে না। তারা স্বাধীন থাকবে, তাদের দাস বানানো হবে না এবং তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ ছেড়ে দেওয়া হবে। [কিফায়াতুত তালিব: ২/৯]।

আল-রাজরাজি বলেন: শত্রুপক্ষ থেকে যখন সামর্থ্যবান পুরুষদের গনিমত হিসেবে লাভ করা হবে, তখন ইমাম পাঁচটি বিষয়ের মধ্য থেকে যেকোনোটি বেছে নেওয়ার অধিকার রাখেন: হত্যা, জিজিয়া, মুক্তিপণ, দয়া করে মুক্তি অথবা দাসত্ব। আর নারীদের ক্ষেত্রে, তারা যদি মুসলিমদের কোনো ক্ষতি না করে এবং নিজেদের ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান করে, তবে তাদের হত্যা করা হারাম হওয়ার বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। আর যদি তারা যুদ্ধের প্রশংসা করে এবং পলায়নের নিন্দা করে (উৎসাহ যোগায়), তবে তারা যদি লড়াই করে এবং অস্ত্র ধারণ করে, তবে সম্মুখ সমরের সময় তাদের হত্যা করা বৈধ হওয়ার বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই; কারণ তখন তাদের হত্যার বৈধতার কারণ বিদ্যমান থাকে। একইভাবে, বন্দী হওয়ার পরেও যদি তারা ইতিপূর্বে কাউকে হত্যা করে থাকে, তবে তাদের হত্যা করা বৈধ। কিন্তু তারা যদি কেবল পাথর নিক্ষেপ করে এবং কোনো গুরুতর আঘাত না করে কিংবা কাউকে হত্যা না করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে বন্দী করার পর তাদের হত্যা করা যাবে না। [মাওয়াহিবুল জলিল: ৩/৩৫১]।
শাফিয়ী মাযহাবের আল-ফায়রুযাবাদি আল-শিরাজি বলেন: যদি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বন্দী করা হয়, তবে ইমাম তার ব্যাপারে যা জনকল্যাণকর মনে করবেন তা বেছে নিতে পারেন—চাইলে হত্যা করা, দাস বানানো, দয়া করে মুক্তি দেওয়া অথবা সম্পদের বিনিময়ে কিংবা বন্দী মুসলিমদের বিনিময়ে মুক্তিপণ গ্রহণ করা। যদি তাকে দাস বানানো হয় এবং তার স্ত্রী থাকে, তবে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। যদি সে বন্দীদশায় ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার হত্যার হুকুম রহিত হবে; বাকি বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ইমামের পছন্দের অধিকার একটি মতানুসারে বহাল থাকবে, আর অন্য মতানুসারে সে সরাসরি দাস হিসেবে গণ্য হবে। যদি কেউ নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাকে বন্দী করে এবং পরবর্তীতে ইমাম বা অন্য কেউ তাকে হত্যা করে, তবে তার ব্যক্তিগত লব্ধ সম্পদ (সালব) সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে: প্রথমটি হলো, এটি তার প্রাপ্য যে তাকে বন্দী করেছে, দ্বিতীয়টি হলো, এটি তার প্রাপ্য নয়। যদি তাকে দাস বানানো হয় বা সম্পদের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে যে তাকে বন্দী করেছে সে কি তার ওপর বা মুক্তিপণের অর্থের ওপর কোনো অধিকার পাবে? এ বিষয়েও দুটি মত রয়েছে। যদি ইমাম কোনো দুর্গ অবরোধ করেন এবং দুর্গের অধিবাসীরা কোনো বিচারকের ফয়সালার শর্তে আত্মসমর্পণ করে, তবে তা জায়েজ। তবে বিচারককে অবশ্যই স্বাধীন, মুসলিম, বিশ্বস্ত এবং ইজতিহাদ করার যোগ্য হতে হবে। বিচারক কেবল মুসলিমদের স্বার্থ ও কল্যাণ বিবেচনায় হত্যা, দাসত্ব, অনুগ্রহ বা মুক্তিপণের আদেশ দেবেন। [আত-তানবিহ: পৃষ্ঠা ২৩৪]।

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ شَيْئَيْنِ الْقَتْلُ أَوْ الِاسْتِرْقَاقُ، وَلَيْسَ لَهُ الْمَنُّ وَلَا الْمُفَادَاةُ بِالْمَالِ؛ وَقَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ بِالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ، قَالَ تَعَالَى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4] ، وَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ1 يَوْمَ بَدْرٍ، وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَلَّا يَعُودَ لِقِتَالِهِ فَعَادَ لِقِتَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأُسِرَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ، فَقَالَ: أَمْنُنْ عَلَيَّ فَقَالَ: "لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ" 2. وَلَمَّا قَتَلَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ بِالصَّفْرَاءِ بَعْدَ انْكِفَائِهِ مِنْ بَدْرٍ لَمَّا اسْتَوْقَفَتْهُ ابْنَتُهُ قُتَيْلَةُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَنْشَدَتْهُ قَوْلَهَا "مِنَ الْكَامِلِ":

يَا رَاكِبًا إِنَّ الْأُثَيْلَ مَظِنَّةٌ ... عَنْ صُبْحِ خَامِسَةٍ وَأَنْتَ مُوَفَّقُ

أَبْلِغْ بِهِ مَيْتًا فَإِنَّ تَحِيَّةً ... مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا الرَّكَائِبُ تَخْفُقُ

مِنِّي إِلَيْهِ وَعَبْرَةٌ مَسْفُوحَةٌ ... جَاءَتْ لِمَائِحِهَا وَأُخْرَى تُخْنَقُ

أَمُحَمَّدٌ يَا خَيْرَ ضِنْءٍ كَرِيمَةٍ ... فِي قَوْمِهَا وَالْفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ

النَّضْرُ أَقْرَبُ مَنْ قَتَلْتَ قَرَابَةً ... وَأَحَقُّهُمْ إِنْ كَانَ عِتْقٌ يُعْتَقُ

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا ... مَنَّ الْفَتَى وَهُوَ الْمَغِيظُ الْمُحْنَقُ

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ سَمِعْتُ شِعْرَهَا مَا قَتَلْتُه" 3. وَلَوْ لَمْ يَجُزِ الْمَنُّ لَمَا قَالَ هَذَا؛ لِأَنَّ أَقْوَالَهُ أَحْكَامٌ مَشْرُوعَةٌ.

وَأَمَّا الْفِدَاءُ: فَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِدَاءَ أَسْرَى بَدْرٍ وَفَادَى بَعْدَهُمْ رَجُلًا بِرَجُلَيْنِ، فَإِذَا ثَبَتَ خِيَارُهُ فِيمَنْ لَمْ يُسْلِمْ بَيْنَ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ، تَصَفَّحَ أَحْوَالَهُمْ وَاجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ فِيهِمْ.

فَمَنْ عَلِمَ مِنْهُ قُوَّةَ بَأْسٍ وَشِدَّةَ نِكَايَةٍ وَيَئِسَ مِنْ إِسْلَامِهِ، وَعَلِمَ مَا فِي قَتْلِهِ مِنْ وَهَنِ قَوْمِهِ قَتَلَهُ صَبْرًا مِنْ غَيْرِ مُثْلَةٍ.

وَمَنْ رَآهُ مِنْهُمْ ذَا جَلَدٍ وَقُوَّةٍ عَلَى الْعَمَلِ، وَكَانَ مَأْمُونَ الْخِيَانَةِ وَالْخَبَاثَةِ اسْتَرَقَّهُ؛ لِيَكُونَ عَوْنًا لِلْمُسْلِمِينَ.

وَمَنْ رَآهُ مِنْهُمْ مَرْجُوَّ الْإِسْلَامِ أَوْ مُطَاعًا فِي قَوْمِهِ، وَرَجَا بِالْمَنِّ عَلَيْهِ إِمَّا إِسْلَامَهُ أَوْ تَأْلِيفَ

---

1 أبو عزة الجمحي، شاعر، واسمه عمرو بن عبد الله.

2 صحيح: رواه البخاري في كتاب الأدب "6133"، ومسلم في كتاب الرقائق "2998".

3 والخبر ذكره ابن خلكان في وفيَّات الأعيان، وابن طيفور في بلاغات النساء.

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন: [ইমামের জন্য] দুটি বিষয়ের মধ্যে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা থাকবে—হত্যা করা অথবা দাসত্বে রূপান্তর করা; তাঁর জন্য অনুগ্রহপূর্বক বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া (মান্ন) বা অর্থের বিনিময়ে মুক্তি (ফিদা) দেওয়ার সুযোগ নেই। অথচ কুরআনে অনুগ্রহ ও মুক্তিপণ আদায়ের বিধান এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: {অতঃপর হয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করো, না হয় মুক্তিপণ গ্রহণ করো, যে পর্যন্ত না যুদ্ধ তার যুদ্ধভার নামিয়ে রাখে} [সূরা মুহাম্মদ: ৪]। রাসূলুল্লাহ (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন আবু আজ্জা আল-জুমাহির ১ প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন এবং তাঁর সাথে এই শর্ত করেছিলেন যে, সে পুনরায় তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। কিন্তু সে ওহুদের যুদ্ধে পুনরায় লড়তে আসে এবং পুনরায় বন্দী হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। সে বলেছিল: "আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।" তিনি বললেন: "মুমিন এক গর্ত থেকে দুবার দংশিত হয় না" ২। আর বদর থেকে ফেরার পথে ‘সাফরা’ নামক স্থানে তিনি যখন নজর ইবনুল হারিসকে হত্যা করেছিলেন, পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের দিন তার কন্যা কুতাইলা তাঁর পথরোধ করেন এবং "কামিল" ছন্দে তাঁর উদ্দেশ্যে নিজের এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন:

হে আরোহী! উসাইল (একটি স্থান) পৌঁছানোর সম্ভাব্য স্থান … পঞ্চম দিনের ভোরে, আর তুমি সফলকাম ও কল্যাণপ্রাপ্ত।

তার কাছে এই মৃতের বার্তা পৌঁছে দিও, কেননা এমন এক অভিবাদন … যা উষ্ট্রারোহীরা ক্রমাগত বহন করে নিয়ে যায়।

আমার পক্ষ থেকে তার প্রতি, আর বিগলিত অশ্রু … যা যাঞ্চাকারীর জন্য প্রবাহিত হয়েছে এবং অন্যটি যা কণ্ঠে রুদ্ধ হয়ে আছে।

হে মুহাম্মদ! হে এক মহীয়সী ও সম্মানিতা নারীর শ্রেষ্ঠ সন্তান … তাঁর গোত্রে, আর যার পিতা একজন সুজাত ও শক্তিশালী বীর।

আপনি যাদের হত্যা করেছেন তাদের মধ্যে নজরই ছিল আপনার নিকটতম আত্মীয় … আর সে-ই ছিল মুক্তি পাওয়ার অধিক যোগ্য যদি কাউকে মুক্তি দিতে হতো।

আপনার কী এমন ক্ষতি হতো যদি আপনি অনুগ্রহ করতেন? কখনো কখনো … একজন বীর পুরুষ চরম রাগান্বিত ও ক্ষুব্ধ অবস্থায়ও অনুগ্রহ করে থাকে।

অতঃপর নবী (সা.) বললেন: "আমি যদি তার এই কবিতাটি (আগে) শুনতাম, তবে তাকে হত্যা করতাম না" ৩। যদি অনুগ্রহ করা (মান্ন) জায়েজ না হতো, তবে তিনি এমনটি বলতেন না; কারণ তাঁর কথা ও কাজগুলো হলো শরয়ি বিধান।

আর মুক্তিপণের (ফিদা) বিষয়টি হলো: রাসূলুল্লাহ (সা.) বদরের বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে একজনের বিনিময়ে দুইজনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সুতরাং যখন অমুসলিম বন্দীদের ক্ষেত্রে এই চারটি বিষয়ের (হত্যা, দাসত্ব, অনুগ্রহ ও মুক্তিপণ) মধ্য থেকে ইখতিয়ার বা পছন্দের বিষয়টি প্রমাণিত হলো, তখন ইমাম তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করবেন এবং তাদের ব্যাপারে নিজ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবেন।

যার রণকৌশল ও চরম শত্রুতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে এবং তার ইসলাম গ্রহণের কোনো আশা থাকবে না, উপরন্তু তাকে হত্যা করলে তার গোত্র দুর্বল হয়ে পড়বে বলে জানা যাবে, তবে তাকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হবে, তবে অঙ্গহানি করা যাবে না।

আর তাদের মধ্যে যাকে সহনশীল, শক্তিশালী ও কর্মক্ষম পাওয়া যাবে এবং যার দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা বা অনিষ্টের ভয় থাকবে না, তাকে দাস হিসেবে গ্রহণ করা হবে; যাতে সে মুসলিমদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

আর যার মধ্যে ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা যাবে অথবা নিজ গোত্রে যার আনুগত্য করা হয়, এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করলে হয় সে ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তার মন জয় করা যাবে

---

১ আবু আজ্জা আল-জুমাহি একজন কবি, তাঁর নাম আমর ইবনে আব্দুল্লাহ।

২ সহিহ: বুখারি এটি ‘আদাব’ অধ্যায়ে (৬১৩৩) এবং মুসলিম ‘রিকাক’ অধ্যায়ে (২৯৯৮) বর্ণনা করেছেন।

৩ এই সংবাদটি ইবনে খাল্লিকান ‘ওয়াফায়াতুল আইয়ান’ এবং ইবনে তাইফুর ‘বালাগাতুন নিসা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

(ص: 209)الأحكام السلطانية للماوردي

قَوْمِهِ مَنَّ عَلَيْهِ وَأَطْلَقَهُ.

وَمَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ ذَا مَالٍ وَجَدَّةٍ وَكَانَ بِالْمُسْلِمِينَ خُلَّةٌ وَحَاجَةٌ، فَأَدَّاهُ عَلَى مَالٍ وَجَعَلَهُ عُدَّةً لِلْإِسْلَامِ وَقُوَّةً لِلْمُسْلِمِينَ.

وَإِنْ كَانَ فِي أَسْرَى عَشِيرَتِهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ رِجَالٍ أَوْ نِسَاءٍ فَأَدَّاهُ عَلَى إِطْلَاقِهِمْ، فَيَكُونُ خِيَارُهُ فِي الْأَرْبَعَةِ عَلَى وَجْهِ الْأَحْوَطِ الْأَصْلَحِ، وَيَكُونُ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ فِي الْفِدَاءِ غَنِيمَةً تُضَافُ إِلَى الْغَنَائِمِ، وَلَا يُخَصُّ بِهَا مَنْ أُسِرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ فِدَاءَ الْأَسْرَى مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إِلَى مَنْ أَسَرَهُمْ قَبْلَ نُزُولِ قَسْمِ الْغَنِيمَةِ فِي الْغَانِمِينَ: وَمَنْ أَبَاحَ الْإِمَامُ دَمَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِعِظَمِ نِكَايَتِهِ وَشِدَّةِ أَذِيَّتِهِ، ثُمَّ أُسِرَ جَازَ لَهُ الْمَنُّ عَلَيْهِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ.

قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ سِتَّةٍ عَامَ الْفَتْحِ وَلَوْ تَعَلَّقُوا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، كَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ لَهُ: "اُكْتُبْ غَفُورٌ رَحِيمٌ" فَيَكْتُبُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَحِقَ بِقُرَيْشٍ، وَقَالَ: إِنِّي أَصْرِفُ مُحَمَّدًا حَيْثُ شِئْتُ، فَنَزَلَ فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [الأنعام: 93] .

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ، كَانَتْ لَهُ قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِسَبِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْحُوَيْرِثُ بْنُ نُفَيْلٍ، كَانَ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمِقْيَسُ بْنُ حُبَابَةَ،

كَانَ بَعْضُ الْأَنْصَارِ قَتَلَ أَخًا لَهُ خَطَأً فَأَخَذَ دِيَتَهُ ثُمَّ اغْتَالَ الْقَاتِلَ فَقَتَلَهُ، وَعَادَ إِلَى مَكَّةَ مُرْتَدًّا وَأَنْشَأَ يَقُولُ "مِنَ الطَّوِيلِ":

شَفَى النَّفْسَ أَنْ قَدْ بَاتَ بِالْقَاعِ مُسْنَدًا ... يُضَرِّجُ ثَوْبَيْهِ دِمَاءُ الْأَخَادِعِ

وَكَانَتْ هُمُومُ النَّفْسِ مِنْ قَبْلِ قَتْلِهِ ... تُلِمُّ فَتُحْفِي عَنْ وِطَاءِ الْمَضَاجِعِ

ثَأَرْتُ بِهِ قَهْرًا وَحَمَّلْتُ عَقْلَهُ ... سَرَاةَ بَنِي النَّجَّارِ أَرْبَابَ فَارِعِ

وَأَدْرَكْتُ ثَأْرِي وَاضْطَجَعْتُ مُوَسَّدًا ... وَكُنْتُ عَنِ الْإِسْلَامِ أَوَّلَ رَاجِعِ

وَسَارَةُ مَوْلَاةٌ لِبَعْضِ بَنِي الْمُطَّلِبِ، كَانَتْ تَسُبُّ وَتُؤْذِي، وَعِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، كَانَ يُكْثِرُ التَّأْلِيبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَلَبًا لِثَأْرِ أَبِيهِ.

فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، فَإِنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه اسْتَأْمَنَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ الِاسْتِئْمَانَ ثَانِيَةً، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: "مَا كَانَ فِيكُمْ مَنْ يَقْتُلُهُ حِينَ أَعْرَضْتُ عَنْهُ".

তার গোত্রের পক্ষ থেকে তাকে অনুগ্রহ করা হলো এবং তাকে মুক্তি দেওয়া হলো।

আর তাদের মধ্যে যাকে সম্পদশালী ও স্বচ্ছল পাওয়া যায় এবং মুসলমানদের মধ্যে যদি অভাব ও প্রয়োজন থাকে, তবে তাকে অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হবে এবং সেই অর্থকে ইসলামের সরঞ্জাম ও মুসলমানদের শক্তির উৎস হিসেবে নির্ধারণ করা হবে।

আর যদি তার বংশের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে কোনো মুসলিম পুরুষ বা নারী থাকে, তবে তাদের মুক্তির বিনিময়ে তাকে মুক্ত করা হবে। এমতাবস্থায় এই চারটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ইমামের ইখতিয়ার বা সিদ্ধান্ত হবে অধিকতর সতর্কতামূলক এবং জনকল্যাণমুখী পন্থার ওপর ভিত্তি করে। আর মুক্তিপণ হিসেবে গৃহীত অর্থ গনিমত হিসেবে গণ্য হবে যা সাধারণ গনিমতের সাথে যুক্ত হবে; এর মাধ্যমে বন্দী মুসলমানদের জন্য কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ সেই বিজয়ীদের প্রদান করেছিলেন যারা তাদের বন্দী করেছিল, গনিমত বণ্টন সংক্রান্ত বিধান নাজিল হওয়ার পূর্বেই।

আর মুশরিকদের মধ্যে যার চরম শত্রুতা এবং তীব্র যাতনা দেওয়ার কারণে ইমাম ইতিপূর্বে তার রক্ত হালাল করেছিলেন, অতঃপর সে বন্দী হলে, ইমামের জন্য তাকে অনুগ্রহ করা এবং ক্ষমা করা বৈধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর ছয় ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এমনকি তারা কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে থাকলেও। তারা হলো: আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারাহ, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওহি লিখত। রাসূলুল্লাহ তাকে বলতেন: "লেখো ক্ষমাশীল দয়ালু", সে লিখত মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়। এরপর সে ধর্মত্যাগ করে কুরাইশদের সাথে মিলিত হয় এবং বলে: আমি মুহাম্মদকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পরিচালিত করি। তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার এই বাণী নাজিল হয়: "আর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে বলে: আল্লাহ যা নাজিল করেছেন আমি তার অনুরূপ নাজিল করব।" [আল-আনআম: ৯৩]।

আর আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, তার দুজন গায়িকা দাসী ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে কুৎসা গাওয়ার কাজে নিয়োজিত ছিল। এবং হুয়াইরিস ইবনে নুফাইল, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট দিত। আর মিকইয়াস ইবনে হুবাবাহ; জনৈক আনসারি সাহাবী ভুলবশত তার ভাইকে হত্যা করলে সে তার রক্তপণ গ্রহণ করে, অতঃপর সেই হত্যাকারীকে অতর্কিত আক্রমণ করে হত্যা করে এবং মুরতাদ হয়ে মক্কায় ফিরে যায় এবং এ কাব্য পংক্তিগুলো আবৃত্তি করতে থাকে:

প্রাণের তৃপ্তি মিলল যে সে ময়দানে শুয়ে আছে … ঘাড়ের ধমনীর রক্তে তার দুই বসন রঞ্জিত করে।

তার হত্যার আগে মনের দুশ্চিন্তা এমন ছিল যে … তা বারবার হানা দিত এবং শয্যার আরাম কেড়ে নিত।

আমি পরাক্রমের সাথে তার প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তার রক্তপণের দায় চাপিয়েছি … বনু নাজ্জারের নেতৃবৃন্দের ওপর যারা ফারির দুর্গের অধিপতি।

আমি আমার প্রতিশোধ পূর্ণ করেছি এবং শিয়রে বালিশ দিয়ে শুয়েছি … অথচ আমিই ছিলাম ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া প্রথম ব্যক্তি।

আর সারা, বনু মুত্তালিবের জনৈকা মুক্তদাসী, সে গালি দিত ও কষ্ট দিত। এবং ইকরিমা ইবনে আবি জাহাল, সে তার পিতার প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে মত্ত থাকত।

আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারাহর ব্যাপারে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, এরপর তিনি পুনরায় নিরাপত্তা

চাইলেন। যখন সে চলে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ বললেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি কি ছিল না, যে তাকে হত্যা করত যখন আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম?"

(ص: 210)الأحكام السلطانية للماوردي

قَالُوا: هَلَّا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: "مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ"، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ1 فَقَتَلَهُ سَعْدُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيُّ، وَأَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ2، وَأَمَّا مِقْيَسُ بْنُ صَبَابَةَ3 فَقَتَلَهُ نُمَيْلَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، وَأَمَّا الْحُوَيْرِثُ بْنُ نُفَيْلٍ فَقَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ صَبْرًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: "لَا يُقْتَلُ قُرَيْشِيٌّ بَعْدَ هَذَا إِلَّا بِقَوَدٍ".

وَأَمَّا قَيْنَتَا ابْنِ خَطَلٍ فَقُتِلَتْ إِحْدَاهُمَا وَهَرَبَتْ الْأُخْرَى حَتَّى اُسْتُؤْمِنَ لَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّنَهَا، وَأَمَّا سَارَةُ فَتَغَيَّبَتْ حَتَّى اُسْتُؤْمِنَ لَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّنَهَا، ثُمَّ تَغَيَّبَتْ مِنْ بَعْدُ حَتَّى أَوْطَأَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَسًا لَهُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِالْأَبْطَحِ فَقَتَلَهَا، وَأَمَّا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ فَإِنَّهُ سَارَ إِلَى نَاحِيَةِ الْبَحْرِ وَقَالَ: لَا أَسْكُنُ مَعَ رَجُلٍ قَتَلَ أَبَا الْحَكَمِ -يَعْنِي: أَبَاهُ، فَلَمَّا رَكِبَ الْبَحْرَ قَالَ لَهُ صَاحِبُ السَّفِينَةِ: أَخْلِصْ قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ فِي الْبَحْرِ إِلَّا الْإِخْلَاصُ، فَقَالَ: وَاَللَّهِ لَئِنْ كَانَ لَا يَصْلُحُ فِي الْبَحْرِ إِلَّا الْإِخْلَاصُ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ فَرَجَعَ، وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَدْ أَسْلَمَتْ وَهِيَ أُمُّ حَلِيمٍ، فَأَخَذَتْ لَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَانًا، وَقِيلَ: بَلْ خَرَجَتْ إِلَيْهِ بِأَمَانِهِ إِلَى الْبَحْرِ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ"4 فَأَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسْأَلُنِي الْيَوْمَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَيْتُكَ".

---

1 هو عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير بن تيم بن غالب، وهو الذي يقال له: ابن خطل، الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله يوم فتح مكة؛ وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقتل. [انظر: نسب قريش] .

2 هو نضلة بن عبيد بن الحارث، أبو برزة الأسلمي، غلبت عليه كنيته، واختلف في اسمه، فقيل: نضلة بن عبد الله بن الحارث، وقيل: عبد الله بن نضلة، وقيل: سلمة بن عبيد، والصحيح الأول، أسلم قديمًا، وشهد فتح مكة، ثم تحوَّل إلى البصرة، ثم غزا خراسان ومات بها أيام يزيد بن معاوية، أو في آخر خلافة معاوية.

3 مقيس بن صبابة الكناني، أمه صبابة بنت مقيس بن قيس بن عدي بن سهم بن عمرو بن هصيص، وأبوه حزن بن سيار بن عبد الله بن عبيد بن كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وعداده في قريش في بني سهم، وكان مع أخواله بني سهم، ورأى منهم بعض ما يكره، فخرج عنهم، هذا قول أبي سعيد السكري. وقال هشام بن الكلبي: هو مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار، أسلم ثم ارتدَّ فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فقتله نميلة بن عبد الله بن رجل من قومه. [انظر: معجم الشعراء للمرزباني] .

4 ضعيف: رواه الترمذي في كتاب الاستئذان والآداب "2735"، وضعَّفه الشيخ الألباني.

তারা বললেন: "আপনি কেন আপনার চোখের ইশারায় আমাদের সংকেত দিলেন না?" তিনি বললেন: "কোনো নবীর জন্য শোভা পায় না যে তিনি চোখের খিয়ানত করবেন (অর্থাৎ চোখের ইশারায় কোনো সংকেত দেবেন)।" আর আবদুল্লাহ ইবনে খাতালের১ কথা হলো, তাকে সা'দ ইবনে হুরাইস আল-মাখজুমি এবং আবু বারজাহ আল-আসলামি২ হত্যা করেছিলেন। আর মিকইয়াস ইবনে সাবাবার৩ কথা হলো, তাকে তার নিজ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নুমাইলা ইবনে আবদুল্লাহ হত্যা করেছিলেন। আর হুয়াইরিস ইবনে নুফাইলের কথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আলী ইবনে আবি তালিব তাকে বন্দি অবস্থায় হত্যা

করেছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "আজকের পর কোনো কুরাইশীকে কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) ব্যতীত হত্যা করা হবে না।"

আর ইবনে খাতালের দুই দাসী-গায়িকার ব্যাপারে ঘটনা হলো, তাদের একজনকে হত্যা করা হয়েছিল এবং অন্যজন পালিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে অভয় দান করেন। আর সারাহর কথা হলো, সে আত্মগোপন করেছিল, অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার জন্য নিরাপত্তা চাওয়া হলে তিনি তাকে অভয় দেন। অতঃপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মক্কার আবতাহ নামক স্থানে জনৈক মুসলিমের ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে সে নিহত হয়। আর ইকরিমা ইবনে আবি জাহলের ব্যাপার হলো, সে সমুদ্র উপকূলের দিকে চলে গিয়েছিল এবং বলেছিল: "আমি এমন ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহর) সাথে বসবাস করব না যিনি আবুল হাকামকে (অর্থাৎ তার পিতাকে) হত্যা করেছেন।" যখন সে নৌযানে আরোহণ করল, তখন নৌকার মাঝি তাকে বলল: "একনিষ্ঠ হোন (অর্থাৎ কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করুন)।" সে জিজ্ঞেস করল: "কেন?" মাঝি বলল: "সমুদ্রে একনিষ্ঠতা (তাওহীদ) ছাড়া আর কিছুই কাজে আসে না।" তখন সে বলল: "আল্লাহর কসম! যদি সমুদ্রে একনিষ্ঠতা ছাড়া আর কিছু কাজে না আসে, তবে স্থলেও তা ভিন্ন আর কিছুই ফলপ্রসূ হবে না।" অতঃপর সে ফিরে এল। তার স্ত্রী আল-হারিসের কন্যা উম্মু হাকীম (ইতিপূর্বেই) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে ইকরিমার জন্য অভয়পত্র গ্রহণ করেছিলেন। মতান্তরে বলা হয়, তিনি স্বয়ং ইকরিমার অভয়পত্র নিয়ে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত গিয়েছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখলেন, তখন বললেন: "হিজরতকারী আরোহীকে স্বাগতম।"৪ অতঃপর ইকরিমা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: "আজ তুমি আমার কাছে যা কিছু চাইবে, আমি তোমাকে তা প্রদান করব।"

---

১ তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে আবদে মানাফ ইবনে আসাদ ইবনে জাবির ইবনে কাবীর ইবনে তাইম ইবনে গালিব। তিনিই সেই ব্যক্তি যাকে 'ইবনে খাতাল' বলা হয়, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার দুই দাসী-গায়িকা ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে গান গাইত। অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়েছিল। [দ্রষ্টব্য: নাসাবু কুরাইশ]।

২ তিনি হলেন নাযলা ইবনে উবাইদ ইবনুল হারিস, আবু বারজাহ আল-আসলামি। তিনি তার উপনামেই অধিক পরিচিত। তার নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে; কেউ বলেছেন নাযলা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস, কেউ বলেছেন আবদুল্লাহ ইবনে নাযলা, আবার কেউ বলেছেন সালামাহ ইবনে উবাইদ। তবে প্রথমোক্তটিই সঠিক। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বসরায় স্থানান্তরিত হন এবং খোরাসানে যুদ্ধ করতে গিয়ে সেখানেই ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার শাসনামলে অথবা মুয়াবিয়ার খিলাফতের শেষের দিকে ইন্তেকাল করেন।

৩ মিকইয়াস ইবনে সাবাবাহ আল-কিনানি। তার মা সাবাবাহ বিনতে মিকইয়াস ইবনে কায়স ইবনে আদি ইবনে সাহম ইবনে আমর ইবনে হাসিস। তার পিতা হুজন ইবনে সাইয়ার ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে কালব ইবনে আউফ ইবনে কাব ইবনে আমির ইবনে লাইস ইবনে বকর ইবনে আবদে মানাহ ইবনে কিনানাহ। কুরাইশদের মধ্যে বনু সাহমের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে তিনি গণ্য হতেন। তিনি তার মাতুল গোষ্ঠী বনু সাহমের সাথে ছিলেন। সেখানে অপ্রীতিকর কিছু প্রত্যক্ষ করে তিনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এটি আবু সাঈদ আস-সুক্কারীর বক্তব্য। হিশাম ইবনুল কালবি বলেন: তিনি হলেন মিকইয়াস ইবনে সাবাবাহ ইবনে হুজন ইবনে ইয়াসার। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিলেন, ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রক্ত বৈধ ঘোষণা করেন। অতঃপর তার নিজ গোত্রের নুমাইলা ইবনে আবদুল্লাহ তাকে হত্যা করেন। [দ্রষ্টব্য: মু'জামুশ শুয়ারা লিল মারযুবানি]।

৪ যঈফ (দুর্বল): এটি তিরমিযী 'ইস্তিজান ও আদাব' অধ্যায়ে (২৭৩৫) বর্ণনা করেছেন এবং শাইখ আলবানী এটিকে যঈফ বলেছেন।

فَقَالَ: إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لِي كُلَّ نَفَقَةٍ أَنْفَقْتُهَا لِأَصُدَّ بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَكُلَّ مَوْقِفٍ وَقَفْتُهُ لِأَصُدَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ مَا سَأَلَ".

فَقَالَ: وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَدَعُ دِرْهَمًا أَنْفَقْتُهُ فِي الشِّرْكِ إِلَّا أَنْفَقْتُ مَكَانَهُ فِي الْإِسْلَامِ دِرْهَمَيْنِ، وَلَا مَوْقِفًا وَقَفْتُهُ فِي الشِّرْكِ إِلَّا وَقَفْتُ مَكَانَهُ فِي الْإِسْلَامِ مَوْقِفَيْنِ، فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ رضي الله عنه.

هَذَا الْخَبَرُ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْكَامٌ، فَلِذَلِكَ اسْتَوْفَيْنَاهُ.

অতঃপর তিনি বললেন: "আমি আপনার নিকট আরজ করছি যে, আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন—আমি আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিমুখ করার জন্য যে অর্থ ব্যয় করেছি এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টির জন্য যে সকল অবস্থানে দাঁড়িয়েছি, যেন তিনি তা ক্ষমা করে দেন।" তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "হে আল্লাহ! তিনি যা প্রার্থনা করেছেন, আপনি তা ক্ষমা করে দিন।"

তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, শিরকের পক্ষে আমি যে পরিমাণ দিরহাম ব্যয় করেছি, ইসলামের জন্য তার স্থলে দুই দিরহাম ব্যয় না করে আমি ক্ষান্ত হব না; আর শিরকের সপক্ষে আমি যে সকল অবস্থানে দাঁড়িয়েছিলাম, ইসলামের সপক্ষে তার স্থলে দ্বিগুণ অবস্থানে না দাঁড়িয়ে আমি ছাড়ব না।" অতঃপর ইয়ারমুক যুদ্ধের দিন তিনি শাহাদাত বরণ করেন (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সীরাত বা জীবনচরিতের কতিপয় বিধান এই বিবরণের সাথে সংশ্লিষ্ট, বিধায় আমরা এটি সবিস্তারে বর্ণনা করেছি।

فصل: "في النهي عن قتل الرهبان"

وَأَمَّا قَتْلُ مَنْ أَضْعَفَهُ الْهَرَمُ، أَوْ أَعْجَزَتْهُ الزَّمَانَةُ، أَوْ كَانَ مِمَّنْ تَخَلَّى مِنَ الرُّهْبَانِ وَأَصْحَابِ الصَّوَامِعِ، فَإِنْ كَانُوا يَمُدُّونَ الْمُقَاتِلَةَ بِرَأْيِهِمْ وَيُحَرِّضُونَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ، جَازَ قَتْلُهُمْ عِنْدَ الظَّفَرِ بِهِمْ، وَكَانُوا فِي حُكْمِ الْمُقَاتِلَةِ بَعْدَ الْأَسْرِ، وَإِنْ لَمْ يُخَالِطُوهُمْ فِي رَأْيٍ وَلَا تَحْرِيضٍ، فَفِي إِبَاحَةِ قَتْلِهِمْ قَوْلَانِ.

فصل:

وَأَمَّا السَّبْيُ فَهُمُ النِّسَاءُ وَالْأَطْفَالُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَلُوا إِذَا كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وَيَكُونُ سَبْيًا مُسْتَرَقًّا يُقْسَمُونَ مَعَ الْغَنَائِمِ، وَإِنْ كَانَ النِّسَاءُ مِنْ قَوْمٍ لَيْسَ لَهُمْ كِتَابٌ -كَالدَّهْرِيَّةِ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ- وَامْتَنَعْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُقْتَلْنَ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُسْتَرْقَقْنَ، لَا يُفَرَّقُ فِيمَنْ اُسْتُرِقَّ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا".

فَإِنْ فَادَى بِالسَّبْيِ عَلَى مَالٍ جَازَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفِدَاءَ بَيْعٌ، وَيَكُونُ مَالُ فَدَائِهِمْ مَغْنُومًا مَكَانَهُمْ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِطَابَةُ نُفُوسِ الْغَانِمِينَ عَنْهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ.

وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُفَادِيَ بِهِمْ عَنْ أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي قَوْمِهِمْ عَوَّضَ الْغَانِمِينَ عَنْهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ، وَإِنْ أَرَادَ الْمَنَّ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِاسْتِطَابَةِ نُفُوسِ الْغَانِمِينَ عَنْهُمْ إِمَّا بِالْعَفْوِ عَنْ حُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ، وَإِمَّا بِمَالٍ يُعَوِّضُهُمْ عَنْهُمْ.

পরিচ্ছেদ: সন্ন্যাসীদের হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে

আর বার্ধক্যের কারণে যারা অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিংবা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি যাদের অক্ষম করে দিয়েছে, অথবা যারা নির্জনে অবস্থানকারী সন্ন্যাসী ও মঠবাসী—তাদের হত্যার বিধান হলো, যদি তারা নিজেদের পরামর্শের মাধ্যমে যোদ্ধাদের সহায়তা করে এবং তাদেরকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে, তবে তাদের ওপর বিজয় লাভের সময় তাদের হত্যা করা বৈধ। এমতাবস্থায় বন্দি করার পর তাদের বিধান যোদ্ধাদের বিধানের অনুরূপ হবে। আর যদি তারা পরামর্শ বা

প্ররোচনার মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পৃক্ত না থাকে, তবে তাদের হত্যা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে।

পরিচ্ছেদ:

আর যুদ্ধবন্দি বলতে নারী ও শিশুদের বোঝায়। তারা যদি আহলে কিতাব (আসমানি কিতাবের অনুসারী) হয়, তবে তাদের হত্যা করা বৈধ নয়; কারণ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং গনিমতের মালামালের সাথে তাদের বণ্টন করা হবে। আর যদি নারীরা এমন কোনো সম্প্রদায়ের হয় যাদের কোনো আসমানি কিতাব নেই—যেমন দহরিয়া (নাস্তিক) ও মূর্তিপূজারী—এবং তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তবে ইমাম শাফিঈর মতে তাদের হত্যা করা হবে, আর ইমাম আবু হানিফার মতে তাদের দাস হিসেবে গ্রহণ করা হবে। যাদের দাস হিসেবে গ্রহণ করা হবে, তাদের ক্ষেত্রে মাতা ও সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কোনো মাকে যেন তার সন্তানের বিচ্ছেদে শোকাতুর না করা হয়।"

যদি মুক্তিপণ হিসেবে সম্পদের বিনিময়ে এই যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তা বৈধ; কারণ এই মুক্তিপণ মূলত একটি ক্রয়-বিক্রয়। এমতাবস্থায় তাদের মুক্তিপণের অর্থ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গনিমতের সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে গনিমতের ভাগীদারদের জনকল্যাণমূলক তহবিল থেকে তুষ্ট করা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য আবশ্যক হবে না।

আর যদি তিনি (রাষ্ট্রপ্রধান) এই বন্দিদের বিনিময়ে শত্রুপক্ষের হাতে থাকা মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করতে চান, তবে তিনি জনকল্যাণমূলক তহবিল থেকে গনিমতের ভাগীদারদের বিনিময় প্রদান করবেন। আর যদি তিনি তাদের বিনাশর্তে মুক্তি দিতে চান, তবে গনিমতের ভাগীদারদের সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত তা বৈধ হবে না; হয় তারা নিজেদের প্রাপ্য অধিকার ক্ষমা করে দেবে, অথবা তিনি তাদের বিনিময়ে অন্য কোনো সম্পদ প্রদান করে তাদের ক্ষতিপূরণ দেবেন।

فَإِنْ كَانَ الْمَنُّ عَلَيْهِمْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ جَازَ أَنْ يُعَوِّضَهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ، وَإِنْ كَانَ لِأَمْرٍ يَخُصُّهُ عَاوَضَ عَنْهُمْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، وَمَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْغَانِمِينَ عَنْ تَرْكِ حَقِّهِ لَمْ يُسْتَنْزَلْ عَنْهُ إِجْبَارًا حَتَّى يَرْضَى، وَخَالَفَ ذَلِكَ حُكْمُ الْأَسْرَى الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ اسْتِطَابَةُ نُفُوسِ الْغَانِمِينَ فِي الْمَنِّ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ، وَقَتْلَ السَّبْيِ مَحْظُورٌ، فَصَارَ السَّبْيُ مَالًا مَغْنُومًا لَا يَسْتَنْزِلُونَ عَنْهُ إِلَّا بِاسْتِطَابَةِ النُّفُوسِ.

قَدْ اسْتَعْطَفَتْ هَوَازِنُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَبَاهُمْ بِحُنَيْنٍ، وَأَتَاهُ وُفُودُهُمْ وَقَدْ فَرَّقَ الْأَمْوَالَ وَقَسَمَ السَّبْيَ، فَذَكَّرُوهُ حُرْمَةَ رَضَاعِهِ فِيهِمْ مِنْ لَبَنِ حَلِيمَةَ، وَكَانَتْ مِنْ هَوَازِنَ.

حَكَى ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ هَوَازِنَ لَمَّا سُبِيَتْ وَغُنِمَتْ أَمْوَالُهُمْ بِحُنَيْنٍ، قَدِمَتْ وُفُودُهُمْ مُسْلِمِينَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَنَا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ، وَقَدْ أَصَابَنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، فَامْنُنْ عَلَيْنَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ، ثُمَّ قَامَ مِنْهُمْ أَبُو صُرَدَ زُهَيْرُ بْنُ صُرَدَ1 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا فِي الْحَظَائِرِ عَمَّاتُكَ وَخَالَاتُكَ وَحَوَاضِنُكَ اللَّائِي كُنَّ يَكْفُلْنَكَ، وَلَوْ أَنَّا مُلِّكْنَا لِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمِرٍ2 أَوِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، ثُمَّ نَزَلْنَا بِمِثْلِ الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلْنَا رَجَوْنَا عَطْفَهُ وَجَائِزَتَهُ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْكَفِيلِينَ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ "مِنَ الْبَسِيطِ":

أُمْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَرَمٍ ... فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَنَدَّخِرُ

أُمْنُنْ عَلَى بَيْضَةٍ قَدْ عَاقَهَا قَدَرٌ ... مُمَزَّقٌ شَمْلُهَا فِي دَهْرِهَا غَبَرُ

أُمْنُنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا ... إِذْ فُوكَ يَمْلَؤُهُ مِنْ مَحْضِهَا الدُّرَرُ

الْآنَ إِذْ كُنْتَ طِفْلًا كُنْتَ تَرْضَعُهَا ... وَإِذْ تُرَبِّيكَ مَا تَأْتِي وَمَا تَذَرُ

لَا تَجْعَلَنَّا كَمَنْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ ... وَاسْتَبْقِ مِنَّا فَإِنَّا مَعْشَرٌ زُهُرُ

إِذْ لَمْ تُدَارِكْنَا نَعْمَاءُ تَنْشُرُهَا ... يَا أَرْجَحَ النَّاسِ حِلْمًا حِينَ يُخْتَبَرُ

---

1 هو زهير بن صرد الجشمي السعدي، أبو صرد، من بني سعد بن بكر، كان رئيس قومه.

2 الحارث بن أبي شمر: وهو الحارث الأعرج، وأمه مارية ذات القرطين، وهي مارية بنت ظالم بن وهب ابن الحارث بن معاوية الكندي؛ وأختها هند الهنود امرأة حجر بن المرار الكندي، وإلى الحارث الأعرج زحف المنذر الأكبر فانهزم جيشه، وقتل هو.. ثم الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث.. وهو ولد الحارث الأعرج، ثم عمرو بن الحارث، وكان يقال له: أبو شمر الأصغر.

যদি তাদের প্রতি অনুগ্রহ (মুক্তিদান) কোনো সাধারণ জনস্বার্থের কারণে হয়, তবে তাদের (যোদ্ধাদের) জনকল্যাণ খাত থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া বৈধ। আর যদি তা কোনো ব্যক্তিগত কারণে হয়, তবে তিনি নিজের সম্পদ থেকে তাদের ক্ষতিপূরণ দেবেন। গনিমতের অধিকারীদের মধ্যে কেউ যদি তার প্রাপ্য অধিকার ত্যাগ করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত জোরপূর্বক তা থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। এটি যুদ্ধবন্দীদের (পুরুষ যোদ্ধা) বিধানের বিপরীত, যেখানে গনিমতের অধিকারীদের সন্তুষ্টি অর্জন আবশ্যক নয়; কারণ পুরুষদের হত্যা করা বৈধ, কিন্তু বন্দিনীদের (নারী ও শিশু) হত্যা করা নিষিদ্ধ। ফলে বন্দিনীরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (গনিমত) অন্তর্ভুক্ত হয়, তাই যোদ্ধাদের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে তাদের সেই অধিকার থেকে সরানো যায় না।

হাওয়াজিন গোত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কৃপা প্রার্থনা করেছিল যখন তিনি হুনায়নের যুদ্ধে তাদের বন্দী করেছিলেন। তাদের প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে তখন উপস্থিত হলো যখন তিনি ইতিমধ্যেই সম্পদ বণ্টন করে ফেলেছিলেন এবং বন্দীদের ভাগ করে দিয়েছিলেন। তারা তাঁকে হালিমার দুধ পানের মাধ্যমে তাদের সাথে তাঁর দুগ্ধ-সম্পর্কের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, আর হালিমা ছিলেন হাওয়াজিন গোত্রের।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, হুনায়নের যুদ্ধে যখন হাওয়াজিন গোত্র বন্দী হলো এবং তাদের ধন-সম্পদ গনিমত হিসেবে সংগৃহীত হলো, তখন তাদের প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলো যখন তিনি জি'রানায় অবস্থান করছিলেন। তারা বলল: 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনার মূল বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্কের লোক, আর আমাদের ওপর যে বিপর্যয় আপতিত হয়েছে তা আপনার কাছে অবিদিত

নয়। সুতরাং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।' অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আবু সুরাদ জুহায়ের ইবনে সুরাদ দাঁড়িয়ে বললেন: 'হে আল্লাহর রাসূল, এই ঘেরাও করা স্থানগুলোতে (বন্দিশালায়) আপনার ফুফু, খালা এবং ধাত্রীরা রয়েছেন যারা আপনার লালন-পালন করেছিলেন। আমরা যদি আল-হারিস ইবনে আবি শিমর অথবা নুমান ইবনে মুনযিরের আশ্রয়ে থাকতাম এবং আমাদের এই দশা হতো, তবে আমরা তাদের কৃপা ও উপঢৌকন আশা করতাম। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবক ও আশ্রয়দাতা।' এরপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করলেন:

হে আল্লাহর রাসূল, আপনার মহানুভবতায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন ... কারণ আপনিই সেই ব্যক্তি যাঁর কাছে আমরা আশা রাখি এবং বিপদে যাঁকে আমরা আশ্রয় মনে করি।

অনুগ্রহ করুন এমন এক গোষ্ঠীর ওপর যাদের ভাগ্য প্রতিকূল হয়েছে ... যাদের একতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং যারা ধুলোমলিন দুর্ভাগ্যের শিকার।

সেই নারীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন যাঁদের স্তন আপনি পান করেছিলেন ... যখন আপনার মুখ তাদের খাঁটি দুগ্ধের মুক্তোরাশিতে পূর্ণ থাকত।

সেই সময়ের স্মরণে, যখন আপনি শিশু হিসেবে স্তন্য পান করতেন ... এবং যখন তাঁরা আপনাকে লালন-পালন করতেন, আপনার যাবতীয় বিষয় তদারকি করতেন।

আমাদের ওই ব্যক্তির মতো নিঃস্ব করবেন না যার সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে ... বরং আমাদের রক্ষা করুন, কারণ আমরা এক উজ্জ্বল ও সম্মানিত সম্প্রদায়।

যদি আপনি আপনার প্রচারিত নেয়ামত দ্বারা আমাদের উদ্ধার না করেন ... হে পরীক্ষার সময়ে মানুষের মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব (তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য)।

---

১ তিনি হলেন জুহায়ের ইবনে সুরাদ আল-জুশামি আস-সাদি, আবু সুরাদ, বনু সাদ ইবনে বকর গোত্রের। তিনি তাঁর গোত্রের নেতা ছিলেন।

২ আল-হারিস ইবনে আবি শিমর: তিনি হলেন আল-হারিস আল-আরাজ। তাঁর মাতা ছিলেন মারিয়া যাতুল কুরতাইন, যিনি কিন্দাহ গোত্রের হারিস ইবনে মুআবিয়ার পৌত্র জালিম ইবনে ওয়াহাব-এর কন্যা। তাঁর বোন ছিলেন হিন্দ আল-হুনুদ, যিনি হুজর ইবনে আল-মুরার আল-কিন্দি-র স্ত্রী। এই আল-হারিস আল-আরাজের বিরুদ্ধেই মুনযির আল-আকবার অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, যাতে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয়েছিল এবং তিনি নিহত হয়েছিলেন। এরপর আল-হারিস আল-আসগার ইবনে আল-হারিস আল-আরাজ ইবনে আল-হারিস... তিনি

আল-হারিস আল-আরাজের পুত্র। এরপর আমর ইবনে আল-হারিস, যাঁকে আবু শিমর আল-আসগার বলা হতো।

إِنَّا لَنَشْكُرُكَ النُّعْمَى وَإِنْ كَثُرَتْ ... وَعِنْدَنَا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ نَدَّخِرُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ أَمْ أَمْوَالُكُمْ "؟.

فَقَالُوا: خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَمْوَالِنَا وَأَحْسَابِنَا، بَلْ تَرُدُّ عَلَيْنَا أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، فَهُمْ أَحَبُّ إِلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ".

وَقَالَتْ قُرَيْشٌ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ، وَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيمٍ فَلَا، وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو فَزَارَةَ فَلَا؛ وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ فَلَا، فَقَالَتْ بَنُو سُلَيْمٍ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ لِبَنِي سُلَيْمٍ: قَدْ وَهَنْتُمُونِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا مَنْ تَمَسَّكَ مِنْكُمْ بِحَقِّهِ مِنْ هَذَا السَّبْيِ فَلَهُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ سِتُّ قَلَائِصَ، فَرُدُّوا إِلَى النَّاسِ أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ" 1.

فَرَدُّوا، وَكَانَ عُيَيْنَةُ قَدْ أَخَذَ عَجُوزًا مِنْ عَجَائِزِ هَوَازِنَ وَقَالَ: إِنِّي لَا أَرَى لَهَا فِي الْحَيِّ نَسَبًا، فَعَسَى أَنْ يُعَظِّمَ فِدَاؤُهَا، فَامْتَنَعَ مِنْ رَدِّهَا بِسِتِّ قَلَائِصَ، فَقَالَ أَبُو صُرَدَ: خَلِّهَا عَنْكَ، فَوَاَللَّهِ مَا فُوهَا بِبَارِدٍ، وَلَا ثَدْيُهَا بِنَاهِدٍ، وَلَا بَطْنُهَا بِوَالِدٍ، وَلَا زَوْجُهَا بِوَاحِدٍ، وَلَا دَرُّهَا بِمَاغِدٍ، فَرَدَّهَا بِسِتِّ قَلَائِصَ، ثُمَّ إِنَّ عُيَيْنَةَ لَقِيَ الْأَقْرَعَ فَشَكَا إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّكَ مَا

أَخَذْتَهَا بَيْضَاءَ غَرِيرَةً وَلَا نَصْفَاءَ وَثِيرَةً، وَكَانَ فِي السَّبْيِ الشَّيْمَاءُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى أُخْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَعَنَّفَ بِهَا إِلَى أَنْ أَتَتْهُ وَهِيَ تَقُولُ: أَنَا أُخْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَيْهِ قَالَتْ لَهُ: أَنَا أُخْتُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَمَا عَلَامَةُ ذَلِكَ"؟ فَقَالَتْ: عَضَّةٌ عَضَضْتَنِيهَا وَأَنَا مُتَوَرِّكَتُكَ، فَعَرَفَ الْعَلَامَةَ وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ وَأَجْلَسَهَا عَلَيْهِ، وَخَيَّرَهَا بَيْنَ الْمُقَامِ عِنْدَهُ مُكَرَّمَةً أَوِ الرُّجُوعِ إِلَى قَوْمِهَا مُمَتَّعَةً، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمَتِّعَهَا وَيَرُدَّهَا إِلَى قَوْمِهَا، فَفَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَذَلِكَ قَبْلَ وُرُودِ الْوَفْدِ وَرَدِّ السَّبْيِ؛ فَأَعْطَاهَا غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: محكل، وَجَارِيَةً فَزَوَّجَتْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ، فَفِيهِمْ مَنْ نَسْلِهِمَا بَقِيَّةٌ.

---

1 حسن: رواه أبو داود في كتاب الجهاد "2694"، والنسائي في كتاب الهبة "3688"، وأحمد "6997"، وحسنه الشيخ الألباني.

আমরা নিশ্চয়ই আপনার অফুরন্ত অনুগ্রহের জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ... আর আজকের এই দিনের পর আমরা তা আমাদের নিকট পাথেয় হিসেবে সঞ্চয় করে রাখব।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমাদের নিকট তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও নারীরা অধিক প্রিয়, নাকি তোমাদের ধন-সম্পদ?"

তারা বলল: "আপনি আমাদের সম্পদ এবং আমাদের সম্মান ও বংশমর্যাদার মধ্যে ইখতিয়ার দিয়েছেন; বরং আপনি আমাদের সন্তান ও নারীদের আমাদের নিকট ফিরিয়ে দিন, কারণ তাঁরাই আমাদের নিকট অধিক প্রিয়।" তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "আমার এবং বনী আব্দুল মুত্তালিবের অংশে যা আছে, তা তোমাদের জন্য উৎসর্গ করা হলো।"

কুরাইশগণ বলল: "আমাদের অংশে যা আছে তা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য।" আনসারগণও বলল: "আমাদের যা আছে তা আল্লাহর রাসূলের জন্য।" কিন্তু আকরা ইবনে হাবিস বলল: "আমি এবং বনী তামীম এতে রাজি নই।" উয়াইনা ইবনে হিসন বলল: "আমি এবং বনী ফাযারা এতে রাজি নই।" আব্বাস ইবনে মিরদাস আস-সুলামী বলল: "আমি এবং বনী সুলাইম এতে রাজি নই।" তখন বনী সুলাইম গোত্রের লোকেরা বলে

উঠল: "আমাদের অংশে যা আছে তা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য।" আব্বাস ইবনে মিরদাস বনী সুলাইমকে লক্ষ্য করে বলল: "তোমরা আমাকে দুর্বল ও অপদস্থ করলে।" এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমাদের মধ্যে যারা এই যুদ্ধবন্দীদের ওপর নিজের অধিকার বজায় রাখতে চাও, তারা প্রতিটি বন্দীর বিনিময়ে ছয়টি করে তরুণ উট পাবে। সুতরাং তোমরা এই লোকদের সন্তান ও নারীদের ফিরিয়ে দাও।" ১.

অতঃপর তারা বন্দীদের ফিরিয়ে দিল। উয়াইনা ইবনে হিসন হাওয়াযিন গোত্রের এক বৃদ্ধা নারীকে গ্রহণ করেছিল এবং মনে মনে বলেছিল: "আমি গোত্রের মধ্যে তার উচ্চ বংশীয় মর্যাদা দেখছি, আশা করা যায় তার মুক্তিপণ অনেক বড় হবে।" তাই সে ছয়টি উটের বিনিময়ে তাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন আবু সুরাদ তাকে লক্ষ্য করে বলল: "একে ছেড়ে দাও; আল্লাহর কসম, তার মুখ শীতল নয়, তার স্তন উন্নত নয়, তার গর্ভ সন্তান ধারণকারী নয়, তার স্বামীও অদ্বিতীয় কেউ নয় এবং তার দুগ্ধও পর্যাপ্ত নয়।" অতঃপর সে তাকে ছয়টি উটের বিনিময়ে ফিরিয়ে দিল। এরপর উয়াইনা আকরা ইবনে হাবিসের সাথে দেখা করে তার কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেন: "তুমি তো তাকে সুন্দরী ও সরলা কিশোরী হিসেবে পাওনি, আবার মাঝবয়সী হৃষ্টপুষ্ট ও নরম হিসেবেও পাওনি।" আর বন্দীদের মধ্যে হারিস ইবনে আব্দুল উযযার কন্যা শায়মাও ছিল, যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুধবোন। তার সাথে রূঢ় আচরণ করা হচ্ছিল, একপর্যায়ে সে রাসূলের কাছে এসে বলল: "আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুধবোন।" যখন সে তাঁর কাছে পৌঁছাল, তখন বলল: "আমি আপনার বোন।" আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এর চিহ্ন বা প্রমাণ কী?" সে বলল: "আপনি আমাকে একবার কামড় দিয়েছিলেন যখন আমি আপনাকে আমার কোমরে বহন করছিলাম।" তিনি সেই চিহ্ন চিনতে পারলেন এবং নিজের চাদর বিছিয়ে তাকে সেখানে বসালেন। তিনি তাকে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে তাঁর কাছে থেকে যাওয়ার অথবা উপঢৌকন নিয়ে নিজ কওমের কাছে ফিরে যাওয়ার স্বাধীনতা দিলেন। তিনি উপঢৌকন গ্রহণ করে নিজ কওমের কাছে ফিরে যাওয়াকেই পছন্দ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করলেন; আর এটি ছিল প্রতিনিধি দলের আগমন এবং বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার আগের ঘটনা। তিনি তাকে 'মাকহুল' নামক একজন গোলাম এবং একজন দাসী দান করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁদের একে অপরের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁদের বংশধরদের অবশিষ্টাংশ এখনও তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান।

---

১. হাসান: আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ (২৬৯৪); নাসায়ি, কিতাবুল হিবা (৩৬৮৮); আহমদ (৬৯৯৭); শায়খ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

(ص: 214)الأحكام السلطانية للماوردي

وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مَعَ الْأَحْكَامِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْهُ سِيرَةٌ يَجِبُ أَنْ يَتَّبِعَهَا الْوُلَاةُ فَلِذَلِكَ اسْتَوْفَيْنَاهُ.

وَإِذَا كَانَ فِي السَّبَايَا ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ بَطَلَ نِكَاحُهُنَّ بِالسَّبْيِ، سَوَاءٌ سُبِيَ أَزْوَاجُهُنَّ مَعَهُنَّ أَمْ لَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ سُبِينَ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ فَهُنَّ عَلَى النِّكَاحِ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ مِنْهُنَّ ذَاتُ زَوْجٍ قَبْلَ حُصُولِهَا فِي السَّبْيِ فَهِيَ حُرَّةٌ، وَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَإِذَا قَسَمَ السَّبَايَا فِي الْغَانِمِينَ حَرُمَ وَطْؤُهُنَّ حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ إِنْ كُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ، أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ إِنْ كُنَّ حَوَامِلَ.

رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِسَبْيِ هَوَازِنَ فَقَالَ: "أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ" 1.

وَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْرَزُوهُ لَمْ يَمْلِكُوهُ، وَكَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ أَرْبَابِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنْ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ رُدَّ عَلَى مَالِكِهِ مِنْهُمْ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَدْ مَلَكَهُ الْمُشْرِكُونَ إِذَا غَلَبُوا عَلَيْهِ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ أَمَةً وَدَخَلَ سَيِّدُهَا الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا، وَلَوْ كَانَتْ أَرْضًا أَسْلَمَ عَنْهَا الْمُتَغَلِّبُ عَلَيْهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا، وَإِذَا غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ كَانُوا أَحَقَّ بِهِ مِنْ مَالِكِهِ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَدْرَكَهُ مَالِكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهَا كَانَ مَالِكُهُ أَحَقَّ بِثَمَنِهِ، وَغَانِمُهُ أَحَقَّ

بِعَيْنِهِ، وَيَجُوزُ شِرَاءُ أَوْلَادِ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْهُمْ كَمَا يَجُوزُ سَبْيُهُمْ، وَيَجُوزُ شِرَاءُ أَوْلَادِ أَهْلِ الْعَهْدِ مِنْهُمْ وَلَا يَجُوزُ سَبْيُهُمْ.

وَيَجْرِي عَلَى مَا غَنِمَهُ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ فِي أَخْذِ خُمُسِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ: لَا يُؤْخَذُ خُمُسُهُ حَتَّى يَكُونُوا سَرِيَّةً، وَاخْتَلَفُوا فِي السَّرِيَّةِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: السَّرِيَّةُ أَنْ يَكُونُوا عَدَدًا مُمْتَنِعًا، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: السَّرِيَّةُ تِسْعَةٌ فَصَاعِدًا؛ لِأَنَّ سَرِيَّةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ كَانَتْ تِسْعَةً، وَهَذَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ إلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ سَرِيَّةً وَحْدَهُ فَقَتَلَهُ، وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ وَآخَرَ مَعَهُ سَرِيَّةً.

وَإِذَا أَسْلَمَ الْأَبَوَانِ كَانَ إسْلَامًا لِصِغَارِ أَوْلَادِهِمَا مِنْ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ، وَلَا يَكُونُ إسْلَامًا لِلْبَالِغَيْنِ مِنْهُمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَالِغُ مَجْنُونًا، وَقَالَ مَالِكٌ: يَكُونُ إسْلَامُ الْأَبِ إسْلَامًا لَهُمْ، وَلَا

---

1 صحيح: رواه أبو داود في كتاب النكاح "2157"، والدارمي في كتاب الطلاق "2295"، وصحَّحه الشيخ الألباني.

এই বিবরণীতে যে সকল বিধান আহরণ করা হয়েছে তার পাশাপাশি এমন এক কর্মপন্থা বিদ্যমান যা শাসকদের অনুসরণ করা আবশ্যক; তাই আমরা তা সবিস্তারে আলোচনা করেছি। যুদ্ধবন্দী নারীদের মধ্যে যদি বিবাহিত নারী থাকে, তবে বন্দী হওয়ার মাধ্যমে তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে; তাদের স্বামীরা তাদের সাথে বন্দী হোক বা না হোক। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন: যদি তারা স্বামীদের সাথে বন্দী হয়, তবে তারা বিবাহের ওপরই বহাল থাকবে। আর যদি তাদের মধ্যকার কোনো বিবাহিত নারী বন্দী হওয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে স্বাধীন এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। যখন গনীমতের অধিকারীদের মাঝে যুদ্ধবন্দীদের বণ্টন করা হয়, তখন এক ঋতুস্রাবের মাধ্যমে গর্ভমুক্ত হওয়া (ইস্তিবরা) নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস করা হারাম, যদি তারা ঋতুবতী হয়; আর যদি তারা গর্ভবতী হয় তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাওয়াযিন গোত্রের যুদ্ধবন্দীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: "সাবধান! কোনো গর্ভবতী নারীর সাথে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত সহবাস করা যাবে না, এবং গর্ভবতী নয় এমন নারীর সাথে ঋতুবতী না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা যাবে না।" ১।

মুশরিকরা মুসলিমদের যে সকল সম্পদ দখল করে তাদের ভূখণ্ডে নিয়ে যায়, তারা সেগুলোর মালিক হয় না। বরং সেগুলো মুসলিম মালিকদের মালিকানাতেই অবশিষ্ট থাকে। যদি মুসলিমরা পুনরায় সেগুলো গনীমত হিসেবে লাভ করে, তবে তা কোনো বিনিময় ছাড়াই পূর্ববর্তী মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন: মুশরিকরা যখন তা দখল করে নেয়, তখন তারা এর মালিক হয়ে যায়। এমনকি যদি তা কোনো দাসী হয় এবং তার মুসলিম মনিব যুদ্ধরত ভূখণ্ডে (দারুল হারব) প্রবেশ করে, তবে তার সাথে সহবাস করা মনিবের জন্য হারাম হয়ে যাবে। আর যদি তা কোনো ভূমি হয় এবং দখলদার ব্যক্তি সেই ভূমির ওপর ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে-ই এর অধিক হকদার হবে। আর যদি মুসলিমরা তা পুনরায় গনীমত হিসেবে লাভ করে, তবে মূল মালিকের চেয়ে গনীমত লাভকারীরাই এর বেশি হকদার হবে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন: যদি গনীমত বণ্টনের আগে মালিক তা ফিরে পায়, তবে সে-ই এর অধিক হকদার। আর যদি বণ্টনের পরে পায়, তবে মালিক এর মূল্যের হকদার হবে এবং গনীমত লাভকারী মূল সম্পদের হকদার হবে। হারবী তথা যুদ্ধরত কাফিরদের সন্তানদের তাদের থেকে ক্রয় করা বৈধ, যেমনটা তাদের বন্দী করা বৈধ। আর চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের (আহলুল আহদ) সন্তানদের তাদের থেকে ক্রয় করা বৈধ, তবে তাদের বন্দী করা বৈধ নয়।

এক বা দুইজন ব্যক্তি যা গনীমত হিসেবে লাভ করে, তার ওপরও পঞ্চমাংশ (খুমুস) গ্রহণের ক্ষেত্রে গনীমতের বিধান প্রযোজ্য হবে। ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর দুই সাথী (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) বলেন: যতক্ষণ তারা একটি ক্ষুদ্র বাহিনী (সারিয়্যাহ) না হবে, ততক্ষণ খুমুস নেওয়া হবে না। 'সারিয়্যাহ' বা ক্ষুদ্র বাহিনীর সংজ্ঞা নিয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ বলেন: সারিয়্যাহ হলো এমন সংখ্যা যারা নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন: সারিয়্যাহ হলো নয়জন বা তার বেশি; কারণ আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.)-এর সারিয়্যাহ ছিল নয়জনের। তবে অধিকাংশ ফকীহর নিকট এটি গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একাকী আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.)-কে সারিয়্যাহ হিসেবে খালিদ ইবনে সুফিয়ান আল-হুযালির কাছে

পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি তাকে হত্যা করেছিলেন। এছাড়া তিনি আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরি (রা.)-কে অন্য একজনের সাথে সারিয়্যাহ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।
যখন পিতা-মাতা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাদের নাবালক সন্তানদের (পুত্র ও কন্যা) ইসলাম গ্রহণ হিসেবেও তা গণ্য হবে। তবে সাবালকদের ক্ষেত্রে তা ইসলাম গ্রহণ হিসেবে গণ্য হবে না, যদি না সাবালক ব্যক্তি পাগল হয়। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন: পিতার ইসলাম গ্রহণ সন্তানদের ইসলাম গ্রহণ হিসেবে গণ্য হবে, তবে...

---

১ সহীহ: আবু দাউদ 'নিকাহ' অধ্যায়ে (২১৫৭) এবং দারেমি 'তালাক' অধ্যায়ে (২২৯৫) বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

(ص: 215)الأحكام السلطانية للماوردي

يَكُونُ إِسْلَامُ الْأَطْفَالِ بِأَنْفُسِهِمْ إِسْلَامًا وَلَا رِدَّتُهُمْ رِدَّةً، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِسْلَامُ الطِّفْلِ إِسْلَامٌ وَرِدَّتُهُ رِدَّةٌ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ وَيُمَيِّزُ، لَكِنْ لَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَكُونُ إِسْلَامُ الطِّفْلِ إِسْلَامًا وَلَا تَكُونُ رِدَّتُهُ رِدَّةً، وَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ مَعْنٍ عَنْهُ: إِنْ عَرَفَ نَفْسَهُ صَحَّ إِسْلَامُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا لَمْ يَصِحَّ.

فصل:

وَأَمَّا الْأَرَضُونَ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَتُقْسَمُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا مُلِكَتْ عَنْوَةً وَقَهْرًا حَتَّى فَارَقُوهَا بِقَتْلٍ أَوْ أَسْرٍ أَوْ جَلَاءٍ؛ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهَا بَعْدَ اسْتِيلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه إِلَى أَنَّهَا تَكُونُ غَنِيمَةً كَالْأَمْوَالِ تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، إِلَّا أَنْ يَطِيبُوا نَفْسًا بِتَرْكِهَا، فَتُوقَفُ عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ مَالِكٌ: تَصِيرُ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ غُنِمَتْ، وَلَا يَجُوزُ قَسْمُهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْإِمَامُ فِيهَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ قِسْمَتِهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ، فَتَكُونُ

أَرْضًا عُشْرِيَّةً، أَوْ يُعِيدُهَا إِلَى أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ بِخَرَاجٍ يَضْرِبُهُ عَلَيْهَا فَتَكُونُ أَرْضَ خَرَاجٍ، وَيَكُونُ الْمُشْرِكُونَ بِهَا أَهْلَ ذِمَّةٍ، أَوْ يَقِفُهَا عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَصِيرُ هَذِهِ الْأَرْضُ دَارَ إِسْلَامٍ، سَوَاءٌ سَكَنَهَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ أُعِيدَ إِلَيْهَا الْمُشْرِكُونَ لِمِلْكِ الْمُسْلِمِينَ لَهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنْزِلَ عَنْهَا لِلْمُشْرِكِينَ لِئَلَّا تَصِيرَ دَارَ حَرْبٍ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْهَا: مَا مُلِكَ مِنْهُمْ عَفْوًا لِانْجِلَائِهِمْ عَنْهَا خَوْفًا، فَتَصِيرُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا وَقْفًا، وَقِيلَ: بَلْ تَصِيرُ وَقْفًا حَتَّى يَقِفَهَا الْإِمَامُ لَفْظًا، وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا خَرَاجًا يَكُونُ أُجْرَةً لِرِقَابِهَا تُؤْخَذُ مِمَّنْ عُومِلَ عَلَيْهَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ، وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ خَرَاجِهَا وَأَعْشَارِ زُرُوعِهَا وَثِمَارِهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الثِّمَارُ مِنْ نَخْلٍ كَانَتْ فِيهَا وَقْتَ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا، فَتَكُونُ تِلْكَ النَّخْلُ وَقْفًا مَعَهَا لَا يَجِبُ فِي ثَمَرِهَا عُشْرٌ، وَيَكُونُ الْإِمَامُ فِيهَا مُخَيَّرًا بَيْنَ وَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا أَوْ الْمُسَاقَاةِ عَلَى ثَمَرَتِهَا، وَيَكُونُ مَا اُسْتُؤْلِفَ غَرْسُهُ مِنَ النَّخْلِ مَعْشُورًا وَأَرْضُهُ خَرَاجًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ، وَيَسْقُطُ الْعُشْرُ بِالْخَرَاجِ، وَتَصِيرُ هَذِهِ الْأَرْضُ دَارَ إِسْلَامٍ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ هَذِهِ الْأَرْضِ وَلَا رَهْنِهَا، وَيَجُوزُ بَيْعُ مَا اُسْتُحْدِثَ فِيهَا مِنْ نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهَا صُلْحًا عَلَى أَنْ تُقَرَّ فِي أَيْدِيهِمْ بِخَرَاجٍ يُؤَدُّونَهُ عَنْهَا، فَهَذَا

শিশুদের নিজে থেকে ইসলাম গ্রহণ করা ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে, কিন্তু তাদের ধর্মত্যাগ (রিদ্দাহ) ধর্মত্যাগ হিসেবে গণ্য হবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেন: শিশুর ইসলাম গ্রহণ ইসলাম হিসেবে গণ্য এবং তার ধর্মত্যাগও ধর্মত্যাগ হিসেবে গণ্য যদি সে বুদ্ধিমান ও পার্থক্য করার যোগ্য হয়, তবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। আবু ইউসুফ বলেন: শিশুর ইসলাম গ্রহণ ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে কিন্তু তার ধর্মত্যাগ ধর্মত্যাগ হিসেবে গণ্য হবে না। ইমাম মালিক থেকে মানের বর্ণনায় এসেছে: সে যদি নিজের সত্তাকে চিনতে পারে তবে তার ইসলাম গ্রহণ সঠিক হবে, আর যদি না চেনে তবে সঠিক হবে না।

পরিচ্ছেদ:

আর যেসব ভূমির ওপর মুসলমানরা আধিপত্য লাভ করে, সেগুলো তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথমত: যা শক্তি প্রয়োগ ও বিজয়ের মাধ্যমে অধিকৃত হয়েছে, এমনকি শত্রুপক্ষ মৃত্যু, বন্দিত্ব অথবা দেশান্তরের মাধ্যমে তা ত্যাগ করেছে। মুসলমানদের আধিপত্যের পর এর বিধান নিয়ে ফকিহগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মনে করেন, এগুলো সম্পদের মতো গনিমত হিসেবে গণ্য হবে যা যুদ্ধজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, যদি না তারা স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করে। সেক্ষেত্রে তা মুসলমানদের জনকল্যাণে সংরক্ষিত রাখা হবে। ইমাম মালিক বলেন: গনিমত হওয়ার সাথে সাথেই তা মুসলমানদের জন্য ওয়াকফে পরিণত হবে এবং যুদ্ধজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করা জায়েজ হবে না। আবু হানিফা বলেন: ইমামের এক্ষেত্রে এখতিয়ার থাকবে এটি যুদ্ধজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করার—তখন তা উশরি ভূমি হবে; অথবা তিনি এটি খেরাজ নির্ধারণপূর্বক মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দেবেন—তখন তা খেরাজি ভূমি হবে এবং সেখানকার মুশরিকরা জিম্মি হিসেবে গণ্য হবে; অথবা তিনি তা সকল মুসলমানের জন্য ওয়াকফ করে দেবেন। এমতাবস্থায় এই ভূমি দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে, চাই সেখানে মুসলমানরা বসবাস করুক বা মুসলমানদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে মুশরিকদের সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এটি মুশরিকদের অনুকূলে স্থায়ীভাবে ছেড়ে দেওয়া জায়েজ হবে না যাতে তা দারুল হারব না হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার: যা তাদের থেকে বিনা যুদ্ধে অর্জিত হয়েছে, কারণ তারা ভয়ে তা ত্যাগ করে চলে গেছে। এর ওপর আধিপত্য লাভের সাথে সাথেই তা ওয়াকফে পরিণত হবে। কেউ কেউ বলেছেন: বরং ইমাম মৌখিকভাবে ওয়াকফ ঘোষণা করা এবং এর ওপর খেরাজ নির্ধারণ করা পর্যন্ত তা ওয়াকফ হবে না। এই খেরাজ হবে সেই ভূমির মূল মালিকানার ভাড়া স্বরূপ, যা সেখানে চাষাবাদকারী মুসলিম বা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে। এতে খেরাজ এবং ফসল ও ফলের উশর (দশমাংশ) উভয়টিই একত্রিত করা হবে। তবে যদি আধিপত্য লাভের সময় সেখানে বিদ্যমান খেজুর গাছ থেকে ফল উৎপন্ন হয়, তবে সেই খেজুর গাছগুলোও ভূমির সাথে ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হবে এবং এর ফলের ওপর উশর ওয়াজিব হবে না। ইমাম এক্ষেত্রে খেরাজ নির্ধারণ অথবা ফলের ওপর মুসাকাত চুক্তির নির্ধারণের ব্যাপারে এখতিয়ারপ্রাপ্ত হবেন। আর যেসব খেজুর গাছ নতুন করে রোপণ করা হবে তার ফলে উশর প্রযোজ্য হবে এবং ভূমির ওপর খেরাজ বহাল থাকবে। আবু হানিফা বলেন: উশর এবং খেরাজ একত্রে প্রযোজ্য হয় না, বরং খেরাজের কারণে উশর রহিত হয়ে যায়। এই ভূমি দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে। এই ভূমি বিক্রি করা বা বন্ধক রাখা জায়েজ নয়, তবে সেখানে নতুন করে রোপণ করা খেজুর বা গাছ বিক্রি করা জায়েজ।

তৃতীয় প্রকার: সন্ধির মাধ্যমে আধিপত্য লাভ করা, এই শর্তে যে ভূমিটি তাদের হাতেই থাকবে এবং তারা এর জন্য খেরাজ প্রদান করবে। এটি...

(ص: 216)الأحكام السلطانية للماوردي

عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ مِلْكَ الْأَرْضِ لَنَا، فَتَصِيرُ بِهَذَا الصُّلْحِ وَقْفًا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ؛ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا رَهْنُهَا، وَيَكُونُ الْخَرَاجُ أُجْرَةً لَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ بِإِسْلَامِهِمْ، فَيُؤْخَذُ خَرَاجُهَا إِذَا انْتَقَلَتْ إِلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ صَارُوا بِهَذَا الصُّلْحِ أَهْلَ عَهْدٍ، فَإِنْ بَذَلُوا الْجِزْيَةَ عَلَى رِقَابِهِمْ جَازَ إِقْرَارُهُمْ فِيهَا عَلَى التَّأْبِيدِ، وَإِنْ مَنَعُوا الْجِزْيَةَ لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهَا، وَلَمْ يَرَوْا فِيهَا إِلَّا الْمُدَّةَ الَّتِي يُقَرُّ فِيهَا أَهْلُ الْعَهْدِ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَلَا يُجَاوِزُونَ السَّنَةَ، وَفِي إِقْرَارِهِمْ فِيهَا مَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالسِّتَّةِ وَجْهَانِ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يُصَالِحُوا عَلَى أَنَّ الْأَرْضِينَ لَهُمْ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ يُؤَدُّونَهُ عَنْهَا، وَهَذَا الْخَرَاجُ فِي حُكْمِ الْجِزْيَةِ مَتَى أَسْلَمُوا سَقَطَ عَنْهُمْ، وَلَا تَصِيرُ أَرْضُهُمْ دَارَ إِسْلَامٍ وَتَكُونُ دَارَ عَهْدٍ، وَلَهُمْ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا، وَإِذَا انْتَقَلَتْ إِلَى مُسْلِمٍ لَمْ يُؤْخَذْ خَرَاجُهَا، وَيُقَرُّونَ فِيهَا مَا أَقَامُوا عَلَى الصُّلْحِ، وَلَا تُؤْخَذُ جِزْيَةُ رِقَابِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ فِي غَيْرِ دَارِ الْإِسْلَامِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَدْ صَارَتْ دَارُهُمْ بِالصُّلْحِ دَارَ إِسْلَامٍ، وَصَارُوا بِهِ أَهْلَ ذِمَّةٍ تُؤْخَذُ جِزْيَةُ رِقَابِهِمْ، فَإِنْ نَقَضُوا الصُّلْحَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ مَعَهُمْ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِمْ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله إِلَى أَنَّهَا إِنْ مُلِّكَتْ أَرْضُهُمْ عَلَيْهِمْ فَهِيَ عَلَى حُكْمِهَا، وَإِنْ لَمْ تُمَلَّكْ صَارَتِ الدَّارُ حَرْبًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ فِي دَارِهِمْ مُسْلِمٌ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ دَارِ

الْحَرْبِ بَلَدٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَهِيَ دَارُ إِسْلَامٍ يَجْرِي عَلَى أَهْلِهَا حُكْمُ الْبُغَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ مُسْلِمٌ وَلَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ دَارِ الْحَرْبِ بَلَدٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَهِيَ دَارُ حَرْبٍ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: قَدْ صَارَتْ دَارَ حَرْبٍ فِي الْأَمْرَيْنِ كِلَيْهِمَا.

এটি দুই প্রকারের হতে পারে:

প্রথমটি হলো: তাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করা যে, ভূমির মালিকানা আমাদের (মুসলিমদের) থাকবে। এই সন্ধির ফলে ভূমিটি দারুল ইসলামের ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হবে; এর ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধক রাখা বৈধ হবে না। এর খরাজ (ভূমি-কর) ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে যা তাদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমেও রহিত হবে না। ভূমিটি যখন অন্য কোনো মুসলিমের নিকট হস্তান্তরিত হবে, তখনো এর খরাজ গ্রহণ করা হবে। এই সন্ধির মাধ্যমে তারা চুক্তিবদ্ধ জাতি (আহলে আহদ) হিসেবে গণ্য হবে। তারা যদি তাদের মাথাপিছু জজিয়া প্রদান করে, তবে তাদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়া বৈধ হবে। আর যদি তারা জজিয়া দিতে অস্বীকার করে, তবে তাদের ওপর তা বাধ্যতামূলক করা হবে না; এবং চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত সময়ের বেশি তাদের সেখানে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না, যা হলো চার মাস এবং তা এক বছরের অধিক হবে না। তবে চার থেকে ছয় মাসের মধ্যবর্তী সময়কাল অবস্থানের অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারটি হলো: এই শর্তে সন্ধি করা যে, ভূমি তাদের মালিকানাতেই থাকবে এবং এর ওপর নির্দিষ্ট খরাজ ধার্য করা হবে যা তারা আদায় করবে। এই খরাজ জজিয়ার বিধানভুক্ত হবে; ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তা তাদের ওপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। তাদের ভূমি দারুল ইসলাম হবে না, বরং তা 'দারুল আহদ' (চুক্তিবদ্ধ অঞ্চল) হিসেবে গণ্য হবে। তাদের জন্য সেই ভূমি বিক্রয় ও বন্ধক রাখা বৈধ। ভূমিটি কোনো মুসলিমের নিকট হস্তান্তরিত হলে তার খরাজ নেওয়া হবে না। তারা যতক্ষণ সন্ধির শর্ত পালন করবে, ততক্ষণ তাদেরকে সেখানে রাখা হবে। তাদের থেকে মাথাপিছু জজিয়া নেওয়া হবে না; কারণ তারা দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন: সন্ধির ফলে তাদের ভূখণ্ড দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে এবং তারা এর মাধ্যমে 'জিম্মি' হিসেবে গণ্য হয়েছে যাদের থেকে মাথাপিছু জজিয়া নেওয়া হবে। যদি তারা সন্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, তবে তাদের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) মনে করেন যে, ভূমি যদি তাদের মালিকানাধীন থাকে

তবে তা তার পূর্বাবস্থায় বহাল থাকবে, আর যদি মালিকানা না থাকে তবে ভূখণ্ডটি ‘দারুল হরব’ হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: যদি তাদের ভূখণ্ডে কোনো মুসলিম থাকে অথবা তাদের ও দারুল হরবের মাঝখানে মুসলিমদের কোনো শহর থাকে, তবে তা দারুল ইসলাম এবং তাদের ওপর বিদ্রোহীদের বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি তাদের মাঝে কোনো মুসলিম না থাকে এবং তাদের ও দারুল হরবের মাঝে মুসলিমদের কোনো শহর না থাকে, তবে তা দারুল হরব। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ বলেন: উভয় অবস্থাতেই তা দারুল হরবে পরিণত হবে।

(ص: 217)الأحكام السلطانية للماوردي

فَصْلٌ:

وَأَمَّا الْأَمْوَالُ الْمَنْقُولَةُ فَهِيَ الْغَنَائِمُ الْمَأْلُوفَةُ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُهَا عَلَى رَأْيِهِ، وَلَمَّا تَنَازَعَ فِيهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَوْمَ بَدْرٍ جَعَلَهَا اللَّهُ عز وجل مِلْكًا لِرَسُولِهِ يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ، وَرَوَى أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الْأَنْفَالِ -يَعْنِي: عَنْ قَوْله تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال:1] .

فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: فِينَا أَصْحَابُ بَدْرٍ أُنْزِلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِي النَّفْلِ فَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقُنَا، فَانْتَزَعَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ أَيْدِينَا، فَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِهِ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى سَوَاءٍ، وَاصْطَفَى مِنْ غَنِيمَةِ بَدْرٍ سَيْفَهُ ذَا الْفِقَارِ وَكَانَ سَيْفَ مُنَبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَأَخَذَ مِنْهَا سَهْمَهُ وَلَمْ يُخَمِّسْهَا إِلَى أَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل بَعْدَ بَدْرٍ قَوْله تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] .

فَتَوَلَّى اللَّهُ سُبْحَانَهُ قِسْمَةَ الْغَنَائِمِ كَمَا تَوَلَّى قِسْمَةَ الصَّدَقَاتِ، فَكَانَ أَوَّلُ غَنِيمَةٍ خَمَّسَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ بَدْرٍ غَنِيمَةَ بَنِي قَيْنُقَاعِ.

وَإِذَا جُمِعَتِ الْغَنَائِمُ لَمْ تُقْسَمْ مَعَ قِيَامِ الْحَرْبِ حَتَّى تَنْجَلِيَ؛ لِيُعْلَمَ بِانْجِلَائِهَا تَحَقُّقُ الظَّفَرِ وَاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ، وَلِئَلَّا يَتَشَاغَلَ الْمُقَاتِلَةُ بِهَا فَيُهْزَمُوا، فَإِذَا انْجَلَتِ الْحَرْبُ كَانَ تَعْجِيلُ قِسْمَتِهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَجَوَازُ تَأْخِيرِهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَبِحَسَبِ مَا يَرَاهُ أَمِيرُ الْجَيْشِ مِنِ الصَّلَاحِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْسِمَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَيَقْسِمُهَا حِينَئِذٍ، فَإِذَا أَرَادَ قِسْمَتَهَا بَدَأَ بِأَسْلَابِ الْقَتْلَى، فَأَعْطَى كُلَّ قَاتِلٍ سَلَبَ قَتِيلِهِ، سَوَاءٌ شَرَطَ الْإِمَامُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَشْرِطْهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: إِنْ شَرَطَ لَهُمْ ذَلِكَ اسْتَحَقُّوهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ لَهُمْ كَانَ غَنِيمَةً فَيَشْتَرِكُونَ فِيهَا، وَقَدْ نَادَى مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ حِيَازَةِ الْغَنَائِمِ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ" 1.

وَالشَّرْطُ مَا تَقَدَّمَ الْغَنِيمَةَ لَا مَا تَأَخَّرَ عَنْهَا، وَقَدْ أَعْطَى أَبُو قَتَادَةَ أَسْلَابَ قَتَلَاهُ وَكَانُوا

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب فرض الخمس "3142"، ومسلم في كتاب الجهاد والسير "1751".

পরিচ্ছেদ:

আর অস্থাবর সম্পত্তির কথা বলতে গেলে তা হলো সুপরিচিত গনিমত বা যুদ্ধের লব্ধ সম্পদ। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর নিজস্ব বিবেচনানুসারে তা বণ্টন করতেন। যখন বদরের দিন মুহাজির ও আনসারগণ এ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হলেন, তখন মহান আল্লাহ তা তাঁর রাসূলের নিরঙ্কুশ অধিকারে অর্পণ করলেন যেন তিনি তা যেখানে ইচ্ছা প্রদান করেন। আবু উমামাহ আল-বাহিলি (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি উবাদাহ বিন সামিত (রা.)-কে আনফাল সম্পর্কে—অর্থাৎ মহান আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে—জিজ্ঞেস করেছিলাম: "তারা আপনাকে আনফাল (অতিরিক্ত সম্পদ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, আনফাল হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। সুতরাং তোমরা

আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধন করো" [সূরা আনফাল: ১]।

অতঃপর উবাদাহ বিন সামিত (রা.) বললেন: আমাদের বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের বিষয়েই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যখন আমরা গনিমতের মালের বণ্টন নিয়ে মতভেদে জড়িয়ে পড়েছিলাম এবং এ বিষয়ে আমাদের আচরণ রূঢ় হয়ে উঠেছিল। তখন মহান আল্লাহ আমাদের হাত থেকে তা উঠিয়ে নিয়ে তাঁর রাসূলের নিকট সমর্পণ করেন। এরপর তিনি (সা.) তা মুসলমানদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করেন। তিনি বদরের গনিমত থেকে তাঁর যুলফিকার নামক তলোয়ারটি বেছে নিয়েছিলেন, যা মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজের তলোয়ার ছিল। তিনি সেখান থেকে নিজের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করেন এবং বদরের পর মহান আল্লাহর এই বাণী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এর এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) পৃথক করেননি: "তোমরা জেনে রেখো যে, যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গনিমত লাভ করো, তার এক-পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, রাসূলের আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য" [সূরা আনফাল: ৪১]।

অতঃপর মহান আল্লাহ স্বয়ং গনিমতের বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, যেমনটি তিনি সদকা বণ্টনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বপ্রথম বনু কায়নুকার যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমত থেকে এক-পঞ্চমাংশ বা খুমুস পৃথক করেছিলেন।

গনিমতগুলো সংগ্রহ করা হলেও যুদ্ধ অব্যাহত থাকা অবস্থায় তা বণ্টন করা হবে না যতক্ষণ না যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে; যাতে সমাপ্তির মাধ্যমে বিজয় সুনিশ্চিত হওয়া এবং সম্পদের মালিকানা স্থিতিশীল হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়, এবং যাতে যোদ্ধারা তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে পরাজিত হওয়ার ঝুঁকিতে না পড়ে। যখন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে, তখন দারুল হরবেই (যুদ্ধক্ষেত্রে) তা দ্রুত বণ্টন করা জায়েজ, আবার দারুল ইসলামে ফেরা পর্যন্ত তা বিলম্বিত করাও জায়েজ। এটি সেনাপ্রধানের নিকট জনকল্যাণার্থে যা সমীচীন মনে হয় সে অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন: দারুল ইসলামে না পৌঁছানো পর্যন্ত দারুল হরবে তা বণ্টন করা বৈধ নয়; বরং সেখানে পৌঁছানোর পরই তা বণ্টন করতে হবে। যখন গনিমত বণ্টন করতে চাওয়া হবে, তখন নিহত শত্রুদের ব্যবহৃত সরঞ্জাম (সালাব) প্রদানের মাধ্যমে শুরু করতে হবে। ইমাম এ সংক্রান্ত পূর্বশর্ত দিন বা না দিন, প্রত্যেক হত্যাকারীকে তার নিহত শত্রুর সরঞ্জাম দিয়ে দিতে হবে। তবে ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (র.) বলেন: যদি ইমাম এ মর্মে শর্তারোপ করেন তবেই তারা তা পাবে, অন্যথায় তা সাধারণ গনিমত হিসেবে গণ্য হবে এবং সবাই তাতে অংশীদার হবে। গনিমত হস্তগত করার পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর

ঘোষক ঘোষণা করেছিলেন: "যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে, তার সরঞ্জাম সেই হত্যাকারীর প্রাপ্য।"
আর এই শর্ত অবশ্যই গনিমত হস্তগত হওয়ার আগে হতে হবে, পরে নয়। আবু কাতাদা (রা.)-কে তাঁর নিহত শত্রুদের সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছিল এবং তারা ছিল...

---

১. সহীহ: বুখারি এটি 'খুমুস' অধ্যায়ে (৩১৪২) এবং মুসলিম 'জিহাদ ও সিয়ার' অধ্যায়ে (১৭৫১) বর্ণনা করেছেন।

(ص: 218)الأحكام السلطانية للماوردي

عِشْرِينَ قَتِيلًا، وَالسَّلَبُ مَا كَانَ عَلَى الْمَقْتُولِ مِنْ لِبَاسٍ يَقِيهِ، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ سِلَاحٍ يُقَاتِلُ بِهِ، وَمَا كَانَ تَحْتَهُ مِنْ فَرَسٍ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ مَا فِي الْمُعَسْكَرِ مِنْ أَمْوَالِهِ سَلَبًا، وَهَلْ يَكُونُ مَا فِي وَسَطِهِ مِنْ مَالٍ، وَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ حَقِيبَةٍ سَلَبًا؟ فِيهِ قَوْلَانِ، وَلَا يُخَمَّسُ السَّلَبُ وَقَالَ مَالِكٌ: يُؤْخَذُ خُمُسُهُ لِأَهْلِ الْخُمُسِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ إِعْطَاءِ السَّلَبِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيمَا يَصْنَعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَالصَّحِيحُ مِنَ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بَعْدَ السَّلَبِ بِإِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ جَمِيعِ الْغَنِيمَةِ، فَيَقْسِمُهُ بَيْنَ أَهْلِ الْخُمُسِ عَلَى خَمْسَةٍ كَمَا قَالَ عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} الْآيَةَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ: يُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ: لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: يُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلَّهِ تَعَالَى يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْكَعْبَةِ.

وَأَهْلُ الْخُمُسِ فِي الْغَنِيمَةِ هُمْ أَهْلُ الْخُمُسِ فِي الْفَيْءِ، فَيَكُونُ سَهْمٌ مِنَ الْخُمُسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيُصْرَفُ بَعْدَهُ لِلْمَصَالِحِ.

وَالسَّهْمُ الثَّانِي: لِذَوِي الْقُرْبَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ.
وَالسَّهْمُ الثَّالِثُ: لِلْيَتَامَى.
وَالسَّهْمُ الرَّابِعُ: لِلْمَسَاكِينِ.
وَالسَّهْمُ الْخَامِسُ: لِبَنِي السَّبِيلِ.
ثُمَّ يَرْضَخُ بَعْدَ الْخُمُسِ لِأَهْلِ الرَّضْخِ؛ وَهُمْ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي مُقَدَّمُونَ عَلَى الْخُمُسِ، وَأَهْلُ الرَّضْخِ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ مِنْ حَاضِرِي الْوَقْعَةِ مِنَ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالزَّمْنَى، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ يَرْضَخُ لَهُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِحَسَبِ عَنَائِهِمْ، وَلَا يَبْلُغُ بِرَضِيخِ أَحَدٍ مِنْهُمْ سَهْمَ فَارِسٍ وَلَا رَاجِلٍ، فَلَوْ زَالَ نَقْصُ أَهْلِ الرَّضْخِ بَعْدَ حُضُورِ الْوَقْعَةِ بِعِتْقِ الْعَبْدِ وَبُلُوغِ الصَّبِيِّ وَإِسْلَامِ الْكَافِرِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ أَسْهَمَ لَهُمْ وَلَمْ يَرْضَخْ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا رَضَخَ لَهُمْ وَلَمْ يُسْهِمْ.
ثُمَّ تُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَالرَّضْخِ مِنْهَا بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، وَهُمُ الرِّجَالُ الْأَحْرَارُ الْمُسْلِمُونَ الْأَصِحَّاءُ، يَشْتَرِكُ فِيهَا مَنْ قَاتَلَ وَمَنْ لَمْ يُقَاتِلْ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَوْنٌ لِلْقَاتِلِ وَرِدْءٌ لَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا} [آل عمران: 167] عَلَى تَأْوِيلَيْنِ:

বিশ জন নিহত ব্যক্তি। 'সালাব' (নিহতের ব্যক্তিগত সরঞ্জাম) হলো নিহত ব্যক্তির পরিহিত শরীর রক্ষাকারী পোশাক বা বর্ম, তার সাথে থাকা যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র এবং তার অধীনে থাকা ঘোড়া যা চড়ে সে যুদ্ধ করছিল। তবে শিবিরের অভ্যন্তরে রক্ষিত তার কোনো সম্পদ 'সালাব' হিসেবে গণ্য হবে না। তার কোমরে থাকা অর্থ বা তার সম্মুখে থাকা মালবাহী থলে 'সালাব' হিসেবে গণ্য হবে কি না—এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে। সালাব থেকে এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) গ্রহণ করা হবে না; তবে ইমাম মালিক বলেন: এর এক-পঞ্চমাংশ খুমুসের প্রাপকদের জন্য নেওয়া হবে। সালাব বণ্টনের কাজ সমাপ্ত হলে এর পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। দুটি অভিমতের মধ্যে সঠিক হলো, সালাব পৃথক করার পর সমগ্র গনীমত (রণলব্ধ সম্পদ) থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করার কাজ শুরু করতে হবে। এরপর তা খুমুসের হকদারদের মধ্যে পাঁচ

ভাগে বণ্টন করতে হবে, যেমনটি মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "আর জেনে রাখো যে, যুদ্ধে তোমরা যা কিছু লাভ করেছ, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের জন্য..." (আয়াতাংশ)। ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ এবং মালিক বলেন: এক-পঞ্চমাংশ তিন ভাগে বিভক্ত হবে—এতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের জন্য।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: এক-পঞ্চমাংশ ছয় ভাগে বিভক্ত হবে। একটি ভাগ মহান আল্লাহর জন্য, যা কাবার কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

গনীমতের এক-পঞ্চমাংশের প্রাপক তারাই, যারা 'ফায়' (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এর এক-পঞ্চমাংশের হকদার। সুতরাং খুমুসের একটি অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্ধারিত হবে এবং তাঁর পরে তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে।

দ্বিতীয় অংশ: বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের নিকটাত্মীয়দের জন্য।

তৃতীয় অংশ: এতিমদের জন্য।

চতুর্থ অংশ: মিসকিনদের জন্য।

পঞ্চম অংশ: মুসাফিরদের জন্য।

অতঃপর এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর 'রাদখ' (অনির্ধারিত অনুদান) প্রাপকদের তা প্রদান করা হবে। অন্য একটি মতে, তাদের বিষয়টি খুমুসের আগেই সম্পন্ন করতে হবে। রাদখ-এর প্রাপক হলেন তারা, যারা যুদ্ধে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কোনো অংশের (সহম) অধিকারী নন; যেমন—দাস, নারী, শিশু এবং দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থ ব্যক্তি। জিম্মিরাও গনীমত থেকে তাদের শ্রম ও অবদানের ভিত্তিতে রাদখ লাভ করবেন। তবে তাদের কারো রাদখ-এর পরিমাণ একজন অশ্বারোহী বা পদাতিক যোদ্ধার পূর্ণ অংশের সমান হবে না। যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার পর যদি রাদখ প্রাপকদের সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে যায়—যেমন দাসের মুক্তি লাভ, শিশুর সাবালকত্ব প্রাপ্তি কিংবা কাফিরের ইসলাম গ্রহণ—তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে এমনটি ঘটলে তাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করা হবে এবং রাদখ দেওয়া হবে না। আর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এমনটি ঘটলে তারা রাদখ পাবেন এবং নির্দিষ্ট অংশ পাবেন না।

এরপর খুমুস এবং রাদখ বের করার পর অবশিষ্ট গনীমত যুদ্ধে উপস্থিত মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, যারা হলেন স্বাধীন, মুসলিম ও সুস্থ পুরুষ। যারা সরাসরি যুদ্ধ করেছেন এবং যারা করেননি—উভয় পক্ষই এতে অংশীদার হবেন; কারণ যে যুদ্ধ করেনি সে যুদ্ধকারীর জন্য সাহায্যকারী এবং প্রয়োজনকালে শক্তির যোগানদাতা। মহান আল্লাহর বাণী: "তাদের বলা

হয়েছিল, এসো আল্লাহর পথে লড়াই করো কিংবা প্রতিরক্ষা করো" [আলে ইমরান: ১৬৭]—এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দুটি অভিমত রয়েছে:

أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ تَكْثِيرُ السَّوَادِ، وَهَذَا قَوْلُ السُّدِّيِّ وَابْنِ جُرَيْجٍ.
وَالثَّانِي: إِنَّهُ الْمُرَابَطَةُ عَلَى الْخَيْلِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَوْنٍ، وَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ قِسْمَةَ الِاسْتِحْقَاقِ، لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَى خِيَارِ الْقَاسِمِ وَوَالِي الْجِهَادِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: مَالُ الْغَنِيمَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، إِنْ شَاءَ قَسَمَهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ تَسْوِيَةً وَتَفْضِيلًا، وَإِنْ شَاءَ أَشْرَكَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدِ الْوَقْعَةَ، وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ" 1 مَا يَدْفَعُ هَذَا الْمَذْهَبَ، وَإِذَا اخْتَصَّ بِهَا مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَجَبَ أَنْ يَفْضُلَ الْفَارِسُ عَلَى الرَّاجِلِ لِفَضْلِ عَنَائِهِ، وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِ تَفْضِيلِهِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْطَى الْفَارِسُ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلُ سَهْمًا وَاحِدًا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُعْطَى الْفَارِسُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَالرَّاجِلُ سَهْمًا وَاحِدًا، وَلَا يُعْطَى سَهْمُ الْفَارِسِ إِلَّا لِأَصْحَابِ الْخَيْلِ خَاصَّةً، وَيُعْطَى رُكَّابُ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْجِمَالِ وَالْفِيَلَةِ سِهَامَ الرَّجَّالَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عِتَاقِ الْخَيْلِ وَهُجَّانِهَا، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ:لَا يُسْهَمُ إِلَّا لِلْعِتَاقِ السَّوَابِقِ، وَإِذَا شَهِدَ الْوَقْعَةَ بِفَرَسٍ أَسْهَمَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ، وَإِذَا خَلَّفَهُ فِي الْعَسْكَرِ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ، وَإِذَا حَضَرَ الْوَقْعَةَ بِأَفْرَاسٍ لَمْ يُسْهِمْ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُسْهِمُ لِفَرَسَيْنِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ.
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: يُسْهِمُ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَلَا سَهْمَ لِمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَمَنْ مَاتَ فَرَسُهُ بَعْدَ حُضُورِ الْوَقْعَةِ أَسْهَمَ لَهُ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَهَا لَمْ يُسْهِمْ لَهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ هُوَ الْمَيِّتَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ مَاتَ هُوَ

---

1 صحيح موقوفًا: رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه "33225"، وعبد الرزاق في مصنفه "9689"، وابن أبي الجعد في مسنده "588"، والطبراني في الكبير "8203"، موقوفًا على قول عمر بن الخطاب، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد "5/ 340"، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

وقال الحافظ ابن حجر: حديث: "الغنيمة لمن شهد الوقعة"، والمشهور وقفه على عمر، أما المرفوع فلم أجده، وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث طارق بن شهاب أنَّ أهل البصرة غزوا نهاوند، فأمدهم أهل الكوفة القصة، وفيها فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الواقعة، وأخرجه البيهقي وقال: هذا هو الصحيح من قول عمر، وأخرجه ابن عدي من قول علي، ويعارضه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبانًا على سرية من المدينة قِبَل نجد، فقَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها إلى أن قال: فلم يقسم لهم، وهو في البخاري وأبي داود، وثبت في الصحيحين عن أبي موسى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَسَم لجعفر والأشعريين، قال: ولم يسهم لغيرنا. [الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2/ 120] .

তন্মধ্যে একটি হলো: এটি সৈন্যদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা; আর এটি সুদ্দী ও ইবনে জুরাইজের অভিমত।

এবং দ্বিতীয়টি হলো: এটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে সীমান্ত পাহারা দেওয়া (মুরবাতা); আর এটি ইবনে আওনের অভিমত। গনীমতের মাল তাদের মধ্যে অধিকারের ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে; এখানে বণ্টনকারী বা জিহাদের আমীরের ইচ্ছার কোনো অবকাশ থাকবে না।

ইমাম মালিক বলেন: গনীমতের সম্পদ রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে গনীমত লাভকারীদের মধ্যে সমভাবে অথবা কাউকে কমবেশি করে বণ্টন করতে পারেন, আবার চাইলে তাদের সাথে এমন ব্যক্তিদেরও অংশীদার করতে পারেন যারা যুদ্ধে উপস্থিত ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী: "গনীমত কেবল তার জন্য যে

যুদ্ধে উপস্থিত ছিল" ১—এই অভিমতকে খণ্ডন করে। আর যখন গনীমত কেবল যুদ্ধে উপস্থিতদের জন্য নির্দিষ্ট হলো, তখন পদাতিক সৈন্যের তুলনায় অশ্বারোহী সৈন্যের কষ্ট ও অবদানের আধিক্যের কারণে তাকে বেশি অংশ প্রদান করা ওয়াজিব। তবে এই অতিরিক্ত অংশের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: অশ্বারোহীকে দুই অংশ এবং পদাতিককে এক অংশ দেওয়া হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন: অশ্বারোহীকে তিন অংশ এবং পদাতিককে এক অংশ দেওয়া হবে। অশ্বারোহীর অংশ কেবল ঘোড়ার মালিকদেরই প্রদান করা হবে। খচ্চর, গাধা, উট এবং হাতির আরোহীদের পদাতিকের সমান অংশ দেওয়া হবে। উন্নত জাতের ঘোড়া এবং সাধারণ জাতের ঘোড়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সুলাইমান ইবনে রাবী'আ বলেন: কেবল দ্রুতগামী উন্নত জাতের ঘোড়ার জন্যই অংশ বরাদ্দ করা হবে। যদি কেউ ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধে উপস্থিত হয়, তবে তার জন্য অংশ বরাদ্দ করা হবে—যদিও সে তার ওপর চড়ে যুদ্ধ না করে থাকে। তবে যদি সে ঘোড়াটিকে সৈন্যশিবিরে রেখে আসে, তবে তার জন্য অংশ বরাদ্দ করা হবে না। আর যদি কেউ একাধিক ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধে উপস্থিত হয়, তবে কেবল একটি ঘোড়ার জন্যই অংশ দেওয়া হবে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ এই মত পোষণ করেন। আর ইমাম আবু ইউসুফ বলেন: দুটি ঘোড়া পর্যন্ত অংশ দেওয়া হবে এবং ইমাম আওযায়ীও একই কথা বলেছেন।

ইবনে উইয়াইনা বলেন: যতটুকু প্রয়োজন তার জন্য অংশ দেওয়া হবে, আর যার প্রয়োজন নেই তার জন্য কোনো অংশ নেই। যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার পর যদি কারো ঘোড়া মারা যায়, তবে তাকে তার অংশ দেওয়া হবে; কিন্তু যদি যুদ্ধের আগে মারা যায় তবে অংশ দেওয়া হবে না। অনুরূপভাবে যদি সে স্বয়ং মৃত্যুবরণ করে (তবে তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম)। ইমাম আবু হানিফা বলেন: যদি সে নিজে মারা যায়...

---

১. সহীহ মাউকুফ: এটি ইবনে আবি শায়বা তার 'মুসান্নাফ' (৩৩২২৫), আবদুর রাজ্জাক তার 'মুসান্নাফ' (৯৬৮৯), ইবনে আবি জা'দ তার 'মুসনাদ' (৫৮৮) এবং তাবারানি 'আল-কাবীর' (৮২০৩) গ্রন্থে উমর ইবনুল খাত্তাবের উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল-হাইসামি 'মাজমাউয যাওয়াইদ' (৫/৩৪০) গ্রন্থে এটি উল্লেখ করে বলেছেন: তাবারানি এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: "গনীমত কেবল তার জন্য যে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল" হাদীসটি উমরের উক্তি (মাউকুফ) হিসেবেই প্রসিদ্ধ। মারফু হিসেবে আমি এটি পাইনি। আর মাউকুফ

বর্ণনাটি ইবনে আবি শায়বা ও তাবারানি তারেক ইবনে শিহাবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, বসরার অধিবাসীরা নাহাওয়ান্দে যুদ্ধ করতে গেলে কুফার অধিবাসীরা তাদের সাহায্য করতে আসে—এভাবে পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে রয়েছে যে, উমর (রা.) লিখে পাঠিয়েছিলেন: "গনীমত কেবল তার জন্য যে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল।" বায়হাকী এটি বর্ণনা করে বলেছেন: এটিই উমরের সহীহ উক্তি। ইবনে আদী এটি আলীর উক্তি হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। তবে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস এর পরিপন্থী হতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবানকে মদীনা থেকে নজদের দিকে একটি সামরিক অভিযানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন, তিনি খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছালেন... সেখানে বর্ণিত আছে যে তিনি তাদের জন্য গনীমত বণ্টন করেননি। এটি বুখারী ও আবু দাউদে রয়েছে। তবে সহীহাইন-এ আবু মুসা থেকে প্রমাণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফর ও আশআরিদের মধ্যে গনীমত বণ্টন করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন: তিনি আমাদের ব্যতীত অন্য কাউকে অংশ দেননি। [আদ-দিরায়াহ ফী তাখরীজি আহাদিসিল হিদায়াহ: ২/ ১২০]।

(ص: 220)الأحكام السلطانية للماوردي

وَفَرَسُهُ بَعْدَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ أَسْهَمَ لَهُ، وَإِذَا جَاءَهُمْ مَدَدٌ قَبْلَ انْجِلَاءِ الْحَرْبِ شَارَكُوهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ، وَإِنْ جَاءُوا بَعْدَ انْجِلَائِهَا لَمْ يُشَارِكُوهُمْ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ قَبْلَ انْجِلَائِهَا شَارَكُوهُمْ، وَيُسَوَّى فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ بَيْنَ مُرْتَزِقَةِ الْجَيْشِ وَبَيْنَ الْمُتَطَوِّعَةِ إِذَا شَهِدَ جَمِيعُهُمُ الْوَقْعَةَ.

وَإِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ كَانَ مَا غَنِمُوهُ مَخْمُوسًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُخَمَّسُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا يَمْلِكُ مَا غَنِمُوهُ.

وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ، أَوْ كَانَ مَأْسُورًا مَعَهُمْ، فَأَطْلَقُوهُ وَأَمَّنُوهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَغْتَالَهُمْ فِي نَفْسٍ وَلَا مَالٍ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَمِّنَهُمْ، وَقَالَ دَاوُد: يَجُوزُ أَنْ يَغْتَالَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْمِنُوهُ، فَيَلْزَمُهُ الْمُوَادَعَةُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الِاغْتِيَالُ.

وَإِذَا كَانَ فِي الْمُقَاتِلَةِ مَنْ ظَهَرَ عَنَاؤُهُ وَأَثَّرَ بَلَاؤُهُ لِشَجَاعَتِهِ وَإِقْدَامِهِ أَخَذَ سَهْمَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ أُسْوَةَ غَيْرِهِ، وَزِيدَ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ بِحَسَبِ عَنَائِهِ، فَإِنَّ لِذِي السَّابِقَةِ وَالْإِقْدَامِ حَقًّا لَا يُضَاعُ؛ قَدْ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ رَايَةٍ عَقَدَهَا فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَتَوَجَّهَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ إِلَى أَدْنَى مَاءٍ بِالْحِجَازِ، وَكَانَ أَمِيرُ الْمُشْرِكِينَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ فَرَمَى سَعْدٌ وَنَكَى؛ كَانَ أَوَّلَ مَنْ رَمَى سَهْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ "مِنَ الْوَافِرِ":

أَلَا هَلْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي ... حَمَيْتُ صَحَابَتِي بِصُدُورِ نَبْلِي

أَذُودُ بِهَا أَوَائِلَهُمْ ذِيَادًا ... بِكُلِّ حَزُونَةٍ وَبِكُلِّ سَهْلِ

فَمَا يُعْتَدُّ رَامٍ فِي عَدُوٍّ ... بِسَهْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَبْلِي

وَذَلِكَ أَنَّ دِينَكَ دِينُ صِدْقٍ ... وَذُو حَقٍّ أَتَيْتَ بِهِ وَعَدْلِ

فَلَمَّا قَدِمَ اعْتَذَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِيهِ.

এবং দারুল হরবে প্রবেশের পর যদি তার ঘোড়া আসে, তবে তার জন্য অংশ বরাদ্দ করা হবে। যদি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে তাদের নিকট কোনো সাহায্যকারী বাহিনী পৌঁছে, তবে তারা গনীমতের অংশীদার হবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তারা পৌঁছালে অংশীদার হবে না। ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন: যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে যদি তারা দারুল হরবে প্রবেশ করে, তবে তারা অংশীদার হবে। গনীমত বণ্টনের ক্ষেত্রে নিয়মিত বেতনভুক্ত সৈন্য এবং স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা হবে, যদি তারা সকলে যুদ্ধে উপস্থিত থাকে।

যদি কোনো দল ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তারা যা গনীমত হিসেবে লাভ করবে তা খুমুস (পঞ্চমাংশ) প্রদানের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম আবু হানিফা (র.)

বলেন: তার খুমুস বের করতে হবে না। হাসান (বসরী) বলেন: তারা যা গনীমত লাভ করেছে তার মালিক হবে না।

যখন কোনো মুসলিম আমান বা নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করবে অথবা তাদের হাতে বন্দী ছিল এবং পরবর্তীতে তারা তাকে মুক্তি দিয়ে নিরাপত্তা প্রদান করেছে, তখন জান কিংবা মালের ক্ষেত্রে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা তার জন্য জায়েজ হবে না। বরং তার ওপর কর্তব্য হলো তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করা। দাউদ (জাহেরী) বলেন: তাদের জান ও মালের ক্ষতিসাধন করা বৈধ, যতক্ষণ না তারা তার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। তখন তার ওপর সন্ধি বজায় রাখা আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করা হারাম হয়ে যায়।

যদি যোদ্ধাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে যার কঠোর পরিশ্রম প্রকাশ পায় এবং তার সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তবে সে অন্যের ন্যায় গনীমত হতে নিজ অংশ গ্রহণ করবে এবং তার পরিশ্রম অনুযায়ী জনস্বার্থের খাত (মাসালিহ) হতে তাকে অতিরিক্ত প্রদান করা হবে। কেননা অগ্রগামিতা ও সাহসিকতার অধিকার বিনষ্ট করা যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম ঝাণ্ডা তাঁর চাচা হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পর হিজরি দ্বিতীয় সনের রবিউল আউয়াল মাসে উবাইদাহ ইবনুল হারিসের জন্য বেঁধে দিয়েছিলেন। তাঁর সাথে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস হিজাজের নিকটবর্তী জলাশয়ের দিকে অগ্রসর হলেন। মুশরিকদের সেনাপতি ছিল ইকরিমাহ ইবনে আবু জাহল। সেখানে সাদ (রা.) তীর নিক্ষেপ করলেন এবং শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি করলেন। তিনিই ছিলেন আল্লাহর পথে প্রথম তীর নিক্ষেপকারী এবং তিনি (ওয়াফির ছন্দে) বললেন:

সাবধান! আল্লাহর রাসূলের নিকট কি সংবাদ পৌঁছেছে যে, আমি আমার তীরের অগ্রভাগ দিয়ে আমার সঙ্গীদের রক্ষা করেছি? … আমি এর মাধ্যমে বন্ধুর ও সমতল প্রতিটি প্রান্তর থেকে তাদের অগ্রবর্তী দলকে বিতাড়িত করেছি।

আমি এর মাধ্যমে প্রতিটি বন্ধুর ও সমতল ভূমি থেকে তাদের অগ্রবর্তী দলকে বিতাড়িত করেছি। … প্রতিটি বন্ধুর পথে এবং প্রতিটি সমতল ময়দানে।

হে আল্লাহর রাসূল! আমার পূর্বে কোনো তীরন্দাজ শত্রুর প্রতি তীর নিক্ষেপ করার গৌরব অর্জন করেনি। … আমার আগে আর কেউ শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেনি।

আর তা এই জন্য যে, আপনার দ্বীন সত্য এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য ও ন্যায়বিচারপূর্ণ। … এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য ও ইনসাফপূর্ণ।

অতঃপর তিনি যখন ফিরে এলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই অগ্রগামিতা ও অবদানের জন্য তাঁর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করলেন।

(ص: 221)الأحكام السلطانية للماوردي

الباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج"

وَالْجِزْيَةُ1 وَالْخَرَاجُ حَقَّانِ أَوْصَلَ اللَّهُ سبحانه وتعالى الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ: يَجْتَمِعَانِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، ثُمَّ تَتَفَرَّعُ أَحْكَامُهُمَا.

فَأَمَّا الْأَوْجُهُ الَّتِي يَجْتَمِعَانِ فِيهَا فَأَحَدُهَا: إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَأْخُوذٌ عَنْ مُشْرِكٍ صَغَارًا لَهُ وَذِمَّةً2، وَالثَّانِي: إِنَّهُمَا مَا لَا فَيْءٍ؛ يُصْرَفَانِ فِي أَهْلِ الْفَيْءِ.

وَالثَّالِثُ: إِنَّهُمَا يَجِبَانِ بِحُلُولِ الْحَوْلِ وَلَا يُسْتَحَقَّانِ قَبْلَهُ.

وَأَمَّا الْأَوْجُهُ الَّتِي يَفْتَرِقَانِ فِيهَا:

فَأَحَدُهَا: إِنَّ الْجِزْيَةَ نَصٌّ، وَإِنَّ الْخَرَاجَ اجْتِهَادٌ.

وَالثَّانِي: إِنَّ أَقَلَّ الْجِزْيَةِ مُقَدَّرٌ بِالشَّرْعِ وَأَكْثَرَهَا مُقَدَّرٌ بِالِاجْتِهَادِ، وَالْخَرَاجُ أَقَلُّهُ وَأَكْثَرُهُ مُقَدَّرٌ بِالِاجْتِهَادِ.

وَالثَّالِثُ: إِنَّ الْجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مَعَ بَقَاءِ الْكُفْرِ، وَتُقَسَّطُ بِحُدُوثِ الْإِسْلَامِ؛ وَالْخَرَاجُ يُؤْخَذُ مَعَ الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ، فَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الرُّءُوسِ وَاسْمُهَا مُشْتَقٌّ مِنَ الْجَزَاءِ، إِمَّا جَزَاءً عَلَى كُفْرِهِمْ؛ لِأَخْذِهَا مِنْهُمْ صَغَارًا، وَإِمَّا جَزَاءً عَلَى أَمَانِنَا لَهُمْ؛ لِأَخْذِهَا مِنْهُمْ رِفْقًا.

وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] .

أَمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ {الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ} فَأَهْلُ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانُوا مُعْتَرِفِينَ بِأَنَّ اللَّهَ

---

1 الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمّة، والجمع جزى؛ كلحية ولحى، قال ابن الدفع: الجزية: الخراج المجعول عليهم، سميت جزية لأنها قضاء لما عليهم؛ أخذًا من قولهم: جزى يجزي إذا قضى. [المطلع: ص 140] .

2 قال النووي: الذمة والعهد والأمان بمعنى الجزية مأخوذ من المجازاة والجزاء؛ لأنها جزاء لكفنا عنهم. [تحرير ألفاظ التنبيه: ص 318] .

ত্রয়োদশ অধ্যায়: জিজিয়া ও খরাজ নির্ধারণ প্রসঙ্গে

জিজিয়া ও খরাজ হলো এমন দুটি পাওনা, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুশরিকদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এ দুটি বিষয় তিনটি দিক থেকে অভিন্ন এবং তিনটি দিক থেকে ভিন্ন; পরবর্তীতে এদের হুকুমসমূহ শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্ত হয়।

যেসব বিষয়ে তারা অভিন্ন, তার প্রথমটি হলো: এ দুটির প্রতিটিই মুশরিকদের থেকে তাদের অবনত অবস্থার প্রকাশ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়টি হলো: এ দুটিই 'ফাই' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) সম্পদ হিসেবে গণ্য; যা 'ফাই'-এর হকদারদের মাঝে ব্যয় করা হয়।

তৃতীয়টি হলো: এ দুটি বছর পূর্ণ হওয়ার পরই ওয়াজিব বা আবশ্যক হয় এবং এর আগে তা পাওনা হয় না।

আর যে সব বিষয়ে তারা ভিন্ন:

তার প্রথমটি হলো: জিজিয়া সুনির্দিষ্ট দলীল (নস) দ্বারা প্রমাণিত, আর খরাজ হলো ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয়টি হলো: জিজিয়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ শরিয়ত দ্বারা নির্ধারিত এবং এর সর্বোচ্চ পরিমাণ ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল; পক্ষান্তরে খরাজের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ উভয় পরিমাণই ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়টি হলো: কুফরের উপস্থিতিতে জিজিয়া গ্রহণ করা হয় এবং ইসলাম গ্রহণের ফলে তা রহিত হয়ে যায়; কিন্তু খরাজ কুফর ও ইসলাম উভয় অবস্থাতেই গ্রহণ করা হয়। জিজিয়া মূলত জনপ্রতি ধার্য করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয়েছে 'জাযা' (বিনিময় বা প্রতিদান) শব্দ

থেকে; হয় এটি তাদের কুফরের প্রতিদান স্বরূপ—যেহেতু তা তাদের নিকট থেকে অবনত অবস্থায় গ্রহণ করা হয়, অথবা এটি আমাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রদত্ত নিরাপত্তার প্রতিদান স্বরূপ—যেহেতু তা তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।
এ বিষয়ে মূল ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর বাণী: {তোমরা যুদ্ধ করো আহলে কিতাবদের ওইসব লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; যতক্ষণ না তারা অনুগত হয়ে নিজ হাতে জিজিয়া প্রদান করে।} [সূরা আত-তাওবাহ: ২৯]
মহান আল্লাহর বাণী {যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না} প্রসঙ্গে বলা যায়, আহলে কিতাবগণ যদিও স্বীকার করে যে আল্লাহ...

---

১. জিজিয়া: যা আহলে জিম্মাদের থেকে গ্রহণ করা হয়, এর বহুবচন হলো 'জিযা'; যেমন 'লিহয়া' ও 'লিহা'। ইবনুল দাফ' বলেন: জিজিয়া হলো তাদের ওপর অর্পিত কর (খরাজ); একে জিজিয়া বলা হয় কারণ এটি তাদের ওপর যা ওয়াজিব তা পরিশোধ করা; যা 'জাযা-ইয়াজযি' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ পরিশোধ করা। [আল-মুতলি': পৃ. ১৪০]
২. ইমাম নববী বলেন: জিম্মা, চুক্তি ও নিরাপত্তা—সবই জিজিয়ার সমার্থক। এটি 'মুজাযাত' ও 'জাযা' (বিনিময়) থেকে গৃহীত; কারণ এটি তাদের বিরুদ্ধে আমাদের আক্রমণ থেকে বিরত থাকার বিনিময়। [তাহরিরু আলফাযিত তানবিহ: পৃ. ৩১৮]

(ص: 222)الأحكام السلطانية للماوردي

سُبْحَانَهُ وَاحِدٌ فَيُحْتَمَلُ نَفْيُ هَذَا الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ تَأْوِيلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لَا يُؤْمِنُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْقُرْآنُ.
وَالثَّانِي: لَا يُؤْمِنُونَ بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَ الرَّسُلِ إيمَانٌ بِالْمُرْسِلِ.

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: {وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} يَحْتَمِلُ تَأْوِيلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لَا يَخَافُونَ وَعِيدَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، وَإِنْ كَانُوا مُعْتَرِفِينَ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ.

وَالثَّانِي: لَا يُصَدِّقُونَ بِمَا وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ.

وَقَوْلُهُ: {وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} يَحْتَمِلُ تَأْوِيلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِنَسْخِهِ مِنْ شَرَائِعِهِمْ.

وَالثَّانِي: مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُمْ وَحَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ.

وَقَوْلُهُ: {وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ} فِيهِ تَأْوِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مِنِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ، وَهَذَا قَوْلُ الْكَلْبِيِّ.

وَالثَّانِي: الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

وَقَوْلُهُ: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} فِيهِ تَأْوِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: مِنْ دِينِ أَبْنَاءِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ.

وَالثَّانِي: مِنَ الَّذِينَ بَيْنَهُمُ الْكِتَابُ؛ لِأَنَّهُمْ فِي اتِّبَاعِهِ كَأَبْنَائِهِ.

وقَوْله تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} فِيهِ تَأْوِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: حَتَّى يَدْفَعُوا الْجِزْيَةَ.

وَالثَّانِي: حَتَّى يَضْمَنُوهَا؛ لِأَنَّ بِضَمَانِهَا يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُمْ.

وَفِي الْجِزْيَةِ تَأْوِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّهَا مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي لَا نَعْرِفُ مِنْهَا مَا أُرِيدَ بِهَا إِلَّا أَنْ يَرِدَ بَيَانٌ.

وَالثَّانِي: إِنَّهَا مِنَ الْأَسْمَاءِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَجِبُ إِجْرَاؤُهَا عَلَى عُمُومِهَا، إِلَّا مَا قَدْ خَصَّهُ الدَّلِيلُ.

وَفِي قَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {عَنْ يَدٍ} تَأْوِيلَانِ:

মহান আল্লাহ একক; তাঁর প্রতি এই ঈমান বা বিশ্বাসের অস্বীকৃতি বিষয়ে দুটি ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে:

প্রথমত: তাঁরা মহান আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না।

দ্বিতীয়ত: তাঁরা তাঁর রাসুল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনে না; কারণ রাসুলদের সত্যয়ন করা মূলত প্রেরণকারীর (আল্লাহর) প্রতিই ঈমান রাখা।

আর মহান আল্লাহর বাণী: {এবং পরকালেও (বিশ্বাস করে না)}, এর ব্যাখ্যায় দুটি সম্ভাবনা রয়েছে:

প্রথমত: তাঁরা পরকালের শাস্তির হুঁশিয়ারিকে ভয় পায় না, যদিও তাঁরা সওয়াব ও আযাবের বিষয়টি স্বীকার করে।

দ্বিতীয়ত: মহান আল্লাহ আজাবের যে সব প্রকারের বর্ণনা দিয়েছেন, তা তাঁরা বিশ্বাস করে না।

এবং তাঁর বাণী: {এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন তা তারা হারাম গণ্য করে না}, এরও দুটি ব্যাখ্যা সম্ভব:

প্রথমত: মহান আল্লাহ তাঁদের শরিয়তের যে সকল বিধান রহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন (তা তাঁরা মান্য করে না)।

দ্বিতীয়ত: যা আল্লাহ তাঁদের জন্য হালাল করেছেন অথবা তাঁদের ওপর হারাম করেছেন।

আর তাঁর বাণী: {এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না}, এর ব্যাপারে দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

প্রথমত: রাসুলের আনুগত্য করার বিষয়ে তাওরাত ও ইঞ্জিলে যা বর্ণিত হয়েছে (তা অনুসরণ না করা); এটি কালবী-র মত।

দ্বিতীয়ত: ইসলামে প্রবেশ করা; এটি জমহুর বা অধিকাংশ আলেমের মত।

এবং তাঁর বাণী: {যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে}, এর ব্যাখ্যায় দুটি দিক রয়েছে:

প্রথমত: যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের বংশধরদের দ্বীন থেকে।

দ্বিতীয়ত: যাদের নিকট কিতাব বিদ্যমান; কেননা কিতাব অনুসরণের ক্ষেত্রে তারা যেন তার সন্তানের মতো।

মহান আল্লাহর বাণী: {যতক্ষণ না তারা জিজিয়া প্রদান করে}, এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

প্রথমত: যতক্ষণ না তারা জিজিয়া আদায় করে।

দ্বিতীয়ত: যতক্ষণ না তারা তা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়; কারণ এই নিশ্চয়তা প্রদানের ফলেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক হয়।

জিজিয়া (কর)-এর ক্ষেত্রে দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

প্রথমত: এটি ওই সকল 'মুজমাল' বা অস্পষ্ট শব্দের অন্তর্ভুক্ত, যার উদ্দেশ্য ততক্ষণ স্পষ্ট হয় না যতক্ষণ না এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয়ত: এটি ওই সকল সাধারণ শব্দের অন্তর্ভুক্ত, যা তার ব্যাপকতা অনুযায়ী প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যক, যদি না কোনো দলিল দ্বারা তাকে সীমাবদ্ধ করা হয়।
আর মহান আল্লাহর বাণী: {নতজানু হয়ে/স্বহস্তে}, এর ব্যাখ্যায় দুটি মত রয়েছে:

(ص: 223)الأحكام السلطانية للماوردي

أَحَدُهُمَا: عَنْ غِنًى وَقُدْرَةٍ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ لَنَا فِي أَخْذِهَا مِنْهُمْ يَدًا وَقُدْرَةً عَلَيْهِمْ.
وَفِي قَوْلِهِ: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} تَأْوِيلَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَذِلَّاءَ مُسْتَكِينِيون.
وَالثَّانِي: أَنْ تُجْرَى عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَضَعَ الْجِزْيَةَ عَلَى رِقَابِ مَنْ دَخَلَ فِي الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِيُقَرُّوا بِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَيَلْتَزِمُ لَهُمْ بِبَذْلِهَا حَقَّانِ: أَحَدُهُمَا الْكَفُّ عَنْهُمْ.
وَالثَّانِي: الْحِمَايَةُ لَهُمْ لِيَكُونُوا بِالْكَفِّ آمِنِينَ وَبِالْحِمَايَةِ مَحْرُوسِينَ، رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ: "احْفَظُونِي فِي ذِمَّتِي"1.
وَالْعَرَبُ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ كَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا آخُذُهَا مِنَ الْعَرَبِ لِئَلَّا يَجْرِي عَلَيْهِمْ صَغَارٌ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ مُرْتَدٍّ وَلَا دَهْرِيٍّ وَلَا عَابِدِ وَثَنٍ، وَأَخَذَهَا أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ إِذَا كَانُوا عَجَمًا، وَلَمْ يَأْخُذْهَا مِنْهُمْ إِذَا كَانُوا عَرَبًا، وَأَهْلُ الْكِتَابِ هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَكِتَابُهُمُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ، وَيَجْرِي الْمَجُوسُ مَجْرَاهُمْ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ، وَإِنْ حَرُمَ أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ وَنِكَاحُ نِسَائِهِمْ، وَتُؤْخَذُ مِنَ الصَّابِئِينَ وَالسَّامِرَةِ إِذَا وَافَقُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِي أَصْلِ مُعْتَقِدِهِمْ، وَمَنْ دَخَلَ فِي الْيَهُودِيَّةِ

وَالنَّصْرَانِيَّة قَبْلَ تَبْدِيلِهِمَا أُقِرَّ عَلَى مَا دَانَ بِهِ مِنْهُمَا، وَلَا يُقَرُّ إِنْ دَخَلَ بَعْدَ تَبْدِيلِهِمَا، وَمَنْ جُهِلَتْ حَالَتُهُ أُخِذَتْ جِزْيَتُهُ وَلَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ.

وَمَنِ انْتَقَلَ مِنْ يَهُودِيَّةٍ إِلَى نَصْرَانِيَّةٍ لَمْ يُقَرَّ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَأُخِذَ بِالْإِسْلَامِ، فَإِنْ عَادَ إِلَى دِينِهِ الَّذِي انْتَقَلَ عَنْهُ فَفِي إِقْرَارِهِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ، وَيَهُودُ خَيْبَرَ وَغَيْرُهُمْ فِي الْجِزْيَةِ سَوَاءٌ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ.

وَلَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ إِلَّا عَلَى الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ الْعُقَلَاءِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا عَبْدٍ؛ لِأَنَّهُمْ أَتْبَاعٌ وَذَرَارِيَّ، وَلَوْ تَفَرَّدَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ عَلَى أَنْ تَكُونَ تَبَعًا لِزَوْجٍ أَوْ نَصِيبٍ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهَا جِزْيَةٌ؛ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِرِجَالِ قَوْمِهَا وَإِنْ كَانُوا أَجَانِبَ مِنْهَا، وَلَوْ تَفَرَّدَتْ امْرَأَةٌ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَبَذَلَتْ الْجِزْيَةَ لِلْمَقَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَلْزَمْهَا مَا بَذَلَتْهُ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهَا كَالْهِبَةِ

---

1 لم أقف عليه بهذا اللفظ.

তাদের একটি হলো: সচ্ছলতা ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে।

দ্বিতীয়টি হলো: তারা যেন বিশ্বাস করে যে, তাদের থেকে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের সামর্থ্য ও তাদের ওপর আমাদের আধিপত্য রয়েছে।

আর মহান আল্লাহর বাণী: {এবং তারা হবে লাঞ্ছিত} এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

একটি হলো: তারা হবে হীন ও বিনীত।

দ্বিতীয়টি হলো: তাদের ওপর ইসলামের বিধানাবলী কার্যকর করা হবে। সুতরাং রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর আবশ্যক হলো আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা জিম্মি (আশ্রিত নাগরিক) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাদের ওপর জিজিয়া ধার্য করা; যেন তারা এর মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসের স্বীকৃতি পায়। আর এই জিজিয়া প্রদানের বিনিময়ে তাদের জন্য দুটি অধিকার সাব্যস্ত হয়: তার একটি হলো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা।

দ্বিতীয়টি হলো: তাদের সুরক্ষা প্রদান করা, যাতে তারা আক্রমণ থেকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। নাফে ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ যে কথাটি বলেছিলেন তা হলো: "তোমরা আমার জিম্মি বা আশ্রিতদের ব্যাপারে আমার অঙ্গীকার রক্ষা করো।" ১।

আরবদের থেকে জিজিয়া গ্রহণের বিষয়টি অন্যদের মতোই। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন: আমি আরবদের থেকে তা গ্রহণ করব না, যাতে তাদের ওপর লাঞ্ছনা প্রকাশ না পায়। আর কোনো ধর্মত্যাগী (মুরতাদ), নাস্তিক (দাহরি) এবং মূর্তিপূজক থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা হবে না। তবে ইমাম আবু হানিফা অনারব মূর্তিপূজকদের থেকে তা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তারা আরব হলে তা গ্রহণ করেননি। আর আহলে কিতাব হলো ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়, এবং তাদের কিতাব হলো তাওরাত ও ইঞ্জিল। অগ্নিপূজকদের (মাজুস) থেকে জিজিয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা আহলে কিতাবদের পর্যায়ভুক্ত হবে, যদিও তাদের জবাইকৃত পশুর মাংস ভক্ষণ এবং তাদের নারীদের বিবাহ করা নিষিদ্ধ। আর সাবেয়ি ও সামেরীয়দের থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা হবে যদি তারা তাদের মূল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে একমত পোষণ করে। আর যারা তাওরাত ও ইঞ্জিল বিকৃত হওয়ার পূর্বে ইহুদি বা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদের সেই ধর্ম পালনের অনুমতি দেওয়া হবে। কিন্তু বিকৃতির পর যারা এই ধর্মে প্রবেশ করেছে, তাদের অনুমতি দেওয়া হবে না। আর যার অবস্থা অজ্ঞাত, তার থেকে জিজিয়া নেওয়া হবে কিন্তু তার জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না।

আর যে ব্যক্তি ইহুদি ধর্ম থেকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হবে, বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী তাকে সে অবস্থায় থাকতে দেওয়া হবে না এবং তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হবে। অতঃপর যদি সে পূর্বের ধর্মে ফিরে যায় যেখান থেকে সে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, তবে তাকে সেই ধর্মে বহাল রাখার ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। আর ফকিহগণের সর্বসম্মত মত (ইজমা) অনুযায়ী খায়বরের ইহুদি এবং অন্য ইহুদিরা জিজিয়ার ক্ষেত্রে সমান।

জিজিয়া কেবল স্বাধীন, বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ওপরই আবশ্যক হয়। কোনো নারী, শিশু, পাগল কিংবা ক্রীতদাসের ওপর তা আবশ্যক নয়; কারণ তারা অনুগামী ও আশ্রিত। যদি কোনো নারী একাকী হয় এই ভিত্তিতে যে সে কোনো স্বামী বা আত্মীয়ের অনুগামী, তবে তার থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা হবে না; কারণ সে তার জাতির পুরুষদের অনুগামী, যদিও তারা তার জন্য পরপুরুষ হয়। আর যদি কোনো নারী দারুল হারব (যুদ্ধরত দেশ) থেকে একাকী এসে দারুল ইসলামে বসবাসের জন্য জিজিয়া দিতে চায়, তবে সে যা দিতে চেয়েছে তা তার ওপর আবশ্যক করা হবে না, বরং তা তার পক্ষ থেকে অনুদান হিসেবে গণ্য হবে।

---

১. আমি এই শব্দবিন্যাসে এটি খুঁজে পাইনি।

(ص: 224)الأحكام السلطانية للماوردي

لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا إِنِ امْتَنَعَتْ وَلَزِمَتْ ذِمَّتُهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَبَعًا لِقَوْمِهَا1.

وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ، فَإِنْ زَالَ إِشْكَالُهُ وَبَانَ أَنَّهُ رَجُلٌ أُخِذَ بِهَا فِي مُسْتَقْبَلِ أَمْرِهِ وَمَاضِيهِ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ الْجِزْيَةِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى تَصْنِيفِهِمْ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: أَغْنِيَاءُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَأَوْسَاطٌ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَفُقَرَاءُ يُؤْخَذُ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا؛ فَجَعَلَهَا مُقَدَّرَةَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ، وَمَنَعَ مِنِ اجْتِهَادِ الْوُلَاةِ فِيهَا، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُقَدَّرُ أَقَلُّهَا وَلَا أَكْثَرُهَا، وَهِيَ مَوْكُولَةٌ لِاجْتِهَادِ الْوُلَاةِ فِي الطَّرَفَيْنِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهَا مُقَدَّرَةُ الْأَقَلِّ بِدِينَارٍ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ، وَعِنْدَهُ غَيْرُ مُقَدَّرَةِ الْأَكْثَرِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ الْوُلَاةِ، وَيَجْتَهِدُ رَأْيَهُ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ أَوِ التَّفْضِيلِ بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ، فَإِذَا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ مَعَهَا عَلَى مُرَاضَاةِ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ صَارَتْ لَازِمَةً لِجَمِيعِهِمْ، وَلِأَعْقَابِهِمْ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، وَلَا يَجُوزُ لِوَالٍ بَعْدَهُ أَنْ يُغَيِّرَهُ إِلَى نُقْصَانٍ مِنْهُ أَوْ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ2.

فَإِنْ صُولِحُوا عَلَى مُضَاعَفَةِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ ضُوعِفَتْ كَمَا ضَاعَفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مَعَ تَنُوخٍ وَبَهْرَاءَ وَبَنِي تَغْلِب بِالشَّامِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ؛ لِأَنَّهَا جِزْيَةٌ تُصْرَفُ فِي أَهْلِ الْفَيْءِ، فَخَالَفَتِ الزَّكَاةَ الْمَأْخُوذَةَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ

---

1 ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله؛ لقوله عليه السلام لمعاذ: "ادعهم"، وحرم قتالهم، ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية. [المبدع: 3/ 412] .

2 وقال ابن مفلح من الحنابلة: وتقسم الجزية بينهم، أي: بين أهل الكتاب ومن في معناهم، فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهمًا وهي أربعة دنانير، وعلى المتوسط أربعة وعشرون وهي ديناران، وعلى الفقير اثنا عشر وهي دينار؛ لفعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر وكان كالإجماع، ويجاب عن قوله عليه السلام لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا" بأنّ الفقر كان في أهل اليمن أغلب، ولذلك قيل لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار، قال: جعل ذلك من أجل اليسار، وبأنَّ الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام وليس التقدير واجبًا؛ لأنها وجبت صغارًا وعقوبة، واختلفت باختلافهم ليست عوضًا عن سكنى الدار، وإلّا لوجبت على النساء ومن في معناهن. [المبدع: 3/ 411] .

যদি সে (নারী) অস্বীকার করে এবং তার জিম্মা (চুক্তি) আবশ্যক হয়ে থাকে, তবে তার থেকে তা (জিজয়া) গ্রহণ করা হবে না, যদিও সে তার সম্প্রদায়ের অনুগামী না হয়।১

কোনো অস্পষ্ট লিঙ্গের ব্যক্তি (খুনসা মুশকিল) থেকে জিজয়া গ্রহণ করা হবে না। তবে যদি তার লিঙ্গের অস্পষ্টতা দূর হয় এবং এটি স্পষ্ট হয় যে সে পুরুষ, তবে তার ভবিষ্যৎ এবং অতীতের জন্য তা গ্রহণ করা হবে।

জিজয়ার পরিমাণের বিষয়ে ফকিহগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা তাদেরকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন:

ধনী ব্যক্তি, যাদের থেকে আটচল্লিশ দিরহাম গ্রহণ করা হবে; মধ্যবিত্ত, যাদের থেকে চব্বিশ দিরহাম গ্রহণ করা হবে; এবং দরিদ্র ব্যক্তি, যাদের থেকে বারো দিরহাম গ্রহণ করা হবে। তিনি এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে শাসকদের ইজতিহাদ (বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত) নিষিদ্ধ করেছেন। অন্যদিকে ইমাম মালিক বলেছেন: এর সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই; বরং উভয় ক্ষেত্রে এটি শাসকদের ইজতিহাদের ওপর ন্যস্ত।

ইমাম শাফিঈ মত দিয়েছেন যে, এর সর্বনিম্ন পরিমাণ এক দিনার নির্ধারিত, যার কম করা বৈধ নয়। তাঁর মতে, এর সর্বোচ্চ পরিমাণের কোনো সীমা নেই এবং তা শাসকদের ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল। তিনি সবার মধ্যে সমতা বিধান করবেন অথবা তাদের অবস্থা অনুযায়ী তারতম্য করার বিষয়ে ইজতিহাদ করবেন। যখন তিনি তাদের নেতৃবৃন্দের সম্মতির ভিত্তিতে জিজয়ার চুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন তা তাদের সকলের জন্য এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যুগ যুগ ধরে বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। পরবর্তী কোনো শাসকের জন্য তা কমিয়ে বা বাড়িয়ে পরিবর্তন করা বৈধ হবে না।২

যদি তাদের সাথে তাদের ওপর সদকা দ্বিগুণ করার শর্তে সন্ধি করা হয়, তবে তা দ্বিগুণ করা হবে; যেমনটি উমর ইবনুল খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন) শামের তানুখ, বাহরা এবং বনু তাগলিব গোত্রের সাথে করেছিলেন। আর এটি নারী ও শিশুদের থেকে গ্রহণ করা হবে না; কারণ এটি জিজয়া যা ফাই-ভোগীদের (রাষ্ট্রীয় কোষাগারের হকদার) মধ্যে ব্যয় করা হয়। তাই এটি নারী ও শিশুদের থেকে গৃহীত জাকাতের বিপরীত। অতঃপর যদি তিনি এ দুটির মধ্যে এবং...

---

১ যখন তারা তাদের ওপর ওয়াজিব হক আদায় করবে, তখন তা গ্রহণ করা আবশ্যক হবে; কেননা নবি (সা.) মুআজকে বলেছিলেন: "তাদেরকে আহ্বান করো", এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তখন হারাম। আর যে ব্যক্তি বছর পূর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে, তার থেকে জিজয়া রহিত হয়ে যায়। [আল-মুবদি: ৩/ ৪১২]

২ হাম্বলি মাজহাবের ইবনে মুফলিহ বলেছেন: জিজয়া তাদের মধ্যে অর্থাৎ আহলে কিতাব ও তাদের সমপর্যায়ভুক্তদের মধ্যে বিন্যস্ত করা হবে। ধনিদের ওপর আটচল্লিশ দিরহাম ধার্য করা হবে যা চার দিনারের সমান, মধ্যবিত্তদের ওপর চব্বিশ দিরহাম যা দুই দিনার, এবং দরিদ্রদের ওপর বারো দিরহাম যা এক দিনার। কারণ উমর (রা.) সাহাবিদের উপস্থিতিতে এটি করেছিলেন এবং কেউ এর প্রতিবাদ করেননি, ফলে এটি ইজমার মতো সাব্যস্ত হয়েছে। মুআজ (রা.)-কে বলা নবি (সা.)-এর বাণী "প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক থেকে এক দিনার গ্রহণ করো" এর উত্তরে বলা হয় যে, ইয়ামেনের অধিবাসীদের মধ্যে দারিদ্র্যের হার বেশি ছিল। একারণেই মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, শামের অধিবাসীদের ওপর কেন চার দিনার এবং ইয়ামেনবাসীদের ওপর কেন এক দিনার ধার্য করা হয়েছে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: স্বচ্ছলতার পার্থক্যের কারণে এমনটি করা হয়েছে। তাছাড়া জিজয়ার বিষয়টি ইমামের ইজতিহাদের ওপর

নির্ভরশীল এবং এর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা ওয়াজিব নয়; কারণ এটি হীনতা প্রকাশ ও শাস্তি স্বরূপ ওয়াজিব হয়েছে। এটি তাদের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এবং এটি দেশে বসবাসের বিনিময় নয়। যদি এটি বিনিময়ে হতো, তবে নারী এবং তাদের সমপর্যায়ভুক্তদের ওপরও তা ওয়াজিব হতো। [আল-মুবদি: ৩/ ৪১১]

(ص: 225)الأحكام السلطانية للماوردي

الْجِزْيَةِ أُخِذَتَا مَعًا، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَحْدَهَا كَانَتْ جِزْيَةً إِذَا لَمْ تَنْقُصْ فِي السَّنَةِ عَنْ دِينَارٍ.

وَإِذَا صُولِحُوا عَلَى ضِيَافَةِ مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُدِّرَتْ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَأُخِذُوا بِهَا لَا يُزَادُونَ عَلَيْهَا، كَمَا صَالَحَ عُمَرُ نَصَارَى الشَّامِ عَلَى ضِيَافَةِ مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِمَّا يَأْكُلُونَ، وَلَا يُكَلِّفُهُمْ ذَبْحَ شَاةٍ وَلَا دَجَاجَةٍ، وَتَبْيِيتِ دَوَابِّهِمْ مِنْ غَيْرِ شَعِيرٍ، وَجَعَلَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ دُونَ الْمُدُنِ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِمُ الضِّيَافَةَ وَمُضَاعَفَةَ الصَّدَقَةِ، فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمْ فِي زَرْعٍ وَلَا ثَمَرَةٍ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ إِضَافَةُ سَائِلٍ وَلَا سَابِلٍ.

وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ شَرْطَانِ: مُسْتَحَقٌّ وَمُسْتَحَبٌّ، أَمَّا الْمُسْتَحَقُّ فَسِتَّةُ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ لَا يَذْكُرُوا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى بِطَعْنٍ فِيهِ وَلَا تَحْرِيفٍ لَهُ.

وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَذْكُرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَكْذِيبٍ لَهُ وَلَا ازْدِرَاءٍ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يَذْكُرُوا دِينَ الْإِسْلَامِ بِذَمٍّ لَهُ وَلَا قَدْحٍ فِيهِ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ لَا يُصِيبُوا مُسْلِمَةً بِزِنًا وَلَا بِاسْمِ نِكَاحٍ.

وَالْخَامِسُ: أَنْ لَا يَفْتِنُوا مُسْلِمًا عَنْ دِينِهِ، وَلَا يَتَعَرَّضُوا لِمَالِهِ وَلَا دِينِهِ.

وَالسَّادِسُ: أَنْ لَا يُعِينُوا أَهْلَ الْحَرْبِ وَلَا يَوَدُّوا أَغْنِيَاءَهُمْ.

فَهَذِهِ السِّتَّةُ حُقُوقٌ مُلْتَزَمَةٌ فَتَلْزَمُهُمْ بِغَيْرِ شَرْطٍ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ إِشْعَارًا لَهُمْ وَتَأْكِيدًا؛ لِتَغْلِيظِ الْعَهْدِ عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُ ارْتِكَابُهَا بَعْدَ الشَّرْطِ نَقْضًا لِعَهْدِهِمْ.

وَأَمَّا الْمُسْتَحَبُّ فَسِتَّةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: تَغْيِيرُ هَيْئَاتِهِمْ بِلُبْسِ الْغِيَارِ وَشَدِّ الزُّنَّارِ.

وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَعْلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَبْنِيَةِ وَيَكُونُوا إِنْ لَمْ يَنْقُصُوا مُسَاوِينَ لَهُمْ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يُسْمِعُوهُمْ أَصْوَاتَ نَوَاقِيسِهِمْ وَلَا تِلَاوَةَ كُتُبِهِمْ، وَلَا قَوْلِهِمْ فِي عُزَيْرٍ وَالْمَسِيحِ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ لَا يُجَاهِرُوهُمْ بِشُرْبِ خُمُورِهِمْ، وَلَا بِإِظْهَارِ صُلْبَانِهِمْ وَخَنَازِيرِهِمْ.

وَالْخَامِسُ: أَنْ يُخْفُوا دَفْنَ مَوْتَاهُمْ، وَلَا يُجَاهِرُوا بِنَدْبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا نِيَاحَةٍ.

وَالسَّادِسُ: أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ عِنَاقًا وَهِجَانًا، وَلَا يُمْنَعُوا مِنْ رُكُوبِ الْبِغَالِ

জিজিয়া; উভয়টি একত্রে গ্রহণ করা হবে। আর যদি কেবল জিজিয়ার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকা হয়, তবে তা জিজিয়া হিসেবে গণ্য হবে যদি তা বছরে এক দীনারের কম না হয়।

এবং যখন তাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করা হয় যে, তারা তাদের পথ অতিক্রমকারী মুসলিমদের মেহমানদারি করবে, তখন তাদের ওপর তিন দিনের মেহমানদারির সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে এবং তাদের এর জন্য দায়বদ্ধ করা হবে; তাদের এর অতিরিক্ত করার জন্য বাধ্য করা হবে না। যেমনটি ওমর (রা.) সিরিয়ার নাসারাদের সাথে সন্ধি করেছিলেন যে, তারা তাদের পথ অতিক্রমকারী মুসলিমদের তিন দিন তাদের সাধারণ খাবার থেকে মেহমানদারি করবে। তিনি তাদের ওপর ছাগল বা মুরগি জবাই করার এবং তাদের পশুপালকে যব ব্যতীত রাত যাপনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করেননি। তিনি এই দায়িত্ব কেবল গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের ওপর আরোপ করেছিলেন, শহরের বাসিন্দাদের ওপর নয়। আর যদি তাদের ওপর মেহমানদারি এবং দ্বিগুণ সদকা প্রদানের শর্ত না করা হয়, তবে তাদের ওপর শস্য বা ফলের ক্ষেত্রে কোনো সদকা প্রযোজ্য হবে না এবং সাহায্যপ্রার্থী বা পথচারীদের মেহমানদারি করাও তাদের জন্য আবশ্যক হবে না।

জিজিয়ার চুক্তিতে তাদের ওপর দুই ধরনের শর্ত আরোপ করা হয়: একটি হলো আবশ্যকীয় এবং অন্যটি হলো পছন্দনীয়। আবশ্যকীয় শর্ত ছয়টি:

প্রথমত: তারা আল্লাহর কিতাবের সমালোচনা করবে না এবং এর বিকৃতি ঘটাবে না।

দ্বিতীয়ত: তারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না এবং তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে না।

তৃতীয়ত: তারা ইসলাম ধর্মের নিন্দা বা এর কোনো ত্রুটি বর্ণনা করবে না।

চতুর্থত: তারা কোনো মুসলিম নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না এবং বিবাহের নামেও তার সাথে সম্পর্ক করবে না।

পঞ্চমত: তারা কোনো মুসলিমকে তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করবে না এবং তার জান-মাল বা ধর্মের কোনো ক্ষতি করবে না।

ষষ্ঠত: তারা যুদ্ধরত শত্রুপক্ষকে সাহায্য করবে না এবং তাদের ধনীদের প্রতি মিত্রতা পোষণ করবে না।

এই ছয়টি হলো অলঙ্ঘনীয় অধিকার যা চুক্তি ছাড়াই তাদের ওপর বাধ্যতামূলক। তবে তাদের সচেতন করার জন্য এবং অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করার জন্য এগুলো শর্তভুক্ত করা হয়; শর্ত করার পর এগুলোর কোনো একটির লঙ্ঘন তাদের নিরাপত্তা চুক্তি ভঙ্গ করার নামান্তর হবে।

আর পছন্দনীয় শর্ত হলো ছয়টি:

প্রথমত: ভিন্নধর্মী পোশাক পরিধান করা এবং কোমরে বিশেষ বেল্ট বা কটিবন্ধনী (জুন্নার) পরিধানের মাধ্যমে নিজেদের বেশভূষায় পরিবর্তন আনা।

দ্বিতীয়ত: ভবন বা অট্টালিকা নির্মাণের ক্ষেত্রে তারা মুসলিমদের ওপর উচ্চতা বৃদ্ধি করবে না; যদি নিচু না হয় তবে অন্তত মুসলিমদের ভবনের সমান সমান হতে হবে।

তৃতীয়ত: তারা মুসলিমদের তাদের গির্জার ঘণ্টার শব্দ, তাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠের আওয়াজ এবং উযাইর ও মসীহ (আলাইহিমাস সালাম) সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসের কথা শোনাবে না।

চতুর্থত: তারা মুসলিমদের সামনে প্রকাশ্যে মদ পান করবে না এবং তাদের ক্রুশ ও শূকর প্রদর্শন করবে না।

পঞ্চমত: তারা তাদের মৃতদেহ দাফন করার কাজ গোপনে সম্পন্ন করবে এবং প্রকাশ্যে বিলাপ বা উচ্চস্বরে শোক প্রকাশ করবে না।

ষষ্ঠত: তাদের অভিজাত ও উন্নত মানের ঘোড়ায় চড়া থেকে বিরত রাখা হবে, তবে খচ্চরে চড়তে তাদের বাধা দেওয়া হবে না।

وَالْحَمِيرِ، وَهَذِهِ السِّتَّةُ الْمُسْتَحَبَّةُ لَا تَلْزَمُ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ حَتَّى تُشْتَرَطَ، فَتَصِيرَ بِالشَّرْطِ مُلْتَزَمَةً، وَلَا يَكُونُ ارْتِكَابُهَا بَعْدَ الشَّرْطِ نَقْضًا لِعَهْدِهِمْ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُونَ بِهَا إِجْبَارًا وَيُؤَدَّبُونَ عَلَيْهَا زَجْرًا، وَلَا يُؤَدَّبُونَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَيُثْبِتُ الْإِمَامُ مَا اسْتَقَرَّ مِنْ عَقْدِ الصُّلْحِ مَعَهُمْ فِي دَوَاوِينَ الْأَمْصَارِ لِيُؤْخَذُوا بِهِ إِذَا تَرَكُوهُ؛ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ صُلْحًا رُبَّمَا خَالَفَ مَا سِوَاهُ، وَلَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَيْهِمْ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً بَعْدَ انْقِضَائِهَا بِشُهُورٍ هِلَالِيَّةٍ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فِيهَا أُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْهَا، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ كَانَ مَا لَزِمَ مِنْ جِزْيَتِهِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ يُؤْخَذُ بِهَا، وَأَسْقَطَهَا أَبُو حَنِيفَةَ بِإِسْلَامِهِ وَمَوْتِهِ، وَمَنْ بَلَغَ مِنْ صِغَارِهِمْ أَوْ أَفَاقَ مِنْ مَجَانِينِهِمْ اُسْتُقْبِلَ بِهِ حَوْلٌ، ثُمَّ أُخِذَ بِالْجِزْيَةِ، وَيُؤْخَذُ الْفَقِيرُ بِهَا إِذَا أَيْسَرَ، وَيُنْظَرُ بِهَا إِذَا أَعْسَرَ، وَلَا تَسْقُطُ عَنْ شَيْخٍ وَلَا زَمِنٍ، وَقِيلَ: تَسْقُطُ عَنْهُمَا وَعَنِ الْفَقِيرِ، وَإِذَا تَشَاجَرُوا فِي دِينِهِمْ، وَاخْتَلَفُوا فِي مُعْتَقَدِهِمْ لَمْ يُعَارِضُوا فِيهِ وَلَمْ يَكْشِفُوا عَنْهُ، وَإِذَا تَنَازَعُوا فِي حَقٍّ وَتَرَافَعُوا فِيهِ إِلَى حَاكِمِهِمْ لَمْ يُمْنَعُوا مِنْهُ، فَإِنْ تَرَافَعُوا فِيهِ إِلَى حَاكِمِنَا حَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا يُوجِبُهُ دِينُ الْإِسْلَامِ، وَتُقَامُ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا أَتَوْهَا، وَمَنْ نَقَضَ مِنْهُمْ عَهْدَهُ بُلِّغَ مَأْمَنَهُ، ثُمَّ كَانَ حَرْبِيًّا، وَلِأَهْلِ الْعَهْدِ إِذَا دَخَلُوا دَارَ الْإِسْلَامِ الْأَمَانُ عَلَى نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ أَنْ يُقِيمُوا فِيهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ، وَلَا يُقِيمُونَ سَنَةً إِلَّا بِجِزْيَةٍ، وَفِيمَا بَيْنَ الزَّمَنَيْنِ خِلَافٌ، وَيَلْزَمُ الْكَفُّ عَنْهُمْ كَأَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا يَلْزَمُ الدَّفْعُ عَنْهُمْ بِخِلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

وَإِذَا أَمَّنَ بَالِغٌ عَاقِلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَرْبِيًّا لَزِمَ أَمَانُهُ كَافَّةَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَذْلِ الْأَمَانِ كَالرَّجُلِ، وَالْعَبْدُ فِيهِ كَالْحُرِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَلَا يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْقِتَالِ، وَلَا يَصِحُّ أَمَانُ الصَّبِيِّ وَلَا الْمَجْنُونِ، وَمَنْ أَمَّنَاهُ فَهُوَ حَرْبٌ إِلَّا إِنْ جَهِلَ حُكْمَ أَمَانِهِمْ، فَيُبَلَّغُ مَأْمَنَهُ وَيَكُونُ حَرْبِيًّا.

وَإِذَا تَظَاهَرَ أَهْلُ الْعَهْدِ وَالذِّمَّةِ بِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا حَرْبًا لِوَقْتِهِمْ، فَيُقْتَلُ مُقَاتِلُهُمْ، وَيُعْتَبَرُ حَالُ مَا عَدَا الْمُقَاتِلَةَ بِالرِّضَى وَالْإِنْكَارِ، وَإِذَا امْتَنَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ كَانَ نَقْضًا لِعَهْدِهِمْ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَيَنْقُضُ بِهِ عَهْدَهُمْ إِلَّا أَنْ يَلْحَقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ جَبْرًا كَالدُّيُونِ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْدِثُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بَيْعَةً وَلَا كَنِيسَةً، فَإِنْ أَحْدَثُوهَا هُدِمَتْ عَلَيْهِمْ، وَيَجُوزُ

...এবং গাধার ওপর আরোহণ; এই ছয়টি মুস্তাহাব বা বাঞ্ছনীয় বিষয় জিম্মা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক নয় যতক্ষণ না তা শর্ত হিসেবে যুক্ত করা হয়। সুতরাং শর্তের মাধ্যমেই তা পালনীয় হবে। শর্তারোপের পর এগুলো লঙ্ঘন করা তাদের নিরাপত্তা চুক্তি ভঙ্গ করা বলে গণ্য হবে না, তবে তাদের ওপর তা বলপ্রয়োগে কার্যকর করা হবে এবং সতর্কতামূলক শাস্তি প্রদান করা হবে। যদি তাদের ওপর এই শর্তারোপ না করা থাকে, তবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে না। ইমাম তাদের সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তির বিষয়গুলো প্রশাসনিক নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করবেন যাতে তারা তা বর্জন করলে তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া যায়; কেননা প্রত্যেক জাতির সাথে সম্পাদিত সন্ধি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তাদের ওপর বছরে একবারের বেশি জিজয়া ধার্য হবে না এবং তা চান্দ্র মাস অনুযায়ী বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর গ্রহণ করা হবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বছরের মাঝে মারা যাবে, বছরের যতটুকু সময় অতিবাহিত হয়েছে সেই অনুপাতে তার ত্যাজ্য সম্পদ থেকে জিজয়া নেওয়া হবে। আর তাদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার ওপর অবধারিত জিজয়া তার জিম্মায় ঋণ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা আদায় করা হবে। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যুর কারণে জিজয়া রহিত হওয়ার মত দিয়েছেন। তাদের অপ্রাপ্তবয়স্করা প্রাপ্তবয়স্ক হলে কিংবা পাগলরা সুস্থ হলে নতুন করে বছর অতিবাহিত হওয়ার পর জিজয়া নেওয়া হবে। দরিদ্র ব্যক্তি সচ্ছল হলে তার থেকে জিজয়া গ্রহণ করা হবে, আর সে অভাবী থাকলে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হবে। বৃদ্ধ এবং পঙ্গু ব্যক্তির ক্ষেত্রে জিজয়া রহিত হবে না। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, তাদের উভয় এবং দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা রহিত হয়ে যাবে। তারা যদি তাদের ধর্ম নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয় এবং তাদের বিশ্বাসে মতবিরোধ ঘটে, তবে সে ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হবে না এবং সে বিষয়ে অনুসন্ধানও করা হবে না। যদি তারা কোনো পাওনা বা অধিকার নিয়ে বিবাদে জড়ায় এবং তাদের বিচারকের কাছে

তা উত্থাপন করে, তবে তাদের বাধা দেওয়া হবে না। কিন্তু যদি তারা আমাদের বিচারকের কাছে তা পেশ করে, তবে তিনি ইসলামের বিধান অনুযায়ী বিচার করবেন। তারা কোনো অপরাধ করলে তাদের ওপর ইসলামি দণ্ডবিধি কার্যকর করা হবে। তাদের কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে হবে, এরপর সে হারবি হিসেবে গণ্য হবে।
সন্ধিচুক্তিবদ্ধ অমুসলিমরা যখন দারুল ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা থাকবে। তারা চার মাস পর্যন্ত জিজয়া ছাড়াই অবস্থান করতে পারবে, তবে জিজয়া ছাড়া এক বছর অবস্থান করতে পারবে না। চার মাস ও এক বছরের মধ্যবর্তী মেয়াদের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। জিম্মিদের ন্যায় তাদের অনিষ্ট করা থেকেও বিরত থাকা আবশ্যক, তবে জিম্মিদের ন্যায় তাদের রক্ষার দায়িত্ব মুসলিমদের ওপর বাধ্যতামূলক নয়।
যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান মুসলিম কোনো হারবিকে নিরাপত্তা দান করে, তবে তার সেই নিরাপত্তা দান সমস্ত মুসলিমের ওপর কার্যকর হবে। নিরাপত্তা দানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ন্যায় এবং দাস স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় গণ্য হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন: দাসের নিরাপত্তা প্রদান বৈধ নয় যদি না তাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়। শিশু এবং পাগলের নিরাপত্তা দান বৈধ নয়। তারা কাউকে নিরাপত্তা দিলে সে হারবি হিসেবেই গণ্য হবে; তবে সে যদি তাদের নিরাপত্তা দানের বিধান সম্পর্কে অনবহিত থাকে, তবে তাকে তার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং এরপর সে হারবি হিসেবে বিবেচিত হবে।
যদি সন্ধিচুক্তিবদ্ধ অমুসলিম ও জিম্মিরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একে অপরকে সহায়তা করে, তবে তারা তৎক্ষণাৎ হারবি বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে। যোদ্ধাদের বাইরে অন্যদের ক্ষেত্রে তাদের সম্মতি বা অসম্মতি বিবেচনা করা হবে। জিম্মিরা জিজয়া দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন: তারা দারুল হারবে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে না, বরং ঋণের ন্যায় তাদের থেকে তা জোরপূর্বক আদায় করা হবে।
দারুল ইসলামে তাদের জন্য কোনো উপাসনালয় বা গির্জা নির্মাণ করা বৈধ নয়। তারা যদি তা নির্মাণ করে তবে তা ভেঙে দেওয়া হবে। এবং তা বৈধ...

أَنْ يَبْنُوا مَا اسْتُهْدِمَ مِنْ بِيَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمُ الْعَتِيقَةِ، وَإِذَا نَقَضَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَهْدَهُمْ لَمْ يُسْتَبَحْ بِذَلِكَ قَتْلُهُمْ، وَلَا غُنْمُ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا سَبْيُ ذَرَارِيِّهِمْ مَا لَمْ يُقَاتِلُوا، وَوَجَبَ إِخْرَاجُهُمْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ آمِنِينَ حَتَّى يَلْحَقُوا مَأْمَنَهُمْ مِنْ أَدْنَى بِلَادِ الشِّرْكِ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجُوا طَوْعًا أُخْرِجُوا كَرْهًا.

فصل: "أحكام الخراج"

وَأَمَّا الْخَرَاجُ1 فَهُوَ مَا وُضِعَ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا، وَفِيهِ مِنْ نَصِّ الْكِتَابِ بَيِّنَةٌ خَالَفَتْ نَصَّ الْجِزْيَةِ، فَلِذَلِكَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ، قَالَ اللَّهُ تعالى: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} [المؤمنون: 72] .

وَفِي قَوْلِهِ: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا} وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا أَجْرًا، وَالثَّانِي: نَفْعًا.

وَفِي قَوْلِهِ: {فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: فَرِزْقُ رَبِّكَ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ مِنْهُ، وَهَذَا قَوْلُ الْكَلْبِيِّ.

وَالثَّانِي: فَأَجْرُ رَبِّكَ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَهَذَا قَوْلُ الْكَلْبِيِّ أَيْضًا، وَقَوْلُهُ: فَأَجْرُ رَبِّكَ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِنْهُ؛ هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ أَيْضًا، قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْخَرْجِ وَالْخَرَاجِ أَنَّ الْخَرْجَ مِنَ الرِّقَابِ، وَالْخَرَاجَ مِنَ الْأَرْضِ، وَالْخَرَاجُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ اسْمٌ لِلْكِرَاءِ وَالْغَلَّةِ، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" 2، وَأَرْضُ الْخَرَاجِ تَتَمَيَّزُ عَنْ أَرْضِ الْعُشْرِ فِي الْمِلْكِ وَالْحُكْمِ.

وَالْأَرْضُونَ كُلُّهَا تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُونَ إِحْيَاءَهُ، فَهُوَ أَرْضُ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ؛

---

1 الخراج: ما يخرج من غلة الأرض، ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجًا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رءوسهم، يعني: الجزية. [أنيس الفقهاء: ص 185] .

2 حسن: رواه أبو داود في كتاب البيوع "3508"، والترمذي في كتاب البيوع "1285"، والنسائي في كتاب البيوع "4490"، وابن ماجه في كتاب التجارات "2242"، وحسنه الشيخ الألباني.

তারা তাদের প্রাচীন উপাসনালয় ও গির্জাগুলোর যা কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তা পুনর্নির্মাণ করতে পারবে। জিম্মিরা যদি তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তবে যতক্ষণ তারা যুদ্ধে লিপ্ত না হয়, ততক্ষণ এর কারণে তাদের হত্যা করা, তাদের সম্পদ গণিমত হিসেবে গ্রহণ করা কিংবা তাদের সন্তানদের দাস বানানো বৈধ হবে না। তবে তাদের মুসলিম রাষ্ট্র থেকে নিরাপদ অবস্থায় বের করে দেওয়া ওয়াজিব হবে, যতক্ষণ না তারা শিরকের নিকটবর্তী দেশগুলোর মধ্যে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে পারে। যদি তারা স্বেচ্ছায় বের না হয়, তবে তাদের জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হবে।

পরিচ্ছেদ: "খারাজের বিধানাবলি"

আর খারাজ হলো ভূমির সত্তার ওপর নির্ধারিত সেসব হক বা অধিকার, যা তার বিনিময়ে প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে কিতাবুল্লাহর (কুরআনের) নস বা সুস্পষ্ট বাণী থেকে এমন প্রমাণ বিদ্যমান যা জিযিয়ার নস থেকে ভিন্ন। এ কারণেই এটি ইমামগণের ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "নাকি আপনি তাদের কাছে কোনো প্রতিদান চান? তবে আপনার রবের প্রতিদানই সর্বোত্তম।" [আল-মুমিনুন: ৭২]

আল্লাহর বাণী— "নাকি আপনি তাদের কাছে কোনো প্রতিদান (খারজ) চান?"—এর ব্যাখ্যায় দুটি মত রয়েছে:

একটি হলো পারিশ্রমিক, আর দ্বিতীয়টি হলো উপকার।

এবং তাঁর বাণী— "তবে আপনার রবের প্রতিদান (খারাজ) সর্বোত্তম"—এর ব্যাখ্যায় দুটি মত রয়েছে:

একটি হলো: দুনিয়ায় আপনার রবের দেওয়া রিযিক এর চেয়ে উত্তম; এটি কালবীর অভিমত।

দ্বিতীয়টি হলো: পরকালে আপনার রবের দেওয়া প্রতিদান এর চেয়ে উত্তম; এটিও কালবীর অভিমত। আর "পরকালে আপনার রবের প্রতিদান এর চেয়ে উত্তম"—এ কথাটি হাসান বসরিও বলেছেন। আবু আমর ইবনুল আলা বলেন: 'খারজ' ও 'খারাজ'-এর মধ্যে পার্থক্য হলো—খারজ হলো ব্যক্তিদের ওপর ধার্যকৃত কর, আর খারাজ হলো ভূমির ওপর ধার্যকৃত কর। আরবি ভাষায় খারাজ শব্দটি ভাড়া ও ফসলের জন্য নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ থেকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণীর উৎপত্তি: "লাভের অধিকার দায়বদ্ধতার সাথে শর্তযুক্ত।" আর মালিকানা ও বিধানের ক্ষেত্রে খারাজি ভূমি উশরি ভূমি থেকে স্বতন্ত্র। সকল ভূমি মোট চার ভাগে বিভক্ত:
প্রথমটি হলো: যা মুসলমানরা নতুন করে আবাদ করেছে; এটি উশরি ভূমি, এর ওপর খারাজ ধার্য করা জায়েজ নেই;

---

১. খারাজ: যা ভূমির ফসল থেকে উৎপাদিত হয়, পরবর্তীতে শাসক যা গ্রহণ করেন তাকেও খারাজ বলা হতে থাকে। যেমন বলা হয়: অমুক তার ভূমির খারাজ প্রদান করেছে, এবং জিম্মিরা তাদের মাথার খারাজ দিয়েছে—অর্থাৎ জিযিয়া। [আনিসুল ফুকাহা: পৃষ্ঠা ১৮৫]।
২. হাসান: এটি আবু দাউদ 'ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে' (৩৫০৮), তিরমিযী 'ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে' (১২৮৫), নাসাঈ 'ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে' (৪৪৯০) এবং ইবনে মাজাহ 'ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়ে' (২২৪২) বর্ণনা করেছেন এবং শায়খ আলবানী একে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।

(ص: 228)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالْكَلَامُ فِيهَا يُذْكَرُ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا.
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ أَرْبَابُهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ، فَتَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله أَرْضَ عُشْرٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ

أَنْ يَجْعَلَهَا خَرَاجًا أَوْ عُشْرًا، فَإِنْ جَعَلَهَا خَرَاجًا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُنْقَلَ إِلَى الْعُشْرِ، وَإِنْ جَعَلَهَا عُشْرًا جَازَ أَنْ تُنْقَلَ إِلَى الْخَرَاجِ.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا مُلِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَةً وَقَهْرًا، فَيَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله غَنِيمَةً تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَتَكُونُ أَرْضَ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ، وَجَعَلَهَا مَالِكٌ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِخَرَاجٍ يُوضَعُ عَلَيْهَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ الْإِمَامُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَرْضِهِمْ، فَهِيَ الْأَرْضُ الْمُخْتَصَّةُ بِوَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا، وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا خَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَحَصَلَتْ لِلْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَتَصِيرُ وَقْفًا عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، وَيَكُونُ أُجْرَةً تُقَرُّ عَلَى الْأَبَدِ، وَإِنْ لَمْ يُقَدَّرْ بِمُدَّةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ عُمُومِ الْمَصْلَحَةِ، وَلَا يَتَغَيَّرُ بِإِسْلَامٍ وَلَا ذِمَّةٍ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ رِقَابِهَا اعْتِبَارًا لِحُكْمِ الْوُقُوفِ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا أَقَامَ فِيهِ أَهْلُهُ وَصُولِحُوا عَلَى إِقْرَارِهِ فِي أَيْدِيهِمْ بِخَرَاجٍ يُضْرَبُ عَلَيْهِمْ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَنْزِلُوا عَنْ مِلْكِهَا لَنَا عِنْدَ صُلْحِنَا، فَتَصِيرُ هَذِهِ الْأَرْضُ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَالَّذِي انْجَلَى عَنْهُ أَهْلُهُ، وَيَكُونُ الْخَرَاجُ الْمَضْرُوبُ عَلَيْهِمْ أُجْرَةً لَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُ رِقَابِهَا، وَيَكُونُونَ أَحَقَّ بِهَا مَا أَقَامُوا عَلَى صُلْحِهِمْ، وَلَا تُنْتَزَعُ مِنْ أَيْدِيهِمْ، سَوَاءٌ أَقَامُوا عَلَى شِرْكِهِمْ أَمْ أَسْلَمُوا، كَمَا لَا تُنْتَزَعُ الْأَرْضُ الْمُسْتَأْجَرَةُ مِنْ يَدِ مُسْتَأْجِرِهَا، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ بِهَذَا الْخَرَاجِ جِزْيَةُ رِقَابِهِمْ إِنْ صَارُوا أَهْلَ ذِمَّةٍ مُسْتَوْطِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلُوا إِلَى الذِّمَّةِ، وَأَقَامُوا عَلَى حُكْمِ الْعَهْدِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَرُّوا فِيهَا سَنَةً، وَجَازَ إِقْرَارُهُمْ فِيهَا دُونَهَا بِغَيْرِ جِزْيَةٍ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَسْتَبْقُوهَا عَلَى أَمْلَاكِهِمْ، وَلَا يَنْزِلُوا عَنْ رِقَابِهَا، وَيُصَالِحُوا عَنْهَا

এ সম্পর্কে আলোচনা আমাদের এই কিতাবের 'পতিত জমি আবাদকরণ' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে।

দ্বিতীয় প্রকার: যে জমির মালিকরা স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেছে, ফলে তারা এর ওপর অধিক হকদার। ইমাম শাফিয়ী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মাযহাব অনুযায়ী এটি 'উশর' (দশমাংশ কর) প্রদানের জমি হিসেবে গণ্য হবে এবং এর ওপর 'খারাজ' (ভূমি রাজস্ব) আরোপ করা বৈধ হবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) এটিকে খারাজি বা উশরি জমি হিসেবে নির্ধারণ করার ব্যাপারে ইখতিয়ার রাখেন। তবে তিনি যদি এটিকে খারাজি ভূমি হিসেবে নির্ধারণ করেন, তবে পরবর্তীতে তা উশরে স্থানান্তর করা জায়েয হবে না; আর যদি উশরি ভূমি হিসেবে নির্ধারণ করেন, তবে তা খারাজে স্থানান্তর করা জায়েয হবে।

তৃতীয় প্রকার: যা মুশরিকদের নিকট থেকে যুদ্ধ ও শক্তির মাধ্যমে জয় করে মালিকানা লাভ করা হয়েছে। ইমাম শাফিয়ী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মাযহাব অনুযায়ী তা গনিমত হিসেবে গণ্য হবে এবং যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এটি হবে উশরি ভূমি এবং এর ওপর খারাজ আরোপ করা বৈধ হবে না। ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) এটিকে মুসলিমদের জন্য 'ওয়াকফ' হিসেবে গণ্য করেছেন যার ওপর খারাজ ধার্য করা হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: ইমাম এই দুই বিষয়ের মধ্যে যেকোনোটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার রাখেন।

চতুর্থ প্রকার: মুশরিকদের সাথে তাদের যে জমির ওপর সন্ধি করা হয়েছে। এই জমিটিই মূলত খারাজ আরোপের জন্য নির্দিষ্ট। এটি দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যে জমি এর অধিবাসীরা ত্যাগ করে চলে গেছে এবং যুদ্ধ ছাড়াই মুসলিমদের হস্তগত হয়েছে। এটি মুসলিমদের জনকল্যাণের জন্য 'ওয়াকফ' হয়ে যাবে এবং এর ওপর খারাজ ধার্য করা হবে। এই খারাজ চিরস্থায়ী ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে, যদিও জনস্বার্থের ব্যাপকতার কারণে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত হবে না। ইসলাম গ্রহণ বা জিম্মি হওয়ার কারণে এর কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ওয়াকফ হওয়ার বিধান অনুসারে এর মূল মালিকানা বিক্রি করা জায়েয হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার: যে জমিতে এর অধিবাসীরা অবস্থান করছে এবং তাদের ওপর খারাজ ধার্য করার শর্তে তাদের অধিকারে রেখে দেওয়ার জন্য সন্ধি করা হয়েছে। এটি আবার দুই প্রকার:

প্রথমটি হলো: সন্ধির সময় তারা জমির মালিকানা আমাদের জন্য ছেড়ে দেবে, ফলে এই জমিটি সেই জমির ন্যায় মুসলিমদের জন্য ওয়াকফ হয়ে যাবে যেখান থেকে অধিবাসীরা প্রস্থান করেছিল। তাদের ওপর ধার্যকৃত খারাজ ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে যা তারা ইসলাম গ্রহণ

করলেও রহিত হবে না। তাদের জন্য এর মূল মালিকানা বিক্রি করা জায়েয হবে না। তারা যতক্ষণ সন্ধির শর্তে অটল থাকবে ততক্ষণ তারাই এর ওপর অধিক হকদার হবে এবং তাদের নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না; তারা মুশরিক থাকুক বা ইসলাম গ্রহণ করুক না কেন। যেমন ভাড়া করা জমি ভাড়াটিয়ার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না। যদি তারা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জিম্মি হয়, তবে এই খারাজের কারণে তাদের ব্যক্তিগত জিযিয়া রহিত হবে না। আর যদি তারা জিম্মি না হয় বরং চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় থাকে, তবে তাদের এক বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে দেওয়া জায়েয হবে না; তবে জিযিয়া ছাড়াই এক বছরের কম সময়ের জন্য তাদের সেখানে থাকার অনুমতি দেওয়া জায়েয হবে।
দ্বিতীয়টি হলো: তারা জমিটি তাদের নিজেদের মালিকানাতেই বহাল রাখবে এবং এর মূল মালিকানা থেকে সরে আসবে না, বরং এর বিনিময়ে তারা সন্ধি করবে—

(ص: 229)الأحكام السلطانية للماوردي

بِخَرَاجٍ يُوضَعُ عَلَيْهَا، فَهَذَا الْخَرَاجُ جِزْيَةٌ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مَا أَقَامُوا عَلَى شِرْكِهِمْ، وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ بِإِسْلَامِهِمْ، وَيَجُوزُ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ جِزْيَةُ رِقَابِهِمْ، وَيَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُ هَذِهِ الْأَرْضِ عَلَى مَنْ شَاءُوا مِنْهُمْ أَوْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَإِنْ تَبَايَعُوهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ كَانَتْ عَلَى حُكْمِهَا فِي الْخَرَاجِ، وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى مُسْلِمٍ سَقَطَ عَنْهُ خَرَاجُهَا، وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى ذِمِّيٍّ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَسْقُطَ عَنْهُ خَرَاجُهَا لِبَقَاءِ كُفْرِهِ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُ خَرَاجُهَا بِخُرُوجِهِ بِالذِّمَّةِ عَنْ عَقْدِهِ مَنْ صُولِحَ عَلَيْهَا، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي هَذَا الْخَرَاجِ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهَا، فَإِنْ وُضِعَ عَلَى مَسَائِحِ الْجُرْبَانِ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَدْرٌ مِنْ وَرِقٍ أَوْ حَبٍّ، فَإِنْ سَقَطَ عَنْ بَعْضِهَا بِإِسْلَامِ أَهْلِهِ كَانَ مَا بَقِيَ عَلَى حُكْمِهِ، وَلَا يُضَمُّ إِلَيْهِ خَرَاجُ مَا سَقَطَ بِالْإِسْلَامِ.

وَإِنْ كَانَ الْخَرَاجُ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهَا صُلْحًا عَلَى مَالٍ مُقَدَّرٍ لَمْ يَسْقُطْ عَلَى مِسَاحَةِ الْجُرْبَانِ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَحُطُّ عَنْهُمْ مِنْ مَالِ الصُّلْحِ مَا سَقَطَ مِنْهُ بِإِسْلَامِ أَهْلِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ مَالُ الصُّلْحِ بَاقِيًا بِكَمَالِهِ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْ هَذَا الْمُسْلِمِ مَا خَصَّهُ بِإِسْلَامِهِ، فَأَمَّا قَدْرُ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ فَيُعْتَبَرُ بِمَا تَحْتَمِلُهُ الْأَرْضُ، فَإِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه حِينَ وَضَعَ الْخَرَاجَ عَلَى سَوَادِ الْعِرَاقِ ضَرَبَ فِي بَعْضِ نَوَاحِيهِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ1 قَفِيزًا وَدِرْهَمًا، وَجَرَى فِي ذَلِكَ عَلَى مَا اسْتَوْفَقَهُ مِنْ رَأْيِ كِسْرَى بْنِ قُبَاءَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ مَسَّحَ السَّوَادَ وَوَضَعَ الْخَرَاجَ وَحَدَّدَ الْحُدُودَ وَوَضَعَ الدَّوَاوِينَ وَرَاعَى مَا تَحْتَمِلُهُ الْأَرْضُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ بِمَالِكٍ، وَلَا إِجْحَافٍ بِزَارِعٍ، وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا، وَكَانَ الْقَفِيزُ وَزْنُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ، وَثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ بِوَزْنِ الْمِثْقَالِ، وَلِانْتِشَارِ ذَلِكَ بِمَا ظَهَرَ فِي جَاهِلِيَّةِ الْعَرَبِ قَالَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي سَلْمَى "مِنَ الطَّوِيلِ":

فَتُغْلِلْ لَكُمْ مَا لَا تُغِلُّ لِأَهْلِهَا ... قُرًى بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيزٍ وَدِرْهَمِ

وَضَرَبَ عُمَرُ رضي الله عنه عَلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى غَيْرَهَا غَيْرَ هَذَا الْقَدْرِ، فَاسْتَعْمَلَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ2 عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالْمِسَاحَةِ، وَوَضْعِ مَا تَحْتَمِلُهُ الْأَرْضُ مِنْ خَرَاجِهَا، فَمَسَحَ وَوَضَعَ عَلَى

---

1 الجريب من الأرض مقدار معلوم الذراع والمساحة، وهو عشرة أقفزة، كل قفيز منها عشرة أعشراء، فالعشير جزء من مائة جزء من الجريب. [اللسان: 1/ 260] .

2 هو عثمان بن حنيف بن وهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة الأنصاري، من بني عمرو بن مالك بن عوف بن الأوس، أخو سهل؛ استشار عمر بن الخطاب الصحابة في رجل يوجهه إلى العراق، فأجمعوا جميعًا على عثمان هذا، وقالوا: لن تبعثه إلى أهم من ذلك! فإن له بصرًا وعقلًا ومعرفة وتجربة، فأسرع عمر إليه فولّاه مساحة أرض العراق، فضرب عثمان على كل جريب من الأرض يناله الماء عامرًا وغامرًا وقفيزًا، فبلغت جباية سواد الكوفة قبل أن يموت عمر بعام مائة ألف

ونيفًا. ونال عثمان بن حنيف في نزول عسكر طلحة، والزبير ما زاد فضله، ثم سكن الكوفة وبقي إلى زمان معاوية.

ঐ ভূমির ওপর ধার্যকৃত খারাজ বা করের মাধ্যমে; আর এই খারাজ হলো জিজিয়া যা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয় যতক্ষণ তারা তাদের শিরকে অটল থাকে, এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে তা রহিত হয়ে যায়। তাদের জন্য এই ভূমি তাদের নিজেদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অথবা মুসলমানদের কাছে অথবা জিম্মিদের কাছে বিক্রি করা বৈধ। যদি তারা নিজেদের মধ্যে এটি কেনাবেচা করে, তবে খারাজের ক্ষেত্রে তা পূর্বের নিয়মেই বহাল থাকবে। আর যদি তা কোনো মুসলমানের কাছে বিক্রি করা হয়, তবে তার ওপর থেকে খারাজ রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তা কোনো জিম্মির কাছে বিক্রি করা হয়, তবে সম্ভাবনা আছে যে তার কুফরি অবশিষ্ট থাকার কারণে তার ওপর থেকে খারাজ রহিত হবে না; আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, যার সাথে মূল চুক্তিটি করা হয়েছিল তার জিম্মার চুক্তির আওতা থেকে ভূমিটি বেরিয়ে যাওয়ার কারণে খারাজ রহিত হয়ে যাবে। অতঃপর এই ভূমির ওপর ধার্যকৃত খারাজের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করা হবে: যদি তা ভূমির পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে ধার্য করা হয়, যেমন প্রতি জেরিবের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা বা শস্য গ্রহণ করা হয়, তবে মালিকদের একাংশের ইসলাম গ্রহণের ফলে যদি সেই অংশ থেকে খারাজ রহিত হয়, তবে অবশিষ্ট অংশ তার পূর্বের নিয়মেই বহাল থাকবে এবং ইসলামের কারণে যা রহিত হয়েছে তার পরিমাণ অবশিষ্ট অংশের সাথে যুক্ত করা হবে না।

আর যদি ভূমির ওপর ধার্যকৃত খারাজ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের ওপর সন্ধি হিসেবে হয় এবং তা ভূমির পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে না হয়, তবে ইমাম শাফিঈর মাযহাব হলো: ইসলাম গ্রহণের ফলে যে অংশ রহিত হয়েছে, সন্ধির মাল থেকে সেই পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হবে। আর ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: সন্ধির মাল পূর্ণাঙ্গভাবেই অবশিষ্ট থাকবে, এবং এই মুসলমান ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কারণে তার অংশের খারাজ রহিত হবে না। আর ধার্যকৃত খারাজের পরিমাণের ক্ষেত্রে ভূমি যতটুকু ভার বহন করতে সক্ষম তা বিবেচনা করা হবে। কেননা উমর (রা.) যখন ইরাকের সাওয়াদ অঞ্চলের ওপর খারাজ ধার্য করেছিলেন, তখন তিনি এর কিছু এলাকায় প্রতি জেরিবে এক কফিজ এবং এক দিরহাম ধার্য করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কিসরা ইবনে কুবায়ের সেই পদ্ধতির অনুসরণ করেছিলেন যা তার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। কেননা কিসরাই সর্বপ্রথম সাওয়াদ অঞ্চলের ভূমি পরিমাপ করেছিলেন, খারাজ ধার্য

করেছিলেন, সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন, প্রশাসনিক দপ্তর স্থাপন করেছিলেন এবং ভূমির মালিকের ওপর অবিচার না করে ও কৃষকের ওপর বোঝা না চাপিয়ে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনা করেছিলেন। তিনি প্রতি জেরিবের বিনিময়ে এক কফিজ ও এক দিরহাম গ্রহণ করেছিলেন। সেই কফিজের ওজন ছিল আট রতল এবং এর মূল্য ছিল মিথকাল ওজনের তিন দিরহাম। জাহেলি যুগে আরবদের মাঝে এর বহুল প্রচারের কারণে কবি জুহাইর ইবনে আবি সুলমা তাঁর কবিতায় বলেছিলেন:
তা তোমাদের জন্য এমন প্রচুর ফসল উৎপাদন করবে যা ইরাকের সেই গ্রামগুলো তাদের অধিবাসীদের জন্য দিত না… যা কফিজ ও দিরহামের বিনিময়ে নির্ধারিত ছিল।
উমর (রা.) অন্য এক অঞ্চলে এই পরিমাণ ব্যতিরেকে ভিন্ন পরিমাণ ধার্য করেছিলেন। তিনি উসমান ইবনে হুনাইফকে এর দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাকে ভূমি পরিমাপ করার ও ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী খারাজ ধার্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি পরিমাপ করলেন এবং ধার্য করলেন...

---

১. জেরিব হলো ভূমির দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফলের একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাপ, যা দশ কফিজের সমান। প্রতিটি কফিজ আবার দশ আশিরের সমান। সুতরাং আশির হলো এক জেরিবের একশ ভাগের এক ভাগ। [আল-লিসান: ১/২৬০]
২. তিনি হলেন উসমান ইবনে হুনাইফ ইবনে ওয়াহাব ইবনে আল-আকিম ইবনে সা'লাবা ইবনে আল-হারিস ইবনে মাজদাআ আল-আনসারি, বনু আমর ইবনে মালিক ইবনে আউফ ইবনে আল-আউস গোত্রের লোক এবং সাহাবী সাহল ইবনে হুনাইফের ভাই। উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ইরাকে পাঠানোর জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলে তারা সর্বসম্মতিক্রমে উসমানের ব্যাপারে একমত হন এবং বলেন: "আপনি এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের জন্য অন্য কাউকে পাঠাতে পারবেন না! কেননা তার বিচক্ষণতা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে।" অতঃপর উমর তাকে ইরাকের ভূমি পরিমাপের দায়িত্ব দেন। উসমান চাষযোগ্য ও পতিত সব ধরনের সিক্ত ভূমির প্রতি জেরিবে এক দিরহাম ও এক কফিজ ধার্য করেছিলেন। ফলে উমরের ইন্তেকালের এক বছর পূর্বে কুফার সাওয়াদ অঞ্চলের সংগৃহীত রাজস্ব এক লক্ষ দিরহাম ছাড়িয়ে যায়। তালহা ও যুবায়েরের সেনাদল আগমনের সময় উসমান ইবনে হুনাইফ তাঁর চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। পরবর্তীতে তিনি কুফায় বসবাস করেন এবং মুয়াবিয়ার শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

كُلِّ جَرِيبٍ مِنَ الْكَرْمِ وَالشَّجَرِ الْمُلْتَفِّ عَشْرَ دَرَاهِمَ، وَمِنَ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنْ قَصَبِ السُّكَّرِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَمِنَ الرَّطْبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنَ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَأَمْضَاهُ وَعَمِلَ فِي نَوَاحِي الشَّامِ عَلَى غَيْرِ هَذَا، فَعُلِمَ أَنَّهُ رَاعَى فِي كُلِّ أَرْضٍ مَا تَحْتَمِلُهُ.

وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَاضِعُ الْخَرَاجِ بَعْدَهُ يُرَاعِي فِي كُلِّ أَرْضٍ مَا تَحْتَمِلُهُ، فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، يُؤَثِّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي زِيَادَةِ الْخَرَاجِ وَنُقْصَانِهِ:

أَحَدُهَا: مَا يَخْتَصُّ بِالْأَرْضِ مِنْ جَوْدَةٍ يَزْكُو بِهَا زَرْعُهَا، أَوْ رَدَاءَةٍ يَقِلُّ بِهَا رِيعُهَا.

وَالثَّانِي: مَا يَخْتَصُّ بِالزَّرْعِ مِنِ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، فَمِنْهَا: مَا يَكْثُرُ ثَمَنُهُ، وَمِنْهَا: مَا يَقِلُّ ثَمَنُهُ، فَيَكُونُ الْخَرَاجُ بِحَسَبِهِ.

وَالثَّالِثُ: مَا يَخْتَصُّ بِالسَّقْيِ وَالشُّرْبِ؛ لِأَنَّ مَا الْتَزَمَ الْمُؤْنَةَ فِي سَقْيِهِ بِالنَّوَاضِحِ وَالدَّوَالِي لَا يَحْتَمِلُ مِنَ الْخَرَاجِ مَا يَحْتَمِلُهُ سَقْيُ السُّيُوحِ وَالْأَمْطَارِ.

وَشُرْبُ الزَّرْعِ وَالْأَشْجَارِ يَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا سَقَاهُ الْآدَمِيُّونَ بِغَيْرِ آلَةٍ كَالسُّيُوحِ1 مِنَ الْعُيُونِ وَالْأَنْهَارِ يُسَاقُ إِلَيْهَا، فَيَسِيحُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيُمْنَعُ مِنْهَا عِنْدَ الِاسْتِغْنَاءِ، وَهَذَا أَوْفَرُ الْمِيَاهِ مَنْفَعَةً وَأَقَلُّهَا كُلْفَةً.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَا سَقَاهُ الْآدَمِيُّونَ بِآلَةٍ مِنْ نَوَاضِحَ2 وَدَوَالِيبَ أَوْ دَوَالِيَ، وَهَذَا أَكْثَرُ الْمِيَاهِ وَأَشَقُّهَا عَمَلًا.

---

1 السيح: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض، وفي التهذيب: الماء الظاهر على وجه الأرض، وجمعه سيوح. [اللسان: 2/ 492] .

2 النضح: سقي الزرع وغيره بالسانية، ونضح زرعه: سقاه بالدلو، والناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء، والأنثي: ناضحة وسانية. [اللسان: 2/ 619] .

প্রতি জারিব আঙ্গুর বাগান এবং ঘন বনজ বৃক্ষের জন্য দশ দিরহাম, খেজুর গাছের জন্য আট দিরহাম, আখের জন্য ছয় দিরহাম, তাজা পশুখাদ্যের জন্য পাঁচ দিরহাম, গমের জন্য চার দিরহাম এবং যবের জন্য দুই দিরহাম (রাজস্ব) নির্ধারণ করা হয়েছিল। তিনি এই মর্মে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট পত্র প্রেরণ করেন এবং উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তা অনুমোদন করেন। তবে তিনি সিরিয়ার অঞ্চলসমূহে এর ব্যতিক্রম বিধান কার্যকর করেছিলেন; এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রতিটি ভূমির ক্ষেত্রে তার উৎপাদন ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন।

অনুরূপভাবে, পরবর্তীকালে যিনিই ভূমিরাজস্ব (খারাজ) নির্ধারণ করবেন, তাঁর জন্য প্রতিটি ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনা করা আবশ্যক। কারণ তিনটি কারণে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, যার প্রতিটি খারাজের হ্রাস-বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে:

প্রথমত: ভূমির নিজস্ব গুণাগুণ তথা মাটির উর্বরতা যার কারণে ফসল বৃদ্ধি পায়, অথবা অনুর্বরতা যার কারণে ফলন কম হয়।

দ্বিতীয়ত: ফসলের বৈচিত্র্য যেমন বিভিন্ন প্রকার শস্য ও ফলমূল। এগুলোর মধ্যে কোনোটির বাজারমূল্য অধিক এবং কোনোটির মূল্য কম; সুতরাং খারাজও সেই অনুপাতে নির্ধারিত হবে।

তৃতীয়ত: সেচ ও পানিবণ্টন ব্যবস্থা; কারণ যে ভূমি সেচ দেওয়ার জন্য পানি বহনকারী পশু ও সেচযন্ত্রের মতো ব্যয়বহুল মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল, তার রাজস্ব প্রদানের সক্ষমতা এবং প্রাকৃতিকভাবে প্রবাহিত পানি বা বৃষ্টির পানির মাধ্যমে সিক্ত ভূমির সক্ষমতা সমান নয়।

ফসল ও বৃক্ষের পানি সিঞ্চন পদ্ধতি চার ভাগে বিভক্ত:

প্রথমত: মানুষ কোনো প্রকার যন্ত্র ছাড়াই যা সেচ দেয়, যেমন ঝরনা বা নদী থেকে প্রবাহিত পানি যা ভূমির দিকে পরিচালিত করা হয়। ফলে প্রয়োজনের সময় তা প্রবাহিত হয় এবং প্রয়োজন না থাকলে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটি পানির সর্বাধিক ফলপ্রসূ এবং সর্বনিম্ন ব্যয়বহুল উৎস।

দ্বিতীয় বিভাগটি: মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে যা সেচ দেয়, যেমন পানি বহনকারী পশু, জলচক্র বা সেচযন্ত্র। এটি পানির উৎসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক কষ্টসাধ্য ও অধিক শ্রমসাধ্য ব্যবস্থা।

---

১. সাইহ: যা ভূমির উপরিভাগে দৃশ্যমান ও প্রবহমান পানি। আল-তাহজিব গ্রন্থে বলা হয়েছে: ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে প্রকাশ্য পানি, এর বহুবচন হলো সুয়ুহ। [লিসানুল আরব: ২/৪৯২]।
২. নাদহ: পানি বহনকারী পশুর সাহায্যে ফসলে পানি সেচ দেওয়া। 'নাদহা যারআহু' অর্থ তিনি বালতি দিয়ে সেচ দিয়েছেন। নাদহ বলা হয় সেই উট, বলদ বা গাধাকে যার ওপর পানি বহন করা হয়। এর স্ত্রীলিঙ্গ হলো নাদিহাহ এবং সানিয়াহ। [লিসানুল আরব: ২/৬১৯]।

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ بِمَطَرٍ أَوْ ثَلْجٍ أَوْ طَلٍّ وَيُسَمَّى الْعِذْيُ.
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا سَقَتْهُ الْأَرْضُ بِنَدَوَاتِهَا، وَمَا اسْتَكَنَّ مِنَ الْمَاءِ فِي قَرَارِهَا، فَيَشْرَبُ زَرْعُهَا وَشَجَرُهَا بِعُرُوقِهِ، وَيُسَمَّى الْبَعْلُ، فَأَمَّا الْغِيلُ وَهُوَ مَا شَرِبَ بِالْقَنَاةِ، فَإِنْ سَاحَ فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَسِحْ فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي، وَأَمَّا الْكَظَائِمُ فَهُوَ مَا شَرِبَ مِنَ الْآبَارِ؛ فَإِنْ نُضِحَ مِنْهَا بِالْغُرُوبِ فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي، وَإِنْ اُسْتُخْرِجَ مِنَ الْقَنَاةِ فَهُوَ غِيلٌ يُلْحَقُ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَإِذَا اسْتَقَرَّ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا بُدَّ لِوَاضِعِ الْخَرَاجِ مِنِ اعْتِبَارِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنَ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ، مِنِ اخْتِلَافِ الْأَرَضِينَ وَاخْتِلَافِ الزُّرُوعِ وَاخْتِلَافِ السَّقْيِ؛ لِيَعْلَمَ قَدْرَ مَا تَحْمِلُهُ الْأَرْضُ مِنْ خَرَاجِهَا، فَيَقْصِدُ الْعَدْلَ فِيهَا فِيمَا بَيْنَ أَهْلِهَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْفَيْءِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ تُجْحِفُ بِأَهْلِ الْخَرَاجِ، وَلَا نُقْصَانٍ يَضُرُّ بِأَهْلِ الْفَيْءِ نَظَرًا لِلْفَرِيقَيْنِ؛ وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اعْتَبَرَ شَرْطًا رَابِعًا وَهُوَ قُرْبُهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَالْأَسْوَاقِ وَبُعْدُهَا؛ لِزِيَادَةِ أَثْمَانِهَا وَنُقْصَانِهَا، وَهَذَا إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا يَكُونُ خَرَاجُهُ وَرِقًا، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيمَا يَكُونُ خَرَاجُهُ حَبًّا، وَتِلْكَ الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ تُعْتَبَرُ فِي الْحَبِّ وَالْوَرِقِ؛ وَإِذَا كَانَ الْخَرَاجُ مُعْتَبَرًا بِمَا وَصَفْنَا، فَكَذَلِكَ مَا اخْتَلَفَ قَدْرُهُ، وَجَازَ أَنْ يَكُونَ

خَرَاجُ كُلِّ نَاحِيَةٍ مُخَالِفًا لِخَرَاجِ غَيْرِهَا، وَلَا يَسْتَقْصِي فِي وَضْعِ الْخَرَاجِ غَايَةَ مَا يَحْتَمِلُهُ، وَلْيَجْعَلْ فِيهِ لِأَرْبَابِ الْأَرْضِ بَقِيَّةً يُجْبِرُونَ بِهَا النَّوَائِبَ وَالْحَوَائِجَ.

حُكِيَ أَنَّ الْحَجَّاجَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي أَخْذِ الْفَضْلِ مِنْ أَمْوَالِ السَّوَادِ فَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: لَا تَكُنْ عَلَى دِرْهَمِكَ الْمَأْخُوذِ أَحْرَصَ مِنْكَ عَلَى دِرْهَمِكَ الْمَتْرُوكِ، وَأَبْقِ لَهُمْ لُحُومًا يَعْقِدُونَ بِهَا شُحُومًا.

فَإِذَا تَقَرَّرَ الْخَرَاجُ بِمَا احْتَمَلَتْهُ الْأَرْضُ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا رَاعَى فِيهَا أَصْلَحَ الْأُمُورِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَضَعَهُ عَلَى مَسَائِحِ الْأَرْضِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَضَعَهُ عَلَى مَسَائِحِ الزَّرْعِ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَجْعَلَهَا مُقَاسَمَةً، فَإِنْ وَضَعَهُ عَلَى مَسَائِحِ الْأَرْضِ كَانَ مُعْتَبَرًا بِالسَّنَةِ الْهِلَالِيَّةِ، وَإِنْ وَضَعَهُ عَلَى مَسَائِحِ الزَّرْعِ كَانَ مُعْتَبَرًا بِالسَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ، وَإِنْ جَعَلَهُ مُقَاسَمَةً كَانَ مُعْتَبَرًا بِكَمَالِ الزَّرْعِ وَتَصْفِيَتِهِ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ عَلَى أَخْذِهَا مُقَدَّرًا بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ صَارَ ذَلِكَ مُؤَبَّدًا،

তৃতীয় প্রকার: যা আকাশ হতে বৃষ্টিপাত, তুষারপাত কিংবা শিশির দ্বারা সিক্ত হয় এবং একে ‘ইযয়ু’ বলা হয়।

চতুর্থ প্রকার: যা জমিন তার আর্দ্রতা এবং এর অভ্যন্তরে সঞ্চিত পানির মাধ্যমে সিক্ত করে, ফলে এর ফসল ও বৃক্ষরাজি তার শিকড়ের সাহায্যে পানি পান করে এবং একে ‘বাল’ বলা হয়। আর ‘গীল’ হলো যা নালার মাধ্যমে সেচ করা হয়; যদি তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয় তবে তা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, আর যদি তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত না হয় তবে তা দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ‘কাযায়িম’ হলো যা কূয়া থেকে সেচ করা হয়; যদি তা থেকে বৃহৎ বালতি বা মশকের সাহায্যে পানি তোলা হয় তবে তা দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, আর যদি তা নালা থেকে বের করে আনা হয় তবে তা ‘গীল’ হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। আমরা যা উল্লেখ করেছি তা যখন সুনির্ধারিত হবে, তখন খারাজ নির্ধারণকারীর জন্য আমরা বর্ণিত তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক—তা হলো ভূমির ভিন্নতা, ফসলের ভিন্নতা এবং সেচ পদ্ধতির ভিন্নতা; যাতে জমিন কতটুকু খারাজ বহন করতে সক্ষম তা নিরূপণ

করা যায়। এর মাধ্যমে তিনি ভূমিমালিক এবং ফায়-এর হকদারদের মধ্যে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন; যেন ভূমিমালিকদের ওপর এমন কোনো বাড়তি বোঝা চাপানো না হয় যা তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে এবং ফায়-এর হকদারদের প্রাপ্যও যেন হ্রাস না পায় যা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে—বরং উভয় পক্ষের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। কেউ কেউ চতুর্থ একটি শর্তের কথাও বিবেচনা করেছেন, তা হলো জনপদ ও বাজার থেকে ভূমির নৈকট্য বা দূরত্ব; কারণ এর ফলে ফসলের দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। এটি কেবল তখনই বিবেচিত হবে যখন খারাজ মুদ্রার মাধ্যমে আদায় করা হয়, কিন্তু শস্যের মাধ্যমে খারাজ আদায়ের ক্ষেত্রে এটি বিবেচিত হবে না। তবে প্রথমোক্ত তিনটি শর্ত শস্য এবং মুদ্রা—উভয় প্রকার খারাজেই প্রযোজ্য। যখন খারাজ আমাদের বর্ণিত মানদণ্ড অনুযায়ী নির্ধারিত হবে, তখন এর পরিমাণও ভিন্ন হবে এবং প্রতিটি অঞ্চলের খারাজ অন্য অঞ্চল থেকে পৃথক হওয়া বৈধ। তবে খারাজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমির সর্বোচ্চ বহনক্ষমতা নিঃশেষ করে ফেলা যাবে না; বরং ভূমিমালিকদের জন্য কিছু উদ্বৃত্ত রাখা উচিত যাতে তারা আকস্মিক বিপদ-আপদ ও প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

বর্ণিত আছে যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের নিকট ‘সাওয়াদ’ অঞ্চলের ভূমি থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের অনুমতি চেয়ে পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু খলিফা তাকে তা করতে নিষেধ করেন এবং পত্রে লেখেন: “যে দিরহাম তুমি গ্রহণ করছ, তার প্রতি তোমার লোভ যেন সেই দিরহামের চেয়ে বেশি না হয় যা তুমি তাদের জন্য ছেড়ে দিচ্ছ। তাদের গায়ে কিছু গোশত অবশিষ্ট থাকতে দাও যা দিয়ে তারা চর্বি তৈরি করতে পারে।”

ভূমির বহনক্ষমতা অনুযায়ী যখন খারাজ নির্ধারিত হবে, তখন নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে কল্যাণকর পদ্ধতিটি বেছে নিতে হবে:

প্রথমত: ভূমির আয়তনের ভিত্তিতে খারাজ নির্ধারণ করা।

দ্বিতীয়ত: আবাদকৃত ফসলি জমির পরিমাণের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা।

তৃতীয়ত: উৎপাদিত ফসলের অংশীদারিত্ব বা মুকাসামা নির্ধারণ করা। যদি ভূমির আয়তনের ভিত্তিতে খারাজ ধার্য করা হয়, তবে তা চান্দ্র বর্ষ অনুযায়ী হিসাব করা হবে। যদি আবাদকৃত ফসলি জমির পরিমাণের ভিত্তিতে হয়, তবে তা সৌর বর্ষ অনুযায়ী হবে। আর যদি ফসল ভাগাভাগির ভিত্তিতে হয়, তবে তা ফসল পূর্ণ হওয়া ও তা পরিচ্ছন্ন করার সময় বিবেচনা করা হবে। যখন প্রয়োজনীয় শর্তাবলি অনুযায়ী খারাজ নির্ধারিত হবে, তখন তা স্থায়ী হিসেবে গণ্য হবে,

لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ وَلَا يُنْقَصَ مِنْهُ مَا كَانَتِ الْأَرْضُونَ عَلَى أَحْوَالِهَا فِي سَقْيِهَا وَمَصَالِحِهَا.

فَإِنْ تَغَيَّرَ سَقْيُهَا وَمَصَالِحُهَا إِلَى الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ فَذَلِكَ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ حُدُوثُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِمْ، كَزِيَادَةٍ حَدَثَتْ بِشَقِّ أَنْهَارٍ أَوِ اسْتِنْبَاطِ مِيَاهٍ، أَوْ نُقْصَانٍ حَدَثَ لِتَقْصِيرٍ فِي عِمَارَتِهِ، أَوْ عُدُولٍ عَنْ حُقُوقٍ وَمَصْلَحَةٍ، فَيَكُونُ الْخَرَاجُ عَلَيْهِمْ بِحَالِهِ، لَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ فِيهِ لِزِيَادَةِ عِمَارَتِهِمْ فِيهِ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ لِنُقْصَانِهَا، وَيُؤْخَذُونَ بِالْعِمَارَةِ لِئَلَّا يَسْتَدِيمَ خَرَابُهُ فَيَتَعَطَّلَ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ حُدُوثُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِمْ، فَيَكُونُ النُّقْصَانُ لِشَقٍّ انْشَقَّ أَوْ نَهْرٍ تَعَطَّلَ؛ فَإِنْ كَانَ سَدُّهُ وَعَمَلُهُ مُمْكِنًا وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْمَلَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ، وَالْخَرَاجُ سَاقِطٌ عَنْهُمْ مَا لَمْ يَعْمَلْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمَلُهُ فَخَرَاجُ تِلْكَ الْأَرْضِ سَاقِطٌ عَنْ أَهْلِهَا إِذَا عُدِمَ الِانْتِفَاعُ بِهَا، فَإِنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهَا فِي غَيْرِ الزِّرَاعَةِ كَمَصَائِدَ أَوْ مَرَاعٍ جَازَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ وَضْعَ خَرَاجٍ عَلَيْهَا بِحَسَبِ مَا يَحْتَمِلُهُ الصَّيْدُ وَالْمَرْعَى، وَلَيْسَتْ كَالْأَرْضِ الْمَوَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَى مَصَائِدِهَا وَمَرَاعِيهَا خَرَاجٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ مَمْلُوكَةٌ وَأَرْضُ الْمَوَاتِ مُبَاحَةٌ.

أَمَّا الزِّيَادَةُ الَّتِي أَحْدَثَهَا اللَّهُ تعالى فَكَأَنْهَارٍ حَفَرَهَا السَّيْلُ وَصَارَتِ الْأَرْضُ بِهَا سَائِحَةً بَعْدَ أَنْ كَانَتْ تُسْقَى بِآلَةٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا عَارِضًا لَا يُوثَقُ بِدَوَامِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَادَ فِي الْخَرَاجِ، وَإِنْ وُثِقَ بِدَوَامِهِ رَاعَى الْإِمَامُ فِيهِ الْمَصْلَحَةَ لِأَرْبَابِ الضِّيَاعِ وَأَهْلِ الْفَيْءِ، وَعَمِلَ فِي الزِّيَادَةِ أَوِ الْمُتَارَكَةِ بِمَا يَكُونُ عَدْلًا بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ.

وَخَرَاجُ الْأَرْضِ إِذَا أَمْكَنَ زَرْعُهَا مَأْخُوذٌ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ تُزْرَعْ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ تَرَكَهَا مُخْتَارًا أَوْ مَعْذُورًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُؤْخَذُ مِنْهَا إِنْ كَانَ مُخْتَارًا وَيَسْقُطُ عَنْهَا إِنْ كَانَ مَعْذُورًا، وَإِذَا كَانَ خَرَاجُ مَا أَخَلَّ بِزَرْعِهِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ

الزُّرُوعِ أُخِذَ مِنْهُ فِيمَا أَخَلَّ بِزَرْعِهِ عَنْ أَقَلِّ مَا يُزْرَعُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى زَرْعِهِ لَمْ يُعَارَضْ فِيهِ.

وَإِذَا كَانَتْ أَرْضُ الْخَرَاجِ لَا يُمْكِنُ زَرْعُهَا فِي كُلِّ عَامٍ حَتَّى تُرَاحَ فِي عَامٍ وَتُزْرَعَ فِي عَامٍ آخَرَ، رُوعِيَ حَالُهَا فِي ابْتِدَاءِ وَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا، وَاعْتَبَرَ أَصْلَحَ أُمُورٍ لِأَرْبَابِ الضِّيَاعِ وَأَهْلِ الْفَيْءِ فِي خَصْلَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَجْعَلَ خَرَاجَهَا عَلَى الشَّطْرِ مِنْ خَرَاجِ مَا يُزْرَعُ فِي كُلِّ عَامٍ، فَيُؤْخَذُ

যতক্ষণ পর্যন্ত ভূমিগুলোর সেচ ব্যবস্থা ও উপযোগিতার অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর খরাজের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করা বৈধ নয়।

যদি এর সেচ ও উপযোগিতায় কোনো পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, তবে তা দুই প্রকার:

প্রথমত: বৃদ্ধি বা হ্রাস তাদের পক্ষ থেকে ঘটিত কোনো কারণে হওয়া; যেমন খাল খনন বা পানি উত্তোলনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া, অথবা আবাদের ক্ষেত্রে অবহেলার কারণে কিংবা ভূমির অধিকার ও উপযোগিতার বিষয়ে বিমুখ হওয়ার কারণে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া।

এমতাবস্থায় খরাজ তার পূর্বাবস্থাতেই বহাল থাকবে; আবাদ বৃদ্ধির কারণে তাদের ওপর খরাজ বাড়ানো হবে না, আবার আবাদ হ্রাসের কারণে তা কমানোও হবে না। বরং তাদের আবাদের জন্য বাধ্য করা হবে, যাতে অনাবাদী অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী না হয় এবং ভূমিটি অকেজো হয়ে না পড়ে।

দ্বিতীয়ত: বৃদ্ধি বা হ্রাস তাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণে ঘটা; যেমন ভাঙন ধরা বা পানির নালার প্রবাহ বন্ধ হওয়ার কারণে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া। যদি বাঁধ নির্মাণ বা সংস্কার কাজ সম্ভব হয়, তবে ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) কর্তব্য হলো বায়তুল মালের জনকল্যাণ খাত থেকে তা সম্পন্ন করা। সংস্কার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের থেকে খরাজ মওকুফ থাকবে। আর যদি সংস্কার করা সম্ভব না হয় এবং এর দ্বারা কৃষি উপযোগিতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে উক্ত ভূমির মালিকদের থেকে খরাজ মওকুফ হয়ে যাবে। তবে যদি কৃষিকাজ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়—যেমন মৎস্য শিকার বা চারণভূমি হিসেবে—তবে মৎস্য শিকার বা পশুচারণের সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন করে খরাজ নির্ধারণ করা বৈধ। এটি 'মাওয়াত' বা পরিত্যক্ত ভূমির মতো নয়, যেখানকার মৎস্য ক্ষেত্র বা চারণভূমির ওপর খরাজ

ধার্য করা জায়েজ নয়; কারণ এই ভূমিটি মালিকানাধীন, আর পরিত্যক্ত ভূমি সবার জন্য উন্মুক্ত।

আর মহান আল্লাহ তাআলা যে প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করেন—যেমন পাহাড়ি ঢল বা প্লাবনের ফলে প্রাকৃতিক নালা তৈরি হওয়া এবং এর ফলে যন্ত্রপাতির পরিবর্তে ভূমিটি সরাসরি প্রাকৃতিকভাবে সেচপ্রাপ্ত হওয়া—যদি এটি সাময়িক হয় এবং এর স্থায়িত্বের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া না যায়, তবে খরাজ বৃদ্ধি করা যাবে না। আর যদি তা স্থায়ী হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়, তবে ইমাম জমির মালিক ও ফায়-সম্পদ ভোগকারী মুসলিমদের পারস্পরিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং খরাজ বৃদ্ধি বা ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মাঝে ইনসাফপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ভূমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হলে তা থেকে খরাজ গ্রহণ করা হবে, যদিও তাতে চাষাবাদ করা না হয়। ইমাম মালিক রহ. বলেন: চাষাবাদ না করলে কোনো খরাজ নেই, চাই তা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করা হোক বা কোনো ওজরের কারণে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন: যদি স্বেচ্ছায় অনাবাদী রাখা হয় তবে খরাজ নেওয়া হবে, আর যদি যুক্তিসঙ্গত কোনো ওজরের কারণে হয় তবে তা মওকুফ হবে। যদি বিভিন্ন ফসলের প্রকারভেদে খরাজের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়, তবে চাষাবাদ না করার ক্ষেত্রে ওই জমিতে আবাদযোগ্য সর্বনিম্ন ফসলের খরাজ গ্রহণ করা হবে; কেননা সে যদি কেবল ওই ফসলটি আবাদ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তবে তাকে বাধা দেওয়া হতো না।

যদি খরাজি ভূমি প্রতি বছর আবাদ করা সম্ভব না হয়—বরং এক বছর বিশ্রাম দিয়ে অন্য বছর আবাদ করতে হয়—তবে খরাজ নির্ধারণের প্রারম্ভে এর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। এক্ষেত্রে জমির মালিক ও বায়তুল মালের হকদারদের জন্য তিনটি পদ্ধতির মধ্যে যেটি সবচেয়ে কল্যাণকর, তা বিবেচনা করা হবে: হয় এর খরাজ প্রতি বছর আবাদযোগ্য ভূমির খরাজের অর্ধেক নির্ধারণ করা হবে, ফলে প্রতি বছর তা গ্রহণ করা হবে...

مِنَ الْمَزْرُوعِ وَالْمَتْرُوكِ، وَإِمَّا أَنْ يَمْسَحَ كُلَّ جَرِيبَيْنِ مِنْهَا بِجَرِيبٍ؛ لِيَكُونَ أَحَدُهُمَا لِلْمَزْرُوعِ وَالْآخَرُ لِلْمَتْرُوكِ، وَإِمَّا أَنْ يَضَعَهُ بِكَمَالِهِ عَلَى مِسَاحَةِ الْمَزْرُوعِ وَالْمَتْرُوكِ، وَيَسْتَوْفِي مِنْ أَرْبَابِهِ الشَّطْرَ مِنْ زِرَاعِ أَرْضِهِمْ.

وَإِذَا كَانَ خَرَاجُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ مُخْتَلِفًا بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ، فَزُرِعَ أَوْ غُرِسَ مَا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ اُعْتُبِرَ خَرَاجُهُ بِأَقْرَبِ الْمَنْصُوصَاتِ بِهِ شَبَهًا وَنَفْعًا.

وَإِذَا زُرِعَتْ أَرْضُ الْخَرَاجِ مَا يُوجِبُ الْعُشْرَ لَمْ يَسْقُطْ عُشْرُ الزَّرْعِ بِخَرَاجِ الْأَرْضِ، وَجُمِعَ فِيهَا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَأَقْتَصِرُ عَلَى أَخْذِ الْخَرَاجِ وَإِسْقَاطِ الْعُشْرِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُنْقَلَ أَرْضُ الْخَرَاجِ إِلَى الْعُشْرِ، وَلَا أَرْضُ الْعُشْرِ إِلَى الْخَرَاجِ، وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ. وَإِذَا سُقِيَ بِمَاءِ الْخَرَاجِ أَرْضُ عُشْرٍ كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْهَا عُشْرًا، وَإِذَا سُقِيَ بِمَاءِ الْعُشْرِ أَرْضُ خَرَاجٍ كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْهَا خَرَاجًا، اعْتِبَارًا بِالْأَرْضِ دُونَ الْمَاءِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَبَرُ حُكْمُ الْمَاءِ، فَيُؤْخَذُ بِمَاءِ الْخَرَاجِ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ الْخَرَاجُ، وَيُؤْخَذُ بِمَاءِ الْعُشْرِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ الْعُشْرُ اعْتِبَارًا بِالْمَاءِ دُونَ الْأَرْضِ، وَاعْتِبَارُ الْأَرْضِ أَوْلَى مِنِ اعْتِبَارِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ مَأْخُوذٌ عَنِ الْأَرْضِ، وَالْعُشْرُ مَأْخُوذٌ عَنِ الزَّرْعِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَاءِ خَرَاجٌ وَلَا عُشْرٌ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ مَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ صَاحِبَ الْخَرَاجِ أَنْ يَسْقِيَ بِمَاءِ الْعُشْرِ، وَمَنَعَ صَاحِبَ الْعُشْرِ أَنْ يَسْقِيَ بِمَاءِ الْخَرَاجِ، وَلَمْ يَمْنَعْ الشَّافِعِيُّ رحمه الله وَاحِدًا مِنْهُمَا أَنْ يَسْقِيَ بِأَيِّ الْمَاءَيْنِ شَاءَ[1].

وَإِنْ بُنِيَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ أَبْنِيَةٌ مِنْ دُورٍ أَوْ حَوَانِيتَ؛ كَانَ خَرَاجُ الْأَرْضِ مُسْتَحَقًّا؛ لِأَنَّ

---

1 وإذا كانت أرض من أرض الخراج فإنَّ أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: ليس فيها عشر، لا يجتمع عشر وخراج وبه يأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه فيها العشر مع الخراج. قال الشافعي -رحمه الله تعالى: وإذا زرع الرجل أرضًا من أرض الخراج

فعليه في زرعها العشر، كما يكون عليه في رزع أرض لرجل تكاراها منه، وهي لذلك الرجل، أو هي صدقة موقوفة. قال: وإذا كانت الأرض من أرض العشر فإنَّ أبا حنيفة -رحمه الله تعالى- كان يقول: في كل قليل وكثير أخرجت من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة وغير ذلك من أصناف الغلة العشر ونصف العشر، والقليل والكثير في ذلك سواء، وإن كانت حزمة من بقل. [الأم: 7/ 143] .

আবাদকৃত এবং অনাবাদী ভূমির ক্ষেত্রে; হয় প্রতি দুই জারিব ভূমির জন্য এক জারিব হারে পরিমাপ করা হবে, যেন একটি আবাদকৃত এবং অপরটি অনাবাদীর জন্য নির্ধারিত হয়; অথবা পূর্ণ ভূমির ওপর (আবাদকৃত ও অনাবাদী মিলিয়ে) খরাজ ধার্য করা হবে এবং মালিকদের কাছ থেকে তাদের ভূমির ফসলের অর্ধাংশ আদায় করা হবে।

যদি ফসল ও ফলের খরাজ প্রকারভেদে ভিন্ন হয়, আর এমন কিছু চাষ বা রোপণ করা হয় যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই, তবে তার খরাজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে সাদৃশ্য ও উপযোগিতার দিক থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী বিষয়টিকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

যদি খরাজি ভূমিতে এমন ফসল চাষ করা হয় যা উশর (দশমাংশ) প্রদান বাধ্যতামূলক করে, তবে ভূমির খরাজের কারণে ফসলের উশর রহিত হবে না; বরং ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মাযহাব অনুযায়ী সেখানে উভয় হক (খরাজ ও উশর) একত্রিত করা হবে।

আর ইমাম আবু হানীফা বলেন: আমি উভয়কে একত্রিত করি না, বরং কেবল খরাজ গ্রহণের ওপর সীমাবদ্ধ থাকি এবং উশর রহিত করে দেই। খরাজি ভূমিকে উশরি ভূমিতে এবং উশরি ভূমিকে খরাজি ভূমিতে পরিবর্তন করা বৈধ নয়, যদিও ইমাম আবু হানীফা এটি বৈধ বলেছেন।

যদি খরাজি পানি দিয়ে উশরি ভূমি সেচ করা হয়, তবে আদায়কৃত অংশ উশর হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি উশরি পানি দিয়ে খরাজি ভূমি সেচ করা হয়, তবে আদায়কৃত অংশ খরাজ হিসেবে গণ্য হবে; অর্থাৎ এখানে ভূমির প্রকৃতিকে বিবেচনা করা হবে, পানিকে নয়।

তবে ইমাম আবু হানীফা বলেন: পানির বিধান বিবেচনা করা হবে। ফলে খরাজি পানি দিয়ে উশরি ভূমি সেচ করলে খরাজ নেওয়া হবে, আর উশরি পানি দিয়ে খরাজি ভূমি সেচ করলে উশর নেওয়া হবে; অর্থাৎ এখানে পানিকে বিবেচনা করা হবে, ভূমিকে নয়। অথচ পানির চেয়ে ভূমিকে বিবেচনা করাই অধিক যুক্তিযুক্ত; কারণ খরাজ নেওয়া হয় ভূমির বিনিময়ে আর উশর

নেওয়া হয় ফসলের ওপর, এবং পানির ওপর কোনো খরাজ বা উশর নেই, তাই সেচকার্যে ব্যবহৃত পানির কোনো প্রভাব এ ক্ষেত্রে থাকা উচিত নয়। এই মতভেদের ভিত্তিতেই ইমাম আবু হানীফা খরাজি ভূমির মালিককে উশরি পানি দিয়ে এবং উশরি ভূমির মালিককে খরাজি পানি দিয়ে সেচ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) তাদের কাউকেই ইচ্ছামতো যেকোনো পানি দিয়ে সেচ করতে নিষেধ করেননি ১।
আর যদি খরাজি ভূমিতে ঘরবাড়ি বা দোকানপাটের মতো কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা হয়, তবে ভূমির খরাজ প্রাপ্য হিসেবে বহাল থাকবে; কারণ

---

১. যদি কোনো ভূমি খরাজি ভূমির অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) বলতেন: তাতে উশর নেই, উশর ও খরাজ একত্রে জমা হয় না এবং তিনি এই মতই গ্রহণ করতেন। আর ইবনে আবি লায়লা বলতেন: খরাজের সাথে উশরও প্রদান করতে হবে। ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ তাআলা) বলেন: কোনো ব্যক্তি যদি খরাজি ভূমিতে চাষাবাদ করে তবে তার ফসলের ওপর উশর ওয়াজিব হবে, ঠিক যেমন অন্যের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া ভূমিতে অথবা ওয়াকফকৃত ভূমিতে চাষাবাদ করলে উশর দিতে হয়। তিনি আরও বলেন: যদি ভূমিটি উশরি ভূমির অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ তাআলা) বলতেন: গম, যব, কিশমিশ, খেজুর, ভুট্টা এবং অন্যান্য শস্যের যা কিছু উৎপন্ন হবে, তা পরিমাণে কম হোক বা বেশি, তাতে উশর (দশমাংশ) বা অর্ধেক উশর (বিশভাগের একভাগ) ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে অল্প ও অধিক উৎপাদনের বিধান সমান, এমনকি তা যদি এক আঁটি শাকও হয়। [আল-উম্ম: ৭/১৪৩]

(ص: 234)الأحكام السلطانية للماوردي

لِرَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَيْفَ شَاءَ، وَأَسْقَطَهُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ تُزْرَعَ أَوْ تُغْرَسَ، وَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّ مَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ بُنْيَانِهِ مِنْ مَقَامِهِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ لِزِرَاعَتِهَا عَفْوٌ يَسْقُطُ عَنْهُ خَرَاجُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِمَسْكَنٍ يَسْتَوْطِنُهُ، وَمَا جَاوَزَ قَدْرَ الْحَاجَةِ

مَأْخُوذٌ بِخَرَاجِهِ، وَإِذَا أُوجِرَتْ أَرْضُ الْخَرَاجِ أَوْ أُعِيرَتْ فَخَرَاجُهَا عَلَى الْمَالِكِ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: خَرَاجُهَا فِي الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَالِكِ، وَفِي الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْعَامِلُ وَرَبُّ الْأَرْضِ فِي حُكْمِهَا، فَادَّعَى الْعَامِلُ أَنَّهَا أَرْضُ خَرَاجٍ، وَادَّعَى رَبُّهَا أَنَّهَا أَرْضُ عُشْرٍ، وَقَوْلُهُمَا مُمْكِنٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ دُونَ الْعَامِلِ، فَإِنِ اتَّهَمَ أَحْلَفَ اسْتِظْهَارًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ فِي مِثْلِ هَذَا الِاخْتِلَافِ عَلَى شَوَاهِدِ الدَّوَاوِينِ السُّلْطَانِيَّةِ إِذَا عَلِمَ صِحَّتَهَا وَوُثِقَ بِكِتَابِهَا، وَقَلَّمَا يُشْكِلُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْحُدُودِ.

وَإِذَا ادَّعَى رَبُّ الْأَرْضِ دَفْعَ الْخَرَاجِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ قَوْلُهُ، وَلَوْ ادَّعَى دَفْعَ الْعُشْرِ قُبِلَ قَوْلُهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ فِي دَفْعِ الْخَرَاجِ عَلَى الدَّوَاوِينِ السُّلْطَانِيَّةِ إِذَا عَرَفَ صِحَّتَهَا اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ الْمُعْتَادِ فِيهَا، وَمَنْ أَعْسَرَ بِخَرَاجِهِ أُنْظِرَ بِهِ إِلَى إِيسَارِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ بِإِيسَارِهِ وَيَسْقُطُ بِالْإِعْسَارِ، وَإِذَا مَطَلَ بِالْخَرَاجِ مَعَ إِيسَارِهِ حُبِسَ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ لَهُ مَالٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ فِي خَرَاجِهِ كَالْمَدْيُونِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ غَيْرُ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَرَى جَوَازَ بَيْعِهَا بَاعَ مِنْهَا عَلَيْهِ بِقَدْرِ خَرَاجِهَا؛ وَإِنْ كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ أَجْرَاهَا عَلَيْهِ وَاسْتَوْفَى الْخَرَاجَ مِنْ مُسْتَأْجِرِهَا، فَإِنْ زَادَتِ الْأُجْرَةُ كَانَ عَلَيْهِ زِيَادَتُهَا، وَإِنْ نَقَصَتْ كَانَ عَلَيْهِ نُقْصَانُهَا، وَإِذَا عَجَزَ رَبُّ الْأَرْضِ عَنْ عِمَارَتِهَا قِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُؤَجِّرَهَا أَوْ تَرْفَعَ يَدَكَ عَنْهَا؛ لِتُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِعِمَارَتِهَا وَلَمْ يُتْرَكْ عَلَى خَرَابِهَا، وَإِنْ دَفَعَ خَرَاجَهَا لِئَلَّا تَصِيرَ بِالْخَرَابِ مَوَاتًا.

وَعَامِلُ الْخَرَاجِ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ وِلَايَتِهِ: الْحُرِّيَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْكِفَايَةُ، ثُمَّ يَخْتَلِفُ حَالُهُ بِاخْتِلَافِ وِلَايَتِهِ، فَإِنْ تَوَلَّى وَضْعَ الْخَرَاجِ اُعْتُبِرَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، وَإِنْ وَلِيَ جِبَايَةَ الْخَرَاجِ صَحَّتْ وِلَايَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا مُجْتَهِدًا، وَرِزْقُ عَامِلِ الْخَرَاجِ فِي مَالِ الْخَرَاجِ، كَمَا أَنَّ رِزْقَ عَامِلِ الصَّدَقَةِ فِي مَالِ الصَّدَقَةِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ، وَكَذَلِكَ أُجُورُ الْمُسَّاحِ.

وَأَمَّا أُجْرَةُ الْقَسَّامِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا. فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله إِلَى أُجُورِ قُسَّامِ

ভূমির মালিকের অধিকার আছে সেটিকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করার। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে, চাষাবাদ বা বৃক্ষরোপণ না করা পর্যন্ত তার ওপর খরাজ রহিত থাকবে। আমার অভিমত হলো, খরাজযোগ্য ভূমিতে চাষাবাদের প্রয়োজনে বসবাসের জন্য যতটুকু দালানকোঠা অপরিহার্য, তা মার্জনীয় এবং তার ওপর থেকে খরাজ রহিত হবে; কারণ স্থায়ীভাবে বসবাস ছাড়া চাষাবাদে স্থিতিশীলতা আসে না। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশের ওপর খরাজ ধার্য হবে। খরাজযোগ্য ভূমি ইজারা বা ধার দেওয়া হলে, এর খরাজ মালিকের ওপর বর্তাবে, ইজারাগ্রহণকারী বা ঋণগ্রহীতার ওপর নয়। ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন: ইজারার ক্ষেত্রে খরাজ মালিকের ওপর, তবে ধারের ক্ষেত্রে তা ব্যবহারকারীর ওপর বর্তাবে।

যদি কর্মকর্তা এবং ভূমির মালিক ভূমির হুকুমের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন—যেমন কর্মকর্তা দাবি করেন এটি খরাজী ভূমি এবং মালিক দাবি করেন এটি উশরী ভূমি—এবং উভয় দাবিই সম্ভবপর হয়, তবে মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে, কর্মকর্তার নয়। যদি সন্দেহ থাকে, তবে অতিরিক্ত সতর্কতাস্বরূপ শপথ গ্রহণ করানো হবে। এ ধরনের বিরোধের ক্ষেত্রে সুলতানি দিওয়ান বা রাষ্ট্রীয় নথিপত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা বৈধ, যদি সেগুলোর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হয় এবং নথিপত্র নির্ভরযোগ্য হয়। সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া সাধারণত এ নিয়ে খুব একটা জটিলতা সৃষ্টি হয় না।

ভূমির মালিক যদি খরাজ পরিশোধের দাবি করেন, তবে তার কথা গৃহীত হবে না। কিন্তু যদি তিনি উশর আদায়ের দাবি করেন, তবে তার কথা গ্রহণ করা হবে। খরাজ আদায়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নথিপত্রের প্রচলিত রীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করা জায়েজ, যদি তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি খরাজ পরিশোধে অক্ষম, তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন: সচ্ছল অবস্থায় খরাজ ওয়াজিব হয় এবং অসচ্ছলতায় তা রহিত হয়ে যায়। যদি সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও কেউ খরাজ আদায়ে টালবাহানা করে, তবে তাকে বন্দি করা হবে; যদি তার কোনো সম্পদ থাকে তবে সাধারণ ঋণের মতো তা বিক্রি করে খরাজ আদায় করা হবে। যদি খরাজী ভূমি ছাড়া তার আর কোনো সম্পদ না থাকে, তবে সুলতান যদি তা বিক্রয় বৈধ মনে করেন, তবে খরাজ পরিমাণ ভূমি বিক্রি করবেন। আর যদি তা বৈধ মনে না করেন, তবে তিনি তা ইজারা দেবেন এবং ইজারাগ্রহীতার নিকট থেকে

খরাজ উসুল করবেন। ইজারার পরিমাণ যদি খরাজের চেয়ে বেশি হয় তবে বাড়তি অংশ মালিকের প্রাপ্য হবে, আর কম হলে বাকিটুকু মালিকের দেনা হিসেবে থাকবে। যদি ভূমির মালিক আবাদ করতে অক্ষম হন, তবে তাকে বলা হবে: হয় আপনি এটি ইজারা দিন নতুবা এর দখল ছেড়ে দিন; যাতে এটি এমন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা যায় যে আবাদ করবে। ভূমিকে অনাবাদী অবস্থায় ফেলে রাখা যাবে না, যদি না সে খরাজ পরিশোধ করতে থাকে যাতে অনাবাদী থাকার কারণে তা পরিত্যক্ত ভূমিতে পরিণত না হয়।

খরাজ কর্মকর্তার নিয়োগ বৈধ হওয়ার জন্য স্বাধীনতা, বিশ্বস্ততা এবং কর্মদক্ষতা শর্ত। এরপর তার পদের ধরন অনুযায়ী যোগ্যতায় ভিন্নতা আসবে। যদি তাকে খরাজ নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে তাকে মুজতাহিদ পর্যায়ের ফকিহ হতে হবে। আর যদি তিনি শুধু খরাজ সংগ্রহের দায়িত্বে থাকেন, তবে মুজতাহিদ ফকিহ না হলেও তার নিয়োগ বৈধ হবে। খরাজ কর্মকর্তার পারিশ্রমিক খরাজ তহবিল থেকেই প্রদান করা হবে, যেমন সদকা কর্মকর্তার পারিশ্রমিক যাকাতের 'আমিলীন' বা সংগ্রাহকদের খাত থেকে দেওয়া হয়। ভূমি পরিমাপকদের পারিশ্রমিকের বিধানও তদ্রূপ।

পক্ষান্তরে বণ্টনকারীর পারিশ্রমিকের ব্যাপারে ফকিহগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (রহ.) বণ্টনকারীর পারিশ্রমিকের বিষয়ে এই মত পোষণ করেছেন যে...

(ص: 235)الأحكام السلطانية للماوردي

الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ مَعًا فِي حَقِّ الَّذِي اسْتَوْفَاهُ السُّلْطَانُ مِنْهُمَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أُجُورُ مَنْ يَقْسِمُ غَلَّةَ الْعُشْرِ وَغَلَّةَ الْخَرَاجِ وَسَطٌ مِنْ أَصْلِ الْكَيْلِ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: أُجُورُ الْخَرَاجِ عَلَى السُّلْطَانِ، وَأُجُورُ الْعُشْرِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَالَ مَالِكٌ: أُجُورُ الْعُشْرِ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ، وَأُجُورُ الْخَرَاجِ عَلَى الْوَسَطِ.

فصل:

وَالْخَرَاجُ حَقٌّ مَعْلُومٌ عَلَى مِسَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَاعْتُبِرَ فِي الْعِلْمِ بِهَا ثَلَاثَةُ مَقَادِيرَ تَنْفِي الْجَهَالَةَ عَنْهَا:

أَحَدُهَا: مِقْدَارُ الْجَرِيبِ بِالذِّرَاعِ الْمَسْمُوحِ بِهِ.

وَالثَّانِي: مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ الْمَأْخُوذِ بِهِ.

وَالثَّالِثُ: مِقْدَارُ الْكَيْلِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ.

فَأَمَّا الْجَرِيبُ فَهُوَ عَشْرُ قَصَبَاتٍ فِي عَشْرِ قَصَبَاتٍ، وَالْقَفِيزُ عَشْرُ قَصَبَاتٍ فِي قَصَبَةٍ، وَالْعَشِيرُ قَصَبَةٌ فِي قَصَبَةٍ، وَالْقَصَبَةُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ، فَيَكُونُ الْجَرِيبُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَسِتِّمِائَةِ ذِرَاعٍ مُكَسَّرَةٍ، وَالْقَفِيزُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا مُكَسَّرَةٌ وَهُوَ عُشْرُ الْجَرِيبِ، وَالْعَشِيرُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا وَهُوَ عُشْرُ الْقَفِيزِ، وَأَمَّا الذِّرَاعُ فَالْأَذْرُعُ سَبْعٌ أَقْصَرُهَا الْقَاضِيَةُ، ثُمَّ الْيُوسُفِيَّةُ ثُمَّ السَّوْدَاءُ، ثُمَّ الْهَاشِمِيَّةُ الصُّغْرَى وَهِيَ الْبِلَالِيَّةُ، ثُمَّ الْهَاشِمِيَّةُ الْكُبْرَى وَهِيَ الزِّيَادِيَّةُ، ثُمَّ الْعُمَرِيَّةُ، ثُمَّ الْمِيزَانِيَّةُ.

فَأَمَّا الْقَاضِيَةُ: وَتُسَمَّى ذِرَاعُ الدُّورِ، فَهِيَ أَقَلُّ مِنْ ذِرَاعِ السَّوْدَاءِ بِأُصْبُعٍ وَثُلُثَيْ أُصْبُعٍ، وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَهَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْقَاضِي، وَبِهَا يَتَعَامَلُ أَهْلُ كَلْوَاذَى.

وَأَمَّا الْيُوسُفِيَّةُ: وَهِيَ الَّتِي تَذْرَعُ بِهَا الْقُضَاةُ الدُّورَ بِمَدِينَةِ السَّلَامِ، فَهِيَ أَقَلُّ مِنَ الذِّرَاعِ السَّوْدَاءِ بِثُلُثَيْ أُصْبُعٍ، وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَهَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي.

وَأَمَّا الذِّرَاعُ السَّوْدَاءُ: فَهِيَ أَطْوَلُ مِنْ ذِرَاعِ الدُّورِ بِأُصْبُعٍ وَثُلُثَيْ أُصْبُعٍ، وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَهَا الرَّشِيدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى، قَدَّرَهَا بِذِرَاعِ خَادِمٍ أَسْوَدَ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَامَلُ بِهَا النَّاسُ فِي ذِرَاعِ الْبَزِّ وَالتِّجَارَةِ وَالْأَبْنِيَةِ وَقِيَاسِ نِيلِ مِصْرَ.

উশর এবং খরাজ উভয় ক্ষেত্রে সুলতান কর্তৃক যা সংগৃহীত হয়েছে তার পাওনা সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেন: উশরের শস্য এবং খরাজের শস্য বণ্টনকারীর মজুরি মূল পরিমাপের মধ্যভাগ থেকে প্রদান করা হবে। সুফিয়ান সাওরি বলেন: খরাজের মজুরি সুলতানের ওপর এবং উশরের মজুরি ভূমির মালিকের ওপর বর্তাবে। ইমাম মালিক বলেন: উশরের মজুরি ভূমির মালিকের ওপর এবং খরাজের মজুরি মধ্যম পর্যায় থেকে (যৌথভাবে) দিতে হবে।

পরিচ্ছেদ:

খরাজ হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমির ওপর নির্ধারিত একটি সুনির্দিষ্ট পাওনা। এর পরিমাপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য তিনটি মানদণ্ড বিবেচনা করা হয় যা এ সংক্রান্ত অস্পষ্টতা দূর করে:

প্রথমটি: অনুমোদিত জিরার (হাত) মাপে জারিবের পরিমাণ।

দ্বিতীয়টি: যে দিরহামের মাধ্যমে এটি আদায় করা হয় তার মান।

তৃতীয়টি: যে পরিমাপক পাত্রের মাধ্যমে তা পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয় তার পরিমাণ।

জারিব হলো দশ কাসাবাহ দৈর্ঘ্য ও দশ কাসাবাহ প্রস্থের ক্ষেত্রফল। কাফিজ হলো দশ কাসাবাহ দৈর্ঘ্য ও এক কাসাবাহ প্রস্থের ক্ষেত্রফল। আশির হলো এক কাসাবাহ দৈর্ঘ্য ও এক কাসাবাহ প্রস্থের ক্ষেত্রফল। এক কাসাবাহ হলো ছয় জিরা (হাত) পরিমাণ। সে হিসেবে এক জারিব হবে তিন হাজার ছয়শ বর্গজিরা। এক কাফিজ হবে তিনশ ষাট বর্গজিরা, যা এক জারিবের দশমাংশ। এক আশির হবে ছত্রিশ বর্গজিরা, যা এক কাফিজের দশমাংশ। আর জিরার মাপ হলো সাত প্রকার; তার মধ্যে ক্ষুদ্রতম হলো কাদিয়াহ, অতঃপর ইউসুফিয়াহ, অতঃপর সাওদা, অতঃপর হাশেমিয়াহ সুগরা যা বিলালিয়াহ নামে পরিচিত, অতঃপর হাশেমিয়াহ কুবরা যা জিয়াদিয়াহ নামে পরিচিত, অতঃপর উমরিয়াহ এবং পরিশেষে মিজানিয়াহ।

কাদিয়াহ সম্পর্কে বলা যায়: একে ঘরবাড়ির মাপের জিরা বলা হয়। এটি সাওদা জিরার চেয়ে এক আঙুল এবং আঙুলের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ছোট। এটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন কাজী ইবনে আবি লায়লা। কালওয়াযার অধিবাসীরা এর মাধ্যমেই লেনদেন করে থাকে।

ইউসুফিয়াহ সম্পর্কে বলা যায়: মদিনাতুস সালামে (বাগদাদ) বিচারকগণ ঘরবাড়ি পরিমাপ করার জন্য এটি ব্যবহার করেন। এটি সাওদা জিরার চেয়ে আঙুলের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ছোট। এটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন কাজী আবু ইউসুফ।

সাওদা জিরা সম্পর্কে বলা যায়: এটি ঘরবাড়ির মাপের জিরার চেয়ে এক আঙুল এবং আঙুলের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ দীর্ঘ। হারুনুর রশিদ (আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন) সর্বপ্রথম এটি প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁর সামনে দণ্ডায়মান জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ দাসের হাতের মাপ অনুযায়ী এটি নির্ধারণ করেছিলেন। কাপড় পরিমাপ, ব্যবসা-বাণিজ্য, দালানকোঠা নির্মাণ এবং মিশরের নীল নদের পানির স্তর পরিমাপের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ এটি ব্যবহার করে থাকে।

وَأَمَّا الذِّرَاعُ الْهَاشِمِيَّةُ الصُّغْرَى وَهِيَ الْبِلَالِيَّةُ، فَهِيَ أَطْوَلُ مِنَ الذِّرَاعِ السَّوْدَاءِ بِأُصْبُعَيْنِ وَثُلُثَيْ أُصْبُعٍ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهَا بِلَالُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، وَذَكَرَ أَنَّهَا ذِرَاعُ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، وَهِيَ أَنْقَصُ مِنَ الزِّيَادِيَّةِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عُشْرٍ، وَبِهَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ.

وَأَمَّا الْهَاشِمِيَّةُ الْكُبْرَى وَهِيَ ذِرَاعُ الْمِلْكِ، وَأَوَّلُ مَنْ نَقَلَهَا إِلَى الْهَاشِمِيَّةِ الْمَنْصُورُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى، فَهِيَ أَطْوَلُ مِنَ الذِّرَاعِ السَّوْدَاءِ بِخَمْسِ أَصَابِعَ وَثُلُثَيْ أُصْبُعٍ، فَتَكُونُ ذِرَاعًا وَثُمُنًا وَعُشْرًا بِالسَّوْدَاءِ، وَيَنْقُصُ عَنْهَا الْهَاشِمِيَّةُ الصُّغْرَى بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عُشْرٍ، وَسُمِّيَتْ زِيَادِيَّةً؛ لِأَنَّ زِيَادًا مَسَحَ بِهَا أَرْضَ السَّوَادِ، وَهِيَ الَّتِي يَذْرَعُ بِهَا أَهْلُ الْأَهْوَازِ.

وَأَمَّا الذِّرَاعُ الْعُمَرِيَّةُ فَهِيَ ذِرَاعُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، الَّتِي مَسَحَ بِهَا أَرْضَ السَّوَادِ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: رَأَيْتُ ذِرَاعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه الَّتِي مَسَحَ بِهَا أَرْضَ السَّوَادِ، وَهِيَ ذِرَاعٌ وَقَبْضَةٌ وَإِبْهَامٌ قَائِمَةٌ، قَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ: إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه عَمَدَ إِلَى أَطْوَلِهَا ذِرَاعًا وَأَوْسَطِهَا، فَجَمَعَ مِنْهَا ثَلَاثَةً وَأَخَذَ الثُّلُثَ مِنْهَا، وَزَادَ عَلَيْهِ قَبْضَةً وَإِبْهَامًا قَائِمَةً، ثُمَّ خَتَمَ فِي طَرَفَيْهِ بِالرَّصَاصِ، وَبَعَثَ بِذَلِكَ إِلَى حُذَيْفَةَ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ حَتَّى مَسَحَا بِهَا السَّوَادَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ مَسَحَ بِهَا بَعْدَهُ عُمَرُ بْنُ هُبَيْرَةَ1.

أَمَّا الذِّرَاعُ الْمِيزَانِيَّةُ فَتَكُونُ بِالذِّرَاعِ السَّوْدَاءِ ذِرَاعَيْنِ وَثُلُثَيْ ذِرَاعٍ وَثُلُثَيْ أُصْبُعٍ، وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَهَا الْمَأْمُونُ رضي الله عنه، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَامَلُ النَّاسُ فِيهَا فِي ذَرْعِ الْبَرَائِدِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْأَسْوَاقِ وَكِرَاءِ الْأَنْهَارِ وَالْحَفَائِرِ.

وَأَمَّا الدِّرْهَمُ: فَيَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى مَعْرِفَةِ وَزْنِهِ وَنَقْدِهِ، فَأَمَّا وَزْنُهُ فَقَدْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى أَنَّ وَزْنَ الدِّرْهَمِ سِتَّةُ دَوَانِيقَ، وَوَزْنَ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ، وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ اسْتِقْرَارِهِ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ، فَذَكَرَ قَوْمٌ أَنَّ الدَّرَاهِمَ كَانَتْ فِي أَيَّامِ

الْفُرْسِ مَضْرُوبَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْزَانٍ؛ مِنْهَا دِرْهَمٌ عَلَى وَزْنِ الْمِثْقَالِ عِشْرُونَ قِيرَاطًا، وَدِرْهَمٌ وَزْنُهُ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا، وَدِرْهَمٌ

---

1 هو عمر بن هبيرة بن معاوية بن سكين، الأمير أبو المثنَّى الفزاري الشامي، أمير العراقين ووالد أميرها يزيد، كان ينوب ليزيد بن عبد الملك فعزله هشام، وجمعت له العراق، ثم عزل بخالد القسري فقيده وألبسه عباءة وسجنه، فتحيل غلمانه ونقبوا سربًا أخرجوه منه، فهرب واستجار بالأمير مسلمة.

আর ক্ষুদ্রতর হাশেমি হস্ত (যিরা-এ-হাশেমিয়া সুগরা), যা বিলালি হস্ত নামেও পরিচিত; তা সিয়াহ বা কালো হস্ত (যিরা-এ-সাওদা) অপেক্ষা দুই আঙ্গুল ও এক আঙ্গুলের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ দীর্ঘ। এটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন বিলাল ইবনে আবি বুরদা এবং তিনি উল্লেখ করেন যে, এটি তাঁর দাদা আবু মুসা আল-আশআরি (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন)-এর হাতের পরিমাপ। এটি যিয়াদি হস্ত অপেক্ষা এক-দশমাংশের তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ ছোট এবং বসরা ও কুফার মানুষ এর মাধ্যমে লেনদেন করে থাকে।

আর বৃহত্তর হাশেমি হস্ত (যিরা-এ-হাশেমিয়া কুবরা) হলো রাজকীয় হস্ত (যিরা-উল-মুলক)। এটি সর্বপ্রথম হাশেমিদের ব্যবহারের জন্য আল-মানসুর (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) নির্ধারণ করেন। এটি সিয়াহ হস্ত অপেক্ষা পাঁচ আঙ্গুল ও এক আঙ্গুলের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ দীর্ঘ। ফলে সিয়াহ হস্তের মাপে এটি এক হস্ত, এক-অষ্টমাংশ ও এক-দশমাংশ পরিমাণ হয়। ক্ষুদ্রতর হাশেমি হস্ত এটি থেকে এক-দশমাংশের তিন-চতুর্থাংশ ছোট। একে যিয়াদিয়াও বলা হয়; কারণ যিয়াদ এর মাধ্যমে সাওয়াদ অঞ্চলের ভূমি জরিপ করেছিলেন এবং আহওয়াজবাসীরা এর মাধ্যমেই পরিমাপ করে থাকে।

আর উমারি হস্ত (যিরা-এ-উমারিয়া) হলো উমর ইবনুল খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন)-এর হস্তের মাপ, যা দিয়ে তিনি সাওয়াদ অঞ্চলের ভূমি জরিপ করেছিলেন। মুসা ইবনে তালহা বলেন: আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন)-এর সেই হস্তটি দেখেছি যা দিয়ে তিনি সাওয়াদ অঞ্চলের ভূমি পরিমাপ করেছিলেন; এর পরিমাণ ছিল এক হস্ত, এক মুষ্টি এবং একটি খাড়া বৃদ্ধাঙ্গুলি। হাকাম ইবনে উয়াইনা বলেন: উমর (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) দীর্ঘতম ও মধ্যম আকৃতির তিন ব্যক্তির হস্তের গড় গ্রহণ করেন এবং তার সাথে এক মুষ্টি

ও একটি খাড়া বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত যোগ করেন। অতঃপর এর উভয় প্রান্তে সীসা দিয়ে মোহর মেরে দেন এবং তা হুজাইফা ও উসমান ইবনে হুনাইফের কাছে পাঠিয়ে দেন যেন তাঁরা এর মাধ্যমে সাওয়াদ অঞ্চলের ভূমি জরিপ করেন। তাঁর পরে সর্বপ্রথম উমর ইবনে হুবাইরা ১ এর মাধ্যমে ভূমি জরিপ করেন।

আর মিজানি হস্তের পরিমাণ সিয়াহ হস্তের মাপে দুই হস্ত, এক হস্তের দুই-তৃতীয়াংশ এবং এক আঙ্গুলের দুই-তৃতীয়াংশ। এটি সর্বপ্রথম আল-মামুন (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) নির্ধারণ করেন। মানুষ ডাক বিভাগের দূরত্ব, ঘরবাড়ি ও বাজারের পরিমাপ এবং নদী ও গর্ত খননের পারিশ্রমিক নির্ধারণে এটি ব্যবহার করে।

আর দিরহামের ক্ষেত্রে এর ওজন ও মুদ্রা-মান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ওজনের ক্ষেত্রে ইসলামে এটি সাব্যস্ত হয়েছে যে, একটি দিরহামের ওজন হবে ছয় দানিক এবং প্রতি দশ দিরহামের ওজন হবে সাত মিসকাল। এই ওজনে স্থির হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন যে, পারস্য সম্রাটদের আমলে দিরহাম তিন ধরনের ওজনে তৈরি হতো; যার একটি ছিল মিসকালের ওজনে অর্থাৎ বিশ কিরাত, দ্বিতীয়টির ওজন ছিল বারো কিরাত এবং তৃতীয়টির ওজন ছিল...

---

১ তিনি হলেন উমর ইবনে হুবাইরা ইবনে মুআবিয়া ইবনে সুকাইন, আমির আবু আল-মুসান্না আল-ফাজারি আশ-শামি। তিনি দুই ইরাকের গভর্নর এবং সেখানকার গভর্নর ইয়াজিদের পিতা। তিনি ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালিকের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন, পরবর্তীতে হিশাম তাঁকে বরখাস্ত করেন। তাঁর অধীনে গোটা ইরাক একীভূত ছিল। পরে খালিদ আল-কাসরি তাঁকে পুনরায় বরখাস্ত করে শৃঙ্খলিত করেন এবং সাধারণ চট পরিহিত অবস্থায় কারারুদ্ধ করেন। তখন তাঁর ভৃত্যরা কৌশল অবলম্বন করে একটি সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তাঁকে সেখান থেকে বের করে আনে। তিনি পালিয়ে গিয়ে আমির মাসলামার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

وَزْنُهُ عَشَرَةُ قَرَارِيطَ، فَلَمَّا اُحْتِيجَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَى تَقْدِيرِهِ فِي الزَّكَاةِ أُخِذَ الْوَسَطُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْزَانِ الثَّلَاثَةِ، وَهُوَ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ قِيرَاطًا، فَكَانَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا مِنْ قَرَارِيطِ الْمِثْقَالِ، فَلَمَّا ضُرِبَتِ الدَّرَاهِمُ الْإِسْلَامِيَّةُ عَلَى الْوَسَطِ مِنْ هَذِهِ الْأَوْزَانِ الثَّلَاثَةِ قِيلَ فِي عَشَرَتِهَا: وَزْنُ سَبْعَةٍ مَثَاقِيلَ، وَإِنَّهَا كَذَلِكَ، وَذَكَرَ آخَرُونَ أَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ الدَّرَاهِمِ، وَأَنَّ مِنْهَا الْبَغْلِيَّ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ دَوَانِقَ، وَمِنْهَا الطَّبَرِيَّ وَهُوَ أَرْبَعَةُ دَوَانِقَ، وَمِنْهَا الْمَغْرِبِيَّ وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَوَانِقَ، وَمِنْهَا الْيَمَنِيَّ وَهُوَ دَانَقٌ، قَالَ: اُنْظُرُوا الْأَغْلَبَ مِمَّا يَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ مِنْ أَعْلَاهَا وَأَدْنَاهَا، فَكَانَ الدِّرْهَمُ الْبَغْلِيُّ، وَالدِّرْهَمُ الطَّبَرِيُّ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَكَانَا اثْنَيْ عَشَرَ دَانَقًا، فَأَخَذَ نِصْفَهَا فَكَانَ سِتَّةَ دَوَانِقَ، فَجَعَلَ الدِّرْهَمَ الْإِسْلَامِيَّ فِي سِتَّةِ دَوَانِيقَ، وَمَتَى زِدْتَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعِهِ كَانَ مِثْقَالًا، وَمَتَى نَقَصْتَ مِنَ الْمِثْقَالِ ثَلَاثَةَ أَعْشَارِهِ كَانَ دِرْهَمًا، فَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ، وَكُلُّ عَشَرَةِ مَثَاقِيلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعَانِ، فَأَمَّا النَّقْصُ فَمِنْ خَالِصِ الْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِمَغْشُوشِهِ مَدْخَلٌ فِي حُكْمِهِ، وَقَدْ كَانَ الْفُرْسُ عِنْدَ فَسَادِ أُمُورِهِمْ فَسَدَتْ نَقُودُهُمْ، فَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَنَقُودُهُمْ مِنَ الْعَيْنِ وَالْوَرِقِ غَيْرُ خَالِصَةٍ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَقُومُ فِي الْمُعَامَلَاتِ مَقَامَ الْخَالِصَةِ، وَكَانَ غِشُّهَا عَفْوًا لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ بَيْنَهُمْ، إِلَى أَنْ ضُرِبَتْ الدَّرَاهِمُ الْإِسْلَامِيَّةُ فَتَمَيَّزَ الْمَغْشُوشُ مِنَ الْخَالِصِ.

وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ مَنْ ضَرَبَهَا فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ الدَّرَاهِمَ الْمَنْقُوشَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَكَانَتْ الدَّنَانِيرُ تَرِدُ رُومِيَّةً وَالدَّرَاهِمُ تَرِدُ كِسْرَوِيَّةً وَحِمْيَرِيَّةً قَلِيلَةً، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَأَمَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْحَجَّاجَ أَنْ يَضْرِبَ الدَّرَاهِمَ بِالْعِرَاقِ، فَضَرَبَهَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ، وَقَالَ الْمَدَائِنِيُّ: بَلْ ضَرَبَهَا الْحَجَّاجُ فِي آخِرِ سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِضَرْبِهَا فِي النَّوَاحِي سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ، وَقِيلَ: إِنَّ الْحَجَّاجَ خَلَّصَهَا تَخْلِيصًا لَمْ يَسْتَقْصِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهَا {اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ} [الأخلاص: 1، 2] .

وَسُمِّيَتْ مَكْرُوهَةً، وَاخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ، فَقَالَ قَوْمٌ: لِأَنَّ الْفُقَهَاءَ كَرِهُوهَا لِمَا عَلَيْهَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَدْ يَحْمِلُهَا الْجُنُبُ وَالْمُحْدِثُ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: لِأَنَّ الْأَعَاجِمَ كَرِهُوا نُقْصَانَهَا فَسُمِّيَتْ مَكْرُوهَةً، ثُمَّ وَلِيَ بَعْدَ الْحَجَّاجِ عُمَرُ بْنُ هُبَيْرَةَ فِي أَيَّامِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ

এর ওজন ছিল দশ কিরাত। যখন ইসলামে যাকাতের নিসাব নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, তখন প্রচলিত তিনটি ওজনের গড় গ্রহণ করা হলো, যা ছিল বিয়াল্লিশ কিরাত। সে হিসেবে দিরহামের ওজন দাঁড়ালো মিসকালের কিরাত অনুযায়ী চৌদ্দ কিরাত। যখন এই তিন প্রকার ওজনের গড়ের ভিত্তিতে ইসলামী দিরহাম তৈরি করা হলো, তখন দশটি দিরহামের ওজন সম্পর্কে বলা হলো যে তা সাত মিসকালের সমান। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তেমনই ছিল। অন্যরা উল্লেখ করেছেন যে, এর কারণ হলো উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন দিরহামের ওজনের ভিন্নতা লক্ষ্য করলেন—যার মধ্যে 'বাগলি' ছিল আট দানিক, 'তাবারী' ছিল চার দানিক, 'মাগরিবী' ছিল তিন দানিক এবং 'ইয়ামানী' ছিল এক দানিক—তখন তিনি বললেন: মানুষ যেগুলোর মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি লেনদেন করে, তার মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের মুদ্রাগুলোর দিকে তাকাও। তখন 'বাগলি' এবং 'তাবারী' দিরহামের ওজনের সমন্বয় করা হলো, যার মোট ওজন হলো বারো দানিক। তিনি এর অর্ধেক গ্রহণ করলেন, যা হলো ছয় দানিক। এভাবে তিনি ইসলামী দিরহামের ওজন ছয় দানিক নির্ধারণ করলেন। যখনই আপনি এর সাথে এর তিন-সপ্তমাংশ যোগ করবেন, তা একটি মিসকালের ওজনের সমান হবে; আর যখন মিসকাল থেকে এর তিন-দশমাংশ বিয়োগ করবেন, তা একটি দিরহামের সমান হবে। সুতরাং প্রতি দশ দিরহাম হলো সাত মিসকাল, আর প্রতি দশ মিসকাল হলো চৌদ্দ এবং দুই-সপ্তমাংশ দিরহাম। তবে এই পরিমাপ কেবল বিশুদ্ধ রূপার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ভেজাল মিশ্রিত মুদ্রার জন্য এই বিধান প্রযোজ্য নয়। পারস্যবাসীদের শাসনব্যবস্থায় যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তখন তাদের মুদ্রাব্যবস্থাও কলুষিত হয়ে পড়েছিল। ফলে ইসলামের আগমনের সময় তাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাগুলো বিশুদ্ধ ছিল না; তবে লেনদেনে সেগুলো বিশুদ্ধ মুদ্রার মতোই গণ্য হতো। মুদ্রায় ভেজালের বিষয়টি তখন সহনীয় ছিল কারণ তা তাদের পারস্পরিক লেনদেনে কোনো প্রভাব ফেলত না। অবশেষে যখন ইসলামী দিরহাম তৈরি করা হলো, তখন ভেজাল মিশ্রিত মুদ্রা থেকে বিশুদ্ধ মুদ্রা পৃথক হয়ে গেল।

ইসলামে সর্বপ্রথম কে দিরহাম তৈরি করেছেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেন: নকশা খচিত দিরহাম সর্বপ্রথম তৈরি করেন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান। সে সময় স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) আসত রোম থেকে আর রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম) আসত পারস্য থেকে এবং অল্প কিছু আসত হিময়ার থেকে। আবুয যিনাদ বলেন: আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে ইরাকে দিরহাম তৈরির নির্দেশ দেন, ফলে তিনি ৭৪ হিজরিতে তা তৈরি করেন। আল-মাদায়িনী বলেন: বরং হাজ্জাজ ৭৫ হিজরির শেষভাগে তা তৈরি করেন এবং এরপর ৭৬ হিজরিতে বিভিন্ন অঞ্চলে তা তৈরির নির্দেশ দেন। বলা হয়ে থাকে যে, হাজ্জাজ দিরহামকে বিশেষভাবে বিশুদ্ধ করেছিলেন, তবে তা চূড়ান্ত পর্যায়ের ছিল না এবং তিনি তার ওপর 'আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী' উৎকীর্ণ করেছিলেন।
এগুলোকে 'মাকরূহ' (অপছন্দনীয়) বলা হতো। কেন এমন নাম দেওয়া হলো তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেন: ফকীহগণ এগুলো অপছন্দ করতেন কারণ এতে কুরআনের আয়াত ছিল, অথচ অপবিত্র বা জুনুব অবস্থায় থাকা ব্যক্তিও এগুলো বহন করতে পারত। অন্যরা বলেন: অনারবরা এর ওজন হ্রাস পাওয়ার কারণে একে অপছন্দ করত, তাই এর নাম হয়েছিল 'মাকরূহ'। হাজ্জাজের পর ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে উমর ইবনে হুবায়রা শাসনভার গ্রহণ করেন।

(ص: 238)الأحكام السلطانية للماوردي

فَضَرَبَهَا أَجْوَدَ مِمَّا كَانَتْ، ثُمَّ وَلِيَ بَعْدَهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيُّ1 فَشَدَّدَ فِي تَجْوِيدِهَا، وَضَرَبَ بَعْدَهُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فَأَفْرَطَ فِي التَّشْدِيدِ فِيهَا وَالتَّجْوِيدِ، فَكَانَتِ الْهُبَيْرِيَّةُ وَالْخَالِدِيَّةُ وَالْيُوسُفِيَّةُ أَجْوَدَ نَقْدِ بَنِي أُمَيَّةَ، وَكَانَ الْمَنْصُورُ رضي الله عنه لَا يَأْخُذُ فِي الْخَرَاجِ مِنْ نَقْدِهِمْ غَيْرَهَا.
وَحَكَى يَحْيَى بْنُ النُّعْمَانِ الْغِفَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ الدَّرَاهِمَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَمْرِ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ سَنَةَ سَبْعِينَ عَلَى ضَرْبِ الْأَكَاسِرَةِ، وَعَلَيْهَا

بَرَكَةٌ فِي جَانِبٍ، وَاَللَّهُ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ، ثُمَّ غَيَّرَهَا الْحَجَّاجُ بَعْدَ سَنَةٍ، وَكَتَبَ عَلَيْهَا بِسْمِ اللَّهِ فِي جَانِبٍ، وَالْحَجَّاجُ فِي جَانِبٍ، وَإِذَا خَلَصَ الْعَيْنُ وَالْوَرِقُ مِنْ غِشٍّ كَانَ هُوَ الْمُعْتَبَرَ فِي النُّقُودِ الْمُسْتَحَقَّةِ وَالْمَطْبُوعِ مِنْهَا بِالسِّكَّةِ السُّلْطَانِيَّةِ الْمَوْثُوقِ بِسَلَامَةِ طَبْعِهِ، الْمَأْمُونِ مِنْ تَبْدِيلِهِ وَتَلْبِيسِهِ، هُوَ الْمُسْتَحَقُّ دُونَ نِقَارِ الْفِضَّةِ وَسَبَائِكِ الذَّهَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوثَقُ بِهِمَا إِلَّا بِالسَّكِّ وَالتَّصْفِيَةِ وَالْمَطْبُوعُ مَوْثُوقٌ بِهِ، وَلِذَلِكَ كَانَ هُوَ الثَّابِتَ فِي الذِّمَمِ فِيمَا يُطْلَقُ مِنْ أَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ، وَلَوْ كَانَتِ الْمَطْبُوعَاتُ مُخْتَلِفَةَ الْقِيمَةِ مَعَ اتِّفَاقِهَا فِي الْجَوْدَةِ، فَطَالَبَ عَامِلُ الْخَرَاجِ بِأَعْلَاهَا قِيمَةً نَظَرَ: فَإِنْ كَانَ مِنْ ضَرْبِ سُلْطَانِ الْوَقْتِ أُجِيبَ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي الْعُدُولِ عَنْ ضَرْبِهِ مُبَايَنَةً لَهُ فِي الطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ ضَرْبِ غَيْرِهِ نَظَرَ: فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَأْخُوذَ فِي خَرَاجِ مَنْ تَقَدَّمَهُ أُجِيبَ إِلَيْهِ اسْتِصْحَابًا لِمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْخُوذًا فِيمَا تَقَدَّمَ كَانَتِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ غَبْنًا وَحَيْفًا.

وَأَمَّا مَكْسُورُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَلَا يَلْزَمُ أَخْذُهُ لِالْتِبَاسِهِ وَجَوَازِ اخْتِلَاطِهِ، وَلِذَلِكَ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا عَنِ الْمَضْرُوبِ الصَّحِيحِ، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَرَاهِيَةِ كَسْرِهَا، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ

---

1 هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد، أبو الهيثم البجليّ القسري، أمير مكة للوليد وسليمان، وأمير العراقين لهشام، وهو من أهل دمشق، وهو الذي قتل جعد بن درهم، وكان جوادًا سخيًّا ممدحًا فصيحًا، إلَّا أنه كان رجل سوء، كان يقع في علي ويذمّ بئر زمزم، وكان نحوًا من الحجَّاج، وبقي على ولاية العراق بضع عشرة سنة، ثم عزله هشام وولى يوسف بن عمر الثقفي.

2 مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أمير العراقيين، أبو عيسى وأبو عبد الله، لا رواية له، كان فارسًا شجاعًا جميلًا وسيمًا، حارب المختار وقتله، سار لحربه عبد الملك بن مروان، قُتِلَ مصعب يوم نصف جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين

وله أربعون سنة، وكان مصعب قد سار ليأخذ الشام فقصده عبد الملك فوقع بينهما ملحمة كبرى بدير الجاثليق.

তিনি তা পূর্বের তুলনায় উৎকৃষ্ট মানে নির্মাণ করলেন। অতঃপর তাঁর পরে খালিদ বিন আব্দুল্লাহ আল-কাসরি শাসনভার গ্রহণ করেন এবং তিনি মুদ্রার মান উন্নয়নে আরও কঠোরতা অবলম্বন করেন। এরপর ইউসুফ বিন উমর শাসনভার গ্রহণ করেন এবং তিনিও মুদ্রার মান ও উৎকর্ষ সাধনে চরম কঠোরতা প্রদর্শন করেন। ফলে 'হুবাইরিয়্যাহ', 'খালিদিয়্যাহ' এবং 'ইউসুফিয়্যাহ' মুদ্রাগুলো বনু উমাইয়ার উৎকৃষ্টতম মুদ্রায় পরিণত হয়। আল-মানসুর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) খারাজ (ভূমি কর) হিসেবে তাদের মুদ্রার মধ্যে এগুলি ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করতেন না।

ইয়াহইয়া ইবনে নুমান আল-গিফারি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, দিরহাম সর্বপ্রথম প্রস্তুত করেন মুসআব ইবনে যুবাইর তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের নির্দেশে সত্তর হিজরি সালে পারস্য সম্রাটদের মুদ্রার আদলে। তার এক পাশে 'বারাকাহ' (বরকত) এবং অন্য পাশে 'আল্লাহ' শব্দটি উৎকীর্ণ ছিল। অতঃপর এক বছর পর হাজ্জাজ তাতে পরিবর্তন আনেন এবং এক পাশে 'বিসমিল্লাহ' এবং অন্য পাশে 'হাজ্জাজ' নাম লিখে দেন। যখন স্বর্ণ ও রৌপ্য ভেজালমুক্ত হয়, তখন তা-ই পাওনা এবং মুদ্রার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হয়। যা রাজকীয় টাঁকশালে মুদ্রিত এবং যার মুদ্রণশৈলীর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত ও যা জালিয়াতি বা বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত, রৌপ্য বা স্বর্ণের পিণ্ডের পরিবর্তে বরং তা-ই পাওনা হিসেবে পরিশোধযোগ্য। কেননা সীলমোহর ও বিশোধন ব্যতীত স্বর্ণ-রৌপ্য পিণ্ডের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা যায় না, যেখানে মুদ্রিত মুদ্রা নির্ভরযোগ্য। এই কারণেই ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য এবং বিনষ্ট জিনিসের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে মুদ্রাই সাব্যস্ত থাকে। যদি মুদ্রিত মুদ্রাগুলোর মান অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর মূল্যে পার্থক্য থাকে, আর খারাজ আদায়কারী কর্মকর্তা সর্বোচ্চ মূল্যের মুদ্রা দাবি করেন, তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে: যদি তা বর্তমান শাসকের মুদ্রা হয় তবে তা মেনে নেওয়া হবে; কারণ শাসকের মুদ্রা বর্জন করা তাঁর আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার শামিল। আর যদি তা অন্যের মুদ্রিত মুদ্রা হয়, তবে দেখতে হবে: যদি পূর্ববর্তী শাসকদের সময় খারাজ হিসেবে তা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে পূর্বের ধারাবাহিকতায় তা মেনে নেওয়া হবে। আর যদি আগে তা গ্রহণ করা না হয়ে থাকে, তবে সেই মুদ্রার দাবি করা হবে লোকসান ও অন্যায্য।

আর ভাঙা বা ত্রুটিযুক্ত দিরহাম ও দিনার গ্রহণ করা আবশ্যক নয়, কারণ এতে সংশয় ও ভেজাল মিশ্রিত হওয়ার অবকাশ থাকে। এই কারণে এর মূল্য অক্ষত সহিহ মুদ্রার চেয়ে কম হয়। ফকিহগণ তা ভেঙে ফেলার (বা বিকৃত করার) অপছন্দীয়তার বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ইমাম মালিক ও অধিকাংশ...

---

১. তিনি হলেন খালিদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াজিদ বিন আসাদ, আবু হাইসাম আল-বাজালি আল-কাসরি। তিনি ওয়ালিদ ও সুলাইমানের পক্ষে মক্কার আমির এবং হিশামের পক্ষে ইরাকদ্বয়ের আমির ছিলেন। তিনি দামেস্কের অধিবাসী ছিলেন। তিনিই জা'দ বিন দিরহামকে হত্যা করেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল, উদার, প্রশংসিত ও বাগ্মী ছিলেন; তবে তিনি মন্দ লোক ছিলেন, তিনি আলীর (রা.) সমালোচনা করতেন এবং যমযম কূপের নিন্দা করতেন। তিনি স্বভাব-চরিত্রে হাজ্জাজের কাছাকাছি ছিলেন। প্রায় দশ বছরেরও বেশি সময় তিনি ইরাকের শাসকের দায়িত্বে ছিলেন, এরপর হিশাম তাঁকে পদচ্যুত করে ইউসুফ বিন উমর আস-সাকাফিকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

২. মুসআব ইবনে যুবাইর ইবনুল আওয়াম আল-কুরাশি আল-আসাদি, ইরাকদ্বয়ের আমির। তাঁর কুনিয়াত আবু ঈসা এবং আবু আব্দুল্লাহ। তাঁর থেকে কোনো হাদিস বর্ণিত নেই। তিনি অত্যন্ত সাহসী বীর, সুশ্রী ও রূপবান ছিলেন। তিনি মুখতারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাকে হত্যা করেন। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বাহাত্তর হিজরি সালের জমাদিউল উলা মাসের মাঝামাঝি সময়ে চল্লিশ বছর বয়সে মুসআব নিহত হন। মুসআব শাম (সিরিয়া) দখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, তখন আব্দুল মালিক তাঁর দিকে অগ্রসর হন এবং দাইরুল জাসালিক নামক স্থানে তাঁদের মধ্যে এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

(ص: 239)الأحكام السلطانية للماوردي

فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ إِلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، وَيُنْكَرُ عَلَى فَاعِلِهِ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْرِ الْمُسْلِمِينَ سِكَّةَ الْجَارِيَةِ بَيْنَهُمْ.

وَالسِّكَّةُ هِيَ الْحَدِيدَةُ الَّتِي يُطْبَعُ عَلَيْهَا الدَّرَاهِمُ؛ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ سِكَّةً، وَقَدْ كَانَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وُلَاةُ بَنِي أُمَيَّةَ حَتَّى أَسْرَفُوا فِيهِ، فَحُكِيَ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ رَجُلًا قَطَعَ دِرْهَمًا مِنْ دَرَاهِمِ فَارِسٍ فَقَطَعَ يَدَهُ، وَهَذَا عُدْوَانٌ مَحْضٌ، وَلَيْسَ لَهُ فِي التَّأْوِيلِ مَسَاغٌ.

وَحَكَى الْوَاقِدِيُّ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ1 كَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَعَاقَبَ مَنْ قَطَعَ الدَّرَاهِمَ وَضَرَبَهُ ثَلَاثِينَ سَوْطًا وَطَافَ بِهِ، قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَهَذَا عِنْدَنَا فِيمَنْ قَطَعَهَا وَدَسَّ فِيهَا الْمُفَرَّغَةَ وَالزُّيُوفَ، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ فَمَا فَعَلَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لَيْسَ بِعُدْوَانٍ؛ لِأَنَّهُ مَا خَرَجَ بِهِ عَنْ حَدِّ التَّعْزِيرِ وَالتَّعْزِيرُ عَلَى التَّدْلِيسِ مُسْتَحَقٌّ، وَأَمَّا فِعْلُ مَرْوَانَ فَظُلْمٌ وَعُدْوَانٌ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَفُقَهَاءُ الْعِرَاقِ إِلَى أَنَّ كَسْرَهَا غَيْرُ مَكْرُوهٍ، وَقَدْ حَكَى صَالِحُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تعالى: {أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود: 87] . قَالَ: كَسْرُ الدَّرَاهِمِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَسَرَهَا لِحَاجَةٍ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ؛ وَإِنْ كَسَرَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ كُرِهَ لَهُ؛ لِأَنَّ إِدْخَالَ النَّقْصِ عَلَى الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ سَفَهٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنْ كَانَ عَلَيْهَا اسْمُ اللَّهِ عز وجل كُرِهَ كَسْرُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا اسْمُهُ لَمْ يُكْرَهْ.

وَأَمَّا الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ السِّكَّةِ، فَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَاضِي الْبَصْرَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كَسْرِهَا؛ لِتُعَادَ تِبْرًا فَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا مُرْصَدَةً لِلنَّفَقَةِ، وَحَمَلَهُ آخَرُونَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كَسْرِهَا؛ لِيَتَّخِذَ مِنْهَا أَوَانِيَ وَزُخْرُفَ، وَحَمَلَهُ آخَرُونَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ أَطْرَافِهَا قَرْضًا بِالْمَقَارِيضِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ يَتَعَامَلُونَ بِهَا عَدَدًا، فَصَارَ أَخْذُ أَطْرَافِهَا بَخْسًا وَتَطْفِيفًا.

وَأَمَّا الْكَيْلُ فَإِنْ كَانَ مُقَاسَمَةً فَبِأَيِّ قَفِيزٍ كِيلَ تَعَدَّلَتْ فِيهِ الْقِسْمَةُ، وَإِنْ كَانَ خَرَاجًا مُقَدَّرًا

---

1 أبان بن عثمان بن عفان؛ سمع أباه وزيد بن ثابت، وكانت ولايته على المدينة سبع سنين، روى له مسلم والأربعة، قال الأموي المدني: توفِّي سنة خمس ومائة، وقيل: مات قبل عبد الملك في عشر التسعين للهجرة.

মদিনার ফকীহগণ এই অভিমত পোষণ করেন যে, এটি মাকরূহ; কেননা এটি জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত এবং এর কর্তাকে তিরস্কার করা হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত মুদ্রার ছাঁচ ভাঙতে নিষেধ করেছেন।

আর সিক্কাহ হলো সেই লোহা যা দিয়ে দিরহামের ওপর সিল মারা হয়; এই কারণেই মুদ্রিত দিরহামকে সিক্কাহ বলা হয়। উমাইয়া বংশের শাসকরা এর নিন্দা করতেন, এমনকি তারা এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনও করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, মারওয়ান ইবনুল হাকাম এক ব্যক্তিকে ধরেছিলেন যে পারস্যের দিরহামের একটি অংশ কেটে ফেলেছিল, ফলে তিনি তার হাত কেটে দেন। এটি ছিল নিছক বাড়াবাড়ি এবং শরয়ি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এর কোনো অবকাশ নেই। ওয়াকিদি বর্ণনা করেন যে, আবান ইবনে উসমান ১ মদিনার দায়িত্বে থাকাকালীন দিরহাম কর্তনকারীকে শাস্তি দিতেন এবং তাকে তিরিশটি বেত্রাঘাত করে জনসমক্ষে ঘুরিয়ে দেখাতেন। ওয়াকিদি বলেন: আমাদের নিকট এটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে মুদ্রা কর্তন করে তাতে ফাঁপা বা মেকি দিরহাম ঢুকিয়ে দেয়। যদি বিষয়টি ওয়াকিদি যা বলেছেন তেমন হয়, তবে আবান ইবনে উসমান যা করেছেন তা বাড়াবাড়ি নয়; কেননা তিনি তা'যীর বা শাসনমূলক শাস্তির সীমা অতিক্রম করেননি এবং প্রতারণার জন্য তা'যীর প্রাপ্য। তবে মারওয়ানের কাজ ছিল জুলুম ও অন্যায়। আবু হানিফা এবং ইরাকের ফকীহগণ মনে করেন যে, মুদ্রা ভাঙা মাকরূহ নয়। সালেহ ইবনে হাফস উবাই ইবনে কাব থেকে আল্লাহর বাণী: {অথবা আমাদের ধন-সম্পদে আমরা যা ইচ্ছা তা করব} [হুদ: ৮৭] এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন: এটি হলো দিরহাম ভেঙে ফেলা। ইমাম শাফিঈ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন)-এর মাযহাব হলো, তিনি বলেছেন: যদি কেউ প্রয়োজনে তা ভেঙে ফেলে তবে তার জন্য তা মাকরূহ হবে না;

আর যদি প্রয়োজন ছাড়া তা ভাঙে তবে তা মাকরূহ হবে; কারণ প্রয়োজন ছাড়া সম্পদের ক্ষতি সাধন করা নির্বুদ্ধিতা। আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন: যদি মুদ্রার ওপর মহান আল্লাহর নাম থাকে তবে তা ভাঙা মাকরূহ, আর যদি তাঁর নাম না থাকে তবে তা মাকরূহ নয়।
আর মুদ্রা ভাঙার নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে বসরা শহরের কাজী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনসারী একে এই অর্থে গ্রহণ করতেন যে, মুদ্রা ভেঙে যেন তা পুনরায় পিণ্ডে পরিণত না করা হয়; বরং তা মুদ্রারূপেই খরচের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অন্যগণ একে এই অর্থে গ্রহণ করেছেন যে, মুদ্রা ভেঙে তা দিয়ে অলংকার ও সাজসজ্জার সামগ্রী তৈরি করা যাবে না। আবার অন্যগণ একে কাঁচি দিয়ে মুদ্রার কিনার কেটে নেয়ার নিষেধাজ্ঞার ওপর প্রয়োগ করেছেন; কারণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে তারা মুদ্রা সংখ্যার হিসেবে লেনদেন করত, ফলে মুদ্রার চারপাশ কেটে নেয়া ওজনে কম দেওয়া ও প্রতারণার শামিল হয়ে দাঁড়ায়।
আর মাপের ক্ষেত্রে যদি তা অংশীদারিত্বের বণ্টন হয়, তবে যে পরিমাপক পাত্র দিয়েই মাপা হোক না কেন তাতে বণ্টন সুষম হবে। আর যদি তা নির্ধারিত খেরাজ হয়...

---

১. আবান ইবনে উসমান ইবনে আফফান; তিনি তাঁর পিতা ও যায়িদ ইবনে সাবিত থেকে হাদীস শুনেছেন। মদিনায় তাঁর শাসনকাল ছিল সাত বছর। ইমাম মুসলিম এবং চার সুনান গ্রন্থকার তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল-উমাবী আল-মাদানি বলেন: তিনি ১০৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মতান্তরে তিনি হিজরি নব্বইয়ের দশকে আব্দুল মালিকের ইন্তেকালের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন।

(ص: 240)الأحكام السلطانية للماوردي

فَقَدْ حَكَى الْقَاسِمُ أَنَّ الْقَفِيزَ الَّذِي وَضَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى أَرْضِ السَّوَادِ فَأَمْضَاهُ عُمَرُ رضي الله عنه كَانَ مَكِيلًا لَهُمْ يُعْرَفُ بِالشَّابِرْقَانِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَهُوَ الْمَخْتُومُ الْحَجَّاجِي، وَقِيلَ: وَزْنُهُ ثَلَاثُونَ رِطْلًا، فَإِنْ اُسْتُؤْنِفَ وَضْعُ الْخَرَاجِ كَيْلًا مُقَدَّرًا

عَلَى نَاحِيَةٍ مُبْتَدَأَةٍ رُوعِيَ فِيهِ مِنَ الْمَكَايِيلِ مَا اسْتَقَرَّ مَعَ أَهْلِهَا مِنْ مَشْهُورِ الْقُفْزَانِ بِتِلْكَ النَّاحِيَةِ.

কাসিম বর্ণনা করেছেন যে, উসমান ইবনে হুনাইফ সওয়াদ অঞ্চলের ভূমির ওপর যে 'কাফিজ' নির্ধারণ করেছিলেন এবং উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যা বহাল রেখেছিলেন, তা তাদের নিকট 'শাবিরকান' নামে পরিচিত একটি পরিমাপক ছিল। ইয়াহইয়া ইবনে আদম বলেন: এটিই 'মাখতুম হাজ্জাজি'। জনশ্রুতি রয়েছে যে, এর ওজন ছিল ত্রিশ রতল। অতএব, যদি নতুন কোনো অঞ্চলে নির্ধারিত পরিমাপে নতুনভাবে খারাজ ধার্য করা শুরু হয়, তবে সেক্ষেত্রে ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট প্রচলিত প্রসিদ্ধ পরিমাপকসমূহ বিবেচনা করা হবে।

(ص: 241)الأحكام السلطانية للماوردي

الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِيمَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ مِنَ الْبِلَادِ

بِلَادُ الْإِسْلَامِ تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: حَرَمٌ، وَحِجَازٌ، وَمَا عَدَاهُمَا.

أَمَّا الْحَرَمُ فَمَكَّةُ وَمَا طَافَ بِهَا مِنْ نُصُبِ حَرَمِهَا، وَقَدْ ذَكَرَهَا اللَّهُ تعالى بِاسْمَيْنِ فِي كِتَابِهِ: مَكَّةَ وَبَكَّةَ، فَذَكَرَ مَكَّةَ فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} [الفتح: 24] .

وَمَكَّةُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: تَمَكَّكْتُ الْمُخَّ مِنَ الْعَظْمِ تَمَكُّكًا: إِذَا اسْتَخْرَجْتَهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهَا تَمُكُّ الْفَاجِرُ عَنْهَا وَتُخْرِجُهُ مِنْهَا، عَلَى مَا حَكَاهُ الْأَصْمَعِيُّ، وَأَنْشَدَ قَوْلَ الرَّاجِزِ فِي تَلْبِيَتِهِ:

يَا مَكَّةُ الْفَاجِرَ مُكِّي مَكَّا ... وَلَا تَمُكِّي مُذْحِجًا وَعَكَّا

وَذَكَرَ بَكَّةَ فِي قَوْلِهِ عز وجل: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا} [آل عمران: 96] .

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: وَسُمِّيَتْ بَكَّةُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَبُكُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيهَا، أَيْ: يَدْفَعُ، وَأَنْشَدَ "مِنَ الرَّجَزِ":

إِذَا الشِّرِّيبُ أَخَذَتْهُ أَكَّهْ ... فَخَلِّهِ حَتَّى يُبَكَّ بَكَّهْ

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ، فَقَالَ قَوْمٌ: هُمَا لُغَتَانِ وَالْمُسَمَّى بِهِمَا وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تُبْدِلُ الْمِيمَ بِالْبَاءِ فَتَقُولُ: ضَرْبَةُ لَازِمٍ وَضَرْبَةُ لَازِبٍ؛ لِقُرْبِ الْمَخْرَجَيْنِ، وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُمَا اسْمَانِ وَالْمُسَمَّى بِهِمَا شَيْئَانِ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْأَسْمَاءِ مَوْضُوعٌ لِاخْتِلَافِ الْمُسَمَّى، وَمَنْ قَالَ: بِهَذَا اخْتَلَفَ فِي الْمُسَمَّى بِهِمَا عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّ مَكَّةَ اسْمُ الْبَلَدِ كُلِّهِ، وَبَكَّةُ اسْمُ الْبَيْتِ، وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي أَيُّوبَ.

وَالثَّانِي: إِنَّ مَكَّةَ الْحَرَمُ كُلُّهُ وَبَكَّةُ الْمَسْجِدُ، وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَحَكَى مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ مَكَّةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُسَمَّى صَلَاحًا لِأَمْنِهَا، وَأَنْشَدَ قَوْلَ

চতুর্দশ অধ্যায়: ভূখণ্ডের ভিন্নতা অনুযায়ী বিধিবিধানের পার্থক্য

ইসলামি ভূখণ্ড তিন ভাগে বিভক্ত: হারাম, হিজাজ এবং এ দুটি ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ।

হারাম হলো মক্কা এবং এর চারপাশের সেই এলাকা যা হারামের সীমানা চিহ্ন দ্বারা পরিবেষ্টিত।

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মক্কাকে দুটি নামে উল্লেখ করেছেন: মক্কা ও বাক্কা। তিনি মক্কার উল্লেখ করেছেন মহান পরাক্রমশালী সত্তার বাণীতে: {তিনিই সেই সত্তা যিনি মক্কার উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলেন, তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী করার পর} [আল-ফাতহ: ২৪]।

মক্কা শব্দটি গৃহীত হয়েছে আরবদের এই কথা থেকে: আমি হাড় থেকে মজ্জা নিংড়ে বের করেছি; কারণ মক্কা পাপাচারীদের নিংড়ে ফেলে এবং সেখান থেকে বের করে দেয়, যেমনটি আসমায়ি বর্ণনা করেছেন। তিনি জনৈক কবির তালবিয়া আবৃত্তি করেছেন:

হে মক্কা! পাপাচারীকে ধ্বংস করো পুরোপুরি ... কিন্তু মুজহিজ ও আক্ক গোত্রকে ধ্বংস করো না

আর তিনি বাক্কা শব্দটি উল্লেখ করেছেন মহান পরাক্রমশালী সত্তার বাণীতে: {নিশ্চয়ই মানুষের ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘরটি স্থাপিত হয়েছে, সেটিই হলো যা বাক্কায় অবস্থিত, কল্যাণময় হিসেবে} [আলে ইমরান: ৯৬]।
আসমায়ি বলেছেন: একে বাক্কা নামকরণ করা হয়েছে কারণ সেখানে মানুষ একে অপরকে ধাক্কা দেয়, অর্থাৎ ভিড়ের চাপে ঠেলাঠেলি করে। তিনি রাজেয ছন্দের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন:
যখন কোনো পানকারী ক্লান্তিতে আক্রান্ত হয় ... তখন তাকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না সে ভিড়ের চাপে পিষ্ট হয়
এই নাম দুটি সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেছেন: এই দুটি মূলত একই শব্দের দুটি রূপ এবং যা নির্দেশ করা হয়েছে তা এক; কারণ আরবরা মীম বর্ণকে বা দ্বারা পরিবর্তন করে থাকে, তাই তারা উচ্চারণের নৈকট্যের কারণে দারবাতু লাযিম এবং দারবাতু লাযিব উভয়ই বলে থাকে। এটি মুজাহিদের অভিমত।
অন্যরা বলেছেন: বরং এ দুটি পৃথক নাম এবং এ দুটির দ্বারা দুটি ভিন্ন বস্তু উদ্দেশ্য; কারণ নামের ভিন্নতা সাধারণত নামধারী বস্তুর ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে হয়। যারা এই মত পোষণ করেন, তারা নাম দুটি কী নির্দেশ করে সে বিষয়ে দুটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:
প্রথমটি হলো: মক্কা হলো পুরো শহরের নাম এবং বাক্কা হলো কাবার নাম। এটি ইব্রাহিম নাখয়ি এবং ইয়াহইয়া ইবনে আবি আইয়ুবের অভিমত।
দ্বিতীয়টি হলো: মক্কা হলো পুরো হারাম এলাকা এবং বাক্কা হলো মসজিদ (মাসজিদুল হারাম)। এটি যুহরি এবং যায়েদ ইবনে আসলামের অভিমত। মুসআব ইবনে আবদুল্লাহ আল-যুবাইরি বর্ণনা করেছেন যে, জাহেলিয়াত যুগে মক্কা তার নিরাপদ অবস্থার কারণে 'সালাহ' নামে অভিহিত হতো। তিনি এই পঙক্তিটি আবৃত্তি করেছেন:

أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ لِابْنِ الْحَضْرَمِيِّ "مِنَ الْوَافِرِ":

أَبَا مَطَرٍ هَلُمَّ إِلَى صَلَاحِ ... فَيَكْفِيكَ النَّدَامَى مِنْ قُرَيْشِ
وَتَنْزِلُ بَلْدَةً عَزَّتْ قَدِيمًا ... وَتَأْمَنُ أَنْ يَزُورَكَ رَبُّ جَيْشِ

وَحَكَى مُجَاهِدٌ أَنَّ أُمَّ زَحْمٍ وَالْبَاسَّةَ، فَأَمَّا أُمُّ زَحْمٍ؛ فَلِأَنَّ النَّاسَ يَتَزَاحَمُونَ بِهَا وَيَتَنَازَعُونَ، وَأَمَّا الْبَاسَّةُ فَلِأَنَّهَا تَبُسُّ مِنَ الْحَدِّ فِيهَا، أَيْ: تُحَطِّمُهُ وَتُهْلِكُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تعالى: {وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا} [الواقعة: 5] .

وَيُرْوَى النَّاسَّةُ بِالنُّونِ، وَمَعْنَاهُ: إِنَّهَا تَنِسُّ مِنَ الْحَدِّ فِيهَا، أَيْ: تَطْرُدُهُ وَتَنْفِيهِ، وَأَصْلُ مَكَّةَ وَحُرْمَتُهَا مَا عَظَّمَهُ اللَّهُ سبحانَهُ مِنْ حُرْمَةِ بَيْتِهِ، حَتَّى جَعَلَهَا لِأَجْلِ الْبَيْتِ الَّذِي أَمَرَ بِرَفْعِ قَوَاعِدِهِ، وَجَعَلَهُ قِبْلَةَ عِبَادِهِ، أُمُّ الْقُرَى كَمَا قَالَ اللَّهُ سبحانَهُ: {لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا} [الشوري: 7] .

وَحَكَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهم أَنَّ سَبَبَ وَضْعِ الْبَيْتِ وَالطَّوَافِ بِهِ، أَنَّ اللَّهَ تعالى قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 30] .

فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ فَعَاذُوا بِالْعَرْشِ، فَطَافُوا حَوْلَهُ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ يَسْتَرْضُونَ رَبَّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ.

وَقَالَ لَهُمْ: ابْنُوا لِي فِي الْأَرْضِ بَيْتًا يَعُوذُ بِهِ مَنْ سَخِطْتُ عَلَيْهِ مِنْ بَنِي آدَمَ، وَيَطُوفُ حَوْلَهُ كَمَا فَعَلْتُمْ بِعَرْشِي فَأَرْضَى عَنْهُمْ، فَبَنَوْا لَهُ هَذَا الْبَيْتَ، فَكَانَ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، قَالَ اللَّهُ تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ} [آل عمران: 96] . فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلْعِبَادَةِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ كَانَ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِغَيْرِهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ وَطَائِفَةٌ: قَدْ كَانَ قَبْلَهُ بُيُوتٌ كَثِيرَةٌ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ: لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ بَيْتٌ.

وَفِي قَوْلِهِ تبارك وتعالى: {مُبَارَكًا} تَأْوِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّ بَرَكَتَهُ بِمَا يَسْتَحِقُّ مِنْ ثَوَابِ الْقَصْدِ إِلَيْهِ.

وَالثَّانِي: إِنَّهُ أَمْنٌ لِمَنْ دَخَلَهُ حَتَّى الْوَحْشِ، فَيَجْتَمِعُ فِيهِ الظَّبْيُ وَالذِّئْبُ.
{وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ} تَحْتَمِلُ تَأْوِيلَيْنِ:

ইবনুল হাদরামীর উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ইবনে উমাইয়ার পঙক্তি (ওয়াফির ছন্দে):
হে আবু মাতার, কল্যাণের দিকে আসো ... কুরাইশদের সাথীরাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে
তুমি এমন এক জনপদে অবতরণ করবে যা প্রাচীনকাল থেকেই প্রতাপশালী ... এবং তুমি কোনো সেনাপতির আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে
মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার নাম হলো 'উম্মু যাহম' এবং 'আল-বাসসাহ'। উম্মু যাহম বলা হয় কারণ মানুষ সেখানে ভিড় (যাহাম) করে এবং একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। আর আল-বাসসাহ বলা হয় কারণ এটি সেখানে সীমালঙ্ঘনকারীদের চূর্ণ করে দেয়, অর্থাৎ তাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধ্বংস করে দেয়। এখান থেকেই মহান আল্লাহর বাণী: {এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হবে} [সূরা আল-ওয়াকিআ: ৫]।
আবার 'আন-নাসসাহ' (নুন বর্ণ দিয়ে) হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে, যার অর্থ হলো: এটি সেখান থেকে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিতাড়িত ও নির্বাসিত করে। মক্কার মূল ভিত্তি ও এর পবিত্রতা হলো মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র ঘরের যে মর্যাদা দান করেছেন তা; এমনকি তিনি মক্কাকে সেই ঘরের খাতিরেই 'উম্মুল কুরা' (জনপদসমূহের জননী) বানিয়েছেন যার ভিত্তি উত্তোলন করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন এবং যাকে তাঁর বান্দাদের কিবলা বানিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {যাতে আপনি উম্মুল কুরা (মক্কা) ও তার চারপাশের মানুষকে সতর্ক করতে পারেন} [সূরা আশ-শূরা: ৭]।
জাফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইবনে আলী (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণনা করেন যে, পবিত্র ঘর নির্মাণ ও তা তাওয়াফ করার কারণ হলো, মহান আল্লাহ যখন ফেরেশতাদের বললেন: {নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা (প্রতিনিধি) নিয়োগ করতে যাচ্ছি। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জানো না} [সূরা আল-বাকারাহ: ৩০]।

এতে তিনি তাদের ওপর রাগান্বিত হলেন, তখন তারা আরশের আশ্রয় নিল। তারা তাদের রবকে সন্তুষ্ট করার জন্য আরশের চারদিকে সাতবার তাওয়াফ করল, ফলে তিনি তাদের ওপর সন্তুষ্ট হলেন।
এরপর তিনি তাদের বললেন: "তোমরা পৃথিবীতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করো, যেন বনী আদমের মধ্যে যার ওপর আমি অসন্তুষ্ট হই, সে সেখানে আশ্রয় নিতে পারে এবং এর চারদিকে তাওয়াফ করতে পারে যেভাবে তোমরা আমার আরশকে তাওয়াফ করেছ, যেন আমি তাদের ওপর সন্তুষ্ট হই।" অতঃপর তারা তাঁর জন্য এই ঘরটি নির্মাণ করলেন। এটিই ছিল মানুষের জন্য নির্মিত প্রথম ঘর। মহান আল্লাহ বলেন: {নিশ্চয়ই মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘরটি নির্মিত হয়েছে তা হলো মক্কায় অবস্থিত, যা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত} [সূরা আলে ইমরান: ৯৬]। উলামায়ে কেরামের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, এটিই ইবাদতের উদ্দেশ্যে মানুষের জন্য নির্মিত প্রথম ঘর। তবে তারা এই বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, এটি ইবাদত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রথম ঘর কি না। হাসান বসরী ও একদল আলেম বলেন, এর আগেও অনেক ঘর ছিল। কিন্তু মুজাহিদ ও কাতাদাহ বলেন, এর আগে আর কোনো ঘর ছিল না।
মহান আল্লাহর বাণী: {বরকতময়}—এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:
প্রথমটি: এর বরকত নিহিত রয়েছে সেখানে গমনের সংকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সওয়াবের মধ্যে।
দ্বিতীয়টি: সেখানে প্রবেশকারীর জন্য এটি একটি নিরাপদ স্থান, এমনকি বন্য প্রাণীদের জন্যও; ফলে সেখানে হরিণ ও নেকড়ে একসাথে অবস্থান করে।
{এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত}—এর দুটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা রয়েছে:

(ص: 243)الأحكام السلطانية للماوردي

أَحَدُهُمَا: هُدًى لَهُمْ إِلَى تَوْحِيدِهِ.
وَالثَّانِي: إِلَى عِبَادَتِهِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ.

{فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97] ، وَكَانَتْ الْآيَةُ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ تَأْثِيرَ قَدَمَيْهِ فِيهِ، وَهُوَ حَجَرٌ صَلْدٌ، وَالْآيَةُ فِي غَيْرِ الْمَقَامِ: أَمْنُ الْخَائِفِ وَهَيْبَةُ الْبَيْتِ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهِ، وَامْتِنَاعُ الطَّيْرِ مِنَ الْعُلُوِّ عَلَيْهِ، وَتَعْجِيلُ الْعُقُوبَةِ لِمَنْ عَتَا فِيهِ؛ وَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الْفِيلِ، وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ قُلُوبَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَعْظِيمِهِ، وَأَنَّ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُمْ غَيْرُ أَهْلِ كِتَابٍ وَلَا مُتَّبِعِي شَرْعٍ يَلْتَزِمُونَ أَحْكَامَهُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَرَى فِيهِ قَاتِلَ أَخِيهِ وَأَبِيهِ فَلَا يَطْلُبُهُ بِثَأْرِهِ فِيهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ آيَاتُ اللَّهِ تعالى أَلْقَاهَا عَلَى قُلُوبِ عِبَادِهِ.

وَأَمَّا أَمْنُهُ فِي الْإِسْلَامِ فَفِي قَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} تَأْوِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: آمِنًا مِنَ النَّارِ، وَهَذَا قَوْلُ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ.

وَالثَّانِي: آمِنًا مِنَ الْقَتْلِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تعالى أَوْجَبَ الْإِحْرَامَ عَلَى دَاخِلِهِ، وَحَظَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَهُ مُحِلًّا.

وَقَالَ أَيْضًا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ حَلَالًا: "أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ وَلَمْ تَحُلَّ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي" 1، ثُمَّ قَالَ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] .

فَجَعَلَ حَجَّهُ فَرْضًا بَعْدَ أَنْ صَارَ فِي الصَّلَاةِ قِبْلَةً؛ لِأَنَّ اسْتِقْبَالَ الْكَعْبَةِ فِي الصَّلَاةِ فُرِضَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَالْحَجُّ فُرِضَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ، وَإِذْ قَدْ تَعَلَّقَ بِمَكَّةَ لِلْكَعْبَةِ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ عِبَادَتَانِ، وَبَايَنَتْ بِحُرْمَتِهَا سَائِرَ الْبُلْدَانِ، وَجَبَ أَنْ نَصِفَهَا ثُمَّ نَذْكُرَ حُكْمَ حَرَمِهَا، فَأَمَّا بِنَاؤُهَا فَأَوَّلُ مَنْ تَوَلَّاهُ بَعْدَ الطُّوفَانِ إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام، فَإِنَّهُ سبحانه قَالَ: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127] .

فَدَلَّ مَا سَأَلَاهُ مِنَ الْقَبُولِ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا بِبِنَائِهَا مَأْمُورَيْنِ، وَسُمِّيَتْ كَعْبَةً لِعُلُوِّهَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: كَعَبَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا عَلَا ثَدْيُهَا، وَمِنْهُ: سُمِّيَ الْكَعْبُ كَعْبًا لِعُلُوِّهِ، وَكَانَتْ الْكَعْبَةُ بَعْدَ

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب الجنائز "1349"، ومسلم في كتاب الحج "1353".

প্রথমটি: তাদের জন্য তাঁর তাওহীদের পথপ্রদর্শন।
দ্বিতীয়টি: হজ্জ ও সালাতে তাঁর ইবাদতের প্রতি পথপ্রদর্শন।
{তাতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, যেমন মাকামে ইবরাহীম; আর যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়} [আলে ইমরান: ৯৭]। মাকামে ইবরাহীমের নিদর্শন ছিল তাঁর দুই পদযুগলের ছাপ, অথচ তা ছিল একটি শক্ত পাথর। আর মাকাম ছাড়া অন্যান্য নিদর্শনগুলো হলো: ভীত ব্যক্তির নিরাপত্তা, ঘরটি দর্শনের সময় এর মহিমা ও গাম্ভীর্য, এর ওপর দিয়ে পাখির উড়ে না যাওয়া, যারা এতে অবাধ্যতা করে তাদের দ্রুত শাস্তি কার্যকর হওয়া; জাহিলিয়াত আমলে হস্তিবাহিনীর সাথে যা ঘটেছিল, জাহিলিয়াতের সময় আরবদের অন্তরে একে সম্মান করার যে গভীর অনুরাগ ছিল এবং জাহিলিয়াতের লোকেরা যারা আহলে কিতাব ছিল না এবং কোনো শরীয়ত অনুসরণ করত না, তারাও এর বিধান মেনে চলত। এমনকি তাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি সেখানে তার বাবা বা ভাইয়ের হত্যাকারীকেও দেখত, তবুও সে সেখানে তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করত না। এ সবই মহান আল্লাহর নিদর্শন যা তিনি তাঁর বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন।
আর ইসলামে এর নিরাপত্তার বিষয়টি মহান আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: {যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে}, এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:
প্রথমটি: জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ হওয়া; এটি ইয়াহইয়া ইবনে জাদার উক্তি।
দ্বিতীয়টি: হত্যা থেকে নিরাপদ হওয়া; কারণ মহান আল্লাহ সেখানে প্রবেশকারীর ওপর ইহরাম ফরজ করেছেন এবং ইহরাম ছাড়া সেখানে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করেছেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর যখন ইহরামবিহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন তখন বলেছিলেন: "আমার জন্য দিনের কিছু সময়ের জন্য এটি বৈধ করা হয়েছিল, যা আমার আগে কারও জন্য বৈধ করা হয়নি এবং আমার পরেও কারও জন্য তা বৈধ হবে না" ১। অতঃপর তিনি বললেন: {মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেই ঘরের হজ্জ করা তার ওপর আবশ্যিক কর্তব্য} [আলে ইমরান: ৯৭]।

সালাতে একে কিবলা নির্ধারণ করার পর তিনি হজ্জকে ফরজ করেছেন। কেননা সালাতে কাবামুখী হওয়া হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরজ হয়েছিল এবং হজ্জ ফরজ হয়েছিল ষষ্ঠ হিজরীতে। যেহেতু কাবাকে কেন্দ্র করে ইসলামের রুকনসমূহের মধ্য থেকে দুটি ইবাদত মক্কার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে এবং এর পবিত্রতার কারণে এটি অন্যান্য সমস্ত শহর থেকে স্বতন্ত্র, তাই আমাদের কর্তব্য হলো এর বর্ণনা প্রদান করা এবং এরপর এর হারাম বা পবিত্র এলাকার বিধান উল্লেখ করা। এর নির্মাণের ক্ষেত্রে প্লাবনের পর সর্বপ্রথম যিনি এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি হলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিল এবং প্রার্থনা করছিল: 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পক্ষ থেকে এটি কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'} [আল-বাকারা: ১২৭]।
কবুল করার জন্য তাদের এই প্রার্থনা প্রমাণ করে যে, তারা তা নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। উচ্চতার কারণে একে 'কাবা' নামকরণ করা হয়েছে, যা আরবদের এই উক্তি থেকে গৃহীত: 'নারীর স্তন উন্নত হলে তাকে কা'বাত বলা হয়'। এখান থেকেই গোড়ালিকে (কাব) উঁচু হওয়ার কারণে 'কাব' বলা হয়। কাবা ছিল এরপর...

---

১ সহীহ: বুখারী জানাযা অধ্যায়ে (১৩৪৯) এবং মুসলিম হজ্জ অধ্যায়ে (১৩৫৩) এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 244)الأحكام السلطانية للماوردي

إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم مَعَ جُرْهُمَ وَالْعَمَالِقَةِ إِلَى أَنِ انْقَرَضُوا، حَتَّى قَالَ فِيهِمْ عَامِرُ بْنُ الْحَارِثِ "مِنَ الطَّوِيلِ":

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَجُونِ إِلَى الصَّفَا ... أَنِيسٌ وَلَمْ يَسْمُرْ بِمَكَّةَ سَامِرُ

بَلَى نَحْنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَبَادَنَا ... صُرُوفُ اللَّيَالِي وَالْجُدُودُ الْعَوَاثِرُ

وَخَلَفَهُمْ فِيهَا قُرَيْشٌ بَعْدَ اسْتِيلَائِهِمْ عَلَى الْحَرَمِ لِكَثْرَتِهِمْ بَعْدَ الْقِلَّةِ، وَعِزَّتِهِمْ بَعْدَ الذِّلَّةِ، تَأْسِيسًا لِمَا يُظْهِرُهُ اللَّهُ تعالى فِيهِمْ مِنَ النُّبُوَّةِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَدَّدَ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ، وَسَقَفَهَا بِخَشَبِ الدَّوْمِ وَجَرِيدِ النَّخْلِ، قَالَ الْأَعْشَى "مِنَ الطَّوِيلِ":

حَلَفْتُ بِثَوْبَيْ رَاهِبِ الشَّامِ وَالَّتِي ... بَنَاهَا قُصَيٌّ جَدُّهُ وَابْنُ جُرْهُمَ

لَئِنْ شَبَّ نِيرَانُ الْعَدَاوَةِ بَيْنَنَا ... لَيَرْتَحِلَنْ مِنِّي عَلَى ظَهْرِ شَيْهَمِ

ثُمَّ بَنَتْهَا قُرَيْشٌ بَعْدَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَشَهِدَ بِنَاءَهَا، وَكَانَ بَابُهَا فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ الْمُغِيرَةِ: يَا قَوْمِ ارْفَعُوا بَابَ الْكَعْبَةِ حَتَّى لَا تُدْخَلَ إِلَّا بِسُلَّمٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا حِينَئِذٍ إِلَّا مَنْ أَرَدْتُمْ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ مِمَّنْ تَكْرَهُونَ رَمَيْتُمْ بِهِ فَيَسْقُطَ، فَكَانَ نَكَالًا لِمَنْ رَآهُ، فَفَعَلَتْ قُرَيْشٌ ذَلِكَ.

وَسَبَبُ بِنَائِهَا أَنَّ الْكَعْبَةَ اسْتُهْدِمَتْ وَكَانَتْ فَوْقَ الْقَامَةِ فَأَرَادُوا تَعْلِيَتَهَا، وَكَانَ الْبَحْرُ قَدْ أَلْقَى سَفِينَةً لِرَجُلٍ مِنْ تُجَّارِ الرُّومِ إِلَى جُدَّةَ فَأَخَذُوا خَشَبَهَا، وَكَانَ فِي الْكَعْبَةِ حَيَّةٌ يَخَافُهَا النَّاسُ فَخَرَجَتْ فَوْقَ جِدَارِ الْكَعْبَةِ، فَنَزَلَ طَائِرٌ فَاخْتَطَفَهَا، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: إِنَّا لَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ سبحانه قَدْ رَضِيَ مَا أَرَدْنَا، فَهَدَمُوهَا وَبَنَوْهَا بِخَشَبِ السَّفِينَةِ، وَكَانَتْ عَلَى بِنَائِهَا إِلَى أَنْ حُوصِرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِالْمَسْجِدِ مِنَ الْحُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَسْكَرِ الشَّامِ حِينَ حَارَبُوهُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ فِي زَمَنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ نَارًا فِي لِيفَةٍ عَلَى رَأْسِ رُمْحٍ وَكَانَتِ الرِّيحُ عَاصِفَةً، فَطَارَتْ شَرَارَةٌ فَتَعَلَّقَتْ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَأَحْرَقَتْهَا، فَتَصَدَّعَتْ حِيطَانُهَا وَاسْوَدَّتْ، وَتَنَاثَرَتْ أَحْجَارُهَا، فَلَمَّا مَاتَ يَزِيدُ وَانْصَرَفَ الْحُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ شَاوَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي هَدْمِهَا وَبِنَائِهَا، فَأَشَارَ بِهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَأَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ: لَا تَهْدِمْ بَيْتَ اللَّهِ تعالى، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا تَرَى الْحَمَامَ يَقَعُ عَلَى حِيطَانِ الْبَيْتِ فَتَتَنَاثَرُ حِجَارَتُهُ

ইব্রাহিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে জুরহুম ও আমালিকা সম্প্রদায়ের বসবাসের বিবরণ, যা তাদের বিলুপ্তি পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এমনকি তাদের সম্পর্কে আমির ইবনুল হারিস 'তওয়ীল' ছন্দে বলেছেন:

মনে হয় যেন হাজুন থেকে সাফা পর্যন্ত কোনো সহচর ছিল না … এবং মক্কায় কোনো গল্পগুজবকারী নৈশ আড্ডা দেয়নি।

হ্যাঁ, আমরাই ছিলাম এর বাসিন্দা, কিন্তু আমাদের বিনাশ করেছে … কালের আবর্তন ও দুর্ভাগ্যের পদস্খলন।

অতঃপর তাদের পরে কুরাইশরা হারামের ওপর কর্তৃত্ব লাভের মাধ্যমে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়; যা ছিল সংখ্যাস্বল্পতার পর তাদের সংখ্যাধিক্য এবং লাঞ্ছনার পর তাদের মর্যাদাপ্রাপ্তির ফল। এটি ছিল তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা যে নবুওয়ত প্রকাশ করবেন, তারই একটি ভিত্তি।

ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর পর কুরাইশদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি কাবার পুনর্নির্মাণ করেন, তিনি হলেন কুসাই ইবনে কিলাব। তিনি ডোম বৃক্ষের কাঠ ও খেজুরের ডাল দিয়ে এর ছাদ নির্মাণ করেন। কবি আল-আ'শা 'তওয়ীল' ছন্দে বলেছেন:

আমি সিরিয়ার সন্ন্যাসীর দুই চাদর এবং সেই ঘরের শপথ করছি যা … কুসাই—তার পূর্বপুরুষ এবং জুরহুমের সন্তানরা নির্মাণ করেছিল।

যদি আমাদের মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বলে ওঠে … তবে সে আমার নিকট থেকে সজারুর পিঠে চড়ে প্রস্থান করবে।

অতঃপর কুসাইয়ের পরে কুরাইশরা পুনরায় কাবা নির্মাণ করে, তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। তিনি এই নির্মাণকাজ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তখন কাবার দরজা ছিল ভূমিসংলগ্ন। আবু হুজাইফা ইবনুল মুগিরা বললেন: 'হে আমার কওম! কাবার দরজা উঁচু করে দাও যেন সিঁড়ি ছাড়া তাতে প্রবেশ করা না যায়। তখন তোমরা যাকে চাইবে কেবল তাকেই প্রবেশ করতে দিবে। আর যদি এমন কেউ আসে যাকে তোমরা অপছন্দ করো, তবে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারবে এবং সে পড়ে যাবে; যা অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।' কুরাইশরা তাই করল।

এই নির্মাণের কারণ ছিল এই যে, কাবা ঘর জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এর উচ্চতা ছিল একজন মানুষের উচ্চতার সমান, তাই তারা এটি আরও উঁচু করতে চাইল। সে সময় সমুদ্র জেদ্দা উপকূলে রোমান এক ব্যবসায়ীর একটি জাহাজ ভিড়িয়ে দিয়েছিল। তারা সেই জাহাজের কাঠ সংগ্রহ করল। কাবার ভেতরে একটি সাপ ছিল যাকে মানুষ ভয় পেত। একদিন সাপটি কাবার

দেয়ালের ওপর বের হলে একটি পাখি এসে তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কুরাইশরা বলল: 'আমরা আশা করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন।' অতঃপর তারা কাবা ভেঙে ফেলল এবং জাহাজের কাঠ দিয়ে তা নির্মাণ করল। এটি সেই নির্মাণের ওপরই বহাল ছিল, যতক্ষণ না ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার আমলে চৌষট্টি হিজরীতে হুসাইন ইবনে নুমাইর ও সিরীয় বাহিনীর দ্বারা ইবনে জুবায়ের মসজিদে (হারামে) অবরুদ্ধ হন। তখন তার এক সঙ্গী বর্শার মাথায় তুলার তৈরি সলতেয় করে আগুন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং বাতাস ছিল অত্যন্ত তীব্র। ফলে আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ উড়ে গিয়ে কাবার গিলাফে লাগে এবং তা পুড়িয়ে ফেলে। এতে কাবার দেয়ালগুলো ফেটে যায়, কালো হয়ে যায় এবং পাথরগুলো ঝুরঝুরে হয়ে পড়ে। যখন ইয়াজিদ মারা গেলেন এবং হুসাইন ইবনে নুমাইর প্রস্থান করলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের কাবা ভেঙে পুনরায় নির্মাণের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও উবাইদ ইবনে উমাইর তাতে সায় দিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর কাছে এসে বললেন: 'আপনি আল্লাহ তাআলার ঘর ভাঙবেন না।' ইবনে জুবায়ের বললেন: 'আপনি কি দেখছেন না যে, পায়রাগুলো ঘরের দেয়ালের ওপর বসলে এর পাথরগুলো ঝুরঝুরে হয়ে ঝরে পড়ছে?'

(ص: 245)الأحكام السلطانية للماوردي

وَيَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَبْنِي بَيْتَهُ وَلَا يَبْنِي بَيْتَ اللَّهِ، أَلَا إِنِّي هَادِمُهُ بِالْغَدَاةِ، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ كَانَتْ لَنَا سِعَةٌ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أُسِّ إِبْرَاهِيمَ، وَلَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا" 1.

وَسَأَلَ الْأَسْوَدُ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام قَالَ لَهَا: "إِنَّ النَّفَقَةَ قَصُرَتْ بِقَوْمِكِ فَاقْتَصَرُوا، وَلَوْلَا حَدَثَانُ عَهْدِهِمْ بِالْكُفْرِ لَهَدَمْتُهُ وَأَعَدْتُ فِيهِ مَا تَرَكُوا" 2.

فَاسْتَقَرَّ رَأْيُ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَقِيلَ: هُوَ نَائِمٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَأَيْقَظَهُ، وَقَالَ لَهُ: أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام قَالَ: "إِنَّ الْأَرْضَ لَتَضِجُّ إِلَى اللَّهِ تعالى مِنْ نَوْمَةِ الْعُلَمَاءِ فِي الضُّحَى" 3.

فَهَدَمَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ هَادِمَهَا فَلَا تَدَعْ النَّاسَ بِلَا قِبْلَةٍ، فَلَمَّا هُدِّمَتْ قَالَ النَّاسُ: كَيْفَ نُصَلِّي بِغَيْرِ قِبْلَةٍ؟ فَقَالَ جَابِرٌ وَزَيْدٌ: صَلُّوا إِلَى مَوْضِعِهَا فَهُوَ الْقِبْلَةُ، وَأَمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَوْضِعِهَا فَسُتِرَ وَوُضِعَ الْحَجَرُ فِي تَابُوتٍ فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ، قَالَ عِكْرِمَةُ: رَأَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ ذِرَاعٌ أَوْ يَزِيدُ، وَكَانَ جَوْفُهُ أَبْيَضَ مِثْلَ الْفِضَّةِ، وَجَعَلَ حُلِيَّ الْكَعْبَةِ عِنْدَ الْحَجَبَةِ فِي خِزَانَةِ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا أَرَادَ بِنَاءَهَا حَفَرَ مِنْ قِبَلِ الْحَطِيمِ حَتَّى اسْتَخْرَجَ أُسَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، فَجَمَعَ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا أُسَّ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَبَنَاهَا عَلَى أُسِّ إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم، وَأَدْخَلَ فِيهَا الْحَجَرَ سِتَّةَ أَذْرُعٍ، وَتَرَكَ مِنْهُ أَرْبَعًا. وَقِيلَ: أَدْخَلَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَتَرَكَ ثَلَاثًا، وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ مَلْصُوقَيْنِ بِالْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا، يَدْخُلُ مِنْ وَاحِدٍ وَيَخْرُجُ مِنَ الْآخَرِ، وَجَعَلَ عَلَى بَابِهِمَا صَفَائِحَ الذَّهَبِ، وَجَعَلَ مَفَاتِيحَهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ مِمَّنْ حَضَرَ بِنَاءَهَا مِنْ رِجَالِ قُرَيْشٍ أَبُو الْجَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ الْعَدَوِيُّ، فَقَالَ: عَمِلْتُ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ، وَاحِدَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِقُوَّةِ غُلَامٍ نَفَّاعٍ، وَأُخْرَى فِي الْإِسْلَامِ بِقُوَّةِ كَبِيرٍ فَانٍ.

وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَجَدَ فِي الْحَجَرِ صَفَائِحَ حِجَارَةٍ خُضْرٍ قَدْ أَطْبَقَ بِهَا عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ: هَذَا قَبْرُ نَبِيِّ اللَّهِ إِسْمَاعِيلَ عليه السلام، فَكُفَّ عَنْ تَحْرِيكِ تِلْكَ الْحِجَارَةِ، ثُمَّ بَقِيَتْ الْكَعْبَةُ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى حَالِهَا إِلَى أَنْ حَارَبَهُ الْحَجَّاجُ

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب الحج " 1586"، ومسلم في كتاب الحج "1333".

2 انظر: التخريج السابق.

3 ذكره أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي في معتصر المختصر "1/ 10".

তোমাদের কেউ কেউ নিজের ঘর নির্মাণ করতে থাকে অথচ আল্লাহর ঘর নির্মাণ করে না। সাবধান! আমি আগামীকাল প্রভাতেই এটি ভেঙে ফেলব। কেননা আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যদি আমাদের সামর্থ্য থাকত, তবে আমি ইব্রাহিমের (আলাইহিস সালাম) ভিত্তির ওপর এটি নির্মাণ করতাম এবং এর জন্য পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি দরজা রাখতাম" ১.

আসওয়াদ জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে এ বিষয়ে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁকে বলেছিলেন: "তোমার সম্প্রদায়ের নিকট অর্থ-সংস্থান কম ছিল, তাই তারা (নির্মাণ কাজ) সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। তারা যদি নব্য মুসলিম না হতো (অর্থাৎ কুফরের যুগ থেকে তাদের দূরত্ব কম না হতো), তবে আমি এটি ভেঙে ফেলতাম এবং তারা যা বর্জন করেছে তা পুনরায় এর অন্তর্ভুক্ত করতাম" ২.

অতঃপর কাবা ভেঙে ফেলার বিষয়ে ইবনে যুবাইরের সিদ্ধান্ত স্থির হলো। যখন সকাল হলো, তিনি ওবায়দ ইবনে উমাইরের নিকট লোক পাঠালেন। বলা হলো যে, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তিনি পুনরায় লোক পাঠিয়ে তাঁকে জাগালেন এবং বললেন: আপনার নিকট কি এই সংবাদ পৌঁছেনি যে, নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই চাশতের সময়ে আলেমদের নিদ্রার কারণে জমিন মহান আল্লাহর নিকট আর্তনাদ করে" ৩.

অতঃপর তিনি সেটি ভেঙে ফেললেন। ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর নিকট বার্তা পাঠালেন: যদি আপনি এটি ভেঙে ফেলেন, তবে মানুষকে কিবলাহীন অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না। যখন এটি ভেঙে ফেলা হলো, তখন লোকজন বলতে লাগল: কিবলা ছাড়া আমরা কীভাবে সালাত আদায় করব? জাবির ও যায়েদ (রা.) বললেন: কাবার নির্ধারিত স্থানের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করো, কারণ সেটিই কিবলা। ইবনে যুবাইর কাবার সীমানার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন এবং সেটি পর্দা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হলো। হাজরে আসওয়াদকে রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে একটি সিন্দুকে রাখা হলো। ইকরিমা (রহ.) বলেন: আমি এটি দেখেছি, তা এক হাত অথবা তার চেয়ে কিছুটা বেশি দীর্ঘ ছিল এবং এর ভেতরটা রুপার মতো সাদা ছিল। তিনি কাবার অলঙ্কারসমূহ কাবা রক্ষকদের নিকট কাবার কোষাগারে গচ্ছিত রাখলেন। যখন তিনি কাবা নির্মাণের ইচ্ছা করলেন, তখন হাতিমের দিক থেকে খনন শুরু করলেন যতক্ষণ না ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর মূল ভিত্তি বেরিয়ে আসে। তিনি লোকজনকে সমবেত করে বললেন: আপনারা কি জানেন যে এটিই ইব্রাহিমের ভিত্তি? তারা বলল: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি ইব্রাহিম (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভিত্তির ওপর এটি নির্মাণ করলেন। তিনি কাবার ভেতরে হাতিমের অংশ থেকে ছয় হাত অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং চার হাত বাইরে রাখলেন। মতান্তরে তিনি সাত হাত অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং তিন হাত বাইরে রাখলেন। তিনি মাটির সমান্তরালে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি দরজা স্থাপন করলেন, যাতে একটি দিয়ে মানুষ প্রবেশ করতে পারে এবং অন্যটি দিয়ে বের হতে পারে। তিনি দরজার পাল্লাগুলোতে স্বর্ণের পাত লাগালেন এবং এর চাবিগুলো স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করলেন। কুরাইশদের যে ব্যক্তিবর্গ কাবা নির্মাণের সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবু জাহম ইবনে হুযাইফা আল-আদাবীও ছিলেন। তিনি বললেন: আমি কাবা নির্মাণের কাজে দুইবার অংশগ্রহণ করেছি; একবার জাহেলিয়াত যুগে একজন শক্তিশালী যুবকের শক্তিতে এবং আরেকবার ইসলামি যুগে একজন জরাজীর্ণ বৃদ্ধের শক্তিতে।
যুবাইর ইবনে বাক্কার উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর হাতিমের পাথরের মধ্যে কিছু সবুজ পাথরের ফলক দেখতে পান যা দ্বারা একটি কবরের উপরিভাগ ঢাকা ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান তাঁকে বললেন: এটি আল্লাহর নবী ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর কবর, সুতরাং সেই পাথরগুলো সরানো থেকে বিরত থাকুন। অতঃপর ইবনে যুবাইরের শাসনামলে কাবা এই অবস্থায় বহাল থাকে যতক্ষণ না হাজ্জাজ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন।

---

১. সহিহ: বুখারি, কিতাবুল হজ (১৫৮৬); মুসলিম, কিতাবুল হজ (১৩৩৩)।
২. পূর্ববর্তী তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য।
৩. আবুল মাহাসিন ইউসুফ ইবনে মুসা আল-হানাফি 'মু'তাসার আল-মুখতাসার' (১/১০) গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।

(ص: 246)الأحكام السلطانية للماوردي

وَحَصَرَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَنَصَبَ عَلَيْهِ الْمَنْجَانِيقَاتِ إِلَى أَنْ ظَفِرَ بِهِ، وَقَدْ تَصَدَّعَ بِنَاءُ الْكَعْبَةِ بِأَحْجَارِ الْمَنْجَنِيقِ فَهَدَمَهَا الْحَجَّاجُ، وَبَنَاهَا بِأَمْرِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَأَخْرَجَ الْحَجَرَ مِنْهَا، وَأَعَادَهَا إِلَى بِنَاءِ قُرَيْشٍ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ، فَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ

بْنُ مَرْوَانَ يَقُولُ: وَدِدْت أَنِّي كُنْتُ حَمَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ مِنْ أَمْرِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا مَا تَحَمَّلَهُ.

وَأَمَّا كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ: فَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَوَّلَ مَنْ كَسَا الْبَيْتَ سَعْدُ الْيَمَانِيُّ"1، ثُمَّ كَسَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الثِّيَابَ الْيَمَانِيَّةَ، ثُمَّ كَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما الْقَبَاطِيَّ، ثُمَّ كَسَاهَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الدِّيبَاجَ الْخُسْرَوَانِيَّ.

وَحَكَى مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ كَسَا الْكَعْبَةَ الدِّيبَاجَ خَالِدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ كِلَابٍ، أَصَابَ لَطِيمَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَفِيهَا نَمَطُ دِيبَاجٍ فَنَاطَهُ بِالْكَعْبَةِ، ثُمَّ كَسَاهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ وَالْحَجَّاجُ الدِّيبَاجَ، ثُمَّ كَسَاهَا بَنُو أُمَيَّةَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِمُ الْحُلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى أَهْلِ نَجْرَانَ فِي حَرْبِهِمْ، وَفَوْقَهَا الدِّيبَاجُ، ثُمَّ جَدَّدَ الْمُتَوَكِّلُ رُخَامَ الْكَعْبَةِ وَأَزَرَهَا بِفِضَّةٍ، وَأَلْبَسَ سَائِرَ حِيطَانِهَا وَسَقْفِهَا بِذَهَبٍ، ثُمَّ كَسَا أَسَاطِينَهَا الدِّيبَاجَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ كِسْوَتُهَا فِي الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ بِأَسْرِهَا.

وَأَمَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَقَدْ كَانَ فِنَاءً حَوْلَ الْكَعْبَةِ لِلطَّائِفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه جِدَارٌ يُحِيطُ بِهِ، فَلَمَّا اُسْتُخْلِفَ عُمَرُ رضي الله عنه، وَكَثُرَ النَّاسُ وَسَّعَ الْمَسْجِدَ، وَاشْتَرَى دُورًا هَدَمَهَا وَزَادَهَا فِيهِ، وَهَدَمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوا، وَوَضَعَ لَهُمُ الْأَثْمَانَ حَتَّى أَخَذُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَاتَّخَذَ لِلْمَسْجِدِ جِدَارًا قَصِيرًا دُونَ الْقَامَةِ، وَكَانَتِ الْمَصَابِيحُ تُوضَعُ عَلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه أَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ جِدَارًا لِلْمَسْجِدِ، فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ عُثْمَانَ رضي الله عنه ابْتَاعَ مَنَازِلَ فَوَسَّعَ بِهَا الْمَسْجِدَ، وَأَخَذَ مَنَازِلَ أَقْوَامٍ وَوَضَعَ لَهُمْ أَثْمَانَهَا فَضَجُّوا مِنْهُ عِنْدَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنَّمَا جَرَّأَكُمْ عَلَيَّ حِلْمِي عَنْكُمْ، فَقَدْ فَعَلَ بِكُمْ عُمَرُ رضي الله عنه هَذَا فَأَقْرَرْتُمْ وَرَضِيتُمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ إِلَى الْحَبْسِ حَتَّى كَلَّمَهُ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ أَسَدٍ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ، وَبَنَى لِلْمَسْجِدِ الْأَرْوِقَةَ حِينَ وَسَّعَهُ؛ فَكَانَ عُثْمَانُ رضي الله عنه أَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ لِلْمَسْجِدِ الْأَرْوِقَةَ، ثُمَّ إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَسَّعَ

الْمَسْجِدَ وَحَمَلَ إِلَيْهِ أَعْمِدَةَ الْحِجَارَةِ وَالرُّخَامِ. ثُمَّ إِنَّ الْمَنْصُورَ رحمه الله زَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَبَنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ الْمَهْدِيُّ رحمه الله بَعْدَهُ، وَعَلَيْهِ اسْتَقَرَّ بِنَاؤُهُ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا.

---

1 لم أقف عليه.

এবং তিনি তাঁকে মসজিদে অবরুদ্ধ করেন এবং তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র (মিনজানিক) স্থাপন করেন যতক্ষণ না তাঁকে পরাভূত করেন। মিনজানিকের পাথরের আঘাতে কাবার কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ফলে হাজ্জাজ তা ভেঙে ফেলেন এবং আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে তা পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি কাবার মধ্য থেকে হাতীম অংশকে বের করে দেন এবং কুরাইশদের নির্মিত কাঠামোর আদলে তা ফিরিয়ে আনেন যেমনটি আজ বিদ্যমান। তখন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান বলতেন: "আমি যদি কাবার বিষয় এবং এর নির্মাণের ভার ইবনে জুবায়ের যা বহন করেছিলেন তা তাঁর ওপরই ন্যস্ত রাখতাম (তবে কতই না ভালো হতো)!"

আর কাবার গিলাফের ব্যাপারে: আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন: "নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম যিনি কাবাকে গিলাফ পরিয়েছেন তিনি হলেন সাদ আল-ইয়ামানি।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একে ইয়ামানি পোশাক দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এরপর উমর ইবনে আল-খাত্তাব এবং উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) একে 'কাবাতি' (মিশরীয় সাদা কাপড়) দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। অতঃপর ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া একে 'খুসরওয়ানি' রেশম দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।

মুহারিব ইবনে দিসার বর্ণনা করেছেন যে, কাবাকে রেশমি গিলাফ দ্বারা আচ্ছাদনকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন খালিদ ইবনে জাফর ইবনে কিলাব; তিনি জাহেলি যুগে একটি বাণিজ্য কাফেলা থেকে কিছু মালামাল লাভ করেন যাতে রেশমি বস্ত্র ছিল, যা তিনি কাবার গায়ে ঝুলিয়ে দেন। এরপর ইবনে জুবায়ের ও হাজ্জাজ একে রেশম দ্বারা আবৃত করেন। অতঃপর উমাইয়া বংশীয়রা তাদের শাসনামলের কোনো এক সময়ে নাজরানবাসীদের থেকে (সন্ধির শর্ত হিসেবে) প্রাপ্ত পোশাক দ্বারা এবং এর ওপর রেশম দিয়ে একে সজ্জিত করেন। পরবর্তীতে আল-মুতাওয়াক্কিল কাবার মার্বেল পাথর নবায়ন করেন এবং এর নিচের অংশ রৌপ্য খচিত করেন এবং এর বাকি দেয়াল ও ছাদ স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করেন। এরপর এর স্তম্ভগুলোকে রেশমি কাপড়ে আবৃত করেন। অতঃপর পুরো আব্বাসীয় আমল জুড়েই এর গিলাফের এই ধারা অব্যাহত ছিল।

আর মসজিদুল হারামের ক্ষেত্রে: এটি কাবার চারপাশে তাওয়াফকারীদের জন্য একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে একে বেষ্টনকারী কোনো প্রাচীর ছিল না। যখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খলিফা নিযুক্ত হলেন এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী কিছু ঘরবাড়ি কিনে নিয়ে তা ভেঙে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন। মসজিদের প্রতিবেশী কিছু লোক যারা বাড়ি বিক্রি করতে অস্বীকার করেছিল, তিনি তাদের বাড়ি ভেঙে দেন এবং তাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দেন, যা তারা পরবর্তীকালে গ্রহণ করেছিল। তিনি মসজিদের জন্য মানুষের উচ্চতার চেয়ে কম উচ্চতাবিশিষ্ট একটি প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং এর ওপর প্রদীপ রাখা হতো। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুই) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মসজিদের জন্য প্রাচীর নির্মাণ করেন। অতঃপর উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন খলিফা হলেন, তখন তিনি আরও কিছু ঘরবাড়ি ক্রয় করে মসজিদ প্রশস্ত করেন। তিনি কিছু লোকের ঘরবাড়ি অধিগ্রহণ করেন এবং তাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দেন; তখন তারা কাবার সামনে এ নিয়ে শোরগোল শুরু করে। তিনি বললেন: "তোমাদের প্রতি আমার সহনশীলতাই তোমাদের আমার বিরুদ্ধে সাহসী করে তুলেছে। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তোমাদের সাথে একই কাজ করেছিলেন এবং তোমরা তা মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলে।" এরপর তিনি তাদের কারারুদ্ধ করার নির্দেশ দেন যতক্ষণ না আবদুল্লাহ ইবনে খালিদ ইবনে আসাদ তাদের বিষয়ে সুপারিশ করেন এবং তিনি তাদের মুক্ত করে দেন। তিনি মসজিদ সম্প্রসারণের সময় অলিন্দ বা বারান্দা নির্মাণ করেন; উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুই) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মসজিদের জন্য বারান্দা নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক মসজিদ সম্প্রসারণ করেন এবং এতে পাথরের স্তম্ভ ও মার্বেল পাথর নিয়ে আসেন। এরপর আল-মনসুর (রাহিমাহুল্লাহ) মসজিদে অতিরিক্ত অংশ যোগ করেন এবং তা নির্মাণ করেন। তাঁর পরে আল-মাহদী (রাহিমাহুল্লাহ) এতে আরও বৃদ্ধি করেন এবং সেই কাঠামোর ওপরই বর্তমান সময় পর্যন্ত এর নির্মাণ স্থিতিশীল রয়েছে।

---

১ আমি এটি খুঁজে পাইনি।

وَأَمَّا مَكَّةُ فَلَمْ تَكُنْ ذَاتَ مَنَازِلَ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ بَعْدَ جُرْهُمَ وَالْعَمَالِقَةِ يَنْتَجِعُونَ جِبَالَهَا وَأَوْدِيَتَهَا، وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْ حَرَمِهَا انْتِسَابًا إِلَى الْكَعْبَةِ لِاسْتِيلَائِهِمْ عَلَيْهَا، وَتَخَصُّصًا بِالْحَرَمِ لِحُلُولِهِمْ فِيهِ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُمْ بِذَلِكَ شَأْنٌ، وَكَلَّمَا كَثُرَ فِيهِمُ الْعَدَدُ وَنَشَأَتْ فِيهِمُ الرِّيَاسَةُ قَوِيَ أَمَلُهُمْ، وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ سَيَتَقَدَّمُونَ عَلَى الْعَرَبِ، وَكَانَ فُضَلَاؤُهُمْ وَذَوُو الرَّأْيِ وَالتَّجْرِبَةِ مِنْهُمْ يَتَخَيَّلُونَ أَنَّ ذَلِكَ لِرِيَاسَةٍ فِي الدِّينِ وَتَأْسِيسٍ لِنُبُوَّةٍ سَتَكُونُ؛ لِأَنَّهُمْ تَمَسَّكُوا مِنْ أُمُورِ الْكَعْبَةِ بِمَا هُوَ بِالدِّينِ أَخَصُّ، فَأَوَّلُ مَنْ شَعَرَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ وَأَلْهَمَهُ كَعْبُ بْنُ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَجْتَمِعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَكَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرُوبَةً، فَسَمَّاهُ كَعْبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَكَانَ يَخْطُبُ فِيهِ عَلَى قُرَيْشٍ فَيَقُولُ عَلَى مَا حَكَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ: وَأَمَّا بَعْدُ، فَاسْمَعُوا وَتَعَلَّمُوا وَافْهَمُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّيْلَ سَاجٍ، وَالنَّهَارَ صَاحٍ، وَالْأَرْضَ مِهَادٌ، وَالْجِبَالَ أَوْتَادٌ، وَالسَّمَاءَ بِنَاءٌ، وَالنُّجُومَ أَعْلَامٌ، وَالْأَوَّلِينَ كَالْآخِرِينَ، وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى زَوْجٌ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ مَا يَهِيجُ، فَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، وَاحْفَظُوا أَصْهَارَكُمْ، وَثَمِّرُوا أَمْوَالَكُمْ، فَهَلْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَالِكٍ رَجَعَ أَوْ مَيِّتٍ انْتَشَرَ، وَالدَّارُ أَمَامَكُمْ، وَالظَّنُّ غَيْرُ مَا تَقُولُونَ، حَرَمُكُمْ زَيِّنُوهُ وَعَظِّمُوهُ، وَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَسَيَأْتِي لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، وَسَيَخْرُجُ مِنْهُ نَبِيٌّ كَرِيمٌ، ثُمَّ يَقُولُ "مِنَ الطَّوِيلِ":

نَهَارٌ وَلَيْلٌ كُلَّ يَوْمٍ بِحَادِثٍ ... سَوَاءٌ عَلَيْنَا لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا

يَئُوبَانِ بِالْأَحْدَاثِ فِينَا تَأَوُّبًا ... وَبِالنِّعَمِ الضَّافِي عَلَيْنَا سُتُورُهَا

صُرُوفٌ وَأَنْبَاءٌ تُقَلِّبُ أَهْلَهَا ... لَهَا عُقَدٌ مَا يَسْتَحِيلُ مَرِيرُهَا

عَلَى غَفْلَةٍ يَأْتِي النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ... فَيُخْبِرُ أَخْبَارًا صَدُوقًا خَبِيرُهَا

ثُمَّ يَقُولُ: أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتُ فِيهَا ذَا سَمْعٍ وَبَصَرٍ وَيَدٍ وَرِجْلٍ لَتَنَصَّبْتُ فِيهَا تَنَصُّبَ الْجَمَلِ، وَلَأَرْقَلْتُ فِيهَا إِرْقَالَ الْفَحْلِ، ثُمَّ يَقُولُ "مِنَ الْبَسِيطِ":

يَا لَيْتَنِي شَاهِدٌ فَحْوَاءَ دَعْوَتِهِ ... حِينَ الْعَشِيرَةُ تَبْغِي الْحَقَّ خِذْلَانًا

وَهَذَا مِنْ فِطَنِ الْإِلْهَامَاتِ الَّتِي تَخَيَّلَتْهَا الْعُقُولُ فَصَدَقَتْ، وَتَصَوَّرَتْهَا النُّفُوسُ فَتَحَقَّقَتْ، ثُمَّ انْتَقَلَتْ الرِّيَاسَةُ بَعْدَهُ إِلَى قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ، فَبَنَى بِمَكَّةَ دَارَ النَّدْوَةِ لِيَحْكُمَ فِيهَا بَيْنَ قُرَيْشٍ، ثُمَّ صَارَتِ الدَّارُ لِتَشَاوُرِهِمْ وَعَقْدِ الْأَلْوِيَةِ فِي حُرُوبِهِمْ. قَالَ الْكَلْبِيُّ: فَكَانَتْ أَوَّلَ دَارٍ بُنِيَتْ بِمَكَّةَ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ فَبَنَوْا مِنَ الدُّورِ مَا اسْتَوْطَنُوهُ؛ وَكُلَّمَا قَرُبُوا مِنْ عَصْرِ الْإِسْلَامِ ازْدَادُوا قُوَّةً وَكَثْرَةً

আর মক্কার অবস্থা এমন ছিল যে, সেখানে আদিতে কোনো স্থায়ী বসতবাড়ি ছিল না। জুরহুম ও আমালিকা সম্প্রদায়ের পর কুরাইশরা এর পাহাড় ও উপত্যকাসমূহে বিচরণ করত। কাবার ওপর কর্তৃত্ব এবং সেখানে বসবাসের মাধ্যমে পবিত্র হারামের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তারা হারামের সীমানার বাইরে যেত না। তারা বিশ্বাস করত যে, এর মাধ্যমে অচিরেই তাদের এক মহান মর্যাদা অর্জিত হবে। তাদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের উন্মেষ ঘটছিল, তাদের এই আশা আরও সুদৃঢ় হচ্ছিল; তারা অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, অচিরেই তারা আরবদের ওপর প্রাধান্য লাভ করবে। তাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এবং বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ধারণা করতেন যে, এই মর্যাদা হবে ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্য এবং আসন্ন নবুওয়াতের ভিত্তি স্বরূপ; কারণ তারা কাবার বিষয়াবলির মধ্যে ধর্মীয় দিকের সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি বিষয়টি উপলব্ধি করেন এবং এ বিষয়ে দৈবপ্রেরণা লাভ করেন, তিনি হলেন কাব ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব। কুরাইশরা প্রতি জুমুআর দিনে তাঁর নিকট সমবেত হতো। জাহেলি যুগে জুমুআর দিনকে 'আরুবাহ' বলা হতো; কাব ইবনে লুয়াই এর নাম দেন 'জুমুআর দিন'। যোবায়ের ইবনে বাক্কারের বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি কুরাইশদের উদ্দেশ্যে সেখানে ভাষণ দিতেন এবং বলতেন: "অতঃপর, তোমরা শ্রবণ করো, শিক্ষা গ্রহণ করো এবং অনুধাবন করো। জেনে রেখো, রাত নিথর ও প্রশান্ত, দিন উজ্জ্বল, পৃথিবী এক শয্যাতুল্য, পর্বতসমূহ কীলকস্বরূপ, আকাশ এক সুউচ্চ ছাদ এবং নক্ষত্ররাজি দিকনির্দেশক চিহ্নস্বরূপ। পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের মতোই গত হয়েছে। পুরুষ ও নারী জোড়ায় জোড়ায় সৃজিত, যতক্ষণ না সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুহূর্ত উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমরা আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখো, বৈবাহিক সম্পর্ক রক্ষা করো এবং তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করো। তোমরা কি দেখেছ কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফিরে এসেছে

কিংবা কোনো মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে? আসল ঘর তো তোমাদের সামনেই রয়েছে এবং তোমাদের ধারণা সত্যের বিপরীত। তোমাদের এই পবিত্র হারামকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো এবং এর সম্মান বৃদ্ধি করো, এর সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো। অচিরেই এখান থেকে এক মহান সংবাদ আসবে এবং এখান থেকে এক সম্মানিত নবীর আবির্ভাব ঘটবে।" অতঃপর তিনি 'তাবিল' ছন্দে বলতেন:

দিন ও রাত প্রতিদিন নতুন নতুন ঘটনা বয়ে আনে ... আমাদের নিকট এর রাত ও দিন সমান। তারা আমাদের মাঝে নতুন নতুন ঘটনা এবং অবারিত নিয়ামতের আবরণ নিয়ে বারবার ফিরে আসে ...

কালচক্র ও বিবিধ সংবাদ মানুষকে বিবর্তিত করে ... এর এমন সব গ্রন্থি রয়েছে যার রশি কখনও শিথিল হয় না।

মানুষ যখন গাফেল বা অসতর্ক থাকবে, তখন নবী মুহাম্মাদ (সা.) আগমন করবেন ... এবং তিনি পরম সত্য ও বিজ্ঞোচিত সংবাদসমূহ প্রদান করবেন।

অতঃপর তিনি বলতেন: "আল্লাহর শপথ! আমি যদি সেই সময়ে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হাত-পায়ের পূর্ণ শক্তি নিয়ে উপস্থিত থাকতাম, তবে আমি সে কাজে একটি শক্তিশালী উটের ন্যায় দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে যেতাম এবং তেজি উটের ন্যায় দ্রুত ধাবিত হতাম।" অতঃপর তিনি 'বাসিত' ছন্দে বলতেন:

হায়! আমি যদি তাঁর দাওয়াতের সেই মূল বার্তার সাক্ষী হতে পারতাম ... যখন স্বগোত্রীয়রা সত্যকে লাঞ্ছিত ও বর্জন করার অপচেষ্টা করবে।

এটি ছিল আল্লাহপ্রদত্ত সেই গভীর প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম প্রেরণার অন্তর্ভুক্ত যা জ্ঞানীরা ধারণা করেছিল এবং তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, এবং যা হৃদয়ে উদিত হয়েছিল এবং বাস্তবে রূপ লাভ করেছে। অতঃপর তাঁর পর নেতৃত্বের ভার কুসাই ইবনে কিলাবের ওপর অর্পিত হয়। তিনি কুরাইশদের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য মক্কায় 'দারুন নদওয়া' নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে এই গৃহটি তাদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং যুদ্ধকালীন পতাকা বাঁধার স্থানে পরিণত হয়। আল-কালবী বলেন: এটিই মক্কায় নির্মিত প্রথম বসতবাড়ি। এরপর মানুষ একের পর এক ঘরবাড়ি নির্মাণ করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ইসলামের যুগের যতই নিকটবর্তী হতে লাগল, তারা শক্তি ও সংখ্যায় ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল।

عَدَدٍ حَتَّى دَانَتْ لَهُمُ الْعَرَبُ، فَصَدَقَتْ الْمَخِيلَةُ الْأُولَى فِي الرِّيَاسَةِ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ سبحانه نَبِيَّهُ رَسُولًا، فَصَدَقَتْ الْمَخِيلَةُ الثَّانِيَةُ فِي حُدُوثِ النُّبُوَّةِ فِيهِمْ، فَآمَنَ بِهِ مَنْ هُدِيَ وَجَحَدَ مَنْ عَانَدَ، وَهَاجَرَ عَنْهُمْ صلى الله عليه وسلم حِينَ اشْتَدَّ بِهِ الْأَذَى حَتَّى عَادَ ظَافِرًا بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ مِنْ هِجْرَتِهِ عَنْهُمْ.

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي دُخُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، هَلْ دَخَلَهَا عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا، مَعَ إجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَغْنَمْ مِنْهَا مَالًا، وَلَمْ يَسْبِ فِيهَا ذُرِّيَّةً، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ إلَى أَنَّهُ دَخَلَهَا عَنْوَةً فَعَفَا عَنِ الْغَنَائِمِ، وَمَنَّ عَلَى السَّبْيِ، وَإِنَّ لِلْإِمَامِ إذَا فَتَحَ بَلَدًا عَنْوَةً أَنْ يَعْفُوَ عَنْ غَنَائِمِهِ، وَيَمُنَّ عَلَى سَبْيِهِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ دَخَلَهَا صُلْحًا عَقَدَهُ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ، كَانَ الشَّرْطُ فِيهِ أَنَّ: "مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ كَانَ آمِنًا، وَمَنْ تَعَلَّقَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ"1.

إلَّا سِتَّةَ أَنْفُسٍ اسْتَثْنَى قَتْلَهُمْ وَلَوْ تَعَلَّقُوا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُمْ، وَلِأَجْلِ عَقْدِ الصُّلْحِ لَمْ يَغْنَمْ وَلَمْ يَسْبِ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ إذَا فَتَحَ بَلَدًا عَنْوَةً أَنْ يَعْفُوَ عَنْ غَنَائِمِهِ، وَلَا يَمُنَّ عَلَى سَبْيِهِ لِمَا فِيهِمَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تعالى وَحُقُوقِ الْغَانِمِينَ، فَصَارَتْ مَكَّةُ وَحَرَمُهَا حِينَ لَمْ تُغْنَمْ أَرْضَ عُشْرٍ إنْ زُرِعَتْ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ دُورِ مَكَّةَ وَإِجَارَتِهَا، فَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ بَيْعِهَا وَأَجَازَ إجَارَتَهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَجِّ، وَمَنَعَ مِنْهُمَا فِي أَيَّامِ الْحَجِّ لِرِوَايَةِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَكَّةُ حَرَامٌ لَا يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَلَا أُجُورُ بُيُوتِهَا" 2.

---

1 لم أقف عليه بهذا اللفظ.

2 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه "14679".

قال الحافظ ابن حجر: رواه الدارقطني والحاكم من حديث أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر رفعه: إن الله تعالى حرم مكة، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها، وقال: من أكل من أجر بيوت مكة شيئًا فإنما يأكل نارًا، وفي رواية الدارقطني: مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها.
قال الدارقطني: وَهِمَ أبو حنيفة في قوله ابن يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد، وهو القداح وفي رفعه، وإنما هو موقوف، ثم أخرجه من طريق عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد كذلك. انتهى، وقد رواه القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة فقال عن عبيد الله بن أبي زياد، فالوهم فيه من محمد بن الحسن راوية أولًا =

সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এমনকি আরবরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করল। ফলে তাদের ওপর নেতৃত্ব লাভের প্রথম ধারণাটি সত্য প্রমাণিত হলো। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর নবীকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করলেন, ফলে তাদের মধ্যে নবুওয়াত প্রকাশের দ্বিতীয় ধারণাটিও সত্য হলো। যাদের হেদায়াত নসিব হয়েছিল তারা তাঁর ওপর ঈমান আনল এবং যারা হঠকারী ছিল তারা তাঁকে অস্বীকার করল। কষ্ট ও নির্যাতন চরমে পৌঁছালে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট থেকে হিজরত করেন এবং হিজরতের আট বছর পর বিজয়ী বেশে পুনরায় তাদের মাঝে ফিরে আসেন।

মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় প্রবেশ নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, তিনি কি তা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জয় করেছিলেন নাকি সন্ধির মাধ্যমে? তবে এ বিষয়ে সকলে একমত যে, তিনি সেখান থেকে কোনো সম্পদ গনিমত হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং কাউকে দাস হিসেবে বন্দিও করেননি। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক রহ.-এর অভিমত হলো, তিনি মক্কা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই জয় করেছিলেন, তবে তিনি গনিমত ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং বন্দিদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন। কোনো ইমাম যখন শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো জনপদ জয় করেন, তখন গনিমত ক্ষমা করা এবং বন্দিদের প্রতি অনুগ্রহ করার অধিকার তাঁর থাকে। অন্যদিকে ইমাম শাফিঈ রহ. মনে করেন, তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন আবু সুফিয়ানের সাথে সম্পাদিত একটি চুক্তির মাধ্যমে। সেই সন্ধির শর্ত ছিল: "যে ব্যক্তি নিজ ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে সে নিরাপদ, যে কাবার পর্দা আঁকড়ে ধরবে সে নিরাপদ এবং যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।"১

তবে কেবল ছয়জন ব্যক্তি ব্যতীত, যাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যদিও তারা কাবার পর্দা আঁকড়ে ধরে থাকে—তাদের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সন্ধি চুক্তির কারণেই তিনি কোনো গনিমত বা বন্দি গ্রহণ করেননি। কারণ কোনো ইমাম যখন শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো জনপদ জয় করেন, তখন গনিমত ক্ষমা করা বা বন্দিদের মুক্ত করে দেওয়া তাঁর জন্য বৈধ নয়; কারণ এতে আল্লাহর অধিকার এবং মুজাহিদদের অধিকার জড়িত থাকে। ফলে মক্কা ও এর হারাম এলাকা গনিমত হিসেবে বণ্টন না হওয়ায় তা উশরি (দশমাংশ করযোগ্য) ভূমিতে পরিণত হয়েছে যদি সেখানে চাষাবাদ করা হয় এবং এর ওপর খেরাজ ধার্য করা জায়েজ নয়।

মক্কার ঘরবাড়ি কেনাবেচা ও ভাড়ার বিষয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. তা বিক্রি করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং হজের দিনগুলো ব্যতীত অন্য সময়ে ভাড়া দেওয়া বৈধ বলেছেন; তবে হজের দিনগুলোতে উভয়টিই নিষিদ্ধ করেছেন। এর ভিত্তি হলো মুজাহিদ থেকে আমাশের বর্ণিত রেওয়ায়েত, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "মক্কা একটি পবিত্র স্থান, এর জমি কেনাবেচা এবং এর ঘরবাড়ির ভাড়া গ্রহণ বৈধ নয়।" ২

---

১ এই শব্দে আমি এটি খুঁজে পাইনি।

২ ইবনে আবি শায়বা তাঁর মুসান্নাফে (১৪৬৭৯) এটি বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: দারকুতনি ও হাকেম এটি আবু হানিফার সূত্রে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবি ইয়াজিদ থেকে, তিনি আবু নাজিহ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মক্কাকে পবিত্র করেছেন, সুতরাং এর জমি বিক্রি করা এবং এর মূল্য ভোগ করা হারাম।" তিনি আরও বলেন: "যে ব্যক্তি মক্কার ঘরের ভাড়া থেকে কিছু ভক্ষণ করল, সে মূলত আগুন ভক্ষণ করল।" দারকুতনির বর্ণনায় রয়েছে: "মক্কা হারাম, এর জমি বিক্রি করা হারাম এবং এর ঘরের ভাড়া হারাম।"

দারকুতনি বলেন: আবু হানিফা উবায়দুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ বলতে গিয়ে ভুল করেছেন, মূলত তিনি হবেন ইবনে আবি জিয়াদ আল-কাদ্দাহ। আর মারফু হিসেবে বর্ণনা করতেও ভুল হয়েছে, এটি আসলে মওকুফ। অতঃপর তিনি ঈসা ইবনে ইউনুসের সূত্রে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবি জিয়াদ থেকে একইভাবে বর্ণনা করেছেন। সমাপ্ত। কাসেম ইবনুল হাকাম আবু হানিফার সূত্রে

এটি বর্ণনা করতে গিয়ে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবি জিয়াদই বলেছেন; সুতরাং প্রথম বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের পক্ষ থেকে এই ভ্রমটি হয়েছে।

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله إِلَى جَوَازِ بَيْعِهَا وَإِجَارَتِهَا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّهُمْ عَلَيْهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ بَعْدَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَهُ، وَلَمْ يَغْنَمْهَا وَلَمْ يُعَارِضْهُمْ فِيهَا، وَقَدْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَهَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَكَذَلِكَ بَعْدَهُ، هَذِهِ دَارُ النَّدْوَةِ، وَهِيَ أَوَّلُ دَارٍ بُنِيَتْ بِمَكَّةَ صَارَتْ بَعْدَ قُصَيٍّ لِعَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ، وَابْتَاعَهَا مُعَاوِيَةُ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ، وَجَعَلَهَا دَارَ الْإِمَارَةِ، وَكَانَتْ مِنْ أَشْهَرِ دَارٍ اُبْتِيعَتْ ذِكْرًا وَأَنْشَرَهَا فِي النَّاسِ خَبَرًا، فَمَا أَنْكَرَ بَيْعَهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَابْتَاعَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما مَا زَادَاهُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ دُورِ مَكَّةَ، وَتَمَلَّكَ أَهْلَهَا أَثْمَانَهَا، وَلَا حَرَّمَ ذَلِكَ لِمَا بَذَلَاهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ جَرَى بِهِ الْعَمَلُ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا، فَكَانَ إِجْمَاعًا مَتْبُوعًا.

وَتُحْمَلُ رِوَايَةُ مُجَاهِدٍ -مَعَ إِرْسَالِهَا- عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا عَلَى أَهْلِهَا، تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُغْنَمْ، فَتُمْلَكَ عَلَيْهِمْ فَلِذَلِكَ لَمْ تُبَعْ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْإِجَارَةِ.

فصل:

أَمَّا الْحَرَمُ فَهُوَ مَا أَطَافَ بِمَكَّةَ مِنْ جَوَانِبِهَا، وَحَدُّهُ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ دُونَ التَّنْعِيمِ عِنْدَ بُيُوتِ بَنِي نِفَارٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ عَلَى ثَنِيَّةِ جَبَلٍ بِالْمُنْقَطِعِ عَلَى سَبْعَةِ أَمْيَالٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الْجِعْرَانَةِ بِشُعَبِ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ عَلَى تِسْعَةِ أَمْيَالٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الطَّائِفِ عَلَى عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ نَمِرَةَ عَلَى سَبْعَةِ أَمْيَالٍ، وَمِنْ طَرِيقِ جُدَّةَ مُنْقَطِعُ الْعَشَائِرِ عَلَى عَشَرَةِ أَمْيَالٍ، فَهَذَا

= عن أبي حنيفة، وكذلك أخرجه الدارقطني لكنَّه في كتاب الآثار قال: عن أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد على الصواب، وقد رفعه أيمن ابن أم نابل عن عبيد الله بن أبي زياد أيضًا، فلم ينفرد أبو حنيفة برفعه، أخرجه الدارقطني أيضًا في أواخر الحج، وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني والحاكم من رواية إسماعيل بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمر رفعه: مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها. قال البخاري: منكر الحديث، وفي ترجمته أخرجه ابن عدي والعقيلي في الضعفاء.

وفي الباب من مرسل مجاهد: مكة حرام حرمها الله تعالى، لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها.

أخرجه ابن أبي شيبة، وعن معمر عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاوس قالوا: كانوا يكرهون بيع شيء من رباع مكة. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج: كان عطاء ينهى في الحرم ويقول: إن عمر كان ينهى أن تبوَّب دور مكة لئلَّا ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوَّب داره سهيل بن عمرو فلامه عمر فقال: إني رجل تاجر، فأردت أن أتخذ بابًا يحبس ظهري، قال: فلا إذًا. ومن طريق مجاهد أن عمر قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًا لينزل البادي حيث شاء، وعن معمر أخبرني بعض أهل مكة: لقد استخلف معاوية وما لدار مكة باب. [الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2/ 236] .

ইমাম শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) মক্কার ঘরবাড়ি বিক্রয় এবং তা ভাড়া দেওয়ার বৈধতার অভিমত পোষণ করেছেন; কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের পূর্বে তারা যে অবস্থায় ছিল, ইসলামের পরেও তাদের সেই অবস্থার ওপর বহাল রেখেছিলেন। তিনি এগুলোকে গনীমত হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং এগুলোর মালিকানায় তাদের সাথে কোনো বিরোধিতা করেননি। অথচ তারা ইসলামের পূর্বে এবং পরেও এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করত। এই যে 'দারুন নদওয়া', যা মক্কায় নির্মিত প্রথম ঘর; এটি কুসাইয়ের পর তার পুত্র আবদুদ দারের

মালিকানায় আসে এবং ইসলামের যুগে মুয়াবিয়া (রা.) এটি আবদুদ দারের বংশধর ইকরিমা ইবন আমির ইবন হিশাম ইবন আবদুদ দারের নিকট থেকে ক্রয় করেন এবং একে দারুল ইমারাহ (প্রশাসনিক ভবন) হিসেবে নির্ধারণ করেন। এটি ক্রয়-বিক্রয়কৃত ঘরগুলোর মধ্যে আলোচনার দিক থেকে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং মানুষের মাঝে খবরের দিক থেকে সর্বাধিক প্রচারিত ছিল। কোনো সাহাবীই এর বিক্রয়কে অস্বীকার করেননি। এছাড়া উমর এবং উসমান (রা.) মক্কার ঘরবাড়ি থেকে যা কিছু মাসজিদুল হারামের সম্প্রসারণে বৃদ্ধি করেছিলেন তা ক্রয় করেছিলেন এবং এর মালিকরা সেগুলোর মূল্য গ্রহণ করেছিলেন। তারা মুসলমানদের সম্পদ থেকে যা ব্যয় করেছিলেন তাকে কেউ হারাম ঘোষণা করেননি। এরপর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই আমলই জারি রয়েছে, যা একটি অনুসৃত ইজমায় (ঐকমত্য) পরিণত হয়েছে।
আর মুজাহিদের বর্ণনাটি—তার মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও—এভাবে ব্যাখ্যা করা হবে যে, মক্কার ঘরবাড়ি তাদের মালিকদের কাছে বিক্রি করা হালাল নয়; এটি এই বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যে, এগুলো গনীমত হিসেবে বিজিত হয়নি যাতে তাদের ওপর মালিকানা স্বত্ব আসে, তাই এগুলো বিক্রি করা হয়নি। ভাড়ার বিধানও অনুরূপ।
পরিচ্ছেদ:
হারাম হলো মক্কার চারপাশের এলাকা। মদীনার পথে এর সীমানা তানিঈমের নিকটবর্তী বনী নিফার গোত্রের ঘরবাড়ি পর্যন্ত যা তিন মাইল দূরে অবস্থিত। ইরাকের পথে এটি সাত মাইল দূরে পাহাড়ের একটি গিরিপথে। জিরানা পথে এটি নয় মাইল দূরে আল-আবদুল্লাহ ইবন খালিদ পরিবারের উপত্যকায়। তায়েফের পথে আরাফাত অভিমুখে নামিরাহ প্রান্তরের মধ্যস্থলে সাত মাইল দূরে। আর জেদ্দার পথে এটি দশ মাইল দূরে আল-আশাঈর নামক স্থানে। এটি হলো...

= আবু হানিফা থেকে বর্ণিত, অনুরূপভাবে দারা কুতনী এটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'কিতাবুল আসার'-এ বলেছেন: আবু হানিফা থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবন আবি যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এটিই সঠিক। আইমান ইবন উম্মে নাবিলও এটি উবায়দুল্লাহ ইবন আবি যিয়াদ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সুতরাং আবু হানিফা এটি মারফু হিসেবে বর্ণনায় একক নন। দারা কুতনী হজ্জ অধ্যায়ের শেষেও এটি বর্ণনা করেছেন। এর আরেকটি সূত্র রয়েছে যা দারা কুতনী এবং হাকীম বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল ইবন মুহাজির থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন বাবাহ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমর থেকে মারফু সূত্রে

বর্ণনা করেছেন: "মক্কা হলো সবার জন্য উন্মুক্ত অবতরণস্থল, এর ঘরবাড়ি বিক্রি করা যায় না এবং ভাড়া দেওয়া যায় না।" ইমাম বুখারী বলেন: সে মুনকারুল হাদীস (পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী), এবং ইবন আদি ও উকাইলি যঈফ বর্ণনাকারীদের জীবনীতে তাকে উল্লেখ করেছেন।
এই বিষয়ে মুজাহিদের একটি মুরসাল বর্ণনা রয়েছে: "মক্কা হলো একটি হারাম বা পবিত্র স্থান যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন, এর জমি বিক্রি করা কিংবা ঘরবাড়ি ভাড়া দেওয়া হালাল নয়।"
ইবন আবি শাইবা এটি বর্ণনা করেছেন। মা'মার থেকে, তিনি লাইস থেকে, তিনি মুজাহিদ, আতা এবং তাউস থেকে বর্ণনা করেছেন যে তারা বলেন: তারা মক্কার কোনো জমি বা ঘরবাড়ি বিক্রি করা অপছন্দ করতেন। আবদুর রাজ্জাক ইবন জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেন: আতা হারামে এটি নিষেধ করতেন এবং বলতেন যে উমর (রা.) মক্কার ঘরগুলোতে দরজা লাগাতে নিষেধ করতেন যেন হাজীরা এর আঙ্গিনায় অবস্থান করতে পারে। সুহাইল ইবন আমর সর্বপ্রথম তার ঘরে দরজা লাগিয়েছিলেন, এতে উমর (রা.) তাকে তিরস্কার করলে তিনি বলেন: আমি একজন ব্যবসায়ী মানুষ, আমি একটি দরজা লাগাতে চেয়েছি যেন তা আমার ভারবাহী পশুদের আটকে রাখে। তিনি (উমর) বললেন: তবে ঠিক আছে। মুজাহিদের সূত্রে বর্ণিত যে উমর (রা.) বলেছেন: হে মক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের ঘরের জন্য দরজা বানিয়ো না যেন আগন্তুক মুসাফির যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারে। মা'মার থেকে বর্ণিত যে মক্কার জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন: মুয়াবিয়া (রা.) খলীফা হওয়া পর্যন্ত মক্কার ঘরগুলোর কোনো দরজা ছিল না। [আদ-দিরায়া ফি তাখরিজি আহাদিসিল হিদায়া: ২/২৩৬]।

(ص: 250)الأحكام السلطانية للماوردي

حَدُّ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَرَمًا لِمَا اخْتَصَّ بِهِ مِنَ التَّحْرِيمِ، وَبَايَنَ بِحُكْمِهِ سَائِرَ الْبِلَادِ.
قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا} [البقرة: 126] .
يَعْنِي: مَكَّةَ وَحَرَمَهَا، {وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ} [البقرة: 126] ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَادِيًا غَيْرَ ذِي زَرْعٍ، فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ لِأَهْلِهِ الْأَمْنَ وَالْخِصْبَ؛ لِيَكُونُوا بِهِمَا فِي رَغَدٍ مِنْ

الْعَيْشِ، فَأَجَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَا سَأَلَ، فَجَعَلَهُ حَرَمًا آمِنًا يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ، وَجَبَا إِلَيْهِ ثَمَرَاتِ كُلِّ بَلَدٍ حَتَّى جَمَعَهَا فِيهِ.

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَكَّةَ وَمَا حَوْلَهَا، هَلْ صَارَتْ حَرَمًا آمِنًا بِسُؤَالِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، أَوْ كَانَتْ قَبْلَهُ كَذَلِكَ، عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّهَا لَمْ تَزَلْ حَرَمًا آمِنًا بِسُؤَالِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَالْمُسَلَّطِينَ وَمِنَ الْخُسُوفِ وَالزَّلَازِلِ، وَإِنَّمَا سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام رَبَّهُ سبحانه أَنْ يَجْعَلَهُ حَرَمًا آمِنًا مِنَ الْجَدْبِ وَالْقَحْطِ، وَأَنْ يَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ؛ لِرِوَايَةِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ سبحانه حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا أَوْ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرًا، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَلَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا هَذِهِ السَّاعَةَ غَضَبًا عَلَى أَهْلِهَا، أَلَا وَهِيَ قَدْ رَجَعَتْ عَلَى حَالِهَا بِالْأَمْسِ، أَلَا لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَمَنْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَتَلَ بِهَا أَحَدًا فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ تعالى قَدْ أَحَلَّهَا لِرَسُولِهِ وَلَمْ يُحِلَّهَا لَكَ" 1.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّ مَكَّةَ كَانَتْ حَلَالًا قَبْلَ دَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام كَسَائِرِ الْبِلَادِ، وَإِنَّهَا صَارَتْ بِدَعْوَتِهِ حَرَمًا آمِنًا حِينَ حَرَّمَهَا، كَمَا صَارَتِ الْمَدِينَةُ بِتَحْرِيمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَامًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ حَلَالًا؛ لِرِوَايَةِ الْأَشْعَثِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم كان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عضاها وصيدها، لا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير، ولا ينفر صيدها".

وَالَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ الْحَرَمُ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُبَايِنُ بِهَا سَائِرَ الْبِلَادِ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ:

أَحَدُهَا: إِنَّ الْحَرَمَ لَا يَدْخُلُهُ مُحِلٌّ قَدِمَ إِلَيْهِ حَتَّى يُحْرِمَ لِدُخُولِهِ، إِمَّا بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ يَتَحَلَّلُ بِهَا مِنْ إِحْرَامِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَهَا الْمُحِلُّ إِذَا لَمْ يُرِدْ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً، وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ حَلَالًا: "أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي" 2، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَى دَاخِلِهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَكْثُرُ

---

1 رواه البخاري في كتاب العلم "104"، ومسلم في كتاب الحج "1354".

2 سبق تخريجه.

মহান আল্লাহ যা কিছুকে তাঁর বিশেষ পবিত্রতার জন্য হারাম (পবিত্র ভূমি) হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং এর বিধানকে অন্যান্য সকল শহর থেকে পৃথক করেছেন, তার সীমা।

মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন: {এবং স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহিম বলেছিলেন: হে আমার প্রতিপালক! আপনি একে একটি নিরাপদ শহর বানিয়ে দিন} [আল-বাকারা: ১২৬]। অর্থাৎ: মক্কা এবং এর হারাম এলাকা; {এবং এর অধিবাসীদের ফলমূল দ্বারা রিজিক দান করুন} [আল-বাকারা: ১২৬]; কারণ এটি ছিল শস্যহীন এক প্রান্তর। তাই তিনি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তিনি এর অধিবাসীদের নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য দান করেন, যাতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে। ফলে মহান আল্লাহ তাঁর সেই প্রার্থনা কবুল করেন এবং একে একটি নিরাপদ হারাম হিসেবে নির্ধারণ করেন, যখন এর চারপাশের মানুষদের ছিনতাই করা হচ্ছিল, আর তিনি সব অঞ্চলের ফলমূল এখানে সমবেত করেন।

মক্কা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, এটি কি ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রার্থনার মাধ্যমে নিরাপদ হারাম হয়েছে, নাকি তাঁর পূর্বেই এমন ছিল? এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি হলো: স্বৈরাচারী শাসক, আধিপত্য বিস্তারকারী এবং ভূমিধস ও ভূমিকম্প থেকে এটি সর্বদা নিরাপদ হারাম হিসেবেই ছিল। ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) তাঁর মহান প্রতিপালকের কাছে কেবল এই প্রার্থনা করেছিলেন যেন তিনি একে দুর্ভিক্ষ ও অনাহার থেকে নিরাপদ হারাম করেন এবং এর অধিবাসীদের ফলমূল দ্বারা রিজিক দান করেন; সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত আবু সাঈদের বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি বলেন: আমি আবু শুরাইহ আল-খুজায়িকে বলতে শুনেছি যে,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন: "হে লোকসকল, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই মক্কাকে সম্মানিত (হারাম) করেছেন। সুতরাং এটি কিয়ামত পর্যন্ত হারামই থাকবে। আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন কোনো ব্যক্তির জন্য এখানে রক্তপাত করা বা কোনো গাছ কাটা বৈধ নয়। আমার পূর্বে কারো জন্য এটি বৈধ ছিল না এবং আমার জন্যও দিনের কেবল এই অল্প সময়ের জন্য তাদের (অধিবাসীদের) প্রতি ক্রোধের কারণে বৈধ করা হয়েছিল। জেনে রাখো, এটি পুনরায় গতকালের মতো হারামে পরিণত হয়েছে। উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে এ বার্তা পৌঁছে দেয়। কেউ যদি বলে যে আল্লাহর রাসূল এখানে কাউকে হত্যা করেছেন, তবে তোমরা তাকে বলে দিও: 'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য একে বৈধ করেছিলেন, কিন্তু তোমার জন্য বৈধ করেননি'।" ১।

দ্বিতীয় অভিমত হলো: ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর দোয়ার পূর্বে মক্কা অন্যান্য শহরের মতো সাধারণ (হালাল) ছিল। তিনি যখন একে সম্মানিত ঘোষণা করেন, তখন থেকে তাঁর দোয়ার মাধ্যমে এটি নিরাপদ হারামে পরিণত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মানিত ঘোষণার মাধ্যমে মদিনা সাধারণ ভূমি থেকে হারামে পরিণত হয়েছে; আশ'আস কর্তৃক নাফে' ও আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই ইব্রাহিম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর খলীল (বন্ধু) ছিলেন এবং আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। ইব্রাহিম মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন এবং আমি মদিনার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলের কাঁটাযুক্ত গাছ ও শিকারকে হারাম ঘোষণা করেছি। যুদ্ধের জন্য সেখানে অস্ত্র বহন করা যাবে না, পশুর খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গাছ কাটা যাবে না এবং সেখানকার কোনো শিকারকে তাড়ানো যাবে না।"

হারামের সাথে খাস বা বিশিষ্ট বিধানসমূহ, যার মাধ্যমে এটি অন্যান্য শহর থেকে পৃথক হয়, তা হলো পাঁচটি বিধান:

এর মধ্যে একটি হলো: ইহরামবিহীন কোনো ব্যক্তি এই হারামে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না সে হজ্জ বা উমরার ইহরাম পরিধান করে, যার মাধ্যমে সে ইহরাম থেকে হালাল হতে পারে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: যদি হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা না থাকে তবে ইহরাম ছাড়াই প্রবেশ করা জায়েজ। মক্কা বিজয়ের বছর নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) যখন ইহরাম ছাড়া (হালাল অবস্থায়) প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁর সেই বক্তব্য: "দিনের এক ক্ষুদ্র সময়ের জন্য এটি আমার জন্য হালাল করা হয়েছিল যা আমার পরে আর কারো জন্য হালাল

হবে না" ২, যা একথার প্রমাণ বহন করে যে হারামে প্রবেশকারীর জন্য ইহরাম করা ওয়াজিব, তবে যদি এমন কেউ হয় যার ঘনঘন প্রবেশ করতে হয়...

---

১ বুখারি, ইলম অধ্যায় (১০৪) এবং মুসলিম, হজ্জ অধ্যায় (১৩৫৪) বর্ণনা করেছেন।

২ পূর্বে এর উৎস উল্লেখ করা হয়েছে।

(ص: 251)الأحكام السلطانية للماوردي

الدُّخُولُ إِلَيْهَا لِمَنَافِعِ أَهْلِهَا؛ كَالْحَطَّابِينَ وَالسَّقَّايِينَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنْهَا غُدْوَةً وَيَعُودُونَ إِلَيْهَا عَشِيَّةً، فَيَجُوزُ لَهُمْ دُخُولُهَا مُحَلِّينَ لِدُخُولِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ فِي الْإِحْرَامِ كُلَّمَا دَخَلُوا، فَإِنَّ عُلَمَاءَ مَكَّةَ أَقَرُّوهُمْ عَلَى دُخُولِهَا مُحَلِّينَ، فَخَالَفُوا حُكْمَ مَنْ عَدَاهُمْ، فَإِنْ دَخَلَ الْقَادِمُ إِلَيْهَا حَلَالًا فَقَدْ أَثِمَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مُتَعَذِّرٌ، فَإِنَّهُ إِذَا خَرَجَ لِلْقَضَاءِ كَانَ إِحْرَامُهُ الَّذِي يَسْتَأْنِفُهُ مُخْتَصًّا بِدُخُولِهِ الثَّانِي، فَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ قَضَاءً عَنْ دُخُولِهِ الْأَوَّلِ، فَتَعَذَّرَ الْقَضَاءُ وَأَعْوَزَ فَسَقَطَ، فَأَمَّا الدَّمُ فَلَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ الدَّمَ يَلْزَمُ جُبْرَانَ النُّسُكِ، وَلَا يَلْزَمُ جُبْرَانًا لِأَصْلِ النُّسُكِ.

وَالْحُكْمُ الثَّانِي: أَنْ لَا يُحَارَبَ أَهْلُهَا؛ لِتَحْرِيمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِتَالَهُمْ، فَإِنْ بَغَوْا عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى تَحْرِيمِ قِتَالِهِمْ مَعَ بَغْيِهِمْ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَرْجِعُوا عَنْ بَغْيِهِمْ، وَيَدْخُلُوا فِي أَحْكَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ عَلَى بَغْيِهِمْ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُمْ عَنِ الْبَغْيِ إِلَّا بِقِتَالٍ؛ لِأَنَّ قِتَالَ أَهْلِ الْبَغْيِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تعالى الَّتِي لَا يَجُوزُ أَنْ تُضَاعَ؛ وَلِأَنْ تَكُونَ مَحْفُوظَةً فِي حَرَمِهِ أَوْلَى مِنْ أَنْ تَكُونَ مُضَاعَةً فِيهِ.

فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي الْحَرَمِ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله إِلَى أَنَّهَا تُقَامُ فِيهِ عَلَى مَنْ أَتَاهَا، وَلَا يَمْنَعُ الْحَرَمُ مِنْ إِقَامَتِهَا، سَوَاءٌ أَتَاهَا فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحِلِّ ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ أَتَاهَا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَتْ فِيهِ، وَإِنْ أَتَاهَا فِي الْحِلِّ ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ فِيهِ، وَأُلْجِئَ إِلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ، فَإِذَا خَرَجَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ.

وَالْحُكْمُ الثَّالِثُ: تَحْرِيمُ صَيْدِهِ عَلَى الْمُحْرِمِينَ وَالْمُحِلِّينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ وَمَنْ طَرَأَ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَصَابَ فِي صَيْدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِرْسَالُهُ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ بِالْجَزَاءِ كَالْمُحْرِمِ، وَهَكَذَا لَوْ رَمَى مِنَ الْحَرَمِ صَيْدًا فِي الْحِلِّ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ فِي الْحَرَمِ. وَهَكَذَا لَوْ رَمَى مِنَ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ مَقْتُولٌ فِي الْحَرَمِ. وَلَا صَيْدَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ كَانَ حَلَالًا لَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله، وَحَرَامًا عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا يَحْرُمُ قَتْلُ مَا كَانَ مُؤْذِيًا مِنَ السِّبَاعِ وَحَشَرَاتِ الْأَرْضِ.

وَالْحُكْمُ الرَّابِعُ: يَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ الَّذِي أَنْبَتَهُ اللَّهُ تعالى، وَلَا يَحْرُمُ قَطْعُ مَا غَرَسَهُ الْآدَمِيُّونَ، كَمَا لَا يَحْرُمُ فِيهِ ذَبْحُ الْأَنِيسِ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَلَا يَحْرُمُ رَعْيُ خَلَاهُ، وَيَضْمَنُ مَا قَطَعَهُ

হারামের অধিবাসীদের উপকারের উদ্দেশ্যে সেখানে প্রবেশ করা; যেমন কাঠুরে এবং পানি সরবরাহকারী যারা প্রতিদিন ভোরে সেখান থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসে, তাদের জন্য ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা বৈধ। কারণ প্রতিবার প্রবেশের সময় ইহরাম গ্রহণ করা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হবে। মক্কার ওলামায়ে কেরাম তাদেরকে ইহরাম ব্যতীত প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন, ফলে তারা অন্যদের সাধারণ বিধানের ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হয়েছেন। তবে সাধারণ কোনো ব্যক্তি যদি ইহরাম ব্যতীত সেখানে প্রবেশ করে, তবে সে গুনাহগার হবে; কিন্তু তার ওপর কোনো কাজা বা দম (পশু কোরবানি) ওয়াজিব হবে না। কারণ এক্ষেত্রে কাজা আদায় করা অসম্ভব। কেননা সে যদি কাজা আদায়ের নিয়তে হারামের বাইরে গিয়ে পুনরায় ইহরাম বাঁধে, তবে সেই ইহরাম তার দ্বিতীয়বার প্রবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, তাই এটি প্রথম প্রবেশের কাজা হিসেবে গণ্য হওয়া সহিহ হবে না। সুতরাং কাজা করা অসম্ভব ও দুষ্কর হওয়ায় তা রহিত হয়ে যাবে। আর দমের (রক্ত বা পশু কোরবানি) বিধানও তার ওপর

প্রযোজ্য হবে না; কারণ দম ওয়াজিব হয় ইবাদতের অসম্পূর্ণতা পূরণের জন্য, কিন্তু এখানে মূল ইবাদত (ইহরাম) শুরুই হয়নি, তাই তা পূরণের প্রশ্ন আসে না।

দ্বিতীয় বিধান হলো: হারামের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না; কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সাথে যুদ্ধ করা হারাম করেছেন। তবে তারা যদি ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তবে কোনো কোনো ফকিহ তাদের বিদ্রোহ সত্ত্বেও হারামের ভেতর যুদ্ধ করা হারাম মনে করেন। এক্ষেত্রে তাদের ওপর অবরোধ বা চাপ সৃষ্টি করতে হবে যতক্ষণ না তারা বিদ্রোহ ত্যাগ করে সত্যের পথে ফিরে আসে এবং ন্যায়পরায়ণদের বিধানের অনুগত হয়। তবে অধিকাংশ ফকিহদের মত হলো, যদি যুদ্ধ ছাড়া তাদের বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব না হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। কারণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মহান আল্লাহর অন্যতম বিধান যা নষ্ট হতে দেওয়া সমীচীন নয়; আর আল্লাহর হারামের পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে এই বিধান কার্যকর রাখা তা অবহেলা করার চেয়ে অধিকতর শ্রেয়।

হারামে হদ বা দণ্ডবিধি কার্যকর করার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) এই মত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি দণ্ডযোগ্য অপরাধ করবে তার ওপর হারামের ভেতরেই দণ্ড কার্যকর করা হবে। হারামের পবিত্রতা দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাধা হবে না, চাই সে অপরাধ হারামের ভেতরে করুক অথবা হারামের বাইরে করে হারামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করুক। ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: যদি অপরাধ হারামের ভেতরে সংঘটিত হয় তবে হারামের ভেতরেই দণ্ড কার্যকর করা হবে। আর যদি হারামের বাইরে অপরাধ করে হারামে আশ্রয় নেয়, তবে হারামের ভেতর দণ্ড কার্যকর করা হবে না; বরং তাকে হারামের বাইরে যেতে বাধ্য করা হবে এবং বাইরে আসার পর দণ্ড কার্যকর করা হবে।

তৃতীয় বিধান হলো: ইহরামধারী এবং হারামের ভেতর অবস্থানকারী ইহরামহীন ব্যক্তি—উভয়ের জন্যই হারামের শিকার করা হারাম। যদি কেউ কোনো বন্যপ্রাণী শিকার করে ফেলে, তবে তা মুক্ত করে দেওয়া তার ওপর ওয়াজিব। যদি শিকারটি তার হাতে মারা যায়, তবে ইহরামধারীর ন্যায় তাকেও বিনিময় (জাজাহ) প্রদান করে দায়ী হতে হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি হারামের ভেতর থেকে হারামের বাইরের কোনো শিকার লক্ষ্য করে তীর ছোড়ে, তবে সে দায়ী হবে; কারণ সে হারামের ভেতর থেকে শিকার করেছে। আবার কেউ যদি হারামের বাইরে থেকে হারামের ভেতরের কোনো শিকার লক্ষ্য করে তীর ছোড়ে, তবে সে দায়ী হবে; কারণ শিকারটি হারামের সীমানায় নিহত হয়েছে। আর যদি হারামের বাইরে কোনো শিকার ধরার পর

তা হারামে প্রবেশ করানো হয়, তবে ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে তা শিকারীর জন্য হালাল থাকবে, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে তা হারাম হয়ে যাবে। তবে হিংস্র প্রাণী এবং ক্ষতিকর পোকামাকড় যা কষ্টদায়ক, তা হত্যা করা হারাম নয়।
চতুর্থ বিধান হলো: হারামের ঐ সকল গাছ বা উদ্ভিদ কাটা হারাম যা মহান আল্লাহ প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন করেছেন। তবে মানুষের রোপণ করা গাছ বা শস্য কাটা হারাম নয়, যেমনিভাবে হারামে গৃহপালিত পশু জবাই করা হারাম নয়। হারামের ঘাস চতুষ্পদ প্রাণীর চরে খাওয়া হারাম নয়, তবে যা কাটা হবে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(ص: 252)الأحكام السلطانية للماوردي

مِنْ مَحْظُورِ شَجَرِهِ، فَيَضْمَنُ الشَّجَرَةَ الْكَبِيرَةَ بِبَقَرَةٍ، وَالشَّجَرَةَ الصَّغِيرَةَ بِشَاةٍ، وَالْغُصْنَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسْقِطُهُ مِنْ ضَمَانِ أَصْلِهِ، وَلَا يَكُونُ مَا اسْتَخْلَفَ بَعْدَ قَطْعِ الْأَصْلِ مُسْقِطًا لِضَمَانِ الْأَصْلِ.

الْحُكْمُ الْخَامِسُ: أَنْ لَيْسَ لِجَمِيعِ مَنْ خَالَفَ دِينَ الْإِسْلَامِ مِنْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ لَا مُقِيمًا فِيهِ وَلَا مَارًّا بِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ.

وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ دُخُولَهُمْ إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يَسْتَوْطِنُوهُ، وَفِي قَوْله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] .

نَصٌّ يَمْنَعُ مَا عَدَاهُ، فَإِنْ دَخَلَهُ مُشْرِكٌ عُزِّرَ إِنْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَلَمْ يَسْتَبِحْ قَتْلَهُ، وَإِنْ دَخَلَهُ بِإِذْنٍ لَمْ يُعَزَّرْ، وَأُنْكِرَ عَلَى الْآذِنِ لَهُ، وَعُزِّرَ إِنِ اقْتَضَتْ حَالُهُ التَّعْزِيرَ، وَأُخْرِجَ مِنْهُ الْمُشْرِكُ آمِنًا، وَإِذَا أَرَادَ مُشْرِكٌ دُخُولَ الْحَرَمِ لِيُسْلِمَ فِيهِ مُنِعَ مِنْهُ حَتَّى يُسْلِمَ قَبْلَ دُخُولِهِ، وَإِذَا مَاتَ مُشْرِكٌ فِي الْحَرَمِ حَرُمَ دَفْنُهُ فِيهِ وَدُفِنَ فِي الْحِلِّ، فَإِنْ دُفِنَ فِي الْحَرَمِ نُقِلَ إِلَى الْحِلِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَلِيَ فَيُتْرَكُ فِيهِ كَمَا تُرِكَتْ أَمْوَاتُ الْجَاهِلِيَّةِ.

وَأَمَّا سَائِرُ الْمَسَاجِدِ فَيَجُوزُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ فِي دُخُولِهَا مَا لَمْ يُقْصَدْ بِالدُّخُولِ اسْتِبْذَالُهَا بِأَكْلٍ أَوْ نَوْمٍ فَيُمْنَعُوا.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ فِي دُخُولِهَا بِحَالٍ.

হারামের সংরক্ষিত বৃক্ষরাজির ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে; বড় গাছের জন্য একটি গরু এবং ছোট গাছের জন্য একটি ছাগল জরিমানা দিতে হবে। আর এই দুই প্রকারের গাছের শাখা কাটার ফলে যে জরিমানা হবে, তা মূল বৃক্ষের জরিমানা থেকে কমিয়ে দেওয়া হবে। তবে মূল গাছটি কাটার পর সেখান থেকে পুনরায় যা গজাবে, তা মূলের জরিমানা মওকুফ করবে না।

পঞ্চম বিধান: ইসলাম বিরোধী সকল অমুসলিম, চাই সে জিম্মি হোক কিংবা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম (মুয়াহিদ), তাদের জন্য হারামে প্রবেশ করা বৈধ নয়; সেখানে বসবাসকারী হিসেবেও নয় এবং পথচারী হিসেবেও নয়। এটি ইমাম শাফেঈ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) এবং অধিকাংশ ফকীহগণের অভিমত।

ইমাম আবু হানিফা হারামে তাদের প্রবেশকে বৈধ বলেছেন যদি তারা সেখানে স্থায়ী বসবাস না করে। আর মহান আল্লাহর বাণীতে রয়েছে: {নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র, সুতরাং তারা যেন তাদের এই বছরের পর মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়} [আত-তাওবাহ: ২৮]।

এটি একটি অকাট্য বিধান যা অন্য সবকিছুকে নিষেধ করে। সুতরাং কোনো মুশরিক যদি বিনা অনুমতিতে সেখানে প্রবেশ করে, তবে তাকে শাস্তিমূলক দণ্ড (তা'যীর) দেওয়া হবে, কিন্তু তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। আর যদি সে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না, তবে অনুমতি প্রদানকারীকে তিরস্কার করা হবে এবং পরিস্থিতি সাপেক্ষে তাকেও শাস্তি প্রদান করা হবে। আর মুশরিক ব্যক্তিকে নিরাপদে হারাম থেকে বের করে দেওয়া হবে। কোনো মুশরিক যদি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে হারামে প্রবেশ করতে চায়, তবে প্রবেশের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাকে বাধা প্রদান করা হবে। যদি হারামের ভেতর কোনো মুশরিক মারা যায়, তবে সেখানে তাকে দাফন করা হারাম, বরং তাকে হারামের বাইরে (হিল এলাকায়) দাফন করা হবে। যদি হারামে দাফন করা হয়ে থাকে, তবে তাকে হারামের বাইরে সরিয়ে নেওয়া হবে; তবে যদি মৃতদেহ পচে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে তাকে সেখানেই রেখে দেওয়া হবে যেমনটি জাহেলী যুগের মৃতদের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। আর অন্যান্য মসজিদের ক্ষেত্রে, তাদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া জায়েয আছে যতক্ষণ না প্রবেশের উদ্দেশ্য সেখানে

পানাহার কিংবা নিদ্রার মাধ্যমে সেগুলোর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়; অন্যথায় তাদের বাধা দেওয়া হবে।
ইমাম মালিক বলেন: কোনো অবস্থাতেই তাদের মসজিদে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া বৈধ নয়।

(ص: 253)الأحكام السلطانية للماوردي

فَصْلٌ:
وَأَمَّا الْحِجَازُ فَقَدْ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: سُمِّيَ حِجَازًا لِأَنَّهُ حَجَزَ بَيْنَ نَجْدٍ وَتِهَامَةَ، وَقَالَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ: سُمِّيَ حِجَازًا لِمَا احْتَجَزَ بِهِ مِنَ الْجِبَالِ.
وَمَا سِوَى الْحَرَمِ مِنْهُ مَخْصُوصٌ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ لَا يَسْتَوْطِنَهُ مُشْرِكٌ مِنْ ذِمِّيٍّ وَلَا مُعَاهَدٍ، وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَدْ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رحمه الله، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ- عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ: "لَا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ" 1.
وَأَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَهْلَ الذِّمَّةِ عَنِ الْحِجَازِ، وَضَرَبَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا أَوْ صَانِعًا مَقَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَيَخْرُجُونَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا، فَجَرَى بِهِ الْعَمَلُ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، فَمَنَعَ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنِ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ، وَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ دُخُولِهِ، وَلَا يُقِيمُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ صُرِفَ عَنْ مَوْضِعِهِ، وَجَازَ أَنْ يُقِيمَ فِي غَيْرِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يُصْرَفَ إِلَى غَيْرِهِ.
فَإِنْ أَقَامَ بِمَوْضِعٍ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عُزِّرَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا.

---

1 صحيح: رواه أحمد "25820"، وقال الزيلعي: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، أخبرنا النضر بن شميل، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفِّي فيه: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" وفيه قصة. ورواه عبد الرزاق في مصنَّفه في كتاب أهل الكتاب: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع بأرض العرب -أوقال- بأرض الحجاز دينان" ورواه في الزكاة، وزاد فيه، فقال عمر لليهود: من كان منكم عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأت به، وإلَّا فإني مجليكم، قال: فأجلاهم عمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مرض موته. انتهى.

ورواه ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان. انتهى.

قال الدارقطني في علله: وهذا حديث صحيح، انتهى. ورواه مالك في الموطأ: قال أبو مصعب: أخبرنا مالك عن ابن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه اليقين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" فأجلى زفر خيبر وأجلى زفر نجران وفدك. [نصب الراية: 3/ 454] .

পরিচ্ছেদ:

আর হিজাজ প্রসঙ্গে আল-আসমাঈ বলেছেন: একে হিজাজ নামকরণ করা হয়েছে কারণ এটি নজদ ও তিহামার মধ্যে ব্যবধান তৈরি করেছে। ইবনুল কালবী বলেছেন: পাহাড়ের মাধ্যমে বেষ্টিত বা আবৃত হওয়ার কারণে একে হিজাজ বলা হয়।

হিজাজের অন্তর্ভুক্ত হারাম এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য সকল ভূখণ্ড থেকে চারটি বিশেষ বিধানে পৃথক:

প্রথমটি হলো: কোনো মুশরিক—সে জিম্মি হোক বা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম—সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না। তবে ইমাম আবু হানিফা একে বৈধ বলেছেন। ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আয়েশা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) তাঁর সর্বশেষ যে অসিয়ত করেছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন: "আরব উপদ্বীপে যেন দুটি দ্বীন একত্রে না থাকে।" ১।

উমর ইবনুল খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) হিজাজ থেকে জিম্মিদের বহিষ্কার করেছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে যারা ব্যবসায়ী বা কারিগর হিসেবে আসত, তাদের অবস্থানের জন্য তিন দিন সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। সেই সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তারা বেরিয়ে যেত। সে অনুযায়ী আমল চালু হয় এবং বিধানটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে তিনি জিম্মিদের হিজাজে বসতি স্থাপনে বাধা প্রদান করেন এবং তাদের সেখানে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয় না। তাদের কেউ সেখানে কোনো এক স্থানে তিন দিনের বেশি অবস্থান করতে পারে না। যখন সেই সময় শেষ হয়, তাকে সেই স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে অন্য কোনো স্থানে তিন দিন থাকার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, এরপর পুনরায় তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যদি সে কোনো উপযুক্ত ওযর ছাড়াই সেখানে তিন দিনের বেশি অবস্থান করে, তবে তাকে শাস্তিমূলক দণ্ড প্রদান করা হবে।

---

১ সহীহ: আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন (২৫৮২০)। যাইলায়ী বলেন: ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহি তাঁর মুসনাদে এটি বর্ণনা করেছেন, আন-নাদর ইবনে শুমাইল আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, সালিহ ইবনে আবিল আখদার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যুহরি থেকে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে যে, আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) তাঁর মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন বলেছিলেন: "আরব উপদ্বীপে যেন দুটি দ্বীন একত্রে না থাকে" এবং এতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর আবদুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থের 'আহলে কিতাব' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন: মা'মার আমাদের সংবাদ দিয়েছেন যুহরি থেকে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "আরব ভূখণ্ডে—অথবা তিনি বলেছেন—হিজাজ ভূখণ্ডে দুটি দ্বীন একত্রে থাকতে পারবে না।" তিনি যাকাত অধ্যায়েও এটি বর্ণনা করেছেন এবং সেখানে অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন যে, উমর ইহুদিদের বলেছিলেন:

"তোমাদের মধ্যে যার কাছে আল্লাহর রাসূলের (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) কোনো অঙ্গীকারনামা রয়েছে সে যেন তা নিয়ে আসে, অন্যথায় আমি তোমাদের বহিষ্কার করব।" তিনি বলেন: এরপর উমর তাদের বহিষ্কার করেন। আর নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) তাঁর মৃত্যুশয্যায় এটি বলেছিলেন। সমাপ্ত।
ইবনে হিশাম তাঁর সিরাত গ্রন্থে ইবনে ইসহাক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন: সালিহ ইবনে কায়সান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যুহরি থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ থেকে, তিনি আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূলের (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) সর্বশেষ অসিয়ত ছিল এই যে, আরব উপদ্বীপে যেন দুটি দ্বীন অবশিষ্ট না থাকে। সমাপ্ত।
দারাকুতনি তাঁর ইলাল গ্রন্থে বলেন: এটি একটি সহীহ হাদীস। সমাপ্ত। আর ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন: আবু মুসাব বলেন: মালিক আমাদের সংবাদ দিয়েছেন ইবনে শিহাব থেকে যে, আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "আরব উপদ্বীপে দুটি দ্বীন একত্রে থাকবে না।" ইমাম মালিক বলেন: ইবনে শিহাব বলেছেন: উমর ইবনুল খাত্তাব এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালান যতক্ষণ না তিনি নিশ্চিত হন যে আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) বলেছিলেন: "আরব উপদ্বীপে দুটি দ্বীন একত্রে থাকবে না।" অতঃপর তিনি খায়বার, নাজরান ও ফাদাকের অমুসলিমদের বহিষ্কার করেন। [নাসবুর রাইয়াহ: ৩/৪৫৪]।

(ص: 254)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالْحُكْمُ الثَّانِي: أَنْ لَا تُدْفَنَ أَمْوَاتُهُمْ وَيُنْقَلُوا إِنْ دُفِنُوا فِيهِ إِلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ دَفْنَهُمْ مُسْتَدَامٌ فَصَارَ كَالِاسْتِيطَانِ، إِلَّا أَنْ يَبْعُدَ مَسَافَةُ إِخْرَاجِهِمْ مِنْهُ وَيَتَغَيَّرُوا إِنْ أُخْرِجُوا، فَيَجُوزُ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ أَنْ يُدْفَنُوا فِيهِ.

وَالْحُكْمُ الثَّالِثُ: إِنَّ لِمَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحِجَازِ حَرَمًا مَحْظُورًا، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُمْنَعُ مِنْ تَنْفِيرِ صَيْدِهِ وَعَضْدِ شَجَرِهِ كَحَرَمِ مَكَّةَ، وَأَبَاحَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَعَلَ الْمَدِينَةَ كَغَيْرِهَا، وَفِيمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَرَمَ الْمَدِينَةِ مَحْظُورٌ، فَإِنْ قَتَلَ صَيْدَهُ وَعَضَدَ شَجَرَهُ فَقَدْ قِيلَ: إِنَّ جَزَاءَهُ سَلْبُ ثِيَابِهِ، وَقِيلَ: تَعْزِيرُهُ.

وَالْحُكْمُ الرَّابِعُ: إِنَّ أَرْضَ الْحِجَازِ تَنْقَسِمُ لِاخْتِصَاصِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِفَتْحِهَا قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: صَدَقَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي أَخَذَهَا بِحَقَّيْهِ، فَإِنَّ أَحَدَ حَقَّيْهِ خُمُسُ الْخُمُسِ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنَائِمِ.

وَالْحَقُّ الثَّانِي: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ الَّذِي أَفَاءَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَمَا صَارَ إِلَيْهِ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْحَقَّيْنِ، فَقَدْ رَضَخَ مِنْهُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَتَرَكَ بَاقِيَهُ لِنَفَقَتِهِ وَصِلَاتِهِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى مَاتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حُكْمِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَجَعَلَهُ قَوْمٌ مَوْرُوثًا عَنْهُ وَمَقْسُومًا عَلَى الْمَوَارِيثِ مِلْكًا، وَجَعَلَهُ آخَرُونَ لِلْإِمَامِ الْقَائِمِ مَقَامَهُ فِي حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعَدُوِّ.

وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا صَدَقَاتٌ مُحَرَّمَةُ الرِّقَابِ، مَخْصُوصَةُ الْمَنَافِعِ مَصْرُوفَةٌ فِي وُجُوهِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، وَمَا سِوَى صَدَقَاتِهِ أَرْضُ عُشْرٍ لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا مَا بَيْنَ مَغْنُومٍ مُلِكَ عَلَى أَهْلِهِ، أَوْ مَتْرُوكٍ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ مَعْشُورٌ لَا خَرَاجَ عَلَيْهِ.

فَأَمَّا صَدَقَاتُ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام فَهِيَ مَحْصُورَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ عَنْهَا فَتَعَيَّنَتْ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ:

إِحْدَاهَا: وَهِيَ أَوَّلُ أَرْضٍ مَلَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصِيَّةُ مُخَيْرِيقٍ الْيَهُودِيِّ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ، حَكَى الْوَاقِدِيُّ أَنَّ مُخَيْرِيقًا الْيَهُودِيَّ كَانَ حَبْرًا مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي

النَّضِيرِ، آمَنَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، وَكَانَتْ لَهُ سَبْعَةُ حَوَائِطَ وَهِيَ: الْمَبِيتُ وَالصَّافِيَةُ وَالدَّلَّالُ وَجَسَّنِي وَبُرْقَةَ وَالْأَعْرَافُ وَالْمُسَرَّبَةُ، فَوَصَّى بِهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَسْلَمَ، وَقَاتَلَ مَعَهُ بِأُحُدٍ حَتَّى قُتِلَ رحمه الله.

দ্বিতীয় বিধান: তাদের মৃতদেহ সেখানে সমাহিত করা যাবে না এবং যদি দাফন করা হয়ে থাকে, তবে তা অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করতে হবে; কারণ তাদের দাফন করা একটি দীর্ঘস্থায়ী বিষয়, যা স্থায়ী বসবাসের অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি তাদের বের করার দূরত্ব অনেক বেশি হয় এবং বের করলে লাশের অবস্থা পরিবর্তন (বিকৃতি) হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে প্রয়োজনে সেখানে দাফন করা বৈধ।

তৃতীয় বিধান: হিজাজে অবস্থিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নগরের (মদীনার) একটি সংরক্ষিত পবিত্র এলাকা (হারাম) রয়েছে; এর দুই কঙ্করময় প্রান্তরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে শিকার তাড়ানো এবং বৃক্ষ কর্তন নিষিদ্ধ, যেমনটি মক্কার হারামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইমাম আবু হানিফা রহ. একে বৈধ গণ্য করেছেন এবং মদীনাকে অন্য সাধারণ শহরের মতো মনে করেছেন। তবে আমরা ইতিপূর্বে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছি, তা মদীনার হারামের নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ দেয়। যদি কেউ সেখানে শিকার হত্যা করে বা গাছ কাটে, তবে বলা হয়েছে যে, তার শাস্তি হলো পরিধেয় বস্ত্র কেড়ে নেওয়া; আবার কেউ বলেছেন, তাকে তা'যীর বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।

চতুর্থ বিধান: হিজাজের ভূমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিজয়ের বিশেষত্বের কারণে দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথমটি হলো: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদকা বা দানকৃত সম্পদ যা তিনি তাঁর দুটি হকের মাধ্যমে গ্রহণ করেছিলেন; তাঁর দুটি হকের একটি হলো 'ফায়' (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং 'গনীমত' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে খুমুসের খুমুস (এক-পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশ)।

দ্বিতীয় হকটি হলো: সেই 'ফায়'-এর চার-পঞ্চমাংশ যা আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে দান করেছিলেন, যা অর্জনে মুসলিমদের ঘোড়া কিংবা উট চালনা (যুদ্ধ) করতে হয়নি। এই দুটি হকের মাধ্যমে যা তাঁর হস্তগত হয়েছিল, তিনি তার কিছু অংশ কোনো কোনো সাহাবীকে প্রদান করতেন এবং বাকি অংশ নিজের ভরণপোষণ, আত্মীয়দের দান এবং মুসলিমদের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার জন্য রেখে দিতেন, যে পর্যন্ত না তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন। তাঁর ওফাতের পর এর বিধান সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। একদল একে তাঁর উত্তরাধিকার সম্পদ হিসেবে গণ্য করেন যা মিরাস হিসেবে বণ্টিত হবে, আর অন্যদল একে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইমাম বা শাসকের জন্য নির্ধারিত করেন, যা ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং শত্রু দমনে ব্যবহৃত হবে।

জমহুর বা অধিকাংশ ফকীহদের অভিমত হলো, এগুলো এমন সদকা বা দান যার মূল মালিকানা হস্তান্তর নিষিদ্ধ এবং এর উপকারিতা বা আয় জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট। তাঁর সদকা ব্যতীত অন্য সব ভূমি ‘উশরী ভূমি’ (দশমাংশ করযোগ্য), সেগুলোর ওপর কোনো ‘খারাজ’ বা ভূমি রাজস্ব নেই। কারণ সেই ভূমিগুলো হয় যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, অথবা এর অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করায় তাদের মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; আর উভয় ক্ষেত্রেই তাতে উশর প্রযোজ্য হয়, খারাজ নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদকাগুলো নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ; কারণ তিনি সেগুলো গ্রহণ করেছিলেন বিধায় তা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল এবং সেগুলো সংখ্যায় আটটি:

প্রথমটি: এটিই প্রথম ভূমি যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালিকানাধীন হয়েছিল; তা হলো বনু নযীর গোত্রের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত ইহুদী মুখায়রীক-এর অসিয়ত বা দানকৃত সম্পদ। আল-ওয়াক্বিদী বর্ণনা করেছেন যে, ইহুদী মুখায়রীক ছিলেন বনু নযীর গোত্রের আলিমদের মধ্যে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি; তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেন। তাঁর সাতটি বাগান ছিল, সেগুলো হলো: আল-মাবীত, আস-সাফিয়াহ, আদ-দাল্লাল, জাস্সানী, বুরক্বাহ, আল-আ’রাফ এবং আল-মুসাররাবাহ। ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকূলে অসিয়ত করে যান এবং উহুদের যুদ্ধে তাঁর সাথে লড়াই করে শহীদ হন, আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন।

(ص: 255)الأحكام السلطانية للماوردي

وَالصَّدَقَةُ الثَّانِيَةُ: أَرْضُهُ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ بِالْمَدِينَةِ، وَهِيَ أَوَّلُ أَرْضٍ أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، فَأَجْلَاهُمْ عَنْهَا وَكَفَّ عَنْ دِمَائِهِمْ، وَجَعَلَ لَهُمْ مَا حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنْ

أَمْوَالِهِمْ إِلَّا الْحَلَقَةَ، وَهِيَ السِّلَاحُ، فَخَرَجُوا بِمَا اسْتَقَلَّتْ إِبِلُهُمْ إِلَى خَيْبَرَ وَالشَّامِ، وَخَلَصَتْ أَرْضُهُمْ كُلُّهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا مَا كَانَ لِيَمِينِ بْنِ عُمَيْرٍ وَأَبِي سَعْدِ بْنِ وَهْبٍ، فَإِنَّهُمَا أَسْلَمَا قَبْلَ الظَّفَرِ، فَأَحْرَزَ لَهُمَا إِسْلَامُهُمَا جَمِيعَ أَمْوَالِهِمَا، ثُمَّ قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا سِوَى الْأَرْضَيْنِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ دُونَ الْأَنْصَارِ، إِلَّا سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، وَأَبَا دُجَانَةَ -سِمَاكَ بْنَ خَرَشَةَ- فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا فَقْرًا فَأَعْطَاهُمَا، وَحَبَسَ الْأَرْضَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ، فَكَانَتْ مِنْ صَدَقَاتِهِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وَيُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ سَلَّمَهَا عُمَرُ إِلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا؛ لِيَقُومَا بِمَصْرِفِهَا.

وَالصَّدَقَةُ الثَّالِثَةُ والرابعَةُ وَالْخَامِسَةُ: ثَلَاثَةُ حُصُونٍ مِنْ خَيْبَرَ، وَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ حُصُونٍ: نَاعِمَ وَالْقُمُوصَ وَشَقَّ وَالنَّطَاةَ وَالْكَتِيبَةَ وَالْوَطِيحَ وَالسَّلَالِمَ وَحِصْنَ الصَّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ، وَكَانَ أَوَّلَ حِصْنٍ فَتَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا نَاعِمٌ، وَعَنْهُ قُتِلَ مَحْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَالثَّانِي الْقُمُوصُ، وَهُوَ حِصْنُ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ، وَمِنْ سَبْيِهِ اصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَكَانَتْ عِنْدَ كِنَانَةَ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي الْحَقِيقِ، فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ثُمَّ حِصْنَ الصَّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ، وَكَانَ أَعْظَمَ حُصُونِ خَيْبَرَ وَأَكْثَرَهَا مَالًا وَطَعَامًا وَحَيَوَانًا، ثُمَّ شَقَّ وَالنَّطَاةَ وَالْكَتِيبَةَ، فَهَذِهِ الْحُصُونُ السِّتَّةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً، ثُمَّ افْتَتَحَ الْوَطِيحَ وَالسَّلَالِمَ، وَهِيَ آخِرُ فُتُوحِ خَيْبَرَ صُلْحًا بَعْدَ أَنْ حَاصَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَ لَيْلَةً، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسِيرَ بِهِمْ وَيَحْقِنَ لَهُمْ دِمَاءَهُمْ فَفَعَلَ ذَلِكَ، وَمَلَكَ مِنْ هَذِهِ الْحُصُونِ الثَّمَانِيَةِ ثَلَاثَةَ حُصُونٍ: الْكَتِيبَةَ وَالْوَطِيحَ وَالسَّلَالِمَ.

أَمَّا الْكَتِيبَةُ فَأَخَذَهَا بِخُمُسِ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا الْوَطِيحُ وَالسَّلَالِمُ فَهُمَا مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فَتَحَهَا صُلْحًا، فَصَارَتْ هَذِهِ الْحُصُونُ الثَّلَاثَةُ بِالْفَيْءِ وَالْخُمُسِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَصَدَّقَ بِهَا وَكَانَتْ مِنْ صَدَقَاتِهِ، وَقَسَّمَ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَفِي جُمْلَتِهَا وَادِي خَيْبَرَ وَوَادِي السَّرِيرِ وَوَادِي حَاضِرٍ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ

سَهْمًا، وَكَانَتْ عِدَّةُ مَنْ قُسِمَتْ عَلَيْهِ أَلْفًا وَأَرْبَعمِائَةٍ، وَهُمْ أَهْلُ الْحُدَيْبِيَةِ مَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ خَيْبَرَ وَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَلَمْ يَغِبْ عَنْهَا إِلَّا جَابِرُ

দ্বিতীয় সদকা হলো: মদিনার বনু নাযির গোত্রের সম্পদ থেকে প্রাপ্ত তাঁর ভূমি। এটিই ছিল প্রথম ভূমি যা আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে 'ফাই' হিসেবে প্রদান করেছিলেন। তিনি তাদেরকে সেখান থেকে নির্বাসিত করেছিলেন এবং তাদের রক্তপাত থেকে বিরত ছিলেন। তিনি তাদের জন্য তাদের উট যতটুকু সম্পদ বহন করতে সক্ষম ততটুকু নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, তবে 'হালাকা' অর্থাৎ যুদ্ধাস্ত্র ব্যতিরেকে। ফলে তারা তাদের উট যতটুকু বহন করতে পারে তা নিয়ে খয়বর ও সিরিয়ার দিকে চলে যায়। এবং ইয়ামীন বিন উমাইর ও আবু সা'দ বিন ওয়াহবের মালিকানাধীন ভূমি ব্যতিরেকে তাদের সমস্ত ভূমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একচ্ছত্র অধিকারে চলে আসে। কারণ তারা উভয়ে বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, ফলে তাদের ইসলাম গ্রহণ তাদের সমস্ত সম্পদকে সুরক্ষিত করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুই ব্যক্তির ভূমি ব্যতিরেকে তাদের অন্যান্য সম্পদ আনসারদের বাদ দিয়ে কেবল প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তবে সাহল বিন হুনাইফ ও আবু দুজানা (সিমাক বিন খারাশাহ)-কে এর ব্যতিক্রম হিসেবে প্রদান করেছিলেন; কারণ তাঁরা উভয়ে তাঁদের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তাই তিনি তাঁদেরকে দান করেন। আর তিনি উল্লিখিত ভূমি দুটি নিজের জন্য রেখে দেন, যা তাঁর সদকা হিসেবে গণ্য হতো; তিনি যেখানে ইচ্ছা তা ব্যয় করতেন এবং তা থেকে তাঁর স্ত্রীদের জন্য খরচ করতেন। পরবর্তীতে উমর (রা.) সেটি আব্বাস ও আলী (রা.)-এর নিকট হস্তান্তর করেন, যাতে তাঁরা উভয়ে এর ব্যয়ের খাতসমূহ পরিচালনা করতে পারেন।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সদকা হলো: খয়বরের তিনটি দুর্গ। সেখানে মোট আটটি দুর্গ ছিল: নায়েম, আল-কামুস, শাক্ক, আন-নাতাহ, আল-কাতিবাহ, আল-ওয়াতবাহ, আস-সালালিম এবং সা'ব বিন মুয়াজের দুর্গ। এগুলোর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম যে দুর্গটি জয় করেছিলেন তা হলো নায়েম; সেখানেই মুহাম্মাদ বিন মাসলামার ভাই মাহমুদ বিন মাসলামা শহীদ হন। দ্বিতীয়টি ছিল আল-কামুস, যা ইবনে আবিল হুকাইকের দুর্গ ছিল। এর যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা সাফিয়্যাহকে নিজের জন্য মনোনীত করেন। তিনি কিনানা বিন রাবী বিন আবিল হুকাইকের স্ত্রী ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মুক্ত করে

বিবাহ করেন এবং তাঁর মুক্তিকেই তাঁর মোহর হিসেবে নির্ধারণ করেন। এরপর সা'ব বিন মুয়াজের দুর্গ বিজিত হয়, যা ছিল খয়বরের সবচেয়ে বড় দুর্গ এবং সম্পদ, খাদ্য ও গবাদিপশুতে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এরপর পর্যায়ক্রমে শাক্ক, আন-নাতাহ এবং আল-কাতিবাহ বিজিত হয়। এই ছয়টি দুর্গ যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল। এরপর তিনি আল-ওয়াতবাহ ও আস-সালালিম জয় করেন। এগুলো খয়বরের সর্বশেষ বিজিত অংশ যা দশ দিনের বেশি অবরোধের পর সন্ধির মাধ্যমে অর্জিত হয়। তারা তাঁর কাছে আবেদন করেছিল যেন তিনি তাদের জীবন রক্ষা করেন এবং তাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দেন, তিনি তা কবুল করেছিলেন। এই আটটি দুর্গের মধ্যে তিনটি দুর্গ তাঁর মালিকানাধীন হয়: আল-কাতিবাহ, আল-ওয়াতবাহ এবং আস-সালালিম।

আল-কাতিবাহ দুর্গের কথা বলতে গেলে, তিনি তা গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর আল-ওয়াতবাহ ও আস-সালালিম ছিল সেই সবের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তাঁকে 'ফাই' হিসেবে দিয়েছিলেন; কারণ তিনি সেগুলো সন্ধির মাধ্যমে জয় করেছিলেন। ফলে এই তিনটি দুর্গ 'ফাই' এবং 'খুমুস' হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একচ্ছত্র সম্পদে পরিণত হয়। তিনি এগুলো সদকা করে দেন এবং এগুলো তাঁর সদকা হিসেবে পরিগণিত হতো। অবশিষ্ট পাঁচটি দুর্গ তিনি যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল খয়বর উপত্যকা, সারীর উপত্যকা এবং হাযির উপত্যকা। এগুলো আঠারোটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যাদের মধ্যে এগুলো বণ্টন করা হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ জন; তাঁরা ছিলেন হুদাইবিয়াহর সন্ধিতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা খয়বরে উপস্থিত ছিলেন এবং যাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র জাবির ব্যতীত আর কেউ অনুপস্থিত ছিলেন না।

(ص: 256)الأحكام السلطانية للماوردي

ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَسَمَ لَهُ كَسَهْمِ مَنْ حَضَرَهَا، وَكَانَ فِيهِمْ مِائَتَا فَارِسٍ أَعْطَاهُمْ سِتَّمِائَةِ سَهْمٍ، وَأَلْفٌ وَمِائَتَا سَهْمٍ لِأَلْفٍ وَمِائَتَيْ رَجُلٍ، فَكَانَتْ سِهَامُ جَمِيعِهِمْ أَلْفًا وَثَمَانِمِائَةِ سَهْمٍ، أَعْطَى لِكُلِّ مِائَةٍ سَهْمًا، فَلِذَلِكَ صَارَتْ خَيْبَرُ مَقْسُومَةً عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا.

وَالصَّدَقَةُ السَّادِسَةُ: النِّصْفُ مِنْ فَدَكَ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ خَيْبَرَ جَاءَهُ أَهْلُ فَدَكَ فَصَالَحُوهُ بِسِفَارَةِ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَ أَرْضِهِمْ وَنَخْلِهِمْ يُعَامِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَلَهُمُ النِّصْفُ الْآخَرُ، فَصَارَ النِّصْفُ مِنْهَا مِنْ صَدَقَاتِهِ، مُعَامَلَةً مَعَ أَهْلِهَا بِالنِّصْفِ مِنْ ثَمَرَتِهَا، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ خَالِصًا لَهُمْ، إِلَى أَنْ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِيمَنْ أَجْلَاهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَنِ الْحِجَازِ، فَقَوَّمَ فَدَكَ وَدَفَعَ إِلَيْهِمْ نِصْفَ الْقِيمَةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سِتِّينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَكَانَ الَّذِي قَوَّمَهَا مَالِكُ ابْنُ التَّيِّهَانِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَصَارَ نِصْفُهَا مِنْ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنِصْفُهَا الْآخَرُ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَصْرِفُ النِّصْفَيْنِ الْآنَ سَوَاءٌ.

وَالصَّدَقَةُ السَّابِعَةُ: الثُّلُثُ مِنْ أَرْضِ وَادِي الْقُرَى؛ لِأَنَّ ثُلُثَهَا كَانَ لِبَنِي عُذْرَةَ وَثُلُثَيْهَا لِلْيَهُودِ، فَصَالَحَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام عَلَى نِصْفِهِ، فَصَارَتْ أَثْلَاثًا؛ ثُلُثُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ مِنْ صَدَقَاتِهِ، وَثُلُثُهَا لِلْيَهُودِ، وَثُلُثُهَا لِبَنِي عُذْرَةَ إِلَى أَنْ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه عَنْهَا، وَقَوَّمَ فِيهَا فَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ تِسْعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِمْ، وَقَالَ لِبَنِي عُذْرَةَ: إِنْ شِئْتُمْ أَدَّيْتُمْ نِصْفَ مَا أَعْطَيْتُ وَنُعْطِيكُمُ النِّصْفَ، فَأَعْطَوْهُ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ، فَصَارَ نِصْفُ الْوَادِي لِبَنِي عُذْرَةَ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ الثُّلُثُ مِنْهُ فِي صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالسُّدُسُ مِنْهُ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَصْرِفُ جَمِيعِ النِّصْفِ سَوَاءٌ.

وَالصَّدَقَةُ الثَّامِنَةُ: مَوْضِعُ سُوقٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: مَهْرُوذٌ، اسْتَقْطَعَهَا مَرْوَانُ مِنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه، فَنَقَمَ النَّاسُ بِهَا عَلَيْهِ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ إِقْطَاعَ تَضْمِينٍ لَا تَمْلِيكٍ؛ لِيَكُونَ لَهُ فِي الْجَوَازِ وَجْهٌ، فَهَذِهِ ثَمَانِ صَدَقَاتٍ حَكَاهَا أَهْلُ السِّيَرِ وَنَقَلَهَا وُجُوهُ رُوَاةِ الْمَغَازِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا.

فَأَمَّا مَا سِوَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَمْوَالِهِ، فَقَدْ حَكَى الْوَاقِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ أُمَّ أَيْمَنَ الْحَبَشِيَّةَ وَاسْمُهَا بَرَكَةُ، وَخَمْسَةَ

أَجْمَالٍ وَقِطْعَةً مِنْ غَنَمٍ، وَقِيلَ: وَمَوْلَاهُ شُقْرَانَ وَابْنَهُ صَالِحًا وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَوَرِثَ مِنْ أُمِّهِ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الزُّهْرِيَّةَ دَارَهَا

ইবনে আবদুল্লাহ তাদের জন্য উপস্থিত ব্যক্তিদের অংশের ন্যায় অংশ বণ্টন করেছিলেন। তাদের মধ্যে দুইশত অশ্বারোহী ছিল যাদের তিনি ছয়শত অংশ প্রদান করেছিলেন এবং এক হাজার দুইশত পদাতিকের জন্য ছিল এক হাজার দুইশত অংশ। ফলে তাঁদের সকলের মোট অংশ ছিল এক হাজার আটশত। তিনি প্রতি একশত অংশের জন্য একটি একক ভাগ নির্ধারণ করেছিলেন, যার ফলে খায়বার আঠারোটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল।

ষষ্ঠ সদকা: ফাদাকের অর্ধেক অংশ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বার জয় করলেন, তখন ফাদাকবাসীরা তাঁর নিকট এসে মুহায়্যিসাহ বিন মাসউদের মধ্যস্থতায় এই মর্মে সন্ধি করল যে, তাদের ভূমি ও খেজুর বাগানের অর্ধেক তাঁর হবে এবং তিনি তা বর্গা হিসেবে তাদের পরিচালনা করতে দেবেন, আর বাকি অর্ধেক তাদের থাকবে। ফলে এর অর্ধেক তাঁর সদকার (ওয়াকফ) অন্তর্ভুক্ত হলো, যা অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে অধিবাসীদের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হতো এবং বাকি অর্ধেক ছিল তাদের নিজস্ব। পরিশেষে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজাজ থেকে জিম্মিদের বহিষ্কার করার সময় তাদেরও বহিষ্কার করেন। তখন তিনি ফাদাকের মূল্য নির্ধারণ করেন এবং তাদের অর্ধেকের মূল্য পরিশোধ করেন, যার পরিমাণ ছিল ষাট হাজার দিরহাম। যারা এর মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন তারা হলেন মালিক ইবনুত তাইয়িহান, সাহল বিন আবি হাসমাহ এবং জায়েদ বিন সাবিত। ফলে এর অর্ধেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সদকার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাকি অর্ধেক সাধারণ মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত হয়। বর্তমানে এই উভয় অংশের ব্যয়ের খাত অভিন্ন।

সপ্তম সদকা: ওয়াদি আল-কুরার এক-তৃতীয়াংশ ভূমি; কেননা এর এক-তৃতীয়াংশ ছিল বনু উজরার এবং দুই-তৃতীয়াংশ ছিল ইহুদিদের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে অর্ধেকের ভিত্তিতে সন্ধি করেছিলেন, ফলে তা তিন ভাগে বিভক্ত হয়: এক-তৃতীয়াংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য যা তাঁর সদকার অন্তর্ভুক্ত, এক-তৃতীয়াংশ ইহুদিদের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ বনু উজরার জন্য। পরবর্তীতে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সেখান থেকে বহিষ্কার করেন এবং এর মূল্য নির্ধারণ করেন যা নব্বই হাজার দিনার হয়েছিল এবং তিনি তা তাদের প্রদান করেন। তিনি বনু উজরাকে বললেন: তোমরা চাইলে আমি যা দিয়েছি তার অর্ধেক পরিশোধ করে অর্ধেক অংশ গ্রহণ করতে পারো। তারা তাঁকে

পঁয়তাল্লিশ হাজার দিনার প্রদান করল। ফলে উপত্যকার অর্ধেক বনু উজরার মালিকানায় চলে যায় এবং বাকি অর্ধেকের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সদকার অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং এক-ষষ্ঠাংশ সাধারণ মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত হয়। এই সম্পূর্ণ অর্ধেক অংশের ব্যয়ের খাত এখন অভিন্ন।

অষ্টম সদকা: মদিনার একটি বাজারের স্থান যাকে 'মাহরুজ' বলা হয়। মারওয়ান এটি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে বরাদ্দ নিয়েছিলেন, যা নিয়ে মানুষ তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সম্ভবত এটি মালিকানা হিসেবে নয় বরং ব্যবস্থাপনা বা ইজারা হিসেবে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, যাতে এর বৈধতার একটি দিক থাকে। এই হলো সেই আটটি সদকা যা সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন এবং মাগাজি (যুদ্ধাভিযান) বর্ণনাকারী নেতৃস্থানীয় রাবীগণ উদ্ধৃত করেছেন। আমরা যা উল্লেখ করেছি তার সঠিকতা সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।

এই আটটি সদকা ব্যতীত তাঁর অন্যান্য সম্পদের বিষয়ে আল-ওয়াকিদি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতা আবদুল্লাহর নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে হাবশি উম্মে আয়মানকে লাভ করেছিলেন—যার নাম ছিল বারাকাহ—এবং পাঁচটি উট ও একপাল ভেড়া পেয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি তাঁর মুক্ত দাস শুকরান এবং তাঁর পুত্র সালিহকেও লাভ করেছিলেন যিনি বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া তিনি তাঁর মাতা আমিনা বিনতে ওয়াহাব জুহরিয়ার নিকট থেকে তাঁর বসতঘরটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন।

(ص: 257)الأحكام السلطانية للماوردي

الَّتِي وُلِدَ فِيهَا فِي شِعْبِ بَنِي عَلِيّ، وَوَرِثَ مِنْ زَوْجَتِهِ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضي الله عنها دَارَهَا بِمَكَّةَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ خَلْفَ سُوقِ الْعَطَّارِينَ وَأَمْوَالًا، وَكَانَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ اشْتَرَى لِخَدِيجَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مِنْ سُوقِ عُكَاظٍ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاسْتَوْهَبَهُ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْتَقَهُ وَزَوَّجَهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَوَلَدَتْ أُمُّ أَيْمَنَ أُسَامَةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ، فَأَمَّا الدَّارَانِ فَإِنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَاعَهُمَا بَعْدَ هِجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قِيلَ لَهُ: فِي أَيِّ دَارَيْكَ تَنْزِلُ؟ فَقَالَ: هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رَبْعٍ، فَلَمْ يَرْجِعْ فِيمَا بَاعَهُ عَقِيلٌ؛ لِأَنَّهُ تَغَلَّبَ عَلَيْهِ وَمَكَّةُ دَارُ حَرْبٍ يَوْمَئِذٍ، فَأَجْرَى عَلَيْهِ حُكْمَ الْمُسْتَهْلَكِ، فَخَرَجَتْ هَاتَانِ الدَّارَانِ مِنْ صَدَقَاتِهِ.

وَأَمَّا دُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام فَقَدْ كَانَ أَعْطَى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ الدَّارَ الَّتِي يَسْكُنُهَا، وَوَصَّى بِذَلِكَ لَهُنَّ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَطِيَّةَ تَمْلِيكٍ فَهِيَ خَارِجَةٌ مِنْ صَدَقَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ عَطِيَّةَ سُكْنَى وَإِرْفَاقٍ فَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ صَدَقَاتِهِ، وَقَدْ دَخَلَتْ الْيَوْمَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا أَحْسَبُ مِنْهَا مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهُ.

وَأَمَّا رَحْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَآلَتُهُ، فَقَدْ رَوَى هِشَامٌ الْكَلْبِيُّ عَنْ عَوَانَةَ بْنِ الْحَكَمِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه دَفَعَ إلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه آلَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَابَّتَهُ وَحِذَاءَهُ، وَقَالَ: مَا سِوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ، وَرَوَى الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَإِنْ كَانَتْ دِرْعُهُ الْمَعْرُوفَةُ بِالْبَتْرَاءِ، فَقَدْ حُكِيَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا- يَوْمَ قُتِلَ، فَأَخَذَهَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ، فَلَمَّا قَتَلَ الْمُخْتَارُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ، صَارَتْ الدِّرْعُ إلَى عَبَّادِ بْنِ الْحُصَيْنِ الْحَنْظَلِيِّ، ثُمَّ إنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ -وَكَانَ أَمِيرَ الْبَصْرَةِ- سَأَلَ عَبَّادًا عَنْهَا فَجَحَدَهُ إيَّاهَا، فَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ: مِثْلُ عَبَّادٍ لَا يُضْرَبُ، إنَّمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَلَ أَوْ يُعْفَى عَنْهُ؛ ثُمَّ لَا يُعْرَفُ لِلدِّرْعِ خَبَرٌ بَعْدَ ذَلِكَ.

أَمَّا الْبُرْدَةُ: فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا، فَحَكَى أَبَانُ بْنُ ثَعْلَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ وَهَبَهَا لِكَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ، وَاشْتَرَاهَا مِنْهُ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه، وَهِيَ الَّتِي يَلْبَسُهَا الْخُلَفَاءُ، وَحَكَى ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ هَذِهِ الْبُرْدَةَ أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ آيِلَةَ أَمَانًا لَهُمْ، فَأَخَذَهَا مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَكَانَ عَامِلًا عَلَيْهِمْ مِنْ قِبَلِ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَبَعَثَ بِهَا إلَيْهِ، وَكَانَتْ فِي خَزَائِنِهِ حَتَّى أُخِذَتْ بَعْدَ قَتْلِهِ، وَقِيلَ: اشْتَرَاهَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّفَّاحُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ.

বনু আলীর উপত্যকায় অবস্থিত যে গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটি, এবং মক্কায় সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সুকুল আত্তারিনের (আতর বাজার) পেছনে অবস্থিত তাঁর স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.)-এর ঘর ও কিছু সম্পদ তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। হাকিম ইবনে হিজাম উকাজের বাজার থেকে চারশ দিরহাম দিয়ে খাদিজা (রা.)-এর জন্য যায়িদ ইবনে হারিসাহকে ক্রয় করেছিলেন; এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কাছে এটি উপহার হিসেবে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁকে মুক্ত করে উম্মে আয়মানের সাথে বিবাহ দেন। নবুওয়াতের পরে উম্মে আয়মানের গর্ভে উসামার জন্ম হয়। আর ঘর দুটির বিষয়ে কথা হলো—রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরতের পর আকীল ইবনে আবি তালিব তা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। যখন তিনি বিদায় হজে মক্কায় আসলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: "আপনি আপনার কোন ঘরে অবস্থান করবেন?" তিনি বললেন: "আকীল কি আমাদের জন্য কোনো ঘর অবশিষ্ট রেখেছে?" সুতরাং আকীল যা বিক্রি করেছিলেন তিনি তা আর ফেরত নেননি; কারণ আকীল সেগুলোর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন এবং মক্কা তখন দারুল হারব (যুদ্ধক্ষেত্র) ছিল। ফলে সেগুলোর ক্ষেত্রে বিলুপ্ত সম্পদের বিধান প্রয়োগ করা হয় এবং এই ঘর দুটি তাঁর সাদাকাহর (ওয়াকফ) আওতা বহির্ভূত হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র পত্নীগণের ঘরগুলোর ব্যাপারে কথা হলো—তিনি তাঁদের প্রত্যেককে যার যার বসবাসের ঘরটি প্রদান করেছিলেন এবং তাঁদের জন্য সে মর্মে ওসিয়ত করেছিলেন। যদি এটি তাঁর পক্ষ থেকে মালিকানা প্রদানের দান হয়ে থাকে, তবে তা তাঁর সাদাকাহর বহির্ভূত হবে। আর যদি তা কেবল বসবাস ও ব্যবহারের সুযোগ হিসেবে দান করা হয়ে থাকে, তবে তা তাঁর সাধারণ সাদাকাহর অন্তর্ভুক্ত হবে। বর্তমানে সেই ঘরগুলো মসজিদের (মসজিদে নববী) অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং আমি মনে করি না যে এগুলোর কোনো অংশ এখন মসজিদের বাইরে আছে।

আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আসবাবপত্র ও সরঞ্জামের বিষয়ে হিশাম আল-কালবী আওয়ানা ইবনে হাকাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আলী (রা.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সরঞ্জাম, তাঁর বাহন এবং তাঁর জুতো জোড়া হস্তান্তর করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "এগুলো ছাড়া বাকি সব কিছু সাদাকাহ।" আসওয়াদ আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর বর্মটি ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে জনৈক ইহুদির কাছে বন্ধক রাখা ছিল।" সেই বর্মটি যদি 'আল-বাতরা' নামে পরিচিত বর্মটি হয়ে থাকে, তবে বর্ণিত আছে যে, শাহাদাতের দিন হুসাইন ইবনে আলী (রা.)

সেটি পরিহিত ছিলেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তা কেড়ে নিয়েছিল। মুখতার যখন উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে হত্যা করে, তখন বর্মটি আব্বাদ ইবনে হুসাইন আল-হানজালি-র হস্তগত হয়। এরপর বসরার আমির খালিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উসাইদ আব্বাদের কাছে সেটির ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি তা অস্বীকার করেন। ফলে খালিদ তাকে একশ দোররা মারেন। তখন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান তাকে লিখে পাঠান: "আব্বাদের মতো ব্যক্তিকে দোররা মারা ঠিক নয়, বরং তাকে হয় হত্যা করা উচিত ছিল নতুবা ক্ষমা করে দেওয়া উচিত ছিল।" এরপর থেকে বর্মটির আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
চাদর বা বুরদাহর ব্যাপারে মানুষের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আবান ইবনে সালাব উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এটি কাব ইবনে জুহাইরকে উপহার দিয়েছিলেন এবং মুয়াবিয়া (রা.) এটি তাঁর কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছিলেন। এটি সেই চাদর যা খলিফাগণ পরিধান করতেন। অন্যদিকে জ.ামরা ইবনে রবিআ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এই চাদরটি আয়লাবাসীদের নিরাপত্তার নিদর্শন হিসেবে দিয়েছিলেন। এরপর মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত গভর্নর সাঈদ ইবনে খালিদ ইবনে আবি আওফা সেটি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। এটি তাঁর কোষাগারে সংরক্ষিত ছিল এবং তাঁর হত্যার পর তা হস্তগত করা হয়। আবার বলা হয়ে থাকে যে, আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ তিনশ দিনারের বিনিময়ে তা ক্রয় করেছিলেন।

(ص: 258)الأحكام السلطانية للماوردي

وَأَمَّا الْقَضِيبُ: فَهُوَ مِنْ تَرِكَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي هِيَ صَدَقَةٌ، وَقَدْ صَارَ مَعَ الْبُرْدَةِ مِنْ شِعَارِ الْخِلَافَةِ.
أَمَّا الْخَاتَمُ فَلَبِسَهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رضي الله عنهم، حَتَّى سَقَطَ مِنْ يَدِهِ فِي بِئْرٍ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَهَذَا شَرْحُ مَا قُبِضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ صَدَقَتِهِ وَتَرِكَتِهِ.

فَصْلٌ:

وَأَمَّا مَا عَدَا الْحَرَمَ وَالْحِجَازَ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ فَقَدْ ذَكَرْنَا انْقِسَامَهَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:

قِسْمٌ: أَسْلَمَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَيَكُونُ أَرْضَ عُشْرٍ.

وَقِسْمٌ: أَحْيَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَيَكُونُ بِمَا أَحْيَوْهُ مَعْشُورًا.

وَقِسْمٌ: أَحْرَزَهُ الْغَانِمُونَ عَنْوَةً فَيَكُونُ مُعَشَّرًا.

وَقِسْمٌ: صُولِحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ فَيْئًا يُوضَعُ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ.

وَهَذَا الْقِسْمُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا صُولِحُوا عَلَى زَوَالِ مُلْكِهِمْ عَنْهُ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَيَكُونُ الْخَرَاجُ أُجْرَةً لَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامِ أَهْلِهِ، فَتُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ.

وَالثَّانِي: مَا صُولِحُوا عَلَى بَقَاءِ مُلْكِهِمْ عَلَيْهِ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، وَيَكُونُ الْخَرَاجُ جِزْيَةً تَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَإِذْ قَدْ انْقَسَمَتْ الْبِلَادُ عَلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ، فَسَنَشْرَحُ حُكْمَ أَرْضِ السَّوَادِ، فَإِنَّهَا أَصْلُ حُكْمِ الْفُقَهَاءِ فِيهَا بِمَا يُعْتَبَرُ بِهِ نَظَائِرُهَا، وَهَذَا السَّوَادُ يُشَار بِهِ إِلَى سَوَادِ كِسْرَى الَّذِي فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ سُمِّيَ سَوَادًا؛ لِسَوَادِهِ بِالزَّرْعِ وَالْأَشْجَارِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ تَاخَمَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ الَّتِي لَا زَرْعَ فِيهَا وَلَا شَجَرَ كَانُوا إِذَا خَرَجُوا مِنْ أَرْضِهِمْ إِلَيْهِ ظَهَرَتْ خُضْرَةُ الزَّرْعِ وَالْأَشْجَارِ.

وَهُمْ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْخُضْرَةِ وَالسَّوَادِ فِي الْأَسَامِي، كَمَا قَالَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ وَكَانَ أَسْوَدَ اللَّوْنِ "مِنَ الرَّمَلِ":

وَأَنَا الْأَخْضَرُ مَنْ يَعْرِفُنِي ... أَخْضَرُ الْجِلْدَةِ مِنْ نَسْلِ الْعَرَبِ

আর দণ্ডটির (কাদীব) বিষয়টি হলো: এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল যা সদকা হিসেবে গণ্য, এবং তা চাদরের (বুরদাহ) সাথে খিলাফতের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

আর আংটিটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে আবু বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম পরিধান করেছিলেন, শেষপর্যন্ত তা তাঁর হাত থেকে একটি কূপে পড়ে যায় এবং তিনি তা আর খুঁজে পাননি। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সদকা ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে যা কিছু রেখে ইন্তেকাল করেছিলেন তার বিবরণ।

পরিচ্ছেদ:

হারামাইন ও হিজাজ ব্যতীত অন্যান্য দেশসমূহের ভূমি সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তা চার ভাগে বিভক্ত:

এক প্রকার: যার অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, ফলে তা উশরি (দশমাংশ করযোগ্য) ভূমি হবে।

দ্বিতীয় প্রকার: যা মুসলমানরা আবাদ করেছে, ফলে তাদের আবাদ করার কারণে তা উশরি হবে।

তৃতীয় প্রকার: যা বিজয়ীরা বলপ্রয়োগে জয় করেছে, ফলে তাও উশরি হবে।

চতুর্থ প্রকার: যার অধিবাসীদের সাথে সন্ধি করা হয়েছে, ফলে তা 'ফায়' হিসেবে গণ্য হবে যার ওপর খারাজ ধার্য করা হয়।

আর এই প্রকারটি দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথমটি: যে ভূমির মালিকানা ত্যাগের শর্তে তাদের সাথে সন্ধি করা হয়েছে; এ ভূমি বিক্রি করা বৈধ নয় এবং এর খারাজ ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে যা অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের ফলে রহিত হবে না। সুতরাং তা মুসলমান ও জিম্মি—উভয়ের থেকেই আদায় করা হবে।

দ্বিতীয়টি: যে ভূমির মালিকানা তাদের অধীনে বহাল রাখার শর্তে সন্ধি করা হয়েছে; এ ভূমি বিক্রি করা বৈধ এবং এর খারাজ জিজিয়া হিসেবে গণ্য হবে যা তাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে রহিত হয়ে যাবে। এটি কেবল জিম্মিদের থেকে আদায় করা হবে এবং মুসলমানদের থেকে নেওয়া হবে না।

যেহেতু দেশসমূহ এই বিভাগগুলোতে বিভক্ত, তাই এখন আমরা 'সাওয়াদ' অঞ্চলের বিধান ব্যাখ্যা করব। কেননা ফকীহগণের নিকট এটিই হলো মূল ভিত্তি যার আলোকে এর সদৃশ অন্যান্য অঞ্চলের বিধান নির্ণয় করা হয়। এই 'সাওয়াদ' দ্বারা কিসরার (পারস্য সম্রাট) সেই উর্বর অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে যা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে মুসলমানরা ইরাক থেকে জয় করেছিলেন। একে 'সাওয়াদ' (কৃষ্ণাভ ভূমি) নামকরণ করা হয়েছে এর শস্য

ও বৃক্ষরাজির নিবিড় শ্যামলতার কারণে; কারণ আরব্য উপদ্বীপ—যেখানে কোনো শস্য বা বৃক্ষ ছিল না—সেখান থেকে যখন তারা বের হয়ে এই ভূমিতে আসতেন, তখন শস্য ও বৃক্ষের সবুজ শ্যামলতা কালো বর্ণের ন্যায় ফুটে উঠত।

আর আরবরা নামকরণের ক্ষেত্রে সবুজ ও কালোকে একীভূত করে থাকে। যেমনটি ফজল ইবনুল আব্বাস ইবনে উতবা ইবনে আবি লাহাব বলেছিলেন (যিনি গায়ের রঙে কৃষ্ণাভ ছিলেন) 'রমল' ছন্দে:

আমিই সেই শ্যামল ব্যক্তি, যে আমাকে চেনে ... আরবের বংশোদ্ভূত এক শ্যামল চর্মধারী পুরুষ।

(ص: 259)الأحكام السلطانية للماوردي

فَسَمُّوا خُضْرَةَ الْعِرَاقِ سَوَادًا، وَسُمِّيَ عِرَاقًا؛ لِاسْتِوَاءِ أَرْضِهِ حِينَ خَلَتْ مِنْ جِبَالٍ تَعْلُو وَأَوْدِيَةٍ تَنْخَفِضُ، وَالْعِرَاقُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ الِاسْتِوَاءُ، قَالَ الشَّاعِرُ "مِنَ السَّرِيعِ":

سُقْتُمْ إِلَى الْحَقِّ لَهُمْ وَسَاقُوا ... سِيَاقَ مَنْ لَيْسَ لَهُ عِرَاقُ

أَيْ: لَيْسَ لَهُ اسْتِوَاءٌ؛ وَحَدُّ السَّوَادِ طُولًا مِنْ حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ إِلَى عَبَّادَانِ، وَعَرْضُهُ مِنْ عُذَيْبِ الْقَادِسِيَّةِ إِلَى حُلْوَانَ، يَكُونُ طُولُهُ مِائَةً وَسِتِّينَ فَرْسَخًا، وَعَرْضُهُ ثَمَانِينَ فَرْسَخًا، فَأَمَّا الْعِرَاقُ فَهُوَ فِي الْعَرْضِ مُسْتَوْعِبٌ لِأَرْضِ السَّوَادِ عُرْفًا، وَيَقْصُرُ عَنْ طُولِهِ فِي الْعُرْفِ؛ لِأَنَّ أَوَّلَهُ مِنْ شَرْقِيِّ دِجْلَةَ الْعَلْثُ، وَفِي غَرْبِيِّهَا حَرْبِيٌّ، ثُمَّ يَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ أَعْمَالِ الْبَصْرَةِ مِنْ جَزِيرَةِ عَبَّادَانِ، فَيَكُونُ طُولُهُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا يَقْصُرُ عَنِ السَّوَادِ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ فَرْسَخًا، وَعَرْضُهُ مَعَ تَبَعِهِ فِي الْعُرْفِ ثَمَانُونَ فَرْسَخًا كَالسَّوَادِ.

قَالَ قُدَامَةُ بْنُ جَعْفَرٍ: يَكُونُ ذَاكَ مُكَسَّرًا عَشَرَةَ آلَافِ فَرْسَخٍ، وَطُولُ الْفَرْسَخِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ ذِرَاعٍ بِالذِّرَاعِ الْمُرْسَلَةِ، وَيَكُونُ بِذِرَاعِ الْمِسَاحَةِ، وَهِيَ الذِّرَاعُ الْهَاشِمِيَّةُ تِسْعَةَ آلَافِ ذِرَاعٍ، فَيَكُونُ ذَلِكَ إِذَا ضُرِبَ فِي مِثْلِهِ هُوَ تَكْسِيرُ فَرْسَخٍ فِي فَرْسَخِ اثْنَيْنِ

وَعِشْرِينَ أَلْفَ جَرِيبٍ وَخَمْسِمِائَةِ جَرِيبٍ، فَإِذَا ضُرِبَ ذَلِكَ فِي عَدَدِ الْفَرَاسِخِ، وَهِيَ عَشَرَةُ آلَافِ فَرْسَخٍ بَلَغَ مِائَتَيْ أَلْفِ أَلْفٍ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ، يَسْقُطُ مِنْهَا بِالتَّخْمِينِ مَوَاضِعُ التِّلَالِ، وَالْآكَامِ، وَالسِّبَاخِ، وَالْآجَامِ، وَمَدَاسُّ الطُّرُقِ وَالْمَحَاجِّ وَمَجَارِي الْأَنْهَارِ، وَعِرَاضِ الْمُدُنِ وَالْقُرَى، وَمَوَاضِعِ الْأَرْجَاءِ وَالْبَرِيدَاتِ، وَالْقَنَاطِرِ والشاذروانات، وَالْبَنَادِرِ، وَمَطَارِحِ الْقَصَبِ، وَأَتَاتِينِ الْآجُرِّ، وَغَيْرُ ذَلِكَ الثُّلُثُ، وَهُوَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ، يَصِيرُ الْبَاقِي مِنْ مِسَاحَةِ الْعِرَاقِ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَخَمْسِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ يُرَاحُ مِنْهَا النِّصْفُ، وَيَكُونُ النِّصْفُ مَزْرُوعًا مَعَ مَا فِي الْجَمِيعِ مِنَ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالْأَشْجَارِ، فَإِذَا أُضِيفَ إِلَى مَا ذَكَرَهُ قُدَامَةُ فِي مِسَاحَةِ الْعِرَاقِ مَا زَادَ عَلَيْهَا بَقِيَّةَ السَّوَادِ، وَهُوَ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ فَرْسَخًا، كَانَتِ الزِّيَادَةُ عَلَى تِلْكَ الْمِسَاحَةِ قَدْرَ رُبْعِهَا، فَيَصِيرُ ذَلِكَ مِسَاحَةَ جَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لِلزَّرْعِ وَالْغَرْسِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ، وَفِي الْمُتَعَذَّرِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ زَرْعَ جَمِيعِهِ، وَقَدْ يَتَعَطَّلُ مِنْهُ بِالْعَوَارِضِ وَالْحَوَادِثِ مَا لَا يَنْحَصِرُ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ بَلَغَتْ مِسَاحَةُ السَّوَادِ فِي أَيَّامِ كَسْرَى قُبَاذَ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَخَمْسِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ، فَكَانَ مَبْلَغُ ارْتِفَاعِهِ مِائَتَيْ أَلْفِ أَلْفٍ وَسَبْعَةٍ وَسَبْعِينَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ

তারা ইরাকের শ্যামলিমাকে ‘সাওয়াদ’ নামে অভিহিত করেছেন। আর একে ‘ইরাক’ বলা হয় এর ভূমির সমতলতার কারণে, যেহেতু তা সুউচ্চ পর্বতমালা ও গভীর উপত্যকা থেকে মুক্ত। আরবদের পরিভাষায় ‘ইরাক’ অর্থ হলো সমতলতা। জনৈক কবি ‘সারী’ ছন্দে বলেছেন:

তোমরা তাদের সত্যের দিকে পরিচালিত করেছ এবং তারাও পরিচালিত হয়েছে ... এমন একজনের পরিচালনার ন্যায় যার কোনো সমতল ভূমি নেই।

অর্থাৎ: তার কোনো সমতা নেই। আর দৈর্ঘ্যে সাওয়াদের সীমানা হলো হাদিসাতুল মাওসিল থেকে আব্বাদান পর্যন্ত, আর প্রস্থে কাদেসিয়ার উজায়ব থেকে হুলওয়ান পর্যন্ত। এর দৈর্ঘ্য একশত ষাট ফারসাখ এবং প্রস্থ আশি ফারসাখ। আর ইরাকের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তা প্রস্থে সাওয়াদ ভূমিকে পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু দৈর্ঘ্যে তা প্রচলিত প্রথানুসারে সাওয়াদের চেয়ে কম। কারণ টাইগ্রিস নদীর পূর্ব দিকে এর শুরু হলো আল-আস থেকে এবং পশ্চিম দিকে হারবিয়্যান থেকে; অতঃপর তা আব্বাদান দ্বীপের বসরা প্রশাসনিক অঞ্চলের শেষ সীমা পর্যন্ত

বিস্তৃত। ফলে এর দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় একশত পঁচিশ ফারসাখ, যা সাওয়াদের তুলনায় পঁয়ত্রিশ ফারসাখ কম। তবে প্রথা অনুযায়ী এর আনুষঙ্গিক অঞ্চলসহ প্রস্থ সাওয়াদের মতোই আশি ফারসাখ।

কুদামা ইবনে জাফর বলেন: ক্ষেত্রফল হিসেবে তা দশ হাজার বর্গ ফারসাখ। এক ফারসাখের দৈর্ঘ্য সাধারণ হাত হিসেবে বারো হাজার হাত এবং পরিমাপের হাত—যা হাশেমি হাত হিসেবে পরিচিত—তা অনুযায়ী নয় হাজার হাত। সুতরাং যখন একে বর্গ করা হয়, তখন এক বর্গ ফারসাখের ক্ষেত্রফল দাঁড়ায় বাইশ হাজার পাঁচশত জারিব। আর যখন একে মোট ফারসাখের সংখ্যা অর্থাৎ দশ হাজার ফারসাখ দিয়ে গুণ করা হয়, তখন তা বাইশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ জারিবে পৌঁছায়। তা থেকে পাহাড়, টিলা, লোনা জমি, জঙ্গল, পথ-ঘাট, মহাসড়ক, নদ-নদীর প্রবাহপথ, শহর ও গ্রামের প্রশস্ত চত্বর, ডাকঘর ও সীমান্তবর্তী এলাকা, সেতু, জলকপাট, বন্দর, নলখাগড়া ফেলার স্থান, ইটের ভাটা ইত্যাদির জন্য আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ বাদ দেওয়া হয়। আর এই এক-তৃতীয়াংশের পরিমাণ হলো সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ জারিব। ফলে ইরাকের অবশিষ্ট ক্ষেত্রফল দাঁড়ায় পনেরো কোটি জারিব। এর অর্ধেক অনাবাদী রাখা হয় এবং বাকি অর্ধেক চাষাবাদ করা হয়, যার সাথে সবখানের খেজুর বাগান, আঙ্গুর বাগান ও গাছপালা অন্তর্ভুক্ত। কুদামা ইরাকের যে ক্ষেত্রফলের কথা উল্লেখ করেছেন, তার সাথে যদি সাওয়াদের অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ ফারসাখ যোগ করা হয়, তবে সেই ক্ষেত্রফলের উপর আরও প্রায় এক-চতুর্থাংশ বৃদ্ধি পাবে। ফলে তা সাওয়াদ ভূমির চাষাবাদ ও বৃক্ষরোপণের উপযুক্ত সকল জমির ক্ষেত্রফলে পরিণত হবে। তবে এর সম্পূর্ণ অংশ চাষাবাদের আওতায় আনা অসম্ভব, আর বিভিন্ন আপদ ও দুর্ঘটনার কারণে এর অসংখ্য অংশ অব্যবহৃত থেকে যেতে পারে।

বলা হয়ে থাকে যে, কিসরা কুবাদ-এর আমলে সাওয়াদের ক্ষেত্রফল পনেরো কোটি জারিবে পৌঁছেছিল এবং এর মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল সাতাশ কোটি সত্তর লক্ষ দিরহাম।

بِوَزْنِ سَبْعَةٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ بِوَزْنِ الْمِثْقَالِ، وَأَنَّ مِسَاحَةَ مَا كَانَ يُزْرَعُ مِنْهُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رضي الله عنه مِنِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ إِلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ.

وَإِذْ قَدْ اسْتَقَرَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُدُودِ السَّوَادِ وَمِسَاحَةِ مَزَارِعِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَتْحِهِ وَفِي حُكْمِهِ.

فَذَهَبَ أَهْلُ الْعِرَاقِ إِلَى أَنَّهُ فُتِحَ عَنْوَةً، لَكِنْ لَمْ يُقَسِّمْهُ عُمَرُ رضي الله عنه بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَأَقَرَّهُ عَلَى سُكَّانِهِ، وَضَرَبَ الْخَرَاجَ عَلَى أَرْضِهِ.

وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله فِي السَّوَادِ أَنَّهُ فُتِحَ عَنْوَةً، وَاقْتَسَمَهُ الْغَانِمُونَ مِلْكًا، ثُمَّ اسْتَنْزَلَهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه، فَنَزَلُوا إِلَّا طَائِفَةً اسْتَطَابَ نُفُوسَهُمْ بِمَالٍ عَاوَضَهُمْ بِهِ عَنْ حُقُوقِهِمْ مِنْهُ، فَلَمَّا خَلَصَ لِلْمُسْلِمِينَ ضَرَبَ عُمَرُ رضي الله عنه عَلَيْهِ خَرَاجًا.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي حُكْمِهِ؛ فَذَهَبَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه وَقَفَهُ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَقَرَّهُ فِي أَيْدِي أَرْبَابِهِ بِخَرَاجٍ ضَرَبَهُ عَلَى رِقَابِ الْأَرَضِينَ يَكُونُ أُجْرَةً لَهَا تُؤَدَّى فِي كُلِّ عَامٍ.

وَإِنْ لَمْ تَتَقَدَّرْ مُدَّتُهَا لِعُمُومِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا، وَصَارَتْ بِوَقْفِهِ لَهَا فِي حُكْمِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ خَيْبَرَ وَالْعَوَالِي وَأَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ مِنْ خَرَاجِهَا مَصْرُوفًا فِي الْمَصَالِحِ، وَلَا يَكُونُ فَيْئًا مَخْمُوسًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ خُمِّسَ، وَلَا يَكُونُ مَقْصُورًا عَلَى الْجَيْشِ؛ لِأَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، فَصَارَ مَصْرِفُهُ فِي عُمُومِ مَصَالِحِهِمُ الَّتِي مِنْهَا أَرْزَاقُ الْجَيْشِ وَتَحْصِينُ الثُّغُورِ وَبِنَاءُ الْجَوَامِعِ وَالْقَنَاطِرِ، وَكِرَاءُ الْأَنْهَارِ، وَأَرْزَاقُ مَنْ تَعُمُّ بِهِمُ الْمَصْلَحَةُ مِنَ الْقُضَاةِ وَالشُّهُودِ وَالْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ، فَهَذَا يَمْنَعُ مِنْ بَيْعِ رِقَابِهَا، وَتَكُونُ الْمُعَارَضَةُ عَلَيْهَا بِالِانْتِفَاعِ، وَالِانْتِقَالِ لِأَيْدٍ، وَجَوَازُ التَّصَرُّفِ لَا لِثُبُوتِ الْمِلْكِ، إِلَّا عَلَى مَا أُحْدِثَ فِيهَا مِنْ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ، وَقِيلَ: إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه وَقَفَ السَّوَادَ بِرَأْيِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنهما.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه حِينَ اسْتَنْزَلَ الْغَانِمِينَ عَنِ السَّوَادِ بَاعَهُ عَلَى الْأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينَ بِالْمَالِ الَّذِي وَضَعَهُ عَلَيْهَا خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ، فَكَانَ الْخَرَاجُ ثَمَنًا، وَجَازَ مِثْلُهُ فِي عُمُومِ الْمَصَالِحِ، كَمَا قُبِلَ بِجَوَازِ مِثْلِهِ فِي الْإِجَارَةِ، وَأَنَّ بَيْعَ أَرْضِ السَّوَادِ يَجُوزُ، وَيَكُونُ الْبَيْعُ مُوجِبًا لِلتَّمْلِيكِ.

সাত দিরহামের ওজনে; কারণ তিনি প্রতি জারিব জমির ওপর এক দিরহাম এবং এক কাফিজ ধার্য করতেন, যার মূল্য ছিল মিথকাল ওজনে তিন দিরহাম। আর উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর আমলে চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল তিন কোটি বিশ লক্ষ জারিব থেকে তিন কোটি ষাট লক্ষ জারিব পর্যন্ত।

আমরা সাওয়াদের সীমানা এবং এর আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাপ সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছি তা যখন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন ফকিহগণ এর বিজয় এবং এর বিধান নিয়ে মতভেদ করেছেন। ইরাকবাসী ফকিহগণের অভিমত হলো, এটি যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, তবে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) এটি বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করেননি বরং এর অধিবাসীদের হাতে বহাল রেখেছেন এবং এর ভূমির ওপর খারাজ ধার্য করেছেন।

সওয়াদের ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মাযহাবের স্পষ্ট মত হলো, এটি যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল এবং বিজয়ীরা তা মালিকানা হিসেবে বণ্টন করে নিয়েছিলেন। অতঃপর উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) তাদের কাছে এটি ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। ফলে একদল ব্যতীত বাকিরা তা ছেড়ে দেন। আর যারা অবশিষ্ট ছিলেন, উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) তাদের হকের বিনিময়ে সম্পদ দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করেন। যখন এটি মুসলমানদের জন্য নিষ্কণ্টক হলো, তখন উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) এর ওপর খারাজ ধার্য করেন।

এর বিধান সম্পর্কে শাফিঈ ঘরানার আলেমগণ মতভেদ করেছেন। আবু সাঈদ আল-ইসতাখরি এবং তাঁদের অনেকের অভিমত হলো, উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) এই ভূমিকে সাধারণ মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন এবং এর মালিকদের হাতে খারাজ প্রদানের শর্তে বহাল রেখেছিলেন, যা ভূমির মূল সত্তার ওপর ধার্য করা হয়েছিল এবং প্রতি বছর তা খাজনা হিসেবে আদায় করা হতো।

যদিও জনস্বার্থের কারণে এর মেয়াদ নির্ধারিত হয়নি। এটি ওয়াকফ করার মাধ্যমে সেই বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে খায়বর, আওয়ালি এবং বনু নাদিরের সম্পদ থেকে 'ফায়' হিসেবে প্রদান করেছিলেন। এর খারাজ থেকে প্রাপ্ত অর্থ জনস্বার্থে

ব্যয় হবে। এটি খুমুস (পঞ্চমাংশ) বের করার যোগ্য ফায় নয়; কারণ এর খুমুস আগেই বের করা হয়েছে। আবার এটি কেবল সেনাবাহিনীর জন্য নির্দিষ্ট নয়; কারণ এটি সকল মুসলমানের জন্য ওয়াকফ। ফলে এর ব্যয় হবে সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজে, যার অন্তর্ভুক্ত হলো সৈন্যদের বেতন, সীমান্ত রক্ষা, জামে মসজিদ ও সেতু নির্মাণ, খাল খনন এবং এমন ব্যক্তিদের পারিশ্রমিক যাদের মাধ্যমে জনস্বার্থ সাধিত হয়; যেমন—বিচারক, সাক্ষী, ফকিহ, ক্বারি, ইমাম ও মুয়াজ্জিন। এটি ভূমির মূল সত্তা বিক্রি করতে বাধা প্রদান করে। এর ওপর উপযোগ গ্রহণ এবং এক হাত থেকে অন্য হাতে স্থানান্তরের অধিকার থাকবে এবং এর ব্যবহারের বৈধতা থাকবে, কিন্তু তা মূল মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নয়; কেবল তাতে নতুনভাবে লাগানো চারাগাছ বা নির্মিত ভবনের মালিকানা সাব্যস্ত হবে। বলা হয়ে থাকে যে, উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) আলী ইবনে আবি তালিব এবং মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর পরামর্শে সাওয়াদ ভূমি ওয়াকফ করেছিলেন।

আবু আব্বাস ইবনে সুরাইজ এবং শাফিঈ ঘরানার একদল আলেম বলেছেন: উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) যখন বিজয়ীদের কাছ থেকে সাওয়াদ ভূমি গ্রহণ করেন, তখন তিনি তা কৃষক ও ভূস্বামীদের কাছে সেই সম্পদের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন, যা তারা প্রতি বছর খারাজ হিসেবে প্রদান করবে। ফলে এই খারাজ ছিল মূলত বিক্রয়মূল্য। জনস্বার্থে এ জাতীয় চুক্তি বৈধ, যেমনটি ইজারার ক্ষেত্রে বৈধতা স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং সাওয়াদ ভূমি বিক্রি করা বৈধ এবং এই বিক্রয় মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হবে।

(ص: 261)الأحكام السلطانية للماوردي

وَأَمَّا قَدْرُ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهَا، فَقَدْ حَكَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه حِينَ اسْتَخْلَصَ السَّوَادَ بَعَثَ حُذَيْفَةَ عَلَى مَا وَرَاءِ دِجْلَةَ، وَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مَا دُونَ دِجْلَةَ.

قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ السَّوَادَ فَوَجَدَهُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا، قَالَ الْقَاسِمُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْقَفِيزَ مِكْيَالٌ لَهُمْ يُدْعَى الشَّابِرْقَانَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: هُوَ الْمَحْتُومُ الْحَجَّاجِيُّ.

وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ أَبِي مُخْلِدٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنَ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنَ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ قَصَبِ السُّكَّرِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنَ الرَّطْبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنَ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ، فَكَانَ خَرَاجُ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مُخَالِفًا لِخَرَاجِهِمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، وَهَذَا لِاخْتِلَافِ النَّوَاحِي بِحَسَبِ مَا تَحْتَمِلُ، وَكَانَتْ ذِرَاعُ حُذَيْفَةَ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ذِرَاعَ الْيَدِ وَقَبْضَةً وَإِبْهَامًا مَمْدُودًا، وَكَانَ السَّوَادُ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ الْفُرْسِ جَارِيًا عَلَى الْمُقَاسَمَةِ، إِلَى أَنْ مَسَحَهُ وَوَضَعَ الْخَرَاجَ عَلَيْهِ قَبَاءُ بْنُ فَيْرُوزَ، فَارْتَفَعَ لَهُ بِالْمِسَاحَةِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ بِوَزْنِ الْمِثْقَالِ.

وَكَانَ السَّبَبُ فِي مِسَاحَتِهِ -وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ جَارِيًا عَلَى الْمُقَاسَمَةِ- مَا حُكِيَ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا يَتَصَيَّدُ فَأَفْضَى إِلَى شَجَرٍ مُلْتَفٍّ، فَدَخَلَ فِيهِ الصَّيْدُ، فَصَعِدَ إِلَى رَابِيَةٍ يُشْرِفُ مِنْهَا عَلَى الشَّجَرِ لِيَرَى مَا فِيهِ مِنَ الصَّيْدِ، فَرَأَى امْرَأَةً تَحْفِرُ فِي بُسْتَانٍ فِيهِ نَخْلٌ وَرُمَّانٌ مُثْمِرٌ، وَمَعَهَا صَبِيٌّ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الرُّمَّانِ، وَهِيَ تَمْنَعُهُ، فَعَجِبَ مِنْهَا، وَأَنْفَذَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَسْأَلُهَا عَنْ سَبَبِ مَنْعِ وَلَدِهَا مِنَ الرُّمَّانِ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ لِلْمَلِكِ حَقًّا لَمْ يَأْتِ الْقَاسِمُ لِقَبْضِهِ، وَنَخَافُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بَعْدَ أَخْذِ حَقِّهِ، فَرَقَّ الْمَلِكُ لِقَوْلِهَا وَأَدْرَكَتْهُ رَأْفَةٌ بِرَعِيَّتِهِ، فَتَقَدَّمَ إِلَى وُزَرَائِهِ بِالْمِسَاحَةِ الَّتِي يُقَارِبُ قِسْطُهَا مَا يَحْصُلُ بِالْمُقَاسَمَةِ؛ لِتَمْتَدَّ يَدُ كُلِّ إِنْسَانٍ إِلَى مَا يَمْلِكُهُ فِي وَقْتِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ، فَكَانَ الْفُرْسُ عَلَى هَذَا فِي بَقِيَّةِ أَيَّامِهِمْ، وَجَاءَ الْإِسْلَامُ فَأَقَرَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِسَاحَةِ وَالْخَرَاجِ، فَبَلَغَ ارْتِفَاعُهُ فِي أَيَّامِهِ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَجَبَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَخَمْسَةً وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ بِغَشْمِهِ وَظُلْمِهِ،

وَجَبَاهُ الْحَجَّاجُ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفٍ بِغَشْمِهِ وَخرابِهِ، وَجَبَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ أَلْفٍ بِعَدْلِهِ وَعِمَارَتِهِ، وَكَانَ ابْنُ هُبَيْرَةَ يَجْبِيهِ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ،

আর তার ওপর ধার্যকৃত খারাজের পরিমাণের ক্ষেত্রে আমর ইবনে মাইমুন বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন সাওয়াদ অঞ্চল করতলগত করলেন, তখন তিনি দজলা নদীর ওপারের জনপদগুলোর জন্য হুযায়ফাকে এবং দজলার এপারের জনপদগুলোর জন্য উসমান ইবনে হুনাইফকে নিয়োগ দিলেন।

শাবি বলেন: অতঃপর উসমান ইবনে হুনাইফ সাওয়াদ অঞ্চলের ভূমি জরিপ করলেন এবং তা ছত্রিশ মিলিয়ন জারীব পেলেন। এরপর তিনি প্রতি জারীবের ওপর এক দিরহাম এবং এক কাফীজ কর ধার্য করলেন। কাসিম বলেন: আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, কাফীজ হলো তাদের একটি পরিমাপের পাত্র যা শাবিরকান নামে অভিহিত হতো। ইয়াহইয়া ইবনে আদম বলেন: তা হলো হাজ্জাজী মাহতূম।

কাতাদা আবু মুখাল্লাদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উসমান ইবনে হুনাইফ প্রতি জারীব আঙ্গুর বাগানের ওপর দশ দিরহাম, প্রতি জারীব খেজুর বাগানের ওপর আট দিরহাম, প্রতি জারীব আখ চাষের ভূমির ওপর ছয় দিরহাম, প্রতি জারীব পশুখাদ্যের ভূমির ওপর পাঁচ দিরহাম, প্রতি জারীব গমের ওপর চার দিরহাম এবং প্রতি জারীব যবের ওপর দুই দিরহাম ধার্য করেছিলেন। এই বর্ণনায় গম ও যবের খারাজ পূর্ববর্তী বর্ণনার তুলনায় ভিন্ন ছিল, আর তা অঞ্চলের উৎপাদন সক্ষমতার ভিন্নতার কারণে। হুযায়ফা এবং উসমান ইবনে হুনাইফের পরিমাপের হাত ছিল এক হাত, এক মুষ্টি এবং একটি প্রসারিত বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ। পারস্য সম্রাটদের প্রাথমিক যুগে সাওয়াদ অঞ্চলের রাজস্ব ব্যবস্থা ফসলের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রচলিত ছিল।

পরবর্তীতে কুব্বাদ ইবনে ফিরুজ তা জরিপ করেন এবং এর ওপর খারাজ ধার্য করেন। জরিপের মাধ্যমে তার মোট সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ছিল মিসকাল ওজনে একশত পঞ্চাশ মিলিয়ন দিরহাম।

পূর্বে ফসলের অংশীদারিত্বের প্রথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও ভূমি জরিপের কারণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি শিকারে বের হয়ে একটি ঘন বনে উপনীত হলেন যেখানে শিকারটি প্রবেশ করেছিল। তিনি একটি উঁচু টিলায় আরোহণ করলেন যেখান থেকে বনটি দেখা যাচ্ছিল, যাতে ভেতরে থাকা শিকারটি দেখতে পান। তখন তিনি এক নারীকে দেখলেন যিনি একটি

খেজুর ও ফলন্ত ডালিম বাগানে মাটি খুঁড়ছেন। তার সঙ্গে একটি বালক ছিল যে কিছু ডালিম নিতে চাচ্ছিল, কিন্তু নারীটি তাকে বাধা দিচ্ছিলেন। সম্রাট এতে বিস্মিত হলেন এবং কেন তিনি তার সন্তানকে ডালিম নিতে বাধা দিচ্ছেন তা জিজ্ঞাসা করার জন্য একজন দূত পাঠালেন। তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই এতে সম্রাটের হক রয়েছে, আর রাজস্ব সংগ্রাহক তা গ্রহণ করতে এখনও আসেননি; আমরা আশঙ্কা করছি যে সম্রাটের হক বুঝে নেওয়ার আগেই সে যেন তা থেকে কিছু খেয়ে না ফেলে।" সম্রাটের মনে তার কথায় দয়ার উদ্রেক হলো এবং প্রজাদের প্রতি তার মমতা জেগে উঠল। তখন তিনি তার উজিরদের এমনভাবে ভূমি জরিপ করার নির্দেশ দিলেন যেন তার নির্ধারিত করের পরিমাণ ফসলের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিমাণের কাছাকাছি হয়; যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনে নিজের মালিকানাধীন বস্তুর ওপর অধিকার ভোগ করতে পারে। পারস্য সম্রাটদের অবশিষ্ট দিনগুলোতে তারা এই নিয়মেই পরিচালিত হয়েছিল। অতঃপর ইসলামের আগমন ঘটলে উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জরিপ ও খারাজের এই পদ্ধতি বহাল রাখেন। তার যুগে মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল একশত বিশ মিলিয়ন দিরহাম। উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তার কঠোরতা ও যুলুমের মাধ্যমে একশত পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন দিরহাম আদায় করেছিলেন। হাজ্জাজ তার কঠোরতা ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে একশত আঠারো মিলিয়ন দিরহাম আদায় করেছিলেন। পক্ষান্তরে উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) তার ন্যায়বিচার এবং সংস্কারের মাধ্যমে একশত বিশ মিলিয়ন দিরহাম আদায় করেছিলেন এবং ইবনে হুবায়রা একশত মিলিয়ন দিরহাম আদায় করতেন।

(ص: 262)الأحكام السلطانية للماوردي

سِوَى طَعَامِ الْجُنْدِ وَأَرْزَاقِ الْمُقَاتِلَةِ.
وَكَانَ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ يُحَصِّلُ مِنْهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ سِتِّينَ أَلْفَ أَلْفٍ إِلَى سَبْعِينَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَيَحْتَسِبُ بِعَطَاءِ مَنْ قَبْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَفِي نَفَقَةِ الْبَرِيدِ أَرْبَعَةَ

آلافِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَفِي الطَّوَارِقِ أَلْفَ أَلْفٍ، وَيَبْقَى فِي بُيُوتِ الْأَحْدَاثِ وَالْعَوَاتِقِ عَشَرَةُ آلافِ أَلْفِ دِرْهَمٍ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ: ارْتِفَاعُ هَذَا الْإِقْلِيمِ فِي الْحَقَّيْنِ أَلْفَ أَلْفِ أَلْفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَمَا نَقَصَ مِنْ مَالِ الرَّعِيَّةِ زَادَ فِي مَالِ السُّلْطَانِ؛ وَمَا نَقَصَ مِنْ مَالِ السُّلْطَانِ زَادَ فِي مَالِ الرَّعِيَّةِ، وَلَمْ يَزَلِ السَّوَادُ عَلَى الْمِسَاحَةِ وَالْخَرَاجِ إِلَى أَنْ عَدَلَ بِهِمُ الْمَنْصُورُ رحمه الله فِي الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ عَنِ الْخَرَاجِ إِلَى الْمُقَاسَمَةِ؛ لِأَنَّ السِّعْرَ نَقَصَ فَلَمْ تَفِ الْغَلَّاتُ بِخَرَاجِهَا، وَخَرِبَ السَّوَادُ فَجَعَلَهُ مُقَاسَمَةً.

وَأَشَارَ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ عَلِيٌّ الْمَهْدِيّ أَنْ يَجْعَلَ أَرْضَ الْخَرَاجِ مُقَاسَمَةً بِالنِّصْفِ إِنْ سَقَى سَيْحًا، وَفِي الدَّوَالِي عَلَى الثُّلُثِ، وَفِي الدَّوَالِيبِ عَلَى الرُّبُعِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ سِوَاهُ، وَأَنْ يَعْمَلَ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالشَّجَرِ مِسَاحَةَ خَرَاجٍ تُقَدَّرُ بِحَسَبِ قُرْبِهِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَالْفَرْضِ، وَيَكُونُ الْبَيْنُ مِثْلَ الْمُقَاسَمَةِ. فَإِذَا بَلَغَ حَاصِلُ الْغَلَّةِ مَا يَفِي بِخَرَاجَيْنِ أَخَذَ عَنْهَا خَرَاجًا كَامِلًا، وَإِذَا نَقَصَ تَرَكَ، فَهَذَا مَا جَرَى فِي أَرْضِ السَّوَادِ.

وَالَّذِي يُوجِبُهُ الْحُكْمُ أَنَّ خَرَاجَهَا هُوَ الْمَضْرُوبُ عَلَيْهَا أَوَّلًا، وَتَغْيِيرُهُ إِلَى الْمُقَاسَمَةِ إِذَا كَانَ لِسَبَبٍ حَادِثٍ اقْتَضَاهُ اجْتِهَادُ الْأَئِمَّةِ، فَيَكُونُ أَمْضَى مَعَ بَقَاءِ سَبَبِهِ، وَإِلَّا أُعِيدَ إِلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ عِنْدَ زَوَالِ سَبَبِهِ؛ إِذْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْقُضَ اجْتِهَادَ مَنْ تَقَدَّمَهُ.

فَأَمَّا تَضْمِينُ الْعُمَّالِ لِأَمْوَالِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ فَبَاطِلٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الشَّرْعِ حُكْمٌ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ مُؤْتَمَنٌ يَسْتَوْفِي مَا وَجَبَ، وَيُؤَدِّي مَا حَصَلَ، فَهُوَ كَالْوَكِيلِ الَّذِي إِذَا أَدَّى الْأَمَانَةَ لَمْ يَضْمَنْ نُقْصَانًا، وَلَمْ يُكْمِلْ زِيَادَةً، وَضَمَانُ الْأَمْوَالِ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ يَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ فِي تَمَلُّكِ مَا زَادَ وَغُرْمِ مَا نَقَصَ، وَهَذَا مُنَافٍ لِوَضْعِ الْعِمَالَةِ وَحُكْمِ الْأَمَانَةِ فَبَطَلَ.

وَحُكِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ الْعَبَّاسِ رضي الله عنه يَتَقَبَّلُ مِنْهُ الْأُبُلَّةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ وَصَلَبَهُ حَيًّا تَعْزِيرًا وَأَدَبًا.

সৈন্যদের খাদ্য এবং যোদ্ধাদের ভাতা ব্যতীত।

ইউসুফ ইবনে উমর তা থেকে প্রতি বছর ছয় কোটি থেকে সাত কোটি দিরহাম সংগ্রহ করতেন এবং তিনি তার পূর্ববর্তী সিরিয়াবাসীদের ভাতা বাবদ এক কোটি ৬০ লক্ষ দিরহাম, ডাক বিভাগের ব্যয় বাবদ ৪০ লক্ষ দিরহাম এবং আপদকালীন জরুরি ব্যয় বাবদ ১০ লক্ষ দিরহাম হিসাব করতেন। এছাড়া নবীন ও কুমারীদের তহবিলে এক কোটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকত।

আবদুর রহমান ইবনে জাফর ইবনে সুলাইমান বলেন: উভয় হকের (রাজস্ব ও পাওনা) ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের মোট আয় ছিল তিনশ কোটি; অতঃপর প্রজাদের সম্পদ থেকে যা হ্রাস পেত, তা সুলতানের সম্পদে বৃদ্ধি পেত; আর সুলতানের সম্পদ থেকে যা হ্রাস পেত, তা প্রজাদের সম্পদে বৃদ্ধি পেত। সাওয়াদ অঞ্চলে ভূমি পরিমাপ ও খারাজের নিয়ম বলবৎ ছিল, যতক্ষণ না আব্বাসীয় আমলে আল-মনসুর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাদের খারাজ থেকে ফসল ভাগাভাগির (মুকাসামা) দিকে সরিয়ে নেন; কারণ ফসলের মূল্য কমে যাওয়ায় উৎপাদিত শস্য খারাজ পরিশোধে পর্যাপ্ত ছিল না এবং সাওয়াদ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, তাই তিনি একে ফসল ভাগাভাগিতে রূপান্তর করেন।

আবু উবায়দুল্লাহ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আল-মাহদী যেন খারাজি ভূমিকে অর্ধেক ফসল ভাগাভাগির ভিত্তিতে নির্ধারণ করেন যদি তা প্রাকৃতিক প্রবাহমান পানিতে সেচপ্রাপ্ত হয়, আর যদি বালতি বা মটকার মাধ্যমে হয় তবে এক-তৃতীয়াংশ এবং যদি জলচক্রের (ওয়াটার হুইল) মাধ্যমে হয় তবে এক-চতুর্থাংশ। এর বাইরে তাদের ওপর অন্য কিছু ধার্য করা হবে না। আর খেজুর, আঙুর ও ফলদ বৃক্ষের ক্ষেত্রে বাজার ও নির্ধারিত কেন্দ্রের নৈকট্য অনুযায়ী ভূমি পরিমাপের ভিত্তিতে খারাজ ধার্য করা হবে এবং এর হার ফসল ভাগাভাগির সমতুল্য হতে হবে। যখন ফসলের ফলন এমন হবে যা দুটি খারাজের সমান হয়, তখন একটি পূর্ণ খারাজ গ্রহণ করা হবে, আর কম হলে তা মাফ করে দেওয়া হবে। সাওয়াদ ভূমির ক্ষেত্রে এটিই ছিল অনুসৃত রীতি।

শরয়ী বিধান অনুযায়ী আবশ্যক হলো এই যে, উক্ত ভূমির খারাজ তাই যা প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে। তবে ইমামদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোনো নতুন কারণ দেখা দিলে তা ফসল ভাগাভাগিতে পরিবর্তন করা কার্যকর হবে যতক্ষণ সেই কারণ বিদ্যমান থাকে। অন্যথায় কারণ দূরীভূত হলে একে পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে; কেননা ইমামের অধিকার রয়েছে তার পূর্ববর্তীদের ইজতিহাদ পরিবর্তন করার।

আর উশর ও খারাজের অর্থের জন্য আমিলদের (রাজস্ব কর্মকর্তা) ওপর আর্থিক নিশ্চয়তা (ইজারা) চাপিয়ে দেওয়া বাতিল, শরিয়তে এর কোনো বিধান নেই। কারণ আমিল হলেন

একজন বিশ্বস্ত আমানতদার, যিনি প্রাপ্য আদায় করবেন এবং যা সংগৃহীত হবে তা প্রদান করবেন। তিনি একজন প্রতিনিধির মতো, যিনি আমানত আদায় করলে কোনো ঘাটতির জন্য দায়ী হন না এবং অতিরিক্ত অংশের মালিক হন না। নির্দিষ্ট অংকের বিনিময়ে রাজস্ব আদায়ের চুক্তি করা অতিরিক্ত অংশ আত্মসাৎ করা এবং ঘাটতি হলে জরিমানা দেওয়ার নামান্তর, যা আমিল পদের প্রকৃতি ও আমানতদারিতার বিধানের পরিপন্থী; ফলে তা বাতিল।
বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে এসে উবুল্লাহ অঞ্চলের রাজস্ব এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে ইজারা নিতে চেয়েছিল। তিনি তাকে দণ্ড ও শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে একশ চাবুক মারেন এবং জীবন্ত অবস্থায় শূলে চড়ান।

(ص: 263)الأحكام السلطانية للماوردي

وَقَدْ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه النَّاسَ فَجَمَعَ فِي خُطْبَتِهِ بَيْنَ صِفَتِهِمْ وَصِفَةِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِمْ، وَحُكْمِ الْمَالِ الَّذِي يَلِيهِ بِمَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَسْمُوعُ، وَالْحَقُّ الْمَتْبُوعُ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، اقْرَءُوا الْقُرْآنَ تَعَرَّفُوا بِهِ، اعْمَلُوا بِمَا فِيهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ، وَلَنْ يَبْلُغَ ذُو حَقٍّ حَقَّهُ أَنْ يُطَاعَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، أَلَا وَإِنَّهُ لَنْ يُبْعِدَ مِنْ رِزْقٍ، وَلَنْ يُقَرِّبَ مِنْ أَجَلٍ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ حَقًّا، أَلَا وَإِنِّي مَا وَجَدْتُ صَلَاحَ مَا وَلَّانِي اللَّهُ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَالْأَخْذُ بِالْقُوَّةِ، وَالْحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، أَلَا وَإِنِّي مَا وَجَدْتُ صَلَاحَ هَذَا الْمَالِ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَنْ يُؤْخَذَ بِحَقٍّ، وَأَنْ يُعْطَى فِي حَقٍّ، وَأَنْ يُمْنَعَ مِنْ بَاطِلٍ، أَلَا وَإِنِّي فِي مَالِكُمْ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ إِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ كَتَرَمُّمِ الْبَهِيمَةِ الْأَعْرَابِيَّةِ.

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জনসমক্ষে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে মানুষের বৈশিষ্ট্য ও তাদের ওপর তাঁর কর্তৃত্বের স্বরূপ এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা সম্পদের বিধান সম্পর্কে এমনভাবে আলোচনা করেন, যা ছিল শ্রুত সঠিক কথা এবং অনুসৃত সত্য। তিনি

বলেন: হে লোকসকল! তোমরা কুরআন পাঠ করো, তাহলে তোমরা এর মাধ্যমে সত্যকে চিনতে পারবে; আর এতে যা আছে সে অনুযায়ী আমল করো, তাহলে তোমরা কুরআনের প্রকৃত অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে আনুগত্য লাভের কোনো অধিকার কোনো হকদারের নেই। জেনে রেখো, সত্য কথা বলা কোনো ব্যক্তির রিযিককে দূরে সরিয়ে দেয় না এবং তার আয়ুও নিকটবর্তী (সংকুচিত) করে না। সাবধান! আল্লাহ আমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তার সংশোধন ও কল্যাণ আমি তিনটি বিষয় ব্যতীত খুঁজে পাইনি: আমানত রক্ষা করা, দৃঢ়তার সাথে দায়িত্ব পালন করা এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করা। জেনে রেখো, এই সম্পদের কল্যাণ আমি তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুতে দেখিনি: তা ন্যায়ের সাথে গ্রহণ করা, ন্যায়ের পথে প্রদান করা এবং অন্যায় পথে ব্যয় হতে বাধা প্রদান করা। সাবধান! তোমাদের এই সম্পদের বিষয়ে আমার অবস্থান ঠিক ইয়াতীমের অভিভাবকের মতো; আমি যদি অভাবমুক্ত থাকি তবে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকি, আর যদি আমি অভাবগ্রস্ত হই তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে সাধারণ প্রয়োজন পূরণ করি—যেমন মরুচারী চতুষ্পদ প্রাণী ঘাস লতাপাতা খুঁটে জীবন ধারণ করে।

(ص: 264)الأحكام السلطانية للماوردي

الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مَلَكَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام: "لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ"1.

وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ" 2 دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِلْكَ الْمَوَاتِ مُعْتَبَرٌ بِالْإِحْيَاءِ دُونَ إِذْنِ الْإِمَامِ.

وَالْمَوَاتُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ عَامِرًا وَلَا حَرِيمًا لِعَامِرٍ فَهُوَ مَوَاتٌ، وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِعَامِرٍ3.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْمَوَاتُ مَا بَعُدَ مِنَ الْعَامِرِ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ الْمَاءُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الْمَوَاتُ كُلُّ أَرْضٍ إِذَا وَقَفَ عَلَى أَدْنَاهَا مِنَ الْعَامِرِ مُنَادٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ لَمْ يَسْمَعْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا فِي الْعَامِرِ، وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ يَخْرُجَانِ عَنِ الْمَعْهُودِ فِي اتِّصَالِ الْعِمَارَاتِ، وَيَسْتَوِي فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ جِيرَانُهُ وَالْأَبَاعِدُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: جِيرَانُهُ مِنْ أَهْلِ الْعَامِرِ أَحَقُّ بِإِحْيَائِهِ مِنَ الْأَبَاعِدِ؛ وَصِفَةُ الْإِحْيَاءِ مُعْتَبَرَةٌ بِالْعُرْفِ فِيمَا يُرَادُ لَهُ الْإِحْيَاءُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَطْلَقَ ذِكْرَهُ إِحَالَةً عَلَى الْعُرْفِ الْمَعْهُودِ فِيهِ؛ فَإِنْ أَرَادَ إِحْيَاءَ الْمَوَاتِ لِلسُّكْنَى كَانَ إِحْيَاؤُهُ بِالْبِنَاءِ وَالتَّسْقِيفِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ كَمَالِ الْعِمَارَةِ الَّتِي يُمْكِنُ سُكْنَاهَا.

---

1 ضعيف جدًّا: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد "5/ 331"، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عمرو بن واقد وهو متروك.

قال الزيلعي: رواه الطبراني في معجمه الكبير الأوسط، وهو معلول بعمرو بن واقد، ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده، وذكره البيهقي في المعرفة في باب إحياء الموات بهذا الإسناد، ثم قال: وهو منقطع بين مكحول ومن فوقه، وراويه عن مكحول مجهول، وهذا إسناد لا يُحتَجُّ به، انتهى. وهذا السند وارد على الطبراني فإنه قال في معجمه الأوسط: لا يُرْوَى هذا الحديث عن معاذ وحبيب إلّا بهذا الإسناد، انتهى. ولو قال: لا نعلم لكان أسلم له والله أعلم [نصب الراية: 3/ 430] .

2 صحيح: رواه مالك في كتاب الأقضية من موطئه "1456"، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة "3073"، والترمذي في كتاب الأحكام "1378"، وصحَّحَه الشيخ الألباني.

3 انظر: [معنى المحتاج: 2/ 361] .

যে ব্যক্তি কোনো অনাবাদী ভূমি আবাদ করবে, ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) অনুমতি সাপেক্ষে হোক বা অনুমতি ব্যতীত, সে তার মালিক হবে। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন: ইমামের অনুমতি ব্যতীত কোনো ভূমি আবাদ করা বৈধ নয়; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "ইমাম বা শাসকের সন্তুষ্টি ব্যতীত কারো জন্য কোনো কিছুই গ্রহণ করা বৈধ নয়।" ১ আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "যে ব্যক্তি কোনো অনাবাদী ভূমিকে আবাদ করবে, তা তারই হবে" ২ —এই হাদিসে এই দলিল রয়েছে যে, অনাবাদী ভূমির মালিকানা আবাদকরণের ওপর নির্ভরশীল, ইমামের অনুমতির ওপর নয়।

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে অনাবাদী ভূমি (মাওয়াত) হলো: যা আবাদকৃত নয় এবং যা কোনো আবাদকৃত ভূমির সংশ্লিষ্ট এলাকা (হারিম) নয়, সেটিই অনাবাদী ভূমি, যদিও তা কোনো আবাদকৃত এলাকার সাথে সংযুক্ত থাকে। ৩

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন: অনাবাদী ভূমি হলো তা, যা লোকালয় থেকে দূরে এবং যেখানে পানি পৌঁছে না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন: অনাবাদী ভূমি হলো এমন জমি, যার লোকালয়ের নিকটতম প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোনো ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করলে লোকালয়ের নিকটতম ব্যক্তিরা তা শুনতে পায় না। আর এই দুটি অভিমত জনবসতির সংযোগের প্রচলিত প্রথা বহির্ভূত। অনাবাদী ভূমি আবাদ করার ক্ষেত্রে প্রতিবেশী এবং দূরবর্তী ব্যক্তি উভয়েই সমান অধিকার রাখে।

ইমাম মালিক রহ. বলেন: লোকালয়ের অধিবাসী প্রতিবেশীরা দূরবর্তী ব্যক্তিদের তুলনায় সেই ভূমি আবাদ করার অধিক হকদার। আবাদকরণের পদ্ধতিটি যে উদ্দেশ্যে আবাদ করা হচ্ছে তার প্রচলিত প্রথার (উরফ) ওপর নির্ভরশীল; কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচলিত প্রথার ওপর বিষয়টি ন্যস্ত করে এর উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, যদি কেউ বসবাসের উদ্দেশ্যে ভূমি আবাদ করতে চায়, তবে তার আবাদকরণ হবে দালান নির্মাণ এবং ছাদ তৈরির মাধ্যমে; কেননা এটিই বসবাসের উপযোগী ইমারত বা স্থাপনা পূর্ণতার প্রাথমিক পর্যায়।

---

১ অত্যন্ত দুর্বল: আল-হাইসামি এটি 'মাজমাউজ যাওয়াইদ' (৫/৩৩১) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তাবারানি 'আল-কাবীর' ও 'আল-আওসাত' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদে আমর বিন ওয়াকিদ রয়েছেন, যিনি হাদিস বিশারদদের নিকট পরিত্যক্ত (মাতরুক)। যয়লায়ী রহ. বলেন: তাবারানি তাঁর মুজামুল কাবীর ও আওসাত গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এটি আমর বিন ওয়াকিদ-এর কারণে ত্রুটিযুক্ত (মা'লুল)। ইসহাক বিন রাহওয়াইহি তাঁর

মুসনাদে এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বায়হাকি 'আল-মা'রিফাহ' গ্রন্থের অনাবাদী ভূমি আবাদকরণ অধ্যায়ে এই সনদে এটি উল্লেখ করেছেন, তারপর বলেছেন: এটি মাকহুল এবং তাঁর ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারীর মাঝে বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি')। আর মাকহুল থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি অজ্ঞাত (মাজহুল), ফলে এই সনদটি দলিল হিসেবে গ্রহণীয় নয়। তাবারানি তাঁর মুজামুল আওসাতে বলেছেন: মুয়াজ ও হাবিব থেকে এই সনদ ব্যতীত হাদিসটি বর্ণিত হয়নি। ইমাম যয়লায়ী বলেন: যদি তিনি বলতেন 'আমাদের জানা নেই' তবে তা তাঁর জন্য নিরাপদ হতো, আল্লাহই ভালো জানেন [নাসবুর রায়াহ: ৩/৪৩০]।
২ সহিহ: ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তার ফয়সালা অধ্যায়ে (১৪৫৬), আবু দাউদ খারাজ ও প্রশাসন অধ্যায়ে (৩০৭৩) এবং তিরমিজি বিধান অধ্যায়ে (১৩৭৮) এটি বর্ণনা করেছেন এবং শায়খ আলবানী একে সহিহ বলেছেন।
৩ দেখুন: [মুগনি আল-মুহতাজ: ২/৩৬১]।

(ص: 265)الأحكام السلطانية للماوردي

وَإِنْ أَرَادَ إِحْيَاءَهَا لِلزَّرْعِ وَالْغَرْسِ اُعْتُبِرَ فِيهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:
أَحَدُهَا: جَمْعُ التُّرَابِ الْمُحِيطِ بِهَا حَتَّى يَصِيرَ حَاجِزًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا.
وَالثَّانِي: سَوْقُ الْمَاءِ إِلَيْهَا إِنْ كَانَتْ يَبِسًا، وَحَبْسُهُ عَنْهَا إِنْ كَانَتْ بَطَائِحَ؛ لِأَنَّ إِحْيَاءَ الْيَبِسِ بِسَوْقِ الْمَاءِ إِلَيْهِ، وَإِحْيَاءَ الْبَطَائِحِ بِحَبْسِ الْمَاءِ عَنْهَا، حَتَّى يُمْكِنَ زَرْعُهَا وَغَرْسُهَا فِي الْحَالَيْنِ.
وَالثَّالِثُ: حَرْثُهَا: وَالْحَرْثُ يَجْمَعُ إِثَارَةَ الْمُعْتَدِلِ وَكَسْحَ الْمُسْتَعْلِي، وَطَمَّ الْمُنْخَفِضِ، فَإِذَا اُسْتُكْمِلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ كَمُلَ الْإِحْيَاءُ وَمَلَكَ الْمُحْيِي، وَغَلِطَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ: لَا يَمْلِكُهُ حَتَّى يَزْرَعَهُ أَوْ يَغْرِسَهُ، وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السُّكْنَى الَّتِي لَا تُعْتَبَرُ فِي تَمَلُّكِ الْمَسْكُونِ، فَإِنْ زَارَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْإِحْيَاءِ مَنْ قَامَ بِحَرْثِهَا وَزِرَاعَتِهَا

كَانَ الْمُحْيِي مَالِكًا لِلْأَرْضِ، وَالْمُثِيرُ مَالِكًا لِلْعِمَارَةِ، فَإِنْ أَرَادَ مَالِكُ الْأَرْضِ بَيْعَهَا جَازَ، وَإِنْ أَرَادَ مَالِكُ الْعِمَارَةِ بَيْعَهَا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِهِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ لَهُ إِثَارَةٌ جَازَ لَهُ بَيْعُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِثَارَةٌ لَمْ يَجُزْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الْعِمَارَةِ عَلَى الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، وَيَجْعَلُ الْأَكَّارَ شَرِيكًا فِي الْأَرْضِ بِعِمَارَتِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الْعِمَارَةِ بِحَالٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا أَعْيَانٌ قَائِمَةٌ كَشَجَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الْأَعْيَانِ دُونَ الْإِثَارَةِ، وَإِذَا تَحَجَّرَ عَلَى مَوَاتٍ كَانَ أَحَقَّ بِإِحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ تَغَلَّبَ عَلَيْهِ مَنْ أَحْيَاهُ كَانَ الْمُحْيِي أَحَقَّ بِهِ مِنَ الْمُتَحَجِّرِ، فَإِنْ أَرَادَ الْمُتَحَجِّرُ عَلَى الْأَرْضِ بَيْعَهَا قَبْلَ إِحْيَائِهَا لَمْ يَجُزْ -عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَجَوَّزَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ بِالتَّحْجِيرِ عَلَيْهَا أَحَقَّ بِهَا جَازَ لَهُ بَيْعُهَا كَالْأَمْلَاكِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَهَا فَتَغَلَّبَ عَلَيْهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مَنْ أَحْيَاهَا، فَقَدْ زَعَمَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ثَمَنَهَا لَا يَسْقُطُ عَنِ الْمُشْتَرِي لِتَلَفِ ذَلِكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ بَيْعِهِ: إِنَّ الثَّمَنَ يَسْقُطُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ، فَأَمَّا إِذَا تَحَجَّرَ وَسَاقَ الْمَاءَ وَلَمْ يَحُزْ فَقَدْ مَلَكَ الْمَاءَ، وَمَا جَرَى فِيهِ مِنَ الْمَوَاتِ وَحَرِيمَهُ، وَلَمْ يَمْلِكْ مَا سِوَاهُ وَإِنْ كَانَ بِهِ أَحَقَّ، وَجَازَ لَهُ بَيْعُ مَا جَرَى فِيهِ الْمَاءُ.

وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَحْجُورِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ.

وَمَا أُحْيِيَ مِنَ الْمَوَاتِ مَعْشُورٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ، سَوَاءٌ سُقِيَ بِمَاءِ الْعُشْرِ أَوْ

যদি কেউ চাষাবাদ বা বৃক্ষরোপণের উদ্দেশ্যে একে (পতিত জমি) আবাদ করতে চায়, তবে তাতে তিনটি শর্ত বিবেচিত হবে:

প্রথমটি: চারপাশের মাটি একত্রিত করা, যাতে এটি সেই ভূমি এবং অন্যান্য ভূমির মাঝে একটি সীমানা বা প্রাচীর হিসেবে গণ্য হয়।

দ্বিতীয়টি: ভূমিটি যদি শুষ্ক হয় তবে তাতে পানি প্রবাহিত করা, আর যদি জলাভূমি হয় তবে তা থেকে পানি আটকে দেওয়া; কারণ শুষ্ক ভূমির আবাদ হয় তাতে পানি আনয়নের মাধ্যমে, আর জলাভূমির আবাদ হয় তা থেকে পানি নিষ্কাশন বা প্রতিরোধের মাধ্যমে, যাতে উভয় অবস্থাতেই তৎক্ষণাৎ তাতে চাষাবাদ ও বৃক্ষরোপণ করা সম্ভব হয়।

তৃতীয়টি: ভূমি কর্ষণ করা। আর কর্ষণ বলতে সাধারণ ভূমির মাটি উলট-পালট করা, উঁচু অংশ কেটে সমান করা এবং নিচু অংশ ভরাট করা বোঝায়। যখন এই তিনটি শর্ত পূর্ণ হবে, তখন আবাদ সম্পন্ন হবে এবং আবাদকারী তার মালিক হবে। ইমাম শাফেঈর অনুসারীদের কেউ কেউ ভুলবশত বলেছেন: চাষাবাদ বা বৃক্ষরোপণ না করা পর্যন্ত সে তার মালিক হবে না; অথচ এই মতটি অসার, কেননা এটি বসবাসের ন্যায়—যা বাসগৃহের মালিকানা অর্জনের শর্ত হিসেবে গণ্য হয় না। আবাদ করার পর যদি কেউ অন্যকে দিয়ে তাতে চাষাবাদ করায় এবং সেই ব্যক্তি কর্ষণ ও বপন করে, তবে আবাদকারী হবে ভূমির মালিক এবং কর্ষণকারী হবে উন্নয়নের মালিক। যদি ভূমির মালিক তা বিক্রি করতে চায় তবে তা জায়েয। আর যদি উন্নয়নের মালিক তা বিক্রি করতে চায়, তবে তার বৈধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: যদি তার কর্ষণের প্রভাব বিদ্যমান থাকে তবে তা বিক্রি করা জায়েয, আর যদি কর্ষণের প্রভাব না থাকে তবে জায়েয নয়।

ইমাম মালেক বলেছেন: সকল অবস্থাতেই তার জন্য উন্নয়নের অংশ বিক্রি করা জায়েয এবং তিনি চাষীকে তার শ্রম বা উন্নয়নের বিনিময়ে জমির অংশীদার সাব্যস্ত করেন।

ইমাম শাফেঈ বলেছেন: কোনো অবস্থাতেই তার জন্য উন্নয়নের অংশ বিক্রি করা জায়েয নয়, যদি না সেখানে দৃশ্যমান কোনো বস্তু যেমন গাছপালা বা ফসল বর্তমান থাকে। সেক্ষেত্রে সেই বস্তুগুলো বিক্রি করা জায়েয হবে, কিন্তু কেবল কর্ষণ বা শ্রম নয়। আর যখন কেউ পতিত জমির চারপাশ পাথর বা বেড়া দিয়ে ঘেরাও (তাহাজ্জুর) করে, তখন সে অন্যের তুলনায় তা আবাদ করার ক্ষেত্রে বেশি হকদার হয়। তবে কেউ যদি জোরপূর্বক তা দখল করে আবাদ করে ফেলে, তবে আবাদকারীই বেষ্টনকারীর চেয়ে এর বেশি হকদার হবে। যদি বেষ্টনকারী আবাদ করার পূর্বে জমিটি বিক্রি করতে চায়, তবে ইমাম শাফেঈর মাযহাবের প্রকাশ্য মত অনুযায়ী তা জায়েয নয়। তবে তাঁর অনেক অনুসারী একে জায়েয বলেছেন; কারণ বেষ্টন করার মাধ্যমে যেহেতু সে এর অধিকতর হকদার হয়েছে, তাই মালিকানাধীন সম্পদের ন্যায় তা বিক্রি করা

জায়েয। এই মতানুসারে, যদি সে তা বিক্রি করে দেয় এবং ক্রেতার হাতে থাকাবস্থায় অন্য কেউ তা দখল করে আবাদ করে ফেলে, তবে শাফেঈ অনুসারী ইবনে আবি হুরায়রা মনে করেন যে, ক্রেতার ওপর থেকে মূল্য পরিশোধের দায়ভার রহিত হবে না; কারণ এটি তার হস্তগত হওয়ার পর নষ্ট হয়েছে।

আর তাঁর অন্যান্য অনুসারী যারা বিক্রি জায়েয বলেন, তারা মনে করেন: মূল্য পরিশোধের দায়ভার রহিত হয়ে যাবে; কারণ তার দখল স্থিতিশীল হয়নি। তবে যদি কেউ বেষ্টনী দেয় এবং পানি প্রবাহিত করে কিন্তু জমি কর্ষণ না করে, তবে সে কেবল পানির মালিক হবে এবং পতিত জমির যতটুকু অংশ দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়েছে তার এবং এর সংশ্লিষ্ট সীমানার মালিক হবে। এছাড়া অন্য কিছুর মালিক সে হবে না, যদিও সে সেটির অধিকতর হকদার থাকবে; এবং যে পথে পানি প্রবাহিত হয়েছে তা বিক্রি করা তার জন্য জায়েয হবে।

বেষ্টনী দেয়া জমির অবশিষ্ট অংশ বিক্রির বৈধতার ব্যাপারে আমরা পূর্বে যে দুটি মত উল্লেখ করেছি তা-ই প্রযোজ্য হবে।

পতিত ভূমি থেকে যা আবাদ করা হয়েছে তা উশর (দশমাংশ) যোগ্য ভূমি, এর ওপর খরাজ ধার্য করা জায়েয নয়—তা উশরি পানি দ্বারা সেচ দেওয়া হোক অথবা

(ص: 266)الأحكام السلطانية للماوردي

بِمَاءِ الْخَرَاجِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: إِنْ سَاقَ إِلَى مَا أَحْيَاهُ مَاءَ الْعُشْرِ كَانَتْ أَرْضَ عُشْرٍ، وَإِنْ سَاقَ إِلَيْهَا مَاءَ الْخَرَاجِ كَانَتْ أَرْضَ خَرَاجٍ1.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ الْمُحْيَاةُ عَلَى أَنْهَارٍ حَفَرَتْهَا الْأَعَاجِمُ فَهِيَ أَرْضُ خَرَاجٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَنْهَارٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عز وجل؛ كَدِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ فَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ مَا أُحْيِيَ مِنْ مَوَاتِ الْبَصْرَةِ وَسِبَاخِهَا أَرْضُ عُشْرٍ.

أَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ؛ فَلِأَنَّ دِجْلَةَ الْبَصْرَةَ مِمَّا أَجْرَاهُ اللَّهُ تعالى مِنَ الْأَنْهَارِ، وَمَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَنْهَارِ الْمُحْدَثَةِ فَهِيَ مُحْيَاةٌ احْتَفَرَهَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْمَوَاتِ.

وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي تَعْلِيلِ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَجَعَلَ بَعْضُهُمُ الْعِلَّةَ فِيهِ أَنَّ مَاءَ الْخَرَاجِ يَفِيضُ فِي دِجْلَةِ الْبَصْرَةِ وَفِي جُزُرِهَا، وَأَرْضُ الْبَصْرَةِ تَشْرَبُ مِنْ مَدِّهَا، وَالْمَدُّ مِنَ الْبَحْرِ، وَلَيْسَ مِنْ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَّ يُفِيدُ الْمَاءَ الْعَذْبَ مِنَ الْبَحْرِ، وَلَا يَمْتَزِجُ بِمَائِهِ وَلَا تُشْرَبُ، وَإِنْ كَانَ الْمَدُّ شَرِبَهَا إِلَّا مَاءَ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ.

وَقَالَ أَصْحَابُهُ -مِنْهُمْ طَلْحَةُ بْنُ آدَمَ: بَلِ الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ مَاءَ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ يَسْتَقِرُّ فِي الْبَطَائِحِ، فَيَنْقَطِعُ حُكْمُهُ وَيَزُولُ الِانْتِفَاعُ بِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى دِجْلَةِ الْبَصْرَةِ، فَلَا يَكُونُ مِنْ مَاءِ الْخَرَاجِ؛ لِأَنَّ الْبَطَائِحَ لَيْسَتْ مِنْ أَنْهَارِ الْخَرَاجِ، وَهَذَا تَعْلِيلٌ فَاسِدٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْبَطَائِحَ بِالْعِرَاقِ انْبَطَحَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، فَتَغَيَّرَ حُكْمُ الْأَرْضِ حَتَّى صَارَتْ مَوَاتًا، وَلَمْ يُعْتَبَرْ حُكْمُ الْمَاءِ.

وَسَبَبُهُ مَا حَكَاهُ صَاحِبُ السِّيَرِ أَنَّ مَاءَ دِجْلَةَ كَانَ مَاضِيًا فِي الدِّجْلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْغَوْرِ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ الْمَدَائِنِ فِي مَنَافِذَ مُسْتَقِيمَةِ الْمَسَالِكِ مَحْفُوظَةِ الْجَوَانِبِ، وَكَانَ مَوْضِعُ الْبَطَائِحِ الْآنَ أَرْضَ مَزَارِعَ وَقُرًى ذَاتِ مَنَازِلَ، فَلَمَّا كَانَ الْمَلِكُ قَبَاءُ بْنُ فَيْرُوزَ انْفَتَحَ فِي أَسَافِلَ كَسْكَرَ بَثْقٍ عَظِيمٍ أَغْفَلَ أَمْرَهُ حَتَّى غَلَبَ مَاؤُهُ وَغَرِقَ مِنَ الْعِمَارَاتِ مَا عَلَاهُ، فَلَمَّا وَلِيَ أَنُوشِرْوَانَ

---

1 قال علاء الدين الكاساني: قال أبو يوسف: إن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية، وإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية. وقال محمد: إن أحياها بماء العشر فهي عشرية، وإن أحياها بماء الخراج فهي خراجية، وإن أحياها ذمي فهي خراجية كيف ما كان بالإجماع، وهي من مسائل كتاب العشر والخراج، والله -عز شأنه- أعلم. [بدائع الصنائع: 6/ 195] .

খারাজি পানির মাধ্যমে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেন: যদি কেউ পতিত জমি আবাদ করে সেখানে উশররি পানি প্রবাহিত করে, তবে তা উশররি ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সেখানে খারাজি পানি প্রবাহিত করে, তবে তা খারাজি ভূমি হবে।১

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান বলেন: যদি আবাদকৃত ভূমিটি এমন সব নহরের (খালের) তীরে হয় যা অনারবরা খনন করেছে, তবে তা খারাজি ভূমি। আর যদি তা এমন সব নদীর তীরে হয় যা মহান আল্লাহ প্রবাহিত করেছেন; যেমন দজলা ও ফুরাত, তবে তা উশররি ভূমি। ইরাকি ফকিহগণ এবং অন্যান্যরা একমত হয়েছেন যে, বসরার পতিত জমি ও লোনাভূমির মধ্য থেকে যা আবাদ করা হয়েছে তা উশররি ভূমি।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের মতানুসারে এর কারণ হলো, বসরার দজলা নদী মহান আল্লাহ প্রবাহিত করেছেন এমন নদীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর এর ওপর যেসব নতুন নহর বা খাল রয়েছে, সেগুলো মূলত পতিত জমিতে মুসলমানদের খনন করা নহর।

ইমাম আবু হানিফার মতের প্রেক্ষিতে তাঁর অনুসারীরা এর কারণ বর্ণনায় দুটি ভিন্ন মত পোষণ করেছেন: তাদের কেউ কেউ একে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, খারাজি পানি বসরার দজলায় ও এর শাখাগুলোতে গিয়ে পড়ে, আর বসরার ভূমি তার জোয়ারের পানি দ্বারা সিক্ত হয়। এই জোয়ার সমুদ্র থেকে আসে, দজলা ও ফুরাত থেকে নয়। কিন্তু এই যুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ; কারণ জোয়ার সমুদ্র থেকে মিষ্টি পানি বয়ে আনে যা সমুদ্রের লোনা পানির সাথে মিশে না এবং পানযোগ্য থাকে না, যদি না সেই জোয়ার দজলা ও ফুরাতের পানিকে ঠেলে নিয়ে আসত।

তাঁর অন্যান্য অনুসারী—যাদের মধ্যে তালহা ইবনে আদম রয়েছেন—বলেন: বরং এর প্রকৃত কারণ হলো দজলা ও ফুরাতের পানি জলাভূমিতে (বাতায়িহ) গিয়ে জমা হয়, ফলে এর আগের বিধান রহিত হয়ে যায় এবং এর উপযোগিতা শেষ হয়ে যায়। এরপর তা বসরার দজলার দিকে বেরিয়ে আসে, ফলে তা আর খারাজি পানি থাকে না; কারণ জলাভূমিগুলো খারাজি নহরের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই যুক্তিটিও ত্রুটিপূর্ণ; কারণ ইরাকের এই জলাভূমিগুলো ইসলামের পূর্বেই তৈরি হয়েছিল, ফলে ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে তা পতিত জমিতে পরিণত হয়েছিল, এখানে পানির বিধান ধর্তব্য নয়।

এর ঐতিহাসিক কারণ সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তারা বর্ণনা করেন যে, দজলার পানি মূলত 'গাওর' নামে পরিচিত সুপরিচিত দজলা নদী দিয়ে প্রবাহিত হতো, যা মাদায়েন থেকে সোজা পথে এবং সংরক্ষিত পাড়ের মধ্য দিয়ে বসরা পর্যন্ত পৌঁছাত। বর্তমানের এই জলাভূমিগুলো তখন আবাদি জমি ও জনপদ ছিল। যখন রাজা কাবাদ ইবনে ফিরোজের শাসনামল এল, তখন নিম্নাঞ্চলে

এক বিশাল প্লাবনের সৃষ্টি হয়। তিনি বিষয়টি অবহেলা করায় পানি জনপদ প্লাবিত করে ফেলে এবং আবাদি এলাকার উপরের অংশগুলো ডুবে যায়। এরপর যখন আনুশিরওয়ান ক্ষমতায় এলেন...

---

১ আলাউদ্দীন আল-কাসানি বলেন: ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন: জমিটি যদি উশররি এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তা উশররি, আর যদি খারাজি এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তা খারাজি। ইমাম মুহাম্মদ বলেন: যদি উশররি পানি দিয়ে আবাদ করা হয় তবে তা উশররি, আর যদি খারাজি পানি দিয়ে আবাদ করা হয় তবে তা খারাজি। আর যদি কোনো জিম্মি (অমুসলিম নাগরিক) জমি আবাদ করে, তবে সর্বসম্মতভাবে তা খারাজি ভূমি হবে, তা যেভাবেই হোক না কেন। এটি কিতাবুল উশর ওয়াল খারাজ-এর মাসআলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। [বাদায়িউস সানায়ি: ৬/১৯৫]।

(ص: 267)الأحكام السلطانية للماوردي

ابْنُهُ أَمَرَ بِذَلِكَ الْمَاءِ فَتَزَحَّمَ بِالْمُسْنَيَاتِ حَتَّى عَادَ بَعْضُ تِلْكَ الْأَرْضِ إِلَى عِمَارَتِهَا، وَكَانَتْ عَلَى ذَلِكَ سَنَةَ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي بَعَثَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ إِلَى كِسْرَى رَسُولًا، وَهُوَ كِسْرَى أَبْرِوِيزُ، فَزَادَتْ دِجْلَةُ وَالْفُرَاتُ زِيَادَةً عَظِيمَةً لَمْ يُرَ مِثْلُهَا، فَانْبَثَقَتْ بُثُوقًا عِظَامًا اجْتَهَدَ أَبْرِوِيزُ فِي سُكْرِهَا حَتَّى صَلَبَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ سَبْعِينَ سُكَارَى، وَبَسَطَ الْأَمْوَالَ عَلَى الْأَنْطَاعِ فَلَمْ يَقْدِرْ لِلْمَاءِ عَلَى حِيلَةٍ، ثُمَّ وَرَدَ الْمُسْلِمُونَ الْعِرَاقَ وَتَشَاغَلَتِ الْفُرْسُ بِالْحُرُوبِ، فَكَانَتِ الْبُثُوقُ تَنْفَجِرُ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا، وَيَعْجَزُ الدَّهَاقِينُ عَنْ سَدِّهَا فَاتَّسَعَتِ الْبَطِيحَةُ وَعَظُمَتْ، فَلَمَّا وُلِّيَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه وَلَّى مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَرَّاجٍ خَرَاجَ الْعِرَاقِ، فَاسْتَخْرَجَ لَهُ مِنْ أَرْضِ الْبَطَائِحِ مَا بَلَغَتْ غَلَّتُهُ خَمْسَةَ آلَافِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَخْرَجَ

بَعْدَهُ حَسَّانُ النَّبَطِيُّ لِلْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بَعْدِهِ كَثِيرًا مِنْ أَرْضِ الْبَطَائِحِ، ثُمَّ جَرَى النَّاسُ عَلَى هَذَا إِلَى وَقْتِنَا، حَتَّى صَارَتْ جَوَامِدُهَا مِثْلَ بَطَائِحِهَا وَأَكْثَرَ، وَكَانَ هَذَا التَّعْلِيلُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ مَا شَرَحْنَاهُ مِنْ أَحْوَالِ الْبَطَائِحِ عُذْرًا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مَا شَاهَدُوا الصَّحَابَةَ عَلَيْهِ مِنْ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَا أُحْيِيَ مِنْ مَوَاتِ الْبَصْرَةِ أَرْضُ عُشْرٍ، وَمَا ذَاكَ لِعِلَّةٍ غَيْرِ الْإِحْيَاءِ.

وَأَمَّا حَرِيمُ مَا أَحْيَاهُ مِنَ الْمَوَاتِ لِسُكْنَى أَوْ زَرْعٍ فَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُعْتَبَرٌ بِمَا لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ تِلْكَ الْأَرْضُ مِنْ طَرِيقِهَا وَفِنَائِهَا وَمَجَارِي مَائِهَا وَمَغِيضِهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: حَرِيمُ أَرْضِ الزَّرْعِ مَا بَعُدَ مِنْهَا وَلَمْ يَبْلُغْهُ مَاؤُهَا.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: حَرِيمُهَا مَا انْتَهَى إِلَيْهِ صَوْتُ الْمُنَادِي مِنْ حُدُودِهَا، وَلَوْ كَانَ لِهَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَجْهٌ لَمَا اتَّصَلَتْ عِمَارَتَانِ، وَلَا تَلَاصَقَتْ دَارَانِ، وَقَدْ مَصَّرَتِ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم الْبَصْرَةَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رضي الله عنه، وَجَعَلُوهَا خُطَطًا لِقَبَائِلِ أَهْلِهَا، فَجَعَلُوا عَرْضَ شَارِعِهَا الْأَعْظَمِ، وَهُوَ مِرْبَدُهَا سِتِّينَ ذِرَاعًا، وَجَعَلُوا عَرْضَ مَا سِوَاهُ مِنَ الشَّوَارِعِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا، وَجَعَلُوا عَرْضَ كُلِّ زُقَاقٍ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ، وَجَعَلُوا وَسَطَ كُلِّ خُطَّةٍ رَحْبَةً فَسِيحَةً لِمَرَابِطِ خَيْلِهِمْ وَقُبُورِ مَوْتَاهُمْ، وَتَلَاصَقُوا فِي الْمَنَازِلِ، وَلَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَأْيٍ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَنَصٍّ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ.

وَقَدْ رَوَى بَشِيرُ بْنُ كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا تَدَارَأَ الْقَوْمُ فِي طَرِيقٍ فَلْيَجْعَلْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ" 1.

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب "2473"، ومسلم في كتاب المساقاة "1613".

তাঁর পুত্র সেই পানি নিয়ন্ত্রণ করার আদেশ দিলেন এবং বাঁধসমূহ নির্মাণ করা হলো, ফলে সেই ভূমির কিছু অংশ পুনরায় আবাদযোগ্য হয়ে উঠল। হিজরি ষষ্ঠ সনে অবস্থা এমনই ছিল; আর এটি সেই বছর যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবদুল্লাহ ইবনে

হুজাফাহ আস-সাহমিকে পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন কিসরা আবরুইজ। সে সময় দজলা ও ফোরাত নদীতে এমন প্রবল বন্যা দেখা দিল যার নজির আগে কখনও দেখা যায়নি। ফলে বড় বড় ভাঙন দেখা দিল। আবরুইজ সেগুলো বাঁধার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, এমনকি তিনি একদিনেই সত্তরজন বাঁধ-শ্রমিককে ক্রুশবিদ্ধ করলেন এবং চামড়ার পাটির ওপর অর্থ ঢেলে দিলেন, তবুও তিনি পানির গতির সামনে কোনো কৌশল খাটাতে সক্ষম হলেন না। অতঃপর মুসলিমগণ ইরাকে প্রবেশ করলেন এবং পারসিকরা যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। ফলে বাঁধগুলো ভাঙতে থাকল কিন্তু সেদিকে আর কেউ ভ্রুক্ষেপ করল না। স্থানীয় ভূস্বামীরা সেগুলো মেরামত করতে অপারগ হয়ে পড়ল, ফলে জলাভূমি বিস্তৃত ও বিশাল আকার ধারণ করল। যখন মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাসনভার গ্রহণ করলেন, তিনি তাঁর মুক্তদাস আবদুল্লাহ ইবনে দাররাজকে ইরাকের রাজস্বের দায়িত্ব দিলেন। তিনি সেই জলাভূমি থেকে এমন পরিমাণ জমি উদ্ধার করলেন যার উৎপাদন পাঁচ লক্ষ দিরহামে পৌঁছেছিল। তাঁর পরে হাসান আন-নাবতি ওয়ালিদ ইবনে আবদিল মালিকের আমলে জলাভূমি থেকে আরও অনেক জমি উদ্ধার করেন। অতঃপর মানুষের এই ধারা বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে, এমনকি এর শুষ্ক ভূমিগুলো জলাভূমির সমান বা তার চেয়েও বেশি হয়ে গেছে। জলাভূমির অবস্থার বর্ণনার পাশাপাশি আবু হানিফার অনুসারীদের এই যুক্তিটি ছিল মূলত একটি কারণ যা তাদের সেই ইজমার দিকে ধাবিত করেছে যা তারা সাহাবীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন—তা হলো বসরার অনাবাদী ভূমি থেকে যা আবাদ করা হয়েছে তা 'উশর' (দশমাংশ কর) যোগ্য ভূমি; আর তা কেবল আবাদের কারণেই হয়েছে, অন্য কোনো কারণে নয়।

আর বসবাস বা চাষাবাদের জন্য যে অনাবাদী ভূমি আবাদ করা হয়েছে তার সীমানা (হারিম) প্রসঙ্গে শাফিয়ী (রহ.)-এর নিকট তা সেই প্রয়োজনীয় বিষয়াদি দ্বারা বিবেচিত হবে যা ছাড়া ভূমিটি অচল, যেমন—রাস্তা, আঙিনা, পানির গতিপথ এবং পানি নিষ্কাশনের পথ। আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন: চাষাবাদের জমির সীমানা হলো সেই দূরবর্তী স্থান যা আবাদি এলাকা থেকে দূরে এবং যেখানে তার পানি পৌঁছায় না।

আবু ইউসুফ (রহ.) বলেছেন: এর সীমানা হলো তার প্রান্তসীমা থেকে আহ্বানকারীর ডাক যতদূর পর্যন্ত পৌঁছায়। যদি এই দুটি মতের কোনো ভিত্তি থাকত, তবে দুটি আবাদি এলাকা কখনো সংযুক্ত হতো না এবং দুটি বাড়িও পরস্পর লাগোয়া হতো না। অথচ সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে বসরা নগরী পত্তন করেছিলেন এবং

গোত্রগুলোর জন্য এলাকা বণ্টন করেছিলেন। তাঁরা প্রধান সড়কের প্রস্থ রেখেছিলেন ষাট হাত, অন্যান্য সাধারণ সড়কের প্রস্থ রেখেছিলেন বিশ হাত এবং প্রতিটি গলির প্রস্থ রেখেছিলেন সাত হাত। তাঁরা প্রতিটি এলাকার মাঝে প্রশস্ত চত্বর রেখেছিলেন তাঁদের ঘোড়া বাঁধার জন্য এবং মৃতদের দাফনের জন্য, এবং তাঁরা ঘরবাড়ি পরস্পর সংলগ্ন করে তৈরি করেছিলেন। তাঁরা এটি কেবল সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে এবং এমন সুস্পষ্ট বিধানের আলোকেই করেছিলেন যার ব্যতিক্রম করা বৈধ নয়।

বশীর ইবনে কা'ব আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যদি লোকেরা পথের প্রস্থের ব্যাপারে বিরোধে লিপ্ত হয়, তবে তা যেন সাত হাত নির্ধারণ করা হয়।" 1.

---

1 সহিহ: বুখারি, কিতাবুল মাজালিম ওয়াল গাসব (২৪৭৩); মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত (১৬১৩)।

فصل:

وأما المياه المستخرجة فتنقسم ثلاثة أقسام: مياه أنهار، ومياه آبار، ومياه عيون، فأما الأنهار فتنقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: أجراه الله تعالى من كبار الأنهار التي لا يحتفرها الآدميون كدجلة والفرات ويسميان الرافدين، فماؤهما يتسع للزرع وللشاربة، وليس يتصور فيه قصور عن كفاية، ولا ضرورة تدعو فيه إلى تنازع أو مشاحنة، فيجوز لمن شاء من الناس أن يأخذ منها لضيعته شربًا، ويجعل من ضيعته إليها مغيضًا، ولا يمنع من أخذ شرب، ولا يعارض في إحداث مغيض.

والقسم الثَّاني: ما أجراه الله تعالى من صغار الأنهار، وهو على ضربين:

أحدهما: أن يعلو ماؤها وإن لم يحبس، ويكفي جميع أهله من غير تقصير، فيجوز لكل ذي أرض من أهله أن يأخذ منه شرب أرضه في وقت حاجته، ولا يعارض بعضهم بعضًا، فإن أراد قوم أن يستخرجوا منه نهرًا يساق إلى أرض أخرى، أو يجعلوا إليه مغيض نهر آخر نظر، فإن كان ذلك مضرًّا بأهل هذا النهر منع منه، وإن لم يضر بهم لم يمنع.

والضرب الثاني: أن يستقل ماء هذا النهر ولا يعلو للشرب إلّا بحبسه، فللأول من أهل النهر أن يبتدئ بحبسه؛ ليسقي أرضه حتى تكتفي منه وترتوي، ثم يحبسه من يليه حتى يكون آخرهم أرضًا آخرهم حبسًا. روى عبادة بن الصامت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أنَّ للأعلى أن يشرب قبل الأسفل، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، كذلك حتى ينقضي الأرضون1.

---

1 يشير المصنف -رحمه الله تعالى- إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب المساقاة "2360"، ومسلم في كتاب المساقاة "1613"، وغيرهما: عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدَّثه أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك" فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك، فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر" فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65]

.

পরিচ্ছেদ:

সংগৃহীত পানির উৎসসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত: নদীর পানি, কূপের পানি এবং প্রস্রবণের পানি। আর নদীর পানির বণ্টন আবার তিন প্রকার:

প্রথমত: আল্লাহ তাআলা যে বৃহৎ নদীগুলো প্রবাহিত করেছেন যা মানুষ খনন করেনি, যেমন দজলা ও ফোরাত—যাদেরকে রাফিদাঈন বলা হয়। এগুলোর পানি চাষাবাদ এবং পান করার জন্য পর্যাপ্ত। এগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় কোনো ঘাটতি কল্পনা করা যায় না, এবং এ নিয়ে কোনো বিবাদ বা কলহেরও আবশ্যকতা নেই। সুতরাং, যে কেউ তার খামারের সেচের জন্য এখান থেকে পানি গ্রহণ করতে পারে এবং তার খামার থেকে সেখানে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে পারে। পানি গ্রহণে কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না এবং পানি নিষ্কাশনের পথ তৈরিতেও বিরোধিতা করা যাবে না।

দ্বিতীয় বিভাগ: আল্লাহ তাআলা প্রবাহিত ছোট ছোট নদীসমূহ। এটি দুই প্রকার:

এক: যেগুলোর পানির স্তর বাঁধ দেওয়া ছাড়াই উঁচুতে থাকে এবং তা সংশ্লিষ্ট সকল অধিবাসীর জন্য কোনো ঘাটতি ছাড়াই পর্যাপ্ত হয়। সেক্ষেত্রে ভূমির মালিক প্রত্যেক অধিবাসী তার প্রয়োজনে নিজ জমির সেচের জন্য পানি গ্রহণ করতে পারবে এবং একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে না। তবে যদি কোনো জনগোষ্ঠী সেখান থেকে অন্য কোনো জমিতে পানি নেওয়ার জন্য নালা খনন করতে চায় অথবা সেখানে অন্য কোনো নদীর পানি নিষ্কাশনের পথ তৈরি করতে চায়, তবে তা বিবেচনা সাপেক্ষ। যদি তা সংশ্লিষ্ট নদীর অধিবাসীদের জন্য ক্ষতিকর হয় তবে তা নিষিদ্ধ হবে, আর যদি ক্ষতিকর না হয় তবে বাধা দেওয়া যাবে না।

দ্বিতীয় প্রকার: যদি এই নদীর পানি স্বল্প হয় এবং বাঁধ দেওয়া ছাড়া সেচ দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে নদীর উজানে অবস্থিত প্রথম ব্যক্তি পানি আটকে সেচ শুরু করবে; যাতে সে তার জমিতে পর্যাপ্ত সেচ দিতে পারে এবং জমি সিক্ত হয়। এরপর তার পরবর্তী ব্যক্তি পানি আটকে সেচ দেবে, এভাবে যে জমির অবস্থান সবার শেষে, সে সবার শেষে পানি আটকাবে। উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বন্যার প্রবাহ থেকে খেজুর গাছে সেচ দেওয়ার বিষয়ে ফয়সালা দিয়েছেন যে, উজানের মালিক নিম্নাঞ্চলের মালিকের আগে সেচ দেবে, তারপর তার পরবর্তী নিম্নাঞ্চলের দিকে পানি ছেড়ে দেবে, এভাবে সমস্ত ভূমির সেচ সম্পন্ন হবে।১।

---

১. গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) এখানে সেই হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা বুখারি 'কিতাবুল মুসাকাত' (২৩৬০) এবং মুসলিম 'কিতাবুল মুসাকাত' (১৬১৩) ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

উরওয়াহ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক আনসারী সাহাবী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট 'হাররার নালা' নিয়ে যুবাইরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হন যা দিয়ে তাঁরা খেজুর গাছে সেচ দিতেন। আনসারী বললেন: পানি ছেড়ে দিন যেন তা প্রবাহিত হতে পারে, কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। ফলে তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বিচার চাইলেন। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুবাইরকে বললেন: "হে যুবাইর! তুমি সেচ দাও, তারপর তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দাও।" এতে আনসারী ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বললেন: (আপনি এমন ফয়সালা দিলেন) কারণ সে আপনার ফুফাতো ভাই? তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারা (রাগে) বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি বললেন: "হে যুবাইর! তুমি সেচ দাও এবং পানি আটকে রাখো যতক্ষণ না তা আইল পর্যন্ত পৌঁছে যায়।" যুবাইর বলেন: আল্লাহর কসম, আমি মনে করি এই আয়াতটি সেই প্রেক্ষাপটেই নাজিল হয়েছে: {না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদপূর্ণ বিষয়ে আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করবে} [সুরা আন-নিসা: ৬৫]।

(ص: 269)الأحكام السلطانية للماوردي

وأما قدر ما يحبسه من الماء في أرضه، فقد روى محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في وادي مهزور أن يحبس الماء في الأرض إلى الكعبين، فإذا بلغ إلى الكعبين أرسل إلى الأخرى1.

وقال مالك: وقضى في سيل بطحان بمثل ذلك فقدره بالكعبين، وليس هذا القضاء منه على العموم في الأزمان والبلدان؛ لأنه مقدَّر بالحاجة.

وقد يختلف من خمسة أوجه باختلاف الأرضين.

فمنها: ما يرتوي باليسير، ومنها ما لا يرتوي إلَّا بالكثير.

والثاني: باختلاف ما فيها، فإن للزرع من الشرب قدرًا، وللنخل والأشجار قدرًا.

والثالث: باختلاف الصيف والشتاء، فإن لكل واحد من الزمانين قدرًا.
والرابع: باختلافها في وقت الزرع وقبله، فإن لكل واحد من الوقتين قدرًا.
والخامس: باختلاف حال الماء في بقائه وانقطاعه، فإن المنقطع يؤخذ منه ما يدخر، والدائم يؤخذ منه ما يستعمل؛ فلاختلافه من هذه الأوجه الخمسة لم يكن تحديده بما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدها، وكان معتبرًا بالعرف المعهود عند الحاجه إليه، فلو سقى رجل أرضه أو فجرها، فسال من مائها إلى أرض جاره فغرقها لم يضمن؛ لأنه تصرَّف في ملكه بمباح، فإن اجتمع في ذلك الماء سمك، كان الثاني أحق بصيده من الأول؛ لأنه من ملكه.
والقسم الثالث: من الأنهار ما احتفره الآدميون لما أحيوه من الأرضين، فيكون النهر بينهم ملكًا مشتركًا -كالزقاق المرفوع بين أهله لا يختص أحدهم بملكه، فإن كان هذا النهر بالبصرة يدخله ماء المد، فهو يعمّ جميع أهله لا يتشاحون فيه لاتساع مائه، ولا يحتاجون إلى حبسه لعلوّه بالمد إلى الحدِّ الذي ترتوي منه جميع الأرضين، ثم يقبض بعد الارتواء في الجزر، وإن كانت بغير البصرة من البلاد التي لا مدَّ فيها ولا جزر فالنهر مملوك لمن احتفره من

---

1 صحيح: رواه أبو داود في كتاب الأقضية "3638"، وابن ماجه في كتاب الأحكام "2481"، وصحَّحه الشيخ الألباني.

আর তার জমিতে যতটুকু পানি আটকে রাখা যাবে সে সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আবু মালিক ইবনে সা'লাবা হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহযুর উপত্যকার ক্ষেত্রে এই ফয়সালা দিয়েছেন যে, জমিতে পানি গোড়ালি পর্যন্ত আটকে রাখা হবে, আর যখন তা গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তখন তা পরবর্তী জনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে।১

ইমাম মালিক বলেন: তিনি বুতহান নামক প্লাবনভূমির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফয়সালা দিয়েছেন এবং তা গোড়ালি পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। তাঁর এই ফয়সালা সকল কাল ও ভূখণ্ডের জন্য সাধারণ কোনো নিয়ম নয়; বরং এটি প্রয়োজনের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল।
ভূমির ভিন্নতা অনুযায়ী এটি পাঁচটি দিক থেকে ভিন্ন হতে পারে।
তন্মধ্যে: কোনো ভূমি সামান্য পানিতেই সিক্ত হয়, আবার কোনোটি প্রচুর পানি ছাড়া সিক্ত হয় না।
দ্বিতীয়ত: জমিতে বিদ্যমান ফসলের ভিন্নতা অনুযায়ী। কেননা শস্যের জন্য এক প্রকার সেচের প্রয়োজন হয়, আবার খেজুর গাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের জন্য ভিন্ন পরিমাণ প্রয়োজন হয়।
তৃতীয়ত: গ্রীষ্ম ও শীতকালের ভিন্নতা অনুযায়ী। কেননা উভয় ঋতুর প্রতিটির জন্য স্বতন্ত্র পরিমাণ রয়েছে।
চতুর্থত: বীজ বপনের সময় এবং তার আগের সময়ের ভিন্নতা অনুযায়ী। কারণ এই উভয় সময়ের প্রতিটির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে।
পঞ্চমত: পানি প্রবাহের স্থায়িত্ব ও সবিরাম অবস্থার ভিন্নতা অনুযায়ী। কারণ সবিরাম পানির ক্ষেত্রে তা সঞ্চয় করে রাখার মতো পরিমাণ গ্রহণ করা হয়, আর প্রবহমান পানির ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী পরিমাণ নেওয়া হয়। এই পাঁচটি দিকের ভিন্নতার কারণে এর সীমা নির্ধারণ শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত একটি ফয়সালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রয়োজনের সময় প্রচলিত প্রথা বা রীতিনীতি অনুযায়ী তা বিবেচনাযোগ্য হবে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি তার জমিতে পানি সেচ দেয় অথবা পানি উন্মুক্ত করে দেয়, আর সেই পানি তার প্রতিবেশীর জমিতে প্রবাহিত হয়ে তা ডুবিয়ে ফেলে, তবে তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না; কারণ সে তার নিজ সম্পত্তিতে বৈধ পন্থায় কাজ করেছে। আর যদি সেই জমাকৃত পানিতে মাছ জমা হয়, তবে প্রথম ব্যক্তির তুলনায় দ্বিতীয় ব্যক্তি (জমির মালিক) তা ধরার অধিক হকদার; কারণ তা তার মালিকানাধীন সীমানায় রয়েছে।
তৃতীয় প্রকার: সেই সব নদী বা খাল যা মানুষ তাদের আবাদকৃত জমির প্রয়োজনে খনন করেছে। এমতাবস্থায় এই নদীটি তাদের মধ্যে যৌথ মালিকানাধীন হবে—যেমনটি কোনো মহল্লার গলি পথ যা সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে সাধারণ থাকে এবং তাদের কেউ একক মালিকানার দাবি করতে পারে না। যদি এই নদীটি বসরার হয় যেখানে জোয়ারের পানি প্রবেশ করে, তবে তা এলাকার সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং পানির প্রাচুর্যের কারণে তারা

এটি নিয়ে কোনো বিবাদ করবে না। জোয়ারের কারণে পানি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে সমস্ত জমি সিক্ত হয়ে যায়, ফলে তাদের পানি আটকে রাখার প্রয়োজন পড়ে না; এরপর সেচ সম্পন্ন হলে ভাটার সময় পানি নেমে যায়। আর যদি তা বসরা ব্যতীত অন্য কোনো শহরের হয় যেখানে জোয়ার-ভাটা নেই, তবে সেই নদী তাদের মালিকানাধীন হবে যারা তা খনন করেছে...

---

১ সহিহ: আবু দাউদ 'কিতাবুল আকদিয়া' (৩৬৩৮) এবং ইবনে মাজাহ 'কিতাবুল আহকাম' (২৪৮১) গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং শেখ আলবানি একে সহিহ বলেছেন।

(ص: 270)الأحكام السلطانية للماوردي

أرباب الأرضين لا حق فيه لغيره في شرب منه، ولا مغيض، ولا يجوز لواحد من أهله أن ينفرد بنصب عبارة عليه، ولا برفع مائه، ولا إدارة رحى فيه إلا عن مراضاة جميع أهله؛ لاشتراكهم فيما هو ممنوع من التفرُّد به، كما لا يجوز في الزقاق المرفوع أن يفتح إليه بابًا، ولا أن يخرج عليه جناحًا، ولا يمد عليه ساباطًا إلَّا بمراضاة جميعهم.

ثم لا يخلو حال شربهم منه من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يتناوبوا عليه بالأيام إن قلّوا، وبالساعات إن كثروا، ويقترعوا إن تنازعوا في الترتيب، حتى يستقرّ لهم ترتيب الأول ومن يليه، ويختص كل واحد منهم بنوبته لا يشاركه غيره فيها، ثم هو من بعدها على ما ترتبوا.

والقسم الثاني: أن يقتسموا في النهر عرضًا بخشبة تأخذ جانبي النهر، ويقسم فيها حفور مقدرة بحقوقهم من الماء، في كل حفرة منها قدر ما استحقه صاحبها من خمس أو عشر، وبأخذه إلى أرضه على الأدوار.

والقسم الثالث: أن يحفر كل واحد منهم في وجه أرضه شربًا مقدّرًا لهم باتفاقهم، أو على مساحة أملاكهم؛ ليأخذ من ماء النهر قدر حقه، ويساوي جميع شركائه، وليس له أن يزيد فيه ولا لهم أن ينقصوه، ولا لواحد منهم أن يؤخّر شربًا مقدمًا، كما ليس لواحد من أهل الزقاق المرفوع أن يؤخّر بابًا مقدَّمًا، وليس له أن يقدم شربًا مؤخرًا، وإن جاز أن يقدّم بابًا مؤخرًا؛ لأن في تقديم الباب المؤخر اقتصارًا على بعض الحق، وفي تقديم الشرب المؤخَّر زيادة على الحق، فأما حريم هذا النهر المحفور في الموات فهو عند الشافعي معتبر بعرف الناس في مثله، وكذلك حكم القناة؛ لأن القناة نهر باطن. وقال أبو حنيفة: حريم النهر مَلْقَى طينه. قال أبو يوسف: وحريم القناة ما لم يسح على وجه الأرض وكان جامعًا للماء، ولهذا القول وجه مستحسن1.

---

1 قال علاء الدين الكاساني: وأمَّا حريم النهر فقد اختلف أبو يوسف ومحمد في تقديره؛ فعند أبي يوسف: قدر نصف بطن النهر من كل جانب النصف من هذا الجانب، والنصف من ذلك الجانب، وعند محمد: قدر جميع بطن النهر من كل جانب قدر جميعه، وأما النهر إذا حفر في أرض الموات فمنهم من ذكر الخلاف فيه بين أبي حنيفة وصاحبيه، والصحيح أن له حريمًا بلا خلاف لما قلنا. [بدائع الصنائع: 6/ 195] .

জমির মালিকদের অধিকার ব্যতিরেকে এই উৎস থেকে সেচ গ্রহণ কিংবা জলনিষ্কাশন করার অধিকার অন্য কারো নেই। এর অংশীদারদের মধ্য থেকে কেউ এককভাবে এর ওপর পারাপারের সাঁকো নির্মাণ করতে পারবে না, এর পানির স্তর বৃদ্ধি করতে পারবে না এবং সকলের সম্মতি ব্যতীত এতে যাঁতাকল পরিচালনা করতে পারবে না। কারণ তারা এমন একটি বিষয়ে অংশীদার যাতে একক আধিপত্য বিস্তার করা নিষিদ্ধ; যেমনটি কোনো বন্ধ গলির ক্ষেত্রে সকল অংশীদারের অনুমতি ব্যতীত তাতে নতুন দরজা খোলা, ঝুলন্ত বারান্দা বের করা কিংবা গলির ওপর ছাদযুক্ত পথ নির্মাণ করা বৈধ নয়।

অতঃপর তাদের সেচ গ্রহণের পদ্ধতি তিন প্রকার হতে পারে:
প্রথমত: তারা পালাক্রমে এটি ব্যবহার করবে। যদি অংশীদার কম হয় তবে দিনের হিসাবে, আর বেশি হলে ঘণ্টার হিসাবে। পালার ক্রম নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে লটারির মাধ্যমে তা নির্ধারণ করবে, যতক্ষণ না প্রথম এবং তার পরবর্তীদের ক্রম সুনির্দিষ্ট হয়। প্রত্যেকে তার নির্দিষ্ট পালার সময় একচ্ছত্র অধিকার লাভ করবে এবং অন্য কেউ তাতে অংশ নিতে পারবে না; অতঃপর তারা নির্ধারিত ক্রম অনুযায়ী এটি ব্যবহার করবে।
দ্বিতীয়ত: তারা নদীর প্রস্থ বরাবর একটি কাষ্ঠখণ্ড স্থাপন করে তা বণ্টন করবে যা নদীর দুই তীরকে স্পর্শ করবে। তাতে তাদের পানির অধিকার অনুযায়ী পরিমিত ছিদ্র বা নালা থাকবে। প্রতিটি ছিদ্রে অংশীদারের পাওনা অনুযায়ী পানির পরিমাণ নির্ধারিত থাকবে—যেমন এক-পঞ্চমাংশ বা এক-দশমাংশ এবং নিজ নিজ জমিতে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা পর্যায়ক্রম অনুসরণ করবে।
তৃতীয়ত: তাদের মধ্যকার প্রত্যেকে নিজ জমির সম্মুখভাগে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে অথবা জমির আয়তন অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সেচনালা খনন করবে; যেন সে নদীর পানি থেকে নিজ প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং সকল অংশীদারের সমানাধিকার বজায় থাকে। এতে সে কোনো অংশ বৃদ্ধি করতে পারবে না, তেমনি অন্য অংশীদাররাও তা হ্রাস করতে পারবে না। তাদের কেউ অগ্রবর্তী কোনো সেচপথ পিছিয়ে দিতে পারবে না, যেমনটি বন্ধ গলির ক্ষেত্রে কেউ তার অগ্রবর্তী দরজা পিছিয়ে দিতে পারে না। তবে কেউ চাইলে পশ্চাদবর্তী দরজা সামনে এগিয়ে নিতে পারে; কারণ পেছনের দরজা সামনে এগিয়ে আনার অর্থ হলো নিজ অধিকারের কিছুটা সংকুচিত করা, কিন্তু পেছনের সেচপথ সামনে নিয়ে আসা অধিকারের সীমানা অতিক্রম করার শামিল। আর অনাবাদী জমিতে খননকৃত এই নদীর 'হারিম' বা পার্শ্ববর্তী রক্ষিত এলাকার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈর মত হলো, এটি এ জাতীয় বিষয়ের প্রচলিত প্রথা বা 'উরফ' দ্বারা নির্ধারিত হবে। ভূগর্ভস্থ নালা বা 'কানাত'-এর বিধানও অনুরূপ; কারণ কানাত হলো মূলত একটি অভ্যন্তরীণ নদী। ইমাম আবু হানিফা বলেন: নদীর রক্ষিত এলাকা হলো সেই স্থান যেখানে নদী সংস্কারের পলি বা কাদা নিক্ষেপ করা হয়। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন: কানাতের রক্ষিত এলাকা হলো সেই পর্যন্ত যা মাটির উপরিভাগে প্রবাহিত হয় না এবং পানি ধারণ করে রাখে; এই মতটির একটি চমৎকার যৌক্তিক দিক রয়েছে।১

---

১. আলাউদ্দিন আল-কাসানি বলেন: নদীর রক্ষিত এলাকা বা হারিমের পরিমাপ সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, নদীর তলদেশের অর্ধেক পরিমাণ জায়গা উভয় পাশে থাকবে; অর্থাৎ এই পাশে অর্ধেক এবং অন্য পাশে অর্ধেক। আর ইমাম মুহাম্মদের মতে, নদীর তলদেশের সমপরিমাণ জায়গা উভয় পাশে থাকবে। আর অনাবাদী জমিতে খননকৃত নদীর ক্ষেত্রে কেউ কেউ ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর দুই শিষ্যের মধ্যকার মতভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে সঠিক মত হলো, আমাদের বর্ণিত দলিল অনুযায়ী সর্বসম্মতভাবেই এর রক্ষিত এলাকা বা হারিম থাকবে। [বাদায়েউস সানায়ে: ৬/১৯৫]।

(ص: 271)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل:

وأمَّا الآبار فلحافرها ثلاثة أحوال:

إحداها: أن يحفرها لسابلة فيكون ماؤها مشتركًا وحافرها فيه كأحدهم، قد وقف عثمان رضي الله عنه بئر رومة، فكان يضرب بدلوه مع الناس، ويشترك في مائها إذا اتَّسع شرب الحيوان وسقي الزرع، فإن ضاق ماؤها عنهما كان شرب الحيوان أولى به من الزرع، ويشترك فيها الآدميون والبهائم، فإن ضاق عنهما كان الآدميون بمائها أحق من البهائم.

والحالة الثانية: أن يحتفرها لارتفاقه بمائها -كالبادية، إذا انتجعوا أرضًا وحفروا فيها بئرًا لشربهم وشرب مواشيهم، كانوا أحق بمائها ما أقاموا عليها في نجعتهم، وعليهم بذل الفضل من مائها للشاربين دون غيرهم، فإذا ارتحلوا عنها صارت البئر سابلة، فتكون خاصة الابتداء وعامة الانتهاء، فإن عادوا إليها بعد الارتحال عنها كانوا هم وغيرهم سواء فيها، ويكون السابق إليها أحق بها.

والحالة الثالثة: أن يحتفرها لنفسه ملكًا، فما لم يبلغ الحفر إلى استنباط مائها لم يستقر ملكه عليها، وإذا استنبط ماءها استقر ملكًا بكمال الإحياء، إلَّا أن يحتاج إلى طي، فيكون طيها من كمال الإحياء واستقرار الملك، ثم يصير مالكًا لها ولحريمها.
واختلف الفقهاء في قدر حريمها؛ فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنَّه معتبر بالعرف المعهود في مثلها. وقال أبو حنيفة: حريم البئر للناضح خمسون ذراعًا.
وقال أبو يوسف: حريمها ستون ذراعًا، إلَّا أن يكون رشاؤها أبعد، فيكون لها منتهى رشائها. قال أبو يوسف: وحريم بئر العطن أربعون ذراعًا، وهذه مقادير لا تثبت إلَّا بنص، فإن جاءها نص كان متبعًا، وإلا فهو معلول، وللتقدير بمنتهى الرشاء وجه يصح اعتباره، ويكون داخلًا في العرف المعتبر، فإذا استقر ملكه على البئر وحريمها فهو أحق بمائها1.

---

1 وقال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة: ومن حفر بئرًا في موات ملك حريمها، والمنصوص عن أحمد رضي الله عنه أنَّ حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب، ومن سبق إلى بئر عادية فاحتفرها فحريمها خمسون ذراعًا من كل جانب؛ لما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في حريم =

পরিচ্ছেদ:
কূয়াসমূহ খননকারীর জন্য তিনটি অবস্থা বিদ্যমান:
প্রথমত: যদি কেউ পথচারীদের (সাধারণ মানুষের) কল্যাণে কূয়া খনন করে, তবে এর পানি সবার জন্য সাধারণ থাকবে এবং খননকারীও সেখানে সাধারণের মতোই একজন বলে গণ্য হবে। উসমান (রা.) রূমাহ কূয়াটি ওয়াকফ করেছিলেন এবং তিনি মানুষের সাথে নিজের বালতি ফেলে পানি সংগ্রহ করতেন। যদি পানি পর্যাপ্ত হয়, তবে পশুদের পান করানো এবং ফসলে সেচ দেওয়া—উভয়ই করা যাবে। তবে যদি পানি উভয়ের জন্য পর্যাপ্ত না হয়, তবে ফসলে সেচের চেয়ে পশুদের পান করানোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। একইভাবে মানুষ এবং

পশু উভয়ই সেখানে অংশীদার হবে; কিন্তু পানি যদি উভয়ের জন্য সংকুলান না হয়, তবে পশুদের তুলনায় মানুষেরা সেই পানির অধিক হকদার হবে।

দ্বিতীয়ত: কেউ যদি নিজের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কূয়া খনন করে—যেমন মরুবাসীরা কোনো চারণভূমিতে অবস্থানকালে নিজেদের ও গবাদি পশুর পানীয়র প্রয়োজনে কূয়া খনন করে। এমতাবস্থায় তারা যতদিন সেখানে অবস্থান করবে, তারাই সেই পানির অধিক হকদার হবে। তবে অতিরিক্ত পানি পানকারীদের প্রদান করা তাদের জন্য আবশ্যক, কিন্তু সেচ বা অন্য কোনো কাজে নয়। যখন তারা সেই স্থান ত্যাগ করবে, তখন কূয়াটি সাধারণ পথচারীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ সূচনায় তা ছিল ব্যক্তিগত এবং শেষে সাধারণ। পরবর্তীতে যদি তারা পুনরায় সেখানে ফিরে আসে, তবে তারা এবং অন্যরা সমান বলে গণ্য হবে এবং যে আগে আসবে সেই অধিক হকদার হবে।

তৃতীয়ত: মালিকানার উদ্দেশ্যে নিজের জন্য কূয়া খনন করা। যতক্ষণ না খননকার্য পানি স্তর পর্যন্ত পৌঁছে পানি নির্গত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। যখন পানি নির্গত হয়, তখন ভূমি আবাদ করার (ইহ্ইয়া) পূর্ণতা সাপেক্ষে তার মালিকানা স্থির হয়। তবে যদি কূয়াটি চারপাশ থেকে বাঁধানোর প্রয়োজন হয়, তবে সেই সংস্কারকার্য মালিকানা স্থির হওয়া ও আবাদের পূর্ণতা হিসেবে গণ্য হবে। এরপর সে সেই কূয়া এবং তার সংলগ্ন নির্দিষ্ট সীমানা (হারীম)-এর মালিক হবে।

কূয়ার সংলগ্ন সীমানার (হারীম) পরিমাণ নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর মতে, এটি প্রচলিত প্রথা (উরফ) অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন: উট বা গবাদি পশুর সাহায্যে পানি তোলা হয় এমন কূয়ার (নাদিহ) হরীম হলো পঞ্চাশ যিরা (হাত)।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন: এর হরীম ষাট যিরা। তবে যদি পানি তোলার রশি আরও দীর্ঘ হয়, তবে রশির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হরীম বলে গণ্য হবে। আবু ইউসুফ আরও বলেন: পশুদের পানি পান করানোর স্থানে অবস্থিত কূয়ার (বীরুল আতান) হরীম হলো চল্লিশ যিরা। এই পরিমাপগুলো শরীয়তের অকাট্য দলীল (নস) ব্যতীত সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। যদি কোনো নস পাওয়া যায়, তবে সেটিই অনুসরণীয় হবে। অন্যথায় এটি যুক্তিগ্রাহ্য ও ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। তবে রশির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিমাপ করার একটি গ্রহণযোগ্য দিক রয়েছে যা প্রচলিত প্রথার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যখন কূয়া এবং তার হরীমের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মালিকই এর পানির অধিক হকদার হয়।১

---

১ হাম্বলী মাযহাবের ইবনে কুদামাহ আল-মাকদিসী বলেন: কেউ যদি অনাবাদি জমিতে কূয়া খনন করে, তবে সে এর হরীমের মালিক হবে। ইমাম আহমাদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নতুন খননকৃত কূয়ার (বদী) হরীম প্রতি দিকে পঁচিশ যিরা। আর যদি কেউ প্রাচীন কোনো কূয়া সংস্কার করে খনন করে, তবে এর হরীম প্রতি দিকে পঞ্চাশ যিরা। কেননা সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: হরীমের ক্ষেত্রে সুন্নাহ হলো—

(ص: 272)الأحكام السلطانية للماوردي

واختلف أصحاب الشافعي: هل يصير مالكًا له قبل استقائه وحيازته، فذهب بعضهم إلى أنَّه يجري على ملكه في قراره قبل حيازته؛ كما إذا ملك معدنًا ما فيه قبل أخذه، ويجوز بيعه قبل استقائه، ومن اتقاه بغير إذنه استرجع منه، وقال آخرون: لا يملكه إلَّا بعد الحيازة؛ لأنَّ أصله موضوع على الإباحة، وله أن يمنع من التصرف فيها باستقائه، فإن غلبه من استقاء لم يسترجع منه شيئًا، فإذا استقرَّ حكم هذه البئر في اختصاصه بملكها واستحقاقه لمائها فله سقي مواشيه وزرعه ونخيله وأشجاره، فإن لم يفضل عن كفايته فضل لم يلزمه بذلك شيء منه إلّا لمضطر على نفس.

وروى الحسن رحمه الله أن رجلًا أتى أهل ماء فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر رضي الله عنه الدية، وإن فضل منه بعد كفايته فضل لزمه -على مذهب الشافعي- أن يبذل فضل مائه للشاربة من أرباب المواشي والحيوان دون الزرع والأشجار.

وقال -من أصحابه أبو عبيدة بن جرثومة: لا يلزمه بذل الفضل منه لحيوان ولا زرع.

وقال آخرون منهم: يلزمه بذله للحيوان دون الزرع، وما ذهب إليه الشافعي من وجوب بذله للحيوان دون الزرع هو المشروع. روى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة" 1.

وبذل هذا الفضل معتبر بأربعة شروط:

أحدها: أن يكون في قرار البئر، فإن استقاه لم يلزمه بذله.

والثاني: أن يكون متصلًا بكلأ، فإن لم يقرب منَ الكلأ لم يلزمه بذله.

= البئر العادي خمسون ذراعًا، والبدي خمسة وعشرون ذراعًا، رواه أبو عبيد في الأموال، وروى الخلَّال والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال القاضي: حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها كقدر مدار الثور إن كان بدولاب، وقد طوّل البئر إن كان بالسواني وحمل التحديد في الحديث، وكلام أحمد رضي الله عنه على المجاز، والظاهر خلافه، فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء لموقف الماشية وعطن الإبل ونحوه، وأمَّا العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها، ويستضر بتملكه عليه وإن كثر. [الكافي في فقه ابن حنبل: 2/ 438] .

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب المساقاة "2353"، ومسلم في كتاب المساقاة "1566".

ইমাম শাফিঈর অনুসারীগণ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন যে, পানি তোলা এবং হস্তগত করার পূর্বেই কোনো ব্যক্তি কূয়োর পানির মালিক হয় কি না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, হস্তগত করার পূর্বে কূয়োর তলদেশে অবস্থানকালেই তা মালিকানাধীন হয়ে যায়; যেমন খনি থেকে আহরণ করার পূর্বেই তাতে বিদ্যমান সম্পদের মালিকানা অর্জিত হয়। এমতাবস্থায় পানি তোলার পূর্বেই তা বিক্রি করা বৈধ, এবং কেউ যদি অনুমতি ব্যতিরেকে তা গ্রহণ করে, তবে তা তার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া যাবে। অন্যদল বলেছেন: হস্তগত করার পূর্বে এর মালিকানা অর্জিত হয় না; কেননা এর মূল প্রকৃতি হলো সবার

জন্য উন্মুক্ত বা মুবাহ। তবে কূয়োর মালিক তার পানি গ্রহণে বাধা দেওয়ার অধিকার রাখেন। যদি কেউ তাকে পরাস্ত করে পানি তুলে নেয়, তবে তার কাছ থেকে তা আর ফেরত নেওয়া যাবে না। যখন কূয়োর মালিকানা এবং এর পানির ওপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে তার গবাদি পশু, শস্যখেত, খেজুর বাগান ও গাছপালায় তা সেচ দিতে পারবে। যদি তার নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত পানি না থাকে, তবে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে উপস্থিত কোনো মুমূর্ষু ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য পানির ব্যবস্থা করা তার ওপর আবশ্যক নয়।

হাসান রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি কোনো এক পানির মালিকদের নিকট পানি চেয়েছিল, কিন্তু তারা তাকে পানি দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় সে মারা যায়। ফলে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের ওপর দিয়ত বা রক্তপণ আবশ্যক করেন। আর যদি নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত পানি থাকে, তবে ইমাম শাফিঈর মাযহাব অনুযায়ী—গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীর পানের জন্য সেই অতিরিক্ত পানি প্রদান করা তার ওপর আবশ্যক; তবে শস্যখেত ও গাছপালার জন্য নয়।

তাঁর অনুসারীদের মধ্যে আবু উবাইদাহ বিন জারসূমাহ বলেছেন: প্রাণী বা শস্য কোনোটির জন্যই অতিরিক্ত পানি প্রদান করা মালিকের ওপর আবশ্যক নয়।

তাঁদের মধ্য থেকে অন্যদল বলেছেন: প্রাণীর জন্য প্রদান করা আবশ্যক, কিন্তু শস্যের জন্য নয়। প্রাণীর জন্য প্রদান আবশ্যক হওয়া এবং শস্যের জন্য আবশ্যক না হওয়া সম্পর্কিত ইমাম শাফিঈর এই অভিমতটিই শরয়ি বিধান অনুযায়ী প্রণীত। আবুয যিনাদ আল-আ'রাজ থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "অতিরিক্ত চারণভূমি থেকে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পানি আটকে রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর রহমতের প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করবেন।" ১।

এই অতিরিক্ত পানি প্রদানের বিষয়টি চারটি শর্তের ওপর নির্ভরশীল:

প্রথম: পানি কূয়োর তলদেশে থাকতে হবে। যদি সে পানি তুলে ফেলে, তবে তা প্রদান করা তার ওপর আর আবশ্যক থাকে না।

দ্বিতীয়: পানি চারণভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। যদি তা চারণভূমির নিকটবর্তী না হয়, তবে তা প্রদান করা আবশ্যক নয়।

= প্রাচীন কূয়োর সীমানা হলো পঞ্চাশ হাত এবং নতুন কূয়োর সীমানা পঁচিশ হাত; আবু উবাইদ 'আল-আমওয়াল' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং আল-খাল্লাল ও আদ-দারাকুতনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল-কাদি বলেন: কূয়োর চারপাশের সংরক্ষিত এলাকা বা হারিম হলো পানি তোলার জন্য যতটুকু জায়গার প্রয়োজন হয়, যেমন পানি তোলার চাকা থাকলে বলদের ঘোরার জায়গার পরিমাণ। আর পানি তোলার জন্য রশি ব্যবহার করা হলে কূয়োর গভীরতা অনুযায়ী সেই জায়গার দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হবে। হাদিসের নির্ধারিত সীমানা এবং ইমাম আহমাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তব্যকে রূপক অর্থে ধরা হয়েছে, তবে এর প্রকাশ্য অর্থ বিপরীত। কেননা গবাদি পশুর অবস্থান এবং উট বিশ্রামের জায়গাসহ পানি তোলা ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনেও কূয়োর সংরক্ষিত এলাকার দরকার হতে পারে। আর খননকৃত ঝরনার ক্ষেত্রে এর সংরক্ষিত এলাকা হলো মালিকের যতটুকু প্রয়োজন হয় এবং অন্যের মালিকানায় গেলে যতটুকুতে মালিকের ক্ষতি হতে পারে, যদিও তা পরিমাণে অধিক হয়। [আল-কাফি ফি ফিকহি ইবনি হাম্বল: ২/ ৪৩৮]।

১ সহিহ: বুখারি '২৩৫৩', মুসলিম '১৫৬৬', উভয়ই কিতাবুল মুসাকাত অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 273)الأحكام السلطانية للماوردي

والثالث: أن لا تجد المواشي غيره، فإن وجدت مباحًا غيره لم يلزمه بذله، وعدلت المواشي إلى الماء المباح، فإن كان غيره من الموجود مملوكًا لزم كل واحد من مالكي الماءين أن يبذل فضل مائه لمن ورد إليه، فإذا اكتفت المواشي بفضل أحد الماءين سقط الفرض عن الآخر.

الرابع: أن لا يكون عليه في ورد المواشي إلى مائه ضرر يلحقه في زرع ولا ماشية، فإن لحقه بورودها ضرر منعت، وجاز للرعاة استقاء فضل الماء لها، فإذا كملت هذه الشروط الأربعة لزمه بذل الفضل، وحرم عليه أن يأخذ له ثمنًا، ويجوز مع الإخلال

بهذه الشروط أن يأخذ ثمنه إذا باعه مقدرًا بكيل أو وزن، ولا يجوز أن يبيعه جزافًا ولا مقدرًا بريّ ماشية أو زرع، وإذا احتفر بئرًا أو ملكها وحريمها، ثم احتفر آخر بعد حريمها بئرًا، فنضب ماء الأول إليها وغار فيها أقرّ عليها ولم يمنع منها.

وكذلك لو حفرها لطهور فتغيّر بها ماء الأول أقرت، وقال مالك: إذا نضب ماء الأول إليها أو تغيَّر بها مُنِع منها وطُمَّت.

فصل:

وأما العيون فتنقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون مما أنبع الله تعالى ولم يستنبطه الآدميون، فحكمها حكم ما أجراه الله تعالى من الأنهار، ولمن أحيا أرضًا بمائها أن يأخذ منه قدر كفايته، فإن تشاحوا فيه لضيقه روعي ما أحيي بمائها منَ الموات، فإن تقدَّم فيه بعضهم على بعض كان لأسبقهم إحياءً أن يستوفي منها شرب أرضه ثم لمن يليه، فإن قصر الشرب عن بعضهم كان نقصانه في حق الأخير، وإن اشتركوا في الإحياء على سواء ولم يسبق به بعضهم بعضًا تخاصوا فيه إمَّا بقسمة الماء وإمَّا بالمهايأة عليه.

والقسم الثاني: أن يستنبطها الآدميون فتكون ملكًا لمن استنبطها، ويملك معها حريمها، وهو على مذهب الشافعي معتبر بالعرف المعهود في مثلها، ومقدر بالحاجة الداعية إليها، وقال أبو حنيفة: حريم العين خمسمائة ذراع، ولمستنبط هذه العين سوق مائها إلى حيث

তৃতীয়ত: গবাদি পশু যেন সেই পানি ব্যতীত অন্য কোনো পানি না পায়। যদি অন্য কোনো মুবাহ (উন্মুক্ত) পানি পাওয়া যায়, তবে তার জন্য তা প্রদান করা বাধ্যতামূলক হবে না এবং গবাদি পশু সেই মুবাহ পানির দিকেই ফিরে যাবে। আর যদি বিদ্যমান অন্য পানিটুকুও মালিকানাধীন হয়, তবে উভয় পানির মালিকের প্রত্যেকের ওপর আবশ্যিক হবে যে, যে ব্যক্তি তার কাছে আসবে তাকে নিজ পানির অতিরিক্ত অংশ দান করা। অতঃপর যদি গবাদি পশুর চাহিদা কোনো একজনের পানির অতিরিক্ত অংশ দ্বারাই মিটে যায়, তবে অপরজনের ওপর থেকে সেই আবশ্যকতা রহিত হয়ে যাবে।

চতুর্থত: তার পানির নিকট গবাদি পশু আনয়নে তার শস্যক্ষেত বা গবাদি পশুর কোনো প্রকার ক্ষতি সাধিত না হওয়া। যদি পশু আনয়নের ফলে তার ক্ষতি হয়, তবে তাদের বাধা প্রদান করা হবে। এমতাবস্থায় রাখালদের জন্য পানির অতিরিক্ত অংশ সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া বৈধ। যখন এই চারটি শর্ত পূর্ণ হবে, তখন তার জন্য অতিরিক্ত পানি দান করা বাধ্যতামূলক হবে এবং এর বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করা তার জন্য হারাম হবে। তবে এই শর্তগুলোর কোনো একটির অনুপস্থিতিতে এর মূল্য গ্রহণ করা বৈধ হবে যদি সে তা পরিমাপ বা ওজনের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে বিক্রয় করে। কিন্তু অনুমানের ভিত্তিতে অথবা গবাদি পশু বা শস্যক্ষেত পরিতৃপ্ত হওয়ার শর্তে তা বিক্রয় করা বৈধ হবে না। আর যদি কেউ একটি কূপ খনন করে অথবা সেটির ও সেটির হারিমের (পার্শ্ববর্তী সংরক্ষিত এলাকা) মালিক হয়, অতঃপর অন্য কেউ সেই হারিমের সীমানার বাইরে অপর একটি কূপ খনন করে এবং এর ফলে প্রথম ব্যক্তির কূপের পানি দ্বিতীয়টিতে চলে আসে বা শুকিয়ে যায়, তবে তাকে তার অবস্থায় বহাল রাখা হবে এবং বাধা দেওয়া হবে না। অনুরূপভাবে যদি পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কূপ খনন করার ফলে প্রথম কূপের পানির গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তাও বহাল রাখা হবে। ইমাম মালিক বলেন: যদি প্রথম কূপের পানি দ্বিতীয়টির দিকে চলে আসে অথবা এর কারণে পানির পরিবর্তন ঘটে, তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে এবং সেটি ভরাট করে ফেলা হবে।

পরিচ্ছেদ:

প্রস্রবণ বা ঝরনা তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথমত: যা মহান আল্লাহ উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ তা খনন বা নিষ্কাশন করেনি। এগুলোর বিধান মহান আল্লাহর প্রবাহিত নদ-নদীর বিধানের অনুরূপ। যে ব্যক্তি এই ঝরনার পানি দিয়ে কোনো অনাবাদী জমি আবাদ করবে, সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পানি গ্রহণ করতে পারবে। যদি পানির স্বল্পতার কারণে তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়, তবে সেই ঝরনার পানি দ্বারা আবাদকৃত জমিগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। যদি তাদের কেউ অগ্রবর্তী হয়, তবে সর্বপ্রথম আবাদকারী ব্যক্তি তার জমির সেচ পূর্ণরূপে গ্রহণ করবে, অতঃপর তার পরবর্তী জন। যদি পানি সবার জন্য পর্যাপ্ত না হয়, তবে ঘাটতি সর্বশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর যদি তারা সবাই সমানভাবে আবাদ শুরু করে থাকে এবং কেউ কারো অগ্রবর্তী না হয়, তবে তারা পানির বণ্টনের মাধ্যমে অথবা পর্যায়ক্রমে ব্যবহারের (মুহাইয়্যাত) মাধ্যমে এর ফয়সালা করবে।

দ্বিতীয় প্রকার: যা মানুষ স্বয়ং খনন বা নিষ্কাশন করেছে; এটি সেই ব্যক্তির মালিকানা বলে গণ্য হবে যে তা নিষ্কাশন করেছে এবং সে এর সাথে এর হারিমেরও মালিক হবে। ইমাম শাফেঈর মাযহাব অনুযায়ী, এর হারিম প্রচলিত প্রথা দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং এর প্রয়োজনীয়তার নিরিখে তা পরিমাপ করা হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: ঝরনার হারিম হলো পাঁচশত হাত। এই ঝরনা নিষ্কাশনকারীর জন্য এর পানি প্রবাহিত করে নিয়ে যাওয়ার অধিকার রয়েছে যেখানে সে ইচ্ছা করে।

شاء، وكان ما جرى فيه ماؤها ملكًا له وحريمه1.

والقسم الثالث: أن يستنبطها الرجل في ملكه، فيكون أحق بمائها لشرب أرضه؛ فإن كان قدر كفايتها فلا حق عليه فيه إلَّا لشارب مضطَّر، وإن فضل عن كفايته وأراد أن يحيي بفضله أرضًا مواتًا فهو أحق به لشرب ما أحياه، وإن لم يرده لموات أحياه بذله لأرباب المواشي دون الزرع كفضل ماء البئر، فإن اعتاض عليه من أرباب الزرع جاز، وإن اعتاض من أرباب المواشي لم يجز، ويجوز لمن احتفر في البادية بئرًا فملكها أو عينًا استنبطها أن يبيعها، ولا يحرم عليه ثمنها. وقال سعيد بن المسيب وابن أبي ذئب: لا يجوز له بيعها ويحرم ثمنها. وقال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد: إن باعها لرغبة جاز، وإن باعها لخلاء لم يجز، وكان أقرب الناس إلى المالك أحق بها بغير ثمن، فإن رجع الخالي فهو أملك لها.

---

1 انظر: المبسوط للسرخسي [23/ 162] ، والإنصاف للمرداوي [6/ 371] .

...ইচ্ছা করেন, এবং তাতে যে স্থানে এর পানি প্রবাহিত হয় তা তার এবং এর সংলগ্ন ভূমির (হারিম) মালিকানাধীন হবে।১

তৃতীয় প্রকার: কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব মালিকানাধীন ভূমিতে পানি আহরণ করল বা ঝরনাধারা বের করল, এমতাবস্থায় সে তার জমির সেচের জন্য সেই পানির সর্বাধিক হকদার হবে; যদি পানি তার প্রয়োজনের সমপরিমাণ হয়, তবে চরম বিপন্ন তৃষ্ণার্থ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো এতে কোনো অধিকার থাকবে না; আর যদি তা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় এবং সে সেই অতিরিক্ত পানি দিয়ে কোনো অনাবাদী ভূমি আবাদ করতে চায়, তবে সেই আবাদকৃত ভূমির সেচের জন্য সে-ই সেই পানির সর্বাধিক হকদার হবে; আর যদি সে তা কোনো অনাবাদী ভূমি আবাদের উদ্দেশ্যে না চায়, তবে কূপের অতিরিক্ত পানির ন্যায় সে তা গবাদি পশুর মালিকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে, কৃষিজমির জন্য নয়; এমতাবস্থায় সে যদি কৃষিজমির মালিকদের কাছ থেকে এর বিনিময়ে কোনো প্রতিদান গ্রহণ করে তবে তা জায়েয হবে, কিন্তু গবাদি পশুর মালিকদের কাছ থেকে প্রতিদান গ্রহণ করলে তা জায়েয হবে না। আর যে ব্যক্তি মরুভূমিতে কোনো কূপ খনন করে তার মালিক হলো অথবা কোনো ঝরনাধারা বের করল, তার জন্য তা বিক্রি করা জায়েয এবং তার নিকট এর বিক্রয়লব্ধ মূল্য হারাম নয়। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এবং ইবনে আবি যিব বলেন: তার জন্য তা বিক্রি করা জায়েয নয় এবং এর মূল্য গ্রহণ করা হারাম। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এবং আবুয যিনাদ বলেন: যদি সে তা অন্যের ব্যবহারের আগ্রহের কারণে বিক্রি করে তবে তা জায়েয, আর যদি সে তা কেবল স্থানটি ছেড়ে যাওয়ার কারণে (অন্যের প্রয়োজনহীন অবস্থায়) বিক্রি করে তবে তা জায়েয নয়; এমতাবস্থায় মালিকের নিকটতম ব্যক্তি মূল্য ছাড়াই এর সর্বাধিক হকদার হবে, তবে যদি স্থান ত্যাগকারী ব্যক্তি পুনরায় ফিরে আসে তবে সে-ই এর মালিকানার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হবে।

---

১ দেখুন: আস-সারাখসি রচিত আল-মাবসুত [২৩/ ১৬২], এবং আল-মারদাউয়ি রচিত আল-ইনসাফ [৬/ ৩৭১]।

الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق

وحمى الموات هو المنع من إحيائه إملاكًا؛ ليكون مستبقى الإباحة لنبت الكلأ ورعي المواشي.

قد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وصعد جبلًا بالبقيع.

قال أبو عبيد: هو النقيع1بالنون2.

وقال: "هذا حماي -وأشار بيده إلى القاع"3.

وهو قدر ميل في ستة أميال حماه لخيل المسلمين من الأنصار والمهاجرين، فأمَّا حمى الأئمة من بعده، فإن حموا به جميع الموات أو أكثره لم يجز؛ وإن حموا أقله لخاص من الناس أو لأغنيائهم لم يجز.

وإن حموه لكافَّة المسلمين أو للفقراء والمساكين ففي جوازه قولان:

أحدهما: لا يجوز ويكون الحمى خاصًّا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لرواية الصعب بن جثامة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حمى البقيع قال: "لا حمى إلّا لله ولرسوله" 4.

---

1 النقيع بالنون: موضع ينتقع فيه ماء فيكثر فيه الخصب.

قال ابن مفلح الحنبلي: وللإمام أن يحمي -بفتح أوله وضمه- أي: يمنع أرضًا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل المجاهدين وإبل الصدقة وضوال الناس؛ لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين. رواه أبو عبيد. [المبدع: 5/ 264] .

3 لم أقف عليه.

4 صحيح: رواه البخاري في كتاب المساقاة "2370"، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة "3083"، وأحمد "27809".

قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين؛ أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلَّا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر: معناه: إلَّا على مثل ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الأوَّل ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحِمَى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة خاصة، وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أنَّ له في هذا قولين، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ، لكن رجَّحوا الأول، والمراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة =

ষোড়শ পরিচ্ছেদ: চারণভূমি সংরক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধা প্রসঙ্গে

অনাবাদী ভূমি 'হিমা' (সংরক্ষণ) করার অর্থ হলো ব্যক্তিগত মালিকানা লাভের উদ্দেশ্যে তা আবাদ করা নিষিদ্ধ করা; যেন তা তৃণলতা জন্মানো এবং গবাদি পশু চরাচরের জন্য সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় চারণভূমি সংরক্ষণ করেছেন এবং তিনি বাক্বী'র একটি পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন।

আবু উবাইদ বলেন: এটি হলো 'নাক্বী' (নুন বর্ণের মাধ্যমে)।

এবং তিনি বললেন: "এটি আমার সংরক্ষিত এলাকা" - এবং তিনি তাঁর হাত দিয়ে সমতল ভূমির দিকে ইশারা করলেন।

এটি ছিল এক মাইল প্রস্থ এবং ছয় মাইল দীর্ঘ এলাকা, যা তিনি আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে মুসলিমদের ঘোড়াগুলোর জন্য সংরক্ষিত করেছিলেন। তবে তাঁর পরবর্তী ইমামদের (শাসকদের) চারণভূমি সংরক্ষণের বিধান হলো: যদি তারা সমস্ত অনাবাদী ভূমি বা তার অধিকাংশ এলাকা সংরক্ষিত করে ফেলে, তবে তা বৈধ হবে না; আর যদি তারা নির্দিষ্ট একদল মানুষের জন্য বা ধনীদের জন্য সামান্য অংশও সংরক্ষিত করে, তাও বৈধ হবে না।

আর যদি তারা তা সকল মুসলিমের জন্য অথবা দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের জন্য সংরক্ষিত করে, তবে এর বৈধতার ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি: এটি বৈধ নয় এবং ভূমি সংরক্ষণ করা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নির্দিষ্ট একটি বিশেষ অধিকার; কারণ সা'ব বিন জাসসামাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাক্বী' এলাকাটি সংরক্ষিত করেছিলেন তখন

বলেছিলেন: "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ব্যতীত আর কারও জন্য ভূমি সংরক্ষণ করার অধিকার নেই।"

---

১. নাক্বী' (নুন বর্ণের মাধ্যমে): এমন একটি স্থান যেখানে পানি জমা হয়, ফলে সেখানে প্রচুর ঘাস ও উর্বরতা সৃষ্টি হয়।

ইবনে মুফলিহ আল-হাম্বলি বলেন: ইমামের জন্য 'হিমা' (সংরক্ষণ) করার অধিকার রয়েছে—অর্থাৎ অনাবাদী ভূমির নির্দিষ্ট অংশকে নিষিদ্ধ করা যাতে সেখানে মুসলিমদের সেই সকল পশু বিচরণ করতে পারে যেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁর ওপর, যেমন- মুজাহিদদের ঘোড়া, যাকাতের উট এবং মানুষের হারিয়ে যাওয়া পশু; কেননা উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের ঘোড়ার জন্য নাক্বী' এলাকাটি সংরক্ষিত করেছিলেন। আবু উবাইদ এটি বর্ণনা করেছেন। [আল-মুবদি: ৫/২৬৪]।

৩. আমি এই উক্তিটির কোনো উৎস খুঁজে পাইনি।

৪. সহিহ: বুখারি এটি 'কিতাবুল মুসাক্বাত' (২৩৭০), আবু দাউদ 'কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারা' (৩০৮৩) এবং আহমদ (২৭৮০৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শাফিঈ বলেন: এই হাদিসের অর্থ দুটি হতে পারে; একটি হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা সংরক্ষিত করেছেন তা ব্যতীত অন্য কারও জন্য সাধারণ মুসলিমদের পক্ষ থেকে ভূমি সংরক্ষিত করার অধিকার নেই। অন্যটি হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে সংরক্ষণ করেছেন, ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতীত অন্যভাবে সংরক্ষণ করা যাবে না। প্রথম অর্থ অনুযায়ী, তাঁর পরবর্তী কোনো শাসকেরই ভূমি সংরক্ষণ করার অধিকার নেই। আর দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী, সংরক্ষণের বিষয়টি সেই ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন, আর তিনি হলেন বিশেষভাবে খলিফা। ইমাম শাফিঈর অনুসারীগণ এখান থেকে গ্রহণ করেছেন যে, এই বিষয়ে তাঁর দুটি অভিমত রয়েছে; তাঁদের নিকট দ্বিতীয়টি অগ্রগণ্য এবং প্রথমটি শব্দের প্রকাশ্য অর্থের নিকটবর্তী, তবে তাঁরা প্রথমটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর হিমা বা সংরক্ষণ বলতে উদ্দেশ্য হলো উন্মুক্ত ভূমির কোনো নির্দিষ্ট অংশে গবাদি পশু চরা নিষিদ্ধ করা, যা ইমাম বা শাসক নির্দিষ্ট করে দেবেন।

والقول الثاني: أن حمى الأئمة بعده جائز كجوازه له؛ لأنه كان يفعل ذلك لصلاح المسلمين لا لنفسه، فكذلك مَنْ قام مقامه في مصالحهم، قد حمى أبو بكر رضي الله عنه بالربذة لأهل الصدقة، واستعمل عليه مولاه أبا سلامة.

وحمى عمر رضي الله عنه من الشرف مثل ما حماه أبو بكر من الربذة، وولى عليه مولًى له يقال له: هني، وقال: يا هني ضمَّ جناحك عن الناس، واتَّقِ دعوة المظلوم فإنَّ دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة يأتيني بعياله فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبالك، فالكلأ أهون عليَّ من الدينار والدرهم، والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا1.

فأمَّا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلَّا لله ولرسوله"، فمعناه: لا حمى إلَّا على مثل ما

= برعي بهائم الصدقة مثلًا، وأصل الحمى عند العرب أنَّ الرئيس منهم كان إذا نزل منزلًا مخصبًا استعوى كلبًا على مكان عالٍ، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب، فلا يرعى فيه غيره، ويرعى هو من غيره فيما سواه، والحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح، ومعناه: أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات؛ ليتوفر فيه الكلأ، فترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها، والأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالخليفة، ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم، ومحل الجواز مطلقًا أن لا يضر بكافة المسلمين، واستدلَّ به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات. [انظر: فتح الباري: 5/ 44] .

1 قال الشافعي في معني قول عمر: إني قد ظلمتهم، إنَّها لبلادهم قاتوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، إنهم يقولون: إن منعت لأحد من أحد فمن قاتل عليها وأسلم أولى أن تمنع له، وهذا كما قال: لو كانت تمنع لخاصة فلما كان لعامة لم يكن في هذا -إن شاء الله- مظلمة. وقول عمر: لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين بلادهم شبرًا، إني لم أحمها لنفسي ولا لخاصَّتي، وإني حميتها لمال الله أحمل عليه في سبيل الله، وكانت من أكثر ما عنده مما يحتاج إلى الحمى، فنسب الحمى إليها لكثرتها.

وقد أدخل الحمى خيل الغزاة في سبيل الله، فلم يكن ما حمي ليحمل عليه أولى بما عنده من الحمى مما تركه أهله، ويحملوه عليها في سبيل الله؛ لأنَّ كلًّا لتعزيز الإسلام، وأدخل فيها إبل الضوالّ؛ لأنها قليل لعوام من أهل البلدان، وأدخل فيها ما فضل من سهمان أهل الصدقة من إبل الصدقة، وهم عوام من المسلمين يحتاجون إلى ما جعل لهم مع إدخاله من ضعف عن النجعة ممن قلَّ ماله، وفي تماسك أموالهم عليهم غنًى عن أن يدخلوا على أهل الفيء من المسلمين، وكل هذا وجه عام النفع للمسلمين. [الأم: 4/ 48] .

দ্বিতীয় অভিমত হলো: তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ) পরবর্তী ইমামদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা (হিমা) নির্ধারণ করা বৈধ, যেমনটি তাঁর জন্য বৈধ ছিল। কারণ তিনি তা নিজের স্বার্থে নয়, বরং মুসলমানদের কল্যাণের জন্য করতেন। অতএব, যারা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে জনস্বার্থ দেখাশোনা করবেন, তাদের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। আবু বকর (রা.) 'রাবাদাহ' নামক স্থানে সদকার পশুর জন্য সংরক্ষিত এলাকা নির্ধারণ করেছিলেন এবং তার তত্ত্বাবধানে তাঁর মুক্তদাস আবু সালামাহকে নিযুক্ত করেছিলেন।

উমর (রা.) 'শারাফ' নামক স্থানে সংরক্ষিত এলাকা তৈরি করেছিলেন, ঠিক যেমন আবু বকর 'রাবাদাহ'-তে করেছিলেন। তিনি সেখানে তাঁর জনৈক মুক্তদাসকে নিযুক্ত করেন যার নাম ছিল হুনায়। তিনি বলেন: "হে হুনায়, মানুষের প্রতি তোমার হাত সংকুচিত রেখো (নম্র থেকো) এবং মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো, কারণ মজলুমের দোয়া কবুল হয়ে যায়। অল্প সংখ্যক উট ও মেষের মালিককে (সংরক্ষিত চারণভূমিতে) প্রবেশের অনুমতি দিয়ো, তবে ইবনে আফফান ও

ইবনে আউফের গবাদিপশু থেকে দূরে থেকো। কারণ তাদের গবাদিপশু ধ্বংস হয়ে গেলেও তারা তাদের খেজুর বাগান ও ফসলি জমিতে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু সেই সামান্য সম্বলধারী দরিদ্র ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজন নিয়ে আমার কাছে এসে বলবে: 'হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি কি আমাদের এভাবেই ছেড়ে দেবেন?' আমি তো তাকে ছেড়ে দিতে পারি না। তাই তাদের জন্য চারণভূমি ছেড়ে দেওয়া আমার কাছে তাদের দিনার ও দিরহাম (বায়তুল মাল থেকে সাহায্য দেওয়া) অপেক্ষা সহজ। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি আল্লাহর পথে জিহাদের বাহনগুলোর প্রয়োজন না থাকত, তবে আমি তাদের এলাকার এক বিঘত জমিও সংরক্ষিত করতাম না।"১

আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কারো জন্য কোনো সংরক্ষিত এলাকা (হিমা) নেই" এর অর্থ হলো: এমন বিষয় ব্যতীত কোনো হিমা নেই যা

= উদাহরণস্বরূপ সদকার পশু চরানো। আর আরবদের নিকট 'হিমা'-এর মূল রীতি ছিল যে, তাদের কোনো গোত্রপতি যখন কোনো উর্বর স্থানে অবতরণ করত, তখন সে কোনো উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে একটি কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করাত। কুকুরটির আওয়াজ যতদূর পর্যন্ত যেত, সে সব দিক থেকে সেই এলাকাটি সংরক্ষিত করে নিত। ফলে সেখানে অন্য কেউ পশু চরাতে পারত না, কিন্তু সে নিজে অন্যের চারণভূমিতে চরাতে পারত। 'হিমা' বলতে সংরক্ষিত স্থানকে বোঝায় যা সর্বসাধারণের ব্যবহারের (মুবাহ) বিপরীত। এর অর্থ হলো: ঘাস ও পশুখাদ্যের প্রাচুর্য বজায় রাখার জন্য সেই অনাবাদী জমি আবাদ করা থেকে বিরত রাখা, যাতে নির্দিষ্ট গবাদিপশু সেখানে চরতে পারে এবং অন্যদের তা থেকে বিরত রাখা হয়। শাফেয়ী মাযহাবের অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতানুসারে, 'হিমা' নির্ধারণের অধিকার কেবল খলিফার। কেউ কেউ প্রাদেশিক গভর্নরদেরও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে এর বৈধতার শর্ত হলো এটি যেন সাধারণ মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর না হয়। ইমাম ত্বহাবী অনাবাদী জমি আবাদের ক্ষেত্রে ইমাম বা শাসকের অনুমতির শর্তযুক্ত করার সপক্ষে এখান থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন। [দেখুন: ফাতহুল বারী: ৫/৪৪]।

১ উমরের উক্তির ব্যাখ্যায় ইমাম শাফেয়ী বলেন: তাঁর এই কথার অর্থ যে, "আমি তাদের প্রতি জুলুম করেছি" তা হলো—এগুলো তাদেরই এলাকা ছিল, জাহেলি যুগেও তারা এখানে জীবনধারণ করত এবং ইসলাম গ্রহণের পরও এখানেই ছিল। তারা বলতে পারে: আপনি যদি একজনের সুবিধা দিতে গিয়ে অন্যকে বাধা দেন, তবে যারা এই ভূমির জন্য লড়াই করেছে

এবং এর ওপর ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারাই এর মালিক হওয়ার ও অন্যের প্রবেশাধিকার রোধ করার অধিক হকদার। ইমাম শাফেয়ী আরও বলেন: যদি এটি বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত হতো (তবে তা অন্যায় হতো), কিন্তু যেহেতু এটি সাধারণের (জনস্বার্থের) জন্য ছিল, তাই ইনশাআল্লাহ এতে কোনো জুলুম নেই। আর উমরের উক্তি: "আল্লাহর পথে জিহাদের বাহনগুলোর প্রয়োজন না থাকত, তবে আমি মুসলমানদের জন্য এক বিঘত জমিও সংরক্ষিত করতাম না"—এর অর্থ হলো, আমি এটি নিজের বা আমার কোনো ঘনিষ্ঠজনের জন্য সংরক্ষিত করিনি; বরং আমি আল্লাহর সম্পদের (জিহাদের বাহন) জন্য এটি সংরক্ষিত করেছি। তাঁর কাছে এমন অনেক পশু ছিল যার জন্য সংরক্ষিত চারণভূমির প্রয়োজন ছিল, তাই পশুর আধিক্যের কারণে তিনি হিমা-কে সেদিকেই সম্বন্ধিত করেছেন।

তিনি সেই সংরক্ষিত এলাকায় জিহাদীদের ঘোড়াগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কারণ যে পশুদের জন্য চারণভূমি সংরক্ষিত করা হয়েছে, সেগুলো তো তাঁর কাছে থাকা অন্য পশুদের চেয়ে বেশি অগ্রগণ্য নয় যাদেরকে তাদের মালিকরা ছেড়ে দিয়েছে যাতে তারা আল্লাহর পথে সেগুলোতে আরোহণ করতে পারে। কেননা সবকিছুই ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির জন্য। তিনি এতে হারিয়ে যাওয়া উটগুলোকেও (যা সরকারি হেফাজতে থাকে) অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন; কারণ সেগুলো সাধারণ নগরবাসীদের জন্য সামান্য সম্পদ। এছাড়া তিনি এতে জাকাতের পশুর অবশিষ্টাংশও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যারা সাধারণ দরিদ্র মুসলমান এবং তাদের জন্য নির্ধারিত সম্পদের মুখাপেক্ষী। আর তাদের সম্পদ সুরক্ষার মাধ্যমে তাদের অভাব মোচন হয় যাতে তারা মুসলমানদের 'ফায়' (লব্ধ সম্পদ) গ্রহণকারীদের ওপর বোঝা না হয়ে দাঁড়ায়। এগুলোর প্রতিটিই মুসলমানদের জন্য সাধারণ কল্যাণের দিক। [আল-উম্ম: ৪/৪৮]।

(ص: 277)الأحكام السلطانية للماوردي

حماه الله ورسوله للفقراء والمساكين ولمصالح كافَّة المسلمين؛ لا على مثل ما كانوا عليه في الجاهلية من تفرُّد العزيز منهم بالحمى لنفسه، كالذي كان يفعله كليب بن وائل؛ فإنه كان يوافي بكلب على نشاز من الأرض، ثم يستعديه ويحمي ما انتهى

إليه عواؤه من كل الجهات، ويشارك الناس فيما عداه، حتى كان ذلك سبب قتله، وفيه يقول العباس بن مرداس "من الطويل":

كما كان يبغيها كليب بظلمه ... من العز حتى طاح وهو قتيلها

على وائل إذ يترك الكلب نابحًا ... وإذ يمنع الأقناء منها حلولها

وإذا جرى على الأرض حكم الحمى استبقاء لمواتها سابلًا ومنعًا من إحيائها ملكًا روعي حكم المحمي، فإن كان للكافَّة تساوى فيه جميعهم من غنيّ وفقير ومسلم وذمي في رعي كلئهم بخيلهم وماشيتهم، فإن خص به المسلمون اشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم، ومنع منهم أهل الذمة؛ وإن خص به الفقراء والمساكين منع منه الأغنياء وأهل الذمة، ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء، ولا أهل الذمة دون المسلمين، وإن خص به نعم الصدقة أو خيل المجاهدين لم يشركهم فيه غيرهم، ثم يكون الحمى جاريًا على ما استقرَّ عليه من عموم وخصوص، فلو اتَّسع الحمى المخصوص لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه؛ لارتفاع الضرر عمَّن خص به، ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم، وفي جواز اختصاص فقرائهم به وجهان، وإذا استقرَّ حكمٌ لحمًى على أرض فأقدم عليها من أحياها ونقض حماها روعي الحمى، فإن كان مما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحِمَى ثابتًا والإحياء باطلًا والمتعرّض لإحيائه مردودًا مزجورًا، لا سيما إذا كان سبب الحمى باقيًا؛ لأنه لا يجوز أن يعارض حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقض ولا إبطال.

وإن كان من حمى الأئمة بعده ففي إقرار إحيائه قولان:

أحدهما: لا يقر ويجري عليه الحمى كالذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه حكم نفذ بحق.

والقول الثاني: يقر الإحياء ويكون حكمه أثبت من الحمى؛ لتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم-

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত এবং সাধারণ মুসলিমদের জনস্বার্থে চারণভূমি সংরক্ষিত করেছেন; এটি জাহেলিয়াত আমলের প্রথার মতো নয়, যেখানে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি একচ্ছত্রভাবে নিজের জন্য চারণভূমি দখল করে রাখত, যেমনটি কুলাইব ইবনে ওয়ায়িল করত; সে কোনো উঁচু ভূমিতে একটি কুকুর নিয়ে যেত, তারপর তাকে ঘেউ ঘেউ করাত এবং সব দিক থেকে তার ডাক যে পর্যন্ত পৌঁছাত, সেই সীমানা পর্যন্ত সে নিজের জন্য সংরক্ষিত করে নিত। এর বাইরের অংশে সে মানুষকে শরিক হতে দিত, পরিশেষে এটাই তার নিহত হওয়ার কারণ হয়েছিল। তার সম্পর্কে আব্বাস ইবনে মিরদাস (তিলওয়াল ছন্দে) বলেন:

যেমনটি কুলাইব তার অন্যায়ের মাধ্যমে আভিজাত্য অন্বেষণ করেছিল ... পরিশেষে সে নিজেই সেটার শিকার হয়ে নিহত হলো।

ওয়ায়িল গোত্রের ওপর যখন সে কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করতে ছেড়ে দিত ... এবং এর বাগানগুলোতে অন্যদের বসতি স্থাপনে বাধা দিত।

যখন কোনো ভূমিতে এই উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত চারণভূমির বিধান জারি করা হয় যে, এর অনাবাদী ভূমি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং ব্যক্তিগত আবাদের মাধ্যমে মালিকানা অর্জন থেকে বিরত রাখা হবে, তখন সেই সংরক্ষিত এলাকার বিধানসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। যদি তা সর্বসাধারণের জন্য হয়, তবে ধনী-দরিদ্র, মুসলিম এবং জিম্মি নির্বিশেষে সবাই তাদের ঘোড়া ও গবাদিপশু চরাবার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাবে। যদি তা কেবল মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট হয়, তবে তাদের ধনী-দরিদ্র সবাই এতে শরিক হতে পারবে এবং জিম্মিদের তা থেকে বিরত রাখা হবে। যদি তা কেবল দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্য নির্দিষ্ট হয়, তবে ধনী এবং জিম্মিদের সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। দরিদ্রদের বাদ দিয়ে কেবল ধনীদের জন্য কিংবা মুসলিমদের বাদ দিয়ে কেবল জিম্মিদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা নির্দিষ্ট করা জায়েজ নয়। আর যদি তা কেবল সদকার গবাদিপশু অথবা মুজাহিদদের ঘোড়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়, তবে অন্য কেউ তাদের সাথে অংশীদার হতে পারবে না। অতঃপর চারণভূমিটি তার নির্ধারিত সাধারণ বা বিশেষ বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। যদি বিশেষ উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত ভূমিটি সাধারণ মানুষের জন্য ব্যবহারের উপযোগী পর্যাপ্ত প্রশস্ত হয়, তবে অন্যরাও তাতে শরিক হতে পারবে; কারণ এতে সেই বিশেষ শ্রেণির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। কিন্তু যদি সাধারণ চারণভূমিটি সবার ব্যবহারের তুলনায় সংকুচিত হয়ে যায়, তবে কেবল ধনীদের জন্য তা নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। তবে কেবল দরিদ্রদের জন্য তা নির্দিষ্ট করা যাবে কি না, সে বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। যখন কোনো ভূমিতে সংরক্ষিত

চারণভূমির বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, অতঃপর কেউ এসে সেখানে আবাদ শুরু করে এবং তার সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভঙ্গ করতে চায়, তবে সেই সংরক্ষিত ভূমির ধরন দেখা হবে। যদি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সংরক্ষিত ভূমি হয়, তবে সেই সংরক্ষণ ব্যবস্থা অটুট থাকবে এবং নতুন করে করা আবাদ বা মালিকানা দাবি বাতিল বলে গণ্য হবে; আর যে ব্যক্তি এর সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভঙ্গ করতে আসবে তাকে কঠোরভাবে প্রতিহত ও তিরস্কার করা হবে। বিশেষ করে যদি সংরক্ষণের মূল কারণটি তখনও বিদ্যমান থাকে; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো নির্দেশ বাতিল বা নাকচ করে দেওয়া জায়েজ নয়। আর যদি তা তাঁর পরবর্তী ইমামগণের (খলিফাদের) সংরক্ষিত ভূমি হয়, তবে সেখানে আবাদকারীর আবাদ বহাল রাখার বিষয়ে দুটি মত রয়েছে:
প্রথমত: তার আবাদ বহাল রাখা হবে না, বরং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংরক্ষিত ভূমির মতোই সংরক্ষিত থাকবে; কারণ এটি একটি আইনগত অধিকারের ভিত্তিতে কার্যকর করা হয়েছে।
দ্বিতীয়ত: তার আবাদ বহাল রাখা হবে এবং এই আবাদের হুকুম চারণভূমির সংরক্ষণের হুকুমের চেয়েও শক্তিশালী হবে; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুস্পষ্ট বাণী অনুযায়ী-

---

(ص: 278)الأحكام السلطانية للماوردي

بقوله: "من أحيا أرضًا مواتًا فهي له" 1، ولا يجوز لأحدٍ من الولاة أن يأخذ من أرباب المواشي عوضًا عن مراعي موات أو حِمَى؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والنار والكلأ" 2.

---

1 صحيح: رواه مالك في كتاب الأقضية من موطئه "1456"، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة "3073"، والترمذي في كتاب الأحكام "1378".

قال الحافظ ابن حجر: حديث "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" البخاري من طريق عروة عن عائشة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها"، قال عروة: وقضى بها عمر في خلافته. وأخرجه أبو يعلى والدارقطني والطيالسي وابن عدي من وجه آخر عن عروة، عن عائشة بلفظ: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له"، وعن عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي مليكة، عن عروة، عن عبد الملك بن مروان عن أبيه به، ورجال إسناده ثقات، وفي الباب عن جابر أخرجه الترمذي والنسائي من رواية أيوب عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان عنه بلفظ: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" وخالفه وكيع عن هشام فقال عن ابن أبي رافع عن جابر، أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر، وعن فضالة بن عبيد رفعه: "الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، من أحيا أرضًا مواتًا فهي له" أخرجه الطبراني في الأوسط. وعن عمرو بن عوف كالأول أخرجه البزار وابن أبي شيبة والطبراني وابن عدي وعن ابن عباس نحوه، أخرجه الطبراني في الكبير. [الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2/ 244] .

والحديث صحَّحه الشيخ الألباني.

2 صحيح: رواه أبو داود في كتاب البيوع "3477"، وأحمد "22573".

قال الزيلعي: روي من حديث رجل، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث ابن عمر، فحديث الرجل أخرجه أبو داود في سننه في البيوع عن حريز بن عثمان عن أبي خداش بن حبان بن زيد عن رجل من الصحابة قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار" انتهى. ورواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنَّفه في الأقضية، وأسند بن عدي في الكامل عن أحمد وابن معين أنَّهما قالا في حريز: ثقة. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود قال: لا أعلم رَوَى عن أبي خداش إلّا حريز بن عثمان، وقد قيل فيه: مجهول. انتهى. قال البيهقي في المعرفة:

وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، وترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضرّ إن لم يعارضه ما هو أصحّ منه، انتهى.

وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه في سننه في الأحكام عن عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار وثمنه حرام" انتهى.

=

তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: "যে ব্যক্তি কোনো মৃত (অনাবাদী) ভূমি আবাদ করবে, সেটি তাঁর হবে" ১, এবং কোনো শাসকের জন্য পশুপালকদের থেকে অনাবাদী চারণভূমি বা সংরক্ষিত চারণভূমির বিনিময়ে কোনো প্রতিদান গ্রহণ করা বৈধ নয়; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুসলিমগণ তিনটি বিষয়ে অংশীদার: পানি, আগুন ও ঘাস (তৃণলতা)" ২।

---

১ সহীহ: মালিক তাঁর মুয়াত্তার 'বিচার অধ্যায়ে' (১৪৫৬), আবু দাউদ 'খারাজ ও ইমারাহ অধ্যায়ে' (৩০৭৩) এবং তিরমিযী 'আহকাম অধ্যায়ে' (১৩৭৮) এটি বর্ণনা করেছেন।
হাফিয ইবনে হাজার বলেন: "যে ব্যক্তি মৃত ভূমি আবাদ করবে সেটি তাঁর" হাদিসটি বুখারীতে উরওয়ার সূত্রে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি এমন ভূমি আবাদ করবে যা কারো মালিকানাধীন নয়, সে-ই তার অধিক হকদার।" উরওয়া বলেন: ওমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে এর ভিত্তিতে ফয়সালা দিয়েছেন। আবু ইয়ালা, দারাকুতনী, তায়ালিসি এবং ইবনে আদি অন্য সূত্রে উরওয়া থেকে, তিনি আয়েশা (রা.) থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি মৃত ভূমি আবাদ করবে সেটি তাঁর।" আর আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে তাবারানী 'আল-আওসাত'-এ ইবনে আবি মুলাইকার সূত্রে উরওয়া থেকে, তিনি আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান থেকে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য। এ প্রসঙ্গে জাবির (রা.) থেকেও হাদিস রয়েছে যা তিরমিযী ও নাসাঈ আইয়ুবের সূত্রে হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে, তিনি ওয়াহাব ইবনে কায়সান থেকে তাঁর সূত্রে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি মৃত ভূমি আবাদ করবে সেটি তাঁর।" তবে ওকি' হিশাম থেকে এর বিপরীতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে আবি রাফে'র সূত্রে জাবির

(রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন; যা ইবনে আবি শায়বা বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান অন্য সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ফাদালাহ ইবনে উবাইদ (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "জমিন আল্লাহর জমিন, আর বান্দারা আল্লাহর বান্দা; যে ব্যক্তি কোনো মৃত ভূমি আবাদ করবে সেটি তাঁর।" এটি তাবারানী 'আল-আওসাত'-এ বর্ণনা করেছেন। আমর ইবনে আউফ (রা.) থেকেও প্রথমটির মতো বর্ণিত হয়েছে যা বাজ্জার, ইবনে আবি শায়বা, তাবারানী ও ইবনে আদি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে যা তাবারানী 'আল-কাবীর'-এ বর্ণনা করেছেন। [আদ-দিরায়া ফী তাখরীজি আহাদিসিল হিদায়া: ২/২৪৪]।
আর হাদিসটি শেখ আলবানী সহীহ বলেছেন।
২ সহীহ: আবু দাউদ 'ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে' (৩৪৭৭) এবং আহমাদ (২২৫৭৩) এটি বর্ণনা করেছেন।
যায়লায়ী বলেন: এটি জনৈক সাহাবীর হাদিস, ইবনে আব্বাসের হাদিস এবং ইবনে ওমরের হাদিস থেকে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীর হাদিসটি আবু দাউদ তাঁর সুনানে 'ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে' হারীজ ইবনে উসমান থেকে, তিনি আবু খাদাশ ইবনে হিব্বান ইবনে যায়দ থেকে, তিনি জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তিনটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি এবং তাঁকে বলতে শুনেছি: 'মুসলিমগণ তিনটি বিষয়ে অংশীদার: ঘাস, পানি ও আগুন'।" সমাপ্ত। এটি আহমাদ তাঁর মুসনাদে এবং ইবনে আবি শায়বা তাঁর মুসান্নাফের 'বিচার অধ্যায়ে' বর্ণনা করেছেন। ইবনে আদি 'আল-কামিল'-এ আহমাদ ও ইবনে মাঈন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা হারীজ সম্পর্কে বলেছেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। আব্দুল হক তাঁর 'আহকাম'-এ আবু দাউদের সূত্রে এটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: আমি জানি না আবু খাদাশ থেকে হারীজ ইবনে উসমান ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেছেন কি না; এবং তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে: তিনি অপরিচিত (মাজহুল)। সমাপ্ত। আল-বাইহাকী 'আল-মা’রিফা'-তে বলেন:
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবীই নির্ভরযোগ্য, আর সনদে তাঁদের নাম উল্লেখ না করা কোনো ক্ষতি করে না যদি তার বিপরীতে অধিকতর বিশুদ্ধ কোনো বর্ণনা না থাকে। সমাপ্ত।
আর ইবনে আব্বাসের হাদিসটি ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে 'আহকাম অধ্যায়ে' আব্দুল্লাহ ইবনে খাদাশের সূত্রে আওয়াম ইবনে হাওশাব থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা.)

থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুসলিমগণ তিনটি বিষয়ে অংশীদার: পানি, ঘাস ও আগুন এবং এর মূল্য হারাম।" সমাপ্ত। =

(ص: 279)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل:

وأما الأرفاق فهو أرفاق بمقاعد الأسواق، وأفنية الشوارع، وحريم الأمصار، ومنازل الأسفار، فيقسم ثلاثة أقسام: قسم يختص الارتفاق فيه بالصحارى والفلوات، وقسم يختص الارتفاق فيه بأفنية الأملاك، وقسم يختص بالشوارع والطرق.

فأمَّا القسم الأول: وهو ما اختُصَّ بالصحارى والفلوات فكمنازل الأسفار وحلول المياه، وذلك ضربان:

أحدهما: أن يكون لاجتياز السابلة واستراحة المسافرين فيه، فلا نظر للسلطان فيه لبعده عنده، وضرورة السابلة إليه، والذي يختص السلطان له من ذلك إصلاح عورته وحفظ مياهه، والتخلية بين الناس وبين نزوله، ويكون السابق إلى المنزل أحقّ بحلوله فيه من المسبوق حتى يرتحل عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مِنَى مناخ من سبق إليها" 1.

فإن وردوه على سواء وتنازعوا فيه نظر في التعديل بينهم مِمَّا يزيل تنازعهم، وكذلك البادية إذا انتجعوا أرضًا طلبًا للكلأ، وارتفاقًا بالمرعى، وانتقالًا من أرض إلى أخرى، كانوا فيما نزلوه وارتحلوا عنه كالسابلة، لا اعتراض عليهم في تنقلهم ورعيهم.

والضرب الثاني: أن يقصدوا بنزول الأرض الإقامة فيها والاستيطان لها، فللسلطان في نزولهم بها نظر يراعَى فيه الأصلح، فإن كان مضرًّا بالسابلة منعوا منها قبل النزول

وبعده، وإن لم يضر بالسابلة راعى الأصلح في نزولهم فيها، أو منعهم منها ونقل غيرهم إليها، كما فعل عمر حين مصَّر البصرة والكوفة؛ نقل إلى كلِّ واحد من المصرين مَنْ رأى المصلحة فيه؛

= قال عبد الحق في أحكامه: قال البخاري: عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب منكر الحديث، وضعَّفه أيضًا أبو زرعة وقال فيه أبو حاتم: ذاهب الحديث، انتهى كلامه، تركها ابن القطان عليه. انتهى.

وأمَّا حديث ابن عمر فرواه الطبراني في معجمه، حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى الحماني، ثنا قيس بن الربيع، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار" انتهى. [نصب الراية: 4/ 294] .

والحديث صحَّحه الشيخ الألباني.

1 صحيح: رواه أبو داود في كتاب المناسك "2019"، والترمذي في كتاب الحج "881"، وابن ماجه في كتاب المناسك "3006"، وأحمد "25190".

অনুচ্ছেদ:

আর জনকল্যাণমূলক উপযোগিতা বা 'ইরফাক' হলো বাজারের বসার স্থান, রাস্তার প্রশস্ত আঙ্গিনা, নগরীর পার্শ্ববর্তী উন্মুক্ত এলাকা এবং সফরের বিরতিস্থল ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ। এটি তিন ভাগে বিভক্ত: একভাগ মরুভূমি ও বিজন প্রান্তরে উপযোগিতা গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট, একভাগ মালিকানাধীন সম্পত্তির আঙ্গিনায় উপযোগিতা গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং একভাগ রাস্তা ও রাজপথের সাথে সংশ্লিষ্ট।

প্রথম ভাগ: যা মরুভূমি ও বিজন প্রান্তরের সাথে নির্দিষ্ট, যেমন সফরের বিরতিস্থল ও পানির আধার। এটি আবার দুই প্রকার:

প্রথমটি: যা পথচারীদের যাতায়াত এবং মুসাফিরদের বিশ্রামের জন্য। এক্ষেত্রে শাসকের কোনো বিশেষ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই, কারণ তার থেকে এর দূরত্ব অনেক বেশি এবং পথচারীদের এর প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য। শাসক কেবল এর ত্রুটি সংশোধন, পানির উৎস

সংরক্ষণ এবং মানুষের অবস্থানের জন্য তা উন্মুক্ত রাখার দায়িত্ব পালন করবেন। যে ব্যক্তি আগে পৌঁছাবে, সে সেখানে অবস্থানের ক্ষেত্রে পরবর্তী ব্যক্তির চেয়ে অধিক হকদার হবে, যতক্ষণ না সে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মিনা হলো সেই ব্যক্তির জন্য অবস্থানস্থল, যে সেখানে আগে পৌঁছেছে" ১।
যদি তারা সমানভাবে পৌঁছায় এবং তা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে এমনভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে যা বিবাদ নিরসন করে। একইভাবে যাযাবররা যখন ঘাস ও চারণভূমির সন্ধানে এবং এক ভূমি থেকে অন্য ভূমিতে গমনের উদ্দেশ্যে কোনো ভূমিতে অবস্থান নেয়, তখন তারা সেখানে অবস্থান ও প্রস্থানের ক্ষেত্রে সাধারণ পথচারীদের মতোই গণ্য হবে। তাদের চলাফেরা এবং গবাদি পশু চরানোর বিষয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না।
দ্বিতীয় প্রকার: যখন তারা ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস ও বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে তাদের সেখানে অবস্থানের বিষয়ে শাসক জনস্বার্থ বা মাসলাহাতের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। যদি এটি পথচারীদের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে অবস্থানের পূর্বে বা পরে তাদের সেখানে বাধা দেওয়া হবে। আর যদি পথচারীদের জন্য ক্ষতিকর না হয়, তবে তাদের সেখানে অবস্থানের ক্ষেত্রে বা তাদের বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং অন্যদের সেখানে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে শাসক জনস্বার্থ বিবেচনা করবেন, যেমনটি উমর করেছিলেন যখন তিনি বসরা ও কুফা শহর পত্তন করেন; তিনি উভয় শহরের প্রত্যেকটিতে এমন ব্যক্তিদের স্থানান্তর করেছিলেন যাদের সেখানে রাখা তিনি কল্যাণকর মনে করেছিলেন;

= আবদুল হক তার 'আহকাম' গ্রন্থে বলেছেন: বুখারী বলেছেন: আওয়াম ইবনে হাওশাব থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে খিদাশের বর্ণনাটি মুনকার (পরিত্যক্ত)। আবু যুরআও তাকে দুর্বল বলেছেন এবং আবু হাতিম তার সম্পর্কে বলেছেন: তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে কাত্তান তার সমালোচনাটি উল্লেখ করেছেন। সমাপ্ত।
আর ইবনে উমরের হাদিসটি তাবারানী তার 'মুজাম' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হুসাইন ইবনে ইসহাক আত-তুস্তারি আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া আল-হিমানি থেকে, তিনি কায়েস ইবনে রাবী থেকে, তিনি যায়েদ ইবনে জুবায়ের থেকে এবং তিনি ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুসলিমরা তিনটি বিষয়ে অংশীদার: পানি, চারণভূমি এবং আগুন।" সমাপ্ত। [নাসবুর রায়াহ: ৪/২৯৪]।

শেখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
১ সহীহ: আবু দাউদ 'মানাসিক' অধ্যায়ে (২০১৯), তিরমিজি 'হজ্জ' অধ্যায়ে (৮৮১), ইবনে মাজাহ 'মানাসিক' অধ্যায়ে (৩০০৬) এবং আহমদ (২৫১৯০) বর্ণনা করেছেন।

(ص: 280)الأحكام السلطانية للماوردي

لئلَّا يجتمع فيه المسافرون، فيكون سببًا لانتشار الفتنة وسفك الدماء، وكما يفعل في إقطاع الموات ما يرى، فإن لم يستأذنوه حتى نزلوه لم يمنعهم منه، كما لا يمنع من أحيا مواتًا بغير إذنه، ودبَّرهم بما يراه صلاحًا لهم، ونهاهم عن إحداث زيادة من بعد إلَّا عن إذنه.

روى كثير بن عبد الله بن عن أبيه عن جده قال: قدمنا مع عمر بن الخطاب في عمرته سنة سبع عشرة، فكلمه أهل المياه في الطريق أن يبنوا بيوتًا فيما بين مكة والمدينة لم تكن قبل ذلك، فأذن لهم واشترط عليهم أنَّ ابن السبيل أحقّ بالماء والظلّ.

وأما القسم الثاني: وهو ما يختص بأفنية الدور والأملاك، فإن كان مضرًّا بأربابها منع المرتفقون منها، إلَّا أن يأذنوا بدخول الضرر عليهم فيمكنوا، وإن كان غير مضر بهم، ففي إباحة ارتفاقهم به من غير إذنهم قولان:

أحدهما: أنَّ لهم الارتفاق بها وإن لم يأذن أربابها؛ لأن الحريم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم منه ساواهم فيما عداه.

والقول الثاني: أنه لا يجوز الارتفاق بحريمهم إلَّا عن إذانهم؛ لأنه تبع لأملاكهم، فكانوا به أحق وبالتصرف فيه أخص، فأمَّا حريم الجوامع والمساجد فإن كان الارتفاق به مضرًّا بأهل المساجد والجوامع منعوا منه، ولم يجز للسلطان أن يأذن

لهم فيه؛ لأنَّ المصلين به أحق، وإن لمن يكن مضرًّا أجاز ارتفاقهم بحريمها1. وهل يعتبر فيه إذن السلطان لهم على وجهين منَ القولين في حريم الأملاك.

وأمَّا القسم الثالث: وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان، وفي نظره وجهان:

أحدهما: أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي، ومنعهم من الإضرار، والإصلاح بينهم عند التشاجر، وليس له أن يقيم جالسًا، ولا أن يقدّم مؤخرًا، ويكون السابق إلى

---

1 قال منصور بن يونس البهوتي -من الحنابلة: قال القاضي: حريم الجوامع والمساجد إن كان الارتفاق بها مضرًّا بأهل الجوامع والمساجد منعوا منه، أي: من الارتفاق بها دفعًا للضرر، ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه؛ لأن المصلين بها أحق من غيرهم، وإن لم يكن في الارتفاق بها ضرر جاز الارتفاق بحريمها؛ لأن الحق فيها لعامة المسلمين، ولا يعتبر فيه إذن السلطان ولا نائبه للحرج، ولا يجوز إحداث المسجد في المقبرة. [كشف القناع: 2/ 374] .

যাতে সেখানে মুসাফিররা একত্রিত না হয়, যার ফলে তা ফিতনা ছড়িয়ে পড়া ও রক্তপাতের কারণ হতে পারে। আর মৃত ভূমি বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি যেমন সমীচীন মনে করবেন তেমনটি করবেন। যদি তারা অনুমতি না নিয়ে সেখানে অবস্থান শুরু করে, তবে তিনি তাদের বাধা দেবেন না, যেমন অনুমতি ছাড়া কেউ মৃত ভূমি পুনর্জীবিত করলে তাকে বাধা দেওয়া হয় না। তিনি তাদের জন্য যা কল্যাণকর মনে করেন সেই অনুযায়ী তাদের পরিচালনা করবেন এবং তার অনুমতি ব্যতীত সেখানে নতুন কিছু তৈরি করতে নিষেধ করবেন।

কাসীর ইবনে আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: সতেরো হিজরি সনে আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সাথে ওমরাহ করতে আসলাম। তখন পথের পানির মালিকরা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে বাড়ি নির্মাণের জন্য তাঁর সাথে কথা বললেন, যা এর আগে ছিল না। তিনি তাদের অনুমতি দিলেন এবং এই শর্তারোপ করলেন যে, মুসাফিররা পানি ও ছায়ার ক্ষেত্রে বেশি হকদার হবে।

আর দ্বিতীয় প্রকার: যা ঘরবাড়ি ও মালিকানাধীন ভূমির প্রাঙ্গণের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি তা মালিকদের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে যারা সেখান থেকে সুবিধা নিতে চায় তাদের বাধা দেওয়া হবে; অবশ্য যদি মালিকরা নিজেদের ক্ষতির ওপর অনুমতি প্রদান করেন, তবে তাদের সুযোগ দেওয়া হবে। আর যদি মালিকদের জন্য ক্ষতিকর না হয়, তবে তাদের অনুমতি ছাড়াই সেখান থেকে সুবিধা গ্রহণ বৈধ হওয়ার বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি হলো: মালিকরা অনুমতি না দিলেও তাদের জন্য সুবিধা গ্রহণ করা বৈধ; কারণ সীমানা হলো একটি উপযোগ, যখন মালিক পক্ষ তাদের প্রাপ্য হক পেয়ে যায়, তখন অবশিষ্টাংশে অন্যরাও তাদের সমান অংশীদার হয়।

দ্বিতীয় অভিমত হলো: মালিকদের অনুমতি ছাড়া তাদের ভূমির সীমানা থেকে সুবিধা গ্রহণ বৈধ নয়; কারণ তা তাদের মালিকানার অনুগামী। ফলে তারা এতে অধিক হকদার এবং এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারাই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। আর জামে মসজিদ ও সাধারণ মসজিদের সীমানার ক্ষেত্রে বিধান হলো, সেখান থেকে সুবিধা গ্রহণ যদি মুসল্লিদের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে তাদের তা থেকে বিরত রাখা হবে। এমতাবস্থায় শাসকের পক্ষে তাদের অনুমতি দেওয়া বৈধ হবে না; কারণ মুসল্লিগণ সেখানে বেশি হকদার। আর যদি ক্ষতিকর না হয়, তবে মসজিদের সীমানা থেকে তাদের সুবিধা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে। এখন এক্ষেত্রে কি শাসকের অনুমতির প্রয়োজন হবে কিনা—তা মালিকানাধীন ভূমির সীমানার ক্ষেত্রে বর্ণিত দুটি অভিমতের মতোই দুই প্রকার।

আর তৃতীয় প্রকার: যা রাস্তা ও রাজপথের প্রাঙ্গণের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি শাসকের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। আর তার বিবেচনার ক্ষেত্রে দুটি দিক রয়েছে:

একটি হলো: শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল তাদের সীমা লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখা, ক্ষতি করা থেকে বাধা দেওয়া এবং ঝগড়া-বিবাদের সময় মীমাংসা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বসা ব্যক্তিকে উঠিয়ে দেওয়ার কিংবা পেছনের কাউকে সামনে এগিয়ে দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই। বরং যে আগে আসবে...

---

১. হাম্বলী মাযহাবের মানসুর ইবনে ইউনুস আল-বাহুতি বলেন: কাযী বলেছেন: জামে মসজিদ ও সাধারণ মসজিদের সীমানা থেকে সুবিধা গ্রহণ যদি মসজিদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে তাদের তা থেকে বাধা দেওয়া হবে—অর্থাৎ ক্ষতি নিরসনের লক্ষ্যে তাদের সুবিধা গ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে শাসকের জন্য অনুমতি দেওয়া বৈধ হবে না, কারণ

মুসল্লিগণ অন্যদের চেয়ে এর বেশি হকদার। আর যদি সুবিধা গ্রহণে কোনো ক্ষতি না হয়, তবে মসজিদের সীমানা ব্যবহার করা জায়েয; কারণ এতে সাধারণ মুসলমানদের অধিকার রয়েছে। সংকীর্ণতা বা অসুবিধার কারণে এতে শাসক বা তাঁর প্রতিনিধির অনুমতির প্রয়োজন নেই। আর কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ নয়। [কাশশাফুল কিনা: ২/ ৩৭৪] ।

(ص: 281)الأحكام السلطانية للماوردي

المكان أحق به من المسبوق1.

والوجه الثاني: أنَّ نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحًا في إجلاس من يجلسه، ومنع من يمنعه، وتقديم من يقدمه، كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات، ولا يجعل السابق أحق، وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرًا.

وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق، فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه، وقال مالك: إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورًا، كان أحق به من غيره قطعًا للتنازع وحسمًا للتشاجر، واعتبار هذا وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك.

فصل:

وأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدِّي للتدريس والفتيا، فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه، أو لا يتصدَّى لما ليس له بأهل، فيضل به المستهدي ويزِلّ به المسترشد، وقد جاء الأثر بأن أجرؤكم على الفتيا أجروكم على جراثيم جهنم.

وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من إقراره أو إنكاره، فإذا أراد من هو لذلك أهل أن يترتَّب في أحد المساجد؛ لتدريس أو فتيا نظر حال المسجد، فإن كان مساجد المحال التي لا يترتب الأئمة فيها من جهة السلطان لم يلزم من ترتب فيه للتدريس والفتيا استئذان السلطان في جلوسه، كما لا يلزم أن يستأذنه من ترتيب للإمامة، وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي ترتب الأئمة فيها بتقليد السلطان، روعي في ذلك عرف البلد وعادته في جلوس أمثاله، فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر، لم يكن له أن يترتب

---

1 قال أبو إسحاق الشيرازي -من الشافعية: ويجوز الارتفاق بما بين العامر من الشوارع والرحاب الواسعة بالقعود للبيع والشراء؛ لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك دون إنكار؛ ولأنه ارتفاق بمباح، فلم يمنع منه كالاجتياز، فإن سبق إليه كان أحق به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مِنَى مناخ من سبق"، وله أن يظلل بما لا ضرر به على المارة من بارية وثوب؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك، وإن أراد أن يبني دكَّة منع منه؛ لأنه يضيق به الطريق ويعثر به الضرير وبالليل البصير فلم يجز. [المهذب: 1/ 426] .

পূর্ববর্তী ব্যক্তি পরবর্তী ব্যক্তির তুলনায় স্থানের অধিক হকদার১।

দ্বিতীয় মতটি হলো: এই বিষয়ে শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি হবে একজন মুজতাহিদের মতো, যিনি জনকল্যাণ বিবেচনায় কাউকে বসার অনুমতি দেবেন, কাউকে নিষেধ করবেন এবং কাউকে অগ্রাধিকার দেবেন। যেমনটি তিনি বায়তুল মালের সম্পদ এবং অনাবাদী ভূমি বণ্টনের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করে থাকেন। এমতাবস্থায় তিনি পূর্ববর্তীকে অধিক হকদার সাব্যস্ত করবেন না। তবে উভয় মতেই, সেখানে বসার জন্য তাদের কাছ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা শাসকের জন্য বৈধ নয়।

আর শাসক যদি বিষয়টি তাদের পারস্পরিক সম্মতির ওপর ছেড়ে দেন, তবে সেখানে যে আগে আসবে সে-ই পরবর্তীর তুলনায় অধিক হকদার হবে। যখন সে স্থানটি ত্যাগ করে চলে যাবে,

তখন পরবর্তী দিন সে এবং অন্য সবাই সমান গণ্য হবে; সেক্ষেত্রে যে আগে আসবে তাকেই বিবেচনা করা হবে। ইমাম মালিক বলেন: যদি কেউ কোনো নির্দিষ্ট স্থানের জন্য পরিচিত হয়ে যায় এবং সেটি তার স্থান হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তবে বিরোধ নিরসন এবং ঝগড়া নির্মূল করার লক্ষ্যে সে-ই অন্যের তুলনায় ওই স্থানের অধিক হকদার হবে। এই মতটি জনকল্যাণের দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হলেও তা স্থানটিকে বৈধ ব্যবহারের বিধান থেকে মালিকানার বিধানে নিয়ে যায়।

পরিচ্ছেদ:

আর জামে মসজিদ ও সাধারণ মসজিদগুলোতে আলেম ও ফকিহগণের বসা এবং দরস ও ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি হলো—তাদের প্রত্যেকের ওপর নিজের নফসের পক্ষ থেকে এমন এক নিয়ন্ত্রণকারী থাকা আবশ্যক, যা তাকে অযোগ্য বিষয়ে হাত দিতে বাধা দেবে; যাতে তার কারণে পথপ্রার্থী বিভ্রান্ত না হয় এবং হেদায়েত প্রত্যাশী পদস্খলিত না হয়। বর্ণিত আছে যে, ‘তোমাদের মধ্যে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে যে সবচেয়ে বেশি সাহসী, সে আসলে জাহান্নামের আগুনের ওপর সবচেয়ে বেশি সাহসী।’

আলেমদের নিয়োগ বা অপসারণের ক্ষেত্রে সুলতানের এখতিয়ার ও তদারকির অধিকার রয়েছে। যখন কোনো যোগ্য ব্যক্তি দরস প্রদান বা ফতোয়া প্রদানের জন্য কোনো মসজিদে স্থায়িত্ব গ্রহণ করতে চায়, তখন মসজিদের অবস্থা বিবেচনা করতে হবে। যদি সেটি মহল্লার এমন মসজিদ হয় যেখানে ইমামগণ সুলতানের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হন না, তবে সেখানে দরস ও ফতোয়া প্রদানের জন্য বসার ক্ষেত্রে সুলতানের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক নয়, যেমনটি ইমামতির ক্ষেত্রেও তাঁর অনুমতির প্রয়োজন হয় না। আর যদি সেটি জামে মসজিদ বা বড় মসজিদগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয় যেখানে সুলতানের নিয়োগের মাধ্যমে ইমাম নিযুক্ত হন, তবে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রথা এবং সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের বসার রীতিনীতি বিবেচনা করা হবে। যদি সুলতানের পক্ষ থেকে এ জাতীয় ব্যক্তিদের বসার ক্ষেত্রে তদারকির বিধান থাকে, তবে অনুমতি ব্যতীত তিনি সেখানে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

---

১ শাফেয়ী মাজহাবের ফকিহ আবু ইসহাক আল-শিরাজী বলেন: জনবসতির মধ্যকার রাস্তা ও প্রশস্ত আঙিনায় কেনা-বেচার উদ্দেশ্যে বসার মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ করা বৈধ। কেননা সকল যুগের ও সকল শহরের অধিবাসীগণ কোনো প্রকার আপত্তি ছাড়াই মানুষকে এই অধিকার প্রদানের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাছাড়া এটি একটি বৈধ বিষয় থেকে সুবিধা গ্রহণ করা,

তাই চলাচলের মতো এটি থেকেও বাধা প্রদান করা হবে না। যদি কেউ কোনো স্থানে আগে আসে, তবে সে-ই তার অধিক হকদার হবে; কেননা নবী করীম (সা.) বলেছেন: "মিনা হলো সেই ব্যক্তির অবস্থানস্থল যে আগে আসে।" আর পথচারীদের ক্ষতি না করে চাটাই বা কাপড় দিয়ে ছায়া তৈরি করার অধিকার তাঁর আছে; কারণ এর প্রয়োজন পড়ে। তবে সে যদি কোনো স্থায়ী বেদী নির্মাণ করতে চায়, তবে তাকে বাধা প্রদান করা হবে; কারণ এতে রাস্তা সংকুচিত হয় এবং অন্ধ ব্যক্তি হোঁচট খায়, এমনকি রাতে চক্ষুমান ব্যক্তিও হোঁচট খেতে পারে, তাই এটি বৈধ নয়। [আল-মুহাজ্জাব: ১/৪২৬]।

(ص: 282)الأحكام السلطانية للماوردي

للجلوس فيه إلّا عن إذنه، كما لا يترتب للإمامة فيه إلَّا عن إذنه؛ لئلَّا يفتات عليه في ولايته.

وإن لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود لم يلزم استئذانه للترتيب فيه، وصار كغيره من المساجد، وإذا ارتسم بموضع من جامع أو مسجد فقد جعله مالك أحق بالموضع إذا عرف به، والذي عليه جمهور الفقهاء أن هذا يستعمل في عرف الاستحسان، وليس بحق مشروع، وإذا قام عنه زال حقّه منه، وكان السابق إليه أحق؛ لقول الله تعالى: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَاد} [الحج: 25] .

ويمنع الناس في الجوامع والمساجد من استطراق حَلَقِ الفقهاء والقراء صيانة لحرمتها.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا حمى إلا في ثلاث: ثلة البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم" 1 فأَمَّا ثلة البئر فهو منتهى حريمها، وأَمَّا طول الفرس فهو ما دار فيه بمقوده إذا كان مربوطًا، وأَمَّا حلقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث.

وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يعترض عليهم فيه، إلَّا أن يحدث بينهم تنافر فيكفوا عنه، وإن حدث منازع ارتكب ما لا يسوغ فيه الاجتهاد كف عنه ومنع منه، فإن أقام عليه وتظاهر باستغواء من يدعو إليه لزم السلطان أن يحسم بزواجر السلطنة ظهور بدعته، ويوضِّح بدلائل الشرع فساد مقالته، فإن لكل بدعة مستمعًا، ولكل مستغو متبعًا، وإذا تظاهر بالصلاح من استبطن ما سواه ترك، وإذا تظاهر بالعلم من عرِّي منه هتك؛ لأنَّ الداعي إلى صلاح ليس فيه مصلح، والداعي إلى علم ليس فيه مضل.

---

1 رواه البيهقي في السنن الكبرى "11618".

তার অনুমতি ব্যতীত সেখানে বসা যাবে না, যেমন সেখানে ইমামতিও তার অনুমতি ব্যতীত সাব্যস্ত হবে না; যাতে তার কর্তৃত্বের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করা না হয়।

আর যদি এ ধরনের ক্ষেত্রে সুলতানের প্রচলিত কোনো তত্ত্বাবধান না থাকে, তবে সেখানে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য তার অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক নয় এবং তা অন্যান্য মসজিদের মতোই গণ্য হবে। যখন কেউ কোনো জামে মসজিদ বা সাধারণ মসজিদের কোনো স্থানে বসতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন ইমাম মালিক তাকে উক্ত স্থানের জন্য অধিক হকদার মনে করেছেন যদি সে তদ্দ্বারা পরিচিতি লাভ করে। তবে জমহুর ফকীহগণের অভিমত হলো, এটি কেবল ‘ইস্তিহসান’ (উত্তম রীতি) হিসেবে গণ্য, কোনো শরয়ি হক বা আইনি অধিকার নয়। অতএব, সে যখন সেখান থেকে উঠে যাবে, তখন তার অধিকার বিলুপ্ত হবে এবং যে আগে আসবে সেই অধিক হকদার হবে; মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: {সেখানে অবস্থানকারী ও বহিরাগত উভয়েই সমান} [হজ্জ: ২৫]।

জামে মসজিদ ও অন্যান্য মসজিদে ফকীহ ও ক্বারীগণের মজলিসের পবিত্রতা রক্ষার খাতিরে সাধারণ মানুষকে তাদের এই সকল ইলমি হালকার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে নিষেধ করা হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো সংরক্ষিত এলাকা (হিমা) নেই: কূপের চারপাশের এলাকা, ঘোড়ার রশির সীমানা এবং একদল মানুষের বসার বৃত্ত।" ১ এখানে 'কূপের চারপাশের এলাকা' বলতে তার

সীমানাকে বোঝানো হয়েছে। 'ঘোড়ার রশির সীমানা' বলতে ঘোড়াটি যখন বাঁধা থাকে তখন তার রশি দ্বারা যতটুকু স্থানে সে ঘুরতে পারে তা বোঝানো হয়েছে। আর 'মানুষের বসার বৃত্ত' বলতে পরামর্শ বা আলোচনার জন্য তাদের গোল হয়ে বসাকে বোঝানো হয়েছে।
যখন বিভিন্ন মাজহাবের অনুসারীগণ এমন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয় যেখানে ইজতিহাদ করার সুযোগ রয়েছে, তখন তাদের ওপর আপত্তি করা হবে না; যতক্ষণ না তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, তখন তাদের বিরত রাখা হবে। আর যদি বিবাদকারী এমন কোনো কাজ করে যাতে ইজতিহাদ করার সুযোগ নেই, তবে তাকে বিরত রাখা হবে এবং বাধা প্রদান করা হবে। সে যদি এর ওপর অটল থাকে এবং বিভ্রান্তিকর দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে বিপথগামী করার প্রকাশ্য চেষ্টা চালায়, তবে সুলতানের ওপর আবশ্যক হলো রাজকীয় দণ্ডবিধির মাধ্যমে তার এই বিদআতের বিস্তার রোধ করা এবং শরয়ি দলিলের মাধ্যমে তার বক্তব্যের অসারতা স্পষ্ট করা। কেননা প্রত্যেক বিদআতেরই শ্রোতা থাকে এবং প্রত্যেক বিভ্রান্তকারীরই অনুসারী থাকে। আর যে ব্যক্তি অন্তরে মন্দ গোপন রেখে বাইরে সততার ভেক ধরে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে; কিন্তু যে ব্যক্তি ইলমশূন্য হওয়া সত্ত্বেও ইলমের দাবি করে, তাকে লোকসমক্ষে উন্মোচন করা হবে। কারণ সততা বর্জিত হয়ে সততার দিকে আহ্বানকারী মূলত সংশোধনকারী নয়, আর ইলম বর্জিত হয়ে ইলমের দিকে আহ্বানকারী হলো পথভ্রষ্টকারী।

---

১ বাইহাকি এটি আস-সুনানুল কুবরা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন "১১৬১৮"।

(ص: 283)الأحكام السلطانية للماوردي

الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع

وإقطاع1 السلطان مختَصّ بما جاز فيه تصرفه، ونفذت فيه أوامره، ولا يصحّ فيما تعيَّن فيه مالكه وتميَّز مستحقه، وهو ضربان: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال.

فأمَّا إقطاع التمليك فتنقسم فيه الأرض المقطعة ثلاثة أقسام: موات2 وعامر ومعادن، فأمَّا الموات فعلى ضربين:

أحدهما: ما لم يزل مواتًا على قديم الدهر، فلم تجز فيه عمارة، ولا يثبت عليه ملك، فهذا الذي يجوز للسلطان أن يقطعه من يحييه ومن يعمّره، ويكون الإقطاع على مذهب أبي حنيفة شرطًا في جواز الإحياء؛ لأنه يمنع من إحياء الموات إلّا بإذن الإمام، وعلى مذهب الشافعي أنَّ الإقطاع يجعله أحق بإحيائه من غيره، وإن لم يكن شرطًا في جوازه؛ لأنه يجوز إحياء الموات بغير إذن الإمام، وعلى كلا المذهبين يكون المقطَع أحق بإحيائه من غيره3.

---

1 قال أبو عبد الله البعلي: الإقطاع مصدر أقطعه إذا ملكه، أو أذن له في التصرُّف في الشيء، قال أبو السعادات: والإقطاع يكون تمليكًا وغير تمليك. [المطلع: ص 281] .

2 الموات: كسحاب، والميتة والموتان -بفتح الميم والواو: الأرض الدارسة الخراب، قاله في المغني والشرح، وعرَّفها الأزهري بأنها الأرض التي ليس لها مالك، ولا بها ماء ولا عمارة، ولا ينتفع بها، والموات مشتق من الموت وهو عدم الحياة. [المبدع: 5/ 249] .

3 قال أبو إسحاق الشيرازي: ولا يجوز لأحد أن يحمي مواتًا؛ ليمنع الإحياء ورعي ما فيه من الكلأ؛ لما روى الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا حمى إلَّا لله ولرسوله"، فأمَّا الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كان يجوز له أن يحمي لنفسه وللمسلمين، فأمَّا لنفسه فإنَّه ما حمي ولكنَّه حمى للمسلمين، والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، وأمَّا غيره من الأئمة فلا يجوز أن يحمي لنفسه للخبر، وهل يجوز أن يحمي لخيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وماشية من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة، فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز للخبر.

والثاني: يجوز لما روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: أتى أعرابي من أهل نجد عمر فقال: يا أمير المؤمنين، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام، فعلام تحميها؟ فأطرق عمر رضي الله عنه وجعل ينفخ ويفتل شاربه، وكان إذا كره أمرًا فتل شاربه ونفخ، فلمَّا رأى الأعرابي ما به =

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ: ইকতা (ভূমি বরাদ্দ) সংক্রান্ত বিধানাবলি

সুলতানের ইকতা (ভূমি বরাদ্দ) প্রদান কেবল সেই সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট যাতে তাঁর প্রশাসনিক এখতিয়ার কার্যকর হয় এবং তাঁর নির্দেশাবলি বলবৎ হয়। কিন্তু যে জিনিসের মালিক সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত এবং যার হকদার চিহ্নিত, তার ক্ষেত্রে ইকতা প্রদান বৈধ নয়। এই ইকতা দুই প্রকার: মালিকানা স্বত্ব প্রদানকারী ইকতা এবং ভোগদখল বা উপস্বত্ব প্রদানকারী ইকতা।

মালিকানা স্বত্ব প্রদানকারী ইক্তার ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত ভূমি তিন ভাগে বিভক্ত: অনাবাদী ভূমি, আবাদী ভূমি এবং খনিজ সম্পদ। অনাবাদী ভূমি আবার দুই প্রকার:

প্রথমত: যা অনাদিকাল থেকে অনাবাদী হয়ে পড়ে আছে, যাতে কখনো আবাদ করা হয়নি এবং যার ওপর কারও মালিকানা সাব্যস্ত নেই। সুলতানের জন্য এই ভূমি এমন ব্যক্তিকে বরাদ্দ দেওয়া বৈধ, যে একে পুনর্জীবিত ও আবাদ করবে। ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অনুযায়ী, ভূমি পুনর্জীবিত করা বৈধ হওয়ার জন্য ইকতা (সুলতানের অনুমতি) একটি শর্ত; কারণ ইমামের অনুমতি ব্যতীত তিনি অনাবাদী ভূমি পুনর্জীবিত করা নিষিদ্ধ মনে করেন। আর ইমাম শাফি'ঈর মাযহাব অনুযায়ী, ইকতা প্রদানের মাধ্যমে গ্রহীতা সেই ভূমি পুনর্জীবিত করার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অধিক হকদার বিবেচিত হন, যদিও তা পুনর্জীবিত করার বৈধতার ক্ষেত্রে ইকতা কোনো শর্ত নয়; কারণ ইমামের অনুমতি ছাড়াও অনাবাদী ভূমি পুনর্জীবিত করা তাঁর নিকট বৈধ। তবে উভয় মাযহাব মতেই, বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভূমিটি পুনর্জীবিত করার ক্ষেত্রে অন্যের তুলনায় বেশি অগ্রগণ্য হবেন।

---

১ আবু আব্দুল্লাহ আল-বালি বলেন: ইকতা হলো 'আকতাআহু' এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল, যার অর্থ হলো কাউকে কোনো কিছুর মালিক বানিয়ে দেওয়া অথবা কোনো বিষয়ে ব্যবহারের

অনুমতি দেওয়া। আবুস সা'দাত বলেন: ইকতা মালিকানা প্রদানকারীও হতে পারে আবার মালিকানা ব্যতীতও হতে পারে। [আল-মুতলি': পৃষ্ঠা ২৮১]

২ মাওয়াত: এটি 'সাহাব'-এর ওজনে, এর সমার্থক শব্দ হলো মাইতাহ এবং মাওয়াতান (মীম ও ওয়াও এর ফাতহা সহ): অর্থাৎ বিশৃঙ্খল ও জনশূন্য বিরান ভূমি। 'আল-মুগনি' ও 'আশ-শারহ' গ্রন্থে এমনটিই বলা হয়েছে। আল-আযহারী এর সংজ্ঞায় বলেন যে, এটি এমন ভূমি যার কোনো মালিক নেই, নেই কোনো পানির ব্যবস্থা বা আবাদ, এবং যা থেকে কোনো উপকার লাভ করা হয় না। মাওয়াত শব্দটি 'মাউত' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ জীবন না থাকা। [আল-মুবদি': ৫/২৪৯]

৩ আবু ইসহাক আল-শিরাজি বলেন: চারণভূমি পুনর্জীবিত করা এবং ঘাস খাওয়া থেকে অন্যদের বাধা দেওয়ার জন্য কোনো অনাবাদী ভূমি সংরক্ষিত রাখা (হিমা) কারও জন্য বৈধ নয়। কেননা সাব ইবনে জাসসামাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কারও জন্য সংরক্ষিত এলাকা (হিমা) নেই।" রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য নিজের এবং মুসলমানদের স্বার্থে ভূমি সংরক্ষিত রাখা বৈধ ছিল। অবশ্য তিনি নিজের জন্য কোনো ভূমি সংরক্ষিত করেননি, বরং মুসলমানদের স্বার্থেই করেছিলেন। এর প্রমাণ হলো ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'নাকি' নামক স্থানটি মুসলমানদের ঘোড়ার জন্য সংরক্ষিত করেছিলেন। আর তিনি ব্যতীত অন্য ইমামদের (শাসকদের) জন্য নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ভূমি সংরক্ষিত রাখা উক্ত হাদীসের কারণে বৈধ নয়। তবে মুজাহিদদের ঘোড়া, জিযিয়ার পশু, সাদাকার উট এবং যারা দূরবর্তী চারণভূমিতে যেতে অক্ষম তাদের গবাদি পশুর জন্য ভূমি সংরক্ষিত রাখা বৈধ কি না—এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে:

প্রথমত: হাদীসের সাধারণ অর্থের কারণে এটি বৈধ নয়।

দ্বিতীয়ত: এটি বৈধ। কেননা আমির ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: নজদবাসীদের মধ্য থেকে এক বেদুইন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে এসে বলল: হে আমিরুল মুমিনীন, এই ভূখণ্ডের জন্য আমরা জাহেলিয়াতের যুগে লড়াই করেছি এবং ইসলামের যুগে এর ওপরই ইসলাম গ্রহণ করেছি, তবে কেন আপনি এটি সংরক্ষিত রাখছেন? উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাথা নিচু করলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোঁফে

তালি দিতে লাগলেন। তাঁর নিয়ম ছিল যখন তিনি কোনো বিষয় অপছন্দ করতেন তখন গোঁফে তালি দিতেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। যখন বেদুইন তাঁর অবস্থা দেখল...

(ص: 284)الأحكام السلطانية للماوردي

قد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ركض فرسه من موات النقيع، فأجراه ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوه منتهى سوطه"1.

والضرب الثاني من الموات ما كان عامرًا فخرب، فصار مواتًا عاطلًا، وذلك ضربان:

أحدهما: ما كان جاهليًّا كأرض عاد وثمود، فهي كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة، ويجوز إقطاعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني"2.

يعني أرض عاد.

والضرب الثاني: ما كان إسلاميًّا جرى عليه ملك المسلمين، ثم خرب حتى صار مواتًا عاطلًا، فقد اختلف الفقهاء في حكم إحيائه على ثلاثة أقوال: فذهب الشافعي فيه إلى أنه لا

= جعل يردد ذلك، فقال عمر: المال مال الله، والعباد عباد الله، فلولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرًا في شبر.

قال مالك: نبئت أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفًا من الظهر، وقال مرة: من الخيل، وروى زيد بن أسلم عن أبيه أنَّ عمر رضي الله عنه استعمل مولًى له يدعى هنيّ على الحِمَى وقال له: يا هني، اضمم جناحك عن الناس، واتق دعوة المظلوم، فإن

دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة، وإياك ونعم ابن عوف، وإياك ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن ربَّ الصريمة وربَّ الغنيمة إن تهلك ماشيتهما فيأتياني فيقولا: يا أمير المؤمنين. أفتاركهم أنا، لا أبا لك، إنَّ الماء والكلأ أيسر عندي من الذهب والورق، والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا، فإن حِمَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضًا لحاجة، والحاجة باقية لم يجز إحياؤها، وإن زالت الحاجة ففيه وجهان:

أحدهما يجوز لأنَّه زال السبب، والثاني: لا يجوز؛ لأن ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم نصّ، فلا يجوز نقضه بالاجتهاد، وإن حماه إمام غيره وقلنا: إنه يصح حماه، فأحياه رجل ففيه قولان:

أحدهما: لا يملكه، كما لا يملك ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والثاني: يملك؛ لأن حمى الإمام اجتهاد وملك الأرض بالإحياء نص، والنص لا ينقض بالاجتهاد. [المهذب: 1/ 427] .

1 رواه أبو داود في كتاب الخراج "3072"، وأحمد "6422"، والبيهقي في السنن الكبرى "11570"، والطبراني في الكبير "13352"، وضعَّفه الشيخ الألباني.

قال ابن الملقن: حديث: "عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم مني" رواه الشافعي من رواية ابن طاوس، كذلك والبيهقي من رواية طاوس، إلّا أنه قال: "ثم لكم من بعد" رواه كذلك موقوفًا على ابن عباس. [خلاصة البدر المنير: 2/ 109] .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে নাকি'র অনাবাদী ভূমি থেকে তাঁর ঘোড়ার দৌড়ের সমান জমি বরাদ্দ দিয়েছিলেন। তিনি (যুবাইর) ঘোড়া দৌড়ালেন, এরপর আরও বেশি পাওয়ার আশায় তাঁর চাবুক নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তাকে তার চাবুক নিক্ষেপের শেষ সীমা পর্যন্ত জমি প্রদান করো"১।

অনাবাদী ভূমির দ্বিতীয় প্রকার হলো যা একসময় আবাদকৃত ছিল কিন্তু পরে জনশূন্য ও পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ায় অনাবাদী হয়ে পড়েছে। এটি দুই প্রকার:
প্রথমত: যা জাহেলী যুগের ছিল, যেমন আদ ও সামূদ জাতির ভূমি। এটি এমন অনাবাদী ভূমির মতো যাতে কখনো আবাদ প্রমাণিত হয়নি এবং তা বরাদ্দ দেওয়া বৈধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রাচীন পরিত্যক্ত ভূমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য, এরপর তা আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য"২।
অর্থাৎ আদ জাতির ভূমি।
দ্বিতীয় প্রকার: যা ইসলামী যুগে মুসলিমদের মালিকানাধীন ছিল, এরপর জনশূন্য ও পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ায় অনাবাদী হয়ে পড়েছে। এর আবাদকরণের বিধান সম্পর্কে ফকিহগণের মাঝে তিনটি মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ এ বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তা...

= তিনি বারবার এটি বলতে থাকলেন। তখন উমর বললেন: সম্পদ আল্লাহর সম্পদ, আর বান্দারা আল্লাহর বান্দা। আমি যদি আল্লাহর পথে জিহাদের বাহন প্রস্তুত করার দায়িত্বে না থাকতাম, তবে আমি জমিনের এক বিঘাত জায়গাও সংরক্ষিত (হিমা) রাখতাম না।
ইমাম মালিক বলেন: আমাকে জানানো হয়েছে যে, তিনি (উমর) প্রতি বছর চল্লিশ হাজার উট (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত করতেন। অন্য বর্ণনায় ঘোড়ার কথা এসেছে। যায়েদ ইবনে আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ‘হুনাই’ নামক তাঁর এক মুক্তদাসকে সংরক্ষিত চারণভূমির (হিমা) দায়িত্বে নিযুক্ত করেন এবং তাকে বলেন: হে হুনাই, মানুষের প্রতি তোমার হাত সংকুচিত করো (উদার হও) এবং মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো, কারণ মজলুমের দোয়া কবুল করা হয়। অল্প উট ও ভেড়ার মালিকদের (চারণভূমিতে) প্রবেশ করতে দাও, কিন্তু ইবনে আউফ এবং ইবনে আফফানের গবাদি পশু থেকে সাবধান থেকো। কারণ তাদের গবাদি পশু যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে তারা তাদের খেজুর বাগান ও ফসলি জমিতে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু অল্প উট ও ভেড়ার মালিকদের গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেলে তারা আমার কাছে এসে বলবে: হে আমিরুল মুমিনীন! তখন আমি কি তাদের অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখব? তোমার কল্যাণ হোক! নিশ্চয়ই পানি ও ঘাস সরবরাহ করা আমার কাছে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিলানোর চেয়ে সহজ। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! যদি সেই গবাদি পশু না থাকত যার ওপর আমি আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য আরোহণ করাই, তবে আমি তাদের দেশের এক বিঘাত জমিও সংরক্ষিত রাখতাম না। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো

প্রয়োজনে কোনো ভূমি সংরক্ষিত করে থাকেন এবং সেই প্রয়োজন এখনও বিদ্যমান থাকে, তবে তা আবাদ করা বৈধ নয়। আর যদি প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়, তবে এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে:

একটি হলো, এটি বৈধ কারণ যে কারণে সংরক্ষিত করা হয়েছিল তা দূর হয়ে গেছে। দ্বিতীয়টি হলো, এটি বৈধ নয়; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নির্দেশ দিয়েছেন তা অকাট্য বিধান (নস), তাই ইজতিহাদের মাধ্যমে তা বাতিল করা যাবে না। আর যদি অন্য কোনো ইমাম ভূমি সংরক্ষিত করেন এবং আমরা যদি সেই সংরক্ষণকে সঠিক মনে করি, এমতাবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি তা আবাদ করে ফেলে, তবে এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে:

প্রথমত: সে এর মালিক হবে না, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংরক্ষিত ভূমির মালিক হওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত: সে মালিক হবে; কারণ ইমামের ভূমি সংরক্ষণ একটি ইজতিহাদজাত বিষয়, আর আবাদ করার মাধ্যমে ভূমির মালিক হওয়া একটি অকাট্য বিধান (নস), আর অকাট্য বিধান ইজতিহাদের কারণে বাতিল হয় না। [আল-মুহাযযাব: ১/৪২৭]।

১ এটি আবু দাউদ ‘কিতাবুল খারাজ’ (৩০৭২), আহমাদ (৬৪২২), বাইহাকী ‘আস-সুনানুল কুবরা’ (১১৫৭০) এবং তাবারানী ‘আল-কাবীর’ (১৩৩৫২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং শায়খ আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

ইবনুল মুলাক্কিন বলেন: "প্রাচীন পরিত্যক্ত ভূমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য, এরপর তা তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে" হাদীসটি ইমাম শাফিঈ ইবনে তাউসের সূত্রে এবং বাইহাকী তাউসের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন: "এরপর তা পরবর্তীতে তোমাদের জন্য।" এটি ইবনে আব্বাস থেকে মাওকুফ হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। [খুলাসাতুল বদরিল মুনীর: ২/১০৯]।

(ص: 285)الأحكام السلطانية للماوردي

يملك بالإحياء سواءٌ عرف أربابه أو لم يعرفوا.

وقال مالك: يملك بالإحياء سواء عرف أربابه أو لم يعرفوا1، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن عرف أربابه لم يملك بالإحياء، وإن لم يعرفوا ملك بالإحياء، وإن لم يجز على مذهبه أن يملك بالإحياء من غير إقطاع، فإن عرف أربابه لم يجز إقطاعه، وكانوا أحق ببيعه وإحيائه، وإن لم يعرفوا جاز إقطاعه، وكان الإقطاع شرطًا في جواز إحيائه، فإذا صار الموات على ما شرحناه إقطاعًا، فمن خصه الإمام به وصار بالإقطاع أحق الناس به لم يستقر ملكه عليه قبل الإحياء، فإن شرع في إحيائه صار بكمال الإحياء مالكًا له، وإن أمسك عن إحيائه كان أحق به يدًا، وإن لم يصر ملكًا ثم روعي إمساكه عن إحيائه، فإن كان لعذر ظاهر لم يعترض عليه فيه، وأقرّ في يده إلى زوال عذره، وإن كان غير معذور، قال أبو حنيفة: لا يعارض فيه قبل مضيّ ثلاث سنين، فإن أحياه فيها، وإلّا بطل حكم إقطاعه بعدها احتجاجًا بأنَّ عمر رضي الله عنه جعل أجل الإقطاع ثلاث سنين.

وعلى مذهب الشافعي أنَّ تأجيله لا يلزم، وإنَّما المعتبر فيه القدرة على إحيائه، فإذا مضى عليه زمان يقدر على إحيائه فيه قيل له: إما تحييه فيقر في يدك، وإمّا أن ترفع يدك عنه ليعود إلى حاله قبل إقطاعه، وأما تأجيل عمر رضي الله عنه فهو قضية في عين يجوز أن يكون لسبب اقتضاه أو لاستحسان رآه.

---

1 قال أبو الحسن المرداوي -من الحنابلة: فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك فعلى روايتين: إن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بلا إحياء بلا خلاف، ونصَّ عليه مرارًا، وإن علم له مالك بشراء أو عطية، والمالك موجود هو أو أحد من ورثته لم يملك بالإحياء بلا خلاف، بل هو إجماع حكاه ابن عبد البر وغيره، وإن كان قد ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتًا، فهذا أيضًا لا يملك بالإحياء كذلك إذا كان لمعصوم، وإن علم ملكه معصوم فإن أحياه بدار الحرب واندرس كان كموات أصلي يملكه المسلم بالإحياء، قاله في

المحرر، وقال القاضي وابن عقيل وأبو الفرج الشيرازي: لا يملك بالإحياء، ويقتضيه مطلق نصوصه، وإن كان لا يعلم له مالك فهو أربعة أقسام:
أحدها: ما أثر الملك جاهلي كالقرى الخربة التي ذهبت أنهارها ودرست آثارها وقد شملها كلام المصنّف، ففي ملكها بالإحياء روايتان وغيره، إحداهما: لا تملك بالإحياء، والرواية الثانية: تملك بالإحياء، وصحَّحه في الحاوي والنظم وأطلقوا، والصحيح التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام. [الإنصاف: 6/ 355] .

আবাদ করার মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হয়, চাই এর মালিকদের পরিচয় জানা থাকুক বা না থাকুক।

ইমাম মালিক বলেন: আবাদ করার মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হয়, চাই এর মালিকদের পরিচয় জানা থাকুক বা না থাকুক। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন: যদি মালিকদের পরিচয় জানা থাকে তবে আবাদের মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হবে না, আর যদি পরিচয় জানা না থাকে তবে আবাদের মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হবে। যদিও তাঁর মাযহাব অনুযায়ী সরকারি বরাদ্দ ব্যতীত আবাদের মাধ্যমে মালিকানা লাভ করা যায় না। সুতরাং যদি মালিকদের পরিচয় জানা থাকে, তবে সেই জমি বরাদ্দ দেওয়া জায়েয নয় এবং তারা (মালিকরা) সেটি বিক্রি বা আবাদ করার ক্ষেত্রে অধিক হকদার। আর যদি মালিকদের পরিচয় জানা না থাকে, তবে তা বরাদ্দ দেওয়া জায়েয এবং এক্ষেত্রে বরাদ্দপ্রাপ্ত হওয়া আবাদ করার বৈধতার জন্য শর্ত। যখন পতিত জমি আমাদের বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত হবে, তখন ইমাম যাকে নির্দিষ্ট করে সেটি বরাদ্দ দেবেন তিনি এই বরাদ্দের কারণে অন্য সকল মানুষের চেয়ে সেটির অধিক হকদার হবেন, তবে আবাদ করার পূর্বে তার মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। যদি তিনি আবাদ শুরু করেন, তবে পূর্ণাঙ্গ আবাদের মাধ্যমে তিনি সেটির মালিক হবেন। আর যদি আবাদ করা থেকে বিরত থাকেন, তবে দখলী স্বত্বের ভিত্তিতে তিনি সেটির অধিক হকদার থাকবেন যদিও মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। এরপর তার আবাদ থেকে বিরত থাকার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হবে; যদি তা কোনো স্পষ্ট ওযরের কারণে হয় তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে না এবং ওযর দূর হওয়া পর্যন্ত জমিটি তার হাতেই বহাল রাখা হবে। আর যদি ওযর না থাকে, তবে ইমাম আবু হানিফা বলেন: তিন বছর পার হওয়ার আগে তাকে এ বিষয়ে কিছু বলা হবে না। যদি এই সময়ের মধ্যে তিনি আবাদ করেন তবে ভালো, নতুবা এর পরে তার বরাদ্দের বিধান বাতিল

হয়ে যাবে। এর সপক্ষে দলিল হলো উমর (রা.) বরাদ্দের মেয়াদ তিন বছর নির্ধারণ করেছিলেন।

আর ইমাম শাফেয়ির মাযহাব হলো, এই সময়সীমা নির্ধারণ করা বাধ্যতামূলক নয়, বরং এক্ষেত্রে আবাদ করার সক্ষমতাই বিবেচ্য। সুতরাং যখন এমন সময় অতিবাহিত হবে যাতে আবাদ করা সম্ভব ছিল, তখন তাকে বলা হবে: হয় আপনি এটি আবাদ করুন যাতে তা আপনার অধিকারে বহাল থাকে, নতুবা আপনার হাত গুটিয়ে নিন যাতে তা বরাদ্দের আগের অবস্থায় ফিরে যায়। আর উমর (রা.)-এর সময়সীমা নির্ধারণের বিষয়টি ছিল একটি বিশেষ ঘটনা কেন্দ্রিক ফয়সালা, যা কোনো বিশেষ কারণবশত অথবা তাঁর বিবেচনাপ্রসূত কোনো জনকল্যাণের (ইসতিহসান) ভিত্তিতে হতে পারে।

---

১. আবুল হাসান আল-মারদাবি—যিনি হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী—বলেন: যদি তাতে মালিকানার চিহ্ন থাকে কিন্তু মালিকের পরিচয় জানা না থাকে, তবে এ বিষয়ে দুটি বর্ণনা রয়েছে: যদি পতিত জমিটি আগে কখনো কারো মালিকানাধীন না হয়ে থাকে এবং তাতে আবাদ বা সংস্কারের কোনো চিহ্ন না পাওয়া যায়, তবে তা আবাদের মাধ্যমে মালিকানাধীন হবে—এতে কোনো দ্বিমত নেই এবং তিনি (ইমাম আহমাদ) বারবার এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আর যদি ক্রয় বা দানের মাধ্যমে এর মালিকের কথা জানা থাকে এবং সেই মালিক বা তার ওয়ারিশদের কেউ বিদ্যমান থাকে, তবে আবাদের মাধ্যমে সেটির মালিক হওয়া যাবে না—এতে কোনো দ্বিমত নেই, বরং এটি ইজমা (ঐক্যমত) যা ইবনে আব্দুল বার এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। আর যদি আগে আবাদের মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হয়ে থাকে কিন্তু পরে তা পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে ধ্বংস হয়ে পুনরায় পতিত জমিতে পরিণত হয়, তবে এটিও আবাদের মাধ্যমে মালিকানাভুক্ত হবে না যদি তা কোনো সংরক্ষিত ব্যক্তির (মুসলিম বা জিম্মি) মালিকানাধীন হয়ে থাকে। আর যদি জানা যায় যে এটি কোনো সংরক্ষিত ব্যক্তির মালিকানায় ছিল এবং তা দারুল হারব-এ অবস্থিত হওয়ার পর বিরান হয়ে যায়, তবে তা আদি পতিত জমির মতো গণ্য হবে যা একজন মুসলিম আবাদের মাধ্যমে মালিকানা লাভ করতে পারে; এটি ‘আল-মুহাররার’ গ্রন্থে বলা হয়েছে। কাজী, ইবনে আকিল এবং আবু ফারাজ আশ-শিরাজি বলেছেন: আবাদের মাধ্যমে এর মালিকানা অর্জিত হবে না এবং ইমাম আহমাদের সাধারণ বক্তব্যসমূহ একথাই দাবি করে। আর যদি মালিকের পরিচয় জানা না থাকে, তবে তা চার প্রকার হতে পারে:

প্রথমত: যার মালিকানার চিহ্ন জাহেলি যুগের (ইসলাম-পূর্ব), যেমন বিরান গ্রামসমূহ যার নহরগুলো বিলীন হয়ে গেছে এবং চিহ্নসমূহ মুছে গেছে। লেখকের বক্তব্য একেও অন্তর্ভুক্ত করে। এই জাতীয় জমি আবাদের মাধ্যমে মালিক হওয়ার ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটি হলো আবাদের মাধ্যমে মালিক হওয়া যাবে না, আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি হলো আবাদের মাধ্যমে মালিক হওয়া যাবে। 'আল-হাবি' ও 'আন-নাযম' গ্রন্থে দ্বিতীয় মতটিকে সহিহ বলা হয়েছে এবং তাঁরা একে সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে সঠিক হলো দারুল হারব ও দারুল ইসলামের মধ্যে পার্থক্য করা। [আল-ইনসাফ: ৬/৩৫৫]।

(ص: 286)الأحكام السلطانية للماوردي

فلو تغلَّب على هذا الموات المستقطع متغلِّب فأحياه، فقد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعي: إنَّ محييه أحق به من مستقطعه. وقال أبو حنيفة: إن أحياه قبل ثلاث سنين كان ملكًا للمقطع، وإن أحياه بعدها كان ملكًا للمحيي. وقال مالك: إن أحياه عالمًا بالإقطاع كان ملكًا للمقطع، وإن أحياه غير عالم بالإقطاع خيّر المقطَع بين أخذه وإعطاه المحيي نفقة عمارته، وبين تركه للمحيي والرجوع عليه بقيمة الموات قبل إحيائه1.

---

1 قال ابن قدامة المقدسي -من الحنابلة: وإن تحجَّر مواتًا وهو أن يشرع في إحيائه مثل أن أدار حول الأرض ترابًا وأحجارًا أو حاطها لم يملكها بذلك؛ لأن الملك بالإحياء وليس هذا إحياء، لكن يصير أحق الناس به؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" رواه أبو داود. فإن نقله إلى غيره صار الثاني بمنزلته؛ لأن صاحبه أقامه مقامه، وإن مات فوارثه أحق به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك حقًّا أو مالًا فهو لورثته"،

فإن باعه لم يصح بيعه؛ لأنه لم يملكه، فلم يملك بيعه كحق الشفعة قبل الأخذ به، وكمن سبق إلى معدن أو مباح قبل أخذه.

قال أبو الخطاب: ويحتمل جواز بيعه؛ لأنه له، فإن سبق غيره فأحياه ففيه وجهان: أحدهما: إنه يملكه؛ لأن الإحياء يملك به، والحجر لا يملك به، فثبت الملك بما يملك به دون ما لم يملك به، كمن سبق إلى معدن أو مشرعة ماء، فجاء غيره فأزاله وأخذه.

والثاني: لا يملكه؛ لأن مفهوم قوله عليه السلام: "من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد" وقوله في مسلم: "فهي له" إنَّها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق، وكذلك قوله: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" وروى سعيد في سننه أن عمر رضي الله عنه قال: من كانت له أرض -يعني: من تحجر- أرضًا فعطلها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها. وهذا يدل على أنَّ من عمَّرها قبل ثلاث سنين لا يملكها؛ لأنَّ الثاني أحيا في حق غيره فلم يملكه، كما لو أحيا ما يتعلق به مصالح ملك غيره، ولأنَّ حق المتحجّر أسبق، فكان أولى كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري، فإن طالت المدة عليه فينبغي أن يقول له السلطان: إمَّا أن تحييه أو تتركه ليحييه غيرك؛ لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم، فلم يمكن من ذلك، كما لو وقف في طريق ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا يدع غيره ينتفع، فإن سأل الإمهال لعذر له أمهل الشهر والشهرين ونحو ذلك، فإن أحياه غيره في مدّة ضربت له لينقطع حقه بمضيها، وسواء أذن له السلطان في عمارتها أو لم يأذن له، وإن لم يكن للمتحجّر عذر في ترك العمارة قيل له: إمَّا أن تعمّر وإمَّا أن ترفع يدك، فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها، فإن لم يقل له شيئًا واستمرَّ تعطيلها فقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنَّ من تحجَّر أرضًا فعطلها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها، ومذهب الشافعي في هذا كله نحو ما ذكرنا. [المغني: 5/ 331] .

যদি কেউ এই বরাদ্দকৃত অনাবাদী ভূমি দখল করে তা আবাদ করে ফেলে, তবে তার বিধান সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম তিনটি মতভেদ করেছেন: শাফেঈ মাজহাব অনুযায়ী, যে ব্যক্তি তা আবাদ করেছে, বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির চেয়ে সেই ব্যক্তিই এর অধিক হকদার। ইমাম আবু হানিফা বলেন: যদি তিন বছরের আগে তা আবাদ করে তবে তা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন হবে, আর যদি তিন বছর পর আবাদ করে তবে তা আবাদকারীর মালিকানাধীন হবে। ইমাম মালিক বলেন: যদি সে বরাদ্দের বিষয়টি জেনে আবাদ করে তবে তা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন হবে; আর যদি বরাদ্দের বিষয়টি না জেনে আবাদ করে, তবে বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দুটি বিষয়ের ইখতিয়ার প্রদান করা হবে: হয় সে জমিটি নিয়ে নেবে এবং আবাদকারীকে তার সংস্কারের ব্যয়ভার প্রদান করবে, অথবা জমিটি আবাদকারীর জন্য ছেড়ে দেবে এবং আবাদ করার পূর্বে ওই অনাবাদী ভূমির যে মূল্য ছিল তা আবাদকারীর নিকট থেকে গ্রহণ করবে।১

---

১ ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি —যিনি হাম্বলি মাজহাবের অনুসারী— বলেন: কেউ যদি কোনো অনাবাদী ভূমিতে বেষ্টনী দেয়, অর্থাৎ তা আবাদ করার কাজ শুরু করে— যেমন জমির চারপাশে মাটি বা পাথর দিয়ে ঘেরাও করে অথবা প্রাচীর দেয়— তবে এর দ্বারা সে তার মালিক হবে না; কারণ মালিকানা অর্জিত হয় আবাদ করার মাধ্যমে, আর এটি আবাদ নয়। তবে সে এই জমির ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার হবে; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোনো জিনিসের দিকে অগ্রসর হলো যাতে কোনো মুসলিম আগে পৌঁছায়নি, তবে সে-ই তার অধিক হকদার।" এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। এখন সে যদি এটি অন্য কাউকে হস্তান্তর করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হবে; কারণ তার পূর্ববর্তী ব্যক্তি তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছে। আর যদি সে মারা যায়, তবে তার উত্তরাধিকারী এর অধিক হকদার হবে; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো অধিকার বা সম্পদ রেখে যায়, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।" যদি সে এটি বিক্রি করে দেয়, তবে তার বিক্রি সহিহ হবে না; কারণ সে এর মালিক হয়নি। ফলে মালিকানা অর্জিত না হওয়ায় সে তা বিক্রি করার অধিকার রাখে না, যেমনটি হস্তগত করার পূর্বে শুফ'আর অধিকারের ক্ষেত্রে হয়, অথবা কোনো খনি বা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে যে আগে পৌঁছাল কিন্তু হস্তগত করার আগেই তা বিক্রির মতো।

আবু আল-খাত্তাব বলেন: এটি বিক্রি করা জায়েজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; কারণ এটি তার অধিকারভুক্ত। যদি অন্য কেউ আগে এসে তা আবাদ করে ফেলে, তবে সে ক্ষেত্রে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমত: সে এর মালিক হবে; কারণ আবাদ করার মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হয়, আর শুধু বেষ্টনী দেওয়ার মাধ্যমে মালিকানা আসে না। সুতরাং যা দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয় তার মাধ্যমেই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, যা দ্বারা মালিকানা আসে না তার দ্বারা নয়। যেমন কেউ কোনো খনি বা পানির ঘাটে আগে পৌঁছাল, অতঃপর অন্য কেউ এসে তাকে সরিয়ে দিয়ে তা হস্তগত করল।

দ্বিতীয়ত: সে এর মালিক হবে না; কারণ নবী আলাইহিস সালামের এই বাণীর মর্মার্থ: "যে ব্যক্তি এমন কোনো মৃত ভূমি আবাদ করল যা অন্য কারো নয়" এবং মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে: "তা তার জন্য"— তা এটাই নির্দেশ করে যে, যদি তাতে কোনো মুসলিমের অধিকার থাকে তবে তা আবাদকারীর হবে না। অনুরূপভাবে তাঁর এই বাণী: "যে ব্যক্তি এমন কোনো জিনিসের দিকে অগ্রসর হলো যাতে কোনো মুসলিম আগে পৌঁছায়নি, তবে সে-ই তার অধিক হকদার।" সাইদ তাঁর সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: যার কোনো ভূমি আছে —অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভূমিতে বেষ্টনী দিয়েছে— অতঃপর তিন বছর তা ফেলে রাখল, এরপর অন্য একদল লোক এসে তা আবাদ করল, তবে তারাই এর অধিক হকদার। এটি প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি তিন বছরের আগে তা আবাদ করবে সে তার মালিক হবে না; কারণ দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্য একজনের অধিকারভুক্ত স্থানে আবাদ করেছে, তাই সে তার মালিক হবে না। যেমন অন্যের মালিকানাধীন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো স্থান আবাদ করলে মালিকানা পাওয়া যায় না। এছাড়া বেষ্টনী প্রদানকারীর অধিকার আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই শুফ'আর অধিকারীর মতো সে-ই অগ্রগণ্য হবে। যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়, তবে শাসকের উচিত তাকে বলা: হয় তুমি এটি আবাদ করো, অন্যথায় এটি ছেড়ে দাও যাতে অন্য কেউ আবাদ করতে পারে। কারণ সে সাধারণ মানুষের একটি অংশীদারিত্বমূলক অধিকারে সংকীর্ণতা তৈরি করছে, যা তাকে করতে দেওয়া যায় না। যেমন কেউ যদি কোনো সংকীর্ণ রাস্তায় বা পানির ঘাটে বা খনিতে দাঁড়িয়ে থাকে যেখানে সে নিজেও উপকৃত হচ্ছে না আবার অন্যকেও উপকৃত হতে দিচ্ছে না। যদি সে কোনো ওজরের কারণে অবকাশ চায়, তবে তাকে এক বা দুই মাস বা অনুরূপ সময় অবকাশ দেওয়া হবে। যদি তার অধিকার শেষ হওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্য কেউ তা আবাদ করে ফেলে, তবে তার অধিকার বিলুপ্ত হবে; চাই শাসক তাকে

আবাদের অনুমতি দিন বা না দিন। যদি বেষ্টনী প্রদানকারীর আবাদ না করার কোনো ওজর না থাকে, তবে তাকে বলা হবে: হয় আবাদ করো নতুবা হাত গুটিয়ে নাও। সে যদি আবাদ না করে তবে অন্য কেউ তা আবাদ করতে পারবে। আর যদি তাকে কিছুই না বলা হয় এবং সে ফেলে রাখতেই থাকে, তবে আমরা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা উল্লেখ করেছি তা-ই প্রযোজ্য হবে যে— যদি কেউ জমি বেষ্টনী দিয়ে তিন বছর ফেলে রাখে এবং অন্য কেউ এসে তা আবাদ করে, তবে আবাদকারীই তার অধিক হকদার হবে। এই সব বিষয়ে ইমাম শাফেঈর মাজহাবও আমাদের বর্ণিত মতের অনুরূপ। [আল-মুগনি: ৫/৩৩১]।

(ص: 287)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل:

وأما العامر فضربان:

أحدهما: ما تعيَّنَ مالكه فلا نظر للسلطان فيه، إلَّا ما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بيت المال إذا كانت في دار الإسلام، سواء كانت لمسلمٍ أو ذميّ، فإن كانت في دار الحرب التي لا يثبت للمسلمين عليها بُدّ، فأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطع عند الظفر بها جاز.

وقد سأل تميم الداري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعه عيون البلد الذي كان منه بالشام قبل فتحه ففعل.

وسأله أبو ثعلبة الخشني أن يقطعه أرضًا كانت بيد الروم فأعجبه ذلك، وقال: "ألا تسمعون ما يقول؟ " فقال: والذي بعثك بالحق ليفتحنّ عليك. فكتب له بذلك كتابًا.

وهكذا لو استوهب من الإمام مال في دار الحرب وهو على ملك أهلها، أو استوهب أحد من سبيها وذراريها ليكون أحق به إذا فتحها، جاز وصحَّت العطية فيه مع الجهالة بها لتعلقها بالأمور العامة.

روى الشعبي أنَّ حريم بن أوس بن حارثة الطائي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فتح الله عليك الحيرة فأعطني بنت نفيلة، فلمَّا أراد خالد صلح أهل الحيرة، قال له حريم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لي بنت نفيلة، فلا تدخلها في صلحك، وشهد له بشير بن سعد ومحمد بن مسلمة، فاستثناها من الصلح ودفعها إلى حريم، فاشتُرِيَت منه بألف درهم، وكانت عجوزًا قد حالت عن عهده فقيل له: ويحك لقد أرخصتها، كان أهلها يدفعون إليك ضعف ما سألت بها، فقال: ما كنت أظن أن عددًا يكون أكثر من ألف1.

وإذا صحَّ الإقطاع والتمليك على هذا الوجه نظر حال الفتح، فإن كان صلحًا خلصت الأرض لمقطعها، وكانت خارجة عن حكم الصلح بالإقطاع السابق، وإن كان الفتح عنوة كان المستقطع والمستوهب أحق بما استقطعه واستوهبه من الغانمين، ونُظِرَ في الغانمين،

---

1 أورده الزيلعي في نصب الراية "3/ 433".

পরিচ্ছেদ:

আর আবাদকৃত ভূমির বিষয়টি দুই প্রকার:

প্রথমটি: যার মালিক সুনির্ধারিত, সে বিষয়ে সুলতানের কোনো হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। তবে ভূমিটি যদি দারুল ইসলামে (ইসলামী ভূখণ্ডে) হয়, তবে উক্ত ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট বায়তুল মালের হকের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম হবে; চাই তার মালিক কোনো মুসলিম হোক বা জিম্মি। কিন্তু ভূমিটি যদি দারুল হারবে (যুদ্ধরত অমুসলিম ভূখণ্ডে) হয়, যেখানে এখনও মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এমতাবস্থায় ইমাম যদি তা কাউকে ইকতা (বরাদ্দ) দিতে চান যেন বিজয়ের পর বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার মালিক হতে পারে, তবে তা বৈধ।

তামীম আদ-দারি (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শাম বিজয়ের পূর্বে তাঁর স্বগোত্রীয় অঞ্চলের ঝরনাধারাগুলো ইকতা হিসেবে চেয়েছিলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) তা মঞ্জুর করেছিলেন।

আবু ছা'লাবা আল-খুশানী (রা.) তাঁর নিকট রোমকদের অধীনে থাকা একটি ভূখণ্ড ইকতা হিসেবে চেয়েছিলেন। এতে তিনি (নবীজি) বিস্ময় ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন: "সে কী বলছে তোমরা কি শুনছ?" তিনি বললেন: "যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম! অবশ্যই আপনার হাতে বিজয় আসবে।" অতঃপর তিনি তাঁকে এ মর্মে একটি সনদ লিখে দিলেন।

অনুরূপভাবে, যদি কেউ ইমামের নিকট দারুল হারবে অবস্থিত এমন কোনো সম্পদ চেয়ে নেয় যা তখনও সেখানকার অধিবাসীদের মালিকানাধীন রয়েছে, অথবা যুদ্ধবন্দী ও তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে কাউকে প্রদানের আবেদন করে যেন বিজয়ের পর সে তাদের ব্যাপারে অধিক হকদার হতে পারে, তবে তা জায়েজ হবে এবং এই দান সহিহ হবে। যদিও এক্ষেত্রে অস্পষ্টতা (জাহালাত) রয়েছে, তবুও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও সাধারণ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় তা বৈধ।

শাবী বর্ণনা করেন যে, হুরআইম বিন আউস বিন হারিসা আত-তাঈ (রা.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন: "আল্লাহ যদি আপনাকে হীরা বিজয়ের সুযোগ দেন, তবে আমাকে নুফাইলার কন্যাকে দান করবেন।" পরবর্তীতে খালিদ (রা.) যখন হীরাবাসীদের সাথে সন্ধি করতে চাইলেন, তখন হুরআইম তাঁকে বললেন: "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুফাইলার কন্যাকে আমার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, সুতরাং তাকে আপনার সন্ধিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত করবেন না।" বশীর বিন সাদ এবং মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করলেন। ফলে খালিদ (রা.) তাকে সন্ধির শর্তাবলি থেকে বাদ রাখলেন এবং হুরআইমের নিকট হস্তান্তর করলেন। অতঃপর এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তাকে তাঁর কাছ থেকে কিনে নেওয়া হয়। সে ছিল এক বৃদ্ধা এবং হুরআইম তাকে পূর্বে যেমন দেখেছিলেন তার পরিবর্তন ঘটেছিল। তাঁকে বলা হলো: "আফসোস! আপনি তো তাকে অনেক সস্তায় বিক্রি করলেন। তার পরিজন তো আপনার চাওয়ার দ্বিগুণ মূল্য পরিশোধ করতে প্রস্তুত ছিল।" তিনি বললেন: "আমি ধারণাই করতে পারিনি যে এক হাজারের চেয়ে বড় কোনো সংখ্যা হতে পারে।"১

যখন এই পদ্ধতিতে ইকতা (বরাদ্দ) ও মালিকানা প্রদান বৈধ হয়, তখন বিজয়ের সময়কার পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হবে। যদি বিজয় সন্ধির মাধ্যমে হয়, তবে সেই ভূমিটি চূড়ান্তভাবে

বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন হবে এবং পূর্ববর্তী বরাদ্দ অনুযায়ী তা সন্ধির বিধানের বাইরে থাকবে। আর যদি বিজয় শক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়, তবে গনীমত লাভকারীদের তুলনায় বরাদ্দপ্রাপ্ত বা দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই নির্দিষ্ট বরাদ্দকৃত বা দানকৃত বিষয়ের ওপর অধিক হকদার হবে। তখন গনীমত লাভকারী অন্যান্য যোদ্ধাদের পাওনার বিষয়ে বিবেচনা করা হবে...

---

১. যায়লায়ী এটি 'নাসবুর রায়াহ' গ্রন্থে (৩/৪৩৩) উল্লেখ করেছেন।

(ص: 288)الأحكام السلطانية للماوردي

فإن علموا بالإقطاع والهبة قبل الفتح فليس لهم المطالبة بعِوَض ما استقطع ووهب؛ وإن لم يعلموا حتى فتحوا عاوضهم الإمام عنه بما يستطيب به نفوسهم، كما يستطيب نفوسهم عن غير ذلك من الغنائم. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه استطابة نفوسهم عنه ولا عن غيره من الغنائم إذا رأى المصلحة في أخذها منهم.

والضرب الثاني: من العامر ما لم يتعيّن مالكوه ولم يتميّز مستحقوه، وهو على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما اصطفاه الإمام لبيت المال من فتوح البلاد، إمَّا بحق الخمس فيأخذه باستحقاق أهله، وإمَّا بأن يصطفيه باستطابة نفوس الغانمين عنه، فقد اصطفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أرض السواد أموال كسرى وأهل بيته، وما هرب عنه أربابه أو هلكوا، فكان مبلغ غلتها تسعة آلاف ألف درهم، كان يصرفها في مصالح المسلمين، ولم يقطع شيئًا منها، ثم إنَّ عثمان رضي الله عنه أقطعها؛ لأنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها، وشرط على من أقطعها إياه يأخذ منه حق الفيء، فكان ذلك منه إقطاع إجازة لا إقطاع تمليك، فتوفَّرت غلتها حتى بلغت على ما قيل: خمسين ألف ألف درهم، فكان منها صلاته وعطاياه، ثم تناقلها الخلفاء بعده، فلمَّا

كان عام الجماجم سنة اثنتين وثمانين في فتنة ابن الأشعث أحرق الديوان وأخذ كل قوم ما يليهم، فهذا النوع من العامر لا يجوز إقطاع رقبته؛ لأنه قد صار باصطفائه لبيت المال ملكًا لكافة المسلمين، فجرى على رقبته حكم الوقوف المؤبَّدة، وصار استغلاله هو المال الموضوع في حقوقه.

والسلطان فيه بالخيار على وجه النظر في الأصلح بين أن يستغلّه لبيت المال كما فعل عمر رضي الله عنه، وبين أن يتخيّر له من ذوي المكنة والعمل من يقوم بعمارة رقبته بخراج يوضع عليه مقدَّر بوفور الاستغلال، ونقصه كما فعل عثمان رضي الله عنه، ويكون الخراج أجرة تصرّف في وجوه المصالح، إلَّا أن يكون مأخوذًا بالخمس فيصرف في أهل الخمس، فإن كان ما وضعه من الخراج مقاسمة على الشطر من الثمار والزروع جاز في النخل، كما ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على النصف من ثمار النخل، وجوازها في الزرع معتبر باختلاف

যদি তারা বিজয়ের আগে ভূমি বরাদ্দ এবং দান সম্পর্কে জানতে পারে, তবে বরাদ্দকৃত বা দানকৃত জিনিসের বিনিময়ের দাবি করার অধিকার তাদের নেই। আর যদি তারা বিজয়ের আগে তা না জানতে পারে, তবে ইমাম তাদের সন্তুষ্টির জন্য বিনিময়ে কিছু প্রদান করবেন, যেমনটি তিনি অন্যান্য গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ মাল) ক্ষেত্রে তাদের সন্তুষ্টি বিধান করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন: যদি ইমাম তাদের থেকে তা গ্রহণ করার মধ্যে জনকল্যাণ দেখেন, তবে তাদের সন্তুষ্টি বিধান করা তার জন্য আবশ্যক নয়—না এই ক্ষেত্রে, আর না অন্য কোনো গনীমতের ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় প্রকার: আবাদি ভূমির মধ্যে যাদের মালিক নির্ধারিত হয়নি এবং পাওনাদাররা সুস্পষ্ট নয়। এটি তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথমটি: বিজিত দেশসমূহ থেকে ইমাম যা বায়তুল মালের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন; তা হতে পারে ‘খুমুস’ (এক-পঞ্চমাংশ) এর অধিকার হিসেবে যা তিনি এর হকদারদের জন্য গ্রহণ করেন, অথবা যোদ্ধাদের সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে তিনি তা আলাদা করে রাখেন। যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সাওয়াদ ভূমি থেকে কিসরা ও তার পরিবার-পরিজনের সম্পদ এবং যাদের মালিকরা পালিয়ে গিয়েছিল বা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তা নির্বাচন করেছিলেন। এর রাজস্বের

পরিমাণ ছিল নব্বই লক্ষ দিরহাম, যা তিনি মুসলিমদের জনকল্যাণে ব্যয় করতেন এবং এর কোনো অংশই তিনি কাউকে বরাদ্দ দেননি। পরবর্তীতে উসমান (রা.) তা বরাদ্দ দেন; কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, ফেলে রাখার চেয়ে বরাদ্দ দেওয়া রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ। আর তিনি শর্ত দিয়েছিলেন যে, যাকে তা বরাদ্দ দেওয়া হবে তার কাছ থেকে 'ফায়' এর হক গ্রহণ করা হবে। এটি ছিল কেবল ব্যবহারের অনুমতি হিসেবে বরাদ্দ, মালিকানা হিসেবে বরাদ্দ নয়। ফলে এর রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং বলা হয়ে থাকে যে, তা পাঁচ কোটি দিরহামে পৌঁছায়। তা থেকেই তিনি দান-খয়রাত ও অনুদান প্রদান করতেন। এরপর পরবর্তী খলিফারাও এর উত্তরাধিকারী হন। যখন বিরাশি হিজরীতে ইবনুল আশআসের ফিতনার সময় 'জ্যামাজেমের যুদ্ধ' সংঘটিত হলো, তখন নথিপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হলো এবং প্রত্যেক দল তাদের নিকটবর্তী অংশ দখল করে নিল। এই প্রকারের আবাদি ভূমির মূল স্বত্ব বরাদ্দ দেওয়া জায়েজ নয়; কারণ বায়তুল মালের জন্য এটি নির্দিষ্ট করার ফলে তা সমস্ত মুসলমানের মালিকানাধীন হয়ে গেছে। ফলে এর মূল স্বত্বের ওপর চিরস্থায়ী ওয়াকফ-এর বিধান জারি হয়েছে এবং এর থেকে প্রাপ্ত আয় মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণে বরাদ্দকৃত সম্পদে পরিণত হয়েছে।

সুলতান (শাসক) এক্ষেত্রে অধিকতর জনকল্যাণ বিবেচনায় ইখতিয়ার রাখেন; হয় তিনি তা বায়তুল মালের জন্য সরাসরি কাজে লাগাবেন যেমন উমর (রা.) করেছিলেন, অথবা তিনি সামর্থ্যবান ও কর্মঠ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এমন কাউকে বেছে নেবেন যারা এর আবাদ করবে এবং এর ওপর একটি 'খরাজ' ধার্য করবেন, যা উৎপাদনের আধিক্য বা স্বল্পতার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে যেমন উসমান (রা.) করেছিলেন। এই খরাজ হবে এক প্রকার ভাড়া যা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হবে; তবে যদি তা 'খুমুস' হিসেবে নেওয়া হয়, তবে তা খুমুসের হকদারদের মধ্যে ব্যয় করা হবে। যদি ধার্যকৃত খরাজ ফল বা ফসলের অর্ধাংশ ভাগ করে নেওয়ার ভিত্তিতে হয়, তবে খেজুর গাছের ক্ষেত্রে তা বৈধ হবে; যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) খায়বারবাসীদের সাথে খেজুরের ফসলের অর্ধেক দেওয়ার শর্তে চুক্তি করেছিলেন। আর ফসলের ক্ষেত্রে এর বৈধতা মতপার্থক্য সাপেক্ষে বিবেচিত...

الفقهاء في جواز المخابرة، فمن أجازها أجاز الخراج بها1، ومن منع منها منع من الخراج بها، وقيل: بل يجوز الخراج بها، وإن منع المخابرة لما يتعلّق بها من عموم المصالح التي يتّسع حكمها عن أحكام العقود الخاصة، ويكون العشر واجبًا في الزرع دون الثمر؛ لأنَّ الزرع ملك لزارعيه، والثمرة ملك لكافَّة المسلمين مصروفة في مصالحهم.

والقسم الثاني من العامر: أرض الخراج، فلا يجوز إقطاع رقابهم تمليكًا؛ لأنها تنقسم على ضربين: ضرب يكون رقابهم وقفًا وخراجها أجرة، فتمليك الوقف لا يصح بإقطاع ولا بيع ولا هبة، وضرب يكون رقابها ملكًا وخراجها جزية، فلا يصح إقطاع مملوك تعين مالكوه، فأمَّا إقطاع خراجها فنذكره بعد في إقطاع الاستغلال.

والقسم الثالث: ما مات عنه أربابه ولم يستحقه وارثه بفرض ولا تعصيب، فينتقل إلى بيت المال ميراثًا لكافَّة المسلمين مصروفًا في مصالحهم. وقال أبو حنيفة: ميرات من لا وارث له مصروف في الفقراء خاصة صدقة عن الميت، ومصرفه عند الشافعي في وجوه المصالح أعمّ؛ لأنه قد كان من الأملاك الخاصة، وصار بعد الانتقال إلى بيت المال من الأملاك العامة، وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما انتقل إلى بيت المال من رقاب الأموال هل يصير وقفًا عليه بنفس الانتقال إليه؟ على وجهين:

أحدهما: إنها تصير وقفًا لعموم مصرفها الذي لا يختص، فعلى هذا لا يجوز بيعها ولا إقطاعها.

والوجه الثاني: لا تصير وقفًا حتى يقفها الإمام، فعلى هذا يجوز له بيعها إذا رأى بيعها أصلح لبيت المال، ويكون ثمنها مصروفًا في عموم المصالح، وفي ذوي الحاجات من أهل الفيء وأهل الصدقات، وأمَّا إقطاعها على هذا الوجه فقد قيل بجوازه؛ لأنَّه لما جاز بيعها وصرف ثمنها إلى من يراه من ذوي الحاجات وأرباب المصالح جاز إقطاعها له، ويكون تمليك رقبتها كتمليك ثمنها، وقيل: إنَّ إقطاعها لا يجوز وإن جاز

بيعها؛ لأنَّ البيع معاوضة وهذا الإقطاع صلة، والأثمان إذا صارت ناضَّة له حكم يخالف في العطايا حكم الأصول

---

1 في الحديث: الذي رواه البخاري في كتاب الإجارة "2286"، ومسلم في كتاب المساقاة "1551" عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

মুখাবারা (বর্গা চাষ) বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। যারা একে বৈধ বলেছেন, তারা এর ভিত্তিতে খরাজ (ভূমি রাজস্ব) আদায় করাকেও বৈধ বলেছেন। আর যারা একে নিষেধ করেছেন, তারা এর ভিত্তিতে খরাজ আদায় করাকেও নিষিদ্ধ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন: বরং এর ভিত্তিতে খরাজ বৈধ হবে, যদিও মুখাবারা নিষিদ্ধ হয়; কারণ এর সাথে এমন জনকল্যাণ (মাসালিহ আম্মাহ) জড়িত যার বিধান বিশেষ চুক্তিসমূহের বিধান অপেক্ষা ব্যাপকতর। এমতাবস্থায় উৎপাদিত শস্যের ওপর উশর (দশমাংশ) প্রদান করা ওয়াজিব হবে, ফলের ওপর নয়; কেননা শস্য হলো চাষীদের মালিকানা, আর ফল হলো সমস্ত মুসলমানের মালিকানা যা তাদের সামগ্রিক কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

আবাদি ভূমির দ্বিতীয় প্রকার হলো: খরাজি জমি। মালিকানা প্রদানের উদ্দেশ্যে এগুলোর মূল সত্তা (রাকাবা) ইকতা করা জায়েজ নয়। কারণ এগুলো দুই ভাগে বিভক্ত: প্রথম প্রকার হলো যার মূল সত্তা ওয়াকফ হিসেবে গণ্য এবং তার খরাজ হলো মূলত ভাড়া; সুতরাং ইকতা, বিক্রয় বা হেবা করার মাধ্যমে ওয়াকফকৃত সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর করা সহীহ নয়। দ্বিতীয় প্রকার হলো যার মূল সত্তা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এবং তার খরাজ হলো জিজয়া; সুতরাং সুনির্দিষ্ট মালিকানাধীন কোনো সম্পদ ইকতা করা সহীহ নয়। আর এর খরাজ ইকতা করার বিষয়টি আমরা পরবর্তীতে 'ইকতাউল ইস্তিগলাল' (উৎপাদন বা উপযোগ দান) অধ্যায়ে আলোচনা করব।

তৃতীয় প্রকার: এমন সম্পদ যার মালিক মৃত্যুবরণ করেছে এবং নির্ধারিত অংশ (ফারদ) বা আসাবা (অবশিষ্টাংশ ভোগী) হিসেবে এর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। এমতাবস্থায় তা সমস্ত মুসলমানের উত্তরাধিকার হিসেবে বায়তুল মালে হস্তান্তরিত হবে এবং তাদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: যার কোনো উত্তরাধিকারী নেই তার উত্তরাধিকার সম্পদ

বিশেষভাবে দরিদ্রদের মাঝে মৃতের পক্ষ থেকে সদকা হিসেবে ব্যয় করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে, এর ব্যয়ের খাত জনকল্যাণমূলক কাজে অধিকতর ব্যাপক; কারণ এটি পূর্বে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল এবং বায়তুল মালে হস্তান্তরিত হওয়ার পর তা সাধারণ বা রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে। বায়তুল মালে হস্তান্তরিত হওয়া মূল সম্পদ কি সেখানে স্থানান্তরের সাথেই ওয়াকফ হয়ে যায়? এ বিষয়ে শাফেয়ী মাযহাবের আলিমগণের দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি হলো: এটি ওয়াকফ হয়ে যাবে, কারণ এর ব্যয়ের খাত কোনো বিশেষ শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং সাধারণ। এই মতানুসারে এটি বিক্রয় করা বা ইকতা প্রদান করা জায়েজ হবে না।

দ্বিতীয় মতটি হলো: ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) নিজে ওয়াকফ না করা পর্যন্ত এটি ওয়াকফ হবে না। এই মতানুসারে, তিনি যদি বায়তুল মালের জন্য অধিকতর কল্যাণকর মনে করেন তবে এটি বিক্রয় করা তার জন্য জায়েজ। এমতাবস্থায় এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ সাধারণ জনকল্যাণে এবং ফায় ও সদকার হকদার অভাবী লোকদের মাঝে ব্যয় করা হবে। এই মতের ভিত্তিতে ইকতা করার বিষয়ে বলা হয়েছে যে এটি জায়েজ; কারণ যেহেতু এটি বিক্রয় করা এবং এর মূল্য অভাবী ও জনকল্যাণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রদান করা জায়েজ, তাই তাদের জন্য এটি ইকতা হিসেবে প্রদান করাও জায়েজ হবে। এক্ষেত্রে মূল সত্তার মালিকানা প্রদান করা তার মূল্যের মালিকানা প্রদানের মতোই গণ্য হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন: এটি বিক্রয় করা জায়েজ হলেও ইকতা করা জায়েজ হবে না; কারণ বিক্রয় হলো একটি বিনিময় চুক্তি, আর এই ইকতা হলো একটি অনুগ্রহ বা দান। আর সম্পদ যখন নগদ অর্থে রূপান্তরিত হয়, তখন দান-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে তার বিধান মূল স্থাবর সম্পত্তির বিধান থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে।

---

১. হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: যা ইমাম বুখারি 'কিতাবুল ইজারা' (২২৮৬) এবং ইমাম মুসলিম 'কিতাবুল মুসাকাত' (১৫৫১)-এ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবরবাসীদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করেছিলেন যে, সেখানে উৎপাদিত ফল বা শস্যের অর্ধেক তারা পাবে।

الثابتة فافترقا؛ وإن كان الفرق بينهما ضعيفًا، وهذا الكلام في إقطاع التمليك.

فصل:

وأما إقطاع الاستغلال فعلى ضربين: عُشْرٌ، وخراج1.

فأما العشر فإقطاعه لا يجوز؛ لأنه زكاة لأصناف يعتبر وصف استحقاقها عند دفعها إليهم، وقد يجوز أن لا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها؛ لأنها تجب بشروط يجوز أن لا توجد فلا تجب، فإن وجبت وكان مقطعها وقت الدفع مستحقًّا كانت حوالة بعشر قد وجب على ربّه لمن هو من أهله، صح وجاز دفعه إليه، ولا يصير دينًا له مستحقًّا حتى يقبضه؛ لأن الزكاة لا تملك إلَّا بالقبض، فإن منع من العشر لم يكن له خصمًا فيه، وكان عامل العشر بالمطالبة أحق.

وأمَّا الخراج فيختلف حكم إقطاعه باختلاف حال مقطعه، وله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون من أهل الصدقات، فلا يجوز أن يقطع مال الخراج؛ لأن الخراج فيء لا يستحقه أهل الصدقة، كما لا يستحق الصدقة أهل الفيء، وجوَّز أبو حنيفة ذلك؛ لأنَّه يجوز صرف الفيء في أهل الصدقة.

والحالة الثانية: أن يكون من أهل المصالح مِمَّن ليس له رزق مفروض، فلا يصح أن يقطعه على الإطلاق، وإن جاز أن يعطاه من مال الخراج؛ لأنَّه من نفل أهل الفيء لا من

---

1 قال منصور بن يونس البهوتي من الحنابلة: وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين عشر وخراج، وللإمام إقطاع موات لمن يحييه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، وأقطع وائل بن حجر أرضًا، وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة، ولا يملكه -أي: الموات- بالإقطاع؛ لأنَّه لو ملكه ما جاز استرجاعه، بل

يصير المقطع كالمتحجّر الشارع في الإحياء؛ لأنه ترجح بالإقطاع على غيره، ويسمَّى تملكًا لما له إليه، ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلَّا ما قدر المقطع على إحيائه؛ لأنَّ في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقًا على الناس في حق مشترك بينهم مما لا فائدة فيه، فإن أقطع الإمام أحدًا أكثر منه، أيّ: مما يقدر على إحيائه، ثم تبين عجزه عن إحيائه، استرجعه الإمام منه، كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وله -أي: للإمام- موات تمليكًا وانتفاعًا للمصلحة لما تقدَّم. [كشف القناع: 4/ 195] .

স্থায়ী, তাই তারা ভিন্ন হলো; যদিও তাদের মধ্যকার পার্থক্য ক্ষীণ। আর এই আলোচনাটি ছিল মালিকানা প্রদানের (ইকতা-আত-তামলিক) ক্ষেত্রে।

পরিচ্ছেদ:

আর ভোগাধিকার প্রদানের (ইকতা-আল-ইস্তিঘলাল) বিষয়টি দুই প্রকারের: উশর (দশমাংশ) এবং খারাজ (ভূমি রাজস্ব)১।

উশরের ক্ষেত্রে তা প্রদানের অধিকার দেওয়া বৈধ নয়; কারণ এটি নির্দিষ্ট শ্রেণির লোকদের জন্য নির্ধারিত জাকাত, যাদের প্রাপ্যতা বিবেচ্য হয় তাদের নিকট তা হস্তান্তরের সময়। এমন হওয়া সম্ভব যে, প্রাপ্যতার সময় তারা এর উপযুক্ত ছিল না; কারণ জাকাত কিছু নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে ওয়াজিব হয় যা অনুপস্থিত থাকতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তা ওয়াজিব হবে না। যদি তা ওয়াজিব হয় এবং প্রদানের সময় প্রাপক এর যোগ্য হয়, তবে তা মালিকের ওপর ওয়াজিব হওয়া উশর সেই ব্যক্তির অনুকূলে স্থানান্তর হিসেবে গণ্য হবে যে এর উপযুক্ত। এটি শুদ্ধ এবং তাকে প্রদান করা বৈধ। তবে এটি তার জন্য পাওনা ঋণ হিসেবে সাব্যস্ত হবে না যতক্ষণ না সে তা হস্তগত করে; কারণ জাকাত গ্রহণ করা ছাড়া মালিকানাভুক্ত হয় না। যদি তাকে উশর প্রদানে বাধা দেওয়া হয়, তবে সে এর বিরুদ্ধে দাবিদার হতে পারবে না, বরং উশর আদায়কারী কর্মকর্তাই তা তলব করার অধিক হকদার হবেন।

আর খারাজের ক্ষেত্রে তা প্রদানের বিধান গ্রহীতার অবস্থার ভিন্নতার কারণে ভিন্ন হবে। এর তিনটি অবস্থা রয়েছে:

প্রথমত: সে যদি সদকার উপযুক্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তাকে খারাজ সম্পদ প্রদানের অধিকার দেওয়া জায়েজ নেই। কেননা খারাজ হলো রাষ্ট্রীয় সম্পদ (ফাই), যার ওপর সদকার

উপযুক্তদের কোনো অধিকার নেই, ঠিক যেমন রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপযুক্তদের সদকার ওপর কোনো অধিকার নেই। তবে ইমাম আবু হানিফা একে বৈধ বলেছেন; কারণ তাঁর মতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ সদকার উপযুক্তদের ওপর ব্যয় করা জায়েজ।

দ্বিতীয় অবস্থা: সে যদি জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি হয় যার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ভাতা নির্ধারিত নেই। সেক্ষেত্রে তাকে নিঃশর্তভাবে এই অধিকার দেওয়া সঠিক হবে না, যদিও খারাজ সম্পদ থেকে তাকে প্রদান করা বৈধ হতে পারে; কারণ এটি রাষ্ট্রীয় সম্পদের অংশীদারদের জন্য অতিরিক্ত অনুদান হিসেবে গণ্য, কোনো

---

১ হাম্বলি মাজহাবের ফকিহ মানসুর ইবনে ইউনুস আল-বাহুতি বলেছেন: ভোগাধিকার প্রদানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে— উশর এবং খারাজ। ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য অনাবাদি জমি কাউকে আবাদ করার শর্তে প্রদান করার অধিকার রয়েছে; কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল ইবনে হারিসকে আকিক অঞ্চল এবং ওয়ায়েল ইবনে হুজরকে একখণ্ড জমি প্রদান করেছিলেন। তদ্রূপ আবু বকর, উমর, উসমান এবং সাহাবায়ে কিরামের একটি বড় অংশ জমি প্রদান করেছিলেন। তবে গ্রহীতা এই প্রদানের মাধ্যমে সেই অনাবাদি জমির মালিক হয়ে যায় না; কারণ সে যদি এর মালিক হতো তবে তা ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ হতো না। বরং গ্রহীতা সেই ব্যক্তির মতো হবে যে জমি ঘেরাও করে আবাদ শুরু করেছে; কারণ এই প্রদানের মাধ্যমে সে অন্যের তুলনায় অগ্রাধিকার পেয়েছে। পরিণতির বিবেচনায় একে মালিকানা বলা হয়। ইমামের জন্য উচিত নয় গ্রহীতার আবাদ করার সক্ষমতার অতিরিক্ত জমি প্রদান করা; কারণ সক্ষমতার অতিরিক্ত জমি প্রদান করা মানুষের জন্য একটি সাধারণ ও অংশীদারিত্বমূলক অধিকারে সংকীর্ণতা তৈরি করে যাতে কোনো উপকার নেই। যদি ইমাম কাউকে তার সক্ষমতার অতিরিক্ত জমি প্রদান করেন এবং পরে তার আবাদ করার অক্ষমতা প্রকাশ পায়, তবে ইমাম তার থেকে তা ফিরিয়ে নেবেন; যেমন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিলাল ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে আকিক অঞ্চলের সেই জমি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন যা তিনি আবাদ করতে অক্ষম ছিলেন এবং যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রদান করেছিলেন। আর জনস্বার্থে মালিকানা বা উপযোগ গ্রহণের জন্য অনাবাদি জমি প্রদান করার অধিকার ইমামের রয়েছে যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। [কাশশাফুল কিনা: ৪/ ১৯৫]।

فرضه، وما يعطى له إنَّما هو من صلات المصالح، فإن جعل له من مال الخراج شيء أجرى عليه حكم الحوالة والتسبب، لا حكم الإقطاع، فيعتبر في جوازه شرطان:

أحدهما: أن يكون بمالٍ مقدَّر قد وجد سبب استباحته.

والثاني: أن يكون مال الخراج قد حلَّ ووجب؛ ليصحَّ التسبب عليه والحوالة به، فخرج بهذين الشرطين عن حكم الإقطاع.

والحالة الثالثة: أن يكون من مرتزقة أهل الفيء وفرضية الديوان، وهم أهل الجيش، وهو أخص الناس بجواز الإقطاع؛ لأنَّ لهم أرزاقًا مقدَّرة تصرف إليهم مصرف الاستحقاق؛ لا تعويض عمَّا أرصدوا نفوسهم من حماية البيضة والذبّ عن الحريم، فإذا صحَّ أن يكونوا من أهل الإقطاع روعي حينئذ مال الخراج، فإن له حالتين: حال يكون جزية، وحال يكون أجرة، فأمَّا ما كان منه جزية فهو مستقرٌّ على التأبيد؛ لأنه مأخوذ مع بقاء الكفر، وزائل مع حدوث الإسلام، فلا يجوز إقطاعه أكثر من سنة؛ لأنه غير موثوق باستحقاقه بعدها، فإن أقطعه سنة بعد حلوله واستحقاقه صح، وإن أقطعه في السنة قبل استحقاقه ففي جوازه وجهان:

أحدهما: يجوز إذا قيل: إنَّ حول الجزية مضروب للأداء.

والثاني: لا يجوز إذا قيل: إنَّ حول الجزية مضروب للوجوب، وأمَّا ما كان من الخراج أجرة فهو مستقر الوجوب على التأبيد، فيصح إقطاعه سنتين، ولا يلزم الاقتصار منه على سنة واحدة، بخلاف الجزية التي لا تستقر.

وإذا كان كذلك فلا يخلو حاله أقطاعه من ثلاثة أقسام:

أحدهما: أن يقدِّر سنين معلومة كإقطاعه عشر سنين، فيصحّ إذا روعي فيه شرطان:

أحدهما: أن يكون رزق المقطع معلوم القدر عند باذل الإقطاع؛ فإن كان مجهولًا عنده لم يصح.

والثاني: أن يكون قدر الخراج معلومًا عند المقطع وعند باذل الإقطاع، فإن كان مجهولًا عندهما أو عند أحدهما لم يصح، وإذا كان كذلك لم يخل حال الخراج من أحد أمرين، إما أن

তার নির্ধারিত পাওনা, এবং তাকে যা প্রদান করা হয় তা মূলত জনস্বার্থমূলক অনুদান। যদি তাকে খারাজের সম্পদ থেকে কিছু প্রদান করা হয়, তবে তার ওপর দায় স্থানান্তর (হাওয়ালা) এবং কারণ সাব্যস্তকরণের (তাসাববুব) বিধান প্রযোজ্য হবে, ইকতা বা ভূমি বরাদ্দের বিধান নয়। এর বৈধতার ক্ষেত্রে দুটি শর্ত বিবেচনা করা হয়:

প্রথমত: এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ হতে হবে যার অধিকার লাভের কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: খারাজের অর্থ আদায়ের সময় হতে হবে এবং তা আবশ্যক হতে হবে; যাতে এর ওপর দায় স্থানান্তর ও কারণ সাব্যস্ত করা বৈধ হয়। এই দুটি শর্তের মাধ্যমে এটি ইকতা-এর বিধান থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়।

তৃতীয় অবস্থা: প্রাপক যেন ‘ফাই’ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে বেতনভোগী এবং রাষ্ট্রীয় নিবন্ধনের (দেওয়ান) অন্তর্ভুক্ত হয়, যারা মূলত সেনাবাহিনীর সদস্য। ইকতা প্রদানের বৈধতার ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে বেশি বিশেষায়িত; কারণ তাদের জন্য নির্দিষ্ট জীবনোপকরণ (রিযিক) রয়েছে যা তাদের প্রাপ্য হিসেবে প্রদান করা হয়; এটি কেবল দেশরক্ষা এবং সীমানা পাহারায় নিজেদের নিয়োজিত করার বিনিময় নয়। যখন তাদের ইকতা প্রদান করা সঠিক হবে, তখন খারাজ সম্পদের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। এর দুটি অবস্থা রয়েছে: একটি হলো জিজিয়া হিসেবে, এবং অন্যটি হলো ভাড়া হিসেবে। যা জিজিয়া হিসেবে ধার্য, তা স্থায়ীভাবে নির্ধারিত; কারণ কুফর বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত তা গ্রহণ করা হয় এবং ইসলাম গ্রহণের ফলে তা রহিত হয়ে যায়। সুতরাং এক বছরের বেশি সময়ের জন্য তা ইকতা হিসেবে দেওয়া বৈধ নয়; কারণ এর পরবর্তী সময়ের প্রাপ্যতা নিশ্চিত নয়। যদি তা আবশ্যক ও পাওনা হওয়ার পর এক বছরের জন্য ইকতা প্রদান করা হয়, তবে তা সঠিক হবে। আর যদি তা পাওনা হওয়ার পূর্বেই সেই বছরের জন্য ইকতা প্রদান করা হয়, তবে এর বৈধতার বিষয়ে দুটি দিক রয়েছে:

প্রথমত: এটি বৈধ হবে যদি বলা হয় যে, জিজিয়ার সময়কাল কেবল তা আদায়ের জন্য নির্ধারিত।

দ্বিতীয়ত: এটি বৈধ হবে না যদি বলা হয় যে, জিজিয়ার সময়কাল তা ওয়াজিব বা আবশ্যক হওয়ার জন্য নির্ধারিত। আর যে খারাজ ভাড়া হিসেবে গণ্য, তার আবশ্যকতা স্থায়ীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তা দুই বছরের জন্য ইকতা দেওয়া সঠিক হবে এবং জিজিয়ার মতো একে এক বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক নয়, কারণ জিজিয়া স্থিতিশীল নয়।
বিষয়টি যখন এরূপ, তখন ইকতা প্রদানের অবস্থা তিন প্রকারের বাইরে নয়:
প্রথমত: নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য নির্ধারণ করা, যেমন দশ বছরের জন্য ইকতা প্রদান করা। এটি সঠিক হবে যদি তাতে দুটি শর্ত পালন করা হয়:
প্রথমত: ইকতা গ্রহণকারীর ভাতার পরিমাণ ইকতা প্রদানকারীর নিকট সুনির্দিষ্ট হতে হবে; যদি তা তার নিকট অজ্ঞাত থাকে তবে তা সঠিক হবে না।
দ্বিতীয়ত: খারাজের পরিমাণ ইকতা গ্রহণকারী এবং প্রদানকারী—উভয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যদি তাদের উভয়ের নিকট বা যে কোনো একজনের নিকট তা অজ্ঞাত থাকে, তবে তা সঠিক হবে না। এমতাবস্থায় খারাজের বিষয়টি দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি থেকে মুক্ত থাকবে না, হয় তা...

(ص: 292)الأحكام السلطانية للماوردي

يكون مقاسمة أو مساحة، فإن كان مقاسمة فمَن جوَّز مِنَ الفقهاء وضع الخراج على المقاسمة جعله منَ المعلوم الذي يجوز إقطاعه، ومن منع من وضع الخراج على المقاسمة جعله من المجهول، وإن كان الخراج مساحة فهو ضربان:
أحدهما: أن لا يختلف باختلاف الزروع، فهذا معلوم يصح إقطاعه.
والثاني: أن يختلف باختلاف الزروع، فينظر مقطعه، فإن كان في مقابلة أعلى الخراجين صحَّ إقطاعه؛ لأنه راضٍ بنقص إن دخل عليه، وإن كان في مقابلة أقل الخراجين لم يصح إقطاعه؛ لأنَّه قد يوجد فيه زيادة لا يستحقها، ثم يراعى بعد

صحة الإقطاع في هذا القسم حال المقطع في مدة الإقطاع، فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يبقى إلى انقضائها على حال السلامة، فهو على استحقاق الإقطاع إلى انقضاء المدة.

والحالة الثانية: أن يموت قبل انقضاء المدة، فيبطل الإقطاع في المدة الباقية بعد موته، ويعود إلى بيت المال، فإن كانت له ذرية دخلوا في إعطاء الذراري لا في أرزاق الجند، فكان ما يعطونه سببًا لا إقطاعًا.

والحالة الثالثة: أن يحدث به زمانة فيكون باقي الحياة مفقود الصحة، ففي بقاء إقطاعه بعد زمانته قولان:

أحدهما: إنه باقٍ عليه إلى انقضاء مدته إذا قيل: إن رزقه بالزمانة قد سقط، فهذا حكم القسم الأول إذا قدِّر الإقطاع فيه بمدة معلومة.

والقسم الثاني من أقسامه: أن يستقطعه مدة حياته ثم لعقبه وورثته بعد موته، فهذا إقطاع باطل؛ لأنه قد خرج بهذا الإقطاع من حقوق بيت المال إلى الأملاك الموروثة، وإذا بطل كان ما اجتباه منه مأذونًا فيه عن عقد فاسد، فيبرأ أهل الخراج بقبضه، وحسب من جملة رزقه، فإن كان أكثر رد الزيادة، وإن كان أقل رجع بالباقي، وأظهر السلطان فساد الإطلاع حتى يمنع من القبض، ويمنع أهل الخراج من الدفع؛ فإن دفعوه بعد إظهار ذلك لم يبرأ منه.

والقسم الثالث: أن يستقطعه مدة حياته، ففي صحة الإقطاع قولان:

أحدهما: إنه صحيح إذ قيل: إنَّ حدوث زمانته لا يقتضي سقوط رزقه.

এটি ফসল-বণ্টন বা পরিমাপ-ভিত্তিক হতে পারে। যদি এটি ফসল-বণ্টন ভিত্তিক হয়, তবে ফকীহদের মধ্যে যারা ফসল-বণ্টনের ভিত্তিতে খারাজ নির্ধারণকে বৈধ মনে করেন, তারা একে সুনির্ধারিত বিষয় হিসেবে গণ্য করেন যা ইকত্বা হিসেবে প্রদান করা বৈধ। আর যারা ফসল-

বণ্টনের ভিত্তিতে খারাজ নির্ধারণকে নিষিদ্ধ মনে করেন, তারা একে অনিশ্চিত বিষয় হিসেবে গণ্য করেন। আর যদি খারাজ পরিমাপ-ভিত্তিক হয়, তবে তা দুই প্রকার:
প্রথমটি: যা ফসলের ভিন্নতার কারণে পরিবর্তিত হয় না; এটি সুনির্ধারিত বিষয়, তাই এর ইকত্বা প্রদান করা শুদ্ধ।
দ্বিতীয়টি: যা ফসলের ভিন্নতার কারণে পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে বরাদ্দ-প্রাপকের অবস্থা বিবেচনা করা হবে; যদি তা উচ্চতর হারের খারাজের বিপরীতে হয়, তবে তার ইকত্বা প্রদান করা শুদ্ধ হবে; কারণ সে সম্ভাব্য ঘাটতি মেনে নিয়েছে। আর যদি তা নিম্নতর হারের খারাজের বিপরীতে হয়, তবে তার ইকত্বা প্রদান করা শুদ্ধ হবে না; কারণ এতে এমন অতিরিক্ত অংশ থাকতে পারে যার সে হকদার নয়। অতঃপর এই বিভাগে ইকত্বা শুদ্ধ হওয়ার পর, বরাদ্দকালীন সময়ে প্রাপকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, যা তিনটি অবস্থার বাইরে নয়:
প্রথমত: সে মেয়াদের সমাপ্তি পর্যন্ত সুস্থ থাকা; এমতাবস্থায় সে মেয়াদের শেষ পর্যন্ত বরাদ্দের হকদার থাকবে।
দ্বিতীয় অবস্থা: মেয়াদের সমাপ্তির পূর্বেই তার মৃত্যু হওয়া; ফলে তার মৃত্যুর পর অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য বরাদ্দ বাতিল হয়ে যাবে এবং তা বায়তুল মালে ফিরে যাবে। যদি তার সন্তানাদি থাকে, তবে তারা সন্তানদের জন্য নির্ধারিত ভাতার অন্তর্ভুক্ত হবে, সৈন্যদের ভাতার অন্তর্ভুক্ত হবে না। ফলে তাদের যা প্রদান করা হবে তা হবে একটি অনুদান, ইকত্বা নয়।
তৃতীয় অবস্থা: সে দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া, ফলে অবশিষ্ট জীবনে তার সুস্থতা লুপ্ত হওয়া। এমতাবস্থায় তার অক্ষমতার পরও বরাদ্দ বহাল থাকবে কি না সে বিষয়ে দুটি মত রয়েছে:
একটি হলো: মেয়াদের সমাপ্তি পর্যন্ত এটি তার জন্য বহাল থাকবে, যদি বলা হয় যে অক্ষমতার কারণে তার নির্ধারিত ভাতা রহিত হয়ে গেছে। এটি প্রথম প্রকারের বিধান হবে যদি বরাদ্দ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্ধারণ করা হয়।
দ্বিতীয় প্রকার: নিজের জীবনকাল এবং মৃত্যুর পর তার বংশধর ও উত্তরাধিকারীদের জন্য বরাদ্দ নেওয়া। এটি একটি বাতিল ইকত্বা; কারণ এই বরাদ্দের মাধ্যমে বায়তুল মালের অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যখন তা বাতিল হয়ে যায়, তখন সে যা সংগ্রহ করেছে তা একটি ত্রুটিপূর্ণ চুক্তির ভিত্তিতে অনুমোদিত বলে গণ্য হবে। ফলে করদাতারা তা প্রদানের মাধ্যমে দায়মুক্ত হবে এবং তা তার ভাতার অংশ হিসেবে গণ্য হবে। যদি তা ভাতার চেয়ে বেশি হয় তবে অতিরিক্ত অংশ ফেরত দিতে হবে, আর যদি

কম হয় তবে অবশিষ্ট পাওনা সে ফেরত পাবে। সুলতান এই বরাদ্দের অবৈধতা প্রকাশ করবেন যাতে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা যায় এবং করদাতাদের তা পরিশোধ করতে নিষেধ করবেন; এই ঘোষণার পর তারা কর পরিশোধ করলে দায়মুক্ত হবে না।
তৃতীয় প্রকার: তার জীবনকালের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা। এই বরাদ্দের শুদ্ধতার বিষয়ে দুটি মত রয়েছে:
একটি হলো: এটি শুদ্ধ, যদি বলা হয় যে তার অক্ষমতা তার ভাতা রহিত হওয়ার কারণ হবে না।

(ص: 293)الأحكام السلطانية للماوردي

والقول الثاني: إنَّه باطل؛ إذ قيل: إنَّ حدوث زمانته يوجب سقوط رزقه، وإذا صحَّ الإقطاع فأراد السلطان استرجاعه من مقطعه جاز ذلك فيما بعد السنة التي هو فيها، ويعود رزقه إلى ديون العطايا، فأمَّا في السنة التي هو فيها فينظر، فإن حلَّ رزقه فيها قبل حلول خراجها لم يسترجع منه في سنته؛ لاستحقاق خراجها في رزقه، وإن حلَّ خراجها قبل حلول رزقه جاز استرجاعه منه؛ لأن تعجيل المؤجّل وإن كان جائزًا ليس بلازم.
وأما أرزاق ما عدا الجيش إذا أقطعوا بها مال الخراج فيقسمون ثلاثة أقسام:
أحدهما: من يرتزق على عمل غير مستديم -كعمال المصالح، وجباة الخراج، فالإقطاع بأرزاقهم لا يصح، ويكون ما حصل لهم بها من مال الخراج تسببًا وحوالة بعد استحقاق الرزق وحلول الخراج.
والقسم الثاني: من يرزق على عمل مستديم، ويجري رزقه مجرى الجعالة، وهم الناظرون في أعماق البرِّ التي يصحّ التطوع بها، إذا ارتزقوا عليها -كالمؤذنين والأئمة، فيكون جعل الخراج لهم في أرزاقهم تسببًا به وحوالة عليه، ولا يكون إقطاعًا.

والقسم الثالث: من يرتزق على عمل مستديم، ويجري رزقه مجرى الإجارة، وهو من لا يصح نظره إلّا بولاية وتقليد، مثل: القضاة والحكام وكُتَّاب الدواوين، فيجوز أن يقطعوا بأرزاقهم خراج سنة واحدة، ويحتمل جواز إقطاعهم أكثر من سنة وجهين:

أحدهما: يجوز كالجيش.

والثاني: لا يجوز؛ لما يتوجَّه إليهم من العزل والاستبدال.

দ্বিতীয় অভিমত হলো: এটি বাতিল; কেননা বলা হয়েছে যে, ব্যক্তির দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা বা পঙ্গুত্ব তার ভাতা বিলুপ্ত হওয়াকে আবশ্যক করে। আর যদি ইকতা (ভূমি বরাদ্দ) বৈধ হয়ে থাকে এবং সুলতান তা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে ফেরত নিতে চান, তবে বর্তমান বছরের পরবর্তী বছরগুলোর ক্ষেত্রে তা করা বৈধ হবে এবং তার ভাতা সাধারণ অনুদান খাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে বর্তমান বছরের ক্ষেত্রে বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে; যদি বছরের খরাজ (ভূমি রাজস্ব) আদায়ের সময়ের আগেই তার ভাতার সময় হয়ে যায়, তবে উক্ত বছরে তা তার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া যাবে না; কারণ উক্ত খরাজ তার ভাতার প্রাপ্য হিসেবে অধিকারভুক্ত হয়ে গেছে। আর যদি ভাতার সময় হওয়ার আগেই খরাজের সময় হয়ে যায়, তবে তা তার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া বৈধ হবে; কারণ বকেয়া পাওনা সময়ের আগে পরিশোধ করা যদিও বৈধ, কিন্তু তা বাধ্যতামূলক নয়।

আর সেনাবাহিনী ব্যতীত অন্যদের ভাতার জন্য যখন খরাজ বা রাজস্ব বরাদ্দ দেওয়া হয়, তখন তাদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়:

প্রথমত: যারা অস্থায়ী কর্মের ভিত্তিতে ভাতা পান—যেমন জনকল্যাণমূলক কাজের কর্মী এবং রাজস্ব সংগ্রাহক। তাদের ভাতার ক্ষেত্রে ইকতা বৈধ নয়। খরাজ বা রাজস্ব থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হন, তা ভাতা পাওয়ার অধিকার লাভ এবং রাজস্ব আদায়ের পর কেবল একটি মাধ্যম ও বরাদ্দপত্র হিসেবে গণ্য হবে।

দ্বিতীয়ত: যারা স্থায়ী কর্মের ভিত্তিতে ভাতা পান এবং তাদের ভাতার বিধান 'জুয়ালাহ' (পুরস্কার) এর ন্যায়। তারা হলেন এমন সব পুণ্যকর্মের তত্ত্বাবধায়ক যা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে করাও বৈধ, যখন তারা এর বিনিময়ে ভাতা গ্রহণ করেন—যেমন মুয়াজ্জিন এবং ইমামগণ। তাদের ভাতার জন্য খরাজ নির্ধারণ করা হবে একটি মাধ্যম ও বরাদ্দ হিসেবে, একে ইকতা বলা যাবে না।

তৃতীয়ত: যারা স্থায়ী কর্মের ভিত্তিতে ভাতা পান এবং তাদের ভাতার বিধান 'ইজারা' (পারিশ্রমিক) এর ন্যায়। তারা হলেন এমন ব্যক্তিবর্গ যাদের কর্তৃত্ব কেবল নিয়োগ ও দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমেই বৈধ হয়, যেমন: বিচারক, শাসক এবং প্রশাসনিক দপ্তরের লেখকবৃন্দ। তাদের ভাতার বিপরীতে এক বছরের খরাজ বরাদ্দ দেওয়া বৈধ। তবে এক বছরের অধিক সময়ের জন্য ইকতা দেওয়ার বৈধতার বিষয়ে দুটি মত রয়েছে:
প্রথমটি: এটি বৈধ, যেমনটি সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।
দ্বিতীয়টি: এটি বৈধ নয়; কারণ তাদের ক্ষেত্রে পদচ্যুতি বা স্থলাভিষিক্তকরণের সম্ভাবনা থাকে।

(ص: 294)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل:

وأما إقطاع المعادن، وهي البقاع التي أودعها الله تعالى جواهر الأرض، فهي ضربان: ظاهرة وباطنة1.

فأَمَّا الظاهرة: فهي ما كان جوهرها المستودع فيها بارزًا -كمعادن الكحل، والملح، والقار، والنفط، وهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه، والناس فيه سواء، يأخذه من ورد إليه، روى ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أَنَّ الأبيض بن حَمَّال استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملح مأرب فأقطعه، فقال الأقرع بن حابس التميمي: يا رسول الله، إني وردت هذا الملح في الجاهلية، وهو بأرض ليس فيها غيره من وَرَدَه أخذه، وهو مثل الماء العد بالأرض، فاستقال الأبيض في قطيعة الملح، فقال قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد من وردة أخذه" 2.

قال أبو عبيد: الماء العد هو الذي له مواد تمده مثل العيون والآبار. وقال غيره: هو الماء المتجمع المعد، فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم، وكان

المقطع وغيره فيها سواء، وجميع من ورد إليها أسوة مشتركون فيها، فإن منعهم المقطع

---

1 قال أبو إسحاق الشيرازي -من الشافعية: وأَمَّا المعادن فإنَّها إن كانت من المعادن الظاهرة لم يجز إقطاعها؛ لما روى ثابت بن سعيد بن أبيه عن جده أبيض بن حمَّال أنه استقطع النبي صلى الله عليه وسلم ملح المأرب فأقطعه إياه، ثم إنَّ الأقرع بن حابس قال: يا رسول الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ملح ومن وَرَدَه أخذه، وهو مثل الماء العد بأرض، فاستقال أبيض بن حمَّال فقال أبيض: قد أقلتك فيه على أن تجعله مني صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو منك صدقة وهو مثل الماء العد ومن ورده أخذه".

وإن كانت من المعادن الباطنة فإن قلنا: إنَّها تملك بالإحياء جاز إقطاعه؛ لأنه موات يجوز أن يملك بالإحياء، فجاز إقطاعه كموات الأرض، وإن قلنا: لا تملك بالإحياء، فهل يجوز إقطاعه فيه قولان:

أحدهما: يجوز إقطاعه؛ لأنه يفتقر الانتفاع به إلى المؤن، فجاز إقطاعه كموات الأرض، والثاني: يجوز؛ لأنه معدن لا يملك بالإحياء، فلم يجز إقطاعه كالمعادن الظاهرة، فإذا قلنا: يجوز إقطاعه لم يجز إلّا ما يقوم به لما ذكرناه في إقطاع الموات. [المهذب: 1/ 427] .

2 حسن: رواه الترمذي في كتاب الأحكام "2380"، وابن ماجه في كتاب الأحكام "2475"، والدارمي في كتاب البيوع "2608"، وحسَّنَه الشيخ الألباني.

পরিচ্ছেদ:

আর খনিজ সম্পদের ইকতা (ভূমি বরাদ্দ) প্রসঙ্গে কথা হলো, খনিজ সম্পদ হলো ঐ সকল ভূখণ্ড যেগুলোতে মহান আল্লাহ পৃথিবীর মূল্যবান সম্পদরাজি গচ্ছিত রেখেছেন। এগুলো দুই প্রকার: প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য।১

প্রকাশ্য খনিজ সম্পদ হলো সেগুলো, যার খনিজ উপাদানসমূহ সেখানে দৃশ্যমান অবস্থায় থাকে—যেমন সুরমা, লবণ, আলকাতরা এবং খনিজ তেলের খনি। এগুলো সেই প্রবহমান পানির মতো যা ইকতা হিসেবে প্রদান করা জায়েয নয়। এতে সকল মানুষের অধিকার সমান; যে সেখানে আসবে সেই তা গ্রহণ করবে। সাবেত বিন সাঈদ তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবইয়াদ বিন হাম্মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মা'রিবের লবণের খনিটি ইকতা হিসেবে চেয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা প্রদান করেছিলেন। তখন আকরা বিন হাবিস আত-তামিমি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি জাহেলি যুগে এই লবণের খনির কাছে এসেছিলাম; এটি এমন এক এলাকায় অবস্থিত যেখানে এটি ছাড়া অন্য কোনো লবণ নেই। যে সেখানে আসে সেই তা গ্রহণ করে। এটি জমিনে থাকা প্রবহমান পানির মতো। তখন আবইয়াদ লবণের সেই বরাদ্দটি ফিরিয়ে দিতে সম্মত হলেন এবং বললেন: আমি এটি ছেড়ে দিচ্ছি এই শর্তে যে, আপনি এটিকে আমার পক্ষ থেকে সদকা হিসেবে গণ্য করবেন। তখন নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম বললেন: "এটি তোমার পক্ষ থেকে সদকা এবং এটি প্রবহমান পানির মতো, যে সেখানে আসবে সে তা গ্রহণ করবে।" ২

আবু উবাইদ বলেন: প্রবহমান পানি (মা আল-ইদ্দ) হলো যার এমন উৎস আছে যা তাকে ক্রমাগত পানি সরবরাহ করে, যেমন ঝরনা ও কূপ। অন্যরা বলেছেন: এটি হলো সঞ্চিত ও ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত পানি। সুতরাং যদি এই প্রকাশ্য খনিজ সম্পদগুলো ইকতা হিসেবে প্রদান করা হয়, তবে সেই বরাদ্দের কোনো আইনি কার্যকারিতা থাকবে না। এক্ষেত্রে বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং অন্য সকল মানুষ সমান অংশীদার হিসেবে গণ্য হবে। যদি বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাদেরকে বাধা প্রদান করে...

---

১ আবু ইসহাক আল-শিরাজি—শাফেয়ী মাযহাবের ফকিহ—বলেন: খনিজ সম্পদ যদি প্রকাশ্য খনিজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার ইকতা জায়েয নয়। কারণ সাবেত বিন সাঈদ তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা আবইয়াদ বিন হাম্মাল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মা'রিবের লবণের খনিটি ইকতা চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে তা প্রদান করেছিলেন। এরপর আকরা বিন হাবিস বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি জাহেলি যুগে এই লবণের খনির কাছে এসেছিলাম; এটি এমন এক এলাকায় অবস্থিত যেখানে অন্য কোনো লবণের খনি নেই এবং যে সেখানে আসে সেই তা গ্রহণ করে। এটি ভূমিতে বিদ্যমান

প্রবহমান পানির মতো। তখন আবইয়াদ বিন হাম্মাল ইকতা ফেরত দিতে চাইলেন এবং বললেন: আমি এটি আপনার নির্দেশে ছেড়ে দিচ্ছি এই শর্তে যে, আপনি একে আমার পক্ষ থেকে সদকা হিসেবে গণ্য করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এটি তোমার পক্ষ থেকে সদকা এবং এটি প্রবহমান পানির মতো, যে আগে আসবে সে তা নিতে পারবে।"

আর যদি খনিজ সম্পদ অপ্রকাশ্য হয়, তবে আমরা যদি বলি যে—তা আবাদ বা প্রচেষ্টার (ইহয়া) মাধ্যমে মালিকানাধীন হয়—তবে তার ইকতা জায়েয হবে; কারণ এটি অনাবাদী ভূমির মতো যা প্রচেষ্টার মাধ্যমে মালিকানাধীন হতে পারে। ফলে অনাবাদী ভূমির ন্যায় এর ইকতাও জায়েয। আর যদি আমরা বলি যে—এটি প্রচেষ্টার মাধ্যমে মালিকানাধীন হয় না—তবে তার ইকতা জায়েয কি না সে বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমত: তার ইকতা জায়েয; কারণ এর থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য শ্রম ও ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, তাই তা অনাবাদী ভূমির মতো ইকতা হিসেবে প্রদান করা জায়েয। দ্বিতীয়ত: তা জায়েয নয়; কারণ এটি এমন খনিজ সম্পদ যা প্রচেষ্টার মাধ্যমে মালিকানা লাভ করা যায় না, তাই প্রকাশ্য খনিজ সম্পদের ন্যায় এর ইকতাও জায়েয হবে না। এখন আমরা যদি বলি যে এর ইকতা জায়েয, তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অতিরিক্ত তা প্রদান করা যাবে না, যেমনটি আমরা অনাবাদী ভূমির বরাদ্দের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি। [আল-মুহায্যাব: ১/৪২৭]।

২ হাসান: তিরমিজি ‘আহকাম’ অধ্যায় (২৩৮০), ইবনে মাজাহ ‘আহকাম’ অধ্যায় (২৪৭৫), দারেমি ‘বিউ’ (ক্রয়-বিক্রয়) অধ্যায় (২৬০৮) এটি বর্ণনা করেছেন এবং শায়খ আলবানী একে হাসান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

(ص: 295)الأحكام السلطانية للماوردي

منها كان بالمنع متعديًا وكان لما أخذه مالكًا؛ لأنه متعدٍّ بالمنع لا بالأخذ. فكُفَّ عن المنع وصرِفَ عن مداومة العمل؛ لئلَّا يثبته إقطاعًا بالصحة. أو يصير معه كالأملاك المستقر.

وأَمَّا المعادن الباطنة: فهي ما كان جوهرها مستكنًا فيها لا يوصل إليه إلَّا بالعمل؛ كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد، فهذه وما أشبهها معادن باطنة، سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتخليص أو لم يحتج.

وفي جواز إقطاعها قولان:

أحدهما: لا يجوز كالمعادن الظاهرة، وكل الناس فيها شرع.

والقول الثاني: يجوز إقطاعها؛ لرواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها وغوريها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يقطعه حق مسلم"1.

وفي الجلسي والغوري تأويلان:

أحدهما: إنه أعلاها وأسفلها، وهو قول عبد الله بن وهب.

والثاني: إن الجلسي بلاد نجد، والغوري بلاد تهامة، وهذا قول أبي عبيدة، ومنه قول الشماخ من الطويل:

فمرت على ماء العذيب وعينها ... كوقب الحصى جلسيها قد تغورا

فعلى هذا يكون المقطع أحق بها، وله منع الناس منها.

وفي حكمه قولان:

أحدهما: إنه إقطاع تمليك يصير به المقطع مالكًا لرقبة المعدن كسائر أمواله في حال عمله، وبعد قطعه يجوز له بيعه في حياته، وينتقل إلى ورثته بعد موته.

والقول الثاني: إنه إقطاع إرفاق لا يملك به رقبة المعدن، ويملك به الارتفاق بالعمل

---

1 حسن: رواه مالك في كتاب الزكاة "582"، وأبو داود في كتاب الخراج "3062"، وحسَّنَه الشيخ الألباني.

সে ক্ষেত্রে অন্যকে বাধা প্রদানের মাধ্যমে সে সীমা লঙ্ঘনকারী সাব্যস্ত হবে, তবে যা সে আহরণ করেছে তার মালিক হবে; কারণ সে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘনকারী, আহরণের ক্ষেত্রে

নয়। সুতরাং তাকে বাধা প্রদান থেকে বিরত রাখা হবে এবং কাজের ধারাবাহিকতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে; যাতে সে একে বৈধ ইকতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে অথবা এটি তার অধিকারে থাকা স্থায়ী মালিকানার মতো হয়ে না যায়।

আর অভ্যন্তরীণ খনিজ হলো সেইসব খনিজ, যার মূলবস্তু ভেতরে লুকায়িত থাকে এবং শ্রম ব্যতীত সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হয় না; যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ও লৌহ খনি। এগুলো এবং এ জাতীয় খনিজগুলো অভ্যন্তরীণ খনিজ হিসেবে গণ্য হবে, চাই আহরিত বস্তু গলানো ও পরিশোধনের প্রয়োজন পড়ুক বা না পড়ুক।

এগুলো ইকতা হিসেবে প্রদানের বৈধতা সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমত: এটি জায়েজ নয়, যেমনটি বাহ্যিক খনিজের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে; আর এ বিষয়ে সকল মানুষের অধিকার সমান।

দ্বিতীয় অভিমত: এগুলো ইকতা হিসেবে প্রদান করা জায়েজ; কারণ কাসীর বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ আল-মুযানী তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল বিন আল-হারিসকে 'কাবালিয়া'র খনিগুলো ইকতা হিসেবে প্রদান করেছিলেন—এর উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি উভয়ই; এবং 'কুদস' এলাকার চাষযোগ্য জমিও দিয়েছিলেন, তবে তিনি কোনো মুসলিমের হকের অন্তর্ভুক্ত কিছু তাকে দেননি।১

'আল-জালসী' ও 'আল-গাউরী' শব্দ দুটির ব্যাখ্যায় দুটি মত রয়েছে:

প্রথমত: এর অর্থ হলো এর উপরিভাগ ও নিম্নভাগ, এটি আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব-এর অভিমত।

দ্বিতীয়ত: 'জালসী' হলো নজদ অঞ্চল এবং 'গাউরী' হলো তিহামাহ অঞ্চল। এটি আবু উবায়দার অভিমত। আশ-শাম্মাখের 'তওয়ীল' ছন্দের পঙক্তিতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়:

অতঃপর সেটি আল-উযাইবের পানির পাশ দিয়ে অতিক্রম করল, এমতাবস্থায় তার চোখ ছিল … যেন কঙ্কর রাখার গর্তের মতো, যার উচ্চভাগ ভেতরে দেবে গেছে।

এই মতানুসারে, যাকে ইকতা প্রদান করা হয়েছে সেই এর অধিক হকদার হবে এবং অন্যদের তা থেকে বিরত রাখার অধিকার তার থাকবে।

এর বিধান সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমত: এটি হলো মালিকানা প্রদানের ইকতা, যার ফলে যাকে ইকতা প্রদান করা হয়েছে সে খনিটির মূল সত্তার মালিক হয়ে যায়, যেমনটি তার অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কাজ

চলাকালীন এবং আহরণের পর সে তার জীবদ্দশায় তা বিক্রি করতে পারে এবং তার মৃত্যুর পর তা উত্তরাধিকারীদের নিকট স্থানান্তরিত হয়।
দ্বিতীয় অভিমত: এটি হলো কেবল ব্যবহারের সুযোগ প্রদান বা উপযোগিতামূলক ইকতা; এর মাধ্যমে সে খনির মূল সত্তার মালিক হয় না, বরং কাজের মাধ্যমে তা থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার লাভ করে।

---

১ হাসান: ইমাম মালিক এটি 'কিতাবুয যাকাত' (৫৮২) এবং আবু দাউদ 'কিতাবুল খারাজ' (৩০৬২) এ বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

(ص: 296)الأحكام السلطانية للماوردي

فيه مدة مقامه عليه، وليس لأحد أن ينازعه فيه ما أقام على العمل، فإذا تركه زال حكم الإقطاع عنه وعاد إلى حال الإباحة؛ فإذا أحيا مواتًا بإقطاع أو غير إقطاع، فظهر فيه بالإحياء معدن ظاهر أو باطن ملكه المحيي على التأبيد، كما يملك ما استنبطه من العيون واحتفره من الآبار.

এতে তার অবস্থানের মেয়াদকাল নির্ধারিত থাকে। যতক্ষণ সে সেখানে কর্মরত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ে তার সাথে বিবাদ করার অধিকার কারো নেই। অতঃপর সে যখন তা ত্যাগ করবে, তখন তা থেকে বরাদ্দের (ইকতা) বিধান রহিত হয়ে যাবে এবং তা পুনরায় সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্তাবস্থায় ফিরে যাবে। আর যদি কেউ বরাদ্দের মাধ্যমে বা বরাদ্দ ছাড়াই কোনো অনাবাদী ভূমি আবাদ করে এবং আবাদের ফলে সেখানে কোনো প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য খনিজ সম্পদ নিহিত পাওয়া যায়, তবে আবাদকারী স্থায়ীভাবে তার মালিক হয়ে যাবে; যেমনভাবে সে তার উৎসারিত প্রস্রবণ বা খননকৃত কূপের মালিক হয়ে থাকে।

الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه

والديوان1: موضع لحفظ ما يتعلَّق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال، ومن يقوم بها من الجيوش والعمَّال، وفي تسميته ديوانًا وجهان:

أحدهما: إنَّ كسرى اطَّلع ذات يوم على كتاب ديوانه فرآهم يحسبون مع أنفسهم، فقال: ديوانه أي: مجانين، فسمِّي موضعهم بهذا الاسم، ثم حذف الهاء عند كثرة الاستعمال تخفيفًا للاسم، فقيل: ديوان.

والثاني: إنَّ الديوان بالفارسية اسم الشياطين، فسمِّي الكتاب باسمهم؛ لحذقهم بالأمور وقوتهم على الجلي والخفي، وجمعهم لما شذَّ وتفرَّق، ثم سمِّي مكان جلوسهم باسمهم فقيل: ديوان.

وأوّل من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

واختلف الناس في سبب وضعه له، فقال قوم: سببه أنَّ أبا هريرة قدِمَ عليه بمال من البحرين، فقال له عمر: ماذا جئت به؟ فقال: خمسمائة ألف درهم، فاستكثره عمر فقال له:

أتدري ما تقول؟ قال: نعم، مائة ألفٍ خمس مرات، فقال عمر: أطيب هو؟ فقال: لا أدري، فصعد عمر المنبر، فحمد الله تعالى وأثني عليه، ثم قال: أيها الناس، قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم كلنا لكم كيلًا، وإن شئتم عددنا لكم عدًّا، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانًا لهم، فدوّن أنت لنا ديوانًا.

وقال آخرون: بل سببه أن عمر بعث بعثًا، وكان عنده الهرمز، فقال لعمر: هذا بعث قد أعطيت أهله الأموال، فإن تخلَّف منهم رجل وآجل بمكانيه، فمن أين يعلم صاحبك به، فأثبت لهم ديوانًا، فسأله عن الديوان حتى فسّره لهم2.

وروى عابد بن يحيى عن الحارث بن نفيل أن عمر رضي الله عنه استشار المسلمين في

---

1 الديوان: هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء، وأوّل من دوَّن الدواوين عمر وهو فارسيّ معرَّب. [النهاية: 2/ 150] .

2 انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة في مصنِّفه "32864"، والسنن الكبرى للبيهقي "6/ 349".

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ: দেওয়ান প্রতিষ্ঠা এবং এর বিধানাবলি আলোচনা প্রসঙ্গে

দেওয়ান হলো: সালতানাত বা রাষ্ট্রীয় অধিকার সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি ও অর্থ-সম্পদ এবং যারা এর দায়িত্বে নিয়োজিত সেই সেনাবাহিনী ও কর্মচারীদের বিবরণ সংরক্ষণের স্থান। একে 'দেওয়ান' নামে নামকরণের ক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে:

প্রথমত: পারস্য সম্রাট কিসরা একদিন তাঁর হিসাবরক্ষণ দপ্তরের লেখকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং দেখলেন যে তারা নিজেদের মধ্যে হিসাব করছে। তখন তিনি বললেন: 'দেওয়ানাহ', যার অর্থ: 'উন্মাদ'। ফলে তাদের কর্মস্থল এই নামে অভিহিত হতে থাকে। পরবর্তীতে অধিক ব্যবহারের কারণে শব্দটিকে সহজ করতে 'হা' বর্ণটি বিলুপ্ত করা হয় এবং তা 'দেওয়ান' হিসেবে পরিচিতি পায়।

দ্বিতীয়ত: ফারসি ভাষায় 'দেওয়ান' হলো শয়তানদের নাম। লেখকদের এই নামে অভিহিত করা হতো তাদের কার্যাবলিতে সূক্ষ্মদর্শিতা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে প্রখর দক্ষতা এবং বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন তথ্যসমূহ একত্রিত করার ক্ষমতার কারণে। পরবর্তীকালে তাদের বসার স্থানটি তাদের নামেই নামাঙ্কিত হয় এবং একে 'দেওয়ান' বলা শুরু হয়।

ইসলামে সর্বপ্রথম উমর ইবনুল খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) দেওয়ান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

এর প্রতিষ্ঠার কারণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেন: এর কারণ ছিল আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) বাহরাইন থেকে প্রচুর সম্পদ নিয়ে তাঁর কাছে আগমন করেন। উমর (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কী নিয়ে এসেছ?" তিনি

উত্তর দিলেন, "পাঁচ লক্ষ দিরহাম।" উমর (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) একে অনেক বড় অংক মনে করলেন এবং তাঁকে বললেন:

"তুমি কি জানো তুমি কী বলছো?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এক লক্ষের পাঁচ গুণ।" তখন উমর (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) বললেন, "এটি কি বৈধ উপায়ে অর্জিত?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি জানি না।" অতঃপর উমর (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। তারপর বললেন, "হে লোকসকল! আমাদের কাছে প্রচুর সম্পদ এসেছে। তোমরা চাইলে আমি তোমাদের তা মেপে দেব, আর চাইলে গুনে দেব।" তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "হে আমিরুল মুমিনিন! আমি অনারবদের দেখেছি যে তারা তাদের জন্য 'দেওয়ান' (রেজিস্টার খাতা) তৈরি করে রাখে; আপনিও আমাদের জন্য একটি দেওয়ান তৈরি করুন।"

অন্যরা বলেন: বরং এর কারণ ছিল উমর (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। তাঁর কাছে তখন হুরমুজান উপস্থিত ছিলেন। তিনি উমর (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন)-কে বললেন, "এটি একটি সেনাদল যাদের পরিবারকে আপনি সম্পদ দান করেছেন; কিন্তু যদি তাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি পিছিয়ে থাকে বা তার স্থলে অন্য কাউকে নিযুক্ত করা হয়, তবে আপনার প্রতিনিধি তা কীভাবে জানতে পারবেন? অতএব তাদের জন্য একটি দেওয়ান বা নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।" অতঃপর তিনি তাঁকে দেওয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনি তাঁদের কাছে তা ব্যাখ্যা করলেন।

আবিদ ইবনে ইয়াহইয়া হারিস ইবনে নুফায়েল থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করলেন...

---

১. দেওয়ান: এটি এমন একটি খাতা বা রেজিস্ট্রার যেখানে সেনাবাহিনী এবং অনুদানপ্রাপ্তদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। উমর (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) সর্বপ্রথম দেওয়ানসমূহ প্রবর্তন করেন। এটি মূলত একটি ফারসি শব্দ যা আরবিতে আত্তীকৃত হয়েছে। [আন-নিহায়াহ: ২/১৫০]।

২. দেখুন: ইবনে আবি শায়বাহ তাঁর 'মুসান্নাফ'-এ (৩২৮৬৪), এবং বায়হাক্বী তাঁর 'আস-সুনান আল-কুবরা'-তে (৬/৩৪৯)।

تدوين الديوان، فقال له عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المال، ولا تمسك منه شيئًا.

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أرى مالًا كثيرًا يتبع الناس، فإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر، فقال خالد بن الوليد: قد كنت بالشام فرأيت ملوكها قد دوَّنوا ديوانًا، وجنَّدوا جنودًا، فدوَّن ديوانًا وجنِّد جنودًا، فأخذ بقوله، ودعا عقيل بن أبي طالب، ومحرمة بن نوفل، وجبير بن مطعم، وكانوا من شباب قريش وقال: اكتبوا الناس على منازلهم، فبدءوا ببني هاشم فكتبوهم، ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه، ثم عمر وقومه، وكتبوا القبائل ووضعوها على الخلافة، ثم رفعوه إلى عمر، فلمَّا نظر فيه قال: لا، ما وددت أنَّه كان هكذا، ولكن ابدءوا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأقرب فالأقرب، حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله فشكره العبَّاس -رضوان الله عليه- على ذلك، وقال: وصلتك رحم1.

وروى زيد بن أسلم عن أبيه أنَّ بني عديّ جاءوا إلى عمر فقالوا: إنك خليفة رسول الله وخليفة أبي بكر وأبو بكر خليفة رسول الله؛ فلو جعلت نفسك حيث جعلك الله سبحانه، وجعلك هؤلاء القوم الذين كتبوا، فقال: بخ بخ يا بني عدي، أردتم الأكل على ظهري، وأن أهب حسناتي لكم لا، ولكنَّكم حتى تأتيكم الدعوة وأن ينطبق عليكم الدفتر، يعني: ولو تكتبوا آخر الناس، إنَّ لي صاحبين سلكا طريقًا، فإن خالفتهما خولف بي، ولكنَّه والله ما أدركنا الفضل في الدنيا، ولا نرجو الثواب عند الله تعالى على عملنا إلَّا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو شرفنا، وقومه أشرف العرب، ثم الأقرب، والله لئن جاءت الأعاجم بعمل، وجئنا بغير عمّ لهم أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم منا يوم القيامة، فإن من قصُرَ به عمله لم يسرع به نسبه.

وروى عامر أن عمر رضي الله عنه حين أراد وضع الديوان قال: بمن أبدأ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: ابدأ بنفسك، فقال عمر: أذكر أني حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبدأ ببني هاشم وبني عبد المطلب، فبدأ بهم عمر، ثم بمن يليهم من قبائل قريش بطنًا بعد بطن، حتى استوفى جميع قريش، ثم انتهى إلى الأنصار، فقال عمر: ابدءوا برهط سعد بن

---

1 انظر: الأم للشافعي "4/ 158".

দেওয়ান (প্রশাসনিক নিবন্ধ) লিপিবদ্ধকরণ প্রসঙ্গে আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে (উমরকে) বললেন: আপনার নিকট প্রতি বছর যে সম্পদ জমা হয় তা বণ্টন করে দিন এবং তার কোনো কিছুই আটকে রাখবেন না।

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: আমি প্রচুর সম্পদ দেখছি যা মানুষের হস্তগত হচ্ছে; যদি সেগুলো হিসাবভুক্ত না করা হয় যাতে জানা যায় কে গ্রহণ করেছে আর কে করেনি, তবে আমি বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছি। তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ বললেন: আমি শামে ছিলাম এবং সেখানকার রাজাদের দেখেছি যে তারা দেওয়ান লিপিবদ্ধ করেছে এবং সৈন্যবাহিনী সুবিন্যস্ত করেছে; সুতরাং আপনিও দেওয়ান লিপিবদ্ধ করুন এবং সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করুন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং আকিল ইবনে আবি তালিব, মাখরামা ইবনে নাওফাল ও জুবাইর ইবনে মুতয়িমকে ডেকে পাঠালেন—তারা ছিলেন কুরাইশ বংশের যুবক। তিনি বললেন: লোকদের তাদের মর্যাদা ও অবস্থান অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করো। তারা বনু হাশিম থেকে শুরু করে তাদের নাম লিখলেন, এরপর আবু বকর ও তার গোত্রকে এবং তারপর উমর ও তার গোত্রকে অন্তর্ভুক্ত করলেন। তারা গোত্রগুলোকে খিলাফতের ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে উমরের নিকট পেশ করলেন। তিনি যখন তা দেখলেন, বললেন: না, আমি এমনটি প্রত্যাশা করিনি; বরং তোমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তার নৈকট্য অনুযায়ী শুরু করো—যিনি যত বেশি নিকটবর্তী, তাকে আগে রাখো, এমনকি উমরকে সেখানে রাখো যেখানে আল্লাহ তাকে স্থান দিয়েছেন। এতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং বললেন: আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেছেন।১

জায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বনু আদি গোত্র উমরের নিকট এসে বলল: আপনি আল্লাহর রাসূলের খলিফার উত্তরসূরি এবং আবু বকরের উত্তরসূরি, আর আবু বকর ছিলেন আল্লাহর রাসূলের খলিফা। সুতরাং আপনি যদি নিজেকে সেখানে রাখতেন যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে রেখেছেন এবং সেই তালিকায় রাখতেন যেখানে এই লেখকগণ আপনাকে রেখেছেন! তিনি বললেন: সাবাস হে বনু আদি! তোমরা কি আমার কাঁধে চড়ে খেতে চাও এবং আমি আমার নেক আমলগুলো তোমাদের দিয়ে দিই? না, বরং তোমাদের সিরিয়াল তখনই আসবে যখন তোমাদের ডাক আসবে এবং দপ্তরে তোমাদের নাম আসবে; অর্থাৎ তোমরা যদি সবার শেষেও তালিকাভুক্ত হও। আমার দুজন সঙ্গী (রাসূলুল্লাহ ও আবু বকর) একটি পথ অনুসরণ করে গেছেন, আমি যদি তাদের বিরোধিতা করি তবে আমার পথও ভিন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহর কসম, আমরা দুনিয়াতে যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছি এবং আল্লাহর নিকট আমাদের কর্মের যে প্রতিদান আশা করি, তা কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। তিনিই আমাদের গৌরব এবং তার গোত্র আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এরপর যারা বংশীয়ভাবে অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহর কসম, যদি অনারবরা আমল নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হয় আর আমরা আমলহীন অবস্থায় যাই, তবে আমাদের চেয়ে তারাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক নিকটবর্তী হবে। কারণ যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারে না।
আমের বর্ণনা করেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন দেওয়ান তৈরি করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি বললেন: আমি কার নাম দিয়ে শুরু করব? আব্দুর রহমান ইবনে আউফ তাকে বললেন: আপনি নিজের নাম দিয়ে শুরু করুন। উমর বললেন: আমার মনে পড়ে আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলাম এবং তিনি বনু হাশিম ও বনু আব্দুল মুত্তালিব থেকে শুরু করতেন। তাই উমর তাদের দিয়েই শুরু করলেন, এরপর কুরাইশ বংশের অন্যান্য উপগোত্রগুলোকে একের পর এক ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করলেন যতক্ষণ না পুরো কুরাইশ শেষ হলো। এরপর তিনি আনসারদের তালিকায় পৌঁছালেন। উমর বললেন: সাদ ইবনে... এর পরিবার থেকে শুরু করো...

---

১. দ্রষ্টব্য: শাফিঈ রচিত আল-উম্ম "৪/ ১৫৮"।

معاذ من الأوس، ثم بالأقرب فالأقرب لسعد.

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أنَّه كان ذلك من المحرَّم سنة عشرين، فلمَّا استقرَّ ترتيب الناس في الدواوين على قدر النسب المتَّصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فضَّل بينهم في العطاء على قدر السابقة في الإسلام، والقربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه يرى التسوية بينهم في العطاء، ولا يرى التفضيل بالسابقة، كذلك كان رأي علي رضي الله عنه في خلافته، وبه يأخذ الشافعي ومالك، وكان رأي عمر رضي الله عنه التفضيل بالسابقة في الإسلام، وكذلك رأي عثمان رضي الله عنه بعده، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق.

وقد نظر عمر أبا بكر حين سوَّى بين الناس فقال: أتسوي بين مَنْ هاجر الهجرتين وصلَّى إلى القبلتين، وبين من أسلم عام الفتح خوف السيف؟ فقال له أبو بكر: إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا دار بلاغ للراكب، فقال له عمر: لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه؛ فلمَّا وضع الديوان فضل السابقة، ففرض لكل من شهد بدرًا من المهاجرين الأولين خمسة آلاف درهم في كل سنة: منهم علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وفرض لنفسه معهم خمسة آلاف درهم، وألحق به العباس بن عبد المطلب، والحسن والحسين -رضوان الله عليهم؛ لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقيل: بل فضل العباس وفرض له سبعة آلاف درهم.

وفرض لكل من شهد بدرًا من الأنصار أربعة آلاف درهم، ولم يفضل على أهل بدر أحدًا، إلَّا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنَّه فرض لكل واحدة منهن عشرة آلاف درهم إلَّا عائشة، فإنه فرض لها اثني عشر ألف درهم، وألحق بهن جويرية

بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وقيل: بل فرض لكلِّ واحدة منهنَّ ستة آلاف درهم، وفرض لكل من هاجر قبل الفتح ثلاثة آلاف درهم، ولمن أسلم بعد الفتح ألف درهم لكل رجل، وفرض لغلمان أحداث من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمي الفتح، وفرض لعمر بن أبي سلمة المخزومي أربعة آلاف درهم؛ لأنَّ أمه أمّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له محمد بن عبد الله بن جحش:

আউস গোত্রের মুআদ, অতঃপর সা'দের নিকটাত্মীয়দের ক্রমানুসারে।

ইমাম জুহরি সাঈদ ইবনে আল-মুসায়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটি বিশ হিজরি সনের মুহাররম মাসে সংঘটিত হয়েছিল। যখন মানুষের বংশধারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় নিবন্ধে (দিওয়ান) বিন্যস্ত করা স্থির হলো, তখন ইসলামে অগ্রগণ্যতা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আত্মীয়তার নৈকট্যের ভিত্তিতে ভাতার ক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে তারতম্য করা হলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাতার ক্ষেত্রে সবার মাঝে সমতা রক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে কাউকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও তাঁর খিলাফতকালে একই মত পোষণ করতেন এবং ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিক এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। তবে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অভিমত ছিল ইসলাম গ্রহণের অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে তারতম্য করা, এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও একই মত পোষণ করতেন। ইমাম আবু হানিফা এবং ইরাকের ফকিহগণ এই মতটি গ্রহণ করেছেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সবার মাঝে সমতা রক্ষা করতে দেখলেন, তখন তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "আপনি কি সেই ব্যক্তির সমান মর্যাদা দেবেন যে দুইবার হিজরত করেছে এবং দুই কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছে, আর সেই ব্যক্তির সমান যে মক্কা বিজয়ের বছর তরবারির ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে?" তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন: "নিশ্চয়ই তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করেছেন এবং তাঁদের প্রতিদান আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত। আর দুনিয়া তো কেবল পথিকের গন্তব্যে পৌঁছানোর পাথেয় সংগ্রহশালা মাত্র।" তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন: "আমি এমন ব্যক্তিকে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে,

তাঁর সমান করব না যে তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করেছে।" অতঃপর তিনি যখন রাষ্ট্রীয় দপ্তর (দিওয়ান) প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন ইসলামে অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রথম দিককার মুহাজিরদের প্রত্যেকের জন্য প্রতি বছর পাঁচ হাজার দিরহাম বরাদ্দ করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আলী ইবনে আবি তালিব, উসমান ইবনে আফফান, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, জুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তিনি নিজের জন্যও তাঁদের সমান পাঁচ হাজার দিরহাম বরাদ্দ করলেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁদের বিশেষ অবস্থানের কারণে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি আব্বাসের জন্য বিশেষ মর্যাদা দিয়ে সাত হাজার দিরহাম বরাদ্দ করেছিলেন।

তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসারদের প্রত্যেকের জন্য চার হাজার দিরহাম বরাদ্দ করলেন। তিনি বদরের যোদ্ধাদের ওপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দেননি, কেবল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সহধর্মিণীগণ ব্যতীত। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের জন্য দশ হাজার দিরহাম করে বরাদ্দ করেছিলেন; তবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্য বরাদ্দ করেছিলেন বারো হাজার দিরহাম। তিনি জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস এবং সাফিয়া বিনতে হুয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। অন্যমতে, তিনি তাঁদের প্রত্যেকের জন্য ছয় হাজার দিরহাম বরাদ্দ করেছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরতকারীদের প্রত্যেকের জন্য তিন হাজার দিরহাম এবং বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারীদের প্রত্যেকের জন্য মাথাপিছু এক হাজার দিরহাম বরাদ্দ করলেন। তিনি মুহাজির ও আনসারদের কিশোর সন্তানদের জন্য বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারীদের সমান ভাতা নির্ধারণ করলেন। তিনি উমর ইবনে আবি সালামাহ আল-মাখজুমির জন্য চার হাজার দিরহাম বরাদ্দ করলেন; কারণ তাঁর মাতা ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামাহ। তখন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ তাঁকে বললেন:

(ص: 300)الأحكام السلطانية للماوردي

لِمَ تفضِّل عمر علينا وقد هاجر آباؤنا وشهدوا بدرًا؟ فقال عمر: أفضِّله لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليأت الذي يستعتب بأُمِّ سلمة أعتبه، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم، فقال له عبد الله بن عمر: فرضت لي ثلاثة آلاف درهم، وفرضت لأسامة أربعة آلاف درهم، وقد شهدت ما لم يشهد أسامة؟ فقال عمر: زدته لأنه كان أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحبَّ إلى رسول الله من أبيك، ثم فرض للناس على منازلهم وقراءتهم القرآن وجهادهم، وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكلِّ رجل منهم من ألفين إلى ألف، إلى خمسمائة، إلى ثلاثمائة، ولم ينقص أحدًا منها، وقال: لئن كثر المال لأفرض لكل رجل أربعة آلاف درهم: ألفًا لفرسه، وألفًا لسلاحه، وألفًا لسفره، وألفًا يخلفها في أهله؛ وفرض للمنفوس مائة درهم، فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم، فإذا بلغ زاده، وكان لا يفرض لمولود شيئًا حتى يفطم، إلى أن سمع امرأة ذات ليلة وهي تكره ولدها على الفطام، وهو يبكي، فسألها عنه؟ فقالت: إنَّ عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم، فأنا أكرهه على الفطام حتى يفرض له، فقال: يا ويل عمر، كم احتقب من وزر وهو لا يعلم، أمر عمر مناديه فنادى: ألَّا تعجلوا أولادكم بالفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، ثم كتب إلى أهل العوالي، وكان يجري عليهم القوت، فأمر بجريب من الطعام فطحن، ثم خبز، ثم ثرد، ثم دعا ثلاثين فأكلوا منه غداهم حتى أصدرهم، ثم فعل في العشاء مثل ذلك، فقال: يكفي الرجل جريبان في كل شهر، وكان يرزق الرجل والمرأة والمملوكة جريبين في كل شهر، وكان أذا أراد الرجل أن يدعو على صاحبه قال له: قطع الله عنك جريبك.

وكان الديوان موضوعًا على دعوة العرب في ترتيب الناس فيه معتبرًا بالنسب، وتفضيل العطاء معتبرًا بالسابقة في الإسلام، وحسن الأثر في الدين، ثم روعي في التفضيل عند انقراض أهل السوابق بالتقدم في الشجاعة والبلاء في الجهد؛ فهذا حكم ديوان الجيش في ابتداء وضعه على الدعوة القريبة والترتيب الشرعي.

وأما ديوان الاستيفاء وجباية الأموال فجرى هذا الأمر فيه بعد ظهور الإسلام بالشام والعراق على ما كان عليه من قبل، فكان ديوان الشام بالرومية؛ لأنه كان من مماليك الروم، وكان ديوان العراق بالفارسية؛ لأنه كان من مماليك الفرس، فلم يزل أمرهما جاريًا على ذلك

কেন আপনি উসামাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছেন অথচ আমাদের পিতৃপুরুষগণ হিজরত করেছেন এবং বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন? উমর (রা.) বললেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার বিশেষ মর্যাদার কারণে আমি তাকে প্রাধান্য দিই; যার কোনো অভিযোগ থাকে সে যেন উম্মে সালামার মাধ্যমে আসে, আমি তার অভিযোগ বিবেচনা করব। তিনি উসামা বিন যায়িদের জন্য চার হাজার দিরহাম বরাদ্দ করলেন। তখন আবদুল্লাহ বিন উমর তাকে বললেন: আপনি আমার জন্য তিন হাজার দিরহাম এবং উসামার জন্য চার হাজার দিরহাম বরাদ্দ করেছেন, অথচ আমি এমন সব যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম যেখানে উসামা ছিলেন না? উমর (রা.) বললেন: আমি তাকে তোমার চেয়ে বেশি দিয়েছি কারণ সে তোমার চেয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় ছিল এবং তার পিতা তোমার পিতার চেয়ে আল্লাহর রাসূলের নিকট অধিক প্রিয় ছিল। এরপর তিনি মানুষের মর্যাদা, কুরআন তিলাওয়াত এবং জিহাদে তাদের অবদানের ভিত্তিতে ভাতা নির্ধারণ করলেন। তিনি ইয়ামেনবাসী এবং সিরিয়া ও ইরাকে অবস্থানরত কায়স গোত্রের লোকদের প্রত্যেকের জন্য দুই হাজার থেকে এক হাজার, পাঁচশত থেকে তিনশত দিরহাম পর্যন্ত বরাদ্দ করলেন এবং কারও অংশ কমালেন না। তিনি বললেন: যদি সম্পদের প্রাচুর্য ঘটে তবে আমি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য চার হাজার দিরহাম বরাদ্দ করব: এক হাজার তার ঘোড়ার জন্য, এক হাজার তার অস্ত্রের জন্য, এক হাজার তার সফরের ব্যয়ের জন্য এবং এক হাজার তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য। তিনি নবজাতকের জন্য একশত দিরহাম বরাদ্দ করতেন, শিশুটি বড় হলে তা দুইশত দিরহামে উন্নীত করতেন। আগে তিনি শিশুর দুধ ছাড়ানোর আগ পর্যন্ত কোনো ভাতা দিতেন না। একদিন রাতে তিনি এক নারীকে তার শিশুকে জোরপূর্বক দুধ ছাড়াতে দেখলেন, শিশুটি কাঁদছিল। তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে নারীটি বললেন: উমর তো দুধ না ছাড়ানো পর্যন্ত শিশুর ভাতা বরাদ্দ করেন না, তাই আমি তাকে জোর করে দুধ ছাড়াচ্ছি যাতে তার ভাতা শুরু হয়। উমর (রা.) আক্ষেপ করে বললেন: উমরের দুর্ভোগ! সে অজান্তেই কত পাপের বোঝা বহন করছে। এরপর তিনি ঘোষককে দিয়ে ঘোষণা করালেন: তোমরা তোমাদের সন্তানদের দুধ ছাড়াতে

তাড়াহুড়ো করো না, কারণ আমরা ইসলামের প্রতিটি নবজাতকের জন্যই ভাতা বরাদ্দ করব। অতঃপর তিনি আওয়ালি অধিবাসীদের নিকট পত্র লিখলেন এবং তাদের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। তিনি এক 'জারিব' পরিমাণ শস্য চূর্ণ করে রুটি ও সারীদ প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। এরপর ত্রিশজন লোককে দাওয়াত দিলেন এবং তারা তৃপ্তিসহকারে দুপুরের খাবার খেল। রাতের খাবারের ক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপ করলেন। এরপর তিনি বললেন: প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রতি মাসে দুই জারিব খাদ্যশস্যই যথেষ্ট। তিনি পুরুষ, মহিলা এবং দাস-দাসীদের প্রত্যেকের জন্য মাসে দুই জারিব বরাদ্দ করলেন। সে সময় কোনো ব্যক্তি তার সঙ্গীকে অভিশাপ দিতে চাইলে বলত: আল্লাহ তোমার জারিব (বরাদ্দকৃত খাদ্য) ছিন্ন করে দিন। আরবদের গোত্রীয় বিন্যাস ও বংশমর্যাদার ভিত্তিতে দিওয়ান বা দাপ্তরিক তালিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছিল। তবে ভাতার ক্ষেত্রে ইসলামে অগ্রগামিতা এবং দ্বীনের পথে বিশেষ অবদানকে মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা হতো। পরবর্তীতে অগ্রগামী ব্যক্তিদের প্রজন্মের অবর্তমানে বীরত্ব এবং জিহাদের ময়দানে ত্যাগের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। সামরিক দিওয়ান প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে এটিই ছিল এর নিকটবর্তী ভিত্তি এবং শরয়ি বিন্যাস। অন্যদিকে রাজস্ব ও কর আদায়ের দিওয়ানগুলোর ক্ষেত্রে সিরিয়া ও ইরাকে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও পূর্ববর্তী নিয়ম বহাল ছিল। সিরিয়ার দিওয়ান ছিল রোমান ভাষায়, কারণ তা রোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। আর ইরাকের দিওয়ান ছিল ফারসি ভাষায়, কারণ তা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দীর্ঘকাল এভাবেই তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল।

(ص: 301)الأحكام السلطانية للماوردي

إلى زمن عبد الملك بن مروان، فنقل ديوان الشام إلى العربية سنة إحدى وثمانين. وكان سبب نقله إليه ما حكاه المدائني: أنَّ بعض كُتَّاب الروم في ديوانه أراد ماء لدواته فبال فيها بدلًا من الماء فأدَّبه، وأمر سليمان بن سعد أن ينقل الديوان إلى العربية، فسأله أن يعينه بخراج الأردن سنة، ففعل وولَّاه الأردن، وكان خراجه مائة

وثمانين ألف دينار، فلم تنقض السنة حتى فرغ من الديوان فنقله، وأتى به إلى عبد الملك بن مروان، فدعا سرجون1 كاتبه فعرضه عليه، فغمه وخرج كئيبًا؛ فلقيه قوم من كتاب الروم فقال لهم: اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة، وقد قطعها الله عنكم.

وأما ديوان الفارسية بالعراق فكان سبب نقله إلى العربية أنَّ كاتب الحجَّاجِ كان يسمَّى زاذان فروخ، كان معه صالح بن عبد الرحمن يكتب بين يديه بالعربية والفارسية، فوصله زاذان فروخ بالحجاج فخفَّ على قلبه، فقال صالح لزاذان فروخ: إن الحجاج قد قرَّبني ولا آمن عليك أن يقدمني عليك، فقال: لا تظن ذلك فهو إليَّ أحوج مني إليه؛ لأنه لا يجد من يكفيه حسابه غيرى، فقال صالح: والله لوشئت أن أحوّل الحساب إلى العربية لفعلت، قال: فحوّل منه ورقة أو سطرًا حتى أرى ففعل، ثم قتل زاذان فروخ في أيام عبد الرحمن بن الأشعث، فاستخلف الحجَّاج صالحًا مكانه، فذكر له ما جرى بينه وبين زاذان فروخ، فأمره أن ينقله، فأجابه إلى ذلك وأجله فيه أجلًا حتى نقله إلى العربية، فلمَّا عرف مردان شاه بن زاذان فروخ ذلك بذل له مائة ألف درهم؛ ليظهر للحجاج العجز عنه فلم يفعل، فقال له: قطع الله أوصالك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسية، فكان عبد الحميد بن يحيى كاتب

---

1 هو سرجون بن منصور الرومي، كاتب لمعاوية ويزيد ابنه ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان، إلى أن أمره عبد الملك بأمر فتوانى فيه، ورأى منه عبد الملك بعض التفريط، فقال لسليمان ابن سعد كاتبه على الرسائل: إنَّ سرجون يدل علينا بصناعته، وأظنّ أنه رأى ضرورتنا إليه في حسابه، فما عندك فيه حيلة؟ فقال: بلى، لو شئت لحوَّلت الحساب من الرومية إلى العربية. قال: افعل. قال: أنظرني على ذلك. قال: لك نظرة ما شئت، فحوَّل الديوان، فولَّاه عبد الملك جميع ذلك. وحسَّان النبطي كاتب الحجاج، وسالم مولى هشام بن عبد الملك، وعبد الحميد

الأكبر، وعبد الصمد، وجبلة بن عبد الرحمن، وقحذم جد الوليد بن هشام القحذمي، وهو الذي قلب الدواوين من الفارسية إلى العربية. [انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه] .

আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের সময়কাল পর্যন্ত, অতঃপর তিনি একাশি হিজরী সনে শামের দিওয়ান (প্রশাসনিক দপ্তর) আরবিতে স্থানান্তরিত করেন।

এর স্থানান্তরের কারণ সম্পর্কে আল-মাদায়িনী বর্ণনা করেছেন যে: তাঁর দিওয়ানের জনৈক রোমান লেখক কালির দোয়াতের জন্য পানি চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পানির পরিবর্তে তাতে প্রস্রাব করে দেন। ফলে তিনি তাকে শাস্তি দেন এবং সুলাইমান ইবন সা'দকে দিওয়ানটি আরবিতে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। সুলাইমান তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন জানান যে, তাকে যেন এক বছরের জন্য জর্ডানের ভূমিরাজস্ব প্রদান করা হয়। তিনি তা মঞ্জুর করেন এবং তাকে জর্ডানের শাসনভার অর্পণ করেন। সেখানকার ভূমিরাজস্ব ছিল এক লক্ষ আশি হাজার দিনার। বছর শেষ হওয়ার আগেই তিনি দিওয়ানের কাজ সম্পন্ন করে তা স্থানান্তর করেন এবং আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের নিকট নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর সচিব সারজুনকে১ ডাকলেন এবং এটি তাঁর সামনে পেশ করলেন। এতে সে অত্যন্ত মর্মাহত হলো এবং বিষণ্ন মনে বের হয়ে গেল। রোমান লেখকদের একটি দল তাঁর সাথে দেখা করলে সে তাদের বলল: তোমরা এই পেশা ছাড়া অন্য কোথাও জীবিকা অন্বেষণ করো, আল্লাহ তোমাদের থেকে এই পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

আর ইরাকের পারস্য দিওয়ান আরবিতে স্থানান্তরের কারণ ছিল এই যে, হাজ্জাজের সচিবের নাম ছিল জাযান ফারুখ। সালেহ ইবন আব্দুর রহমান তাঁর অধীনে আরবি ও ফারসি উভয় ভাষায় লিখতেন। জাযান ফারুখ তাকে হাজ্জাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তিনি হাজ্জাজের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। সালেহ জাযান ফারুখকে বললেন: হাজ্জাজ আমাকে তাঁর নিকটবর্তী করেছেন, আর আমি তোমার ব্যাপারে শঙ্কিত যে তিনি আমাকে তোমার স্থলাভিষিক্ত করবেন। সে বলল: এমনটি ভেব না, কারণ আমার তাঁর প্রতি যতটা প্রয়োজন, তাঁর আমার প্রতি তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন; কেননা আমি ছাড়া তাঁর হিসাব সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত কাউকে তিনি পাবেন না। তখন সালেহ বললেন: আল্লাহর কসম, আমি যদি চাই তবে পুরো হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিকে আরবিতে রূপান্তর করতে পারি। সে বলল: তবে এর থেকে একটি পাতা বা একটি লাইন রূপান্তর করে দেখাও। তিনি তাই করলেন। এরপর আব্দুর রহমান ইবনুল আশআসের

বিদ্রোহের সময়কালে জাযান ফারুখ নিহত হন এবং হাজ্জাজ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সালেহকে নিযুক্ত করেন। সালেহ তাঁর ও জাযান ফারুখের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি হাজ্জাজের কাছে বর্ণনা করলেন। তখন হাজ্জাজ তাকে এটি স্থানান্তরের নির্দেশ দিলেন। তিনি এতে সম্মত হলেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এটি আরবিতে রূপান্তর করলেন। যখন জাযান ফারুখের পুত্র মাদান শাহ বিষয়টি জানতে পারল, তখন সে সালেহকে এক লক্ষ দিরহাম প্রদানের প্রস্তাব দিল যাতে তিনি হাজ্জাজের কাছে এটি করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। তখন সে তাকে বলল: আল্লাহ দুনিয়া থেকে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে দিন, যেমনটি তুমি ফারসি ভাষার মূল ভিত্তি উপড়ে ফেলেছ। অতঃপর আব্দুল হামিদ ইবন ইয়াহইয়া ছিলেন সচিব...

---

১ তিনি হলেন সারজুন ইবন মানসুর আল-রুমি, যিনি মুয়াবিয়া, তাঁর পুত্র ইয়াজিদ, মারওয়ান ইবনুল হাকাম এবং আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের সচিব ছিলেন। আব্দুল মালিক তাকে একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তিনি অবহেলা করেন। আব্দুল মালিক যখন তাঁর মধ্যে কিছুটা শৈথিল্য লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি তাঁর পত্র যোগাযোগ সচিব সুলাইমান ইবন সা'দকে বললেন: সারজুন তাঁর কারিগরি দক্ষতার কারণে আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। আমার মনে হয় সে হিসাবরক্ষণ কাজে আমাদের তার মুখাপেক্ষিতা টের পেয়েছে। এ বিষয়ে তোমার কাছে কোনো কৌশল আছে কি?
তিনি বললেন: হ্যাঁ, আপনি চাইলে আমি হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি রোমান থেকে আরবিতে রূপান্তর করতে পারি। তিনি বললেন: করো। তিনি বললেন: আমাকে এজন্য সময় দিন। তিনি বললেন: তোমার যতটুকু প্রয়োজন সময় নাও। অতঃপর তিনি দিওয়ানটি রূপান্তর করলেন এবং আব্দুল মালিক তাকে এই সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। এছাড়া হাসান আন-নাবাতি ছিলেন হাজ্জাজের সচিব, সালেম ছিলেন হিশাম ইবন আব্দুল মালিকের মুক্তদাস, আব্দুল হামিদ আল-আকবার, আব্দুস সামাদ, জাবালা ইবন আব্দুর রহমান এবং কাযহাম—যিনি আল-ওয়ালিদ ইবন হিশাম আল-কাযহামির দাদা ছিলেন এবং তিনিই মূলত ফারসি থেকে দিওয়ানসমূহকে আরবিতে রূপান্তর করেছিলেন। [দেখুন: ইবন আব্দ রাব্বিহি রচিত আল-ইকদ আল-ফারিদ]।

مروان يقول: لله در صالح ما أعظم منَّته على الكتاب1.

فصل:

والذي يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم أربعة أقسام:

أحدها: ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء.

والثاني: ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق.

والثالث: ما يختص بالعمال من تقليد وعزل.

والرابع: ما يختص ببيت المال من دخل وخراج، فهذه أربعة أقسام تقتضيها أحكام الشرع، يتضمَّن تفصيلها ما ربما كان لكتاب الدواوين في إفرادها عادة هم بها أخص.

فأما القسم الأول: فيما يختص بالجيش من إثبات وعطاء، فإثباتهم في الديوان معتبر بثلاثة شروط.

أحدها: الوصف الذي يجوز إثباتهم.

والثاني: السبب الذي يستحق به ترتيبهم.

والثالث: الحال التي يقدر به عطاؤهم.

فأما شرط جواز إثباتهم في الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف:

أحدها: البلوغ، فإنَّ الصبى من جملة الذراري والأتباع، فلم يجز أن يثبت في ديوان الجيش، فكان جاريًا في عطاء الذراري.

والثاني: الحرية؛ لأنَّ المملوك تابع لسيده، فكان داخلًا في عطائه، وأسقط أبو حنيفة اعتبار الحرية، وجوَّز إفراد العبد بالعطاء في ديوان المقاتلة، وهو رأي أبي بكر وخالفه فيه عمر، واعتبر الحرية في العطاء، وبه أخذ الشافعي.

والثالث: الإسلام ليدفع عن الملّة باعتقاده، ويوثّق بنصحه واجتهاده، فإن أثبت فيهم ذميًّا لم يجز، وإن ارتدَّ منهم مسلم سقط.

---

1 انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري.

মারওয়ান বলেন: সালিহর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ হোক, লেখকদের (প্রশাসনিক লিপিকারদের) ওপর তাঁর কতই না বিশাল অবদান! ১।

পরিচ্ছেদ:

সালতানাতের দেওয়ান (প্রশাসনিক বিভাগ) যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে, তা চার ভাগে বিভক্ত:

প্রথমটি: যা সেনাবাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট; যেমন তালিকাভুক্তকরণ এবং পারিশ্রমিক বা ভাতা প্রদান।

দ্বিতীয়টি: যা দাপ্তরিক কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট; যেমন বিধি-বিধান এবং অধিকারসমূহ।

তৃতীয়টি: যা কর্মকর্তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট; যেমন তাদের নিয়োগ দান এবং পদচ্যুতি।

চতুর্থটি: যা বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) সংশ্লিষ্ট; যেমন আয় এবং রাজস্ব। এগুলি হলো সেই চারটি বিভাগ যা শরীয়তের বিধান অনুসারে আবশ্যকীয়। এগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় এমন বিষয়সমূহও অন্তর্ভুক্ত হবে যা সম্ভবত দেওয়ানের লিপিকারদের প্রথা অনুযায়ী তারা এককভাবে করার ক্ষেত্রে অধিক পারদর্শী।

প্রথম বিভাগ প্রসঙ্গে: যা সেনাবাহিনীর তালিকাভুক্তি ও ভাতা সংশ্লিষ্ট; দেওয়ানে তাদের তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত বিবেচনা করা হয়।

প্রথমটি: সেই গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য যার ভিত্তিতে তাদের তালিকাভুক্ত করা বৈধ।

দ্বিতীয়টি: সেই কারণ যার ভিত্তিতে তারা ক্রমে বিন্যস্ত হওয়ার যোগ্য হয়।

তৃতীয়টি: সেই অবস্থা যার মাধ্যমে তাদের ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

দেওয়ানে তাদের তালিকাভুক্তির বৈধতার শর্ত প্রসঙ্গে পাঁচটি গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়:

প্রথমটি: সাবালক হওয়া; কেননা অপ্রাপ্তবয়স্করা সন্তানসন্ততি ও অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। তাই তাকে সেনাবাহিনীর দেওয়ানে তালিকাভুক্ত করা বৈধ নয়। সে সন্তানদের জন্য বরাদ্দকৃত ভাতার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

দ্বিতীয়টি: স্বাধীন হওয়া; কেননা দাস তার মনিবের অনুগামী, তাই সে তার মনিবের ভাতার আওতাভুক্ত থাকবে। ইমাম আবু হানিফা স্বাধীন হওয়ার শর্তটি বাতিল করেছেন এবং যোদ্ধাদের দেওয়ানে দাসকে পৃথকভাবে ভাতা প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন। এটি আবু বকর

(রা.)-এর অভিমত ছিল, তবে ওমর (রা.) তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়াকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম শাফেয়ীও এই মতটি গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয়টি: ইসলাম গ্রহণ করা; যেন সে নিজ আকিদা বা বিশ্বাসের কারণে মিল্লাত (জাতি)-এর প্রতিরক্ষা করতে পারে এবং তার বিশ্বস্ততা ও প্রচেষ্টার ওপর ভরসা করা যায়। সুতরাং তাদের মধ্যে যদি কোনো জিম্মিকে (অমুসলিম নাগরিক) অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে তা বৈধ হবে না। আর যদি তাদের মধ্য থেকে কোনো মুসলমান ধর্মত্যাগী হয়, তবে তার নাম বাদ পড়ে যাবে।

১। দেখুন: নুওয়াইরির নিহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব।

(ص: 303)الأحكام السلطانية للماوردي

والرابع: السَّلَامة من الآفات المانعة من القتال؛ فلا يجوز أن يكون زمنًا ولا أعمى ولا أقطع، ويجوز أن يكون أخرس أو أصمّ. فأَمَّا الأعرج فإن كان فارسًا أثبت، وإن كان راجلًا لم يثبت.

والخامس: أن يكون فيه إقدام على الحروب ومعرفة بالقتال، فإن ضعفت منَّته عن الإقدام، أو قلَّت معرفته بالقتال لم يجز إثباته؛ لأنه مرصد لما هو عاجز عنه، فإذا تكاملت فيه هذه الأوصاف الخمسة كان إثباته في ديوان الجيش موقوفًا على الطلب والإيجاب، فيكون منه الطلب إذا تجرَّد عن كل عمل، ويكون لمن ولي الأمر الإجابة إذا دعت الحاجة إليه، فإن كان مشهور الاسم نبيّه القدر لم يحسن إذا أثبت في الديوان أن يحلَّى فيه أو ينعت، فإن كان من المغمورين في الناس حلي ونعت، فذكر سنه وقدُّه ولونه وحلِّي وجهه، ووصف بما يتميّز به عن غيره؛ لئلَّا تتفق الأسماء ويدَّعي وقت العطاء، وضمَّ إلى نقيب عليه أو عريف له؛ ليكون مأخوذًا بدركه.

فصل:

واما ترتيبهم في الديوان إذا أثبتوا فيه فمعتبر من وجهين: أحدهما عام، والآخر خاص.

فأمَّا العام: فهو ترتيب القبائل والأجناس حتى تتميّز كل قبيلة عن غيرها، وكل جنس عمن خالفة، فلا يجمع فيه بين المختلفين، ولا يفرّق به بين المتفقين؛ لتكون دعوة الديوان على نسق واحد معروف بالنسب، يزول به التنازع والتجاذب، وإذا كان هكذا لم يخل حالهم من أن يكونوا عربًا أو عجمًا، فإن كانوا عربًا تجمعهم أنساب، وتفرق بينهم أنساب ترتيب قبائلهم بالقربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمر رضي الله عنه حين دونهم.

فيبدأ بالترتيب في أصل النسب، ثم بما يتفرَّع عنه، فالعرب عدنان وقحطان، فتقدم عدنان على قحطان؛ لأنَّ النبوة فيهم، وعدنان يجمع ربيعة ومضر، فتقدم مضر على ربيعة؛ لأنَّ النبوة فيهم، ومضر يجمع قريشًا وغير قريش، فتقدَّم قريش؛ لأن النبوة فيهم، وقريش يجمع بني هاشم وغيرهم، فتقدَّم بنو هاشم؛ لأنَّ النبوة فيهم، فيكون بنو هاشم قطب الترتيب، ثم بمن يليهم من أقرب الأنساب إليهم يستوعب قريشًا، ثم بمن يليهم في النسب حتى

চতুর্থ শর্ত: যুদ্ধ করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন শারীরিক ব্যাধি বা ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া। সুতরাং পঙ্গু, অন্ধ কিংবা অঙ্গহীন হওয়া চলবে না। তবে বোবা বা বধির হওয়া অনুমোদিত। আর খোঁড়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি সে অশ্বারোহী হিসেবে দক্ষ হয় তবে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, কিন্তু যদি সে পদাতিক হয় তবে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

পঞ্চম শর্ত: যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস এবং রণকৌশল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা। যদি তার সাহসিকতা দুর্বল হয় কিংবা যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান অপর্যাপ্ত হয়, তবে তাকে তালিকাভুক্ত করা বৈধ নয়; কারণ তাকে এমন কাজের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে যা করতে সে অক্ষম। যখন তার মধ্যে এই পাঁচটি গুণ পূর্ণ হবে, তখন সামরিক দিওয়ানে (রেজিস্টারে) তার নাম নথিভুক্ত হওয়া আবেদন এবং গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল হবে। যখন সে অন্য সকল পেশা থেকে মুক্ত থাকবে

তখন তার পক্ষ থেকে হবে আবেদন, আর যখন প্রয়োজন দেখা দেবে তখন রাষ্ট্রপ্রধান বা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে হবে তার গ্রহণ বা স্বীকৃতি। যদি সে সুপরিচিত নামের ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হয়, তবে দিওয়ানে তার নাম নথিভুক্ত করার সময় তার শারীরিক অবয়ব বা বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেওয়া শোভনীয় নয়। কিন্তু যদি সে সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও গুণের বর্ণনা দিতে হবে। অর্থাৎ তার বয়স, উচ্চতা, গায়ের রঙ এবং চেহারার বিশেষ চিহ্নসমূহ উল্লেখ করতে হবে এবং এমনভাবে বিশেষায়িত করতে হবে যাতে অন্যের থেকে তাকে পৃথক করা যায়; যেন নামের মিলের কারণে ভাতা প্রদানের সময় কোনো বিভ্রান্তি না ঘটে এবং কোনো প্রকার দাবি উত্থাপনের সুযোগ না থাকে। তাকে একজন নকীব (তত্ত্বাবধায়ক) বা আরিফের (দলনেতা) অধীনে ন্যস্ত করা হবে, যাতে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের দায়ভার গ্রহণ করা যায়।

পরিচ্ছেদ:

দিওয়ানে নাম নথিভুক্ত করার পর তাদের বিন্যাস বা ক্রমবিন্যাস দুটি দিক থেকে বিবেচনাযোগ্য: একটি সাধারণ এবং অন্যটি বিশেষ।

সাধারণ দিকটি হলো: গোত্র ও জাতিগত বিন্যাস যাতে প্রতিটি গোত্র অন্য গোত্র থেকে পৃথক থাকে এবং প্রতিটি জাতি ভিন্ন জাতি থেকে আলাদা থাকে। এতে বিসদৃশ ব্যক্তিদের একত্রিত করা হবে না এবং সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে না; যাতে দিওয়ানের ডাক বা শৃঙ্খলা বংশীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে একই ধারায় পরিচিত থাকে, যার ফলে বিবাদ ও টানাপোড়েন দূর হয়। আর এই বিন্যাস অনুযায়ী তারা হয় আরব হবে নতুবা অনারব। যদি তারা আরব হয় তবে তাদের বংশধারা তাদের যেমন একত্রিত করবে তেমনি নির্দিষ্ট উপগোত্রগুলো তাদের পৃথক করবে। তাদের গোত্রবিন্যাস করা হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশগত নৈকট্যের ক্রমানুসারে, যেমনটি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন যখন তিনি তাদের জন্য দিওয়ান সংকলন করেছিলেন।

সুতরাং বিন্যাস শুরু হবে মূল বংশধারা থেকে, এরপর তার শাখা-প্রশাখা। আরবরা মূলত আদনান ও কাহতান—এই দুই ধারায় বিভক্ত। এখানে আদনানকে কাহতানের আগে প্রাধান্য দেওয়া হবে; কারণ নবুওয়াত তাদের মধ্যেই রয়েছে। আদনান বংশধারা আবার রাবিয়াহ ও মুদারকে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে মুদারকে রাবিয়াহর আগে রাখা হবে; কারণ নবুওয়াত তাদের মধ্যে। মুদার কুরাইশ ও কুরাইশ বহির্ভূত গোত্রগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে কুরাইশকে প্রাধান্য দেওয়া হবে; কারণ নবুওয়াত তাদের মধ্যে। কুরাইশ আবার বনু হাশিম ও অন্যদের

অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে বনু হাশিমকে অগ্রগণ্য করা হবে; কারণ নবুওয়াত তাদের মধ্যে। সুতরাং বনু হাশিম হবে এই বিন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। এরপর বংশগত নৈকট্যের ভিত্তিতে ক্রমানুসারে কুরাইশের অবশিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, এরপর বংশানুসারে যারা তাদের নিকটবর্তী তাদের ধারাবাহিকভাবে...

(ص: 304)الأحكام السلطانية للماوردي

يستوعب جميع مضر، ثم بمن يليهم في النسب حتى يستوعب جميع عدنان.
وقد رتّب أنساب العرب ست مراتب، فجعلت طبقات أنسابهم هي: شعب، ثم قبيلة، ثم عمارة، ثم بطن، ثم فخذ، ثم فصيلة.
فالشعب: النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان، سمِّي شعبًا لأنَّ القبائل منه تشعَّبت، ثم القبيلة، وهي: ما انقسمت فيها أنساب الشعب مثل ربيعة ومضر، سميت قبيلة لتقابل الأنساب فيها، ثم العمارة، وهي ما انقسمت فيها أنساب القبائل مثل قريش وكنانة. ثم البطن، وهو ما انقصمت فيه أنساب العمارة مثل بني عبد مناف وبني مخزوم. ثم الفخذ وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن مثل بني هاشم وبني أمية. ثم الفصيلة وهي ما انقسمت فيها أنساب الفخذ مثل بني أبي طالب وبني العباس،
فالفخذ يجمع الفصائل، والبطن يجمع الأفخاذ، والعمارة تجمع البطون، والقبيلة تجمع العمائر، والشعب يجمع القبائل، وإذا تباعدت الأنساب صارت القبائل شعوبًا والعمائر قبائل.
وإن كانوا عجمًا لا يجتمعون على نسب، فالذي يجمعهم عند فقد النسب أمران: إما أجناس وإما بلاد، فالمتميزون بالأجناس كالترك والهند، ثم يميز الترك أجناسًا والهند أجناسًا، والمتميزون بالبلاد كالديلم والجبل، ثم يتميز الديلم بلدانًا

والجبل بلدانًا، وإذا تميزوا بالأجناس أو البلدان، فإن كانت لهم سابقة في الإسلام ترتبوا عليها في الديوان، وإن لم تكن لهم سابقة ترتبوا بالقرب من ولي الأمر، فإن تساووا فبالسبق إلى طاعته.

وأما الترتيب الخاص: فهو ترتيب الواحد بعد الواحد يرتب بالسابقة في الإسلام، فإن تكافئوا في السابقة ترتبوا بالدين، فإن تقاربوا فيه ترتبوا بالسن، فإن تقاربوا فيها ترتبوا بالشجاعة، فإن تقاربوا فيها فولي الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة، أو يرتبهم عن رأيه واجتهاده.

এটি সমগ্র মুদার বংশকে অন্তর্ভুক্ত করে, অতঃপর বংশপরম্পরায় তাদের নিকটবর্তীদেরকে, এভাবে সমগ্র আদনান বংশকে তা শামিল করে।

আর আরবদের বংশধারাকে ছয়টি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তাদের বংশীয় পর্যায়গুলো হলো: শাব (মহা-গোত্র), অতঃপর কাবিলাহ (গোত্র), অতঃপর ইমারাহ (উপ-শাখা), অতঃপর বাতন (শাখা), অতঃপর ফাখিজ (উপ-গোষ্ঠী) এবং সবশেষে ফাসিলাহ (পরিবার)।

শাব হলো দূরবর্তী বংশপরম্পরা যেমন আদনান ও কাহতান। একে 'শাব' বলা হয় কারণ এটি থেকে বিভিন্ন গোত্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। অতঃপর কাবিলাহ; এটি হলো সেই স্তর যাতে শাবের বংশসমূহ বিভক্ত হয়, যেমন রাবিয়াহ ও মুদার। বংশগুলোর সমান্তরাল অবস্থানের কারণে একে 'কাবিলাহ' নামকরণ করা হয়েছে। এরপর ইমারাহ; এটি হলো সেই স্তর যাতে কাবিলার বংশসমূহ বিভক্ত হয়, যেমন কুরাইশ ও কিনানাহ। এরপর বাতন; যাতে ইমারাহর বংশসমূহ বিভক্ত হয়, যেমন বনু আবদে মানাফ ও বনু মাখজুম। এরপর ফাখিজ; যাতে বাতনের বংশসমূহ বিভক্ত হয়, যেমন বনু হাশিম ও বনু উমাইয়াহ। এরপর ফাসিলাহ; যাতে ফাখিজের বংশসমূহ বিভক্ত হয়, যেমন বনু আবি তালিব ও বনু আব্বাস। সুতরাং ফাখিজ ফাসিলাহসমূহকে একত্রিত করে, বাতন ফাখিজসমূহকে একত্রিত করে, ইমারাহ বাতনসমূহকে একত্রিত করে, কাবিলাহ ইমারাহসমূহকে একত্রিত করে এবং শাব কাবিলাহসমূহকে একত্রিত করে। আর যখন বংশধারা অধিক বিস্তৃত ও দূরবর্তী হয়ে যায়, তখন কাবিলাহগুলো শাবে এবং ইমারাহগুলো কাবিলাহতে পরিণত হয়।

আর যদি তারা অনারব হয় যারা কোনো একক বংশধারায় মিলিত হয় না, তবে বংশের অনুপস্থিতিতে দুটি বিষয় তাদের একত্রিত করে: হয় জাতিসত্তা, না হয় দেশ। জাতিসত্তার

ভিত্তিতে স্বতন্ত্ররা হলো যেমন তুর্কি ও হিন্দুস্তানি; অতঃপর তুর্কি ও হিন্দুস্তানিদের মধ্যেও বিভিন্ন উপ-জাতি রয়েছে। আর দেশের ভিত্তিতে স্বতন্ত্ররা হলো যেমন দাইলাম ও জাবালবাসী; অতঃপর দাইলাম ও জাবালবাসীরাও বিভিন্ন অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়। যদি জাতি বা দেশের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণে তাদের কোনো পূর্ববর্তিতা থাকে, তবে রাষ্ট্রীয় নথিতে সেই ভিত্তিতেই তাদের বিন্যাস করা হবে। আর যদি তাদের কোনো পূর্ববর্তিতা না থাকে, তবে শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানের নৈকট্যের ভিত্তিতে তারা বিন্যস্ত হবে। আর যদি এক্ষেত্রেও তারা সমান হয়, তবে আনুগত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আর বিশেষ বিন্যাস হলো: এটি হলো একজন ব্যক্তির পর আরেকজনকে ক্রমানুসারে সাজানো, যা ইসলাম গ্রহণে পূর্ববর্তিতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। যদি পূর্ববর্তিতায় তারা সমান হয়, তবে ধর্মীয় নিষ্ঠার ভিত্তিতে বিন্যস্ত হবে। যদি এ ক্ষেত্রেও তারা কাছাকাছি হয়, তবে বয়সের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিন্যস্ত হবে। যদি এতেও সমপর্যায়ের হয়, তবে সাহসিকতার ভিত্তিতে বিন্যস্ত হবে। আর সাহসিকতাতেও যদি পরস্পর কাছাকাছি হয়, তবে শাসক লটারির মাধ্যমে অথবা নিজের বিবেচনা ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে তাদের বিন্যাস করার বিষয়ে পূর্ণ এখতিয়ার রাখবেন।

(ص: 305)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل:

وأمَّا تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة.

والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه:

أحدها: عدد من يعوله من الذراري والمماليك.

والثاني: عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر.

والثالث: الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص، فيقدَّر كفايته في نفقته وكسوته لعامه كله، فيكون هذا المقدر في عطائه، ثم تعرض حاله في كل عام، فإن زادت رواتبه الماسَّة زيد، وإن نقصت نقص.

واختلف الفقهاء إذا تقدَّر رزقه بالكفاية، هل يجوز أن يزاد عليها؟ فمنع الشافعي من زيادته على كفايته، وإن اتسع المال؛ لأنَّ أموال بيت المال لا توضع إلَّا في الحقوق اللازمة، وجوَّز أبو حنيفة زيادته على الكفاية إذا اتسع المال لها، ويكون وقت العطاء معلومًا يتوقَّعه الجيش عند الاستحقاق، وهو معتبر بالوقت الذي تستوفي فيه حقوق بيت المال، فإن كانت تستوفي في وقت واحد من السنة جعل العطاء في رأس كل سنة، وإن كانت تستوفي في وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين، وإن كانت تستوفي في كل شهر جعل العطاء في رأس كل شهر؛ ليكون المال مصروفًا إليهم عند حصوله، فلا يحبس عنهم إذا اجتمع، ولا يطالبون به إذا تأخَّر، وإذا تأخَّر عنهم العطاء عند استحقاقه وكان حاصلًا في بيت المال كان لهم المطالبة به كالديون المستحقة، وإن أعوز بيت المال لعوارض أبطلت حقوقه أو أخرتها كانت أرزاقهم دينًا على بيت المال، وليس لهم مطالبة وليّ الأمر به، كما ليس لصاحب الدَّيْن مطالبة من أعسر بدينه، وإذا أراد وليّ الأمر إسقاط بعض الجيش لسبب أوجبه، أو لعذر اقتضاه جاز، وإن كان لغير سبب لم يجز؛ لأنهم جيش المسلمين في الذبِّ عنهم.

وإذا أراد بعض الجيش إخراج نفسه من الديوان جاز مع الاستغناء عنه، ولم يجز من الحاجة إليه، إلَّا أن يكون معذورًا، وإذا جرّد الجيش لقتال فامتنعوا، وهم أكفاء من حاربهم

পরিচ্ছেদ:

আর ভাতার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ততার বিষয়টি বিবেচ্য, যাতে এর মাধ্যমে সে এমন সব জীবিকা অনুসন্ধান থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে যা তাকে মুসলিম ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষা থেকে বিচ্যুত করে দেয়।

আর পর্যাপ্ততা তিনটি দিক থেকে বিবেচনা করা হয়:

প্রথমত: তার ওপর নির্ভরশীল সন্তান-সন্ততি ও ভৃত্যদের সংখ্যা।

দ্বিতীয়ত: তার অধীনে থাকা ঘোড়া ও বাহনজন্তুর সংখ্যা।

তৃতীয়ত: সে যেখানে বসবাস করে সেখানকার দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি। অতএব, পুরো বছরের জন্য তার ভরণপোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদের পর্যাপ্ততা নিরূপণ করা হবে এবং এই নির্ধারিত পরিমাণই হবে তার প্রাপ্য ভাতা। অতঃপর প্রতি বছর তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে; যদি তার অপরিহার্য ব্যয় বৃদ্ধি পায় তবে ভাতা বাড়ানো হবে, আর যদি হ্রাস পায় তবে কমানো হবে। ফকিহগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, যখন রিযিক পর্যাপ্ততা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, তখন কি এর অতিরিক্ত প্রদান করা জায়েজ? ইমাম শাফেঈ পর্যাপ্ততার অতিরিক্ত প্রদান করতে নিষেধ করেছেন, যদিও সম্পদের প্রাচুর্য থাকে; কারণ বায়তুল মালের অর্থ কেবল আবশ্যকীয় অধিকারগুলোতেই ব্যয় করা যায়। ইমাম আবু হানিফা পর্যাপ্ততার অতিরিক্ত প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন যদি সম্পদের প্রাচুর্য থাকে। আর ভাতা প্রদানের সময়টি সুনির্দিষ্ট হতে হবে যা সেনাবাহিনী তাদের পাওনা লাভের সময় হিসেবে অবগত থাকবে। এটি বায়তুল মালের পাওনা আদায়ের সময়ের ওপর নির্ভরশীল; যদি বছরে একবার আদায় করা হয় তবে প্রতি বছরের শুরুতে ভাতা প্রদান করা হবে। যদি বছরে দুইবার আদায় করা হয় তবে বছরে দুইবার ভাতা দেওয়া হবে। আর যদি প্রতি মাসে আদায় করা হয় তবে প্রতি মাসের শুরুতে ভাতা প্রদান করা হবে; যাতে সম্পদ অর্জিত হওয়ামাত্রই তাদের জন্য ব্যয় করা যায়। ফলে সম্পদ জমা হলে যেন তা আটকে রাখা না হয়, আবার বিলম্ব হলে যেন তারা তা দাবি না করে। আর যদি পাওনা হওয়ার পর ভাতা প্রদানে বিলম্ব হয় অথচ বায়তুল মালে অর্থ গচ্ছিত থাকে, তবে তারা তা পাওনা ঋণের ন্যায় দাবি করার অধিকার রাখবে। কিন্তু যদি কোনো আকস্মিক কারণে বায়তুল মালে অর্থের সংকট দেখা দেয় যার ফলে তার পাওনাগুলো বাতিল বা বিলম্বিত হয়, তবে তাদের প্রাপ্য রিযিক বায়তুল মালের ওপর ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। তবে তারা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে তা দাবি করতে পারবে না, যেমন পাওনাদার তার নিঃস্ব দেনাদারের কাছে ঋণ দাবি করতে পারে না। আর রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোনো অনিবার্য কারণ বা সংগত ওজরের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর কোনো অংশকে অব্যাহতি দিতে চান তবে তা জায়েজ, কিন্তু কোনো কারণ ছাড়া তা জায়েজ নয়; কারণ তারা মুসলিমদের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত মুসলিম বাহিনী।

যদি সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য দিওয়ান (রেজিস্টার) থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করতে চায়, তবে তার অনুপস্থিতিতে কোনো সমস্যা না হলে তা জায়েজ হবে। কিন্তু তার প্রয়োজন

থাকলে তা জায়েজ হবে না, যদি না সে ওজরগ্রস্ত হয়। আর যখন কোনো বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং তারা অস্বীকৃতি জানায়, অথচ তারা শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় সমকক্ষ...

(ص: 306)الأحكام السلطانية للماوردي

سقطت أرزاقهم، وإن ضعفوا عنهم لم تسقط، وإذا نفقت دابَّة أحدهم في حرب عوِّض عنها، وإن نفقت في غير حرب لم يعوض، وإذا استهلك سلاحه فيها عوض عنه إن لم يكن يدخل في تقدير عطائه، ولم يعوض إن دخل فيه. وإذا جُرِّدَ لسفر أعطي نفقة سفره إن لم تدخل في تقدير عطائه ولم يعط إن دخلت فيه. وإذا مات أحدهم أو قتل كان ما يستحق من عطائه موروثًا عنه على فرائض الله تعالى، وهو دين لورثته في بيت المال.

واختلف الفقهاء في استبقاء نفقات ذريته من عطائه في ديوان الجيش على قولين:

أحدهما: أنه قد سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه، ويحالون على مال العشر والصدقة.

والقول الثاني: أنه يستبقي من عطائه نفقات ذريته ترغيبًا له في المقام، وبعثًا له على الإقدام.

واختلف الفقهاء في سقوط عطائه إذا حدثت به زمانة على قولين:

أحدهما: يسقط؛ لأنه في مقابلة عمل قد عدم.

والقول الثاني: أنه باقٍ على العطاء ترغيبًا في التجند والارتزاق.

তাদের নির্ধারিত ভাতা রহিত হয়ে যাবে, তবে তারা যদি (অক্ষমতার কারণে) দুর্বল হয়ে পড়ে তবে তা রহিত হবে না। যুদ্ধ চলাকালীন যদি তাদের কারও সওয়ারি পশু মারা যায়, তবে তাকে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে; আর যদি যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য অবস্থায় মারা যায়, তবে

ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। যুদ্ধে যদি তার অস্ত্র বিনষ্ট হয়, তবে তার জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে—যদি তা তার নির্ধারিত ভাতার অন্তর্ভুক্ত না থাকে; আর যদি তা ভাতার অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। তাকে যদি কোনো সফরের জন্য পাঠানো হয়, তবে তাকে সফরের ব্যয়ভার প্রদান করা হবে—যদি তা তার নির্ধারিত ভাতার অন্তর্ভুক্ত না থাকে; আর যদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে দেওয়া হবে না। তাদের কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তবে তার প্রাপ্য ভাতা মহান আল্লাহর নির্ধারিত উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মিরাস হিসেবে গণ্য হবে এবং তা বায়তুল মালের পক্ষ থেকে তার ওয়ারিশদের জন্য পাওনা হিসেবে বিবেচিত হবে।

সামরিক দপ্তরে সংরক্ষিত তার ভাতা থেকে তার সন্তানদের ভরণপোষণ অব্যাহত রাখার বিষয়ে ফকিহগণ দুটি মত ব্যক্ত করেছেন:

প্রথমত: মূল হকদার না থাকার কারণে সামরিক দপ্তর থেকে তাদের ভরণপোষণ রহিত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে উশর ও সদকার মালের ওপর সোপর্দ করা হবে।

দ্বিতীয় মত: যুদ্ধে অবিচল থাকতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবং বীরত্ব প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করার মানসে তার সন্তানদের জন্য ভরণপোষণ অব্যাহত রাখা হবে।

যদি কেউ দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি বা পঙ্গুত্বের শিকার হয়, তবে তার ভাতা রহিত হওয়ার বিষয়ে ফকিহগণ দুটি মত পোষণ করেছেন:

প্রথমত: তা রহিত হয়ে যাবে; কারণ এই ভাতা ছিল কর্মের বিনিময়ে, যা এখন বিলুপ্ত।

দ্বিতীয় মত: সৈন্যদলে যোগদানে এবং জীবিকা অর্জনে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে তার ভাতা অব্যাহত থাকবে।

(ص: 307)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل:

وأما القسم الثاني بالأعمال من رسوم وحقوق فيشتمل على ستة فصول:

أحدهما: تحديد العمل بما يتميز به من غيره، وتفصيل نواحيه التي تختلف أحكامها، فيجعل لكل بلد حدًّا لا يشاركه فيه غيره، ويفصل نواحي كل بلد إذا اختلفت أحكام نواحيه، وإن اختلفت أحكام الضياع في كل ناحية فصلت ضياعة كتفصيل نواحيه، وإن لم تختلف اقتصر على تفصيل النواحي دون الضياع.

والفصل الثاني: أن يذكر حال البلد هل فتح عنوة أو صلحًا، وما استقرَّ عليه حكم أرضه من عشر أو خراج، وهل اختلفت أحكامه ونواحيه أو تساوت؟ فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إمَّا أن يكون جميعه أرض عشر، أو جميعه أرض خراج، أو يكون بعضه عشرًا وبعضه خراجًا، فإن كان جميعه أرض عشر لم يلزم إثبات مسائحه؛ لأنَّ العشر على الزرع دون المساحة، ويكون ما استؤنِفَ زرعه مرفوعًا إلى ديوان العشر لا مستخرجًا منه، ويلزم تسمية أربابه عند رفعه إلى الديوان؛ لأنَّ وجوب العشر فيه معتبر بأربابه دون رقاب الأرضين.

وإذا رفع الزرع بأسماء أربابه ذكر مبلغ كيله، وحال سفيه بسيح أو عمل لاختلاف حكمه ليستوفي على موجبه، وإن كان جميعه أرض خراج لزم إثبات مسائحه؛ لأن الخراج على المساحة، فإن كان هذا الخراج في حكم الأجرة لم يلزم تسمية أرباب الأرضين؛ لأنه لا يختلف بإسلام ولا كفر، وإن كان الخراج في حكم الجزية لزم تسمية أربابه ووصفهم بالإسلام والكفر؛ لاختلاف حكمه باختلاف أهله، وإن كان بعضه عشرًا وبعضه خراجًا فصّل في ديوان العشر ما كان منه عشرًا، وفي ديوان الخراج ما كان منه خراجًا؛ لاختلاف الحكم فيها، وأجري على كل واحد منهما ما يختص بحكمه.

والفصل الثالث: أحكام خراجه، وما استقرَّ على مسائحه، هل هو مقاسمة على زرعه أو هو رزق مقدَّر على خراجه؛ فإن كان مقاسمة لزم إذا أخرجت مسائح الأرضين من ديوان الخراج أن يذكر معها مبلغ المقاسمة من ربع أو ثلث أو نصف، ويرفع إلى الديوان مقادير

পরিচ্ছেদ:

প্রশাসনিক কার্যাবলীর দ্বিতীয় বিভাগ, যা নির্ধারিত শুল্ক ও পাওনা সম্পর্কিত, তা ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত:

প্রথমত: কর্মের সীমানা এমনভাবে নির্ধারণ করা যার মাধ্যমে তা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র হয় এবং এর বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যেগুলোর বিধান ভিন্ন ভিন্ন। ফলে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য এমন সীমানা নির্ধারণ করা হবে যাতে অন্য কোনো অঞ্চল তাতে অংশীদার না হয়। প্রতিটি অঞ্চলের উপ-অঞ্চলসমূহের বিধান ভিন্ন হলে সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হবে। যদি কোনো উপ-অঞ্চলের অন্তর্গত ভূ-সম্পত্তিগুলোর বিধান ভিন্ন হয়, তবে উপ-অঞ্চলের বর্ণনার মতোই ভূ-সম্পত্তিগুলোরও বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে। আর যদি ভিন্ন না হয়, তবে ভূ-সম্পত্তির বর্ণনা বাদ দিয়ে কেবল উপ-অঞ্চলের বর্ণনা দিলেই যথেষ্ট হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ভূখণ্ডের অবস্থা উল্লেখ করা যে, তা কি বলপ্রয়োগে বিজিত হয়েছে নাকি সন্ধির মাধ্যমে? এবং সেই ভূমির ওপর উশর (দশমাংশ) না খারাজ (ভূমি কর)—কোন বিধান নির্ধারিত হয়েছে? এর বিধান ও উপ-অঞ্চলসমূহ কি ভিন্ন ভিন্ন নাকি অভিন্ন? কেননা এটি তিনটি অবস্থার বাইরে নয়: হয় তার পুরোটি উশরযোগ্য ভূমি হবে, অথবা পুরোটি খারাজযোগ্য ভূমি হবে, নতুবা কিছু অংশ উশরযোগ্য এবং কিছু অংশ খারাজযোগ্য হবে। যদি পুরো ভূমিই উশরযোগ্য হয়, তবে তার জরিপ বা আয়তন লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক নয়; কারণ উশর নির্ধারিত হয় ফসলের ওপর, ভূমির আয়তনের ওপর নয়। নতুন করে আবাদকৃত ফসলের বিবরণ উশর দিওয়ানে পেশ করতে হবে, তা সেখান থেকে কর্তনযোগ্য হবে না। ফসল দিওয়ানে জমা দেওয়ার সময় ভূমির মালিকদের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক; কারণ উশরের বাধ্যবাধকতা ভূমির মালিকদের ওপর নির্ভরশীল, ভূমির মূল মালিকানার ওপর নয়।

যখন মালিকদের নামে ফসলের হিসাব দাখিল করা হবে, তখন তার পরিমাপ উল্লেখ করতে হবে। সেই ফসল কি প্রাকৃতিকভাবে সেচপ্রাপ্ত নাকি কায়িক শ্রমের মাধ্যমে সেচকৃত—তার অবস্থা বর্ণনা করতে হবে; কারণ সেচ পদ্ধতির ভিন্নতায় বিধান ভিন্ন হয় যাতে সে অনুযায়ী হক আদায় করা যায়। আর যদি পুরো ভূমিই খারাজযোগ্য হয়, তবে ভূমির জরিপ বা পরিমাপ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক; কারণ খারাজ ভূমির আয়তনের ওপর নির্ধারিত হয়। এই খারাজ যদি ভাড়ার পর্যায়ভুক্ত হয়, তবে ভূমির মালিকদের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক নয়; কারণ ইসলাম গ্রহণ বা কুফরের কারণে এর বিধানে কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু খারাজ যদি জিজিয়ার পর্যায়ভুক্ত হয়, তবে মালিকদের নাম এবং তাদের ইসলাম বা কুফরের পরিচয় উল্লেখ করা

আবশ্যক; কারণ মালিকের ভিন্নতায় এর বিধান ভিন্ন হয়। আর যদি ভূমির কিছু অংশ উশরযোগ্য এবং কিছু অংশ খারাজযোগ্য হয়, তবে উশর দিওয়ানে উশরযোগ্য অংশ এবং খারাজ দিওয়ানে খারাজযোগ্য অংশ পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে; কেননা উভয়ের বিধান ভিন্ন। প্রতিটি ক্ষেত্রের ওপর তার সংশ্লিষ্ট বিধান প্রয়োগ করতে হবে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: খারাজের বিধানসমূহ এবং ভূমির আয়তনের ওপর যা নির্ধারিত হয়েছে তার বিবরণ; তা কি ফসলের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নির্ধারিত, নাকি খারাজের জন্য নির্ধারিত কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ? যদি তা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হয়, তবে খারাজ দিওয়ান থেকে ভূমির পরিমাপ বের করার সময় তার সাথে অংশীদারিত্বের হার—যেমন এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক—উল্লেখ করা আবশ্যক এবং দিওয়ানে সেই পরিমাণগুলো পেশ করতে হবে...

(ص: 308)الأحكام السلطانية للماوردي

الكيول؛ لتُستوفَى المقاسمة على موجبها، وإن كان الخراج ورقًا لم يخل من أن يكون متساويًا مع اختلاف الزروع أو مختلفًا، فإن كان متساويًا مع اختلاف الزروع أخرجت المسائح من ديوان الخراج ليستوفي خراجها، ولا يلزم أن يرفع إليه إلَّا ما قبض منها، وإن كان الخراج مختلفًا باختلاف الزروع لزم إخراج المسائح من ديوان الخراج، وأن يرفع إليه أجناس الزروع؛ ليستوفي خراج المساحة على ما يوجبه حكم الزرع.
والفصل الرابع: ذكر من في كل بلد من أهل الذمة وما استقرَّ عليهم في عقد الجزية، فإن كانت مختلفة باليسار والإعسار سموا في الديوان، مع ذكر عددهم ليختبر حال يسارهم وإعسارهم، وإن لم تختلف في اليسار والإعسار جاز الاقتصار

على ذكر عددهم، ووجب مراعاتهم في كل عام؛ ليثبت من بلغ، ويسقط من مات أو أسلم؛ لينحصر بذلك ما يستحق من جزيتهم.

والفصل الخامس: إن كان من بلدان المعادن أن يذكر أجناس معادنه، وعدد كل جنس منها ليستوفي حقَّ المعدن منها، وهذا مما لا ينضبط بمساحة، ولا ينحصر بتقدير لاختلافه، وإنما ينضبط بحسب المأخوذ منه إذا أعطى وأنال، ولا يلزم في أحكام المعادن أن يوصف في الديوان أحكام فتوحها، هل هي من أرض عشر أو خراج؛ لأن الديوان فيها موضوع لاستيفاء الحق من نيلها، وحقها لا يختلف باختلاف فتوحها وأحكام أرضها، وإنما يختلف ذلك في حقوق العاملين فيها والآخذين.

وقد تقدم القول في اختلاف الفقهاء في أجناس ما يؤخذ حق المعادن منه، وفي قدر المأخوذ منه، فإن لم يكن قد سبق الأئمة فيها حكم اجتهد والي الوقت برأيه في الجنس الذي يجب فيه، وفي القدر المأخوذ منه، وعمل عليه في الأمرين معًا إذا كان من أهل الاجتهاد، وإن كان من سبق من الأئمة والولاة قد اجتهد برأيه في الجنس الذي يجب فيه وفي القدر المأخوذ منه، وحكم به فيها حكمًا أيده وأمضاه، فاستقرّ حكمه في الأجناس التي يجب فيها حق المعدن، ولم يستقرّ حكمه في القدر المأخوذ من المعدن؛ لأن حكمه في الجنس معتبر بالمعدن الموجود، وحكمه في القدر يعتبر بالمعدن المفقود.

পরিমাপসমূহ; যেন সেই অনুযায়ী ফসলের অংশীদারিত্ব (মুকাসামা) যথাযথভাবে আদায় করা হয়। আর যদি খাজনা রৌপ্যমুদ্রার মাধ্যমে হয়, তবে ফসল ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও খাজনা সমান হতে পারে অথবা ভিন্ন হতে পারে। যদি ফসল ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও খাজনা সমান হয়, তবে খাজনা আদায়ের জন্য রাজস্ব দপ্তর থেকে ভূমি জরিপের তথ্যাদি বের করতে হবে; এক্ষেত্রে যা সংগৃহীত হয়েছে কেবল তা-ই সেখানে পেশ করা আবশ্যক। আর যদি ফসলের ভিন্নতার কারণে খাজনাও ভিন্ন হয়, তবে রাজস্ব দপ্তর থেকে ভূমি জরিপসমূহ বের করা আবশ্যক এবং ফসলের

প্রকারসমূহও পেশ করা প্রয়োজন; যাতে ফসলের বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করা যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: প্রত্যেক জনপদে বসবাসকারী জিম্মিদের পরিচয় এবং জিজিয়া চুক্তির মাধ্যমে তাদের ওপর যা ধার্য করা হয়েছে তার বিবরণ। যদি তাদের সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার ভিত্তিতে জিজিয়ার পরিমাণে পার্থক্য থাকে, তবে তাদের নাম এবং সংখ্যা দপ্তরে উল্লেখ করতে হবে যাতে তাদের সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থা যাচাই করা যায়। আর যদি সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতার ভিত্তিতে জিজিয়ার পরিমাণে কোনো পার্থক্য না থাকে, তবে কেবল তাদের সংখ্যা উল্লেখ করাই যথেষ্ট। তবে প্রতি বছর তাদের প্রতি নজর রাখা আবশ্যক; যাতে যারা বালেগ হয়েছে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং যারা মারা গেছে বা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের নাম বাদ দেওয়া যায়। এর মাধ্যমে জিজিয়া বাবদ পাওনা অর্থের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: খনিজ সমৃদ্ধ এলাকা হলে সেখানকার খনিজ পদার্থের প্রকারসমূহ এবং প্রতিটি প্রকারের সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে, যাতে খনিজ সম্পদের পাওনা পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করা যায়। এটি এমন বিষয় যা আয়তন দিয়ে নির্ধারণ করা যায় না এবং এর ভিন্নতার কারণে কোনো নির্দিষ্ট অনুমানের মাধ্যমেও সীমাবদ্ধ করা যায় না। বরং খনি থেকে যখন সম্পদ আহরিত ও লব্ধ হয়, তখন সেই আহরিত পরিমাণের ভিত্তিতেই তা নির্ধারিত হয়। খনিজ সম্পদের বিধানের ক্ষেত্রে রাজস্ব দপ্তরে সেই অঞ্চল বিজয়ের ইতিহাস বর্ণনা করা আবশ্যক নয় যে, তা উশরি ভূমি নাকি খরাজি ভূমি; কারণ এক্ষেত্রে রাজস্ব দপ্তরের মূল উদ্দেশ্য হলো খনি থেকে আহরিত সম্পদ থেকে নির্ধারিত পাওনা আদায় করা। আর বিজয়ের ধরন বা ভূমির বিধান পরিবর্তনের কারণে খনিজ সম্পদের হকের কোনো পরিবর্তন হয় না; বরং এই পার্থক্য কেবল খনির শ্রমিক ও গ্রহণকারীদের হকের ক্ষেত্রে হতে পারে।

কোন কোন প্রকারের খনিজ সম্পদ থেকে হক আদায় করতে হবে এবং তার পরিমাণ কত হবে, সে বিষয়ে ফকিহগণের মতপার্থক্য পূর্বে আলোচিত হয়েছে। যদি এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ইমামদের কোনো ফয়সালা না থাকে, তবে তৎকালীন শাসক যদি ইজতিহাদের যোগ্য হন, তবে তিনি খনিজের প্রকার এবং তার থেকে আদায়যোগ্য পরিমাণ নির্ধারণে নিজের সুচিন্তিত অভিমত প্রয়োগ করবেন এবং উভয় ক্ষেত্রেই সেই অনুযায়ী আমল করবেন। আর যদি পূর্ববর্তী কোনো ইমাম বা শাসক খনিজের প্রকার ও পরিমাণের বিষয়ে ইজতিহাদ করে কোনো ফয়সালা দিয়ে থাকেন এবং বর্তমান শাসক তা সমর্থন ও কার্যকর করেন, তবে খনিজের প্রকারের ক্ষেত্রে সেই ফয়সালাটি স্থিতিশীল হবে, কিন্তু খনিজ থেকে আদায়যোগ্য পরিমাণের ক্ষেত্রে সেই ফয়সালাটি

স্থায়ী হবে না; কারণ প্রকারের ক্ষেত্রে তাঁর ফয়সালা বিদ্যমান খনিজ সম্পদের ওপর ভিত্তি করে হয়, আর পরিমাণের ক্ষেত্রে ফয়সালাটি ভবিষ্যতের বা অদৃশ্য সম্পদের ওপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে।

(ص: 309)الأحكام السلطانية للماوردي

والفصل السادس: إن كان البلد ثغرًا يتاخم دار الحرب، وكانت أموالهم دخلت دار الإسلام معشورة عن صلح استقرَّ معهم، وأثبت في ديوان عقد صلحهم، وقدر المأخوذ منهم من عشر أو خمس، وزيادة عليه أو نقصان منه، فإن كان يختلف باختلاف الأمتعة والأموال فصلت فيه، وكان الديوان موضوعًا لإخراج رسومه ولاستيفاء ما يرفع إليه من مقادير الأمتعة المحمولة إليه.

وأما أعشار الأموال المنتقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلد فمحرمة لا يبيحها شرع، ولا يسوغها اجتهاد، ولا هي من سياسات العدل، ولا من قضايا النصفة، وقلَّ ما تكون إلَّا في البلاد الجائزة، وقد روي عن النبي -عليه الصلام والسلام- أنه قال: "شر الناس العشارون الحشارون"1.

وإذا غيرت الولاة أحكام البلاد ومقادير الحقوق فيها اعتبر ما فعلوه، فإن كان مسوغًا في الاجتهاد لأمر اقتضاه لا يمنع الشرع منه؛ لحدوث سبب يسوغ الشرع الزيادة لأجله، أو النقصان لحدوثه جاز، وصار الثاني هو الحق المستوفى دون الأول. وإذا استُخرِج حال العمل من الديوان جاز أن يقتصر على إخراج الحال الثانية دون الأولى، والأحوط أن يخرج الحالين؛ لجواز أن يزول السبب الحادث فيعود الحكم الأول؛ وإن كان ما أخذ به الولاة من تغيير الحقوق غير مسوغ في الشرع، ولا له وجه في الاجتهاد، كانت الحقوق على الحكم الأول، وكان الثاني مردودًا، سواء غيّروه

إلى زيادة أو نقصان؛ لأنَّ الزيادة ظلم في حقوق الرعية، والنقصان ظلم في حقوق بيت المال، وإذا استخرج حال العمل من الديوان وجب على رافعه من كتاب الدواوين إخراج الحالين إن كان المستدعي لإخراجها من الولاة لا يعلم حالها فيما تقدم، وإن كان عالمًا بها لم يلزمه إخراج الحال الأول إليه؛ لأنه علمه بها قد سبق، وجاز الاقتصار على إخراج الحال الثانية مع وصفها بأنها مستحدثة.

---

1 لم أقف عليه بهذا اللفظ.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: যদি শহরটি দারুল হারব সংলগ্ন কোনো সীমান্ত এলাকা হয় এবং তাদের সম্পদ যদি তাদের সাথে সম্পাদিত কোনো স্থায়ী সন্ধিচুক্তির ভিত্তিতে উশর (দশমাংশ) প্রদানের শর্তে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে থাকে, যা তাদের সন্ধিচুক্তির দাপ্তরিক নিবন্ধে (দিওয়ান) লিপিবদ্ধ আছে, এবং তাদের কাছ থেকে গৃহীত উশর বা খুমুস (পঞ্চমাংশ) অথবা এর চেয়ে বেশি বা কম পরিমাণের হার নির্ধারিত থাকে—আর যদি মালামাল ও সম্পদের ভিন্নতার কারণে সেই হার ভিন্ন হয়, তবে তাতে বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে। আর এই নিবন্ধটি মূলত নির্ধারিত নিয়মাবলী জারি এবং সেখানে আনীত পণ্যের পরিমাণের ভিত্তিতে প্রাপ্য হক পূর্ণরূপে আদায়ের জন্যই নির্ধারিত থাকবে।

আর দারুল ইসলামের অভ্যন্তরে এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত সম্পদের ওপর উশর (কর) ধার্য করা হারাম; শরীয়ত একে বৈধতা দেয় না এবং কোনো ইজতিহাদও একে জায়েজ করে না। এটি ন্যায়ানুগ রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং ইনসাফেরও পরিপন্থী। এটি সাধারণত যালিম শাসকদের শাসিত দেশেই হয়ে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "মানুষের মধ্যে তারা সর্বনিকৃষ্ট, যারা অন্যায়ভাবে কর আদায় করে এবং যারা (মানুষের ওপর যুলুম করতে) তাদের একত্রিত করে।"১

যখন শাসকগণ কোনো অঞ্চলের বিধান এবং সেখানে প্রাপ্য পাওনার মাপে পরিবর্তন আনেন, তখন তাদের কৃতকর্ম পর্যালোচনা করা হবে। যদি তা কোনো বাস্তব কারণে ইজতিহাদের ভিত্তিতে করা হয় যা শরীয়ত বিরোধী নয়—যেমন এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া যাতে শরীয়ত কর বৃদ্ধি বা হ্রাসের অনুমতি দেয়—তবে তা বৈধ হবে এবং প্রথম বিধানের পরিবর্তে দ্বিতীয় বিধানটিই পাওনা হিসেবে কার্যকর হবে। যখন দাপ্তরিক নথিপত্র (দিওয়ান) থেকে

বর্তমান অবস্থা বের করা হবে, তখন শুধুমাত্র দ্বিতীয় অবস্থাটি উল্লেখ করাই যথেষ্ট হতে পারে। তবে সতর্কতা হলো উভয় অবস্থা উল্লেখ করা; কারণ উদ্ভূত কারণটি দূরীভূত হতে পারে এবং তখন পুনরায় প্রথম বিধানটি কার্যকর হবে। আর যদি শাসকদের পক্ষ থেকে এই পরিবর্তনের বিষয়টি শরীয়তসম্মত না হয় এবং ইজতিহাদের দৃষ্টিতেও তার কোনো ভিত্তি না থাকে, তবে প্রাপ্য পাওনাগুলো প্রথম বিধান অনুযায়ীই বহাল থাকবে এবং দ্বিতীয় বিধানটি প্রত্যাখ্যাত হবে—তা তারা বৃদ্ধি করুক বা হ্রাস করুক। কেননা পাওনা বৃদ্ধি করা হলো প্রজাদের হকের ওপর যুলুম, আর হ্রাস করা হলো বাইতুল মালের হকের ওপর যুলুম। দাপ্তরিক নথিপত্র থেকে যখন কোনো বিষয়ের বিবরণ বের করা হবে, তখন নথিপত্র সংরক্ষণকারীদের (দিওয়ানের কাতিবদের) ওপর কর্তব্য হলো উভয় অবস্থা বর্ণনা করা, যদি বিবরণ তলবকারী শাসক পূর্বাবস্থা সম্পর্কে অবগত না থাকেন। আর যদি তিনি তা অবগত থাকেন, তবে তার কাছে পূর্বাবস্থা বর্ণনা করা আবশ্যক নয়; কারণ তিনি তা আগে থেকেই জানেন। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থাটি বর্ণনা করে সেটিকে ‘নব্য প্রবর্তিত’ হিসেবে চিহ্নিত করাই যথেষ্ট।

---

১ আমি এই শব্দে হাদিসটি খুঁজে পাইনি।

(ص: 310)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل:

وأما القسم الثالث فيما اختص بالعمال من تقليد وعزل فيشتمل على ستة فصول:

أحدها: ذكر من يصحّ منه تقليد العمال، وهو معتبر بنفوذ الأمر وجواز النظر، فكل من جاز نظره في عمل نفذت فيه أوامره، وصحَّ منه تقليد العمال عليه، وهذا يكون من أحد ثلاثة: إمَّا من السلطان المستولي على كل الأمور، وإما من وزير التفويض، وإما من عامل عام الولاية كعامل إقليم أو مصر عظيم، يقلد في خصوص الأعمال عاملًا، فأمَّا وزير التنفيذ فلا يصح منه تقليد عامل إلَّا بعد المطالعة والاستئمار.

والفصل الثاني: من يصح أن يتقلَّد العمالة، وهو من استقلَّ بكفايته ووثق بأمانته، فإن كانت عمالة تفويض إلى اجتهاد روعي فيها الحرية والإسلام؛ وإن كانت عمالة تنفيذ لا اجتهاد للعامل فيها لم يفتقر إلى الحرية والإسلام.

والفصل الثالث: ذكر العمل الذي تقلده، وهذا يعتبر فيه ثلاثة شروط:

أحدها: تحديد الناحية بما تتميز به عن غيرها.

والثاني: تعيين العمل الذي يختص بنظره فيها من جباية أو خراج أو عشر.

والثالث: العلم برسوم العمل وحقوقه على تفصيل ينتفي عنه الجهالة، فإذا استكملت هذه الشروط الثلاثة في عمل علم به الولي والمولى صح التقليد ونفذ.

والفصل الرابع: زمان النظر، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يقدره بمدة محصورة الشهور أو السنين، فيكون تقديرها بهذه المدة مجوزا للنظر فيها، ومانعًا من النظر بعد انقضائها، ولا يكون النظر في المدة المقيدة لازمًا من جهة المولي، وله صرفه ولا استبدال به إذا رأى ذلك صلاحًا، فأمَّا لزومه من جهة العامل المولى فمعتبر بحال جارية عليها؛ فإن كان الجارى معلومًا بما تصحّ به الأجور لزمه العمل في المدة إلى انقضائها؛ لأنَّ العمالة فيها تصير من الإجارات المحضة، ويؤخذ العامل فيها بالعمل إلى انقضائها إجبارًا.

পরিচ্ছেদ:

আর আমিল বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও অপসারণ সংক্রান্ত বিশেষায়িত তৃতীয় অংশটি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত:

প্রথম পরিচ্ছেদ: আমিলদের নিয়োগ দান যাদের জন্য বৈধ তাদের বিবরণ। এটি আদেশের কার্যকারিতা ও তদারকির অধিকারের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে ব্যক্তির কোনো বিষয়ে তদারকির অধিকার আছে, সে বিষয়ে তার আদেশ কার্যকর হবে এবং সেখানে আমিল নিয়োগ দেওয়া তার জন্য বৈধ হবে। এই ব্যক্তি তিন শ্রেণির যে কোনো একজন হতে পারেন: হয় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সুলতান, অথবা পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত উযীর (উযীরুত তাফবীদ), অথবা সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী কোনো আমিল—যেমন কোনো প্রদেশ বা বিশাল

জনপদের গভর্নর, যিনি বিশেষ কাজের জন্য কোনো আমিল নিয়োগ করেন। তবে নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী উযীর (উযীরুত তানফীয) সুলতানের নিকট পেশ করা এবং তার অনুমতি গ্রহণ করা ব্যতিরেকে কোনো আমিল নিয়োগ দিতে পারেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আমিল হওয়ার বা প্রশাসনিক দায়িত্ব পাওয়ার যোগ্যতা কার আছে। তিনি এমন ব্যক্তি হবেন যিনি কর্মসম্পাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সক্ষম এবং যার আমানতদারিতা নির্ভরযোগ্য। যদি তা এমন কোনো সাধারণ প্রশাসনিক দায়িত্ব হয় যাতে নিজস্ব বিচারবুদ্ধি (ইজতিহাদ) প্রয়োগের অবকাশ থাকে, তবে সেখানে স্বাধীন হওয়া এবং মুসলিম হওয়া শর্ত হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি তা নিছক নির্বাহী দায়িত্ব হয় যেখানে আমিলের ইজতিহাদ প্রয়োগের সুযোগ নেই, তবে সেখানে স্বাধীন হওয়া এবং মুসলিম হওয়া অপরিহার্য নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: অর্পিত কাজের বিবরণ। এ ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত বিবেচিত হয়:

প্রথমত: কর্মক্ষেত্রের সীমানা এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করা যাতে তা অন্য এলাকা থেকে ভিন্নভাবে চিহ্নিত হয়।

দ্বিতীয়ত: তার তদারকির অধীনে নির্দিষ্ট কাজের ধরন নির্ধারণ করা—যেমন রাজস্ব সংগ্রহ বা খারাজ আদায় অথবা উশর সংগ্রহ।

তৃতীয়ত: সংশ্লিষ্ট কাজের নিয়মকানুন ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে এমন বিস্তারিত জ্ঞান থাকা যা সব ধরণের অস্পষ্টতা দূর করে। যখন কোনো কাজের ক্ষেত্রে এই তিনটি শর্ত পূর্ণ হবে এবং নিয়োগকর্তা ও নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি সে সম্পর্কে অবগত হবেন, তখন নিয়োগ শুদ্ধ হবে এবং কার্যকর হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: দায়িত্ব পালনের সময়কাল। এটি তিনটি অবস্থার বাইরে নয়:

প্রথমত: সময়কালকে নির্দিষ্ট মাস বা বছরের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা। এই সময়সীমা নির্ধারণ ওই সময় পর্যন্ত তদারকির বৈধতা দান করে এবং সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তদারকির পথে বাধা সৃষ্টি করে। নির্ধারিত এই সময়কালের মধ্যে আমিলকে বহাল রাখা নিয়োগকর্তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়; তিনি যদি জনকল্যাণ বিবেচনা করেন তবে তাকে অপসারণ করতে পারেন বা তার পরিবর্তে অন্য কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন। তবে নিয়োগপ্রাপ্ত আমিলের দিক থেকে এই দায়িত্বের আবশ্যকতা বর্তমান পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল; যদি ভাতা বা পারিশ্রমিক এমন সুনির্দিষ্ট হয় যা দ্বারা শ্রমচুক্তি (ইজারা) বৈধ হয়, তবে সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য কাজ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ তখন আমিলের দায়িত্বটি বিশুদ্ধ শ্রমচুক্তির পর্যায়ভুক্ত হয়ে

যায় এবং মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমিলকে দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করিয়ে নেওয়া হয়।

(ص: 311)الأحكام السلطانية للماوردي

والفرق بينهما في تخيير المولى ولزومها للمولِّي أنها في جنبة المولِّي من العقود العامَّة لنيابته فيها عن الكافَّة، فروعي الأصلح في التخيير، وهي في جنبة المولَّى من العقود الخاصة لعقده، لها في حق نفسه، فيجري عليها حكم اللزوم، وإن لم يتقدر جاريه بما يصح في الأجور لم تلزمه المدة، وجاز له له الخروج من العمل إذا شاء بعد أن ينهي إلى موليه حال تركه حتى لا يخلو عمله من ناظر فيه.

والحالة الثانية: أن يقدر بالعمل فيقول المولّي فيه: قلدتك خراج ناحية كذا في هذه السنة، أو قلدتك بلد كذا في هذا العام، فتكون مدة نظره مقدرة بفراغه من عمله، فإذا فرغ منه انعزل عنه، وهو قبل فراغه على ما ذكرنا يجوز أن يعزله المولّي، وعزله لنفسه معتبر بصحة جارية وفساده.

والحالة الثالثة: أن يكون التقليد مطلقًا فلا يقدر بمدة ولا عمل، فيقول فيه: قد قلدتك خراج الكوفة، أو أعشار البصرة، أو حماية بغداد، فهذا تقليد صحيح، وإن جهلت مدته؛ لأنَّ المقصود منه الإذن لجواز النظر، وليس المقصود منه اللزوم المعتبر في عقود الإيجارات.

وإذا صحَّ التقليد وجاز النظر لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون مستديمًا أو منقطعًا، فإن كان مستديمًا كالنظر في الجباية والقضاء وحقوق المعادن، فيصح نظره فيها عامًا بعد عام ما لم يعزل، وإن كان منقطعًا فهو على ضربين:

أحدهما: أن لا يكون معهود العود في كل عام كالوالي على قسم الغنيمة، فيعزل بعد فراغه منها، وليس له النظر في قسمة غيرها من الغنائم.

والضرب الثاني: أن يكون عائدًا في كل عام كالخراج الذي إذا استخرج في عام عاد فيما يليه.

فقد اختلف الفقهاء هل يكون إطلاق تقليده مقصورًا على نظر عامه أو محمولًا على كل عام ما لم يعزل على وجهين:

أحدهما: أنه يكون مقصورًا للنظر على العام الذي هو فيه، فإذا استوفى خراجه، أو أخذ أعشاره انعزل، ولم يكن له أن ينظر في العام الثاني إلَّا بتقليد مستجد اقتصارًا على اليقين.

নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে নিয়োগ রদ করার এখতিয়ার থাকা এবং নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা আবশ্যক হওয়ার মধ্যবর্তী পার্থক্য এই যে, নিয়োগকর্তার দিক থেকে এটি একটি সাধারণ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত; কেননা এতে তিনি সর্বসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করেন। ফলে এখতিয়ারের ক্ষেত্রে যা অধিকতর কল্যাণকর তা-ই বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে, নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিক থেকে এটি তার নিজের জন্য সম্পাদিত একটি বিশেষ চুক্তি। ফলে এর ওপর চুক্তির আবশ্যিকতার বিধান জারি হবে। আর যদি পারিশ্রমিক নির্ধারণের বৈধতা অনুযায়ী তার পারিশ্রমিক নির্ধারিত না থাকে, তবে তার ওপর মেয়াদের আবশ্যকতা থাকবে না। সেক্ষেত্রে সে চাইলে কাজ ত্যাগ করতে পারবে, তবে শর্ত হলো তাকে ত্যাগের বিষয়টি নিয়োগকর্তাকে অবহিত করতে হবে, যাতে তার কর্মস্থলটি তদারককারী শূন্য না থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থা: কাজটি নির্দিষ্ট করে দেওয়া। এক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা বলবেন: 'আমি তোমাকে এই বছরে অমুক অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করলাম', অথবা 'আমি তোমাকে এই বছরে অমুক শহরের দায়িত্ব প্রদান করলাম।' এমতাবস্থায় তার তদারকির মেয়াদ কাজ শেষ হওয়ার দ্বারা নির্ধারিত হবে। কাজ শেষ হলে সে আপনাআপনি পদচ্যুত হবে। কাজ শেষ হওয়ার আগে তাকে অপসারণের বিষয়টি আমরা পূর্বে যা উল্লেখ করেছি তার অনুরূপ। আর তার নিজের পক্ষ থেকে পদত্যাগের বিষয়টি তার পারিশ্রমিকের বৈধতা বা অবৈধতার ওপর নির্ভরশীল।

第三 অবস্থা: নিয়োগটি শর্তহীন বা সাধারণ হওয়া, অর্থাৎ যা সময় বা কাজের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। যেমন তিনি বললেন: 'আমি তোমাকে কুফার ভূমিরাজস্ব, কিংবা বসরার উশর, অথবা বাগদাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রদান করলাম।' মেয়াদ অজ্ঞাত থাকলেও এই নিয়োগটি বৈধ হবে; কারণ এর উদ্দেশ্য হলো তদারকি করার অনুমতি প্রদান করা, ইজারা বা ভাড়ার চুক্তির ন্যায় মেয়াদের আবশ্যকতা এর উদ্দেশ্য নয়।

যখন নিয়োগ বৈধ হবে এবং দায়িত্ব পালন জায়েজ হবে, তখন এর অবস্থা দুই প্রকারের বাইরে হবে না: হয় তা নিরবচ্ছিন্ন হবে, নতুবা বিচ্ছিন্ন হবে। যদি তা নিরবচ্ছিন্ন হয়—যেমন রাজস্ব আদায়, বিচার বিভাগ এবং খনিজ সম্পদের হকের তদারকি—তবে অপসারণ না করা পর্যন্ত বছরের পর বছর তার তদারকি কার্যকর থাকবে। আর যদি তা বিচ্ছিন্ন বা সাময়িক হয়, তবে তা দুই প্রকার:

প্রথমটি হলো: যা প্রতি বছর পুনরায় ফিরে আসার মতো নিয়মিত বিষয় নয়, যেমন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। উক্ত সম্পদ বণ্টন শেষ হওয়ার পর সে পদচ্যুত হয়ে যাবে। পরবর্তী অন্য কোনো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের তদারকির অধিকার তার থাকবে না।

দ্বিতীয় প্রকার: যা প্রতি বছর পুনরায় ফিরে আসে, যেমন ভূমিরাজস্ব, যা এক বছর আদায় করার পর পরবর্তী বছরে আবারও ফিরে আসে।

এক্ষেত্রে ফকীহগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন যে, তার নিয়োগের সাধারণ ভাষা কি কেবল বর্তমান বছরের তদারকির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি অপসারণ না করা পর্যন্ত প্রতি বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে? এক্ষেত্রে দুইটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি হলো: তার তদারকি কেবল বর্তমান বছরের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং যখন সে সেই বছরের ভূমিরাজস্ব পূর্ণরূপে আদায় করবে বা উশর গ্রহণ করবে, তখন সে পদচ্যুত হয়ে যাবে। কেবল নিশ্চিত অবস্থার ওপর সীমাবদ্ধ থাকার খাতিরে নতুন নিয়োগ ব্যতীত পরবর্তী বছরে তদারকি করার অধিকার তার থাকবে না।

والوجه الثاني: أنه يحمل على جواز النظر في كل عام ما لم يعزل اعتبارًا بالعرف.

والفصل الخامس: في جاري العامل على عمله، ولا يخلو فيه من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يسمي معلومًا.

والثاني: أن يسمي مجهولًا.

والثالث: أن لا يسمي بمجهول ولا بمعلوم، فإن سمَّى معلومًا استحق المسمَّى إذا وفَّى العمالة حقَّها، فإن قصر فيها روعي تقصيره، فإن كان لترك بعض العمل لم يستحق جاري ما قابله، وإن كان لخيانة منه مع استيفاء العمل استكمل جارية وارتجع ما خان فيه، وإن زاد في العمل روعيت الزيادة، فإن لن تدخل في حكم عمله كان نظره فيها مردودًا لا ينفذ، وإن كانت داخله في حكم نظره لم يخل من أحد أمرين:

إما أن يكون قد أخذها بحق أو ظلم، فإن أخذها بحق كان متبرعًا بها لا يستحق لها زيادة على المسمَّى في جاريه، وإن كان ظلمًا وجب ردَّها على من ظلم بها، وكان عدوانًا من العامل يؤخذ بجريرته، واما إن سمَّى جارية مجهولًا استحق جاري مثله فيما عمل، فإن كان جاري العمل مقدرًا في الديوان وعمل به جماعة من العمال صار ذلك القدر هو جاري المثل، وإن لم يعمل به إلَّا واحد لم يصر ذلك مألوفًا في جاري المثل.

وأما إن لم يسم جارية بمعلوم ولا بمجهول، فقد اختلف الفقهاء في استحقاقه لجاري مثله على عمله على أربعة مذاهب قالها الشافعي وأصحابه، فمذهب الشافعي فيها أنه لا جاري له على عمله، ويكون متطوعًا به حتى يسمّي جاريًا معلومًا أو مجهولًا؛ لخلو عمله من عوض.

وقال المزني: له جاري مثله وإن لم يسمِّه لاستيفاء عمله عن إذنه.

وقال أبو العباس بن سريج: إن كان مشهورًا بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله، وإن لم يشهر بأخذ الجاري عليه فلا جاري له.

وقال أبو إسحاق المروزي1 من أصحاب الشافعي: إن دعي إلى العمل في الابتداء أو أمر

---

1 هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي الشافعي، إمام عصره في الفتوى والتدريس، أخذ الفقه عن ابن سريج، وشرح مختصر المزني، وله مصنَّفات كثيرة، وأقام ببغداد دهرًا طويلًا يفتي ويدرس، وأنجب من أصحابه جماعة، وإليه ينسب المروزي ببغداد الذي في قطيعة الربيع، ثم ارتحل إلى مصر آخر عمره وأدركه أجله بها، وتوفِّي -رحمه الله تعالى- سنة أربعين وثلاثمائة، ودفن بالقرب من الشافعي رضي الله عنه.

দ্বিতীয় দিক হলো: প্রথা ও রীতির ওপর ভিত্তি করে তাকে অপসারণ না করা পর্যন্ত প্রতি বছর কর্ম পরিচালনার বৈধতা প্রদান করা হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: কর্মীর কাজের বিনিময়ে প্রাপ্য পারিশ্রমিক প্রসঙ্গে; এক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথমত: নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা।

দ্বিতীয়ত: অনির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা।

তৃতীয়ত: নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট কোনোটিই উল্লেখ না করা। যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, তবে কর্মী তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে সেই নির্ধারিত পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে। যদি সে অবহেলা করে, তবে তার অবহেলা বিবেচনা করা হবে। যদি অবহেলার কারণে কাজের কোনো অংশ অসম্পূর্ণ থাকে, তবে সে অংশের পারিশ্রমিক সে পাবে না। আর যদি কাজ সম্পন্ন করা সত্ত্বেও কোনো খেয়ানত বা আত্মসাৎ করে, তবে সে পুরো পারিশ্রমিক পাবে কিন্তু আত্মসাৎকৃত অংশ তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি সে অতিরিক্ত কাজ করে, তবে সেই আধিক্য বিবেচনা করা হবে; যদি তা তার কাজের এক্তিয়ারভুক্ত না হয়, তবে সেই কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে এবং কার্যকর হবে না। আর যদি তা তার এক্তিয়ারভুক্ত হয়, তবে বিষয়টি দুই ধরনের হতে পারে: হয় সে তা ন্যায্যভাবে গ্রহণ করেছে অথবা অন্যায্যভাবে। যদি সে ন্যায্যভাবে গ্রহণ করে থাকে, তবে তা তার পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাশ্রম হিসেবে গণ্য হবে এবং নির্ধারিত পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার সে দাবিদার হবে না। আর যদি তা জুলুম বা অন্যায়ভাবে হয়, তবে

যার ওপর জুলুম করা হয়েছে তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক এবং কর্মীর এই সীমালঙ্ঘনের জন্য তাকে দণ্ড প্রদান করা হবে। অন্যদিকে, যদি সে অনির্দিষ্ট পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে থাকে, তবে সমজাতীয় কাজের প্রচলিত পারিশ্রমিকের সে অধিকারী হবে। যদি দপ্তরে ওই কাজের পারিশ্রমিক নির্ধারিত থাকে এবং একদল কর্মী সেই অনুযায়ী কাজ করে থাকে, তবে সেই পরিমাণই প্রচলিত পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি কেবল একজন ব্যক্তি তা করে থাকে, তবে তা প্রচলিত পারিশ্রমিক হিসেবে স্বীকৃত হবে না।

আর যদি নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট কোনো পারিশ্রমিকই নির্ধারণ না করা হয়, তবে তার কাজের জন্য প্রচলিত পারিশ্রমিক পাওয়ার বিষয়ে ফকিহগণ চারটি মতে বিভক্ত হয়েছেন, যা ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীরা বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব হলো, তার কাজের জন্য কোনো পারিশ্রমিক নেই এবং নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট পারিশ্রমিক উল্লেখ না করা পর্যন্ত সে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে গণ্য হবে; কারণ তার কাজে কোনো বিনিময় নির্ধারিত ছিল না।

ইমাম মুযানী বলেন: তার অনুমতিক্রমে কাজ সম্পন্ন করার কারণে সে প্রচলিত পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য হবে, যদিও তা উল্লেখ করা না হয়ে থাকে।

আবু আব্বাস ইবনে সুরাইজ বলেন: যদি সে তার কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য প্রসিদ্ধ হয়, তবে সে প্রচলিত পারিশ্রমিক পাবে; আর যদি সে এর জন্য প্রসিদ্ধ না হয়, তবে সে কোনো পারিশ্রমিক পাবে না।

ইমাম শাফেয়ীর অনুসারীদের মধ্যে আবু ইসহাক আল-মারওয়াযী১ বলেন: যদি তাকে শুরুতে কাজের জন্য আহ্বান জানানো হয় বা আদেশ করা হয়

---

১ তিনি হলেন ইব্রাহিম ইবনে আহমদ আবু ইসহাক আল-মারওয়াযী আশ-শাফেয়ী, ফতোয়া ও পাঠদানের ক্ষেত্রে স্বীয় যুগের ইমাম। তিনি ইবনে সুরাইজের নিকট ফিকহ শিক্ষা করেন এবং 'মুখতাসারুল মুযানী'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বহু গ্রন্থ রয়েছে। তিনি দীর্ঘকাল বাগদাদে অবস্থান করে ফতোয়া ও পাঠদান করেন এবং তাঁর ছাত্রদের মধ্য থেকে একদল প্রতিভাবান আলিম বের হন। বাগদাদের 'ক্বাতীআতুর রাবী'-তে অবস্থিত মারওয়াযী তাঁর দিকেই সম্বন্ধযুক্ত। এরপর জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি মিসরে হিজরত করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন— ৩৪০ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন এবং ইমাম শাফেয়ীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কবরের কাছে তাঁকে দাফন করা হয়।

به فله جاري مثله، فإن ابتدأ بالطلب فأذن له في العمل فلا جاري له، وإذا كان في عمله مال يجتنَى فجاريه مستحق فيه، وإن لم يكن فيه مال فجاريه في بيت المال مستحق من سهم المصالح.

والفصل السادس: فيما يصح به التقليد، فإن كان نطقًا يلفظ به المولِّي صحَّ به التقليد كما تصحّ به سائر العقود، وإن كان عن توقيع المولّي بتقليده خطًّا لا لفظًا صحَّ التقليد، وانعقدت به الولايات السلطانية إذا اقترنت به شواهد الحال، وإن لم تصح به العقود الخاصة اعتبارًا بالعرف الجاري فيه، وهذا إذا كان التقليد مقصورًا عليه لا يتعداه إلى استبانة غيره فيه، ولا يصح إذا كان التقليد عامًّا متعديًا؛ فإذا صلح التقليد بالشروط المعتبرة فيه، وكان العمل قبله خاليًا من ناظر تفرَّد هذا المولي بالنظر، واستحقَّ جاريه من أول وقت نظره فيه، وإن كان في العمل ناظر قبل تقليده نظر في العمل، فإن كان مما لا يصح الاشتراك فيه كان تقليده الثاني عزلًا للأول، وإن كان مما يصحّ فيه الاشتراك روعي العرف الجاري فيه، فإن لم يجر العرف بالاشتراك فيه كان عزلًا للأول، وإن جرى العرف بالاشتراك فيه لم يكن تقليد الثاني عزلًا للأول، وكانا عاملين عليه وناظرين فيه، فإن قلّد عليه مشرف كان العامل مباشرًا للعمل، وكان المشرف مستوفيًا له يمنع من زيادة عليه أو نقصان منه أو تفرّد به.

وحكم المشرف يخالف حكم صاحب البريد من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ليس العامل أن ينفرد بالعمل دون المشرف، وله أن ينفرد به دون صاحب البريد.

والثاني: أن للمشرف منع العامل مما أفسد فيه، وليس ذلك لصاحب البريد.

والثالث: أن المشرف لا يلزمه الاختيار بما فعله العامل من صحيح وفاسد إذا انتهى إليه، ويلزم صاحب البريد الإخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد؛ لأنَّ خبر المشرف استعداء، وخبر صاحب البريد إنهاء.

সুতরাং তার জন্য অনুরূপ ভাতা বা বৃত্তি ধার্য হবে। তবে সে যদি নিজে থেকে কাজের আবেদন করে এবং তাকে কাজের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে সে কোনো ভাতার অধিকারী হবে না। আর যদি তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজে অর্জিত কোনো সম্পদ থাকে, তবে সেই সম্পদ থেকেই তার ভাতা প্রাপ্য হবে। আর যদি তাতে কোনো সম্পদ না থাকে, তবে জনকল্যাণমূলক খাত থেকে বায়তুল মাল হতে তার ভাতা প্রদান করা হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: যে সকল উপায়ে নিয়োগ বৈধ হয়। যদি নিয়োগ দানকারী মৌখিকভাবে ঘোষণা করেন, তবে এর মাধ্যমে নিয়োগ কার্যকর হবে, যেমনটি অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে থাকে। আর যদি নিয়োগ দানকারীর পক্ষ থেকে মৌখিক ঘোষণার পরিবর্তে লিখিত স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়, তবে সেই নিয়োগও বৈধ হবে। এর মাধ্যমে সুলতানি প্রশাসনিক পদসমূহ প্রতিষ্ঠিত হবে যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার অনুকূলে থাকবে, যদিও প্রচলিত প্রথার প্রেক্ষিতে বিশেষ কোনো ব্যক্তিগত চুক্তির ক্ষেত্রে তা বৈধ না-ও হতে পারে। এটি তখনই কার্যকর যখন নিয়োগটি কেবলমাত্র তার ওপর সীমাবদ্ধ থাকে এবং অন্যের বিষয় এতে জড়িত না হয়। আর নিয়োগ যদি সাধারণ এবং ব্যাপ্ত হয় তবে তা বৈধ হবে না। যখন নির্ধারিত শর্তাবলি সাপেক্ষে নিয়োগ সম্পন্ন হয় এবং সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্ব ইতিপূর্বে অন্য কারো ওপর ন্যস্ত না থাকে, তবে এই নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি একাই উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন এবং দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম সময় থেকেই তিনি ভাতার অধিকারী হবেন। আর যদি তার নিয়োগের পূর্বে উক্ত কাজে অন্য কোনো কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকেন, তবে কাজের ধরণ বিবেচনা করা হবে। যদি কাজটি এমন হয় যাতে অংশীদারিত্ব সম্ভব নয়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিয়োগ প্রথম ব্যক্তির অব্যাহতির শামিল হবে। আর যদি কাজটি অংশীদারিত্বের যোগ্য হয়, তবে প্রচলিত প্রথা বিবেচনা করা হবে। যদি প্রচলিত প্রথা অংশীদারিত্ব অনুমোদন না করে, তবে তা প্রথম ব্যক্তির অব্যাহতি হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি প্রথা অংশীদারিত্ব অনুমোদন করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিয়োগ প্রথম ব্যক্তির অব্যাহতি হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তারা উভয়েই উক্ত কাজের কর্মী ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বিবেচিত হবেন। যদি তার ওপর কোনো পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়, তবে মূল কর্মী সরাসরি কাজটি সম্পাদন করবেন এবং পরিদর্শক তার পূর্ণ তদারকি করবেন, যাতে

তিনি কাজে কোনো অতিরিক্ত কিছু করতে না পারেন কিংবা কোনো ঘাটতি রাখতে না পারেন অথবা এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পারেন।
পরিদর্শকের বিধান ডাক-কর্মকর্তার বিধান থেকে তিনটি দিক দিয়ে ভিন্ন:
প্রথমত: মূল কর্মী পরিদর্শককে বাদ দিয়ে এককভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারবেন না, কিন্তু তিনি ডাক-কর্মকর্তাকে ছাড়াই এককভাবে কাজ করতে পারবেন।
দ্বিতীয়ত: পরিদর্শক কর্মীকে যেকোনো অনিয়ম থেকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, যা ডাক-কর্মকর্তার নেই।
তৃতীয়ত: কর্মীর কাজের সঠিক বা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সংবাদ পৌঁছালে পরিদর্শকের জন্য তা নির্বাচন করা বা বেছে নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়; কিন্তু ডাক-কর্মকর্তার জন্য কর্মীর প্রতিটি সঠিক ও ত্রুটিপূর্ণ কাজ সম্পর্কে রিপোর্ট করা আবশ্যক। কেননা পরিদর্শকের সংবাদ হলো প্রতিকারমূলক অভিযোগ, আর ডাক-কর্মকর্তার সংবাদ হলো নিছক তথ্য প্রদান।

(ص: 314)الأحكام السلطانية للماوردي

أحدهما: أنَّ خبر الإنهاء يشتمل على الفاسد والصحيح، وخبر الاستعداء مختص بالفاسد دون الصحيح.
والثاني: أنَّ خبر الإنهاء فيما رجع عنه العامل وفيما لم يرجع عنه، وخبر الاستعداء مختَصٌّ بما لم يرجع عنه دون ما رجع عنه، وإذا أنكر العامل استعداء المشرف أو إنهاء صاحب البريد، لم يكن قول واحد منهما مقبولًا عليه حتى يبرهن عنه، فإن اجتمعا على الإنهاء والاستعداء صارا شاهدين عليه، فيقبل قولهما عليه إذا كانا مأمونين، وإذا طولب العامل برفع الحساب فيما تولَّاه لزمه رفعه في عمالة الخراج، ولم يلزمه رفعه في عمالة العشر؛ لأنَّ مصرف الخراج إلى بيت المال، ومصرف العشر إلى أهل الصدقات، وعلى مذهب أبي حنيفة يؤخذ برفع الحساب في المالين؛ لاشتراك

مصرفهما عنده، وإذا ادَّعى عامل العشر صرف العشر في مستحقه قبل قوله فيه، ولو ادَّعى عامل الخراج دفع الخراج إلى مستحقه لم يقبل قوله إلا بتصديق أو ببينة.

وإذا أراد العامل أن يستخلف على عمله فذلك ضربان:

أحدهما: أن يستخلف عليه من ينفرد بالنظر فيه دونه، فهذا غير جائز منه؛ لأنه يجري مجرى الاستبدال، وليس له أن يستبدل غيره بنفسه، وإن جاز له عزل نفسه.

والضرب الثاني: أن يستخلف عليه معينًا له فيُرَاعَى مخرج التقليد، فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال:

أحدهما: أن يتضمَّن إذنًا بالاستخلاف فيجوز له أن يستخلف، ويكون من استخلفه نائبًا عنه يعزل بعزله إن لم يكن مسمَّى في الإذن، فإن سمَّى له من يستخلفه فقد اختلف الفقهاء فيه إذا استخلفه هل ينعزل بعزله؟ فقال قوم: ينعزل، وقال آخرون: لا ينعزل.

والحالة الثانية: أن يتضمَّن التقليد نهيًا عن الاستخلاف، فلا يجوز له أن يستخلف، وعليه أن ينفرد بالنظر فيه إن قدر عليه، فإن عجز عنه كان التقليد فاسدًا، فإن نظر مع فساد التقليد صحَّ في نظره ما اختص بالإذن من أمر ونهي، ولم يصح منه ما اختص بالولاية من عقد وحل.

প্রথমত: ইনহা বা কার্যাদি সমাপ্তির সংবাদ সঠিক ও ত্রুটিপূর্ণ উভয় বিষয়কে শামিল করে, আর ইস্তি'দা বা অভিযোগের সংবাদ কেবল ত্রুটিপূর্ণ বিষয়ের সাথে সুনির্দিষ্ট, সঠিক বিষয়ের সাথে নয়।

দ্বিতীয়ত: ইনহা বা সমাপ্তির সংবাদ এমন বিষয়ের ক্ষেত্রেও হয় যা থেকে আমিল বা কর্মকর্তা নিবৃত্ত হয়েছে এবং যা থেকে সে নিবৃত্ত হয়নি। পক্ষান্তরে ইস্তি'দা বা অভিযোগের সংবাদ কেবল সেই বিষয়ের সাথে সুনির্দিষ্ট যা থেকে সে নিবৃত্ত হয়নি। যখন কোনো কর্মকর্তা পরিদর্শকের অভিযোগ অথবা ডাক বিভাগের কর্মকর্তার দেওয়া ইনহা বা তথ্যকে অস্বীকার করে, তখন তাদের কারও কথাই তার বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না তারা তা প্রমাণ করতে পারে।

তবে তারা উভয়ই যদি ইনহা ও ইস্তি'দার ব্যাপারে একমত হয়, তবে তারা তার বিরুদ্ধে দুজন সাক্ষী হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় যদি তারা বিশ্বস্ত হয়, তবে তাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কর্মকর্তা যখন তার দায়িত্বাধীন খাতের হিসাব দাখিল করতে আদিষ্ট হয়, তখন খারাজ বা ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তার ওপর হিসাব দাখিল করা বাধ্যতামূলক হয়; কিন্তু উশর বা দশমাংশ সদকা আদায়ের ক্ষেত্রে তা দাখিল করা আবশ্যক হয় না। কারণ, খারাজের খাত হলো বাইতুল মাল, আর উশরের খাত হলো সদকা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ। তবে ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অনুযায়ী উভয় প্রকার মালেরই হিসাব দাখিল করতে হবে; কারণ তার মতে উভয় মালের ব্যয়ের খাত অভিন্ন। যখন উশর আদায়কারী কর্মকর্তা দাবি করে যে সে উশরের মাল উপযুক্ত খাতে ব্যয় করেছে, তখন তার কথা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু খারাজ আদায়কারী যদি দাবি করে যে সে খারাজের মাল উপযুক্ত প্রাপককে প্রদান করেছে, তবে সত্যায়ন বা প্রমাণ ছাড়া তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

যখন কোনো কর্মকর্তা তার কার্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে চায়, তবে তা দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: সে তার কার্যে এমন কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করবে যে তাকে বাদ দিয়ে এককভাবে তা পরিচালনা করবে। তার জন্য এটি করা বৈধ নয়; কারণ এটি মূলত স্থলাভিষিক্ত করার পর্যায়ভুক্ত। আর নিজের পরিবর্তে অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করার অধিকার তার নেই, যদিও তার নিজের পদত্যাগ করার অধিকার রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার: সে তার কার্যে একজন সহকারী হিসেবে কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করবে। এক্ষেত্রে নিয়োগপত্রের শর্তাবলি বিবেচনা করা হবে। এর তিনটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথমত: নিয়োগপত্রের মধ্যে প্রতিনিধি নিয়োগের অনুমতি থাকা। সেক্ষেত্রে তার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ। যাকে সে প্রতিনিধি করবে, সে তার নায়েব বা সহকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং নিয়োগকর্তা অপসারিত হলে সেও অপসারিত হবে, যদি না নিয়োগের অনুমতিতে তার নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। আর যদি নিয়োগদাতা তাকে সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগের নির্দেশ দেয় এবং সে তাকে নিয়োগ করে, তবে মূল নিয়োগকর্তার অপসারণে প্রতিনিধিও অপসারিত হবে কি না—সে বিষয়ে ফকিহগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। একদল বলেছেন, সে পদচ্যুত হবে; অন্যদল বলেছেন, সে পদচ্যুত হবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা: নিয়োগপত্রে প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকা। এমতাবস্থায় তার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ নয়। সামর্থ্য থাকলে তাকে একাই দায়িত্ব পালন করতে হবে। যদি সে তাতে অক্ষম হয়, তবে সেই নিয়োগই ফাসিদ বা ত্রুটিপূর্ণ বলে গণ্য হবে। নিয়োগ

ফাসিদ হওয়া সত্ত্বেও যদি সে দায়িত্ব পালন করে, তবে আদেশ ও নিষেধ সংক্রান্ত অনুমোদিত বিষয়গুলো তার তদারকিতে কার্যকর হবে, কিন্তু শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বা বিলায়াত সংক্রান্ত বিষয়গুলো যেমন চুক্তি সম্পাদন বা বাতিল করা—তার পক্ষ থেকে শুদ্ধ হবে না।

(ص: 315)الأحكام السلطانية للماوردي

والحالة الثالثة: أن يكون التقليد مطلقًا لا يتضمّن إذنًا ولا نهيًا، فيعتبر حال العمل، فإن قدر على التفرُّد بالنظر فيه لم يجز أن يستخلف عليه، وإن لم يقدر على التفرد بالنظر فيه جاز له أن يستخلف فيما عجز عنه، ولم يجز أنه يستخلف فيما قدر عليه.

فصل:

وأما القسم الرابع فيما اختص ببيت المال من دخل وخرج، فهو أن كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعيّن مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال، فإذا قبض صار بالقبض مضافًا إلى حقوق بيت المال، سواء أدخل إلى حرزه أو لم يدخل؛ لأنَّ بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان، وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال، فإذا صرف في جهته صار مضافًا إلى الخراج من بيت المال، سواء خرج من حرزه أو لم يخرج؛ لأنَّ ما صار إلى عمَّال المسلمين أو خرج من أيديهم، فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه.

وإذا كان كذلك فالأموال التي يستحقها المسلمون تنقسم ثلاثة أقسام: فيء وغنيمة وصدقة.

فأما الفيء: فمن حقوق بيت المال؛ لأنَّ مصرفه موقوف على رأي الإمام واجتهاده.

وأما الغنيمة: فليست من حقوق بيت المال؛ لأنها مستحقة للغانمين الذين تعينوا بحضور الواقعة لا يختلف مصرفها برأي الإمام، ولا اجتهاد له في منعهم منها، فلم تصر من حقوق بيت المال.

وأمَّا خمس الفيء والغنيمة فينقسم ثلاثة أقسام: قسم منه يكون من حقوق بيت المال، وهو سهم النبي صلى الله عليه وسلم المصروف في المصالح العامة؛ لوقوف مصرفه على رأي الإمام واجتهاده، وقسم منه لا يكون من حقوق بيت المال لخروجه عن اجتهاد الإمام ورأيه.

وقسم منه يكون بيت المال فيه حافظًا له على جهاته وهو سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل، إن وجدوا دفع إليهم، وإن فقدوا أحرز لهم.

তৃতীয় অবস্থা: যখন নিয়োগ বা দায়িত্ব প্রদান হবে নিঃশর্ত, যাতে কোনো অনুমতি বা নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ থাকবে না। এমতাবস্থায় কাজের প্রকৃতি বিবেচনা করা হবে; যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এককভাবে তা আঞ্জাম দিতে সক্ষম হন, তবে তিনি কাউকে স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন না। আর যদি তিনি এককভাবে তা করতে সক্ষম না হন, তবে যে অংশে তিনি অক্ষম সেখানে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন, কিন্তু যে অংশে তিনি সক্ষম সেখানে প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ হবে না।

পরিচ্ছেদ:

চতুর্থ পরিচ্ছেদ হচ্ছে বায়তুল মালের আয় ও ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে। আর তা হলো, মুসলমানদের প্রাপ্য এমন প্রতিটি সম্পদ যার মালিক সুনির্দিষ্ট নয়, তা বায়তুল মালের অধিকারভুক্ত বলে গণ্য হবে। যখন তা হস্তগত বা সংগৃহীত হয়, তখন সংগ্রহের মাধ্যমেই তা বায়তুল মালের অধিকারভুক্ত হয়ে যায়, চাই তা ভাণ্ডারে প্রবেশ করুক বা না করুক। কারণ, 'বায়তুল মাল' বলতে একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা খাতকে বোঝায়, কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে নয়। মুসলমানদের জনকল্যাণে ব্যয় করা আবশ্যক এমন প্রতিটি অধিকারই বায়তুল মালের ওপর দায়বদ্ধ। যখন তা তার নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা হয়, তখন তা বায়তুল মাল থেকে নির্গত হিসেবে গণ্য হয়, চাই তা ভাণ্ডার থেকে বের হোক বা না হোক। কেননা মুসলিম কর্মকর্তাদের হস্তগত হওয়া বা তাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া সবকিছুর ওপরই বায়তুল মালের আয় ও ব্যয়ের বিধান প্রযোজ্য হয়।

বিষয়টি যখন এইরকম, তখন মুসলমানদের প্রাপ্য সম্পদ তিন ভাগে বিভক্ত: ফায়, গনিমত এবং সদকা।
ফায়-এর ক্ষেত্রে তা বায়তুল মালের অধিকারভুক্ত; কারণ এর ব্যয়ের খাত ইমামের রায় ও ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল।
পক্ষান্তরে গনিমত বায়তুল মালের অধিকারভুক্ত নয়; কারণ এটি সেই গনিমত লাভকারীদের প্রাপ্য যারা যুদ্ধে উপস্থিত থাকার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট হয়েছেন। এর ব্যয়ের খাত ইমামের রায়ের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয় না এবং তাদের তা থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে ইমামের কোনো ইজতিহাদ বা এখতিয়ার নেই। ফলে তা বায়তুল মালের অধিকারভুক্ত হয় না।
আর ফায় ও গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ তিন ভাগে বিভক্ত: এক ভাগ বায়তুল মালের অধিকারভুক্ত, আর তা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ যা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়; কেননা এর ব্যয়ের খাত ইমামের রায় ও ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল। এক ভাগ বায়তুল মালের অধিকারভুক্ত নয়, কারণ তা ইমামের ইজতিহাদ ও রায়ের বহির্ভূত।
এবং অন্য এক ভাগে বায়তুল মাল সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের জন্য কেবল সংরক্ষণকারীর ভূমিকা পালন করে, আর তা হলো এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের অংশ। যদি তাদের পাওয়া যায় তবে তা তাদের প্রদান করা হবে, আর যদি তাদের পাওয়া না যায় তবে তাদের জন্য তা সংরক্ষণ করে রাখা হবে।

(ص: 316)الأحكام السلطانية للماوردي

وأما الصدقة فضربان:
صدقة مال باطن: فلا يكون من حقوق بيت المال؛ لجواز أن ينفرد أربابه بإخراج زكاته في أهلها.

والضرب الثاني: صدقة مال ظاهر؛ كأعشار الزروع والثمار وصدقات المواشي، فعند أبي حنيفة أنه من حقوق بيت المال؛ لأنه يجوز صرفه على رأي الإمام واجتهاده، ولم يعينه في أهل السهمين، وعلى مذهب الشافعي لا يكون من حقوق بيت المال؛ لأنه معين الجهات عنده، لا يجوز صرفه على غير جهاته، لكن اختلف قوله هل يكون بين المال محلًّا لإحرازه عند تعذر جهاته؟ فذهب في القديم إلى أن بيت المال إذا تعذَّرت الجهات يكون محلًّا لإحرازه فيه إلى أن توجد؛ لأنه كان يرى وجوب دفعه إلى الإمام، ورجع عنه في مستجد قوله إلى بيت المال لا يكون محلًّا لإحرازه استحقاقًا؛ لأنه لا يرى فيه وجوب دفعه إلى الإمام، وإن جاز أن يدفع إليه فذلك لم يستحق إحرازه في بيت المال، وإن جاز إحرازه فيه.

وأما المستحق على بيت المال فضربان:

أحدهما: ما كان بيت المال فيه حرزًا فاستحقاقه معتبر بالوجود، فإن كان المال موجودًا فيه كان صرفه في جهاته مستحقًّا وعدمه مسقطًا لاستحقاقه.

والضرب الثاني: أن يكون بيت المال له مستحقًّا فهو على ضربين:

أحدهما: أن يكون مصرفه مستحقًّا على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاح، فاستحقاقه غير معتبر بالوجود، وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم، فإن كان موجودًا عجل دفعه كالديوان مع اليسار؛ وإن كان معدومًا وجب فيه على الإنظار كالديون مع الإعسار.

والضرب الثاني: أن يكون مصرفه مستحقًّا على وجه المصلحة والأرفاق دون البدل، فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم، فإن كان موجودًا في بيت المال وجب فيه وسقط غرضه عن المسلمين، وإن كان معلومًا سقط وجوبه عن بيت المال، وكان إن عمَّ ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد، وإن كان مما لا يعم ضرره كوعورة طريق قريب يجد الناس طريقًا غيره بعيدًا، أو انقطاع شرب يجد

আর সদকা হলো দুই প্রকার:
অপ্রকাশ্য সম্পদের জাকাত: এটি বায়তুল মালের হকের অন্তর্ভুক্ত হবে না; কারণ এর মালিকদের জন্য নিজ উদ্যোগে এর প্রাপকদের নিকট জাকাত পৌঁছে দেওয়ার অবকাশ রয়েছে।
দ্বিতীয় প্রকার: প্রকাশ্য সম্পদের জাকাত; যেমন ফসলের উশর (দশমাংশ) ও ফলমূল এবং গবাদি পশুর জাকাত। ইমাম আবু হানিফার মতে, এটি বায়তুল মালের হকের অন্তর্ভুক্ত; কারণ ইমামের সিদ্ধান্ত ও ইজতিহাদ অনুযায়ী এটি ব্যয় করা বৈধ এবং তিনি একে কেবল নির্দিষ্ট কোনো দুই শ্রেণির প্রাপকের জন্য সীমাবদ্ধ করেননি। ইমাম শাফিয়ীর মাযহাব অনুযায়ী এটি বায়তুল মালের হকের অন্তর্ভুক্ত হবে না; কারণ তাঁর নিকট এর ব্যয়ের খাতসমূহ সুনির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত খাতসমূহ ব্যতীত অন্য কোথাও তা ব্যয় করা বৈধ নয়। তবে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ পাওয়া দুষ্কর হলে বায়তুল মাল কি তা সংরক্ষণের স্থান হবে কি না, সে বিষয়ে তাঁর মতভেদ রয়েছে। তাঁর প্রাচীন মতানুসারে, ব্যয়ের খাতসমূহ পাওয়া না গেলে প্রাপ্য খাত না পাওয়া পর্যন্ত বায়তুল মাল তা সংরক্ষণের স্থান হবে; কারণ তিনি তখন তা ইমামের নিকট সমর্পণ করা ওয়াজিব মনে করতেন। কিন্তু তাঁর নতুন মতে তিনি এ থেকে ফিরে এসেছেন যে, বায়তুল মাল আবশ্যিক সংরক্ষণের স্থান হবে না; কারণ তিনি তখন ইমামের নিকট তা প্রদান করা ওয়াজিব মনে করতেন না। আর এটি যদি ইমামের নিকট প্রদান করা বৈধও হয়, তবুও সেটি বায়তুল মালে সংরক্ষণের আবশ্যকতা প্রমাণ করে না, যদিও সেখানে তা সংরক্ষণ করা বৈধ।
আর বায়তুল মালের ওপর পাওনা বা প্রাপ্য অধিকারসমূহ দুই প্রকার:
প্রথমটি: যেক্ষেত্রে বায়তুল মাল কেবল সংরক্ষক হিসেবে থাকে; এক্ষেত্রে প্রাপ্য অধিকারটি অর্থ বিদ্যমান থাকার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং যদি অর্থ বিদ্যমান থাকে, তবে নির্দিষ্ট খাতে তা ব্যয় করা আবশ্যক হবে, আর অর্থ না থাকলে সেই অধিকার বা পাওনা রহিত হয়ে যাবে।
দ্বিতীয় প্রকার: বায়তুল মাল যেখানে নিজেই দায়বদ্ধ; এটি আবার দুই প্রকার:
এক: যার ব্যয় বিনিময় বা পারিশ্রমিক হিসেবে পাওনা, যেমন সৈন্যদের বেতন এবং ঘোড়া ও সমরাস্ত্রের মূল্য। এই পাওনা অর্থ বিদ্যমান থাকার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং অর্থ থাকুক বা না থাকুক, এটি একটি আবশ্যিক পাওনা। সুতরাং অর্থ বিদ্যমান থাকলে স্বচ্ছল ব্যক্তির ঋণের মতো তা দ্রুত পরিশোধ করতে হবে; আর যদি অর্থ না থাকে, তবে অসচ্ছল ব্যক্তির ঋণের মতো তা পরিশোধের জন্য সময় নিতে হবে।

দুই: যার ব্যয় কোনো বিনিময় ছাড়াই জনকল্যাণ ও জনসুবিধার নিরিখে পাওনা। এক্ষেত্রে পাওনাটি অর্থ বিদ্যমান থাকার ওপর নির্ভরশীল, অনুপস্থিতির ওপর নয়। যদি বায়তুল মালে অর্থ বিদ্যমান থাকে, তবে তা ব্যয় করা ওয়াজিব এবং এর ফলে সাধারণ মুসলিমদের জিম্মাদারী লাঘব হবে। কিন্তু যদি অর্থ না থাকে, তবে বায়তুল মালের ওপর থেকে সেই আবশ্যকতা রহিত হবে। এক্ষেত্রে যদি সেই প্রয়োজন পূরণ না হওয়ার ক্ষতি ব্যাপক হয়, তবে তা সমস্ত মুসলিমের ওপর ফরজে কেফায়া হিসেবে গণ্য হবে, যতক্ষণ না তাদের মধ্য থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক তা সম্পাদন করে, যেমন জিহাদ। আর যদি এর ক্ষতি ব্যাপক না হয়, যেমন কোনো নিকটবর্তী পথ দুর্গম হওয়া অথচ মানুষ বিকল্প কোনো দূরবর্তী পথ ব্যবহার করতে পারে, অথবা পানির উৎস বিচ্ছিন্ন হওয়া যেখানে মানুষ বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পেতে পারে...

(ص: 317)الأحكام السلطانية للماوردي

الناس غيره شربًا، فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكفاية لوجود البدل، فلو اجتمع على بيت المال حقّان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينًا فيه، فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولي الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون الارتفاق، وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذًا بقضائه إذا اتسع له بيت المال.

وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفها فقد اختلف الفقهاء في فاضله، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يدخر في بيت المال لما ينوب المسلمين من حادث. وذهب الشافعي إلى أنه يقبض على أموال من يعمّ به صلاح المسلمين ولا يدخر؛ لأن النوائب تعين فرضها عليهم إذا حدثت، فهذه الأقسام الأربعة التي وضعت عليها قواعد الديوان.

فصل:

وأما كاتب الديوان وهو صاحب ذمامه، فالمعتبر في صحة ولايته شرطان: العدالة والكفاية.

فأما العدالة: فلأنه مؤتَمَن على حق بيت المال والرعية، فاقتضى أن يكون في العدالة والأمانة على صفات المؤتمنين.

وأما الكفاية: فلأنَّه مباشر لعمل يقتضي أن يكون في القيام مستقبلًا بكفاية المباشرين، فإذا صحَّ تقليده فالذي ندب له ستة أشياء: حفظ القوانين، واستيفاء الحقوق، وإثبات الرفع، ومحاسبات العمال، وإخراج الأحوال، وتصفح الظلامات.

فأما الأول منها: وهو حفظ القوانين على الرسوم العادلة من غير زيادة تتحيف بها الرعية، أو نقصان ينثلم به حق بيت المال، فإن قررت في أيامه لبلاد استؤنف فتحها، أو لمواتٍ ابتدئ في إحيائه، أثبتها في ديوان الناحية وديوان بيت المال الجامع للحكم المستقر فيها، وإن تقدمته القوانين المقررة فيها رجع فيها إلى ما أثبته أمناء الكتاب إذا وثق بخطوطهم، وتسلمه من أمنائهم تحت ختمهم، وكانت الخطوط الخارجة على هذه الشروط مقنعة في جواز الأخذ بها، والعمل عليها في الرسوم الديوانية والحقوق السلطانية، وإن لم

অন্যান্যদের জন্য পানির বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং যদি তহবিলের অভাবে বায়তুল মাল থেকে এর আবশ্যকতা রহিত হয়ে যায়, তবে বিকল্প বিদ্যমান থাকার কারণে সামষ্টিক আবশ্যকতা (ফরজে কিফায়া) থেকেও তা রহিত হবে। যদি বায়তুল মালের ওপর দুটি হকের দাবি একত্রিত হয় এবং তহবিল উভয়ের জন্য সংকীর্ণ কিন্তু একটির জন্য প্রশস্ত হয়, তবে যা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে তাতে তা ব্যয় করা হবে। যদি কোনোটির জন্যই পর্যাপ্ত অর্থ না থাকে এবং শাসক বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করেন, তবে তিনি বায়তুল মালের পক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন যা তিনি ঋণের খাতে ব্যয় করবেন, বিলাসিতার জন্য নয়। তার পরবর্তী শাসকগণ সেই ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন যদি বায়তুল মালের তহবিল সচ্ছল হয়।

বায়তুল মালের প্রাপ্য হকসমূহ যদি ব্যয়ের খাতের চেয়ে অতিরিক্ত হয়, তবে সেই উদ্বৃত্ত অংশ নিয়ে ফকিহগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে, মুসলমানদের কোনো আকস্মিক বিপদ-আপদের জন্য তা বায়তুল মালে জমা রাখা হবে। ইমাম শাফেঈ রহ.-এর

মতে, তা এমন ব্যক্তিদের মাঝে বণ্টন করা হবে যাদের কল্যাণে মুসলমানদের সামষ্টিক মঙ্গল সাধিত হয় এবং তা জমা রাখা হবে না; কারণ কোনো বিপদ দেখা দিলে তখন নতুন করে তাদের ওপর তা প্রদান করা আবশ্যক হবে। এই চারটি বিভাগই হলো দিওয়ানের নিয়মাবলির মূল ভিত্তি।

পরিচ্ছেদ:

দিওয়ানের কাতিব বা সচিব, যিনি এর দায়বদ্ধতার অধিকারী, তার নিয়োগ বৈধ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত বিবেচনাযোগ্য: ন্যায়পরায়ণতা এবং কর্মদক্ষতা।

ন্যায়পরায়ণতার আবশ্যকতা এই কারণে যে, তিনি বায়তুল মাল এবং প্রজাসাধারণের হকের বিষয়ে একজন আমানতদার। সুতরাং আমানতদারদের যে সকল গুণাবলি ও ন্যায়পরায়ণতা থাকা প্রয়োজন, তার মধ্যেও তা থাকা আবশ্যক।

আর কর্মদক্ষতার কারণ হলো, তিনি এমন এক কর্ম সরাসরি সম্পাদন করেন যা সুচারুভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত দক্ষতার দাবি রাখে। যখন তার নিয়োগ সঠিক হবে, তখন তার ওপর ছয়টি দায়িত্ব অর্পিত হবে: আইনসমূহ সংরক্ষণ করা, পাওনা আদায় করা, রাজস্বের প্রাপ্তি লিপিবদ্ধ করা, কর্মীদের হিসাব গ্রহণ করা, আয়-ব্যয়ের বিবরণী তৈরি করা এবং অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করা।

এগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো: প্রজাদের ওপর কোনো প্রকার জুলুম বা অতিরিক্ত বোঝা চাপানো ছাড়াই অথবা বায়তুল মালের হক ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো ঘাটতি ছাড়াই ন্যায়সঙ্গত রীতির ভিত্তিতে আইনসমূহ সংরক্ষণ করা। যদি নতুন বিজিত কোনো ভূখণ্ড বা নতুন করে আবাদ করা অনাবাদি ভূমির জন্য কোনো নিয়ম নির্ধারিত হয়, তবে তিনি তা আঞ্চলিক দিওয়ানে এবং বায়তুল মালের কেন্দ্রীয় দিওয়ানে স্থায়ী সিদ্ধান্ত হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। আর যদি সেখানে আগে থেকেই নির্ধারিত আইন বিদ্যমান থাকে, তবে তিনি পূর্ববর্তী বিশ্বস্ত লেখকদের নথিপত্রের দিকে রুজু করবেন, যদি তাদের হস্তাক্ষর নির্ভরযোগ্য হয় এবং তাদের থেকে মোহরযুক্ত অবস্থায় তা গ্রহণ করা হয়। দিওয়ানের কার্যাবলি ও রাষ্ট্রীয় পাওনার ক্ষেত্রে এই শর্তানুযায়ী প্রাপ্ত নথিপত্র গ্রহণ করা এবং তদানুযায়ী আমল করা বৈধ বলে গণ্য হবে, যদিও তা...

تقنع في أحكام القضاء والشهادات اعتبارًا بالعرف المعهود فيها، كما يجوز للمحدث أن يروي ما وجد من سماعه بالخط الذي يثق به، ويجيء على قول أبي حنيفة أنه يجوز لكاتب الديوان أن يعمل على الخط وحده حتى يأخذه سماعًا من لفظ نفسه يحفظه عنه بقلبه، كما يقول في رواية الحديث اعتبارًا بالقضاء والشهادات، وهذا شاق مستبعَد.

والفرق بينهما أنَّ القضاء والشهادات من الحقوق الخاصَّة التي يكثر المباشر لها والقُيَّمُ بها، فلم يضق الحفظ لها بالقلب، فلذلك لم يجز أن يعول فيها على مجرد الخط، وأن القوانين الديوانية من الحقوق العامة التي يقل المباشر لها مع كثرتها وانتشارها فضاق حفظها بالقلب، فلذلك جاز التعويل فيها على مجرد الخط، وكذلك رواية الحديث.

وأما الثاني: وهو استيفاء الحقوق فهو على ضربين:

أحدهما: استيفاؤها ممن وجب عليه من العاملين.

والثاني: استفاؤها من القابضين لها من العمال.

فأما استيفاؤها من العاملين: فيعمل فيه على إقرار العمال بقبضها، وأما العمل فيها على خطوط العمال بقبضها، فالذي عليه كتاب الدواوين أنه إذا عرف الخط كان حجة لقبض، سواء اعترف العامل بأنه خطة أو أنكره إذا قيس بخطه المعروف.

والذي عليه الفقهاء أنَّه لم يعترف العامل بأنه خطه وأنكره لم يلزمه، ولم يكن حجة في القبض ولا يسوغ أن يقاس بخطه في الإلزام إجبارًا، وإنما يقاس بخطه إرهابًا ليعترف به طوعًا، وإن اعترف بالخط وأنكر القبض، فالظاهر من مذهب الشافعي أنه يكون في الحقوق السلطانية خاصة حجة للعاملين وبالدفع، وحجة على العمال بالقبض اعتبارًا بالعرف؛ والظاهر من مذهب أبي حنيفة أنه لا يكون حجة

عليهم ولا للعاملين حتى يقرّ به لفظ كالديون الخاصة، وفيما قدمناه من الفرق بينهما مقنع.

وأما استيفاؤها من العمال: فإن كانت خراجًا إلى بيت المال لم يحتج فيها إلى توقيع ولي الأمر، وكان اعتراف صاحب بيت المال بقبضها حجة في براءة العمال منها، والكلام في خطٍّ إذا تجرَّد عن إقراره على ما قدمناه في خطوط العمال أنه يكون حجة على الظاهر من مذهب

বিচারিক সিদ্ধান্ত ও সাক্ষ্যদানের বিধানে প্রচলিত প্রথার ওপর ভিত্তি করে তা যথেষ্ট বলে গণ্য হয়; যেমন একজন মুহাদ্দিসের জন্য তাঁর শ্রুত বিষয়কে এমন হস্তলিপির মাধ্যমে বর্ণনা করা জায়েজ যা তাঁর নিকট নির্ভরযোগ্য। ইমাম আবু হানিফার অভিমত অনুযায়ী, দিওয়ানের লেখকের (প্রশাসনিক কর্মকর্তা) জন্য শুধুমাত্র হস্তলিপির ওপর নির্ভর করে কাজ করা বৈধ, যতক্ষণ না তিনি স্বীয় মুখনিঃসৃত শব্দ থেকে তা শুনে হৃদয়ে গেঁথে নেন; যেমনটি তিনি বিচার ও সাক্ষ্যদানের প্রথার নিরিখে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে বলে থাকেন। তবে এই বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন ও সুদূরপরাহত।

এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, বিচার ও সাক্ষ্যদান হলো বিশেষ অধিকারভুক্ত বিষয় (ব্যক্তিগত অধিকার), যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও তদারককারীর সংখ্যা অধিক, ফলে তা হৃদয়ে মুখস্থ রাখা কঠিন হয় না। এই কারণে শুধুমাত্র হস্তলিপির ওপর নির্ভর করা সেখানে জায়েজ নয়। অন্যদিকে দিওয়ানি আইনসমূহ হলো সাধারণ অধিকারভুক্ত বিষয় (রাষ্ট্রীয় অধিকার), যার বিষয়বস্তুর আধিক্য ও বিস্তৃতি সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা কম, ফলে তা হৃদয়ে সংরক্ষণ করা দুঃসাধ্য। এই কারণেই দিওয়ানি বিষয়ে শুধুমাত্র হস্তলিপির ওপর নির্ভর করা বৈধ হয়েছে এবং হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রেও বিষয়টি তদ্রূপ।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: পাওনা আদায় করা; এটি দুই প্রকার:

প্রথমত: যাদের ওপর এটি অর্পিত হয়েছে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট থেকে আদায় করা।

দ্বিতীয়ত: যারা এই সম্পদ গ্রহণ করেছেন সেই তহশিলদার বা আদায়কারীদের নিকট থেকে তা বুঝে নেওয়া।

ব্যক্তিদের থেকে অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের স্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আর হস্তলিপির মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে দিওয়ান সংশ্লিষ্ট লেখকদের রীতি হলো, যদি

হস্তলিপি চেনা যায় তবে তা গ্রহণের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে; সংশ্লিষ্ট আদায়কারী তা নিজের হস্তলিপি বলে স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক, যদি তার পরিচিত হস্তলিপির সাথে তার মিল পাওয়া যায়।

ফকীহগণের অভিমত হলো, আদায়কারী যদি তা নিজের হস্তলিপি বলে স্বীকার না করে বরং অস্বীকার করে, তবে তা তার ওপর বাধ্যতামূলক হবে না এবং তা গ্রহণের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে না। বাধ্য করার ক্ষেত্রে অন্য হস্তলিপির সাথে তুলনা করা বৈধ নয়; বরং তাকে ভয় দেখানোর জন্য হস্তলিপির তুলনা করা যেতে পারে যাতে সে স্বেচ্ছায় তা স্বীকার করে নেয়। আর যদি সে হস্তলিপি স্বীকার করে কিন্তু গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করে, তবে ইমাম শাফিঈর মাযহাবের প্রকাশ্য মতানুসারে এটি বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় পাওনাদির ক্ষেত্রে প্রথার বিবেচনায় করদাতাদের পক্ষে পরিশোধের দলিল এবং আদায়কারীদের বিপক্ষে গ্রহণের দলিল হিসেবে গণ্য হবে। আর ইমাম আবু হানিফার মাযহাবের প্রকাশ্য মতানুসারে, এটি তাদের বিপক্ষে বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সপক্ষে দলিল হবে না যতক্ষণ না ব্যক্তিগত ঋণের মতো মৌখিকভাবে তা স্বীকার করা হয়। আমরা ইতিপূর্বে এই উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছি তা-ই সন্তোষজনক।

আর আদায়কারীদের নিকট থেকে পাওনা বুঝে নেওয়ার বিষয়টি যদি বায়তুল মালের খেরাজ সংক্রান্ত হয়, তবে তাতে শাসনকর্তার দস্তখতের প্রয়োজন নেই। বায়তুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির স্বীকৃতিই আদায়কারীদের দায়মুক্তির দলিল হিসেবে গণ্য হবে। আর আদায়কারীর স্বীকৃতি ব্যতিরেকে শুধুমাত্র হস্তলিপির বিষয়টি আমরা আদায়কারীদের হস্তলিপির ব্যাপারে ইতিপূর্বে যা উল্লেখ করেছি তদ্রূপই হবে যে, মাযহাবের প্রকাশ্য মতানুসারে তা দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

الشافعي- ولا يكون حجة على الظاهر من مذهب أبي حنيفة، وإن كانت خراجًا من حقوق بيت المال، ولم تكن خراجًا إليه لم يمض العمال إلّا بتوقيع ولي الأمر، وكان التوقيع إذا عرفت صحته حجة مقنعة في جواز الدفع.

وأمَّا الاحتساب به فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون الاحتساب به موقوفًا على اعتراف الموقع له بقبض ما تضمنه؛ لأنَّه التوقيع حجة بالدفع إليه، وليس بحجة في القبض منه.

والوجه الثاني: يحتسب به العمل في حقوق بيت المال، فإن أنكر صاحب التوقيع القبض حاكم العامل فيه، وأخذ العامل بإقامة الحجة عليه، فإن عدمها أحلف صاحب التوقيع، وأخذ العامل بالغرم، وهذا الوجه أخص بعرف الديوان.

والوجه الأوّل أشبه بتحقيق الفقه، فإن استراب صاحب الديوان بالتوقيع لم يحتسب للعامل به على الوجهين معًا حتى يعرضه على الموقع، فإن اعترف به صحَّ، وكان الاحتساب به على ما تقدَّم، وإن أنكره لم يحتسب به للعامل، ونظر في وجه الخراج، فإن كان في خاص موجود رجع به العامل عليه، وإن كان في جهات لا يمكن الرجوع بها سأل العامل إحلاف الموقع على إنكاره، وإن لم يعرف صحة الخراج لم يكن للموقع إحلاف العامل لا في عرف السلطنة ولا في حكم القضاء، فإن علم بصحة الخراج فهو من عرف السلطنة مدفوع عن إحلاف الموقع، وفي حكم القضاء يجاب عليه.

وأما الثالث: فهو إثبات الرفع، فينقسم ثلاثة أقسام: رفع مساحة وعمل، ورفع قبض واستيفاء، ورفع خرج ونفقة، فأمَّا رفع المساحة والعمل، فإن كانت أصولها مقدرة في الديوان اعتبر صحة الرفع بمقابلة الأصل، وأثبت في الديوان إن وافقها، وإن لم يكن لها في الديوان أصول عمل في إثباتها على قول رافعها.

وأما رفع القبض والاستيفاء فيعمل في إثباتها على مجرد قول رافعها؛ لأنه يقر به على نفسه لا لها.

وأما رفع الخراج والنفقة فرافعها مدع لها فلا تقبل دعواه إلا بالحجج البالغة، فإن احتج

ইমাম শাফিঈর মতে—এটি ইমাম আবু হানিফার মাযহাবের প্রকাশ্য মত অনুযায়ী দলিল হিসেবে গণ্য হবে না। যদি তা বাইতুল মালের পাওনা কোনো খারাজ হয় এবং তা তার নিকট সরাসরি অর্পিত খারাজ না হয়, তবে আমিল বা কর্মকর্তা শাসক বা অভিভাবকের স্বাক্ষর ব্যতিরেকে তা কার্যকর করবেন না। যদি স্বাক্ষরের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হওয়া যায়, তবে তা প্রদানের বৈধতার ক্ষেত্রে তা একটি সন্তোষজনক দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

আর এর হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দুটি দিক হতে পারে:

প্রথমটি: হিসাব সংরক্ষণ বিষয়টি যার অনুকূলে স্বাক্ষর প্রদান করা হয়েছে, তার পক্ষ থেকে প্রাপ্তি স্বীকারের ওপর স্থগিত থাকবে; কারণ স্বাক্ষরটি তার নিকট প্রদানের ক্ষেত্রে দলিল হলেও তার পক্ষ থেকে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে দলিল নয়।

দ্বিতীয় দিক: বাইতুল মালের পাওনার ক্ষেত্রে এটি হিসাবভুক্ত করা হবে। যদি স্বাক্ষরধারী ব্যক্তি তা গ্রহণ করার কথা অস্বীকার করে, তবে সে বিষয়ে আমিলের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে এবং আমিলকে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হবে। যদি সে প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়, তবে স্বাক্ষরধারীর শপথ গ্রহণ করা হবে এবং আমিলকে জরিমানার সম্মুখীন করা হবে। এই পদ্ধতিটি দিওয়ানের রীতির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রথম পদ্ধতিটি ফিকহী বিশ্লেষণের বিচারে অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যদি দিওয়ানের প্রধান সেই স্বাক্ষর সম্পর্কে সন্দিহান হন, তবে উভয় পদ্ধতি অনুযায়ীই আমিলের জন্য তা হিসাবভুক্ত করা হবে না, যতক্ষণ না তা স্বাক্ষরদাতার নিকট পেশ করা হয়। যদি তিনি তা স্বীকার করেন, তবে তা সঠিক বলে গণ্য হবে এবং পূর্ববর্ণিত নিয়মে হিসাব রাখা হবে। আর যদি তিনি তা অস্বীকার করেন, তবে তা আমিলের অনুকূলে হিসাবভুক্ত হবে না। তখন খারাজের ধরনটি দেখা হবে; যদি তা কোনো বিদ্যমান নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সম্পদের ক্ষেত্রে হয়, তবে আমিল তার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। আর যদি এমন কোনো খাতের হয় যেখানে প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়, তবে আমিল স্বাক্ষরদাতার অস্বীকারের প্রেক্ষিতে তার শপথ গ্রহণের আবেদন জানাবে। আর যদি খারাজের বিষয়টি নিশ্চিত না হয়, তবে প্রশাসনিক রীতি বা বিচারিক সিদ্ধান্ত—কোনো মাধ্যমেই স্বাক্ষরদাতার জন্য আমিলকে শপথ করানোর অধিকার থাকবে না। যদি খারাজের বিষয়টি

নিশ্চিতভাবে জানা থাকে, তবে প্রশাসনিক রীতি অনুযায়ী স্বাক্ষরদাতাকে শপথ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে, কিন্তু বিচারিক ফয়সালার ক্ষেত্রে তাকে শপথের জন্য আহ্বান করা হবে।
আর তৃতীয়টি হলো: প্রতিবেদন বা হিসাব দাখিল সাব্যস্ত করা। এটি তিন ভাগে বিভক্ত: পরিমাপ ও কর্মতৎপরতার প্রতিবেদন, আদায় ও উশুলের প্রতিবেদন এবং ব্যয় ও খরচের প্রতিবেদন। পরিমাপ ও কর্মতৎপরতার প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে যদি তার মূল ভিত্তিগুলো দিওয়ানে সংরক্ষিত থাকে, তবে মূল রেকর্ডের সাথে মিলিয়ে প্রতিবেদনের সঠিকতা যাচাই করা হবে। যদি তা রেকর্ডের সাথে মিলে যায়, তবে দিওয়ানে তা লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যদি দিওয়ানে এর কোনো মূল রেকর্ড না থাকে, তবে প্রতিবেদন পেশকারীর বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে তা সাব্যস্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আর আদায় ও উশুলের প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে তা সাব্যস্ত করতে কেবল প্রতিবেদন পেশকারীর বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা হবে; কারণ সে এর মাধ্যমে নিজের দায় স্বীকার করছে, নিজের জন্য কোনো অধিকার দাবি করছে না।
আর ব্যয় ও খরচের প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন পেশকারী যেহেতু এখানে দাবিদার, তাই অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত তার দাবি গ্রহণ করা হবে না। যদি সে প্রমাণ পেশ করে...

(ص: 320)الأحكام السلطانية للماوردي

بتوقيعات ولاة الأمور استعرضها، وكان الحكم فيها على ما قدمنا من أحكام التوقيعات.

وأما الرابع: وهو محاسبة العمال: فيختلف حكمها باختلاف ما تقلَّدوه، وقد قدمنا القول فيها، فإن كانوا من عمَّال الخراج لزمهم رفع الحساب، ووجب على كاتب الديوان محاسبتهم على صحة ما رفعوه، وإن كانوا من عمَّال العشر لم يلزمهم على مذهب الشافعي رفع الحساب، ولم يجب على كاتب الديوان محاسبتهم عليه؛ لأن العشر عنده صدقة لا يقف مصرفها على اجتهاد الولاة، ولو تفرَّد أهلها أجزأت،

ويلزمهم على مذهب أبي حنيفة رفع الحساب، ويجب على كاتب الديوان محاسبتهم عليه؛ لأنَّ مصرف الخراج والعشر عنده مشترك، وإذا حوسب من وجبت عليه محاسبته من العمَّال نظر، فإن لم يقع بين العامل وكاتب الديوان حلف كان كاتب الديوان مصدقًا في بقايا الحساب، فإن استراب به وليّ الأمر كلَّفه إحضاره شواهده، فإن زالت الريبة عنه سقطت اليمين فيه، وإن لم تزل الريبة وأراد ولي الأمر الإحلاف على ذلك أحلف العامل دون كاتب الديوان؛ لأنَّ المطالبة متوجهة على العامل دون الكاتب، وإن اختلفا في الحساب نظر، فإن كان اختلافهما في دخل، فالقول فيه قول العامل؛ لأنه منكر، وإن كان اختلافهما في خراج، فالقول فيه قول الكاتب؛ لأنه منكر، وإن كان اختلافهما في مساحة تمكن إعادتها اعتبرت بعد الاختلاف، وعمل فيها على ما يخرج بصحيح الاعتبار.

وأما الخامس: وهو إخراج الأحوال، فهو استشهاد صاحب الديوان على ما ثبت فيه من قوانين وحقوق، فصار كالشهادة واعتبر فيه شرطان:

أحدهما: أن لا يخرج من الأموال إلّا ما علم صحته كما لا يشهد إلَّا بما علمه وتحققه.

والثاني: أن لا يبتدئ بذلك حتى يُسْتَدعَى منه كما لا يشهد حتى يستشهد، والمستدعَى لإخراج الأحوال من نفذت توقيعاته، كما أنَّ المشهود عنده من نفذت أحكامه، فإذا أخرج حالًا لزم الموقع بإخراجها والأخذ بها والعمل عليها، كما يلزم الحاكم تنفيذ الحكم بما يشهد به الشهود عنده، فإن استراب الموقع بإخراج الحال جاز أن يسأله من أين أخرجه، ويطالبه بإحضار شواهد الديوان بها، وإن لم يجز أن يسأل شاهدًا عن سبب شهادته، فإن أحضرها ووقع في النفس صحتها زالت عنه الريبة، وإن عدمها وذكر أنه أخرجها من حفظه؛ لتقدم

রাষ্ট্রপ্রধানদের স্বাক্ষরের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হবে এবং এ সংক্রান্ত বিধান আমরা ইতিপূর্বে স্বাক্ষর বিষয়ক বিধিমালায় যা উল্লেখ করেছি তদানুযায়ী হবে।

চতুর্থত: কর্মকর্তাদের হিসাব গ্রহণ। তাঁদের অর্পিত দায়িত্বের ভিন্নতা অনুযায়ী এর বিধানেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। যদি তাঁরা খারাজ বা ভূমিরাজস্ব আদায়ের কর্মকর্তা হন, তবে তাঁদের জন্য হিসাব পেশ করা আবশ্যক এবং দেওয়ানের লিপিকারের (কাতিব উদ-দেওয়ান) কর্তব্য হলো তাঁদের পেশকৃত হিসাবের সঠিকতা যাচাই করা। আর তাঁরা যদি উশর বা ফসলের দশমাংশ আদায়ের কর্মকর্তা হন, তবে ইমাম শাফিয়ীর মাযহাব অনুযায়ী তাঁদের ওপর হিসাব পেশ করা বাধ্যতামূলক নয় এবং দেওয়ানের লিপিকারের জন্যও তা পরীক্ষা করা আবশ্যক নয়। কারণ তাঁর মতে, উশর হলো সদকা বা দান বিশেষ, যার ব্যয়ের খাতসমূহ শাসকদের ইজতিহাদ বা সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এককভাবে তা প্রদান করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অনুযায়ী তাঁদের ওপর হিসাব পেশ করা আবশ্যক এবং দেওয়ানের লিপিকারের ওপরও তা যাচাই করা বাধ্যতামূলক; কারণ তাঁর নিকট খারাজ ও উশরের ব্যয়ের খাত অভিন্ন। অতঃপর যখন কোনো কর্মকর্তার হিসাব গ্রহণ করা হবে, তখন যদি কর্মকর্তা ও দেওয়ানের লিপিকারের মধ্যে কোনো শপথের আবশ্যকতা তৈরি না হয়, তবে অবশিষ্ট হিসাবের ক্ষেত্রে লিপিকারের বক্তব্যই সত্য বলে গৃহীত হবে। কিন্তু যদি রাষ্ট্রপ্রধান লিপিকারের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন, তবে তাকে স্বপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপনের নির্দেশ দেবেন। যদি এতে সন্দেহ দূর হয়ে যায়, তবে শপথের আবশ্যকতা রহিত হবে। আর যদি সন্দেহ দূর না হয় এবং রাষ্ট্রপ্রধান শপথ গ্রহণ করাতে চান, তবে তিনি লিপিকারের পরিবর্তে কর্মকর্তাকে দিয়ে শপথ করাবেন; কারণ পাওনা আদায়ের দাবিটি কর্মকর্তার ওপর বর্তায়, লিপিকারের ওপর নয়। আর যদি হিসাবের বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তবে লক্ষ্য করা হবে—যদি তাঁদের মতভেদ আয়ের বিষয়ে হয়, তবে কর্মকর্তার কথা নির্ভরযোগ্য হবে, কারণ তিনি এখানে অস্বীকারকারী। কিন্তু যদি মতভেদ খারাজ বা রাজস্বের বিষয়ে হয়, তবে লিপিকারের কথা নির্ভরযোগ্য হবে, কারণ তিনি এখানে অস্বীকারকারী। আর যদি মতভেদ ভূমির পরিমাপ সংক্রান্ত হয় এবং তা পুনরায় পরিমাপ করা সম্ভব হয়, তবে বিরোধের পর তা পুনরায় পরিমাপ করে প্রাপ্ত সঠিক ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কাজ সম্পন্ন করা হবে।

পঞ্চমত: অবস্থার বিবরণ (আহওয়াল) প্রকাশ করা। এটি হলো দেওয়ানের প্রধান কর্তৃক নথিবদ্ধ নিয়ম-কানুন ও অধিকারসমূহের সাক্ষ্য প্রদান। ফলে এটি সাক্ষ্যের মর্যাদা লাভ করেছে এবং এতে দুটি শর্ত বিবেচনা করা হয়েছে:

প্রথমটি হলো: কোনো সম্পদ বা অর্থের বিবরণ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ করা যাবে না, যতক্ষণ না তার সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়; যেমনটি নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতিরেকে সাক্ষ্য প্রদান করা বৈধ নয়।
দ্বিতীয়টি হলো: তলব বা আহ্বান না করা পর্যন্ত এটি আরম্ভ করা যাবে না, যেমনটি সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহ্বান না করা পর্যন্ত সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। আর এই বিবরণ প্রকাশের জন্য আহ্বানকারী হলেন তিনি, যাঁর স্বাক্ষর কার্যকর হয়; ঠিক যেমন যাঁর কাছে সাক্ষ্য দেওয়া হয় তিনি হলেন এমন ব্যক্তি যাঁর রায় কার্যকর হয়। সুতরাং যখন তিনি কোনো বিবরণ পেশ করবেন, তখন স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার ওপর তা গ্রহণ ও তদনুযায়ী আমল করা আবশ্যক হয়ে পড়বে, যেভাবে বিচারকের ওপর সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় কার্যকর করা আবশ্যক হয়। যদি স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা পেশকৃত বিবরণের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন, তবে তিনি প্রশ্ন করতে পারেন যে এটি কোথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং দেওয়ানের প্রমাণাদি উপস্থাপনের দাবি জানাতে পারেন; যদিও সাধারণ সাক্ষীকে তার সাক্ষ্যের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বৈধ নয়। অতঃপর যদি তিনি প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন এবং মনের মধ্যে তার সঠিকতা বদ্ধমূল হয়, তবে সন্দেহ দূর হবে। কিন্তু যদি তিনি প্রমাণাদি উপস্থাপনে ব্যর্থ হন এবং উল্লেখ করেন যে তিনি তা স্মৃতির ওপর ভিত্তি করে পেশ করেছেন; যা সময়ের অগ্রগতির কারণে...

(ص: 321)الأحكام السلطانية للماوردي

علمه بها صار معلول القول، والموقع مخير بين قبول ذلك منه أو رده عليه، وليس له استخلافه.

وأما السادس: وهو تصفّح الظلامات، فهو يختلف بسبب اختلاف التظلم، وليس يخلو من أن يكون المتظلم من الرعية أو من العمال، فإن كان المتظلم من الرعية تظلم من عامل تحيفه في معاملته كان صاحب الديوان فيها حاكمًا بينهما، وجاز له أن يتصفح الظلامة1 ويزيل التحيف2، سواء وقع النظر إليه بذلك أو لم يقع؛ لأنه

مندوب لحفظ القوانين واستيفاء الحقوق، فصار بعقد الولاية مستحقًّا لتصفح الظلامة، فإن منع منها امتنع وصار عزلًا عن بعض ما كان إليه، وإن كان المتظلم عاملًا جوزف في حساب، أو غولط في معاملة صار صاحب الديوان فيها خصمًا، وكان المتصفح لها والي الأمر.

---

1 الظلامة والظليمة والمظلمة بفتح اللام: ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما أخذه منك. [مختار الصحاح: ص 170] .

2 التحيف: من الحيف. [الغريب للخطابي: 3/ 61] .

তার সে বিষয়ে অবগতি কথাটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেয়; আর নিয়োগকারী ব্যক্তি তা গ্রহণ করা বা তার ওপর তা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে ইখতিয়ারপ্রাপ্ত হবেন, এবং তাঁর জন্য কোনো স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার নেই।

আর ষষ্ঠ বিষয় হলো: অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করা। অভিযোগের ভিন্নতার কারণে এটি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অভিযোগকারী হয় সাধারণ প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত হবে অথবা কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি প্রজাদের কেউ কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে লেনদেনে অন্যায়ের অভিযোগ করে, তবে দপ্তরের প্রধান (সাহেবে দেওয়ান) তাদের মাঝে বিচারক হিসেবে গণ্য হবেন। এমতাবস্থায় তাঁর জন্য অভিযোগটি পর্যালোচনা করা এবং সেই অন্যায় দূর করা বৈধ হবে, চাই বিষয়টি বিশেষভাবে তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয়ে থাকুক বা না থাকুক; কারণ তিনি আইনসমূহ সংরক্ষণ এবং পাওনা যথাযথভাবে আদায়ের জন্য নিয়োজিত। সুতরাং প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণের মাধ্যমেই তিনি অভিযোগ পর্যালোচনার অধিকার লাভ করেন। এমতাবস্থায় যদি তাঁকে তা থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বের একাংশ থেকে অপসারিত বলে গণ্য হবেন। আর যদি অভিযোগকারী কোনো কর্মকর্তা হয় যে হিসাবের ক্ষেত্রে অবিচারের শিকার হয়েছে কিংবা লেনদেনে বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়েছে, তবে দপ্তরের প্রধান সেক্ষেত্রে বিবাদী হিসেবে গণ্য হবেন এবং তখন খোদ রাষ্ট্রপ্রধান হবেন সেই অভিযোগ পর্যালোচনা করার কর্তৃপক্ষ।

---

১ 'যুলামাহ', 'যুলিমাহ' এবং 'মাযলামাহ' (লাম বর্ণে ফাতহা যোগে): যা আপনি অত্যাচারীর কাছে দাবি করেন; আর এটি মূলত সেই বস্তুর নাম যা আপনার থেকে অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। [মুখতার আস-সিহাহ: পৃষ্ঠা ১৭০] ।
২ 'আত-তাহাইয়ুফ': এটি 'আল-হাইফ' (অবিচার) শব্দ থেকে উদ্ভূত। [আল-গারিব লিল-খাত্তাবি: ৩/৬১] ।

الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم

مدخل

...

الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدّ أو تعزيز1، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية.

فأمَّا حالها بعد التهمة وقبل ثبوتها وصحتها فمعتبر بحال النظر فيها، فإن كان حاكمًا رفع إليه رجل قد اتُّهم بسرقة أو زنًا، لم يكن لتهمة بها تأثير عنده؛ ولم يجز أن يحبسه لكشف ولا استبراء، ولا أن يأخذه بأسباب الإقرار إجبارًا، ولم يسمع الدعوى عليه في السرقة إلَّا من خصم مستحق لما قرف، وراعى ما يبدو من إقرار المتهوم أو إنكاره؛ إن اتهم بالزنا لم يسمع الدعوى عليه إلَّا بعد أن يذكر المرأة التي زنى بها، ويصف ما فعله بها مما يكون زنًا موجبًا للحدِّ، فإن أقرَّ حده

بموجب إقراره، وإن أنكر وكانت بينة سمعها عليه، وإن لم تكن أحلفه في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى إذا طلب الخصم اليمين2.

وإن كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم أميرًا، أو من أولاد الأحداث والمعاون، كان له مع هذا المتهوم من أسباب الكشف والاستبراء ما ليس للقضاة والحكام، وذلك من تسعة أوجه يختلف بها حكم الناظرين:

أحدها: أنه لا يجوز للأمير أن يسمع قرف3 المتهوم من أعوان الإمارة من غير تحقيق للدعوى المقررة ويرجع إلى قولهم في الإخبار عن حال المتهوم، وهل هو من أهل الريب؟

---

1 التعزيز: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. [اللسان: 4/ 561] .

2 قلت: وهذا كلام في غاية الجودة والدقة سبق به المصنف رحمه الله واضعي القوانين والدساتير بمئات السنين.

3 قرف: الذنب وغيره يقرفه قرفًا واقترفه: اكتسبه. والاقتراف: الاكتساب. اقترف أي اكتسب، واقترف ذنبًا أي: أتاه وفعله. وفي الحديث: رجل قرف على نفسه ذنوبًا أي كسبها. ويقال: قرف الذنب واقترفه إذا عمله. وقارف الذنب وغيره: داناه ولاصقه. [اللسان: 9/ 280] .

উনবিংশ অধ্যায়: অপরাধের বিধানাবলী প্রসঙ্গে

ভূমিকা

...

উনবিংশ অধ্যায়: অপরাধের বিধানাবলী প্রসঙ্গে

অপরাধ হলো শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ, যেগুলোর জন্য আল্লাহ তাআলা হদ (নির্ধারিত দণ্ড) অথবা তাজীর (বিবেচনামূলক দণ্ড) এর মাধ্যমে সতর্ক করেছেন১। অভিযোগের ক্ষেত্রে অপরাধের এমন একটি তদন্ত ও সত্য উদঘাটনের অবস্থা রয়েছে যা ধর্মীয় প্রশাসনিক নীতির

দাবি; আর অপরাধ প্রমাণিত ও শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে এর এমন একটি দণ্ড কার্যকরের অবস্থা রয়েছে যা শরয়ী বিধান অনুযায়ী আবশ্যক হয়।

পক্ষান্তরে, অভিযোগের পর কিন্তু তা প্রমাণিত ও শুদ্ধ হওয়ার আগের অবস্থাটি বিচারিক পর্যালোচনার ওপর নির্ভরশীল। যদি বিষয়টি এমন কোনো বিচারকের নিকট উত্থাপিত হয় যার কাছে চুরি বা ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে আনা হয়েছে, তবে তার নিকট কেবল অভিযোগের কোনো প্রভাব থাকবে না; তদন্ত বা সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে তাকে বন্দী করা বিচারকের জন্য বৈধ হবে না, আর তাকে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করার জন্য কোনো উপায় অবলম্বন করাও জায়েজ হবে না। চুরির ক্ষেত্রে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দাবিনামা কেবল সেই বাদীর পক্ষ থেকেই গ্রহণ করা হবে যার মাল চুরি হওয়ার অভিযোগ৩ আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিচারক অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি বা অস্বীকৃতির বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। যদি ব্যভিচারের অভিযোগ আনা হয়, তবে যে নারীর সাথে ব্যভিচার করা হয়েছে তার নাম উল্লেখ না করা পর্যন্ত এবং ব্যভিচারের সংজ্ঞায় পড়ে এমন কর্মকাণ্ডের বর্ণনা—যা হদ প্রদানকে আবশ্যক করে—না দেওয়া পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা হবে না। যদি সে স্বীকারোক্তি দেয়, তবে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাকে হদ প্রদান করা হবে। আর যদি সে অস্বীকার করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত থাকে, তবে বিচারক তার বিরুদ্ধে সেই প্রমাণ গ্রহণ করবেন। আর যদি কোনো প্রমাণ না থাকে, তবে বাদী শপথ করার আবেদন করলে বিচারক কেবল মানুষের হকের ক্ষেত্রে তাকে শপথ করাবেন, আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে নয়২।

আর যে কর্তৃপক্ষের নিকট এই অভিযুক্তকে আনা হয়েছে তিনি যদি আমীর (শাসক) হন অথবা জননিরাপত্তা কর্মকর্তা বা সহকারীর অন্তর্ভুক্ত কেউ হন, তবে এই অভিযুক্তের ক্ষেত্রে তদন্ত ও সত্য উদঘাটনের এমন কিছু উপায় অবলম্বনের অধিকার তার রয়েছে যা সাধারণ কাজী ও বিচারকদের নেই। এটি নয়টি প্রেক্ষিতের কারণে যা দ্বারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিচারের ধরনে পার্থক্য তৈরি হয়:

তন্মধ্যে প্রথমটি হলো: আমীরের জন্য এটা জায়েজ নয় যে, তিনি সুনির্দিষ্ট দাবির সত্যতা যাচাই না করে কেবল প্রশাসনের সহকারীদের পক্ষ থেকে অভিযুক্তের প্রতি আনীত অভিযোগ৩ শ্রবণ করবেন; তবে অভিযুক্তের অবস্থা এবং সে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত কি না—সে সম্পর্কে তথ্য লাভের ক্ষেত্রে তিনি তাদের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

---

১ তাজীর: হদ-এর চেয়ে কম মাত্রার শাস্তি, যা অপরাধীকে পুনরায় অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে এবং অবাধ্যতা থেকে দমনে প্রয়োগ করা হয়। [আল-লিসান: ৪/৫৬১]।
২ আমি (টীকাটিপ্পনীকার) বলছি: এটি অত্যন্ত উচ্চমানসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম একটি বক্তব্য, যার মাধ্যমে লেখক (রহিমাহুল্লাহ) আইন ও সংবিধান প্রণেতাদের চেয়ে শত শত বছর অগ্রগামী ছিলেন।
৩ ক্বরফ: পাপ বা অন্য কিছু; সে তা 'ক্বরফ' বা 'ইকতিরাফ' করেছে অর্থাৎ তা অর্জন করেছে। আল-ইকতিরাফ অর্থ অর্জন। সে 'ইকতারাফা' করেছে মানে সে তা অর্জন করেছে, আর সে কোনো পাপ 'ইকতারাফা' করেছে মানে সে তা সম্পাদন করেছে। হাদীসে এসেছে: জনৈক ব্যক্তি নিজের ওপর অনেক পাপ 'ক্বরফ' করেছে অর্থাৎ অর্জন করেছে। বলা হয়: সে পাপটি 'ক্বরফ' বা 'ইকতিরাফ' করেছে যখন সে তা সম্পাদন করে। আর পাপের 'মুকারাফাত' অর্থ তার নিকটবর্তী হওয়া বা তাতে লিপ্ত হওয়া। [আল-লিসান: ৯/২৮০]।

وهل هو معروف بمثل ما قرف به أم لا؟ فإن برؤوه من مثل ذلك خفت التهمة، ووضعت وعجل إطلاقه ولم يغلظ عليه، وإن قرفوه بأمثاله وعرفوه بأشباهه غلظت التهمة وقويت واستعمل فيها من حال الكشف ما سنذكره، وليس هذا للقضاة.
والثاني: أن للأمير أن يراعي شواهد الحال، وأوصاف المتهوم في قوة التهمة وضعفها، فإن كانت التهمة زنا، وكان المتهوم مطيعًا للنساء ذا فكاهة وخلابة قويت التهمة، وإن كان بضده ضعفت، وإن كانت التهمة بسرقة، وكان المتهوم بها ذا عيارة1، أو في بدنه آثار ضرب، أو كان معه حين أخذ منقب قويت التهمة، وإن كان بضده ضعفت وليس هذا للقضاة أيضًا.

والثالث: أنَّ للأمير أن يجعل حبس المتهوم للكشف والاستبراء، واختلف في مدة حبسه لذلك، فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء، والكشف مقدَّر بشهر واحد لا يتجاوزه. وقال غيره: بل ليس بمقدر، وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده وهذا أشبه2، وليس للقضاة أن يحبسوا أحدًا إلا بحق وجب.

والرابع: أن يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزيز لا ضرب الحد؛ ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم، فإن أقر وهو مضروب، اعتبرت حالة فيما ضرب عليه، فإن ضرب لم يكن لإقراءه تحت الضرب حكم، وإن ضرب ليصدق عن حالة وأقرَّ تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره، فإذا أعاده كان مأخوذًا بالإقرار الثاني دون الأول، فإن اقتصر على الإقرار ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول، وإن كرهناه.

والخامس: أنه يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجز عنها بالحدود ان يستديم حبسه إذا استضرَّ الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال؛ ليدفع ضرره عن الناس، وإن لم يكن ذلك للقضاة.

---

1 رجل عيَّار أي: كثير التطواف والحركة ذكي، وعيّره كذا من التعبير أي: التوبيخ والعامة تقول: عيره بكذا، والعار: السبة والعيب. [مختار الصحاح: 194] .

2 قلت: بل الأشبه الأول خاصة في عصور يشيع فيها الظلم والاستبداد.

আর সে কি এমন কোনো কাজের জন্য পরিচিত যা তার ওপর আরোপ করা হয়েছে, নাকি নয়? যদি তারা তাকে এমন কাজ থেকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে, তবে অভিযোগ দুর্বল হয়ে পড়বে, তাকে অব্যাহতি দেওয়া হবে এবং দ্রুত মুক্তি দেওয়া হবে ও তার প্রতি কঠোরতা করা হবে না। আর যদি তারা তাকে এমন কাজের মাধ্যমে অভিযুক্ত করে এবং তাকে অনুরূপ কাজের জন্য চেনে, তবে অভিযোগ শক্তিশালী হবে এবং সেক্ষেত্রে তদন্তের সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হবে যা আমরা সামনে উল্লেখ করব। আর এটি বিচারকদের এখতিয়ারভুক্ত নয়।

দ্বিতীয়ত: আমিরের অধিকার রয়েছে পরিস্থিতির আলামত এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের নিরিখে অভিযোগের সবলতা বা দুর্বলতা পর্যবেক্ষণ করা। যদি অভিযোগ ব্যভিচারের হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি নারীদের প্রতি আসক্ত, রসিক ও প্রলোভনকারী হয়, তবে অভিযোগ শক্তিশালী হবে; আর যদি এর বিপরীত হয়, তবে তা দুর্বল হবে। যদি অভিযোগ চুরির হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি ভবঘুরে ও ধূর্ত হয়, অথবা তার শরীরে চাবুকের আঘাতের চিহ্ন থাকে, অথবা ধরার সময় তার কাছে সিঁদ কাটার সরঞ্জাম থাকে, তবে অভিযোগ শক্তিশালী হবে; আর যদি এর বিপরীত হয়, তবে তা দুর্বল হবে। এটিও বিচারকদের জন্য সংগত নয়।

তৃতীয়ত: আমিরের অধিকার রয়েছে তদন্ত ও সত্য উদঘাটনের জন্য অভিযুক্তকে বন্দি রাখা। এ উদ্দেশ্যে বন্দি রাখার মেয়াদের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী আব্দুল্লাহ আল-যুবাইরী উল্লেখ করেছেন যে, সত্য উদঘাটন ও তদন্তের জন্য বন্দি রাখার মেয়াদ সর্বোচ্চ এক মাস, যা অতিক্রম করা যাবে না। অন্যগণ বলেছেন: বরং এটি কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ইমামের রায় ও ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল; আর এটাই অধিক সংগতিপূর্ণ। আর বিচারকদের জন্য কোনো সুনিশ্চিত হক বা অধিকার সাব্যস্ত হওয়া ব্যতীত কাউকে বন্দি করার অধিকার নেই।

চতুর্থত: অভিযোগ জোরালো হলে আমিরের জন্য বৈধ যে তিনি অভিযুক্তকে শাসনমূলক প্রহার (তাজীর) করবেন—শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ড (হদ) হিসেবে নয়; যাতে সে তার ওপর আরোপিত অভিযোগের বিষয়ে সত্য প্রকাশ করে। যদি সে প্রহারের অবস্থায় থাকাকালীন স্বীকারোক্তি দেয়, তবে যে উদ্দেশ্যে তাকে প্রহার করা হয়েছে তা বিবেচনা করা হবে। যদি তাকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য প্রহার করা হয়ে থাকে, তবে প্রহারের অধীনে দেওয়া তার স্বীকারোক্তির কোনো আইনি গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর যদি তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে সত্য বলার জন্য প্রহার করা হয় এবং সে প্রহারের অধীনে থাকাকালে স্বীকারোক্তি দেয়, তবে তার প্রহার বন্ধ করা হবে এবং পুনরায় তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হবে। যখন সে তা পুনরাবৃত্তি করবে, তখন সে প্রথমটির পরিবর্তে দ্বিতীয় স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে অভিযুক্ত হবে। আর যদি সে কেবল প্রহারকালীন স্বীকারোক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তা পুনরায় ব্যক্ত না করে, তবে প্রথম স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আমল করা আমিরের জন্য নিষিদ্ধ হবে না, যদিও আমরা একে অপছন্দ করি।

পঞ্চমত: আমিরের জন্য সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বৈধ—যার দ্বারা বারবার অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং নির্ধারিত দণ্ডের মাধ্যমেও যে নিবৃত্ত হয়নি—তাকে আমৃত্যু বন্দি রাখা, যদি তার অপরাধের কারণে মানুষের ক্ষতি হয়। তবে বাইতুল মাল থেকে তার খাদ্য ও পোশাকের সংস্থান

করতে হবে, যাতে মানুষের থেকে তার অনিষ্ট দূর করা যায়; যদিও বিচারকদের জন্য এটি করার সুযোগ নেই।

---

১ 'আইয়ার' বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যে অনেক বেশি ঘোরাফেরা ও চলাচল করে এবং অত্যন্ত চতুর। আর 'আইয়ারাহু' অর্থ হলো তাকে তিরস্কার করা; সাধারণ মানুষ একে 'অমুক বিষয়ে দোষারোপ করা' অর্থে ব্যবহার করে। আর 'আর' মানে হলো কলঙ্ক বা দোষ। [মুখতার আস-সিহাহ: ১৯৪]।

২ আমি বলি: বরং প্রথম মতটিই অধিক সংগতিপূর্ণ, বিশেষ করে এমন যুগে যখন জুলুম ও স্বৈরাচার ব্যাপক রূপ লাভ করে।

والسادس: أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم استبراء لحاله، وتغليظًا عليه في الكشف عن أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاق والعتاق والصدقة كالإيمان بالله في البيعة السلطانية1، وليس للقضاة إحلاف أحد على غير حق، ولا أن يجاوز الإيمان بالله إلى الطلاق أو العتق.

والسابع: أن للأمير أن يأخذ أهل الجرائم بالتوبة إجبارًا، ويظهر من الوعيد عليهم ما يقودهم إليها طوعًا، ولا يضيق عليهم الوعيد بالقتل فيما لا يجب فيه القتل؛ لأنه وعيد إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزيز والأدب، ولا يجوز أن يحقق وعيده بالقتل، فيقتل فيما لا يجب فيه القتل.

والثامن: أنَّه لا يجوز للأمير أن يسمع شهادات أهل الملل، ومن لا يجوز أن يسمع منه القضاة إذا كثر عددهم.

والتاسع: أن للأمير النظر في المواثبات، وإن لم توجد غرمًا ولا حدًّا، فإن لم يكن بواحد منهما أثر سمع قول من سبق بالدعوى، وإن كان بأحدهما أثر فقد ذهب بعضهم إلى أنه يبدأ بسماع دعوى من به الأثر ولا يراعي السبق. والذي عليه أكثر الفقهاء أنَّه يسمع قول أسبقهما بالدعوى، ويكون المبتدئ بالمواثبة2 أعظمهما جرمًا وأغلظهما تأديبًا، ويجوز أن يخالف بينهما في التأديب من وجهين:

أحدهما: بحسب اختلافهما في الاقتراف والتعدي.

والثاني: بحسب اختلافهما في الهيبة والتصاون، وإذا رأى من الصلاح في ردع السفلة أن يشهّرهم وينادي عليهم بجرائمهم ساغ له ذلك، فهذه أوجه يقع بها الفرق في الجرائم بين نظر الأمراء والقضاة في حال الاستبراء وقبل ثبوت الحد لاختصاص الأمير بالسياسة، واختصاص القضاة بالأحكام.

---

1 قال المرداوي: لا يحلف بطلاق، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقًا للأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى، وحكاه ابن عبد البر رحمه الله إجماعًا. [الإنصاف: 21/ 124] .

2 المواثبة: المصاولة. [الفائق ص 334] .

ষষ্ঠত: আমিরের জন্য বৈধ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার অবস্থা স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং মহান আল্লাহর হক ও মানুষের হকের বিষয়ে তার সংশ্লিষ্টতা উদঘাটনের ক্ষেত্রে কঠোরতা স্বরূপ কসম করানো। সুলতানি বাইয়াতের মতো আল্লাহর নামে শপথের পাশাপাশি তালাক, দাসমুক্তি এবং সদকার শপথ যুক্ত করা তার জন্য সংকীর্ণতার বিষয় নয়। তবে বিচারকদের (কাযী) জন্য কারো নিকট থেকে অনধিকার কোনো বিষয়ে কসম নেওয়ার অধিকার নেই, কিংবা আল্লাহর নামে শপথের সীমা অতিক্রম করে তালাক বা দাসমুক্তির শপথ নেওয়ারও সুযোগ নেই।

সপ্তমত: আমিরের জন্য অপরাধীদের তওবা করতে বাধ্য করার অধিকার রয়েছে এবং তাদের প্রতি এমন ভীতি প্রদর্শন করাও জায়েজ যা তাদের স্বেচ্ছায় তওবার দিকে ধাবিত করবে। যে অপরাধে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত নয়, সেক্ষেত্রেও ভীতি প্রদর্শনের জন্য হত্যার হুমকি দেওয়া তার

জন্য সংকীর্ণতার বিষয় নয়; কারণ এটি একটি সতর্কতামূলক ভীতি প্রদর্শন যা মিথ্যার সীমা থেকে বেরিয়ে শাস্তি ও আদব প্রদানের আওতায় পড়ে। তবে হত্যার এই হুমকি কার্যকর করা তার জন্য বৈধ নয়, অর্থাৎ যে অপরাধে মৃত্যুদণ্ড ওয়াজিব নয় সেখানে কাউকে হত্যা করা যাবে না।

অষ্টমত: আমিরের জন্য ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা জায়েজ নয়, এবং যাদের সাক্ষ্য কাযীদের জন্য গ্রহণ করা বৈধ নয় তাদের সাক্ষ্যও তিনি গ্রহণ করবেন না, যদিও তাদের সংখ্যা অনেক হয়।

নবমত: আমিরের জন্য পারস্পরিক আক্রমণের (মুওয়াছাবাত) বিষয়ে বিচার করার অধিকার রয়েছে, যদিও সেখানে জরিমানা বা দণ্ডবিধি (হদ) কার্যকর করার মতো অবস্থা তৈরি না হয়। যদি তাদের কারো গায়ে আঘাতের চিহ্ন না থাকে, তবে যিনি আগে অভিযোগ করেছেন আমির তার কথা শুনবেন। আর যদি তাদের একজনের গায়ে আঘাতের চিহ্ন থাকে, তবে কোনো কোনো ফকীহ মনে করেন যে, যার গায়ে চিহ্ন রয়েছে তার অভিযোগ আগে শোনা হবে এবং অভিযোগের ধারাবাহিকতা বিবেচনা করা হবে না। তবে অধিকাংশ ফকীহগণের অভিমত হলো, যিনি আগে মামলা করেছেন আমির তার কথা শুনবেন। আর যিনি প্রথম আক্রমণ করেছেন তার অপরাধ হবে বড় এবং তার শাস্তিও হবে কঠোর। আমির দুই ব্যক্তির শাস্তির ক্ষেত্রে দুটি কারণে পার্থক্য করতে পারেন:

প্রথমত: অপরাধের ধরন ও সীমা লঙ্ঘনের পার্থক্যের ভিত্তিতে।

দ্বিতীয়ত: মর্যাদা ও আত্মসম্মানের পার্থক্যের ভিত্তিতে। আমির যদি নীচ ও লম্পটদের দমনের স্বার্থে তাদের জনসমক্ষে লাঞ্ছিত করা এবং তাদের অপরাধ ঘোষণা করাকে কল্যাণকর মনে করেন, তবে তার জন্য তা বৈধ। অপরাধের তদন্তকালে এবং দণ্ডবিধি প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে আমির ও কাযীর বিচারের ক্ষেত্রে পার্থক্যের দিকগুলো এগুলোই; কেননা আমিরের বৈশিষ্ট্য হলো শাসননীতি (সিয়াসা), আর কাযীর বৈশিষ্ট্য হলো বিচারিক বিধিবিধান (আহকাম)।

---

১ আল-মারদাভী বলেছেন: তালাকের মাধ্যমে শপথ করানো যাবে না। শায়খ তাকীউদ্দিন (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) চার ইমামের (আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন) মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে এটি উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে আব্দুল বার (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) একে ঐক্যমত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। [আল-ইনসাফ: ২১/ ১২৪]।

২ মুওয়াছাবাত: পারস্পরিক আক্রমণ বা হামলা। [আল-ফাইক, পৃষ্ঠা ৩৩৪]।

فصل:

وأما بعد ثبوت جرائمهم، فيستوي في إقامة الحدود عليهم أحوال الأمراء والقضاة، وثبوتها عليهم يكون من وجهين: إقرار وبينة، ولكل واحد منهما حكم يذكر في موضعه.

والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر به لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة، فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرًا من ألم العقوبة، وخيفة من نكال الفضيحة؛ ليكون ما حظر من محارمه ممنوعًا، وما أمر به من فروضه متبوعًا، فتكون المصلحة أعمّ والتكليف أتم، قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107] :

يعني في استنقاذهم من الجهالة، وإرشادهم من الضلالة، وكفِّهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة.

وإذا كان كذلك فالزواجر ضربان: حد وتعزيز:

فأما الحدود فضربان:

أحدهما: ما كان من حقوق الله تعالى.

والثاني: ما كان من حقوق الآدميين.

فأما المختصة بحقوق الله تعالى فضربان:

أحدهما: ما وجب في ترك مفروض.

والثاني: ما وجب في ارتكاب محظور، فأما ما وجب في ترك مفروض كتارك الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها يسأل عن تركه لها، فإن قال: لنسيان أمر بها قضاء في وقت ذكرها ولم ينتظر بها مثل وقتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من

نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها لا كفارة لها غير ذلك" 1. وإن تركها لمرض صلاها بحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع، قال الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] .

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة "597"، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة "684".

পরিচ্ছেদ:

তাদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর, তাদের ওপর দণ্ডবিধি (হুদুদ) প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমির ও বিচারকদের অবস্থা সমান। তাদের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ দুইভাবে হতে পারে: স্বীকৃতি এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ; আর এগুলোর প্রত্যেকটির বিধান যথাস্থানে আলোচিত হবে।

হুদুদ বা দণ্ডবিধি হলো মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এমন কিছু প্রতিবন্ধক বা সতর্ককারী বিধান, যা নিষিদ্ধ কার্যাবলি সম্পাদন এবং আদেশকৃত বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে। কেননা মানুষের লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তির তাড়না পরকালীন শাস্তির ধমককে ভুলিয়ে দিয়ে দুনিয়াবি নগদে ভোগের নেশায় মত্ত করে। তাই আল্লাহ তাআলা দণ্ডবিধির মাঝে এমন কিছু সতর্ককারী ব্যবস্থা রেখেছেন, যা অজ্ঞ ব্যক্তিকে শাস্তির যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার ভয়ে পাপ থেকে বিরত রাখে; যাতে তাঁর নিষিদ্ধ হারাম বিষয়গুলো থেকে মানুষ দূরে থাকে এবং তাঁর আদেশকৃত ফরজ বিষয়গুলো অনুসৃত হয়। এর ফলে জনকল্যাণ ব্যাপক হয় এবং শরিয়তের দায়বদ্ধতা পূর্ণতা পায়। মহান আল্লাহ বলেন: "আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।" [আল-আম্বিয়া: ১০৭] :

অর্থাৎ তাদেরকে অজ্ঞতা থেকে উদ্ধার করা, গোমরাহি থেকে হেদায়েতের পথে আনা, পাপাচার থেকে বিরত রাখা এবং আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে (এই রহমত প্রকাশ পায়)।

বিষয়টি যখন এমনই, তখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দুই প্রকার: নির্ধারিত দণ্ড (হদ) এবং বিবেচনাপ্রসূত দণ্ড (তা'যির):

নির্ধারিত দণ্ডবিধি আবার দুই প্রকার:

প্রথমত: যা আল্লাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয়ত: যা বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আল্লাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আবার দুই প্রকার:
প্রথমত: যা কোনো ফরজ বা আবশ্যকীয় বিধান ত্যাগের কারণে অবধারিত হয়।
দ্বিতীয়ত: যা কোনো নিষিদ্ধ কাজ করার কারণে অবধারিত হয়। ফরজ ত্যাগের কারণে যা অবধারিত হয়—যেমন ফরজ সালাত ত্যাগকারী, যে সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করেনি; তাকে সালাত ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি সে বলে: 'ভুলে যাওয়ার কারণে', তবে তাকে মনে পড়ার সাথে সাথেই তা কাজা করার নির্দেশ দেওয়া হবে এবং এজন্য পুনরায় ওয়াক্তের অপেক্ষা করতে হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে থাকে, তবে যখনই তার মনে পড়বে তখনই যেন সে তা আদায় করে নেয়; সেটিই তার সালাতের ওয়াক্ত, আর এর জন্য এটি ছাড়া অন্য কোনো কাফফারা নেই।" ১। আর যদি সে অসুস্থতার কারণে সালাত ছেড়ে থাকে, তবে সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী বসে বা শুয়ে সালাত আদায় করবে। মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ কোনো নফসকে তার সাধ্যাতীত কোনো দায়িত্ব দেন না।" [আল-বাকারা: ২৮৬]।

---

১ সহিহ: ইমাম বুখারি তাঁর 'সালাতের সময়' অধ্যায়ে (৫৯৭) এবং ইমাম মুসলিম তাঁর 'মসজিদ ও সালাতের স্থান' অধ্যায়ে (৬৮৪) এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 326)الأحكام السلطانية للماوردي

وإن تركها جاحدًا لوجوبها كان كافرًا، حكمه حكم المرتدِّ يقتل بالردة إذا لم يتب، وإن تركها استثقالًا لفعلها مع اعترافه بوجوبها، فقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يضرب في وقت كل صلاة ولا يقتل، قال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث: يصير بتركها كافرًا يقتل بالردة. وذهب الشافعي إلى أنه لا يكفر بتركها، ولا يقتل حدًّا، ولا يصير مرتدًّا، ولا يقتل إلَّا بعد الاستتابة، فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك وأمر بها، فإن قال: أصليها في منزلي وكلت إلى أمانته، ولم

يجبر على فعلها بمشهد من الناس، وإن امتنع من التوبة، ولم يجب إلى فعل الصلاة قتل بتركها في الحال على أحد القولين، وبعد ثلاثة أيام في القول الثاني، ويقتله بسيف صبرًا. وقال أبو العباس بن سريج1: يقتله ضربًا بالخشب حتى يموت ويعدل عن السيف الموحَّى؛ ليستدرك التوبة بتطاول المدى.

واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله بترك الصلوات الفوائت إذا امتنع من قضائها، فذهب بعضهم إلى أن قتله بها كالموقتات، وذهب آخرون إلى أنه لا يقتل بها لاستقرارها في الذمة بالفوات، ويصلَّى عليه بعد قتله، ويدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه منهم ويكون ماله لورثته.

فأما تارك الصيام فلا يقتل بإجماع الفقهاء، ويحبس عن الطعام والشراب مدة صيام شهر رمضان، ويؤدب تعزيزًا، فإن أجاب إلى الصيام ترك، ووكل إلى أمانته، فإن شوهد آكلًا عزِّر ولم يقتل.

وأما إذا ترك الزكاة فلا يقتل بها، وتؤخذ إجبارًا من ماله، ويعزَّر إن كتمها بغير شبهة، وإن تعذر أخذها لامتناعه حورب عليها، وإن أفضى الحرب إلى قتله حتى تؤخذ منه كما حارب أبو بكر الصديق مانعي الزكاة.

---

1 هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، الفقيه الشافعي؛ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في حقه في كتاب الطبقات: كان من عظماء الشافعيين، وأئمة المسلمين، وكان يقال له: الباز الأشهب، ولي القضاء بشيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي، حتى على المزني، وإنَّ فهرست كتبه كانت تشتمل على أربعمائة مصنَّف، وقام بنصرة مذهب الشافعي ورد على المخالفين، وفرع على كتب محمد بن الحسن الحنفي.

যদি কেউ সালাতের আবশ্যকতাকে অস্বীকার করে তা পরিত্যাগ করে, তবে সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। তার বিধান মুরতাদের বিধানের মতো; যদি সে তওবা না করে তবে তাকে মুরতাদ

হওয়ার কারণে হত্যা করা হবে। আর যদি সে এর আবশ্যকতা স্বীকার করা সত্ত্বেও অলসতাবশত সালাত ত্যাগ করে, তবে তার বিধান সম্পর্কে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা এই মত পোষণ করেছেন যে, তাকে প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তে প্রহার করা হবে কিন্তু হত্যা করা হবে না। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং একদল হাদিস বিশারদ বলেছেন: সালাত ত্যাগের মাধ্যমে সে কাফির হয়ে যাবে এবং তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। ইমাম শাফেঈ এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, সে সালাত ত্যাগের কারণে কাফির হবে না, তাকে হদ্দ হিসেবে হত্যা করা হবে না এবং সে মুরতাদও হবে না। তাকে কেবল তওবা করার আহ্বান জানানোর পরেই হত্যা করা হবে। যদি সে তওবা করে এবং সালাত আদায়ে সম্মত হয়, তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হবে। যদি সে বলে: 'আমি আমার বাড়িতে সালাত পড়ব', তবে বিষয়টি তার আমানতদারির ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে এবং জনসমক্ষে সালাত আদায়ে তাকে বাধ্য করা হবে না। আর যদি সে তওবা করতে অস্বীকার করে এবং সালাত আদায়ে রাজি না হয়, তবে দুই মতের একটি অনুযায়ী তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হবে, আর দ্বিতীয় মতানুযায়ী তিন দিন পর। তাকে তরবারির আঘাতে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হবে। আবু আল-আব্বাস ইবনে সুরাইজ বলেন: তাকে কাঠের লাঠি দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত প্রহার করা হবে এবং ধারালো তরবারির আঘাত বর্জন করা হবে; যাতে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণের মাধ্যমে সে তওবা করার সুযোগ পায়।

কাজা সালাত আদায় করতে অস্বীকার করলে সালাত ত্যাগের কারণে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব কি না, সে বিষয়ে শাফেঈ মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের কেউ কেউ মনে করেন, এ ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করার বিধান ওয়াক্তিয়া সালাতের মতোই। আবার অন্যেরা মনে করেন, এর জন্য তাকে হত্যা করা হবে না; কারণ সময় অতিবাহিত হওয়ার ফলে তা জিম্মায় (ঋণ হিসেবে) স্থির হয়ে গেছে। হত্যার পর তার জানাজা পড়া হবে এবং মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে; কারণ সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং তার সম্পদ তার উত্তরাধিকারীরা লাভ করবে।

পক্ষান্তরে সিয়াম পরিত্যাগকারীকে ফকিহগণের ঐকমত্যে হত্যা করা হবে না। রমজান মাসের সিয়ামের সময় তাকে পানাহার থেকে বিরত রেখে বন্দি রাখা হবে এবং তা'জির হিসেবে শাস্তি দেওয়া হবে। যদি সে সিয়াম পালনে সম্মত হয় তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং বিষয়টি তার আমানতদারির ওপর ন্যস্ত করা হবে। যদি তাকে প্রকাশ্যে আহার করতে দেখা যায়, তবে তাকে তা'জির প্রদান করা হবে কিন্তু হত্যা করা হবে না।

আর যদি কেউ জাকাত প্রদানে বিরত থাকে তবে তার জন্য তাকে হত্যা করা হবে না, বরং তার সম্পদ থেকে তা বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা হবে। যদি সে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই তা গোপন করে তবে তাকে তা'জির করা হবে। যদি তার বাধার কারণে জাকাত গ্রহণ করা অসম্ভব হয়, তবে এর জন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। এমনকি জাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ যদি তাকে হত্যা পর্যন্ত নিয়ে যায় (তবে তা বৈধ), যেমন আবু বকর সিদ্দিক (রা.) জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

---

১. তিনি হলেন আবু আল-আব্বাস আহমাদ বিন উমর বিন সুরাইজ, প্রখ্যাত শাফেঈ ফকিহ। শায়খ আবু ইসহাক আল-শিরাজি তাঁর সম্পর্কে 'তাবাকাত' গ্রন্থে বলেন: তিনি ছিলেন শাফেঈ মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং মুসলিমদের ইমামদের একজন। তাঁকে 'আল-বাজ আল-আশহাব' (শিকারী বাজপাখি) বলা হতো। তিনি শিরাজে কাজির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে ইমাম শাফেঈর সকল অনুসারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হতো, এমনকি মুজানী রহ.-এর ওপরেও। তাঁর কিতাবসমূহের তালিকায় চারশত রচনার উল্লেখ ছিল। তিনি শাফেঈ মাযহাবের সমর্থনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন করেন এবং মুহাম্মদ বিন হাসান আল-হানাফীর কিতাবসমূহের মাসয়ালাগুলোর বিশ্লেষণ প্রদান করেন।

(ص: 327)الأحكام السلطانية للماوردي

وأما الحجّ ففرضه عند الشافعي على التراخي ما بين الاستطاعة والموت، فلا يتصور على مذهبه تأخيره عن وقته، وهو عند أبي حنيفة على الفور، فيتصور على مذهبه تأخيره عن وقته، ولكنه لا يقتل به ولا يعزَّر عليه؛ لأنه يفعله بعد الوقت أداء لا قضاء، فإن مات قبل أدائه حج عنه من رأس ماله.

وأما الممتنع من حقوق الآدميين من ديون وغيرها فتؤخذ منه جبرًا إن أمكن، ويحبس بها إذا تعذّرت، إلّا أن يكون بها معسرًا، فينظر إلى ميسرة، فهذا حكم ما وجب بترك المفروضات.

واما ما وجب بارتكاب المحظورات فضربان:

أحدهما: ما كان من حقوق الله تعالى وهي أربعة: حد الزنا، وحد الخمر، وحد السرقة، وحد المحاربة.

والضرب الثاني: من حقوق الآدميين شيئان: حد القذف بالزنا، والقذف في الجنايات، وسنذكر كل واحد منهما مفصَّلًا.

আর হজ্জের বিধান হলো, ইমাম শাফিঈর মতে সামর্থ্য লাভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এটি আদায় করার অবকাশ রয়েছে; ফলে তাঁর মাযহাব অনুযায়ী হজ্জকে এর নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বিলম্বিত করা কল্পনা করা যায় না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফার মতে এটি অবিলম্বে আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং তাঁর মাযহাব মতে এটি সময় অতিবাহিত করে বিলম্ব করা সম্ভব, তবে এর কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না এবং কোনো শাসনমূলক শাস্তিও প্রদান করা হবে না; কারণ সে নির্ধারিত সময়ের পরে এটি 'আদা' হিসেবেই পালন করে, 'কাদা' হিসেবে নয়। যদি সে হজ্জ আদায়ের পূর্বে মারা যায়, তবে তার মূল সম্পদ থেকে তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা হবে।

আর মানুষের অধিকার যেমন ঋণ ও অন্যান্য বিষয় পরিশোধে কেউ অস্বীকৃতি জানালে, সম্ভব হলে তা তার থেকে বলপূর্বক আদায় করা হবে। আর যদি তা অসম্ভব হয় তবে তাকে কারারুদ্ধ করা হবে; তবে সে যদি নিঃস্ব হয়, তবে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া হবে। ফরয বিষয়সমূহ বর্জনের ক্ষেত্রে এটিই হলো বিধান।

আর নিষিদ্ধ কাজ করার কারণে যা অবধারিত হয় তা দুই প্রকার:

প্রথমটি হলো: যা মহান আল্লাহর হকের অন্তর্ভুক্ত এবং তা চারটি: যিনার হদ, মদ্যপানের হদ, চুরির হদ এবং ডাকাতির হদ।

দ্বিতীয় প্রকার: যা মানুষের হকের অন্তর্ভুক্ত এবং তা দুটি বিষয়: যিনার অপবাদ প্রদানের হদ এবং অপরাধের বিচার; আমরা এগুলোর প্রত্যেকটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

الفصل الأول: في حد الزنا

الزنا هو تغيب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجين من قُبُلٍ أو دُبُرٍ ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة، وجعل أبو حنيفة الزنا مختصًّا بالقُبُل دون الدبر، ويستوي في حد الزنا حكم الزاني والزانية، ولكل واحد منهما حالتان: بكر ومحصن، أما البكر فهو الذي لم يطأ زوجة بنكاح، فيحد إن كان حرًّا مائة سوط تفرق في جميع بدنه، إلَّا الوجه والمقاتل، ليأخذ كل عضو حقه، بسوط لا جديد فيقتل، ولا خلق فلا يؤلم، واختلف الفقهاء في تغريبه مع الجلد، فمنع منه أبو حنيفة اقتصارًا على جلده. وقال مالك: يغرَّب الرجل ولا تغرَّب المرأة، وأوجب الشافعي تغريبها عامًا عن بلدها إلى مسافة أقلها يوم وليلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" 1.

وحد الكافر والمسلم سواء عند الشافعي في الجلد والتغريب.

وأما العبد ومن جرى عليه حكم الرق من المدبّر والمكاتب وأم الولد، فحدهم في الزنا خمسون جلدة على النصف من الحر لنقصهم بالرق، واختلف في تغريب من رق منهم فقيل: لا يغرَّب لما في التغريب من الإضرار بسيده، وهو قول مالك، وقيل: يغرَّب عامًا كاملًا كالحر، وظاهر مذهب الشافعي أن يغرَّب نصف عام كالجلد في تنصيفه، وأما المحصن فهو الذي أصاب زوجته بنكاح صحيح، وحده الرجم بالأحجار، أو ما قام مقامها حتى يموت، ولا يلزم توفي مقاتله، بخلاف الجلد؛ لأنَّ المقصود بالرجم القتل، ولا يجلد مع الرجم. وقال داود: يجلد مائة سوط ثم يرجم، والجلد منسوخ في المحصن. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزًا ولم يجلده.

وليس الإسلام شرطًا في الإحصان، فيرجم الكافر كالمسلم، وقال أبو حنيفة: الإسلام شرط في الإحصان، فإذا زنى الكافر جلد ولم يرجم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا

---

1 صحيح: رواه مسلم في كتاب "1690"، وأبو داود في كتاب الحدود "1690"، والترمذي في كتاب الحدود "1434"، وابن ماجه في كتاب الحدود "2550"، وأحمد "22158".

প্রথম পরিচ্ছেদ: যিনার দণ্ডবিধি প্রসঙ্গে

যিনা হলো কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির দ্বারা এমন কোনো ব্যক্তির সম্মুখ বা পশ্চাৎপথে নিজ লিঙ্গমুণ্ড প্রবেশ করানো, যার সাথে তার কোনো বৈবাহিক সুরক্ষা নেই এবং যিনার কোনো সংশয়ও নেই। ইমাম আবু হানিফা যিনাকে কেবল সম্মুখপথের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন এবং পশ্চাৎপথের মিলনকে এর অন্তর্ভুক্ত করেননি। যিনার দণ্ডের ক্ষেত্রে ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারীর বিধান সমান। তাদের প্রত্যেকের দুটি অবস্থা রয়েছে: কুমার (অবিবাহিত) এবং মুহসান (বিবাহিত)। কুমার বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি। সে যদি স্বাধীন হয়, তবে তার দণ্ড (হদ) হলো একশত বেত্রাঘাত, যা তার শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হবে; তবে মুখমণ্ডল ও মরণাঘাত হতে পারে এমন স্থানসমূহ বাদ দেওয়া হবে, যেন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ তার প্রাপ্য পাওনা লাভ করে। বেত্রাঘাত এমন বেত দ্বারা হতে হবে যা একদম নতুন নয় যে মৃত্যু ঘটাতে পারে, আবার জীর্ণ বা পুরোনোও নয় যে কোনো যন্ত্রণা দেবে না। বেত্রাঘাতের সাথে নির্বাসনের ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা কেবল বেত্রাঘাতের ওপর সীমাবদ্ধ থেকে নির্বাসন দেওয়াকে নিষেধ করেছেন। ইমাম মালিক বলেন: পুরুষকে নির্বাসন দেওয়া হবে, কিন্তু নারীকে নির্বাসন দেওয়া হবে না। ইমাম শাফেয়ী নারীর জন্য তার নিজ শহর থেকে অন্তত একদিন ও একরাতের পথ সমপরিমাণ দূরত্বে এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া আবশ্যক করেছেন। এর স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হলো: "তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো, আল্লাহ তাদের জন্য পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন; কুমার ও কুমারীর ব্যভিচারে

একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন, আর বিবাহিত ও বিবাহিতার ব্যভিচারে একশত বেত্রাঘাত ও রজম (পাথর নিক্ষেপে মৃত্যু)।" ১।

বেত্রাঘাত ও নির্বাসনের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ীর নিকট অমুসলিম ও মুসলিমের বিধান সমান। আর দাস এবং যাদের ওপর দাসত্বের বিধান কার্যকর রয়েছে—যেমন মুদাব্বার, মুকাতাব ও উম্মে ওয়ালাদ—দাসত্বের কারণে তাদের মর্যাদা কম হওয়ায় যিনায় তাদের দণ্ড হলো স্বাধীনের অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। তাদের মধ্য হতে যারা দাস তাদের নির্বাসনের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে; বলা হয়েছে: তাদের নির্বাসন দেওয়া হবে না, কারণ এতে তার মুনিবের ক্ষতি হয়; এটি ইমাম মালিকের মত। আবার বলা হয়েছে: স্বাধীনের ন্যায় তাদের পূর্ণ এক বছর নির্বাসন দেওয়া হবে। তবে ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবের স্পষ্ট মত হলো, বেত্রাঘাত অর্ধেক হওয়ার ন্যায় তাদের অর্ধেক বছর নির্বাসন দেওয়া হবে। আর মুহসান (বিবাহিত) হলো সেই ব্যক্তি, যে সঠিক বিবাহের মাধ্যমে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। তার দণ্ড হলো পাথর বা তার সমজাতীয় বস্তু নিক্ষেপ করে মৃত্যু পর্যন্ত রজম করা। এক্ষেত্রে তার মরণাঘাতের স্থানগুলো বাঁচিয়ে চলা আবশ্যক নয়, যা বেত্রাঘাতের ক্ষেত্রে ভিন্ন ছিল; কারণ রজমের উদ্দেশ্যই হলো মৃত্যুদণ্ড। রজমের সাথে বেত্রাঘাত করা হবে না। দাউদ জাহেরি বলেন: প্রথমে একশত বেত্রাঘাত করা হবে এবং এরপর রজম করা হবে। তবে মুহসানের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতের বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়েজকে রজম করেছেন কিন্তু তাকে বেত্রাঘাত করেননি।

ইহসান বা বিবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম শর্ত নয়, তাই মুসলিমের ন্যায় অমুসলিমকেও রজম করা হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: ইহসানের জন্য ইসলাম একটি শর্ত, সুতরাং অমুসলিম যিনা করলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে কিন্তু রজম করা হবে না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজন ইহুদীকে রজম করেছিলেন যারা যিনা করেছিল।

---

১ সহীহ: এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম, কিতাব নম্বর ১৬৯০; আবু দাউদ, কিতাবুল হুদুদ, ১৬৯০; তিরমিযী, কিতাবুল হুদুদ, ১৪৩৪; ইবনে মাজাহ, কিতাবুল হুদুদ, ২৫৫০; এবং আহমাদ, ২২১৫৮।

ولا يرجم إلّا محصنًا، فأمَّا الحرية فهي من شروط الإحصان، فإذا زنى العبد لم يرجم، وإن كان ذا زوجة جلد خمسين، وقالد داود: يرجم كالحر. واللواط وإتيان البهائم زنًا يوجب جلد البكر، ورجم المحصن، وقيل: بل يوجب قتل البكر والمحصن. وقال أبو حنيفة: لا حدَّ فيها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اقتلوا البهيمة ومن أتاها" 1.

وإذا زنى البكر بمحصنة أو المحصن بالبكر جُلِدَ البكر منهما ورُجِمَ المحصن، وإذا عاود الزنا بعد الحد حدَّ، وإذا زنى مرارًا قبل الحدِّ حد للجميع حدًّا واحدًا.

والزنا يثبت بأحد أمرين: إمَّا بإقرار أو بينة.

فأما الإقرار: فإذا أقرَّ البالغ العاقل بالزنا مرة واحدة طوعًا أقيم عليه الحد. وقال أبو حنيفة: لا آخذه حتى يقرَّ أربع مرات، وإذا وجب الحد عليه بإقراره، ثم رجع عنه قبل الجلد سقط عند الحد. وقال أبو حنيفة: لا يسقط الحد برجوعه عنه.

وأما البينة: فهو أن يشهد عليه بفعل الزنا أربعة رجال عدول لا امرأة فيهم، يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكره في الفرج كدخول المرود في المكحلة، فإن لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة فليست شهادة، فإذا قاموا بالشهادة على حقها مجتمعين أو متفرقين قبلت شهادتهم.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا أقبلها إذا تفرقوا في الأداء وأجعلهم قذفة. وإذا شهدوا بالزنا بعد سنة أو أكثر سمعت شهادتهم. وقال أبو حنيفة: لا أسمعها بعد سنة وأجعلهم قذفة، وإذا لم يكمل شهود الزنا أربعة فهم قذفة يُحَدُّون في أحد القولين ولا يحدون في الثاني. وإذا شهدت البينة على إقراره بالزنا جاز الاقتصار على شاهدين في أحد القولين. ولا يجوز في القول الثاني أقلّ من أربعة، وإذا رجم الزاني بالبينة

حفرت له بئر عند رجمه ينزل فيها إلى وسطه يمنعه من الهرب، فإن هرب أتبع، ورُجِمَ حتى يموت، وإن رجم بإقراره لم تحفر له، وإن هرب لم يتبع.

ويجوز للإمام أو من حكم برجمه من الولاة أن يحضر رجمه، ويجوز أن لا يحضر.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلّا بحضور من حكم برجمه؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اغد يا أنيس على هذه

---

1 حسن صحيح: رواه أبو داود في كتاب الحدود "4464"، والترمذي في كتاب الحدود "1455"، وابن ماجه في كتاب الحدود "2564"، وأحمد "2416"، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح.

বিবাহিত (মুহসান) ব্যতীত কাউকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা (রজম) করা যাবে না। আর স্বাধীন হওয়া হলো মুহসান হওয়ার অন্যতম শর্ত। সুতরাং কোনো দাস যদি ব্যভিচার করে, তবে তাকে রজম করা হবে না; যদিও সে বিবাহিত হয়, তবুও তাকে পঞ্চাশটি দোররা মারা হবে। আর দাউদ (আল-জাহিরি) বলেছেন: তাকে স্বাধীনের মতোই রজম করা হবে। সমকামিতা ও পশুর সাথে মৈথুনও ব্যভিচার হিসেবে গণ্য, যা অবিবাহিতের ক্ষেত্রে দোররা এবং বিবাহিতের ক্ষেত্রে রজমের বিধান আবশ্যক করে। কেউ কেউ বলেছেন: বরং এটি অবিবাহিত ও বিবাহিত উভয়ের ক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ড আবশ্যক করে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: এতে কোনো নির্ধারিত হদ (শাস্তি) নেই। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "তোমরা পশুকে হত্যা করো এবং যে ব্যক্তি তার সাথে এই কাজ করেছে তাকেও।"
১
যদি কোনো অবিবাহিত ব্যক্তি কোনো বিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার করে অথবা কোনো বিবাহিত ব্যক্তি অবিবাহিতের সাথে ব্যভিচার করে, তবে তাদের মধ্যে অবিবাহিতকে দোররা মারা হবে এবং বিবাহিতকে রজম করা হবে। যদি হদ কার্যকর করার পর সে পুনরায় ব্যভিচার করে, তবে তাকে আবার হদ প্রদান করা হবে। আর যদি হদ কার্যকর করার আগে বারবার ব্যভিচার করে, তবে সবার জন্য একটি হদই যথেষ্ট হবে।
ব্যভিচার দুটি বিষয়ের যেকোনো একটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়: হয় স্বীকৃতির মাধ্যমে, না হয় সাক্ষ্যের মাধ্যমে।

স্বীকৃতির বিষয়টি হলো: যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বেচ্ছায় একবার ব্যভিচারের স্বীকৃতি দেয়, তবে তার ওপর হদ কায়েম করা হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: আমি তাকে শাস্তি দেব না যতক্ষণ না সে চারবার স্বীকৃতি প্রদান করে। আর যদি তার স্বীকৃতির কারণে হদ আবশ্যক হয় এবং দোররা মারার আগে সে তা থেকে ফিরে আসে (স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে), তবে হদ রহিত হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: স্বীকৃতি প্রত্যাহারের মাধ্যমে হদ রহিত হবে না।

আর সাক্ষ্যের বিষয়টি হলো: ব্যভিচারের সপক্ষে চারজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষ্য প্রদান করবে, যাদের মধ্যে কোনো নারী থাকবে না। তারা উল্লেখ করবে যে, তারা জননেন্দ্রিয়ের প্রবেশ প্রত্যক্ষ করেছে যেভাবে সুরমাদানি বা কাজলদানিতে শলাকা প্রবেশ করে। যদি তারা এই বিশেষ পন্থায় প্রত্যক্ষ না করে, তবে তা সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হবে না। যদি তারা যথাযথভাবে একত্রে বা পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক বলেছেন: তারা যদি পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষ্য দেয় তবে আমি তা গ্রহণ করব না এবং তাদেরকে অপবাদকারী (কাযেফ) হিসেবে গণ্য করব। যদি তারা এক বছর বা তার বেশি সময় পর ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য শোনা হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: আমি এক বছর পর তাদের সাক্ষ্য শুনব না এবং তাদেরকে অপবাদকারী হিসেবে গণ্য করব। আর যদি ব্যভিচারের সাক্ষীর সংখ্যা চারজন পূর্ণ না হয়, তবে তারা অপবাদকারী হিসেবে গণ্য হবে; দুই মতের একটি অনুযায়ী তাদের ওপর হদ প্রয়োগ করা হবে এবং দ্বিতীয় মত অনুযায়ী হদ প্রয়োগ করা হবে না। যদি সাক্ষীরা তার ব্যভিচারের স্বীকৃতির ওপর সাক্ষ্য দেয়, তবে দুই মতের একটি অনুযায়ী দুজন সাক্ষীই যথেষ্ট। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী চারজনের কম গ্রহণযোগ্য নয়। যখন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ব্যভিচারীকে রজম করা হবে, তখন তার জন্য একটি গর্ত খনন করা হবে যেখানে সে তার কোমর পর্যন্ত থাকবে যাতে সে পালাতে না পারে। যদি সে পালিয়ে যায় তবে তাকে অনুসরণ করা হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত রজম করা হবে। আর যদি স্বীকৃতির ভিত্তিতে রজম করা হয়, তবে তার জন্য গর্ত খনন করা হবে না এবং সে পালিয়ে গেলে তাকে অনুসরণ করা হবে না।

ইমাম বা শাসকদের মধ্য থেকে যিনি রজমের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর উপস্থিত থাকা জায়েজ, আবার উপস্থিত না থাকাও জায়েজ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: যিনি রজমের নির্দেশ

দিয়েছেন তাঁর উপস্থিতি ব্যতিরেকে এটি জায়েজ নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "হে উনাইস! তুমি এই মহিলার কাছে যাও..."

---

১ হাসান সহীহ: এটি আবু দাউদ 'কিতাবুল হুদুদ' (৪৪৬৪), তিরমিযী 'কিতাবুল হুদুদ' (১৪৫৫), ইবনে মাজাহ 'কিতাবুল হুদুদ' (২৫৬৪) এবং আহমাদ (২৪১৬) বর্ণনা করেছেন। শেখ আলবানী বলেছেন: হাসান সহীহ।

(ص: 330)الأحكام السلطانية للماوردي

المرأة فإن اعترفت فارجمها" 1.

ويجوز أن لا يحضر الشهود رجمه. وقال أبو حنيفة: يجب حضورهم وأن يكونوا أول من يرجمه؛ ولا تحدّ حامل حتى تضع، ولا بعد الوضع حتى يوجد لولدها مرضع إذا ادَّعى في الزنا شبهة محتملة من نكاح فاسد، أو اشتبهت عليه بزوجته، أو جهل تحريم الزنا وهو حديث الإسلام درئ بها عند الحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود بالشبهات"2.

وقال أبو حنيفة: إذا اشتبهت عليه الأجنبية لزوجته لم يكن ذلك شبهة له وحد من أصابها، وإذا أصاب ذات محرم بعقد نكاح حد، ولا يكون العقد مع تحريمها بالنص شبهة في درء الحد؛ وجعله أبو حنيفة شبهة يسقط بها الحد عنه. وإذا تاب الزاني بعد القدرة عليه لم يسقط عند الحد، ولو تاب قبل القدرة عليه يسقط عند الحد في أظهر القولين، قال الله تعالى: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: 119] .

وفي قوله: {بِجَهَالَةٍ} تأويلان: أحدهما: بجهالة سوء.

والثاني: لغلبة الشهوة مع العلم بأنَّها سوء وهذا أظهر التأويلين، ولكن من جهل بأنها سوء لم يأثم بها، ولا تحل لأحد أن يشفع في إسقاط حد عن زانٍ ولا غيره، ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه، قال الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [النساء: 85] .

وفي الحسنة والسيئة ثلاث تأويلات:

أحدها: أن الشفاعة الحسنة التماس الخير لمن يشفع له، والشفاعة السيئة التماس الشر له، وهذا قول الحسن ومجاهد.

والثاني: أنَّ الحسنة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والسيئة الدعاء عليهم.

والثالث: وهو محتمل، أنَّ الحسنة تخليصه من الظلم والسيئة دفعه عن الحق.

وفي الكفل تأويلان:

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب الوكالة "2315"، ومسلم في كتاب الحدود "1698".

2 ضعيف: ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع "258".

"...সেই নারী; যদি সে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তবে তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড) করো।" ১।

রজমের সময় সাক্ষীদের অনুপস্থিত থাকা বৈধ। তবে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: তাদের উপস্থিত থাকা ওয়াজিব এবং তাদেরকেই সর্বপ্রথম পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। কোনো গর্ভবতী নারীকে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত দণ্ড প্রদান করা যাবে না, এমনকি প্রসবের পরেও নয় যতক্ষণ না তার সন্তানের জন্য কোনো দুগ্ধদাত্রী পাওয়া যায়। যদি ব্যভিচারের ক্ষেত্রে কোনো গ্রহণযোগ্য সংশয় প্রকাশ করা হয়—যেমন ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ) বিবাহ, অথবা ভুলবশত পরনারীকে নিজ স্ত্রী মনে করা, কিংবা ব্যভিচার হারাম হওয়ার বিষয়টি তার অজানা থাকা এবং সে ইসলামে নতুন হওয়া—তবে এসব সংশয়ের কারণে দণ্ড মওকুফ করা হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা সংশয় বা সন্দেহের দ্বারা দণ্ডবিধিগুলো প্রতিহত করো।" ২।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: যদি কেউ কোনো পরনারীকে নিজ স্ত্রী ভেবে ভুল করে, তবে সেটি তার জন্য সংশয় হিসেবে গণ্য হবে না এবং তাকে দণ্ড প্রদান করা হবে। আর যদি কেউ কোনো মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ) নারীকে বিবাহ চুক্তির মাধ্যমে সঙ্গম করে, তবে তাকে দণ্ড দেওয়া হবে; নস (সুস্পষ্ট ধর্মীয় পাঠ) দ্বারা হারাম হওয়ার কারণে উক্ত বিবাহ চুক্তি দণ্ড মওকুফের ক্ষেত্রে সংশয় হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে ইমাম আবু হানিফা একে সংশয় হিসেবে গণ্য করেছেন যার মাধ্যমে দণ্ড রহিত হয়ে যায়। ব্যভিচারীকে পাকড়াও করার পর যদি সে তাওবা করে, তবে দণ্ড মওকুফ হবে না; কিন্তু পাকড়াও করার পূর্বে তাওবা করলে দণ্ড মওকুফ হয়ে যাবে—এটিই অধিকতর স্পষ্ট অভিমত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {অতঃপর যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, তারপর তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক এরপর তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু} [আন-নাহল: ১১৯]।

তাঁর বাণী {অজ্ঞতাবশত} এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে: প্রথমটি: মন্দ কাজটির পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞতা।

দ্বিতীয়টি: বিষয়টি মন্দ জেনেও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় তা করা; আর এটিই অধিকতর স্পষ্ট ব্যাখ্যা। তবে যে ব্যক্তি এটি মন্দ হওয়া সম্পর্কেই অবগত নয়, সে এতে পাপী হবে না। কোনো ব্যভিচারী বা অন্য কারো দণ্ড রহিত করার ব্যাপারে সুপারিশ করা কারো জন্য বৈধ নয়, আর যার কাছে সুপারিশ করা হয় তার জন্যও তা গ্রহণ করা বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {যে ব্যক্তি ভালো কাজের সুপারিশ করবে সে তার একটি অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ কাজের সুপারিশ করবে সে তার পাপের একটি অংশ পাবে} [আন-নিসা: ৮৫]।

উত্তম (হাসানাহ) এবং মন্দ (সাইয়্যিআহ) সুপারিশের ক্ষেত্রে তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

প্রথমটি: উত্তম সুপারিশ হলো যার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে তার কল্যাণ কামনা করা, আর মন্দ সুপারিশ হলো তার অকল্যাণ কামনা করা। এটি হাসান এবং মুজাহিদের উক্তি।

দ্বিতীয়টি: উত্তম হলো মুমিন নর-নারীদের জন্য দোয়া করা এবং মন্দ হলো তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করা।

তৃতীয়টি: এটিও সম্ভাব্য যে, উত্তম হলো কাউকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং মন্দ হলো তাকে ন্যায়বিচার বা হক থেকে বিচ্যুত করা।

'কিফল' (অংশ বা বোঝা) শব্দটির দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

---

১. সহীহ: বুখারী 'ওয়াকালাহ' অধ্যায় (২৩১৫) এবং মুসলিম 'হুদুদ' অধ্যায় (১৬৯৮) বর্ণনা করেছেন।
২. যঈফ: শেখ আলবানী 'যঈফুল জামে' (২৫৮) গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।

(ص: 331)الأحكام السلطانية للماوردي

أحدهما: الإثم، وهو قول الحسن.
والثاني: أنه النصيب، وهو قول السدي1.

---

1 هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب السدي، الإمام أبو محمد السدي الكبير، الحجازي ثم الكوفي، الأعور المفسر راوي قريش، روى عن أنس بن مالك وابن عباس وعبد خير الهمداني ومصعب بن سعد وأبي صالح باذام وأبي عبد الرحمن السلمي ومرة الطيب وخلق، ورأى أبا هريرة والحسن بن علي رضي الله عنه، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال النسائي: صالح الحديث، وقال القطان: لا بأس به، وقال أحمد: مقارب الحديث. وقال مرة: ثقة، وقال ابن معين: ضعيف، وقال أبو زرعة: لين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال ابن عدي: هو عندي صدوق. قيل: إنه كان عظيمًا.

প্রথমটি: পাপ; এটি হাসানের বক্তব্য।
দ্বিতীয়টি: এটি হলো অংশ বা হিস্যা; এটি সুদ্দী-এর বক্তব্য।১

---

১ তিনি হলেন ইসমাইল ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবি যুয়াইব আস-সুদ্দী, ইমাম আবু মুহাম্মদ আস-সুদ্দী আল-কাবীর; তিনি প্রথমে হিজাজি ও পরবর্তীতে কুফি নিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন একচক্ষুবিশিষ্ট মুফাসসির ও কুরাইশ বংশীয় বর্ণনাকারী। তিনি আনাস ইবনে মালিক,

ইবনে আব্বাস, আবদ খাইর আল-হামদানি, মুসআব ইবনে সাদ, আবু সালিহ বাযাম, আবু আবদুর রহমান আস-সুলামি, মুররাহ আত-তৈয়িব এবং আরও অনেকের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু হুরায়রা ও হাসান ইবনে আলীকে (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) দেখেছেন। ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ বলেন: 'তাঁর বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য'; আল-কাত্তান বলেন: 'তাঁর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই'; আহমদ বলেন: 'তাঁর হাদিস গ্রহণযোগ্যতার নিকটবর্তী'। মুররাহ বলেন: 'নির্ভরযোগ্য'; ইবনে মাঈন বলেন: 'দুর্বল'; আবু যুরআহ বলেন: 'শিথিল'; আবু হাতিম বলেন: 'তাঁর হাদিস লিখে রাখা যায়'; ইবনে আদি বলেন: 'আমার নিকট তিনি সত্যবাদী'। বলা হয় যে, তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

(ص: 331)الأحكام السلطانية للماوردي

الفصل الثاني: في قطع السرقة

كل مال محرز بلغت قيمته نصابًا إذا سرقه بالغ عاقل لا شبهة له في المال ولا في حرزه قطعت يده اليمني من مفصل الكوع، فإن سرق ثانية بعد قطعه، إما من ذلك المال بعد إحرازه، أو من غيره، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، فإن سرق ثالثة قال أبو حنيفة: لا يقطع فيها، وعند الشافعي تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وإن سرق خامسة عزّر ولم يقتل، وإن سرق مرارًا قبل القطع فليس عليه إلّا قطع واحد.

واختلف الفقهاء في قدر النصاب الذي تقطع فيه اليد، فذهب الشافعي إلى أنه مقدَّر بما تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدًا من غالب الدنانير الجيدة. وقال أبو حنيفة: هو مقدر بعشرة دراهم أو دينار، ولا يقطع في أقلّ منه. وقدَّره إبراهيم النخعي بأربعين

درهمًا أو أربعة دنانير، وقدره ابن أبي ليلى بخمسة دراهم، وقدره مالك بثلاثة دراهم، قال داود: يقطع في الكثير والقليل من غير تقدير.

واختلف الفقهاء في المال الذي تقطع فيه اليد، فذهب الشافعي إلى أنه يقطع في كل مال حرم على سارقه. وقال أبو حنيفة: لا يقطع فيما كان أصله مباحًا كالصيد والحطب والحشيش، وعند الشافعي يقطع فيه بعد تملكه، وقال أبو حنيفة: لا يقطع في الطعام الرطب، وعند الشافعي يقطع فيه. وقال أبو حنيفة: لا يقطع سارق المصحف، وعند الشافعي يقطع. وقال أبو حنيفة: لا يقطع إذا سرق من قناديل المسجد أو أستار الكعبة، وعند

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: চুরির দণ্ড প্রসঙ্গে

সুরক্ষিত স্থানে রাখা প্রত্যেক মাল যার মূল্য নেসাব পরিমাণ পৌঁছেছে, যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা চুরি করে এবং সেই মাল বা তার সংরক্ষণের স্থানে তার কোনো অধিকার বা অস্পষ্টতা (শুবহা) না থাকে, তবে তার ডান হাত কবজি থেকে কেটে ফেলা হবে। যদি সে একবার হাত কাটার পর দ্বিতীয়বার চুরি করে, চাই তা সেই মাল পুনরায় সংরক্ষণের পর চুরি করা হোক বা অন্য কোনো মাল হোক, তবে তার বাম পা গোড়ালি থেকে কেটে ফেলা হবে। যদি সে তৃতীয়বার চুরি করে, তবে ইমাম আবু হানিফা বলেন: এতে আর কোনো অঙ্গ কাটা হবে না; কিন্তু ইমাম শাফিঈর মতে, তৃতীয়বার চুরিতে তার বাম হাত এবং চতুর্থবার চুরিতে তার ডান পা কাটা হবে। আর যদি সে পঞ্চমবার চুরি করে, তবে তাকে তা'যীর (শিক্ষামূলক শাস্তি) প্রদান করা হবে, কিন্তু হত্যা করা হবে না। আর যদি দণ্ড কার্যকর করার আগে সে কয়েকবার চুরি করে থাকে, তবে তার ওপর কেবল একবারই অঙ্গচ্ছেদের দণ্ড প্রয়োগ করা হবে।

চুরির দণ্ডে হাত কাটার জন্য নেসাবের পরিমাণের ক্ষেত্রে ফকিহগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফিঈর অভিমত হলো, এর পরিমাণ প্রচলিত উৎকৃষ্ট মানের দিনারের এক-চতুর্থাংশ বা তার বেশি মূল্যের সমপরিমাণ। ইমাম আবু হানিফা বলেন: এর পরিমাণ দশ দিরহাম বা এক দিনার, এর কম মূল্যের কিছু চুরিতে হাত কাটা হবে না। ইবরাহীম নাখঈ এর পরিমাণ চল্লিশ দিরহাম বা চার দিনার নির্ধারণ করেছেন; ইবনে আবী লায়লা পাঁচ দিরহাম এবং ইমাম মালিক তিন দিরহাম নির্ধারণ করেছেন। দাউদ বলেন: কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়াই কম-বেশি সব ধরণের চুরিতেই হাত কাটা হবে।

হাত কাটার দণ্ড প্রযোজ্য হওয়ার মতো মালের বিষয়ে ফকিহগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফিঈ মনে করেন, চোরের জন্য নিষিদ্ধ এমন সব ধরণের মাল চুরির ক্ষেত্রেই হাত কাটা হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: যা মূলত সবার জন্য বৈধ (মুবাহ), যেমন—শিকারলব্ধ পশু, কাঠ ও ঘাস, তা চুরিতে হাত কাটা হবে না; কিন্তু ইমাম শাফিঈর মতে, এগুলো কারো মালিকানাধীন হওয়ার পর চুরি করলে হাত কাটা হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: পচনশীল খাবারের ক্ষেত্রে হাত কাটা হবে না, কিন্তু ইমাম শাফিঈর মতে এতেও হাত কাটা হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: পবিত্র কুরআন চোরের হাত কাটা হবে না, কিন্তু ইমাম শাফিঈর মতে কাটা হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: যদি কেউ মসজিদের প্রদীপসমূহ বা কাবার গিলাফ চুরি করে, তবে তার হাত কাটা হবে না; আর ইমাম শাফিঈর নিকট...

(ص: 332)الأحكام السلطانية للماوردي

الشافعي يقطع. وإذا سرق عبد صغير لا يعقل أو أعجمي لا يفهم قطع عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يقطع. ولو سرق صبي صغير لم يقطع، وقال مالك: يقطع.

واختلف الفقهاء في الحرز، فشذَّ عنهم داود ولم يعتبره، وقطع كل سارق من حرز [أو من غير حرز، وذهب جمهورهم إلى اعتبار الحرز في وجوب القطع، وأنه لا قطع على من سرق من غير حرز، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا قطع في حريسة الخيل حتى تولي إلى معاقلها". وهكذا لو استعار فجحد لم يقطع، وقال أحمد بن حنبل: يقطع، واختلف في جعل الحرز شرطًا في صفته، فسوى أبو حنيفة بين الأحراز في كل الأموال، وجعل حرز أقل الأموال حرز أجلها، والأحراز عند الشافعي تختلف باختلاف الأموال اعتبارًا بالعرف فيها.

فيخف الحرز فيما قلَّت قيمته من الخشب والحطب، ويغلظ ويشتد فيما كثرت قيمته من الذهب والفضة، فلا يجعل حرز الفضة والذهب، فيقطع سارق الخشب منه، ولا

يقطع سارق الذهب والفضه منه، ويقطع نباش القبور إذا سرق أكفان موتاها؛ لأن القبور أحراز لها في العرف، وإن لم تكن أحرازًا لغيرها من الأموال. وقال أبو حنيفة: لا يقطع النباش؛ لأنَّ القبر ليس بحرز لغير الكفن. وإذا شد الرجل متاعه على بهيمة سائرة كما جرت العادة بمثله فسرق سارق من المتاع ما بلغت قيمته ربع دينار قطع؛ لأنه سارق من حرز، ولو سرق البهيمة وما عليها لم يقطع؛ لأنه سرق الحرز والمحروز، ولو سرق إناء من فضة أو ذهب قطع، وإن كان استعماله محظورًا؛ لأنه مال مملوك، سواء كان فيه طعام أو لم يكن. وقال أبو حنيفة: إن كان في الإناء المسروق طعام أو شراب أو ماء مشروب فشربه لم يقطع، ولو أفرغ الإناء من الطعام والشراب ثم سرقه قطع. وإذا اشترك اثنان في نقب الحرز، ثم انفرد أحدهما بأخذ المال قطع المنفرد منهما بالأخذ دون المشارك في النقب، ولو اشترك اثنان فنقب أحدهما ولم يأخذ، وأخذ الآخر ولم ينقب، لم يقطع واحد منهما، وفي مثلها قال الشافعي: اللص الظريف لا يقطع. وإذا دخل الحرز واستهلك المال فيه غرم ولم يقطع، وإذا قطع السارق والمال باقٍ رد على مالكه، فإن عاد السارق بعد قطعه فسرق ثانية بعد إحرازه قطع. وقال أبو حنيفة: لا يقطع في مال مرتين، وإذا استهلك السارق] 1.

---

1 هذه الجزئية سقط في بعض النسخ.

ইমাম শাফিঈ হস্তকর্তনের বিধান দেন। যদি এমন কোনো অল্পবয়স্ক দাস চুরি করে যার বুদ্ধি পরিপক্ক হয়নি অথবা এমন কোনো অনারব ব্যক্তি চুরি করে যে কিছুই বোঝে না, তবে ইমাম শাফিঈর মতে তার হস্তকর্তন করা হবে। ইমাম আবু হানীফা বলেন: তার হাত কাটা হবে না। আর যদি কোনো ছোট শিশু চুরি করে তবে তার হাত কাটা হবে না; কিন্তু ইমাম মালিক বলেন: তার হাত কাটা হবে।

ফকীহগণ 'হির্জ' (নিরাপদ বেষ্টনী)-এর বিষয়ে মতভেদ করেছেন। দাউদ (জাহেরী) তাঁদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন এবং একে (হস্তকর্তনের শর্ত হিসেবে) গণ্য করেননি। তিনি

হির্জ বা হির্জ ছাড়া যেকোনো স্থান থেকে চুরি করা প্রত্যেক চোরের হস্তকর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে জুমহুর (অধিকাংশ) ফকীহ হস্তকর্তন ওয়াজিব হওয়ার জন্য হির্জ-এর উপস্থিতিকে শর্ত হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং হির্জ ছাড়া অন্য কোথাও থেকে চুরি করলে হস্তকর্তন নেই বলে মত দিয়েছেন। নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "আস্তাবলে ফিরিয়ে আনা পর্যন্ত ঘোড়া চুরির ক্ষেত্রে কোনো হস্তকর্তন নেই।" তদ্রূপ যদি কেউ কোনো বস্তু ধার নিয়ে তা অস্বীকার করে, তবে তার হাত কাটা হবে না; কিন্তু ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন: তার হাত কাটা হবে। হির্জ-এর গুণগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এটি শর্ত হওয়ার বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা সকল সম্পদের হির্জের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করেছেন এবং নিম্নমানের সম্পদের হির্জকে উচ্চমানের সম্পদের হির্জের ন্যায় গণ্য করেছেন। আর ইমাম শাফিঈর মতে, প্রচলিত প্রথা (উরফ) অনুযায়ী সম্পদের ভিন্নতার কারণে হির্জও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

কাঠ বা জ্বালানি কাঠের মতো কম মূল্যের জিনিসের হির্জ বা সংরক্ষণ ব্যবস্থা শিথিল হয়ে থাকে; কিন্তু সোনা-রুপার মতো উচ্চমূল্যের সম্পদের ক্ষেত্রে হির্জ অত্যন্ত মজবুত ও কঠোর হওয়া জরুরি। সুতরাং সোনা-রুপার হির্জকে কাঠের হির্জের সমতুল্য করা হবে না। ফলে যদি কেউ কাঠের হির্জ থেকে কাঠ চুরি করে তবে তার হাত কাটা হবে, কিন্তু (উক্ত স্থানটি হির্জ না হওয়ার কারণে) সেখান থেকে সোনা-রুপা চুরি করলে তার হাত কাটা হবে না। কবরের কাফন চুরিকারী বা 'নাব্বাশ'-এর হস্তকর্তন করা হবে যদি সে মৃত ব্যক্তির কাফন চুরি করে; কারণ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কবর হলো কাফনের জন্য হির্জ, যদিও অন্য কোনো সম্পদের জন্য কবর হির্জ হিসেবে গণ্য নয়। ইমাম আবু হানীফা বলেন: নাব্বাশ-এর হস্তকর্তন করা হবে না; কারণ কবর কাফন ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর জন্য হির্জ নয়। যদি কোনো ব্যক্তি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী চলন্ত পশুর পিঠে তার আসবাবপত্র বেঁধে রাখে এবং কোনো চোর সেখান থেকে এক চতুর্থাংশ দিনার সমমূল্যের মাল চুরি করে, তবে তার হাত কাটা হবে; কারণ সে হির্জ থেকেই চুরি করেছে। কিন্তু যদি সে পশুটি এবং তার পিঠের মালামালসহ পুরোটাই চুরি করে, তবে তার হাত কাটা হবে না; কারণ সে হির্জ এবং সংরক্ষিত বস্তু (মাহরুজ) উভয়টিই একত্রে চুরি করেছে। যদি কেউ সোনা বা রুপার পাত্র চুরি করে, তবে তার হাত কাটা হবে—যদিও সেই পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ; কারণ এটি মালিকানাধীন সম্পদ, চাই তাতে খাবার থাকুক বা না থাকুক। ইমাম আবু হানীফা বলেন: যদি চুরি করা পাত্রটিতে কোনো খাবার, পানীয় বা পানযোগ্য পানি থাকে এবং চোর তা পান করে ফেলে, তবে তার হাত কাটা হবে না। কিন্তু যদি সে পাত্র থেকে খাবার বা

পানীয় খালি করার পর সেটি চুরি করে, তবে তার হাত কাটা হবে। যদি দুইজন ব্যক্তি হির্জ-এ সিঁধ কাটতে শরিক হয় এবং পরবর্তীতে তাদের একজন এককভাবে সম্পদ হস্তগত করে, তবে কেবল সেই গ্রহণকারীর হাত কাটা হবে, সিঁধ কাটায় শরিক ব্যক্তির নয়। আবার যদি দুইজন শরিক হয় এবং একজন সিঁধ কাটে কিন্তু মাল না নেয়, আর অন্যজন সিঁধ না কেটে কেবল মাল নিয়ে যায়, তবে তাদের কারোরই হাত কাটা হবে না। এ জাতীয় ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ বলেছেন: চতুর চোরের হাত কাটা যায় না। যদি কেউ হির্জ-এ প্রবেশ করে সেখানে সম্পদটি বিনষ্ট করে ফেলে, তবে তাকে জরিমানা দিতে হবে কিন্তু হাত কাটা হবে না। যদি চোরের হাত কাটা হয় এবং সম্পদটি অবশিষ্ট থাকে, তবে তা মালিককে ফেরত দেওয়া হবে। যদি চোর তার হস্তকর্তনের পর পুনরায় সেই মাল সংরক্ষিত থাকা অবস্থায় দ্বিতীয়বার চুরি করে, তবে আবার তার হাত কাটা হবে। ইমাম আবু হানীফা বলেন: একই সম্পদের জন্য দুইবার হস্তকর্তন করা হবে না। আর যদি চোর তা বিনষ্ট করে ফেলে] ১।

---

১ এই অংশটি কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে বাদ পড়েছে।

ما سرقه قطع وأغرم.

وقال أبو حنيفة: إن قطع لم يغرم، وإن أغرم لم يقطع. وإذا وهبت له السرقة لم يسقط عنه القطع. وقال أبو حنيفة: يسقط، وإذا عفا رب المال عن القطع لم يسقط. قد عفا صفوان بن أمية عن سارق ردائه فقال صلى الله عليه وسلم: "لا عفا الله عنِّي إن عفوت" وأمر بقطعه.

وحكي أن معاوية أتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم، فقدم ليقطع فقال من [الطويل] :

يميني أمير المؤمنين أعيذها ... بعفوك أن تلقى نكالًا يبينها

يدي كانت الحسناء لو تمَّ سترها ... ولا تقدم الحسناء عيبًا يشينها
فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة ... إذا ما شمال فارقتها يمينها
فقال معاوية: كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك؟ فقالت أم السارق: اجعلها من جملة ذنوبك التي تتوب إلى الله منها، فخلّى سبيله. فكان أوّل حد ترك في الإسلام.
ويستوي في قطع السرقة الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم والكافر، ولا يقطع صبي، ولا يقطع المغمى عليه إذا سرق في إغمائه، ولا يقطع عبد سرق من مال سيده، ولا والد سرق من مال ولده. وقال داود: يقطعان.

যা সে চুরি করেছে তার জন্য তার হাত কাটা হবে এবং তাকে সেই মালের বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
ইমাম আবু হানিফা বলেন: যদি হাত কাটা হয় তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, আর যদি ক্ষতিপূরণ নেওয়া হয় তবে হাত কাটা হবে না। আর যদি চুরিকৃত মালটি চোরকে দান করে দেওয়া হয়, তবে তার ওপর থেকে দণ্ড রহিত হবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেন: রহিত হয়ে যাবে। আর যদি মালের মালিক দণ্ড ক্ষমা করে দেয়, তবুও তা রহিত হবে না।
সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ তাঁর চাদর চুরিকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: "আমি যদি ক্ষমা করে দেই তবে আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা না করেন" এবং তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
বর্ণিত আছে যে, মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে কিছু চোরকে আনা হয়েছিল। তিনি তাদের হাত কাটার আদেশ দিলেন এবং একে একে সবার হাত কাটা হলো, অবশেষে একজন অবশিষ্ট রইল। যখন তাকে হাত কাটার জন্য পেশ করা হলো, তখন সে [তাবিল ছন্দ] কাব্যে বলল:
হে আমিরুল মুমিনিন, আমি আমার ডান হাতকে আপনার ক্ষমার আশ্রয়ে রক্ষা করতে চাই ...
যেন এটি এমন শাস্তির সম্মুখীন না হয় যা তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে
আমার হাতটি ছিল সুন্দর যদি তার আবরণ পূর্ণ হতো ... আর সুন্দরের এমন কোনো খুঁত থাকে না যা তাকে কলঙ্কিত করে
এই দুনিয়ায় কোনো কল্যাণ নেই এবং এটি কদর্য হয়ে যায় ... যখন বাম হাত তার ডান হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে

মুয়াবিয়া (রা.) বললেন: আমি তোমার সাথে কেমন আচরণ করব অথচ আমি ইতিমধ্যে তোমার সঙ্গীদের হাত কেটে ফেলেছি? তখন চোরের মা বলল: এই কাজটিকে আপনার সেই গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে নিন যেগুলোর জন্য আপনি আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। তখন তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। এটিই ছিল ইসলামে প্রথম বারের মতো দণ্ডবিধি (হদ) মওকুফ করার ঘটনা।

চুরির দণ্ডে হাত কাটার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী, স্বাধীন ও দাস এবং মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই সমান। কোনো শিশুর হাত কাটা হবে না, এবং কোনো সংজ্ঞাহীন ব্যক্তি যদি তার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় চুরি করে তবে তারও হাত কাটা হবে না। কোনো দাস যদি তার মালিকের মাল চুরি করে তবে তার হাত কাটা হবে না, এবং কোনো পিতা যদি তার সন্তানের মাল চুরি করে তবে তারও হাত কাটা হবে না। তবে দাউদ জাহেরি বলেন: উভয়েরই হাত কাটা হবে।

(ص: 334)الأحكام السلطانية للماوردي

الفصل الثالث: في حد الخمر

كل ما أسكر كثيره أو قليله من خمر أو نبيذ حرام، حدَّ شاربه سواء سكر منه أو لم يسكر. وقال أبو حنيفة: يحد من شرب الخمر وإن لم يسكر، ولا يحد من شرب النبيذ حتى يسكر.

والحدّ: أن يجلد أربعين بالأيدي وأطراف الثياب، ويبكَّت بالقول المضّ، والكلام الرادع للخبر المأثور فيه. وقيل: بل يُحَدُّ بالسوط اعتبارًا بسائر الحدود، ويجوز أن يتجاوز الأربعين إذا لم يرتدع بها إلى ثمانين جلدة، فإن عمر رضي الله عنه حدّ شارب الخمر أربعين إلى أن رأى تهافت الناس فيه فشاور الصحابة فيه، وقال: أرى الناس قد تهافتوا في شرب الخمر فماذا ترون؟ فقال علي عليه السلام: أرى أن تحدُّه ثمانين؛ لأنه إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذى افترى، فحدّه ثمانين

حدّ الفرية، فجلد فيه عمر بقية أيامه. والأئمة من بعده ثمانين فقال علي عليه السلام: ما أحد أقيم عليه الحد فيموت فأجد في نفسي منه شيئًا ألحق قتله إلا شارب الخمر، فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حدَّ شارب الخمر أربعين فمات منها كانت نفسه هدرًا، وإن حد ثمانين فمات ضمنت نفسه.

وفي قدر ما يضمن منها قولان:

أحدهما: جميع ديته لمجاوزته النص في حده.

والثاني: نصف ديته؛ نصف حده نص ونصفه مزيد، ومن أكره على شرب الخمر، أو شربها وهو لا يعلم أنَّها حرام فلا حدَّ عليه، وإن شربها لعطش حدَّ؛ لأنها لا تروي، وإن شربها لداء لم يحد؛ لأنه ربما يبرأ بها، وإذا اعتقد إباحة النبيذ حد، وإن كان في عدالته، ولا يحد السكران حتى يقر بشرب الخمر المسكر، أو يشهد عليه شاهدان أنه شرب مختارًا ما لم يعلم أنه مسكر. وقال أبو عبد الله الزبيري: أحدُّه للسكر، وهذا سهو؛ لأنه قد يكره على شرب المسكر.

وحكم السكران في جريان الأحكام عليه كالصاحي إذا كان عاصيًا بسكره، فإن خرج عن حكم المعصية لإكراهه على شرب الحمر ما لا يعلم أنه مسكر، لم يجر عليه قلم كالمغمى عليه.

واختلف في حد المسكر، فذهب أبو حنيفة إلى حدّ السكر ما زال معه العقل حتى لا يفرق بين الأرض والسماء، ولا يعرف أمه من زوجته، وحده أصحاب الشافعي بأنه ما أفضى بصاحبه إلى أن يتكلم بلسان متكسِّر، ومعنى منتظم ويتصرَّف بحركة مختبط، ومشي متمايل، وإذا جمع بين اضطراب الكلام فهمًا وإفهامًا، وبين اضطراب الحركة مشيًا وقيامًا، صار داخلًا في حدِّ السكر، وما زاد على هذا فهو زيادة في حد السكر.

যা কিছু অধিক বা স্বল্প পরিমাণে সেবন করলে মাদকতা তৈরি করে, চাই তা আঙুরের তৈরি মদ (খামর) হোক বা অন্য কিছুর নির্যাস (নাবিজ), তা হারাম। এর পানকারীর ওপর দণ্ড (হদ) কার্যকর হবে, চাই সে নেশাগ্রস্ত হোক বা না হোক। ইমাম আবু হানিফা বলেন: আঙুরের মদ পান করলে দণ্ড কার্যকর হবে যদিও সে নেশাগ্রস্ত না হয়, তবে নাবিজ পানের ক্ষেত্রে নেশাগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত দণ্ড কার্যকর হবে না।

আর দণ্ড হলো: হাত এবং কাপড়ের কিনারা দিয়ে চল্লিশটি আঘাত করা এবং যন্ত্রণাদায়ক বাক্য ও প্রতিরোধমূলক কথার মাধ্যমে তাকে তিরস্কার করা, যা এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসের আলোকে সাব্যস্ত। অন্য মতে বলা হয়েছে: বরং অন্যান্য দণ্ডের সাথে তুলনা করে চাবুক দ্বারাই দণ্ড কার্যকর করা হবে। আর যদি চল্লিশটি আঘাতে সে বিরত না হয়, তবে তা বাড়িয়ে আশিটি বেত্রাঘাত করা বৈধ। কেননা উমর (রা.) মদ্যপায়ীকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন, যতক্ষণ না তিনি দেখলেন যে মানুষ এতে লিপ্ত হতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তখন তিনি এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন এবং বললেন: আমি দেখছি মানুষ মদ্যপানের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গেছে, এ বিষয়ে আপনাদের অভিমত কী? তখন আলী (আ.) বললেন: আমার অভিমত হলো আপনি তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করুন; কারণ সে যখন মদ পান করে তখন মাতাল হয়, আর যখন মাতাল হয় তখন আবোলতাবোল বকে, আর যখন আবোলতাবোল বকে তখন অপবাদ আরোপ করে। অতএব তার দণ্ড অপবাদের দণ্ডের ন্যায় আশি হওয়া উচিত। এরপর উমর (রা.) তাঁর অবশিষ্ট দিনগুলোতে এই দণ্ডই কার্যকর করেন। এবং তাঁর পরবর্তী ইমামগণও আশিটি দণ্ড কার্যকর করেন। আলী (আ.) বলতেন: যার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সে কারণে সে মারা গেছে, তার মৃত্যুর দায়ভার নেওয়ার ব্যাপারে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই—মদ্যপায়ী ব্যতীত। কারণ এটি এমন একটি বিষয় যা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে প্রবর্তন করেছি। সুতরাং যদি মদ্যপায়ীকে চল্লিশটি আঘাত করা হয় এবং সে মারা যায়, তবে তার রক্ত বিফলে যাবে (কোনো দিয়াত দিতে হবে না), কিন্তু যদি আশিটি আঘাত করার পর সে মারা যায়, তবে তার প্রাণের জরিমানা (দিয়াত) নিশ্চিত করতে হবে।

এই জরিমানার পরিমাণ নিয়ে দুটি মত রয়েছে:

এক: পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে, কারণ নির্ধারিত দণ্ডের (নস) সীমা অতিক্রম করার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে।

দুই: অর্ধেক রক্তপণ; কারণ দণ্ডের অর্ধেক অংশ নস দ্বারা প্রমাণিত এবং অর্ধেক অংশ অতিরিক্ত। যাকে মদ পানে বাধ্য করা হয়েছে, অথবা যে ব্যক্তি এটি হারাম হওয়া সম্পর্কে না জেনে পান করেছে, তার ওপর কোনো দণ্ড নেই। আর যদি তৃষ্ণা মেটাতে পান করে তবে দণ্ড কার্যকর হবে; কারণ মদ তৃষ্ণা নিবারণ করে না। কিন্তু যদি রোগের চিকিৎসার জন্য পান করে তবে দণ্ড কার্যকর হবে না; কারণ অনেক সময় এর দ্বারা রোগমুক্তি ঘটতে পারে। যদি কেউ নাবিজকে বৈধ মনে করে পান করে তবুও তার ওপর দণ্ড কার্যকর হবে, যদিও সে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়। মাতাল ব্যক্তিকে ততক্ষণ দণ্ড দেওয়া যাবে না যতক্ষণ না সে মাদক পান করার কথা স্বীকার করে, অথবা দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে সে স্বেচ্ছায় এমন কিছু পান করেছে যা মাদক বলে সে জানত না। আবু আব্দুল্লাহ আল-জুবাইরি বলেন: আমি তাকে মাতলামির কারণে দণ্ড দেব। কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা; কারণ অনেক সময় মাদক পানে বাধ্য করা হতে পারে।

বিধিবিধান কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে মাতাল ব্যক্তির হুকুম সুস্থ ব্যক্তির মতোই, যদি সে পাপাচারের উদ্দেশ্যে নেশাগ্রস্ত হয়। কিন্তু যদি সে পাপাচারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায় (যেমন: বাধ্য হয়ে বা মাদক না জেনে পান করা), তবে তার ওপর কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না, যেমনটি সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

মাদকতার সীমার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে; ইমাম আবু হানিফা এই মত পোষণ করেছেন যে, নেশার সীমা হলো জ্ঞান এমনভাবে লোপ পাওয়া যাতে সে আসমান ও জমিনের পার্থক্য করতে না পারে এবং নিজের মা ও স্ত্রীর মাঝে তফাত করতে না পারে। শাফেয়ি মাযহাবের ইমামগণ একে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে যে, যার কারণে পানকারীর কথা জড়িয়ে যায়, অর্থ অসংলগ্ন হয়ে পড়ে, আচরণ ভারসাম্যহীন হয় এবং চালচলন টালমাটাল হয়ে যায়। যখন কথা বোঝা ও বোঝানোর ক্ষেত্রে অসংলগ্নতা এবং হাঁটা ও দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অস্থিরতা একীভূত হয়, তখন তাকে মাতাল হিসেবে গণ্য করা হবে। এর অতিরিক্ত যা কিছু তা নেশার উচ্চতর পর্যায় বলে বিবেচিত।

الفصل الرابع: في حد القذف واللعان

حد القذف بالزنا ثمانون جلدة، ورد النص بها وانعقد الإجماع عليها، لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وهو من حقوق الآدميين يستحق بالطلب ويسقط بالعفو، فإذا اجتمعت في المقذوف بالزنا خمسة شروط، وفي القاذف ثلاثة شروط، وجب الحد فيه.

أمَّا الشروط الخمسة في المقذوف فهي: أن يكون بالغًا عاقلًا مسلمًا حرًّا عفيفًا، فإن كان صبيًّا أو مجنونًا أو عبدًا أو كافرًا، أو ساقط العصمة بزنا حد فيه حد على قاذفه ولكن يعزر؛ لأجل الأذى ولبذاءة اللسان.

وأمَّا الشروط الثلاثة في القاذف فهي: أن يكون بالغًا عاقلًا حرًّا، فإن كان صغيرًا، أو مجنونًا لم يحدّ ولم يعزَّر، وإن كان عبدًا حُدَّ أربعين، نصف الحد للحر لنصفه بالرق. ويحد الكافر كالمسلم، وتحد المرأة كالرجل، ويفسق القاذف ولا يعمل بشهادته، فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته قبل الحدّ وبعده. وقال أبو حنيفة: تقبل شهادته إن تاب قبل الحد، ولا تقبل شهادته إن تاب بعد الحد، والقذف باللواط، وإتيان البهائم كقذف الزنا في وجوب الحد، ولا يحد القاذف بالكفر والسرقة ويعزَّر؛ لأجل الأذى.

والقذف بالزنا ما كان صريحًا فيه كقوله: يا زانٍ، أو قد زنيت، أو رأيتك تزني، فإن قال: يا فاجر أو يا فاسق أو يا لوطيّ كان كناية لاحتماله، فلا يجب به الحد إلا أن يريد به القذف، ولو قال: يا عاهر كانت كناية عند بعض أصحاب الشافعي لاحتماله، وصريحًا عند آخرين

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: অপবাদারোপের দণ্ড (হাদ্দ-ই-কাযফ) ও লিয়ান প্রসঙ্গে

ব্যভিচারের অপবাদ প্রদানের নির্ধারিত দণ্ড (হাদ্দ) হলো আশিটি বেত্রাঘাত। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান (নস) অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর ওপর ইজমা বা সর্বসম্মত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এতে কোনো প্রকার বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যাবে না। এটি বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত, যা দাবির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় এবং ক্ষমার মাধ্যমে রহিত হয়। যখন ব্যভিচারের অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে পাঁচটি শর্ত এবং অপবাদদাতার মধ্যে তিনটি শর্ত পূর্ণ হবে, তখন উক্ত দণ্ড কার্যকর করা ওয়াজিব

হবে। অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির পাঁচটি শর্ত হলো: তাকে প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন, মুসলিম, স্বাধীন এবং সতী (ব্যভিচারমুক্ত) হতে হবে। যদি অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিশু, পাগল, দাস বা কাফির হয়, অথবা ইতিপূর্বে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তার সতীত্বের সুরক্ষা ও মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে থাকে, তবে অপবাদদাতার ওপর নির্ধারিত দণ্ড কার্যকর হবে না; তবে কষ্ট প্রদান এবং কটুভাষার অপরাধে তাকে তা'যীর বা সতর্কতামূলক শাস্তি প্রদান করা হবে।
আর অপবাদদাতার তিনটি শর্ত হলো: তাকে প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন এবং স্বাধীন হতে হবে। যদি সে অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাগল হয়, তবে তার ওপর হাদ্দ বা তা'যীর কোনোটিই কার্যকর হবে না। আর যদি সে দাস হয়, তবে তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হবে; দাসত্বের কারণে তার শাস্তি স্বাধীন ব্যক্তির দণ্ডের অর্ধেক হবে। কাফির ব্যক্তির দণ্ড মুসলিমের ন্যায় এবং নারীর দণ্ড পুরুষের ন্যায় হবে। অপবাদদাতা ফাসিক (পাপাচারী) বলে গণ্য হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। তবে যদি সে তওবা করে, তবে তার পাপাচার দূর হয়ে যাবে এবং দণ্ড কার্যকর করার পূর্বে ও পরে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আবু হানীফা বলেন: যদি সে দণ্ড কার্যকর করার পূর্বে তওবা করে তবে তার সাক্ষ্য কবুল হবে, কিন্তু দণ্ড কার্যকর করার পর তওবা করলে তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না। সমকামিতা ও পশুকামের অপবাদ প্রদান করা হাদ্দ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যভিচারের অপবাদের মতোই। তবে কুফর বা চুরির অপবাদ দেওয়ার কারণে হাদ্দ কার্যকর হবে না, বরং অন্যকে কষ্ট দেওয়ার অপরাধে তা'যীর করা হবে। ব্যভিচারের অপবাদ সেটিই যা সুস্পষ্ট ভাষায় করা হয়, যেমন বলা: হে ব্যভিচারী, অথবা তুমি ব্যভিচার করেছ, অথবা আমি তোমাকে ব্যভিচার করতে দেখেছি। আর যদি সে বলে: হে পাপিষ্ঠ, অথবা হে ফাসিক, অথবা হে সমকামী, তবে তা পরোক্ষ উক্তি (কিনায়া) হিসেবে গণ্য হবে; কারণ এতে ভিন্ন অর্থের অবকাশ থাকে। ফলে এতে হাদ্দ ওয়াজিব হবে না, যতক্ষণ না সে এর মাধ্যমে অপবাদ প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করে। আর যদি সে বলে: ‘হে ব্যভিচারী’ (আহির), তবে ইমাম শাফি'র কিছু অনুসারীর মতে এটি ভিন্ন অর্থের সম্ভাবনার কারণে পরোক্ষ উক্তি হিসেবে গণ্য; কিন্তু অন্যদের মতে এটি একটি সুস্পষ্ট উক্তি।

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" 1.
وجعل مالك رحمه الله التعريض فيه كالصريح في وجوب الحد، والتعريض1 أن يقول في حال الغضب والملاحاة: أنا ما زنيت فجعله بمثابة قوله: إنك زنيت، ولا حدَّ في التعريض عند الشافعي وأبي حنيفة -رحمها الله- حتى يُقِرّ أنه أراد به القذف؛ فإذا قال: يا ابن الزانيين، كان قاذفًا لأبويه دونه، فيُحَدُّ لهما إن طلبا أو أحدهما إلَّا أن يكونا ميتين، فيكون الحد موروثًا عنهما. وقال أبو حنيفة: حد القذف لا يورث؛ ولو أراد المقذوف أن يصالح عن حد القذف بمال لم يجز. وإذا قذف ابنه لم يحد، وإذا لم يحد القاذف حتى زنَى المقذوف لم يسقط حد القذف. وقال أبو حنيفة: يسقط.
وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا حدّ لها إلا أن يلاعن منها.
واللعان أن يقول في المسجد الجامع على المنبر، أو عنده بمحضر من الحاكم وشهود أقلها أربعة: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا بفلان، وأنَّ هذا الولد من زنا وما هو مني، إن أراد أن ينفي الولد ويكرر ذلك أربعًا، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا بفلان إن كان ذكر الزاني بها، وأنَّ هذا الولد من الزنا، وما هو مني، فإذا قال هذا فقد أكمل لعانه، وسقط حد القذف عنه، ووجب به حد الزنا على زوجته، إلَّا أن تلاعن فتقول: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا بفلان، وأن هذا الولد منه، وما هو من زنا تكرر ذلك أربعًا، ثم تقول في الخامسة: وعليَّ غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به من الزنا بفلان، فإذا أكملت هذه سقط حد الزنا عنها، وانتفى الولد عن الزوج، ووقعت الفرقة بينهما وحرمت على الأبد.
واختلف الفقهاء فيما وقعت به الفرقة، فذهب الشافعي إلى أنَّ الفرقة واقعة بلعان الزوج وحده. وقال مالك: الفرقة بلعانهما معًا، وقال أبو حنيفة: لا تقع الفرقة بلعانهما حتى يفرق بينهما الحاكم؛ وإذا قذفت المرأة زوجها حدَّت، ولم تلاعن،

وإذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان لحق به الولد وحُدَّ للقذف، ولم تحلّ له الزوجة عند الشافعي، وأحلها أبو حنيفة.

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب البيوع "2053"، ومسلم في كتاب الرضاع "1457".

2 التعريض: ضد التصريح يقال: عرض لفلان وبفلان إذا قال قولًا وهو يعيّنه، ومنه المعاريض في الكلام وهي التورية بالشيء عن الشيء. [مختار الصحاح: ص 178] .

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর কারণে: "সন্তান শয্যার অধিকারীর (অর্থাৎ বৈধ স্বামী বা মালিকের) এবং ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (অর্থাৎ বঞ্চনা ও শাস্তি)।" ১।
ইমাম মালিক (রহ.) এই বিষয়ে ইঙ্গিতে অপবাদ দেওয়াকে (তা'রীদ) 'হাদ্দ' ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্ট অপবাদ দেওয়ার সমতুল্য গণ্য করেছেন। আর ইঙ্গিত (তা'রীদ) হলো রাগ এবং বিবাদের সময় এ কথা বলা: 'আমি ব্যভিচারী নই', ফলে তিনি এটিকে তার 'তুমি ব্যভিচার করেছ' বলার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে ইঙ্গিতে অপবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে 'হাদ্দ' বা নির্ধারিত শাস্তি নেই যতক্ষণ না সে স্বীকার করে যে, এর মাধ্যমে সে অপবাদ (কাযফ) দেওয়ারই ইচ্ছা পোষণ করেছিল। সুতরাং সে যদি বলে: 'হে দুই ব্যভিচারীর সন্তান', তবে সে তার পিতামাতাকেই অপবাদ দানকারী হিসেবে গণ্য হবে, তাকে (সন্তানকে) নয়। সুতরাং তাদের উভয়ের জন্য (অপবাদের) শাস্তি কার্যকর করা হবে যদি তারা বা তাদের অন্তত একজন তা দাবি করে, যদি না তারা মৃত হয়; সেক্ষেত্রে এই শাস্তির দাবি করার অধিকার তাদের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হবে। তবে ইমাম আবু হানিফা বলেন: অপবাদের শাস্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর যদি অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে অপবাদের শাস্তির ব্যাপারে আপস করতে চায়, তবে তা বৈধ হবে না। আর যদি কেউ নিজের সন্তানকে অপবাদ দেয়, তবে তার ওপর হাদ্দ কার্যকর হবে না। আর যদি অপবাদ দানকারীর ওপর শাস্তি কার্যকর হওয়ার আগেই অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যভিচার করে ফেলে, তবে অপবাদের শাস্তি রহিত হবে না। তবে ইমাম আবু হানিফা বলেন: রহিত হয়ে যাবে।

আর যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তবে তার জন্য হাদ্দ কার্যকর হবে যদি না সে তার সাথে 'লিআন' (শপথের মাধ্যমে অভিযোগ ও অস্বীকার) করে।
আর লিআন হলো এই যে, সে জামে মসজিদের মিম্বরে বা মিম্বরের কাছে বিচারক এবং কমপক্ষে চারজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বলবে: 'আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আমার এই স্ত্রীর প্রতি অমুকের সাথে ব্যভিচারের যে অপবাদ আরোপ করেছি তাতে আমি অবশ্যই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত, আর এই সন্তান ব্যভিচারের জাতক এবং সে আমার থেকে নয়'—যদি সে সন্তান অস্বীকার করতে চায় এবং এভাবে চারবার পুনরাবৃত্তি করবে। অতঃপর পঞ্চমবার বলবে: 'আমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক যদি আমি আমার স্ত্রীর প্রতি অমুকের সাথে ব্যভিচারের যে অপবাদ আরোপ করেছি তাতে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হই'—যদি সে ব্যভিচারী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে—'এবং এই সন্তান ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্মেছে এবং সে আমার নয়'। সে যখন এটি বলবে তখন তার লিআন পূর্ণ হলো এবং তার থেকে অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে গেল, আর এর মাধ্যমে তার স্ত্রীর ওপর ব্যভিচারের শাস্তি ওয়াজিব হলো, যতক্ষণ না স্ত্রী লিআন করে। স্ত্রী লিআন করার সময় বলবে: 'আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার এই স্বামী আমার প্রতি অমুকের সাথে ব্যভিচারের যে অপবাদ আরোপ করেছে তাতে সে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত, আর এই সন্তান তার পক্ষ থেকেই এবং এটি ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়'—এভাবে সে চারবার পুনরাবৃত্তি করবে। অতঃপর পঞ্চমবার বলবে: 'আর আমার ওপর আল্লাহর গযব বর্ষিত হোক যদি আমার স্বামী আমার প্রতি অমুকের সাথে ব্যভিচারের যে অপবাদ আরোপ করেছে তাতে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়'। যখন সে এটি সম্পন্ন করবে তখন তার থেকে ব্যভিচারের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে, সন্তানটি স্বামীর বংশপরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে এবং সে (স্ত্রী) তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে।
আর ফকীহগণ কোন কাজের মাধ্যমে বিচ্ছেদ কার্যকর হবে সে বিষয়ে মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফিঈ এই মত পোষণ করেছেন যে, কেবল স্বামীর লিআনের মাধ্যমেই বিচ্ছেদ ঘটে যায়। ইমাম মালিক বলেছেন: উভয়ের লিআনের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: বিচারক তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাদের লিআনের কারণে বিচ্ছেদ ঘটবে না। আর যদি কোনো মহিলা তার স্বামীকে অপবাদ দেয় তবে তার ওপর হাদ্দ কার্যকর হবে, আর সে লিআন করবে না। আর যদি স্বামী লিআনের পর নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে (অর্থাৎ স্বীকার করে যে সে মিথ্যা বলেছিল), তবে সন্তান তার সাথে যুক্ত হবে এবং তার ওপর

অপবাদের শাস্তি (হাদ্দ) কার্যকর হবে; তবে ইমাম শাফিঈর মতে ওই স্ত্রী তার জন্য আর হালাল হবে না, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা তাকে হালাল বলেছেন।

---

১ সহিহ: বুখারি এটি 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়ে (২০৫৩) এবং মুসলিম 'দুগ্ধপান' অধ্যায়ে (১৪৫৭) বর্ণনা করেছেন।

২ তা'রীদ: এটি স্পষ্ট বলার (তাসরীহ) বিপরীত। বলা হয় সে অমুককে বা অমুকের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছে যখন সে কোনো কথা বলে এবং এর মাধ্যমে তাকেই নির্দিষ্ট করে। কথা বলার ক্ষেত্রে 'মা'আরীয' হলো এর অন্তর্ভুক্ত, যা কোনো বিষয়ের মাধ্যমে অন্য কোনো বিষয়কে পরোক্ষভাবে বোঝানো বা দ্ব্যর্থবোধকতা। [মুখতারুস সিহাহ: পৃ. ১৭৮] ।

الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها

الجنايات على النفوس ثلاث: عمد، وخطأ، وعمد شبه الخطأ.

فأمَّا العمد المحض: فهو أن يتعمَّد قتل النفس بما يقطع بحده كالحديد، أو بما يمور في اللحم مور الحديد، أو ما يقتل غالبًا بثقله كالحجارة والخشب، فهو قتل عمد يوجب الحد.

وقال أبو حنيفة: العمد الموجب للقود ما قتل بحده من حديد وغيره إذا مار في اللحم مورًا، ولا يكون ما قتل بثقله أو ألمه من الأحجار والخشب عمدًا، ولا يوجب قودًا. وحكم العمد عند الشافعي أن يكون وليّ المقتول حرًّا مع تكافؤ الدمين بين القود والدية. وقال أبو حنيفة: لولي المقتول أن ينفرد بالقود، وليست له الدية إلَّا عن مراضاة القاتل. وولي الدم هو وارث المال من ذكر أو أنثى بفرض أو تعصيب.

وقال مالك: أولياؤه ذكور الورثة دون إناثهم، ولا قود لهم إلَّا أن يجتمعوا على استيفائه، فإن عفا أحدهم سقط القود ووجبت الدية.

وقال مالك: لا يسقط، وإذا فيهم صغير أو مجنون لم يكن للبالغ والعاقل أن ينفرد بالقود، وتكافؤ الدمين عند الشافعي أن لا يفضل القاتل على المقتول بحرية، ولا إسلام، فإن فضل القاتل عليه بأحدهما، فقتل حر عبدًا، أو مسلم كافرًا، فلا قود عليه. وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بهذا التكافؤ، فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر، كما يقتل العبد بالحر والكافر بالمسلم، وما تتحاماه النفوس من هذا وتأباه قد منع القائلين به من العمل عليه.

حكي أنَّه رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل كافرًا فحكم عليه بالقود، فأتاه رجل برقعة فألقاها إليه، فإذا فيها مكتوب [من السريع] :

يا قاتل المسلم بالكافر ... جرت وما العادل كالجائر

يا من ببغداد وأطرافها ... من علماء الناس أو شاعر

استرجعوا وابكوا على دينكم ... واصطبروا فالأجر للصابر

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: অপরাধের কিসাস ও দিয়াত প্রসঙ্গে

জীবনের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ তিন প্রকার: ইচ্ছাকৃত, ভুলবশত এবং ভুলবশত সদৃশ ইচ্ছাকৃত।

বিশুদ্ধ ইচ্ছাকৃত হত্যা (আমদ মাহদ) হলো: যা ধারালো কোনো কিছু যেমন লোহা দ্বারা হত্যা করার সংকল্প করা হয়, অথবা যা লোহার ন্যায় মাংসের ভেতরে প্রবেশ করে, কিংবা যা তার ওজনের কারণে সাধারণত হত্যা করে থাকে যেমন পাথর ও কাঠ; এটি ইচ্ছাকৃত হত্যা যা দণ্ডবিধি (কিসাস) আবশ্যক করে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন: কিসাস বা প্রতিশোধ ওয়াজিবকারী ইচ্ছাকৃত হত্যা হলো যা লোহা বা অন্য কোনো ধারালো বস্তু দ্বারা হত্যা করা হয় যখন তা মাংসের ভেতরে প্রবেশ করে। আর যা পাথর ও কাঠের ওজন বা যন্ত্রণার মাধ্যমে হত্যা করে, তা ইচ্ছাকৃত হত্যা হিসেবে গণ্য হবে না এবং তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফি'র মতে ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান হলো, নিহতের অভিভাবক স্বাধীন হবেন এবং কিসাস ও দিয়াতের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের রক্তের মর্যাদা

সমান হতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: নিহত ব্যক্তির অভিভাবক এককভাবে কিসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রাখেন, তবে হত্যাকারীর সম্মতি ব্যতীত তিনি দিয়াত বা রক্তপণ পাওয়ার অধিকারী নন। রক্তের অভিভাবক (ওয়ালিউল দাম) হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মৃত ব্যক্তির সম্পদের উত্তরাধিকারী হন, তিনি পুরুষ হোক বা নারী, নির্ধারিত অংশীদার (ফারদ) হিসেবে কিংবা আসাবা (অবশিষ্টাংশ ভোগী) হিসেবে। ইমাম মালিক বলেন: অভিভাবকগণ হলেন ওয়ারিশদের মধ্য থেকে কেবল পুরুষগণ, নারীরা নন। তারা সকলে কিসাস বাস্তবায়নে একমত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কিসাস গ্রহণের অধিকার নেই। যদি তাদের একজন ক্ষমা করে দেন, তবে কিসাস রহিত হয়ে যাবে এবং দিয়াত ওয়াজিব হবে।

ইমাম মালিক বলেন: (কিসাস) রহিত হবে না। যদি তাদের মধ্যে কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাগল থাকে, তবে প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি এককভাবে কিসাস গ্রহণ করতে পারবেন না। ইমাম শাফি'র মতে রক্তের সমতা হলো, হত্যাকারী যেন স্বাধীনতা বা ইসলামের কারণে নিহতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ না হয়। যদি হত্যাকারী এই দুটির কোনো একটির কারণে শ্রেষ্ঠ হয়—যেমন কোনো স্বাধীন ব্যক্তি ক্রীতদাসকে অথবা কোনো মুসলিম কোনো কাফিরকে হত্যা করে—তবে তার ওপর কিসাস বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেন: এই সমতার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই; ফলে ক্রীতদাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি এবং কাফিরের পরিবর্তে মুসলিমকে হত্যা করা হবে, যেমনটি স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে ক্রীতদাস এবং মুসলিমের পরিবর্তে কাফিরকে হত্যা করা হয়। তবে মানুষের প্রবৃত্তি যা ঘৃণা করে এবং প্রত্যাখ্যান করে, তা এই মতের প্রবক্তাদের এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা থেকে বিরত রেখেছে।

বর্ণিত আছে যে, কাজি আবু ইউসুফের নিকট এমন এক মুসলিমের মামলা আনা হলো যে একজন কাফিরকে হত্যা করেছে, ফলে তিনি তার ওপর কিসাসের (মৃত্যুদণ্ডের) রায় দিলেন। তখন এক ব্যক্তি তার কাছে একটি চিরকুট নিয়ে এসে তা তার দিকে ছুড়ে দিল। তাতে লেখা ছিল:

হে কাফিরের বদলে মুসলিমের হত্যাকারী! … আপনি অবিচার করেছেন, আর ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কখনও জালেমের সমান নয়।

হে বাগদাদ ও এর আশপাশের জনপদে বসবাসরত … আলেম সমাজ কিংবা কবি সম্প্রদায়! তোমরা 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করো এবং তোমাদের দ্বীনের জন্য রোদন করো … আর ধৈর্য ধারণ করো, কারণ ধৈর্যশীলদের জন্যই রয়েছে পুরস্কার।

جار على الدين أبو يوسف ... بقتله المؤمن بالكافر

فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر، وأقرأه الرقعة، فقال له الرشيد: تدارك هذا الأمر بحيلة لئلَّا تكون فتنة، فخرج أبو يوسف وطالب أصحاب الدم ببينة على صحة الذمَّة وثبوتها، فلم يأتوا بها فأسقط القود؛ والتوصُّل إلى مثل هذا سائغ عند ظهور المصلحة فيه.

ويقتل العبد بالعبد، وإن فضلت قيمة القاتل على المقتول. وقال أبو حنيفة: لا قود على القاتل إذا زادت قيمته على قيمة المقتول.

وإذا اختلف أديان الكفار قيد بعضهم ببعض، ويقاد الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، والكبير بالصغير، والعاقل بالمجنون، ولا قود على صبي ولا مجنون، ولا يقاد والد بولده، ويقاد الولد بالوالد، والأخ بالأخ.

وأما الخطأ المحض: فهو أن يتسبب إليه في القتل من غير قصد، فلا يقاد القاتل بالمقتول كرجل رمى هدفًا فأمات إنسانًا، أو حفر بئرًا فوقع فيها إنسان، أو أشرع جناحًا فوقع على إنسان، أو ركب دابة فرمحت ووطئت إنسانًا، أو وضع حجرًا فعثر به إنسان، فهذا وما أشبهه إذا حدث عنه الموت قتل خطإ محض يوجب الدية دون القود، وتكون على عاقلة الجاني لا في ماله مؤجلة في ثلاث سنين من حين يموت القتيل. وقال أبو حنيفة: من حين يحكم الحاكم بديته، والعاقلة من عدد الآباء والأبناء من العصبات، فلا يحمله الأب وإن علا، ولا الابن وإن سفل، وجعل أبو حنيفة ومالك الآباء والأبناء من العاقلة، ولا يتحمل القاتل مع العاقلة من الدية. وقال أبو حنيفة ومالك: يكون القاتل كأحد العاقلة، والذي يتحمّله الموسر منهم في كل سنة نصف دينار أو قدره من الإبل، ويتحمَّل الأوسط ربع دينار أو قدره من

الإبل، ولا يتحمَّل الفقير شيئًا منها. ومن أيسر بعد فقره تحمل، ومن افتقر بعد يساره لم يتحمل.

ودية نفس الحر المسلم إن قدرت ذهبًا ألف دينار من غالب الدنانير الجيدة، وإن قدرت ورقًا اثنا عشر ألف درهم. وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم، وإن كانت إبلًا فهي مائة

আবু ইউসুফ ধর্মের ওপর যুলুম করেছেন ... মুমিনের বদলে কাফিরকে হত্যা করার ফতোয়া দিয়ে।

অতঃপর আবু ইউসুফ হারুনুর রশীদের নিকট প্রবেশ করে তাকে বিষয়টি জানালেন এবং চিরকুটটি পড়ে শোনালেন। তখন রশীদ তাকে বললেন: কোনো কৌশল অবলম্বন করে এ বিষয়টি সমাধান করুন যাতে ফিতনা সৃষ্টি না হয়। এরপর আবু ইউসুফ বেরিয়ে এলেন এবং নিহতের উত্তরাধিকারীদের নিকট নিহত ব্যক্তির জিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ নাগরিক হওয়ার সত্যতা ও প্রমাণের সপক্ষে সাক্ষ্য চাইলেন। তারা তা উপস্থিত করতে না পারায় তিনি কিসাস রহিত করে দিলেন। আর যখন কোনো বিশেষ কল্যাণ বা জনস্বার্থ দৃশ্যমান হয়, তখন এ জাতীয় উপায়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো জায়েয।

দাসের বদলে দাসকে হত্যা করা হবে, যদিও হত্যাকারী দাসের মূল্য নিহত দাসের চেয়ে বেশি হয়। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন: হত্যাকারী দাসের মূল্য নিহত দাসের মূল্যের চেয়ে বেশি হলে তার ওপর কিসাস বর্তাবে না।

কাফিরদের ধর্ম ভিন্ন হলেও একের বদলে অপরকে হত্যা করা হবে। মহিলার বদলে পুরুষকে এবং পুরুষের বদলে মহিলাকে কিসাস দেওয়া হবে। বয়স্কের বদলে শিশুকে এবং জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বদলে পাগলকে হত্যা করা হবে। তবে শিশু বা পাগলের ওপর কোনো কিসাস নেই। সন্তানের বদলে পিতাকে হত্যা করা হবে না, তবে পিতার বদলে সন্তানকে এবং ভাইয়ের বদলে ভাইকে হত্যা করা হবে।

আর নিছক ভুলবশত হত্যাকাণ্ড (খাতা-ই-মাহয) হলো: অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যার কারণ হওয়া। এমতাবস্থায় নিহতের বদলে হত্যাকারীকে কিসাস দেওয়া হবে না; যেমন কোনো ব্যক্তি লক্ষ্যবস্তুতে তীর নিক্ষেপ করল কিন্তু তা কোনো মানুষকে বিদ্ধ করে মেরে ফেলল, অথবা কুয়া খনন করল যাতে কোনো মানুষ পড়ে মারা গেল, অথবা কোনো ঝুলন্ত বারান্দা তৈরি করল যা

কোনো মানুষের ওপর ভেঙে পড়ল, অথবা কোনো পশুর ওপর আরোহণ করল এবং পশুটি লাথি মেরে বা পদপিষ্ট করে কাউকে মেরে ফেলল, অথবা কোনো পাথর রাখল যাতে হোঁচট খেয়ে কোনো মানুষ মারা গেল। এ জাতীয় ঘটনার ফলে মৃত্যু ঘটলে তা নিছক ভুলবশত হত্যাকাণ্ড হিসেবে গণ্য হবে, যা কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত (রক্তপণ) ওয়াজিব করে। এই দিয়াত অপরাধীর 'আকিলা'র (রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের) ওপর বর্তাবে, অপরাধীর নিজস্ব সম্পদের ওপর নয়; যা নিহতের মৃত্যুর সময় থেকে তিন বছরের মধ্যে কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন: বিচারক যখন দিয়াতের ফয়সালা করবেন তখন থেকে সময় গণনা শুরু হবে। আর আকিলা বলতে আসাবাভুক্ত আত্মীয়দের বোঝায়। তবে (এক মতানুসারে) পিতা উর্ধ্বতন হলেও এবং পুত্র অধস্তন হলেও এই ভার বহন করবে না। ইমাম আবু হানিফা ও মালিক রহ. পিতা ও পুত্রদের আকিলার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হত্যাকারী নিজে আকিলার সাথে দিয়াতের কোনো অংশ বহন করবে না। ইমাম আবু হানিফা ও মালিক রহ. বলেন: হত্যাকারীও আকিলার একজন সদস্য হিসেবে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে সচ্ছল ব্যক্তি প্রতি বছর অর্ধেক দিনার বা সমমূল্যের উট প্রদান করবে এবং মধ্যবিত্ত ব্যক্তি এক চতুর্থাংশ দিনার বা সমমূল্যের উট প্রদান করবে; তবে দরিদ্র ব্যক্তি এর কোনো অংশ বহন করবে না। যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের পর সচ্ছল হবে সে অংশ প্রদান করবে, আর যে সচ্ছলতার পর দরিদ্র হয়ে যাবে সে তা বহন করবে না।

একজন স্বাধীন মুসলিমের জীবনের দিয়াত যদি স্বর্ণের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় তবে তা হবে এক হাজার প্রচলিত উৎকৃষ্ট মানের দিনার; আর যদি রৌপ্যের মাধ্যমে করা হয় তবে তা বারো হাজার দিরহাম। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন: দশ হাজার দিরহাম। আর যদি উট দ্বারা নির্ধারণ করা হয় তবে তা হবে একশত উট।

(ص: 339)الأحكام السلطانية للماوردي

بعير أخماسًا، منها عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وأصل الدية الإبل، وما عداها بدل، ودية المرأة النصف من دية الرجل في النفس والأطراف.

واختلف في دية اليهودي والنصراني، فذهب أبو حنيفة إلى أنها كدية المسلم.

قال مالك: نصف دية المسلم1، وعند الشافعي أنها ثلث دية المسلم. وأمَّا المجوسي فديته ثلثا عشر دية المسلم ثمانمائة درهم2، ودية العبد قيمته ما بلغت، وإن زادت على دية الحر أضعافًا عند الشافعي. وقال أبو حنيفة3: لا أبلغ بها دية الحر إذا زادت وأنقص منها عشرة دراهم4.

وأما العمد شبه الخطأ: فهو أن يكون عامدًا في الفعل غير قاصد للقتل، كرجل ضرب

---

1 قال ابن جزري من المالكية: دية العمد إذا عفي عنه ودية الجنين، فأمَّا دية الخطأ فهي مائة من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق، وهذه دية المسلم الذكر، وأمَّا اليهودي والنصراني والذمي فديته نصف دية المسلم. [القوانين الفقهية: ص 228] .

2 قال الشافعي: وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فقتله مسلم عمدًا، فلا قود عليه وعليه الكفَّارة في ماله وديته، فإن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا فثلث دية المسلم، وإن مجوسيًّا أو وثنيًّا فهو كالمجوسي فثمانمائة درهم في ماله حالة. [الأم: 4/ 289] .

3 قال محمد بن الحسن الشيباني: وإن كان الجاني حرًّا ما لم يبلغ النفس، فإذا بلغت النفس عقلته العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلث قيمته، فإن قلت القيمة في ذلك أو الغرماء فهو أنَّه لا يبلغ بها دية الحر، بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي أنهما قالا: لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر. وقال أبو حنيفة: ينقص منه عشرة دراهم. [المبسوط: 4/ 592] .

4 قال ابن قدامة من الحنابلة: روي أنَّ عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف إلَّا أنه رجع عن هذه الرواية، وقال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم، فإن قتله المسلم عمدًا أضعفت الداية على قاتله لإزالة القود؛ لأنَّ عثمان حكم بذلك، ولو قتله الكافر لم تضعف ديته؛ لأنَّ القود واجب، ونساءهم على النصف من دياتهم، كما أنَّ نساء المسلمين على النصف منهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم لما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: ديتهم ثمانمائة درهم، والمستأمن كالذمي، وإن كان وثنيًّا فديته دية المجوسي؛ لأنه كافر لا يحل نكاح نسائه، فأمَّا من لم تبلغه الدعوة إن لم يكن له عهد فلا ضمان فيه؛ لأنه كافر لا عهد له، أشبه نساء أهل الحرب. [الكافي في فقه ابن حنبل: 4/ 78] .

উট হবে পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত; যার মধ্যে বিশটি বিনতে মাখাদ (এক বছর পূর্ণ হওয়া উটনী), বিশটি বিনতে লাবুন (দুই বছর পূর্ণ হওয়া উটনী), বিশটি ইবনে লাবুন (দুই বছর পূর্ণ হওয়া পুরুষ উট), বিশটি হিক্কাহ (তিন বছর পূর্ণ হওয়া উটনী) এবং বিশটি জাযআহ (চার বছর পূর্ণ হওয়া উটনী)। মূলত দিয়ত বা রক্তপণ হলো উট, আর এর বাইরে অন্য যা কিছু আছে তা উটের স্থলাভিষিক্ত বা বিকল্প মাত্র। জীবনহানি ও অঙ্গহানি উভয় ক্ষেত্রেই নারীর দিয়ত পুরুষের দিয়তের অর্ধেক।

ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানের দিয়তের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে; ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমত হলো, তাদের দিয়ত একজন মুসলিমের দিয়তের সমান।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন: তা মুসলিমের দিয়তের অর্ধেক।১ আর ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর মতে, তা মুসলিমের দিয়তের এক-তৃতীয়াংশ। আর অগ্নিপূজকের (মাজুসি) দিয়ত হলো মুসলিমের দিয়তের এক-দশমাংশের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ আটশ দিরহাম।২ দাসের দিয়ত হলো তার বাজারমূল্য, তা যত পরিমাণই হোক না কেন; ইমাম শাফিঈর (রহ.) মতে তা স্বাধীন ব্যক্তির দিয়তের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি হলেও তাই দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন:৩ দাসের মূল্য বেশি হলেও আমি তাকে স্বাধীন ব্যক্তির দিয়তের সমপরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছাব না, বরং তা থেকে দশ দিরহাম কম ধরব।৪

আর ‘ভুল সদৃশ ইচ্ছাকৃত হত্যা’ (শামহে আমদ): তা হলো কার্যের ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকা কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য না থাকা; যেমন কোনো ব্যক্তি কাউকে আঘাত করল...

---

১ মালিকি মাযহাবের ইবনে জুযাই বলেন: ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়ত যখন ক্ষমা করা হয় এবং ভ্রূণের দিয়ত—পক্ষান্তরে ভুলবশত হত্যার দিয়ত হলো উটের মালিকদের ওপর একশটি উট, স্বর্ণের মালিকদের ওপর এক হাজার দিনার এবং রৌপ্যের মালিকদের ওপর বারো হাজার দিরহাম। আর এটি একজন মুসলিম পুরুষের দিয়ত। তবে ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান ও জিম্মি ব্যক্তির দিয়ত একজন মুসলিমের দিয়তের অর্ধেক। [আল-কাওয়ানিন আল-ফিকহিয়্যাহ: পৃ. ২২৮]।

২ ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন: যদি কোনো নিরাপত্তা লাভকারী ব্যক্তি (মুস্তামিন) ইসলামি ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং কোনো মুসলিম তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তবে তার ওপর প্রাণের বদলা (কিসাস) প্রযোজ্য হবে না, কিন্তু তার সম্পদ থেকে কাফফারা ও দিয়ত আদায় করতে হবে। সে যদি ইয়াহুদি বা খ্রিষ্টান হয় তবে মুসলিমের দিয়তের এক-তৃতীয়াংশ, আর যদি অগ্নিপূজক বা মূর্তিপূজক হয় তবে তা অগ্নিপূজকের দিয়তের মতো অর্থাৎ তার সম্পদ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আটশ দিরহাম প্রদান করতে হবে। [আল-উম্ম: ৪/২৮৯]।

৩ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানি বলেন: যদি অপরাধী স্বাধীন হয় তবে প্রাণের ক্ষতির স্তরে না পৌঁছানো পর্যন্ত (জরিমানা দিবে), আর যখন প্রাণের বিনিময়ে (মূল্য) সাব্যস্ত হয়, তখন ‘আকিলা’ (অভিভাবক বা গোষ্ঠী) তিন বছরে তা পরিশোধ করবে, প্রতি বছর মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ। যদি মূল্য দিয়তের সমান বা তার বেশি হয়, তবে তা স্বাধীন ব্যক্তির দিয়ত পর্যন্ত পৌঁছাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইব্রাহিম নাখয়ি থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, তাঁরা বলেছেন: দাসের মূল্য স্বাধীন ব্যক্তির দিয়ত পর্যন্ত পৌঁছাবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন: তা থেকে দশ দিরহাম কম ধরা হবে। [আল-মাবসুত: ৪/৫৯২]।

৪ হাম্বলি মাযহাবের ইবনে কুদামা বলেন: বর্ণিত আছে যে, উমর (রা.) ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানের দিয়ত চার হাজার নির্ধারণ করেছিলেন, তবে তিনি এই বর্ণনা থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন: আমি মনে করতাম ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানের দিয়ত চার হাজার, কিন্তু আজ আমি এই মতে ফিরে এসেছি যে তা মুসলিমের দিয়তের অর্ধেক। যদি কোনো মুসলিম তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তবে কিসাস রহিত হওয়ার কারণে হত্যাকারীর ওপর দিয়ত দ্বিগুণ করা হবে; কেননা উসমান (রা.) এরূপ ফয়সালা দিয়েছিলেন। আর যদি কোনো কাফের তাকে হত্যা করে তবে দিয়ত দ্বিগুণ হবে না, কারণ তখন কিসাস ওয়াজিব। তাদের নারীদের দিয়ত

তাদের পুরুষদের দিয়তের অর্ধেক, যেমন মুসলিম নারীদের দিয়ত মুসলিম পুরুষদের দিয়তের অর্ধেক। আর অগ্নিপূজকের দিয়ত হলো আটশ দিরহাম; উমর, উসমান ও ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে তাঁরা বলেছেন: তাদের দিয়ত আটশ দিরহাম। নিরাপত্তা লাভকারী (মুস্তামিন) ব্যক্তি জিম্মির ন্যায়। আর যদি সে মূর্তিপূজক হয় তবে তার দিয়ত অগ্নিপূজকের দিয়তের সমান; কেননা সে এমন কাফের যার নারীদের বিবাহ করা বৈধ নয়। আর যার নিকট দাওয়াত পৌঁছায়নি, যদি তার সাথে কোনো নিরাপত্তা চুক্তি না থাকে তবে তার জন্য কোনো জরিমানা নেই; কারণ সে এমন কাফের যার কোনো চুক্তি নেই, তাই সে যুদ্ধরত (হারবি) কাফের নারীদের সদৃশ। [আল-কাফি ফি ফিকহ ইবন হাম্বল: ৪/৭৮]।

(ص: 340)الأحكام السلطانية للماوردي

رجلًا بخشبة، أو رمى بحجر، يجوز أن يسلم من مثلها أو يتلف، فأفضى إلى قتله، أو كمعلم ضرب صبيًّا بمعهود أو عزَّر السلطان رجلًا على ذنب فتلف، فلا قود عليه في هذا القتل، وفيه الدية على العاقلة مغلظة، وتغليظها في الذهب والورق أن يزاد عليها ثلثها، وفي الإبل أن تكون أثلاثًا منها ثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وروي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحمل العاقلة عبدًا ولا عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا" 1.

ودية الخطإ المحض في الحرم والأشهر الحرم وذي الرحم مغلظة، ودية العمد المحض واحد وجب القود على جميعهم، فعليهم دية واحدة وإن كثروا؛ ولولي الدم أن يعفو عمَّن شاء منهم ويقتل باقيهم، وإن عفا عن جميعهم فعليهم دية واحدة تسقط عليهم على عدد رءوسهم، فإن كان بعضهم ذابحًا وبعضهم جارحًا أو موجئًا، فالقود في النفس على الذابح والموجئ، والجارح مأخوذ بحكم الجراحة دون النفس.

وإذا قتل الواحد جماعة قتل بالأول ولزمته في ماله دية الباقين. وقال أبو حنيفة: يقتل

---

1 قال ابن حجر: قال إمام الحرمين في النهاية: روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ: "لا تحمل العاقلة عبدًا ولا اعترافًا"، قال: وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث: "لا تحمل العاقلة عمدًا ولا اعترافًا". وقال الرافعي في أواخر الباب: هذا الحديث تكلموا في ثبوته. وقال ابن الصباغ: لم يثبت متصلًا وإنما هو موقوف على ابن عباس. انتهى، وفي جميع هذا نظر، فقد روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا"، وإسناده واهٍ، فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو كذَّاب، وفيه الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث، وروى الدارقطني والبيهقي من حديث عمر مرفوعًا: "العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة"، وهو منقطع في إسناده عند الملك بن حسين وهو ضعيف. قال البيهقي: والمحفوظ أنَّه عن عامر. [تلخيص الحبير: 4/ 31] .

وقال عمر بن الملقن: حديث: "لا تحمل العاقلة عمدًا ولا اعترافًا" رواه الدارقطني من رواية عبادة بلفظ: "لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا" وإسناده واه. قلت: والمعروف أنه من قول عمر، كذلك رواه الدارقطني والبيهقي من رواية عامر عنه، "العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة". قال البيهقي: وهو منقطع. قلت: وضعيف المحفوظ عن عامر الشعبي من قوله: "لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولاصلحًا ولا اعترافًا". [خلاصة البدر المنير: 2/ 297] .

যদি কোনো ব্যক্তি লাঠি দিয়ে আঘাত করে বা পাথর নিক্ষেপ করে—যা থেকে সাধারণত বেঁচে থাকা সম্ভব অথবা মৃত্যুও হতে পারে—এবং এর ফলে তার মৃত্যু ঘটে, অথবা কোনো শিক্ষক যদি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোনো কিশোরকে প্রহার করেন, কিংবা সুলতান যদি কোনো

অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দেন এবং এর ফলে সে মারা যায়, তবে এই হত্যার ক্ষেত্রে কোনো 'কিসাস' (মৃত্যুদণ্ড) কার্যকর হবে না। বরং এতে 'আকিলাহ'র (রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়গোষ্ঠী) ওপর 'দিয়াত-ই-মুগাল্লাজাহ' (গুরুতর রক্তপণ) প্রদান করা আবশ্যক হবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে এর কঠোরতার নিয়ম হলো যে, মূল রক্তপণের পরিমাণের সাথে আরও এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত যোগ করা হবে। আর উটের ক্ষেত্রে তা হবে তিন ভাগে বিভক্ত; যার মধ্যে তিরিশটি হবে 'জাযআহ' (পাঁচ বছর বয়সী উট), তিরিশটি 'হিক্কাহ' (চার বছর বয়সী উট) এবং চল্লিশটি হবে 'খালফাহ' অর্থাৎ গর্ভবতী উট। বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আকিলাহ কোনো দাসের মূল্য, ইচ্ছাকৃত হত্যা, আপস-নিষ্পত্তি এবং স্বীকারোক্তিমূলক অপরাধের রক্তপণের দায়ভার বহন করবে না।"
হারাম এলাকা (মক্কা), হারাম মাসসমূহ এবং নিকটাত্মীয়ের (যিল আরহাম) ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত হত্যার (খাতা-ই-মাহয) রক্তপণও কঠোর বা বর্ধিত হবে। আর সুনিশ্চিতভাবে ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে তাদের সবার ওপর একটিই 'কিসাস' (মৃত্যুদণ্ড) ওয়াজিব হবে। হত্যাকারী সংখ্যায় অনেক হলেও তাদের সবার পক্ষ থেকে একটি দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে নিহতের অভিভাবক বা উত্তরাধিকারী তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন এবং বাকিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারেন। আর যদি তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দেন, তবে তাদের সবার ওপর একটি দিয়াত আবশ্যক হবে, যা তাদের মাথা পিছু সংখ্যা অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। তবে যদি তাদের মধ্যে কেউ গলা কাটে (যাবেহ করে) এবং কেউ কেবল যখম করে বা গুরুতর আঘাত করে, তবে হত্যার মূল দায়ভার জবেহকারী ও প্রাণসংহারী আঘাতকারীর ওপর বর্তাবে; আর যে কেবল জখম করেছে তাকে হত্যার দায়ে নয় বরং জখমের বিধান অনুযায়ী সাজা দেওয়া হবে।
যদি একজন ব্যক্তি একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে প্রথম ব্যক্তির বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে এবং বাকিদের রক্তপণ তার নিজস্ব সম্পদ থেকে পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন: তাকে হত্যা করা হবে...

---

১ ইবনে হাজার বলেন: ইমামুল হারামাইন 'আন-নিহায়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: ফকিহগণ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং এর শব্দ ছিল এমন: "আকিলাহ কোনো দাসের বা স্বীকারোক্তির দায় বহন করবে না।" তিনি আরও বলেন: আমার প্রবল ধারণা যে হাদিস বিশারদগণ যা বর্ণনা করেছেন তা-ই সঠিক, আর তা হলো: "আকিলাহ ইচ্ছাকৃত হত্যা ও স্বীকারোক্তির দায় বহন

করবে না।" রাফেয়ি এই অধ্যায়ের শেষে বলেন: এই হাদিসের প্রামাণিকতা নিয়ে আলেমগণ সমালোচনা করেছেন। ইবনে সাব্বাগ বলেন: এটি 'মুত্তাসিল' (নিরবচ্ছিন্ন) সনদ হিসেবে প্রমাণিত নয়, বরং এটি ইবনে আব্বাস রা.-এর ওপর 'মাওকুফ' (তার নিজস্ব বক্তব্য) হিসেবে বর্ণিত। পরিশেষে, এই সব কটি মতই পর্যালোচনার দাবি রাখে। দারাকুতনি এবং তাবারানি 'মুসনাদুশ শামিয়্যিন'-এ উবাদাহ ইবনুস সামিত রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "স্বীকারোক্তিকারীর রক্তপণের কোনো কিছুই তোমরা আকিলাহ-র ওপর চাপিয়ে দিও না।" এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল; এতে মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল-মাসলুব নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছে যে বড় মিথ্যাবাদী, এবং হারিস ইবনে নাবহান নামক একজন রয়েছে যার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় (মুনকারুল হাদিস)। দারাকুতনি এবং বায়হাকি উমর রা. থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন: "ইচ্ছাকৃত হত্যা, দাস, আপস-নিষ্পত্তি এবং স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে আকিলাহ রক্তপণ দেবে না।" এটি মালিক বিন হুসাইন নামক বর্ণনাকারীর কারণে সনদবিচ্ছিন্ন, যিনি দুর্বল। বায়হাকি বলেন: সংরক্ষিত সঠিক তথ্য হলো এটি আমের-এর উক্তি। [তালখিসুল হাবির: ৪/৩১]।

উমর ইবনুল মুলাক্কিন বলেন: "আকিলাহ ইচ্ছাকৃত হত্যা ও স্বীকারোক্তির দায় বহন করবে না" হাদিসটি দারাকুতনি উবাদাহ রা. থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: "স্বীকারোক্তিকারীর রক্তপণের কোনো কিছুই তোমরা আকিলাহ-র ওপর চাপিয়ে দিও না" এবং এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল। আমি বলি: এটি উমর রা.-এর উক্তি হিসেবেই প্রসিদ্ধ; এভাবেই দারাকুতনি ও বায়হাকি আমের-এর সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে: "ইচ্ছাকৃত হত্যা, দাস, আপস-নিষ্পত্তি এবং স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে আকিলাহ রক্তপণ দেবে না।" বায়হাকি বলেন: এটি সনদবিচ্ছিন্ন। আমি বলি: আমের আশ-শাবি-র বক্তব্য হিসেবে সংরক্ষিত বর্ণনার ভাষ্য হলো: "আকিলাহ ইচ্ছাকৃত হত্যা, দাস, আপস-নিষ্পত্তি এবং স্বীকারোক্তির দায় বহন করবে না।" [খুলাসাতুল বদরিল মুনির: ২/২৯৭]।

جميعهم ولا دية عليه؛ وإذا قتلهم في حالة واحدة أقرع بينهم، وكان القَوَد لمن قرع منهم إلَّا أن يتراضى أولياؤهم على تسليم القود لأحدهم فيقاد له، ويلزم في ماله ديات الباقين، وإذا أمر المطاع رجلًا بالقتل، فالقود على الآمر والمأمور معًا، ولو كان الآمر غير مطاع كان القود على المأمور دون الآمر؛ وإذا أكره على القتل وجب القود على المكرَه، وفي وجوبه على المكروه قولان:

وأمَّا القود في الأطراف، فكل طرف قطع من مفصل ففيه القود، فيقاد من اليد باليد، والرجل بالرجل، والأصبع بالأصبع، والأنملة بالأنملة، والسن بمثلها، ولا تقاد يمنى بيسرى، ولا عليا بسفلى، ولا ضرس بسن، ولا ثنية برباعية، ولا يؤخذ بسن من قد ثغر سنّ من لم يثغر؛ ولا تؤخذ يد سليمة بيد شلاء، ولا بلسان أخرس، وتؤخذ اليد الكاتبة والصانعة بيد من ليس بكاتب ولا صانع. وتؤخذ العين بالعين، وتؤخذ النجلاء بالحولاء والعشواء، ولا تؤخذ العين القائمة واليد الشلاء إلّا بمثلها، ويقاد الأنف الذي يشم بالأنف الأخشم، وأذن السميع بأذن الأصم.

وقال مالك: لا قَوَدَ عليه، ويقاد من العربي بالعجمي، ومن الشريف بالدنيء، فإن عفي عن القود بهذه الأطراف إلى الدية، ففي اليدين الدية الكاملة، وفي إحداهما نصف الدية؛ وفي كل أصبع عشر الدية وهو عشر من الإبل، وفي كل واحدة من أنامل الأصابع ثلاثة وثلث إلّا أنملة الإبهام ففيها خمس من الإبل، ودية اليدين كالرجلين إلّا في أناملهما، فيكون في كل أنملة منها خمس من الإبل، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، ولا فضل لعين الأعور على من ليس بأعور، وأوجب مالك رحمه الله في عين الأعور جميع الدية. وفي الجفون الأربعة جميع الدية، وفي كل واحد منها ربع الدية، وفي الأنف الدية، وفي الأذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين ربع الدية، وفي كل سن خمس من الإبل، ولا فضل لسن على ضرس، ولا لثنية على ناجذ، وفي إذهاب السمع الدية، فإن قطع أذنيه فأذهب سمعه فعليه ديتان، وكذلك لو قطع أنفه فأذهب شمه فعليه ديتان، وفي إذهاب الكلام

الدية، فإن لسانه فأذهب كلامه، فعليه دية واحدة وفي إذهاب العقل الدية. وفي إذهاب الذكر الدية؛ وذكر الخصي والعنين وغيرهما سواء، وقال أبو

তাদের সকলের পক্ষ থেকে (একজনকে হত্যার বিনিময়ে) কিসাস গ্রহণ করা হবে এবং তার ওপর কোনো রক্তপণ (দিয়াত) থাকবে না। আর যদি সে তাদের সকলকে একই অবস্থায় হত্যা করে, তবে তাদের মধ্যে লটারি করা হবে এবং লটারিতে যার নাম আসবে, তার পক্ষ থেকেই কিসাস কার্যকর হবে; তবে যদি তাদের অভিভাবকরা তাদের মধ্য থেকে একজনের অনুকূলে কিসাস সমর্পণ করার ব্যাপারে একমত হয়, তবে তার জন্যই কিসাস নেওয়া হবে এবং হত্যাকারীর সম্পদ থেকে বাকিদের রক্তপণ (দিয়াত) প্রদান করা আবশ্যক হবে। আর যদি আনুগত্য করা ওয়াজিব এমন কোনো ব্যক্তি (যেমন শাসক) কাউকে হত্যার নির্দেশ দেয়, তবে নির্দেশদাতা ও নির্দেশপালনকারী উভয়ের ওপরই কিসাস বর্তাবে। কিন্তু যদি নির্দেশদাতা এমন কেউ না হয় যার আনুগত্য করা জরুরি, তবে কিসাস কেবল নির্দেশপালনকারীর ওপরই হবে, নির্দেশদাতার ওপর নয়। আর যদি কাউকে হত্যার জন্য বাধ্য করা (ইকরাহ) হয়, তবে বাধ্যকারীর ওপর কিসাস ওয়াজিব হবে; আর যাকে বাধ্য করা হয়েছে তার ওপর কিসাস ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিসাসের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, প্রতিটি অঙ্গ যা সন্ধিস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, তাতে কিসাস প্রযোজ্য। সুতরাং হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা, আঙুলের বদলে আঙুল, আঙুলের করের বদলে কর এবং দাঁতের বদলে অনুরূপ দাঁত দিয়ে কিসাস নেওয়া হবে। তবে ডান হাতের বদলে বাম হাত নয়, ওপরের অংশের বদলে নিচের অংশ নয়, মাড়ির দাঁতের বদলে সামনের দাঁত নয় এবং সম্মুখের 'সানিয়্যাহ' দাঁতের বদলে 'রুবায়িয়্যাহ' দাঁত নেওয়া হবে না। তেমনিভাবে যার স্থায়ী দাঁত উঠেছে তার দাঁতের বদলে যার দাঁত ওঠেনি এমন কারো দাঁত নেওয়া হবে না। সুস্থ হাত অবশ বা পঙ্গু হাতের বদলে নেওয়া হবে না, আর বাকশক্তিহীন জিহ্বার বদলে সুস্থ জিহ্বা নেওয়া হবে না। তবে লেখক বা কারিগরের হাত এমন ব্যক্তির হাতের বদলে নেওয়া হবে যে লেখক বা কারিগর নয়। চোখের বদলে চোখ নেওয়া হবে। বড় ও সুন্দর চোখ টেরা বা ক্ষীণদৃষ্টির চোখের বদলে নেওয়া হবে। তবে স্থির (দৃষ্টিহীন) চোখ বা পঙ্গু হাত কেবল তার অনুরূপের বদলে নেওয়া হবে। ঘ্রাণশক্তিযুক্ত নাকের বদলে ঘ্রাণশক্তিহীন নাকের কিসাস নেওয়া যাবে এবং শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কান বধির কানের বদলে নেওয়া যাবে।

ইমাম মালিক (র.) বলেন: তার ওপর কোনো কিসাস নেই। অনারবের বদলে আরবের এবং নিচুবংশীয় ব্যক্তির বদলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কিসাস কার্যকর করা হবে। যদি এই অঙ্গগুলোর কিসাস ক্ষমা করে রক্তপণে (দিয়াত) উপনীত হওয়া হয়, তবে উভয় হাতের জন্য পূর্ণ দিয়াত এবং একটি হাতের জন্য অর্ধেক দিয়াত প্রযোজ্য হবে। প্রতিটি আঙুলের জন্য দিয়াতের দশভাগের একভাগ, যা দশটি উটের সমান। আঙুলের প্রতিটি করের জন্য তিনটি ও এক-তৃতীয়াংশ উট, তবে বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রতি করের জন্য পাঁচটি উট। দুই হাতের দিয়াত দুই পায়ের দিয়াতের মতোই, তবে পায়ের আঙুলের করের ক্ষেত্রে প্রতিটি করের জন্য পাঁচটি করে উট হবে। উভয় চোখের জন্য পূর্ণ দিয়াত এবং একটির জন্য অর্ধেক দিয়াত। এক চোখ অন্ধ ব্যক্তির চোখের জন্য সুস্থ চোখের অধিকারীর ওপর কোনো বাড়তি মর্যাদা নেই, তবে ইমাম মালিক (রহ.) এক চোখ অন্ধ ব্যক্তির চোখের ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব করেছেন। চার চোখের পাতার জন্য পূর্ণ দিয়াত এবং প্রত্যেকটির জন্য এক-চতুর্থাংশ দিয়াত। নাকের জন্য পূর্ণ দিয়াত। উভয় কানের জন্য পূর্ণ দিয়াত এবং একটির জন্য অর্ধেক দিয়াত। জিহ্বার জন্য পূর্ণ দিয়াত। দুই ঠোঁটের জন্য এক-চতুর্থাংশ দিয়াত। প্রতিটি দাঁতের জন্য পাঁচটি উট। সাধারণ দাঁতের ওপর মাড়ির দাঁতের কিংবা সম্মুখস্থ 'সানিয়্যাহ' দাঁতের ওপর 'নাজিজ' দাঁতের কোনো বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রবণশক্তি বিনষ্ট করার জন্য পূর্ণ দিয়াত। যদি কেউ কারো দুই কান কেটে ফেলে এবং তার শ্রবণশক্তিও বিলুপ্ত করে দেয়, তবে তার ওপর দুটি দিয়াত ওয়াজিব হবে। একইভাবে যদি কারো নাক কেটে ফেলে এবং তার ঘ্রাণশক্তিও নষ্ট করে দেয়, তবে তার ওপর দুটি দিয়াত হবে। বাকশক্তি বিনষ্ট করলে পূর্ণ দিয়াত। যদি কেউ জিহ্বা কর্তন করে এবং তাতে বাকশক্তি চলে যায়, তবে তার ওপর একটিই দিয়াত ওয়াজিব হবে। বুদ্ধি বিনষ্ট করলে পূর্ণ দিয়াত। পুরুষাঙ্গ বিচ্ছিন্ন করলে পূর্ণ দিয়াত; এক্ষেত্রে খাসিকৃত ব্যক্তি, ধ্বজভঙ্গ ব্যক্তি বা অন্যদের অঙ্গ সমান বিবেচিত হবে। এবং আবু... (বাক্যটি অসম্পূর্ণ)

(ص: 342)الأحكام السلطانية للماوردي

حنيفة: في ذكر العنّين والخصيّ حكومة، وفي الأنثيين الدية، وفي إحداهما نصف الدية؛ وفي ثديي المرأة ديتها، وفي إحداهما نصف الدية، وفي ثديي الرجل حكومة وقيل: دية.

وأما الشجاج، فأولها الخارصة، وهي التي أخذت في الجلد، ولا قود فيها، ولا دية، وفيها حكومة. ثم الدامية، وهي التي أخذت في الجلد وأدمت وفيها حكومة، ثم الدامغة، وهي التي قد خرج دماؤها من قطع الجلد كالدامغة وفيها حكومة. ثم المتلاحمة، وهي التي قطعت وأخذت في اللحم وفيها حكومة. ثم الباضعة وهي التي قطعت اللحم بعد الجلد وفيها حكومة. ثم السمحاق، وهي التي قطعت جميع اللحم بعد الجلد، وأبقت على عظم الرأس غشاوة رقيقة وفيها حكومة، وحكومات هذه الشجاج تزيد على حسب ترتيبها. ثم الموضِّحة، وهي التي قطعت الجلد واللحم والغشاوة وأوضحت عن العظم ففيها القود، فإن عُفِيَ عنها ففيها خمس من الإبل. ثم الهاشمة، وهي التي أوضحت عن اللحم حتى ظهر وهشَّمت عظم الرأس حتى تكسر، وفيها عشر من الإبل؛ فإن أراد القود من الهشم لم يكن له، وإن أراده من الموضحة قيد له منها، وأعطي في زيادة الهشم خمسًا من الإبل، وقال مالك: في الهشم حكومة. ثم المنقلة، وهي التي أوضحت وهشمت حتى شظي العظم وزال عن موضعه، واحتاج إلى نقله وإعادته، وفيها خمس عشرة من الإبل، فإن استقاد من الموضحة أعطي في الهشم والتنقيل عشرًا من الإبل. ثم المأمومة وتسمَّى الدامغة، وهي التي وصلت إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية.

وأما جراح الجسد فلا تقدر دية شيء منها إلَّا الجافية، وهي الواصلة إلى الجوف، وفيها ثلث الدية، ولا قَوَد في جراح الجسد إلَّا الموضحة عن عظم ففيها حكومة. وإذا قطعت أطرافه فاندملت وجبت عليه دياتها، وإن كانت أضعاف دية النفس، ولو مات منها قبل اندمال بعضها وجبت عليه دية النفس فيما لم يندمل مع دية الأطراف، وفيما اندمل من لسان الأخرس، ويد الأشلِّ والأصبغ الزائد، والعين القائمة

حكومة، والحكومة في جميع ذلك أن يقوم الحاكم المجني عليه لو كان عبدًا لم يجن عليه، ثم يقوّمه لو كان عبدًا بعد الجناية عليه، ويعتبر ما بين القيمتين من ديته، فيكون قدر الحكومة في جنايته. وإذا ضرب بطن امرأة فألقت من الضرب

হানিফা বলেন: লিঙ্গোত্থানে অক্ষম এবং খাসিকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হুকুমা (বিবেচনাপ্রসূত ক্ষতিপূরণ) প্রযোজ্য। অণ্ডদ্বয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত এবং একটির ক্ষেত্রে অর্ধেক দিয়ত সাব্যস্ত হবে। নারীর উভয় স্তনের ক্ষেত্রে তার পূর্ণ দিয়ত এবং একটির ক্ষেত্রে অর্ধেক দিয়ত প্রযোজ্য। পুরুষের উভয় স্তনের ক্ষেত্রে হুকুমা ওয়াজিব হবে; তবে কারো মতে দিয়ত ওয়াজিব।
আর মাথা ও চেহারার জখম বা শিজাজ-এর ক্ষেত্রে প্রথম হলো 'খারিসাহ', যা চামড়ার উপরিভাগে আঁচড় কাটে; এতে কিসাস বা দিয়ত নেই, বরং হুকুমা রয়েছে। এরপর 'দামিয়াহ', যা চামড়া ভেদ করে রক্ত বের করে; এতে হুকুমা রয়েছে। এরপর 'দামিঘাহ' (রক্তক্ষরণকারী), যা চামড়া কাটার ফলে রক্ত বের করে দেয়; এতেও হুকুমা রয়েছে। এরপর 'মুতালহিমাহ', যা গোশতের ভেতরে প্রবেশ করে; এতে হুকুমা রয়েছে। এরপর 'বাদিআহ', যা চামড়া ভেদ করে গোশত কেটে ফেলে; এতে হুকুমা রয়েছে। এরপর 'সিমহাক', যা চামড়ার পর সবটুকু গোশত কেটে ফেলে এবং মাথার হাড়ের ওপর একটি পাতলা আবরণ অবশিষ্ট রাখে; এতেও হুকুমা রয়েছে। এই জখমগুলোর হুকুমা বা ক্ষতিপূরণ তাদের তীব্রতার ক্রম অনুসারে বৃদ্ধি পায়।
এরপর হলো 'মুদিহাহ', যা চামড়া, গোশত ও আবরণ কেটে হাড় উন্মোচিত করে দেয়; এতে কিসাস প্রযোজ্য। যদি কিসাস মাফ করে দেওয়া হয়, তবে দিয়ত হিসেবে পাঁচটি উট প্রদান করতে হবে। এরপর 'হাশিমা', যা গোশত ভেদ করে হাড় উন্মোচিত করে এবং মাথার হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়; এতে দশটি উট দিতে হবে। যদি কেউ হাড় চূর্ণ করার কারণে কিসাস নিতে চায় তবে সে তার সুযোগ পাবে না, তবে মুদিহাহ-এর জন্য কিসাস নিতে পারবে এবং হাড় চূর্ণ করার অতিরিক্ত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাঁচটি উট পাবে। ইমাম মালিক বলেন: হাড় চূর্ণ করার ক্ষেত্রে হুকুমা ওয়াজিব হবে। এরপর 'মুনাক্কিলাহ', যা হাড় উন্মোচিত করে ও চূর্ণ করে এবং হাড় স্বস্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয়, ফলে তা পুনরায় স্থাপনের প্রয়োজন হয়; এতে পনেরোটি উট দিতে হবে। যদি মুদিহাহ-এর জন্য কিসাস গ্রহণ করা হয়, তবে হাড় চূর্ণ ও বিচ্যুত করার জন্য দশটি উট প্রদান করতে হবে। এরপর 'মামুমাহ', যা 'দামিঘাহ' নামেও পরিচিত, এটি মস্তিষ্কের ঝিল্লি বা পর্দা পর্যন্ত পৌঁছে যায়; এতে পূর্ণ দিয়তের এক-তৃতীয়াংশ ওয়াজিব।

শরীরের অন্যান্য জখমের ক্ষেত্রে 'জাফিয়াহ' ব্যতীত কোনোটির দিয়ত নির্ধারিত নেই। জাফিয়াহ হলো শরীরের অভ্যন্তরীণ গহ্বর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া জখম; এতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়ত প্রযোজ্য। শরীরের জখমের ক্ষেত্রে হাড় উন্মোচিত করার মতো জখম (মুদিহাহ) ব্যতীত কিসাস নেই, বরং এতে হুকুমা ওয়াজিব হবে। যদি কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং পরে তা শুকিয়ে সুস্থ হয়ে যায়, তবে ওই অঙ্গগুলোর জন্য নির্ধারিত দিয়তসমূহ প্রদান করা ওয়াজিব হবে, এমনকি তা যদি জীবনের দিয়তের কয়েকগুণও হয়। তবে যদি কিছু অঙ্গ সুস্থ হওয়ার আগেই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তবে যা সুস্থ হয়নি তার জন্য জীবনের দিয়ত এবং যা সুস্থ হয়েছে তার জন্য ওই নির্দিষ্ট অঙ্গের দিয়ত প্রদান করা ওয়াজিব হবে। বোবা ব্যক্তির জিহ্বা, অবশ হাত, অতিরিক্ত আঙুল এবং দৃষ্টিহীন অক্ষিগোলকের ক্ষেত্রে হুকুমা সাব্যস্ত হবে। হুকুমা নির্ধারণের পদ্ধতি হলো, বিচারক আহত ব্যক্তিকে একজন ক্রীতদাস হিসেবে কল্পনা করবেন এবং জখম না হলে তার মূল্য কত হতো তা নির্ধারণ করবেন। এরপর জখমপ্রাপ্ত অবস্থায় ওই ক্রীতদাসের মূল্য কত হবে তা নির্ধারণ করবেন। এই দুই মূল্যের যে ব্যবধান, তা দিয়তের যে অনুপাতে হবে, সেই আনুপাতিক পরিমাণই হুকুমা হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর যখন কেউ কোনো নারীর পেটে আঘাত করবে এবং আঘাতের ফলে তার গর্ভপাত ঘটবে...

(ص: 343)الأحكام السلطانية للماوردي

جنينًا ميتًا، ففيه إذا كان حرًّا غرة عبد أو أمة تحملها العاقلة، ولو كان مملوكًا ففيه عشر قيمة أمه يستوي فيه الذكر والأنثى، فإن استهلَّ الجنين صارخًا ففيه الدية كاملة، ويفرق بين الذكر والأنثى، وعلى كل قاتل نفس ضمن ديتها الكفارة عامدًا كان أو خاطئًا، وأوجبها أبو حنيفة على الخاطئ دون العامد.

والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن أعوزها صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكينًا في أحد القولين، ولا شيء عليه في القول الآخر، وإذا ادَّعى قوم قتلًا على قوم، ومع الدعوى لوث، واللوث أن

يعنوا بالدعوى ما يوقع في النفس صدق المدعي، فيصير القول باللوث قول المدعي، فيحلف خمسين يمينًا، ويحكم له بالدية دون القود، ولو نكل المدعي عن اليمين أو بعضها حلف عليه خمسين يمينًا وبرئ.

وإذا وجب القود في نفس أو طرفٍ لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلَّا بإذن السلطان، فإن كان في طرف لم يمكنه السلطان من استيفائه حتى يتولّاه غيره، وأجره الذي يتولاه في مال المقتص منه دون المقتص له. وقال أبو حنيفة: تكون في مال المقتص له دون المقتص منه، فإن كان القصاص في نفس جاز أن يأذن له السلطان في استيفائه بنفسه إذا كان ثابت النفس إلّا استوفاه السلطان له بأوحى سيف وأمضاه، فإن تفرَّد وليّ القود باستيفائه من نفس أو طرف ولم يتعد عزره السلطان لافتياته عليه، وقد صار إلى حقه القود فلا شيء عليه.

মৃত ভ্রূণ; যদি সেটি মুক্ত (স্বাধীন) হয়, তবে তার জন্য একটি 'গুরাহ' (উত্তম দাস বা দাসী) প্রদান করা আবশ্যক হবে, যা হত্যাকারীর 'আকিলা' (রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন) বহন করবে। আর যদি সেটি ক্রীতদাস হয়, তবে তার জন্য তার মায়ের মূল্যের দশমাংশ প্রদান করতে হবে, যেখানে পুরুষ ও নারী উভয়ই সমান গণ্য হবে। যদি ভ্রূণটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় চিৎকার করে ওঠে (জীবিত জন্ম নেয়), তবে তার জন্য পূর্ণ দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর দিয়াতের মধ্যে পার্থক্য করা হবে। প্রত্যেক হত্যাকারী—যার ওপর দিয়াত অবধারিত হয়েছে—তার ওপর কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব, সে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী হোক বা ভুলবশত; তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এটি কেবল ভুলবশত হত্যাকারীর ওপর ওয়াজিব করেছেন, ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর ওপর নয়।

আর কাফফারা হলো এমন একজন মুমিন দাস মুক্ত করা, যে শারীরিক ও কর্মক্ষমতার জন্য ক্ষতিকর এমন সব ত্রুটি থেকে মুক্ত। যদি সে দাসের সংস্থান করতে না পারে, তবে তাকে একটানা দুই মাস রোজা রাখতে হবে। যদি সে এতেও অক্ষম হয়, তবে দুটি মতের একটি অনুযায়ী তাকে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে, আর অন্য মতানুসারে তার ওপর আর কোনো দায়ভার থাকবে না। যখন কোনো এক গোষ্ঠী অন্য কোনো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হত্যার দাবি উত্থাপন করে এবং সেই দাবির সপক্ষে 'লাওস' (বলিষ্ঠ আলামত) বিদ্যমান থাকে—আর

'লাওস' বলতে দাবির সাথে এমন পারিপার্শ্বিকতা বোঝায় যা বাদীর সত্যতার ব্যাপারে মনে প্রবল ধারণা সৃষ্টি করে—তবে সেই 'লাওস'-এর কারণে বাদীর বক্তব্যই প্রধান হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় বাদী পঞ্চাশটি শপথ করবে এবং তার পক্ষে দিয়াতের রায় দেওয়া হবে, কিসাস (প্রাণের বদলে প্রাণ) নয়। আর যদি বাদী শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায় বা শপথের কিছু অংশ বর্জন করে, তবে বিবাদীকে পঞ্চাশটি শপথ করতে হবে এবং সে দায়মুক্ত হবে। যদি প্রাণ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে কিসাস অবধারিত হয়, তবে সুলতানের (রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ) অনুমতি ব্যতিরেকে উত্তরাধিকারীর একাকী তা কার্যকর করার অধিকার নেই। যদি অঙ্গের কিসাস হয়, তবে সুলতান তাকে ততক্ষণ তা কার্যকর করতে দেবেন না যতক্ষণ না কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তা সম্পাদন করেন। আর এই কার্য সম্পাদনকারীর পারিশ্রমিক সেই ব্যক্তির সম্পদ থেকে দেওয়া হবে যার ওপর কিসাস কার্যকর করা হচ্ছে (দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি), যার সপক্ষে কিসাস নেওয়া হচ্ছে তার থেকে নয়। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, এই পারিশ্রমিক যার সপক্ষে কিসাস নেওয়া হচ্ছে তার সম্পদ থেকে পরিশোধ করতে হবে। আর যদি প্রাণের কিসাস হয়, তবে সুলতান উত্তরাধিকারীকে নিজ হাতে তা কার্যকর করার অনুমতি দিতে পারেন যদি সে মানসিকভাবে অবিচল থাকে; অন্যথায় সুলতানই তার পক্ষ থেকে ধারালো তলোয়ারের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে তা কার্যকর করবেন। যদি কিসাসের অধিকারী ব্যক্তি সুলতানের অনুমতি ছাড়াই একাকী প্রাণ বা অঙ্গের কিসাস গ্রহণ করে এবং কোনো সীমালঙ্ঘন না করে, তবে সুলতানের প্রশাসনিক এখতিয়ার খর্ব করার অপরাধে সুলতান তাকে দণ্ড (তাজির) দিতে পারেন; তবে যেহেতু সে কিসাস হিসেবে নিজের প্রকৃত হক লাভ করেছে, তাই তার ওপর অন্য কোনো দায় বা বিনিময় বর্তাবে না।

الفصل السادس: في التعزير

والتعزير: تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله، فيوافق الحدود من وجه أنه تأديب استصلاح وزجر، يختلف بحسب اختلاف الذنب، ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه:

أحدها: إنَّ تأديب ذي الهيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم" 1.

فتدرج في الناس على منازلهم: فإن تساووا في الحدود المقدَّرة فيكون تعزير من جلَّ قدره بالإعراض عنه، وتعزير من دونه بالتعنيف له، وتعزير من دونه بزواجر الكلام وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس الذي يحبسون فيه على حسب ذنبهم وبحسب هفواتهم، فمنهم من يحبس يومًا، ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غاية مقدرة. وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي: تقدَّر غايته بشهر للاستبراء والكشف، وبستة أشهر للتأديب والتقويم، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى النفي والإبعاد إذا تعدت ذنوبه إلى اجتذاب غيره إليها واستضراره بها2.

واختلف في غاية نفيه وإبعاده، فالظاهر من مذهب الشافعي تقدر بما دون الحول ولو بيوم واحد؛ لئلَّا يصير مساويًا لتعزير الحول في الزنا، وظاهر مذهب مالك أنه يجوز أن يزاد فيه على الحول بما يرى من أسباب الزواجر، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الضرب ينزلون فيه على حسب الهفوة في مقدار الضرب، وبحسب الرتبة في الامتهان والصيانة.

واختلف في أكثر ما ينتهي إليه الضرب في التعزير، فظاهر مذهب الشافعي أنَّ أكثره في الحر تسعة وثلاثون سوطًا لينقص عن أقلِّ الحدود في الخمر، فلا يبلغ بالحر أربعين، وبالعبد

---

1 صحيح: رواه أبو داود في كتاب الحدود "4375"، وأحمد "24946"، وصحَّحه الشيخ الألباني.

2 في فتاوى قاضيخان وغيره: إن كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ استحسانًا فلا يعزر، فإن عاد وتكرر منه روي عن أبي حنيفة أنه يضرب، وهذا يجب أن يكون في حقوق الله تعالى، فإن حقوق العباد لا يتمكن القاضي فيها من إسقاط التعزير. قلت: يمكن أن يكون محله ما قلت من حقوق الله تعالى ولا مناقضة؛ لأنه إذا كان ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر إلى باب القاضي والدعوى، فلا يكون مسقطًا لحق الله سبحانه وتعالى في التعزير. [شرح فتح القدير للسيواسي: 5/ 346]

.

ষষ্ঠ অধ্যায়: তা'যীর প্রসঙ্গে

তা'যীর হলো: এমন সব পাপাচারের জন্য এক প্রকার সংশোধনমূলক শাস্তি যেগুলোর ক্ষেত্রে শরীয়তে কোনো নির্ধারিত দণ্ড (হদ) নেই। এর বিধান অপরাধের ধরন এবং অপরাধীর অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এটি একদিক থেকে নির্ধারিত দণ্ডের (হদ) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যে, এটি সংশোধন এবং ভীতিপ্রদর্শনের লক্ষ্যে একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যা অপরাধের ভিন্নতা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। আবার এটি তিনটি দিক থেকে নির্ধারিত দণ্ডের সাথে ভিন্নতা রাখে: প্রথমত: আত্মমর্যাদাশীল ও সজ্জন ব্যক্তিদের শাসন করা অশ্লীল ও নির্বোধ ব্যক্তিদের শাসনের চেয়ে হালকা হতে হবে; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করে দাও।" ১

সুতরাং মানুষের মর্যাদার স্তর অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে: যদি তারা নির্ধারিত দণ্ডের ক্ষেত্রে সমান হয়, তবুও যার মর্যাদা অনেক বেশি তার তা'যীর হবে কেবল তার দিক থেকে বিমুখ হওয়ার মাধ্যমে; তার নিম্নস্তরের ব্যক্তির তা'যীর হবে তাকে তিরস্কার করার মাধ্যমে; তার চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তির তা'যীর হবে কঠোর বাক্য প্রয়োগ এবং চরম অবজ্ঞার মাধ্যমে যাতে অপবাদ বা গালিগালাজ থাকবে না। এরপর এর চেয়ে নিম্নস্তরের অপরাধীকে কারাবন্দী করার দিকে যেতে হবে, যেখানে তাদের অপরাধ ও বিচ্যুতি অনুযায়ী বন্দী করে রাখা হবে। তাদের মধ্যে কাউকে একদিন, আবার কাউকে তার চেয়ে বেশি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী আবু আব্দুল্লাহ আল-যুবায়রী বলেন: এর সর্বোচ্চ

সীমা হতে পারে পবিত্রতা যাচাই ও অনুসন্ধানের জন্য এক মাস এবং সংশোধন ও চারিত্রিক উন্নতির জন্য ছয় মাস। এরপর এর চেয়েও গুরুতর অপরাধীকে নির্বাসন ও বহিষ্কারের সাজা প্রদান করা হবে, যদি তার পাপাচার অন্যকে প্রলুব্ধ করার পর্যায়ে পৌঁছে এবং অন্যের ক্ষতির কারণ হয়। ২

নির্বাসন ও বহিষ্কারের সর্বোচ্চ সীমার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ী মাযহাবের প্রকাশ্য অভিমত অনুযায়ী এটি এক বছরের চেয়ে কম হতে হবে, এমনকি তা একদিন কম হলেও; যাতে তা ব্যভিচারের এক বছরের নির্বাসনের সমান না হয়ে যায়। আর ইমাম মালিকের মাযহাবের প্রকাশ্য অভিমত হলো, অপরাধীকে বিরত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মনে হলে তা এক বছরের বেশি হওয়া জায়েজ। এরপর এর চেয়ে বেশি গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রহারের (বেত্রাঘাত) আশ্রয় নেওয়া হবে, যেখানে প্রহারের মাত্রা বিচ্যুতির ধরন অনুযায়ী এবং অবমাননা ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

তা'যীরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কতটি বেত্রাঘাত করা যাবে সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ী মাযহাবের প্রকাশ্য মত হলো, স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে উনচল্লিশটি, যাতে তা মদ্যপানের সর্বনিম্ন নির্ধারিত দণ্ড অপেক্ষা কম হয়। সুতরাং স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংখ্যাটি চল্লিশে পৌঁছাবে না, আর দাসের ক্ষেত্রে—

---

১ সহীহ: আবু দাউদ এটি 'কিতাবুল হুদূদ'-এ (৪৩৭৫) এবং আহমাদ (২৪৯৪৬) বর্ণনা করেছেন। শেখ আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

২ ফাতওয়ায়ে কাযীখান ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে: যদি বিবাদী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয় এবং এটিই তার প্রথম অপরাধ হয়, তবে তাকে কেবল সদুপদেশ দেওয়া হবে এবং তা'যীর প্রদান করা হবে না। যদি সে পুনরায় লিপ্ত হয়, তবে ইমাম আবু হানিফা থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে প্রহার করা হবে। এটি আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত; কারণ বান্দার হকের ক্ষেত্রে বিচারক তা'যীর মওকুফ করার অধিকার রাখেন না। আমি বলি: এটি আল্লাহর হকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব এবং এতে কোনো বৈপরীত্য নেই; কারণ সে মর্যাদাবান হওয়ার কারণে তাকে বিচারকের দরবারে টেনে আনা এবং মোকদ্দমা রুজু করাই তার জন্য তা'যীর হিসেবে গণ্য হয়েছে। সুতরাং এটি তা'যীরের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর হক বাতিলকারী হবে না। [সিওয়াসীর শারহু ফাতহিল কাদীর: ৫/৩৪৬]।

عشرين، وقال أبو حنيفة: أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطًا في الحرِّ والعبد، وقال أبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون. وقال مالك: لا حدَّ لأكثره، ويجوز أن يتجاوز به أكثر الحدود. وقال أبو عبد الله الزبيري1: تعزيز كل ذنب مستنبط من حده المشروع فيه، وأعلاه خمسة وسبعون يقصر به عن حدِّ القذف بخمسة أسواط، فإن كان الذنب في التعزيز بالزنا روعي منه ما كان، فإن أصابوها بأن نال منها ما دون الفرج ضربوهما أعلى التعزير، وهو خمسة وسبعون سوطًا، وإن وجدوهما في إزار لا حائل بينهما متباشرين غير متعاملين للجماع ضربوهما ستين سوطًا، وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطًا، وإن وجدوهما خاليين في بيت عليهما ثيابهما ضربوهما ثلاثين سوطًا، وإن وجدوهما في طريق يكلمها وتكلمه ضربوهما عشرين سوطًا، وإن وجدوه يتبعها ولم يقفوا على ذلك يحققوا، وإن وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط، وهكذا يقول في التعزير بسرقة ما لا يجب فيه القطع، فإذا سرق نصابًا من غير حرز ضرب أعلى التعزير خمسة وسبعين سوطًا، وإذا سرق من حرز أقل من نصاب ضرب ستين سوطًا، واذا سرق أقلّ من نصاب من غير حرز ضرب خمسين سوطًا، فإذا جمع المال في الحرز واسترجع منه قبل إخراجه ضرب أربعين سوطًا، وإذا نقب الحرز ودخل ولم يأخذ ضرب ثلاثين سوطًا، وإذا نقب الحرز ولم يدخل ضرب عشرين سوطًا.

وإذا تعرَّض للنقب أو لفتح باب ولم يكمله ضرب عشرة أسواط، وإذا وجد معه منقب أو كان مرصدًا للمال يحقق، ثم على هذه العبارة فيما سوى هذين، وهذا الترتيب وإن كان مستحسنًا في الظاهر فقد تجرَّد الاستحسان فيه عن دليل يتقدر به، وهذا الكلام في أحد

---

1 هو حمد بن محمد بن أحمد بن العباس بن محمد بن موسى، أبو عبد الله الزبيري، ينتهي إلى الزبير بن العوام، من أهل آمل طبرستان. سمع الكثير ببلده، وسافر إلى خراسان ولقي الأئمة، وجالس الكبار وتفقّه على ناصر بن الحسين العمري، وولي القضاء بطبرستان وآستراباذ. وكان له تقدم عند السلاطين والوزراء. وكان يطوف مع العسكر ويراسل به إلى الأطراف. وقد جمع في الحديث السنن وفضائل الصحابة، وغير ذلك من التاريخ. وكان متمسكًا بآثار السلف، وله لسان في النظر والوعظ. وقدم بغداد وناظر في حلق الفقهاء، فأبان عن فضل وافر. توفّي بنيسابور سنة أربع وسبعين وأربعمائه، وحمل إلى آمل طبرستان ودفن بها.

বিশ; ইমাম আবু হানিফা বলেন: স্বাধীন ও দাস উভয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেই তা'যীরের সর্বোচ্চ সীমা হলো উনচল্লিশটি চাবুক। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন: এর সর্বোচ্চ সীমা পঁচাত্তরটি চাবুক। ইমাম মালিক বলেন: এর সর্বোচ্চ সীমার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই এবং তা'যীরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হদকেও (নির্ধারিত শাস্তি) অতিক্রম করা বৈধ। আর আবু আব্দুল্লাহ আয-যুবাইরী১ বলেন: প্রতিটি অপরাধের তা'যীর ওই অপরাধের জন্য শরীয়ত নির্ধারিত হদ থেকে আহরিত হবে; এর সর্বোচ্চ মাত্রা হবে পঁচাত্তরটি চাবুক, যা অপবাদের (কযফ) হদ থেকে পাঁচটি চাবুক কম। যদি অপরাধটি ব্যভিচার সংশ্লিষ্ট তা'যীর হয়, তবে তার ধরন বিবেচনা করা হবে। যদি তারা এমন আচরণে লিপ্ত হয় যা জৌনাঙ্গ ব্যতিরেকে কামোদ্দীপক স্পর্শ বা মিলনজাতীয়, তবে তাদের সর্বোচ্চ তা'যীর অর্থাৎ পঁচাত্তরটি চাবুক মারা হবে। যদি তাদের একই চাদরে আবৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং মাঝখানে কোনো আড়াল ছাড়াই তারা একে অপরের শরীরের সাথে লেপ্টে থাকে কিন্তু সহবাসে লিপ্ত না হয়, তবে তাদের ষাটটি চাবুক মারা হবে। আর যদি শরীরের সাথে লেপ্টে থাকা অবস্থায় না পাওয়া যায়, তবে চল্লিশটি চাবুক মারা হবে। যদি তাদের নির্জনে কোনো ঘরে পরিহিত পোশাকে পাওয়া যায়, তবে ত্রিশটি চাবুক মারা হবে। যদি তাদের রাস্তায় কথা বলতে দেখা যায়, তবে বিশটি চাবুক মারা হবে। যদি তাকে অনুসরণ করতে দেখা যায় এবং বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া যায়, তবে তা তদন্ত করা হবে; আর যদি একে অপরকে কথা ছাড়াই ইশারা করতে দেখা যায়, তবে দশটি চাবুক মারা হবে। একইভাবে তিনি এমন চুরির তা'যীরের ক্ষেত্রেও বলেন যাতে হাত কাটা ওয়াজিব নয়; সুতরাং যদি কেউ সংরক্ষিত স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও থেকে নিসাব পরিমাণ মাল চুরি করে, তবে তাকে সর্বোচ্চ তা'যীর হিসেবে

পঁচাত্তরটি চাবুক মারা হবে। যদি সংরক্ষিত স্থান থেকে নিসাবের কম পরিমাণ মাল চুরি করে, তবে ষাটটি চাবুক মারা হবে। আর যদি অসুরক্ষিত স্থান থেকে নিসাবের কম মাল চুরি করে, তবে পঞ্চাশটি চাবুক মারা হবে। যদি সংরক্ষিত স্থানে মাল একত্রিত করে কিন্তু তা বের করার পূর্বেই উদ্ধার করা হয়, তবে চল্লিশটি চাবুক মারা হবে। যদি সংরক্ষিত স্থান ছিদ্র করে ভেতরে প্রবেশ করে কিন্তু কিছু না নেয়, তবে ত্রিশটি চাবুক মারা হবে। আর যদি সংরক্ষিত স্থান ছিদ্র করে কিন্তু ভেতরে প্রবেশ না করে, তবে বিশটি চাবুক মারা হবে।
যদি ছিদ্র করার বা দরজা খোলার উপক্রম করে কিন্তু তা পূর্ণ না করে, তবে দশটি চাবুক মারা হবে। যদি তার কাছে সিঁধ কাটার সরঞ্জাম পাওয়া যায় বা সে মালের অপেক্ষায় ওত পেতে থাকে, তবে বিষয়টি তদন্ত করা হবে। অতঃপর এই দুই প্রকারের অপরাধ ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই বিন্যাস অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও এই বিন্যাসটি বাহ্যিকভাবে চমৎকার মনে হয়, তবুও এই নির্দিষ্ট মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো অকাট্য দলিল নেই। আর এই আলোচনাটি এক...

---

১ তিনি হলেন হামাদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন আব্বাস বিন মুহাম্মদ বিন মুসা, আবু আব্দুল্লাহ আয-যুবাইরী; তাঁর বংশধারা যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। তিনি আমুল তাবারিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। নিজ দেশে প্রচুর হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং খুরাসান সফর করে প্রাজ্ঞ ইমামদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তিনি উচ্চপদস্থ আলেমদের মজলিসে বসেছেন এবং নাসের বিন হুসাইন আল-উমারীর নিকট ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। তিনি তাবারিস্তান ও আস্তরাবাদের বিচারকের (কাজী) দায়িত্ব পালন করেন। সুলতান ও মন্ত্রীদের নিকট তাঁর বিশেষ প্রভাব ও মর্যাদা ছিল। তিনি সেনাবাহিনীর সাথে সফর করতেন এবং বিভিন্ন প্রান্তে সংবাদ আদান-প্রদানের দূত হিসেবে কাজ করতেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রে সুনান, সাহাবীগণের ফজিলত এবং ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তিনি সালাফে সালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণে অবিচল ছিলেন এবং বিতর্ক ও নসীহত প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ বাগ্মিতা ছিল। তিনি বাগদাদে এসে ফকীহদের মজলিসে বিতর্ক (মুনাজারা) করে স্বীয় পাণ্ডিত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। তিনি ৪৭৪ হিজরীতে নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে আমুল তাবারিস্তানে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করা হয়।

الوجوه التي يختلف فيها الحد والتعزير.

والوجه الثاني: إنَّ الحد وإن لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه، فيجوز في التعزير العفو عنه، وتسوغ الشفاعة فيه، فإن تفرّد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم، ولم يتعلق به حق لآدمي، جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير، وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اشفعوا إليّ ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء" 1.

ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي -كالتعزير في الشتم والمواثبة- ففيه حق المشتوم والمضروب، وحق السلطنة للتقويم والتهذيب، فلا يجوز لولي الأمر أن يسقط بعفوه حق للمشتوم والمضروب، وعليه أن يستوفي له حقه من تعزيز الشاتم والضارب، فإن عفا المضروب والمشتوم كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويمًا، والصفح عنه عفوًا، فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إليه سقط التعزيز الآدمي.

واختُلِفَ في سقوط حق السلطنة والتقويم على الوجهين:

أحدهما: وهو قول أبي عبد الله الزبيري أنه يسقط، وليس لولي الأمر أن يعزر فيه؛ لأنَّ حد القذف أغلظ ويسقط حكمه بالعفو، فكان حكم التعزير بالسلطنة أسقط.

والوجه الثاني: هو الأظهر أن لولي الأمر أن يعزّر فيه مع العفو قبل الترافع إليه، كما يجوز أن يعزّر فيه مع العفو بعد الترافع إليه مخالفة للعفو عن حدِّ القذف في الموضعين؛ لأن التقويم من حقوق المصلحة العامة، ولو تشاتم وتواثب والد مع ولد سقط تعزير الوالد في حق الولد، ولم يسقط تعزير الولد في حق الوالد، كما لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، وكان تعزير الأب مختصًّا بحق السلطنة، والتقويم لا حق فيه للولد، ويجوز لولي الأمر أن ينفرد بالعفو عنه، وكان تعزير

الولد مشتركًا بين حق الولد وحقوق السلطنة، فلا يجوز لولي الأمر أن ينفرد بالعفو عنه مع مطالبة الوالد به حتى يستوفيه له، وهذا الكلام في الوجه الثاني الذي يختلف فيه الحد والتعزير.

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب الزكاة " 1432"، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب "2627".

যেসব দিক দিয়ে হদ (নির্ধারিত দণ্ড) ও তা'যীর (বিবেচনামূলক দণ্ড) ভিন্ন হয়ে থাকে।
দ্বিতীয় দিক: হদ-এর ক্ষেত্রে ক্ষমা করা বা সুপারিশ করা বৈধ না হলেও, তা'যীরের ক্ষেত্রে ক্ষমা করা বৈধ এবং সেখানে সুপারিশ করাও সংগত। যদি তা'যীর কেবল শাসনকর্তার অধিকার এবং সংশোধনের বিধানের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং সেখানে কোনো মানুষের অধিকার জড়িত না থাকে, তবে কর্তৃপক্ষের জন্য ক্ষমা বা দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে যা অধিক কল্যাণকর তা বিবেচনা করা বৈধ। আর যে ব্যক্তি অপরাধ মার্জনা করার জন্য সুপারিশ করতে চায়, তার সুপারিশ গ্রহণ করাও জায়েজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "তোমরা আমার নিকট সুপারিশ করো, আর আল্লাহ তাঁর নবীর মুখে যা ইচ্ছা ফয়সালা করবেন" ১।
আর যদি তা'যীরের সাথে কোনো মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট থাকে—যেমন গালি দেওয়া বা মারপিটের কারণে প্রাপ্য দণ্ড—তবে সেখানে গালিপ্রাপ্ত বা প্রহৃত ব্যক্তির অধিকার এবং সংশোধন ও শিষ্টাচার প্রসারের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় অধিকার উভয়ই বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের জন্য নিজের ক্ষমতাবলে গালিপ্রাপ্ত বা প্রহৃত ব্যক্তির অধিকার রহিত করা বৈধ নয়। বরং তার ওপর কর্তব্য হলো আক্রমণকারী বা গালিবর্ষণকারীর ওপর তা'যীর প্রয়োগের মাধ্যমে ভুক্তভোগীর প্রাপ্য অধিকার আদায় করে দেওয়া। যদি প্রহৃত বা গালিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয়, তবে তাদের ক্ষমার পর কর্তৃপক্ষ সংশোধনমূলক তা'যীর প্রদান অথবা ক্ষমা করে দেওয়ার ক্ষেত্রে যা অধিক কল্যাণকর তা বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার রাখবেন। আর যদি মামলা উত্থাপনের আগেই তারা পরস্পর গালি বা মারপিটের বিষয়টি ক্ষমা করে দেয়, তবে মানুষের প্রাপ্য অধিকার বাবদ তা'যীর রহিত হয়ে যাবে।
তবে রাষ্ট্রীয় অধিকার ও সংশোধনমূলক দণ্ড রহিত হওয়ার ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি: এটি আবু আব্দুল্লাহ আল-জুবাইরীর অভিমত যে, এটি রহিত হয়ে যাবে এবং কর্তৃপক্ষের জন্য সেখানে তা'যীর প্রদানের অবকাশ থাকবে না; কেননা অপবাদের হদ (হাদ্দুল কাযফ) আরও কঠোর হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমার মাধ্যমে তার বিধান রহিত হয়ে যায়, সুতরাং রাষ্ট্রীয় অধিকারভুক্ত তা'যীরের বিধান রহিত হওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত।
দ্বিতীয় দিক: এটিই অধিকতর স্পষ্ট মত যে, মামলা উত্থাপনের পূর্বে ক্ষমা করে দিলেও কর্তৃপক্ষের জন্য তা'যীর প্রদানের সুযোগ থাকে, যেমনটি মামলা উত্থাপনের পর ক্ষমা করার পরও দণ্ড প্রদানের অবকাশ থাকে। এটি উভয় ক্ষেত্রেই অপবাদের হদ-এর বিধানের বিপরীত; কারণ সংশোধন হচ্ছে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি পিতা ও সন্তান একে অপরকে গালি দেয় বা মারপিট করে, তবে সন্তানের হকের কারণে পিতার ওপর থেকে তা'যীর রহিত হবে, কিন্তু পিতার হকের কারণে সন্তানের ওপর থেকে তা'যীর রহিত হবে না; ঠিক যেমন পিতাকে তার সন্তানের পরিবর্তে হত্যা করা হয় না, কিন্তু সন্তানকে তার পিতার পরিবর্তে হত্যা করা হয়। পিতার ক্ষেত্রে তা'যীরটি কেবল রাষ্ট্রীয় অধিকার ও সংশোধনের সাথে নির্দিষ্ট ছিল, সেখানে সন্তানের কোনো ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না; তাই কর্তৃপক্ষ চাইলে এককভাবে তাকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু সন্তানের ক্ষেত্রে তা'যীরটি সন্তানের অধিকার ও রাষ্ট্রীয় অধিকারের মধ্যে সম্মিলিত ছিল, তাই পিতার দাবি ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ এককভাবে তাকে ক্ষমা করতে পারেন না যতক্ষণ না তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করা হয়। এটি ছিল হদ ও তা'যীরের পার্থক্যের দ্বিতীয় দিক সংক্রান্ত আলোচনা।

---

১ সহীহ: বুখারী, যাকাত অধ্যায় "১৪৩২"; মুসলিম, সদাচরণ ও শিষ্টাচার অধ্যায় "২৬২৭"।

(ص: 347)الأحكام السلطانية للماوردي

والوجه الثالث: إنَّ الحد وإن كان ما حدث عنه من التلف هدرًا، فإن التعزير يوجب ضمان ما حدث عنه من التلف. قد أرهب عمر بن الخطاب امرأة فأخمصت بطنها فألقت جنينًا ميتًا، فشاور عليًّا عليه السلام، وحمل دية جنينها.

واختلف في محل دية التعزير فقيل: تكون على عاقلة ولي الأمر، وقيل: تكون في بيت المال، فأمّا الكفارة ففي ماله إن قيل: إن الدية على عاقلته، وإن قيل: إن الدية في بيت المال ففي محل الكفارة وجهان:

أحدهما: في ماله. والثاني: في بيت المال، وهكذا المعلّم إذا ضرب صبيًّا أدبًا معهودًا في العرف، فأفضى إلى تلفه، ضمن ديته على عاقلته والكفارة في ماله. ويجوز للزوج ضرب زوجته إذا نشزت عنه، فإن تلفت من ضربه ضمن ديتها على عاقلته إلّا إن يتعمّد قتلها فيقاد بها.

وأما صفة الضرب في التعزير فيجوز أن يكون بالعصا، وبالسوط الذي كسرت ثمرته كالحد.

واختلف في جوازه بسوط لم تكسر ثمرته، فذهب الزبيري إلى جوازه، فإن زاد في الصفة على ضرب الحدود، وأنه يجوز أن يبلغ به إنهار الدم. وذهب جمهور أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى حظره بسوط لم تكسر ثمرته؛ لأن الضرب في الحدود أبلغ وأغلظ، وهو كذلك محظور، فكان في التعزير أولى أن يكون محظورًا، ولا يجوز أن يبلغ بتعزير إنهار الدم، وضرب الحد يجب أن يفرق في البدن كله بعد توقي المواضع القاتلة؛ ليأخذ كل عضو نصيبه من الحد، ولا يجوز أن يجتمع في موضع واحد من الجسد.

واختلف في ضرب التعزير، فأجراه جمهور أصحاب الشافعي مجرى الضرب في تفريقه وحظر جمعه، وخالفهم الزبيري فجوّز جمعه في موضع واحد من الجسد؛ لأنه لما جاز إسقاطه عن جميع الجسد جاز إسقاطه عن بعضه بخلاف الحد، ويجوز أن يصلب في التعزير حيًّا.

قد صلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا على جبل يقال له: أبو ناب، ولا يمنع إذا صلب أداء طعام ولا شراب ولا يمنع من الوضوء للصلاة، ويصلي موميًا ويعيد إذا أرسل، ولا يتجاوز

তৃতীয় দিকটি হলো: হুদূদ বা শরয়ি দণ্ডের ফলে যদি কোনো প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতি ঘটে, তবে তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। কিন্তু তা'যীর বা বিবেচনামূলক শাস্তির ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হলে তার দায়ভার গ্রহণ করা আবশ্যক। উমর ইবনুল খাত্তাব এক মহিলাকে ভীত করেছিলেন, যার ফলে ভয়ে তার গর্ভ সংকুচিত হয়ে যায় এবং সে একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। অতঃপর তিনি আলী আলাইহিস সালামের সাথে পরামর্শ করলেন এবং সেই ভ্রূণের দিয়াত বা রক্তপণ আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

তা'যীরের দিয়াত কে প্রদান করবে সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন: এটি রাষ্ট্রপ্রধানের আত্মীয়-স্বজনের (আকিলা) ওপর বর্তাবে। আবার কেউ বলেছেন: এটি বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদান করা হবে। আর কাফফারার বিষয় হলো, যদি বলা হয় যে দিয়াত তার আত্মীয়-স্বজনের ওপর বর্তাবে, তবে কাফফারা তার নিজস্ব সম্পদ থেকে দিতে হবে। আর যদি বলা হয় দিয়াত বায়তুল মাল থেকে দেওয়া হবে, তবে কাফফারার ক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে:

প্রথমটি হলো: তার নিজস্ব সম্পদ থেকে। দ্বিতীয়টি হলো: বায়তুল মাল থেকে। অনুরূপভাবে, কোনো শিক্ষক যদি কোনো শিশুকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী শাসন করার জন্য প্রহার করেন এবং এর ফলে তার মৃত্যু ঘটে, তবে তার দিয়াতের দায়ভার শিক্ষকের আত্মীয়-স্বজনের ওপর বর্তাবে এবং কাফফারা তার নিজস্ব সম্পদ থেকে দিতে হবে। স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণে স্বামীর জন্য তাকে প্রহার করা বৈধ। তবে যদি তার প্রহারে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে, তবে তার দিয়াতের দায়ভার স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের ওপর বর্তাবে; তবে স্বামী যদি তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তবে তার বদলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

তা'যীরের ক্ষেত্রে প্রহারের ধরন হলো, লাঠি দিয়ে বা এমন চাবুক দিয়ে প্রহার করা জায়েজ যার অগ্রভাগ হুদূদের প্রহারের ন্যায় তীব্রতাহীন করা হয়েছে।

তীব্রতা না কমানো চাবুক ব্যবহার করা বৈধ কি না সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। জুবাইরী এটি জায়েজ মনে করেন, এমনকি যদি তা হুদূদের প্রহারের চেয়েও কঠোর হয় এবং এর ফলে রক্ত প্রবাহিত হয় তবুও। তবে ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুসারী অধিকাংশ আলিম অগ্রভাগ না ভাঙা চাবুক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ মনে করেন। কারণ, হুদূদের প্রহার অধিকতর কঠোর ও তীব্র হওয়া সত্ত্বেও সেখানে এমন চাবুক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, তাই তা'যীরের ক্ষেত্রে এটি নিষিদ্ধ হওয়া আরও বেশি সংগত। তা'যীরের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ নয়। হুদূদের প্রহারের ক্ষেত্রে শরীরের প্রাণঘাতী স্থানগুলো এড়িয়ে সারা শরীরে প্রহারের আঘাত ছড়িয়ে

দেওয়া ওয়াজিব, যাতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ দণ্ডের অংশ পায়। শরীরের কেবল এক স্থানে সব আঘাত করা জায়েজ নয়।

তা'যীরের প্রহারের বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ শাফিঈ ফকীহ একে হুদূদের প্রহারের মতোই গণ্য করেছেন—অর্থাৎ আঘাত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এক স্থানে পুঞ্জীভূত করা নিষিদ্ধ। তবে জুবাইরী তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন; তিনি শরীরের এক স্থানে আঘাত করা জায়েজ বলেছেন। তার যুক্তি হলো, যেহেতু শরীরের সকল অংশ থেকে প্রহার বাদ দেওয়া জায়েজ, তাই শরীরের নির্দিষ্ট কিছু অংশ থেকেও তা বাদ দেওয়া জায়েজ হবে, যা হুদূদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এছাড়া তা'যীরের ক্ষেত্রে অপরাধীকে জীবিত অবস্থায় শূলে চড়ানোও বৈধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে 'আবু নাব' নামক পাহাড়ে শূলে চড়িয়েছিলেন। শূলে চড়ানো অবস্থায় তাকে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে বাধা দেওয়া যাবে না এবং নামাযের জন্য ওযূ করতেও বাধা দেওয়া যাবে না। এমতাবস্থায় সে ইশারায় নামায পড়বে এবং যখন তাকে মুক্ত করা হবে, তখন সে সেই নামায পুনরায় আদায় করে নেবে। এবং তা যেন সীমা অতিক্রম না করে।

(ص: 348)الأحكام السلطانية للماوردي

بصلبه ثلاثة أيام، ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلّا قدر ما يستر عورته، ويشهر في الناس، وينادي عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يتب.

ويجوز أن يحلق شعره، ولا يجوز أن تحلق لحيته. واختلف في جواز تسويد وجوههم، فجوَّزه الأكثرون؛ ومنع منه الأقلون1.

---

1 قال المرداوي: وفي تسويد وجهه وجهان: وأطلقهما في الفروع. قلت: الصواب الجواز. وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله في تسويد الوجه.

وسئل الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا عن تسويد الوجه: قال مهنا: فرأيت كأنه كره تسويد الوجه. قاله في النكت في شهادة الزور، وذكره في الإرشاد والترغيب أنَّ عمر رضي الله عنه حلق رأس شاهد الزور.

وذكر ابن عقيل عن أصحابنا: لا يركب ولا يحلق رأسه ولا يمثل به، ثم جوزه هو لمن تكرّر منه للردع. قال الإمام أحمد رحمه الله: ورد فيه عن عمر رضي الله عنه يضرب ظهره، ويحلق رأسه، ويسخم وجهه ويطاف به، ويطال حبسه. [الإنصاف: 10/ 248] .

তিন দিন পর্যন্ত তাকে শূলে চড়িয়ে রাখা যাবে। শাস্তিমূলক সতর্কীকরণের (তা'যীর) উদ্দেশ্যে তার দেহ থেকে কাপড় খুলে নেওয়া বৈধ, তবে ততটুকু পরিমাণ রাখা আবশ্যক যা তার সতর আবৃত করে। তাকে জনসমক্ষে লজ্জিত করা যাবে এবং তার অপরাধের কথা ঘোষণা করা হবে, যদি সে বারবার একই অপরাধ করে এবং তওবা না করে।

তার মাথার চুল মুণ্ডন করা বৈধ, তবে দাড়ি মুণ্ডন করা বৈধ নয়। অপরাধীর মুখমণ্ডল কালো করে দেওয়ার বৈধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে; অধিকাংশ আলেম একে বৈধ বলেছেন এবং অল্প সংখ্যক আলেম এটি নিষেধ করেছেন।১

---

১ আল-মারদাওয়ী বলেন: মুখমণ্ডল কালো করে দেওয়ার বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে; 'আল-ফুরু' গ্রন্থে উভয় মতই নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি বলি: সঠিক মত হলো এটি বৈধ। আর ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) মুখমণ্ডল কালো করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দানে বিরত থেকেছেন।

মুহান্নার বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ)-কে মুখমণ্ডল কালো করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। মুহান্না বলেন: আমি তাকে দেখলাম যেন তিনি মুখমণ্ডল কালো করা অপছন্দ করছেন। তিনি এটি 'আন-নুকাতু ফী শাহাদাতিয যুর' গ্রন্থে বলেছেন। 'আল-ইরশাদ' ও 'আত-তারগীব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মাথা মুণ্ডন করে দিয়েছিলেন।

ইবনে আকীল আমাদের মাযহাবের আলেমদের থেকে উল্লেখ করেছেন যে: তাকে পশুর পিঠে চড়ানো হবে না, মাথা মুণ্ডন করা হবে না এবং তার কোনো অঙ্গহানি করা হবে না; অতঃপর

অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তিনি তা বৈধ বলেছেন। ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এই মর্মে বর্ণিত হয়েছে যে, তার পিঠে প্রহার করা হবে, মাথা মুণ্ডন করা হবে, মুখমণ্ডল কালো করা হবে, জনসমক্ষে ঘোরানো হবে এবং তার কারাবাস দীর্ঘায়িত করা হবে। [আল-ইনসাফ: ১০/২৪৮]।

(ص: 349)الأحكام السلطانية للماوردي

الباب العشرون: في أحكام الحسبة

الحسبة1: هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله. وقال الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 104] .

وهذا، وإن صح من كل مسلم، فالفرق فيه بين المتطوع والمحتسب2 من تسعة أوجه:

أحدها: إنَّ فرضه متعيّن على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية.

والثاني: إنَّ قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه، وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره.

والثالث: إنَّه منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاؤه، وليس المتطوع منصوبًا للاستعداء.

والرابع: إنَّ على المحتسب إجابة من استعداه، وليس على المتطوع إجابته.

والخامس: إنَّ عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة؛ ليصل إلى إنكارها، ويفحص

---

1 الحسبة لغة: اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد، والاحتساب في الأعمال الصالحات وعند المكروهات: هو البدار إلى طلب الأجر، وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها، طلبًا للثواب المرجوّ منها. وفي حديث عمر: أيها الناس، احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله، كتب له أجر عمله وأجر حسبته. [اللسان: 1/ 315] .

ويقول ابن سيده: والاحتساب: طلب الأجر، والاسم الحسبة، واحتسب فلان على فلان: أنكر عليه قبيح عمله. [المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: ص 149] .

وشرعًا: المنعة عن المنكر لحق الله، صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر. [إحياء علوم الدين: 2/ 321] .

2 يقول ابن تيمية: وأمَّا المحتسب، فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من اختصاصات الولاة والقضاء وأهل الديوان ونحوهم. [الحسبة في الإسلام: ص 8] .

বিংশ অধ্যায়: হিসবাহর বিধানাবলী প্রসঙ্গে

হিসবাহ১: হলো সৎকাজের আদেশ প্রদান করা যখন তার বর্জন প্রকাশ পায়, এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা যখন তার সম্পাদন প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: {আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে} [আল-ইমরান: ১০৪]।

যদিও এটি প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষ থেকে সম্পাদিত হওয়া শুদ্ধ, তবুও স্বেচ্ছাসেবী (মুতাতাওয়ি) এবং প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির (মুহতাসিব)২ মধ্যে নয়টি দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে:

প্রথমত: প্রশাসনিক পদের কারণে এই দায়িত্ব পালন মুহতাসিবের ওপর ব্যক্তিগত অপরিহার্য কর্তব্য (ফরজে আইন), আর অন্যদের ওপর এটি সামষ্টিক কর্তব্যের (ফরজে কিফায়া) অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত: মুহতাসিবের পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব পালন তার এমন প্রশাসনিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত যা থেকে অন্য কাজে লিপ্ত হওয়া তার জন্য বৈধ নয়; আর স্বেচ্ছাসেবীর পক্ষ থেকে এটি তার নফল আমলের অন্তর্ভুক্ত যা থেকে অন্য কাজে লিপ্ত হওয়া তার জন্য জায়েজ।
তৃতীয়ত: যে বিষয়গুলো দমন করা আবশ্যক সে বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণের জন্য মুহতাসিবকে নিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী অভিযোগ গ্রহণের জন্য নিযুক্ত নন।
চতুর্থত: যে ব্যক্তি অভিযোগ নিয়ে আসে তার ডাকে সাড়া দেওয়া মুহতাসিবের জন্য আবশ্যক, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবীর জন্য তা আবশ্যক নয়।
পঞ্চমত: প্রকাশ্য অন্যায়গুলো অনুসন্ধান করা মুহতাসিবের কর্তব্য যাতে তিনি সেগুলো প্রতিরোধ করতে পারেন; এবং তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন

---

১ আভিধানিক অর্থে হিসবাহ: এটি ‘ইহতিসাব’ থেকে আগত একটি বিশেষ্য, যেমন ‘ইতিদাদ’ থেকে ‘ইদ্দাহ’। নেক আমলের ক্ষেত্রে এবং বিপদের সময় ‘ইহতিসাব’ বলতে বোঝায় সওয়াব লাভের আশায় দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং ধৈর্য ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অথবা পুণ্যকর্মসমূহ শরয়ি পন্থায় পালনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সওয়াব হাসিল করা। উমর (রা.)-এর হাদিসে এসেছে: হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের কর্মের সওয়াব আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করো, কেননা যে ব্যক্তি তার কর্মের সওয়াব প্রত্যাশা করে, তার জন্য আমলের সওয়াব এবং হিসবাহর সওয়াব উভয়ই লেখা হয়। [লিসানুল আরব: ১/৩১৫]।
ইবন সঈদাহ বলেন: ‘আল-ইহতিসাব’ হলো প্রতিদান অন্বেষণ করা, আর এর বিশেষ্য হলো ‘হিসবাহ’। আর অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির ওপর ‘ইহতিসাব’ করেছে এর অর্থ হলো সে তার মন্দ কাজের নিন্দা বা প্রতিবাদ করেছে। [আল-মুহকাম ওয়াল মুহিতুল আজম ফিল লুগাহ: পৃ. ১৪৯]।
শরয়ি পরিভাষায়: আল্লাহর হকের খাতিরে অন্যায় কাজ থেকে বাধা প্রদান করা, যাতে নিষিদ্ধ ব্যক্তিকে পাপাচার থেকে রক্ষা করা যায়। [ইহয়াউ উলুমিদ্দিন: ২/৩২১]।
২ ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন: আর মুহতাসিবের দায়িত্ব হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা সেইসব বিষয়ে যা শাসক, বিচারক এবং দাপ্তরিক কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট এখতিয়ারভুক্ত নয়। [আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম: পৃ. ৮]।

عَمَّا ترك من المعروف الظاهر؛ ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص.

والسادس: إنَّ له أن يتخذ على إنكاره أعوانًا؛ لأنه عمل هو له منصوب وإليه مندوب؛ ليكون له أقهر وعليه أقدر، وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانًا.

والسابع: إنَّ له أن يعزِّر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود، وليس للمتطوع أن يعزر على منكر.

والثامن: أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار منكر.

والتاسع: إنَّ له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع؛ كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة فيه، فيقر وينكر من ذلك ما أدَّاه اجتهاده إليه، وليس هذا للمتطوع، فيكون الفرق بين والي الحسبة وإن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبين غيره من المتطوعين وإن جاز أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من هذه الوجوه التسعة.

وإذا كان كذلك فمن شروط والي الحسبة أن يكون حرًّا عدلًا، ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين، وعلم بالمنكرات الظاهرة1.

---

1 قال ابن تيمية موضحًا ما يندرج ويقع تحت اختصاصات المحتسب: وأما ولاية الحسبة فخاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم، فعلى متولي الحسبة أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس، وأما القتل فإلى غيره.

ويتعاهد الأئمة والمؤذنين، فمن فرّط منهم فيما يجب عليه من حقوق الأمة وخرج عن المشروع ألزمه به، واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والقاضي، واعتناء ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقامة الصلاة أهم من كل شيء، فإنها عماد الدين وأساسه وقاعدته، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله أن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة. ويأمر والي الحسبة بالجمعة والجماعة، وأداء الأمانة والصدق، والنصح في الأقوال والأعمال، وينهى عن الخيانة وتطفيف المكيال والميزان، والغش في الصناعات والبياعات، ويتفقَّد أحوال المكاييل والموازين، وأحوال الصناع الذين يصنعون الأطعمة والملابس والآلات، فيمنعهم من صناعة المحرم =

প্রকাশ্য সৎকর্মসমূহের মধ্যে যা বর্জিত হয়েছে, তা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ তিনি দেবেন; কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী অন্য কারো জন্য এমন অনুসন্ধান বা তদন্ত করা আবশ্যক নয়।

ষষ্ঠত: মন্দ কাজ প্রতিরোধে তিনি সাহায্যকারী গ্রহণ করতে পারেন; কারণ এটি এমন একটি কাজ যেজন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তার প্রতি অর্পণ করা হয়েছে; যাতে তিনি এ কাজে অধিক প্রভাবশালী ও সামর্থ্যবান হতে পারেন। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবীর জন্য এ উদ্দেশ্যে সাহায্যকারী নিয়োগ করার অধিকার নেই।

সপ্তমত: প্রকাশ্য অসৎকাজের ক্ষেত্রে তিনি 'তা'যীর' বা শাসনমূলক দণ্ড প্রদান করতে পারেন, তবে তা যেন 'হুদূদ' বা শরয়ি দণ্ডবিধির সীমা অতিক্রম না করে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবীর কোনো মন্দ কাজের ওপর দণ্ড দেওয়ার অধিকার নেই।

অষ্টমত: তিনি তার হিজবাহর দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে ভাতা বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবীর জন্য মন্দ কাজ প্রতিরোধের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ নয়।

নবমত: শরয়ি বিধানের বাইরে কেবল সামাজিক প্রথা বা 'উরফ' সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি নিজস্ব বিচারবুদ্ধি বা ইজতিহাদ প্রয়োগ করতে পারেন; যেমন বাজারে বসার স্থান নির্ধারণ এবং রাস্তার ওপর ঝুলন্ত বারান্দা নির্মাণ করা। এ জাতীয় বিষয়ে তার ইজতিহাদ তাকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত করে, সে অনুযায়ী তিনি তা অনুমোদন করতে পারেন বা বারণ করতে পারেন। স্বেচ্ছাসেবীর

এই অধিকার নেই। হিজবাহর দায়িত্বশীল এবং সাধারণ স্বেচ্ছাসেবীর মধ্যে পার্থক্য এই নয়টি দিক থেকে ফুটে ওঠে, যদিও উভয়েই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করে থাকেন। আর বিষয়টি যখন এমনই, তখন হিজবাহর দায়িত্বশীলের জন্য শর্ত হলো— তাকে স্বাধীন ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে; তিনি হবেন দূরদর্শী, দৃঢ়চেতা ও দ্বীনের ব্যাপারে কঠোর এবং প্রকাশ্য অসৎকর্মসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন।

---

১ ইবনে তাইমিয়্যাহ মুহতাসিবের কর্মপরিধি ব্যাখ্যা করে বলেন: হিজবাহর বিশেষ দায়িত্ব হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা, যা শাসক, বিচারক এবং দাপ্তরিক কর্মকর্তাদের বিশেষ এখতিয়ারভুক্ত নয়। সুতরাং হিজবাহর দায়িত্বশীলের কর্তব্য হলো সাধারণ মানুষকে সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া এবং যে সালাত আদায় করবে না তাকে প্রহার বা কারাদণ্ডের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া। তবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা অন্যের এখতিয়ারভুক্ত।

তিনি ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের তদারকি করবেন; তাদের মধ্যে কেউ যদি উম্মতের পাওনা হকের ক্ষেত্রে অবহেলা করে বা শরয়ি পদ্ধতির বাইরে চলে যায়, তবে তাকে তা পালনে বাধ্য করবেন। আর যে বিষয়ে তিনি নিজে অক্ষম হবেন, সেক্ষেত্রে সামরিক কর্তৃপক্ষ ও বিচারকের সাহায্য নেবেন। প্রজাদের সালাত কায়েমে বাধ্য করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানদের যত্নবান হওয়া অন্য সবকিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; কেননা সালাত হলো দ্বীনের খুঁটি, ভিত্তি ও মূল স্তম্ভ। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর গভর্নরদের কাছে লিখেছিলেন: "তোমাদের কার্যাবলীর মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সালাত। যে ব্যক্তি এর হেফাজত করবে এবং এর প্রতি যত্নবান হবে, সে তার দ্বীনকে রক্ষা করল। আর যে তা নষ্ট করল, সে দ্বীনের অন্যান্য বিষয়কে আরও বেশি বিনষ্ট করবে।"

হিজবাহর দায়িত্বশীল জুমুআ ও জামাত কায়েম, আমানত রক্ষা, সত্যবাদিতা এবং কথা ও কাজে নসিহতের নির্দেশ দেবেন। তিনি খেয়ানত, মাপে ও ওজনে কম দেওয়া, শিল্পকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা থেকে নিষেধ করবেন। এছাড়া তিনি পরিমাপক ও দাঁড়িপাল্লা এবং খাদ্য, বস্ত্র ও যন্ত্রপাতির কারিগরদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং তাদের নিষিদ্ধ বস্তু তৈরি করা থেকে বিরত রাখবেন...

واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي، هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري1: إنَّ له أن يحمل ذلك على رأيه واجتهاده، فعلى هذا يجب على المحتسب أن يكون عالمًا من أهل الاجتهاد في أحكام الدين؛ ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه.

والوجه الثاني: ليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده، ولا يقودهم إلى مذهبه لتسويغ الاجتهاد للكافة، وفيما اختلف فيه، فعلى هذا يجوز أن يكون المحتسب من غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفًا بالمنكرات المتفق عليها2.

= على الإطلاق -كآلات الملاهي، وثياب الحرير للرجال، ويمنع من اتخاذ أنواع المسكرات، ويمنع صاحب كل صناعة من الغش في صناعته، ويمنع من إفساد نقود الناس وتغييرها، ويمنع من جعل النقود متجرًا، فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلّا الله، بل الواجب أن تكون النقود رءوس أموال يتجر بها ولا يتجر فيها، وإذا حرَّم السلطان سكة أو نقدًا منع من الاختلاط بما أذن في المعاملة به.

ومعظم ولايته وقاعدتها الإنكار على هؤلاء الزغلية وأرباب الغش في المطاعم والمشارب والملابس وغيرها، فإن هؤلاء يفسدون مصالح الأمة، والضرر بهم عام لا يمكن الاحتراز منه، فعليه ألا يهمل أمرهم، وأن ينكل بهم وأمثالهم، ولا يرفع عنهم عقوبته. [الطرق الحكمية: ص 349، 350] .

1 هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل الإصطخري، الفقيه الشافعي؛ كان من نظراء أبي العباس بن سريج، وأقران أبي علي بن أبي هريرة، وله

مصنَّفات حسنة في الفقه منها كتاب "الأقضية"، وكان قاضي قم، وتولَّى حسبة بغداد، وكان ورعًا متقللًا، واستقضاه المقتدر على سجستان فسار إليها فنظر في مناكحاتهم فوجد معظمها على غير اعتبار الوليّ، فأنكرها وأبطلها عن آخرها. وكانت ولادته في سنة أربع وأربعين ومائتين، وتوفي في جمادى الآخرة يوم الجمعة ثاني عشرة، وقيل: رابع عشرة، وقيل: مات في شعبان سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، رحمه الله تعالى.

2 قال ابن القيم رحمه الله: من المعلوم أنَّ العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين على الأسواق، ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء، فإذا أفتى المفتون نفذه الوالي، وعمل به المحتسب، وصار عملًا، فهذا هو الذي لا يلتفت إليه في مخالفة السنن لا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والصحابة، فذاك هو السنة، فلا يخلط أحدهما وصله، فنحن لهذا العمل أشد تحكيمًا، وللعمل الآخر إذا خالف السنة أشد تركًا وبالله التوفيق، وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يفتي وسليمان بن بلال المحتسب ينفذ فتواه، فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هذا. [إعلام الموقعين: 2/ 393] .

ইমাম শাফিঈর অনুসারী ফকীহগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, যেসব বিষয়ে ফকীহগণের মাঝে ইজতিহাদী মতপার্থক্য রয়েছে, সেগুলোতে কোনো বিষয়কে অপছন্দনীয় (মুনকার) মনে করলে মানুষকে নিজের রায় ও ইজতিহাদের ওপর পরিচালিত করা তার জন্য বৈধ কি না? এ ক্ষেত্রে দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমটি: এটি আবু সাঈদ আল-ইসতাখরি-এর মত; তিনি মনে করেন, মুহতাসিবের জন্য বিষয়টি তার নিজের রায় ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে পরিচালনা করার সুযোগ রয়েছে। এই মতানুসারে, মুহতাসিবের জন্য শরয়ি বিধানাবলীতে ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন আলিম হওয়া ওয়াজিব; যাতে তিনি মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়গুলোতে নিজ ইজতিহাদ প্রয়োগ করতে পারেন।

দ্বিতীয় অভিমত: মানুষকে নিজের রায় ও ইজতিহাদের অনুগত করা কিংবা নিজের মাজহাবের দিকে পরিচালিত করার অধিকার তার নেই; কেননা ইজতিহাদী ও মতভেদপূর্ণ বিষয়ে

ইজতিহাদের অবকাশ সকলের জন্যই রয়েছে। এই মতানুসারে, মুহতাসিবের জন্য মুজতাহিদ হওয়া আবশ্যক নয়, যদি তিনি সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ (মুনকার) বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত থাকেন।

= সাধারণভাবে—যেমন বাদ্যযন্ত্র, পুরুষদের জন্য রেশমি পোশাক, সব ধরনের মাদকদ্রব্য গ্রহণে বাধা দেওয়া, প্রত্যেক কারিগরকে তার কাজে প্রতারণা থেকে বিরত রাখা, জনগণের মুদ্রার মান নষ্ট করা ও তাতে পরিবর্তন ঘটানো থেকে নিষেধ করা। অনুরূপভাবে মুদ্রাকে ব্যবসার পণ্যে রূপান্তর করা থেকে বিরত রাখা; কেননা এতে মানুষের মধ্যে এমন বিপর্যয় সৃষ্টি হয় যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। বরং মুদ্রাকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে তা দিয়ে ব্যবসা করা ওয়াজিব, মুদ্রার কেনাবেচা নয়। সুলতান যদি কোনো বিশেষ মুদ্রা বা নকশা নিষিদ্ধ করেন, তবে যে মুদ্রায় লেনদেনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার সাথে নিষিদ্ধ মুদ্রা মিশ্রিত করতে বাধা দিতে হবে।

তার প্রশাসনিক দায়িত্বের প্রধান ক্ষেত্র ও মূল ভিত্তি হলো—খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, পোশাক এবং অন্যান্য সামগ্রীতে যারা ভেজাল ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তাদের প্রতিবিধান করা। কেননা তারা উম্মাহর স্বার্থের ক্ষতি করে এবং তাদের মাধ্যমে সৃষ্ট ক্ষতি এতই ব্যাপক যে তা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। তাই তার উচিত নয় তাদের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করা, বরং তাদের এবং তাদের ন্যায় অন্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া এবং তাদের ওপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার না করা। [আত-তুরুক আল-হুকমিয়্যাহ: পৃষ্ঠা ৩৪৯, ৩৫০]।

১. তিনি হলেন আবু সাঈদ হাসান বিন আহমদ বিন ইয়াজিদ বিন ঈসা বিন ফজল আল-ইসতাখরি, প্রখ্যাত শাফিঈ ফকীহ। তিনি আবু আব্বাস বিন সুরাইজ-এর সমসাময়িক এবং আবু আলী বিন আবি হুরায়রা-এর সমগোত্রীয় ছিলেন। ফিকহ শাস্ত্রে তার চমৎকার কিছু রচনা রয়েছে, যার মধ্যে "কিতাবুল আকদিয়া" অন্যতম। তিনি কোমের কাজী ছিলেন এবং বাগদাদের হিহসবা (জনশৃঙ্খলা রক্ষা) বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও অল্পেতুষ্ট ছিলেন। আল-মুক্তাদির তাকে সিজিস্তানের কাজী হিসেবে নিয়োগ দেন; সেখানে গিয়ে তিনি তাদের বিবাহ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, অধিকাংশ বিয়ে অভিভাবকের (ওয়ালি) উপস্থিতি ছাড়াই সম্পন্ন হচ্ছে। তিনি তা অস্বীকার করেন এবং সব বাতিল করে দেন। তার জন্ম ২৪৪ হিজরীতে এবং মৃত্যু ৩২৮ হিজরীর জমাদিউল আখিরা মাসের শুক্রবার ১২ বা ১৪ তারিখ, মতান্তরে শাবান মাসে। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

২. ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: এটি সুবিদিত যে, খুলাফায়ে রাশিদিন এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগের অবসানের পর মদীনায় আমল বা কর্মপদ্ধতি পরিচালিত হতো সেখানকার মুফতি, আমীর এবং বাজারের পরিদর্শক বা মুহতাসিবদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। সাধারণ মানুষ তাদের বিরোধিতা করত না। মুফতিগণ যখন ফতোয়া দিতেন, তখন ওয়ালী বা শাসক তা বাস্তবায়ন করতেন এবং মুহতাসিব সে অনুযায়ী কাজ করতেন; আর এভাবেই তা একটি 'আমল' বা প্রথায় পরিণত হতো। মূলত এটিই সেই আমল যা সুন্নাহর পরিপন্থী হলে গ্রাহ্য হবে না—রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), খুলাফায়ে রাশিদিন ও সাহাবায়ে কেরামের আমল তো সুন্নাহ নিজেই, তাই উভয়ের মধ্যে গোলমাল করা যাবে না। সুন্নাহর ভিত্তিতে হওয়া আমলের প্রতি আমরা কঠোর অনুগামী এবং সুন্নাহ বিরোধী আমল ত্যাগে আমরা আপোষহীন; আল্লাহর কাছেই তাওফীক প্রার্থনা করি। রবিআ বিন আবি আবদির রহমান ফতোয়া দিতেন এবং মুহতাসিব সুলাইমান বিন বিলাল তা বাস্তবায়ন করতেন; আর সাধারণ মানুষ একজনের ফতোয়া এবং অন্যজনের বাস্তবায়নের ওপর আমল করত। [ইলামুল মুওয়াক্কিঈন: ২/৩৯৩]।

(ص: 352)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل:

واعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم، فأمَّا ما بينهما وبين القضاء فهي موافقة لأحكام القضاء من وجهين، ومقصورة عنه من وجهين، وزائدة عليه من وجهين:

فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء:

فأحدهما: جواز الاستعداء إليه وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق الآدميين، وليس هذا على عموم الدعاوى، وإنما يختص بثلاثة أنواع من الدعوى:

أحدها: أن يكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن.
والثاني: ما يتعلق بغش أو تدليس في مبيع أو ثمن.
والثالث: فيما يتعلق بمطل وتأخير لدَيْن مستحق مع المكنة. وإنما جاز نظره في هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداها من سائر الدعاوى؛ لتعلقها بمنكر ظاهر هو منصوب لإزالته، واختصاصها بمعروف بيّن هو مندوب إلى إقامته؛ لأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها، وليس للناظر فيها أن يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز والفصل البات، فهذا أحد وجهي الموافقة.
والوجة الثاني: إنَّ له إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه، وليس هذا على العموم في كل الحقوق، وإنما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها، وإذا وجبت باعتراف وإقرار مع تمكنه وإيساره، فيلزم المقر الموسر الخروج منها ودفعها إلى مستحقها؛ لأن في تأخيره لها منكرًا هو منصوب لإزالته.
وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء:
فاحدهما: قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات، فلا يجوز أن ينتدب لسماع الدعوى لها، ولا أن يتعرّض للحكم فيها، لا في كثير الحقوق، ولا في قليلها من درهم فما

পরিচ্ছেদ:
জেনে রাখুন যে, হিসবাহ (জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা তদারকি) হলো বিচারিক বিধান (কাদা) এবং মাজালিম (জুলুম নিরসনমূলক) বিধানের মধ্যবর্তী একটি স্তর। বিচারিক বিধানের সাথে এর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি দুটি দিক থেকে বিচারিক বিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, দুটি দিক থেকে তার চেয়ে সীমাবদ্ধ এবং দুটি দিক থেকে তার চেয়ে অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী।
বিচারিক বিধানের সাথে এর সাদৃশ্যের দুটি দিক হলো:

প্রথমটি: তার কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করা বৈধ হওয়া এবং মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর অভিযোগ শোনা। তবে এটি সাধারণ সব মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং তা কেবল তিন ধরণের মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট:

এক. পরিমাপে কারচুপি এবং ওজন বা মাপে কম দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়।

দুই. বিক্রিত পণ্য বা এর মূল্যে কোনো প্রকার প্রতারণা বা জালিয়াতি সংক্রান্ত বিষয়।

তিন. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাওনা ঋণ পরিশোধে গড়িমসি বা বিলম্ব করা সংক্রান্ত বিষয়।

অন্যান্য মামলার পরিবর্তে কেবল এই তিন ধরণের মামলার ক্ষেত্রে তার বিচারিক এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে; কারণ এগুলো প্রকাশ্য অন্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা দূর করার জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে, এবং এগুলো সুস্পষ্ট সৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত, যা প্রতিষ্ঠিত করা তার দায়িত্ব। কেননা হিসবাহর মূল বিষয় হলো অধিকার আদায়ে বাধ্য করা এবং তা আদায়ে সহায়তা করা। তবে সংশ্লিষ্ট তদারককারীর জন্য এই সীমা অতিক্রম করে চূড়ান্ত রায় বা চূড়ান্ত ফয়সালা প্রদানের এখতিয়ার নেই। এটি হলো সাদৃশ্যের প্রথম দিক।

দ্বিতীয় দিক: বিবাদীকে তার ওপর অর্পিত পাওনা আদায়ে বাধ্য করার ক্ষমতা তার রয়েছে। তবে এটি ঢালাওভাবে সব পাওনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং কেবল সেই সব পাওনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলোর অভিযোগ শোনার এখতিয়ার তার রয়েছে। আর যখন বিবাদী দায় স্বীকার করবে এবং সে পরিশোধে সক্ষম ও স্বচ্ছল হবে, তখন সেই স্বচ্ছল স্বীকৃতিকারীকে পাওনা পরিশোধ করতে এবং হকদারের কাছে তা হস্তান্তরে বাধ্য করা হবে। কেননা এটি আদায়ে বিলম্ব করা একটি অন্যায়, যা দূর করার জন্যই তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

বিচারিক বিধানের তুলনায় এর সীমাবদ্ধতার দুটি দিক হলো:

প্রথমটি: প্রকাশ্য অন্যায়ের বহির্ভূত সাধারণ মামলাগুলো শোনার ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতা। যেমন: চুক্তি, লেনদেন এবং অন্যান্য সাধারণ অধিকার ও দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ। এসব অভিযোগ শোনার জন্য তাকে নিযুক্ত করা বৈধ নয় এবং এ বিষয়ে ফয়সালা দেওয়ারও কোনো এখতিয়ার তার নেই; চাই তা অধিক পরিমাণ পাওনার বিষয় হোক কিংবা এক দিরহাম বা তার কম সামান্য পরিমাণ হোক।

دونه، إلَّا أن يرد ذلك إليه بنص صريح يزيد على إطلاق الحسبة، فيجوز ويصير بهذه الزيادة جامعًا بين قضاء وحسبة، فيراعَى فيه أن يكون من أهل الاجتهاد، وإن اقتصر به عن مطلق الحسبة، فالقضاة والحكام بالنظر في قليل ذلك وكثيره أحق، فهذا وجه.

والوجه الثاني: إنَّها مقصورة على الحقوق المعترف بها، فأمَّا ما يتداخله التجاحد والتناكر فلا يجوز للمحتسب أن يسمع بينة على إثبات الحق، ولا أن يحلف يمينًا على نفي الحق، والقضاة والحكام بسماع البينة وإحلاف الخصوم أحق.

وأما الوجهان في زيادتها على أحكام القضاء:

فأحدهما: إنه يجوز للناظر فيها أن يتعرَّض لتصفُّح ما يأمر به من المعروف وينهى عنه من المنكر وإن لم يحضره خصم مستعد، وليس للقاضي أن يتعرَّض لذلك إلا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه، فإن تعرّض القاضي لذلك خرج عن منصب ولايته، وصار متجوزًا في قاعدة نظره.

والثاني: إنَّ للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماة فيما تعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة؛ لأنَّ الحسبة موضوعة للرهبة، فلا يكون خروج المحتسب إليها بالسلاطة والغلظة تجوزًا فيها ولا خرقًا، والقضاء موضوع للمناصفة، فهو بالأناة والوقار أحق، وخروجه عنهما إلى سلاطة الحسبة تجوز وخرق؛ لأنَّ موضوع كل واحد من المنصبين مختلف، فالتجوز فيه خروج عن حده.

وأما ما بين الحسبة والمظالم فبينهما شبه موتلف وفرق مختلف.

فأما الشبه الجامع بينهما فمن وجهين:

أحدهما: إنَّ موضوعهما مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة.

والثاني: جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر.

وأما الفرق بينهما فمن وجهين:

أحدهما: إنَّ النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة، والنظر في الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة، ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى، ورتبة الحسبة أخفض، وجاز لوالي المظالم أن يوقع إلى القضاة والمحتسب، ولم يجز للقاضي أن يوقع إلى والي المظالم، وجاز

অন্যথায় নয়, তবে যদি সাধারণ হিসবাহর অতিরিক্ত কোনো সুস্পষ্ট বিধানের মাধ্যমে বিষয়টি তার নিকট অর্পণ করা হয়, তবে তা জায়েয হবে এবং এই অতিরিক্ত ক্ষমতার কারণে তিনি বিচারব্যবস্থা (কাযা) ও হিসবাহর সমন্বয়কারী হিসেবে গণ্য হবেন। এমতাবস্থায় তাকে অবশ্যই গবেষণালব্ধ আইনগত সিদ্ধান্তের যোগ্যতাসম্পন্ন (আহলুল ইজতিহাদ) হতে হবে। আর যদি তার ক্ষমতা কেবল সাধারণ হিসবাহর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে ছোট-বড় সকল বিষয়ে বিচারক ও শাসকগণই অধিক উপযুক্ত। এটি একটি দিক।

দ্বিতীয় দিকটি হলো: হিসবাহ কেবল স্বীকৃত অধিকারসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেসকল বিষয়ে অস্বীকার ও বাদানুবাদ পরিলক্ষিত হয়, সেখানে মুহতাসিবের জন্য অধিকার প্রমাণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা কিংবা অধিকার অস্বীকারের প্রেক্ষিতে শপথ পরিচালনা করা বৈধ নয়। বরং সাক্ষ্য গ্রহণ ও বিবাদীদের শপথ করানোর ক্ষেত্রে বিচারক ও শাসকগণই অধিক উপযুক্ত।

বিচারবিভাগীয় বিধানের চেয়ে হিসবাহর অতিরিক্ত ক্ষমতার দুইটি দিক হলো:

প্রথমত: হিসবাহর তদারককারী (মুহতাসিব) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ক্ষেত্রে কোনো বিবাদী বা অভিযোগকারীর উপস্থিতি ছাড়াই নিজ উদ্যোগে অনুসন্ধান ও তদারকি করার অধিকার রাখেন। কিন্তু বিচারক বা কাযীর পক্ষে কোনো ফরিয়াদী বা মামলাকারীর উপস্থিতি ব্যতিরেকে এমন হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই যার থেকে তিনি আরজি গ্রহণ করতে পারেন। যদি বিচারক এমনটি করেন, তবে তিনি তার পদের এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করবেন এবং তার বিচারিক মূলনীতির সীমা লঙ্ঘন করবেন।

দ্বিতীয়ত: হিসবাহর তদারককারীর অসৎকর্ম দমনে রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতার প্রয়োগ ও আইন প্রয়োগকারী শক্তির ব্যবহারের যে সুযোগ রয়েছে, তা বিচারকদের নেই; কারণ হিসবাহর ভিত্তি হলো ভীতি প্রদর্শন ও কঠোরতা। সুতরাং মুহতাসিবের পক্ষ থেকে শাসনতান্ত্রিক কঠোরতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করা নিয়মবহির্ভূত বা সীমা লঙ্ঘন নয়। অন্যদিকে বিচারব্যবস্থার ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার ও সমতা, তাই বিচারকের জন্য ধৈর্য ও গাম্ভীর্য বজায় রাখাই অধিক সংগত। যদি বিচারক এই দুই বৈশিষ্ট্য পরিহার করে মুহতাসিবের ন্যায় কঠোরতা অবলম্বন করেন, তবে তা

অনধিকার চর্চা ও সীমা লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে; কারণ উভয় পদেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। সুতরাং এতে কোনো পরিবর্তন আসা মানেই নিজ সীমা থেকে বিচ্যুত হওয়া।
আর হিসবাহ ও মাযালিম (প্রশাসনিক অভিযোগ আদালত)-এর মধ্যে কিছু সামঞ্জস্যপূর্ণ সাদৃশ্য এবং ভিন্নধর্মী পার্থক্য বিদ্যমান।
তাদের মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ সাদৃশ্য দুই প্রকার:
প্রথমত: উভয়ের ভিত্তিই রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতার বিশেষ প্রভাব ও কঠোর সংকল্পজাত ভীতি প্রদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
দ্বিতীয়ত: জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজ উদ্যোগে হস্তক্ষেপ করার এবং প্রকাশ্য অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন প্রতিরোধের লক্ষ্যে তৎপরতা চালানোর অধিকার উভয় ক্ষেত্রে রয়েছে।
আর এই দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্যও দুই প্রকার:
প্রথমত: মাযালিম বা প্রশাসনিক বিচারব্যবস্থা এমন সব বিষয়ের জন্য নির্ধারিত যা সম্পন্ন করতে সাধারণ বিচারকগণ অক্ষম হন। আর হিসবাহ এমন সব বিষয়ের জন্য নির্ধারিত যা বিচারকদের ভারমুক্ত রাখার জন্য (অপেক্ষাকৃত ছোট বিষয় হিসেবে) তার নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণেই মাযালিমের পদমর্যাদা উচ্চতর এবং হিসবাহর স্তর অপেক্ষাকৃত নিম্নতর। মাযালিম প্রধানের জন্য বিচারক ও মুহতাসিবের নিকট বিষয় প্রেরণ করা জায়েয, কিন্তু বিচারকের জন্য মাযালিম প্রধানের নিকট বিষয় প্রেরণ করা জায়েয নয়। এবং এটি বৈধ...

(ص: 354)الأحكام السلطانية للماوردي

له أن يوقع إلى المحتسب، ولم يجز للمحتسب أن يوقع إلى واحد منهما، فهذا الفرق الثاني: إنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم، ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم.
فصل:
وإذا استقر ما وصفناه من موضع الحسبة، ووضع الفرق بينهما وبين القضاء والمظالم فهي تشتمل على فصلين:

أحدهما: أمر بالمعروف.

والثاني: نهي عن المنكر1.

فأما الأمر بالمعروف فينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يتعلق بحقوق الله تعالى.

والثاني: ما يتعلق بحقوق الآدميين.

والثالث: ما يكون مشتركًا بينهما.

فأما المتعلق بحقوق الله عز وجل فضربان:

أحدهما: يلزم الأمر به في الجماعة دون الانفراد؛ كترك الجمعة في وطن مسكون، فإن كانوا عددًا قد اتفق على انعقاد الجمعة بهم -كالأربعين فما زاد- فواجب أن يأخذهم بإقامتها، ويأمرهم بفعلها، ويؤدّب على الإخلال بها، وإن كانوا عددًا اختلف في انعقاد الجمعة بهم فله ولهم أربعة أحوال:

أحدها: أن يتفق رأيه ورأي القوم على انعقاد الجمعة بذلك العدد، فواجب بهم فله

---

1 المقصود: إنَّ الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى هو المعروف بولاية الحسبة، وقاعدته وأصله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، ووصف به هذه الأمة وفضلها لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للناس، وهذا واجب على كل مسلم قادر، من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} . [الطرق الحكمية: ص 354] .

তিনি মুহতাসিবের (তদারককারী) নিকট নির্দেশ পাঠাতে পারেন, কিন্তু মুহতাসিবের জন্য এই দুইজনের কোনো একজনের নিকট নির্দেশ পাঠানোর অধিকার নেই। এটি হলো-

দ্বিতীয় পার্থক্য: মাজালিম (অন্যায় নিরসন) কর্তৃপক্ষের জন্য বিচারিক রায় প্রদানের অধিকার রয়েছে, কিন্তু হিসবাহ (বাজার ও নৈতিকতা নিয়ন্ত্রণ) কর্তৃপক্ষের জন্য বিচারিক রায় প্রদানের অধিকার নেই।

পরিচ্ছেদ:

আমরা হিসবাহর অবস্থান এবং বিচার বিভাগ ও মাজালিম কর্তৃপক্ষের সাথে এর পার্থক্যের যে বিবরণ দিয়েছি তা যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হলো, তখন এটি দুটি অধ্যায় বা ভাগের ওপর বিন্যস্ত হয়:

প্রথমটি: সৎকাজের আদেশ।

দ্বিতীয়টি: অসৎকাজে নিষেধ।১

সৎকাজের আদেশের বিষয়টি আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত:

প্রথমটি: যা আল্লাহ তাআলার হকের (অধিকারের) সাথে সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয়টি: যা বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট।

তৃতীয়টি: যা উভয়ের মধ্যে যৌথ বা সাধারণ।

আল্লাহ তাআলার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আবার দুই প্রকার:

প্রথমটি: যা ব্যক্তিগতভাবে নয় বরং সামষ্টিকভাবে আদেশ করা আবশ্যক; যেমন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় জুমার নামাজ পরিত্যাগ করা। যদি লোকসংখ্যা এমন হয় যাদের দ্বারা জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে—যেমন চল্লিশ বা তার বেশি—তবে তাদের মাধ্যমে জুমা কায়েম করা বাধ্যতামূলক, তাদের এটি পালনের আদেশ দিতে হবে এবং এতে কোনো বিচ্যুতি ঘটলে অনুশাসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর যদি সংখ্যাটি এমন হয় যে ক্ষেত্রে জুমার নামাজ সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, তবে তার (মুহতাসিবের) এবং লোকজনের জন্য চারটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথমটি: যদি তাঁর এবং লোকজনের অভিমত এই হয় যে উক্ত সংখ্যার মাধ্যমেই জুমার নামাজ সম্পন্ন হবে, তবে তাদের মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করা ওয়াজিব এবং তাঁর জন্য-

---

১ উদ্দেশ্য হলো: মানুষের মধ্যে এমন সব বিষয়ে ফয়সালা করা যা কোনো সুনির্দিষ্ট মামলার ওপর নির্ভর করে না, তা ‘বিলায়াতুল হিসবাহ’ (হিসবাহ কর্তৃপক্ষ) হিসেবে পরিচিত। এর মূলভিত্তি ও উৎস হলো সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ, যার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলদের পাঠিয়েছেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন এবং এই উম্মতকে এর মাধ্যমেই বিশেষায়িত করেছেন ও অন্যান্য জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এটি প্রত্যেক সক্ষম

মুসলমানের ওপর ওয়াজিব; তাদের ওপর এর আবশ্যকতা অন্যদের তুলনায় বেশি, কারণ ওয়াজিব হওয়ার মানদণ্ড হলো সক্ষমতা। সুতরাং সক্ষম ব্যক্তির ওপর যা ওয়াজিব, অক্ষম ব্যক্তির ওপর তা নয়। মহান আল্লাহ বলেন: "অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো।" [আত-তুরুক আল-হুকমিয়্যাহ: পৃষ্ঠা ৩৫৪]

(ص: 355)الأحكام السلطانية للماوردي

يأمرهم بإقامتها، وعليهم أن يسارعوا إلى أمره بها، ويكون في تأديبهم على تركها ألين من تأديبه على ترك ما انعقد الإجماع عليه.

والحالة الثانية: أن يتفق رأيه ورأي القوم على أن الجمعة لا تنعقد بهم، فلا يجوز أن يأمرهم بإقامتها وهو بالنهي عنها لو أقيمت أحق.

والحالة الثالثة: أن يرى القوم انعقاد الجمعة بهم ولا يراه المحتسب، فلا يجوز له أن يعارضهم فيها ولا يأمر بإقامتها؛ لأنه لا يراه، ولا يجوز أن ينهاهم عنها ويمنعهم مما يرونه فرضًا عليهم.

والحالة الرابعة: أن يرى المحتسب انعقاد الجمعة بهم، ولا يراه القوم، فهذا مما في استمرار تركه تعطيل الجمعة مع تطاول الزمان وبعده وكثرة العدد وزيادته، فهل للمحتسب أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بهذا المعنى أم لا؟ على وجهين لأصحاب الشافعي رضي الله عنه:

أحدهما: وهو مقتضى قول أبي سعيد الإصطخري أنه يجوز له أن يأمرهم بإقامتها اعتبارًا المصلحة؛ لئلَّا ينشأ الصغير على تركها، فيظن أنها تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه، فقد راعى زياد مثل هذا في صلاة الناس في جامعي البصرة والكوفة، فإنهم كانوا إذا صلوا في صحنه فرفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب، فأمر

بإلقاء الحصى في صحن المسجد الجامع، وقال: لست آمن أن يطول الزمان فيظنّ الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة.

والوجه الثاني: لا يتعرّض لأمرهم بها؛ لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده، ولا أن يأخذهم في الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه، وأنهم يعتقدون أن نقصان العدد يمنع من إجزاء الجمعة، وأما أمرهم بصلاة العيد فله أن يأمرهم بها، وهل يكون الأمر بها من الحقوق اللازمة أو من الحقوق الجائزة؟ على وجهين من اختلاف أصحاب الشافعي فيها، هل هي مسنونة، أو من فروض الكفاية؟ فإن قيل: إنها مسنونة كان الأمر بها ندبًا، وإن قيل: إنها من فروض الكفاية، كان الأمر بها حتمًا.

তিনি তাদের তা পালনের নির্দেশ দেবেন এবং তাদের ওপর আবশ্যক হলো তাঁর নির্দেশ পালনে দ্রুততা প্রদর্শন করা। তবে এটি ত্যাগের কারণে তাদের শাসন করার বিষয়টি ঐ বিষয় ত্যাগের দণ্ড অপেক্ষা অধিক কোমল হবে যে বিষয়ে সর্বসম্মত ঐক্য বা ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থা: তাঁর (মুহতাসিবের) মত এবং জনগণের মত যদি এ বিষয়ে এক হয় যে, তাদের দ্বারা জুমা অনুষ্ঠিত হবে না, তবে তাদের তা পালনের নির্দেশ দেওয়া তাঁর জন্য জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যদি তা পালন করা হয়, তবে তিনি বরং তা নিষেধ করার অধিক হকদার হবেন।

তৃতীয় অবস্থা: জনগণ যদি মনে করে যে তাদের দ্বারা জুমা অনুষ্ঠিত হবে কিন্তু মুহতাসিব তা মনে না করেন, তবে সে ক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতা করা বা তাদের তা পালনের নির্দেশ দেওয়া তাঁর জন্য জায়েয নয়; কারণ তিনি তা (ওয়াজিব হিসেবে) মনে করেন না। আবার তাদের তা থেকে নিষেধ করা বা তারা যা নিজেদের ওপর ফরজ মনে করে তা থেকে তাদের বিরত রাখাও তাঁর জন্য জায়েয নয়।

চতুর্থ অবস্থা: মুহতাসিব যদি মনে করেন যে তাদের দ্বারা জুমা অনুষ্ঠিত হবে কিন্তু জনগণ তা মনে না করে, তবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া এবং লোকসংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জুমা বর্জন অব্যাহত রাখলে তা জুমার বিধান অকার্যকর করার নামান্তর হবে। এমতাবস্থায়, মুহতাসিব কি এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের জুমা কায়েমের নির্দেশ দেবেন কি না? এ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (রা.)-এর অনুসারীদের মাঝে দুটি মত রয়েছে:

প্রথমটি: এটি আবু সাঈদ আল-ইসতাখরির বক্তব্যের সারমর্ম যে, জনকল্যাণ বা মাসলাহাতের বিবেচনায় তিনি তাদের তা আদায়ের নির্দেশ দিতে পারেন; যাতে ছোটরা এটি বর্জনের অভ্যাসের ওপর বেড়ে না ওঠে এবং মনে না করে যে সংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও এটি রহিত হয়ে যায় যেমন সংখ্যা হ্রাসের কারণে হয়ে থাকে। যিয়াদ বসরা ও কুফার দুটি জামে মসজিদে মানুষের নামাজের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। তারা যখন মসজিদের প্রাঙ্গণে নামাজ পড়ত এবং সেজদা থেকে মাথা তুলত, তখন তারা কপাল থেকে ধুলোবালি মুছে ফেলত। ফলে তিনি জামে মসজিদের প্রাঙ্গণে নুড়ি পাথর বিছানোর নির্দেশ দিলেন এবং বললেন: "আমি আশঙ্কা করছি যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলে ছোটরা যখন বড় হবে, তখন তারা মনে করতে পারে যে সেজদার চিহ্নের কারণে কপাল মোছা নামাজের একটি সুন্নত।"
দ্বিতীয় মত: তিনি তাদের এটি পালনের জন্য বাধ্য করবেন না; কারণ মানুষকে নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অনুগামী করার অধিকার তাঁর নেই এবং যে বিষয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণার অবকাশ রয়েছে সে বিষয়ে দ্বীনের ক্ষেত্রে নিজের মত চাপিয়ে দেওয়াও তাঁর সংগত নয়। তাছাড়া তারা বিশ্বাস করে যে সংখ্যা স্বল্পতা জুমা শুদ্ধ হওয়ার পথে অন্তরায়। আর তাদের ঈদের নামাজের নির্দেশ দেওয়ার বিষয়টি হলো, তিনি তাদের তা পালনের নির্দেশ দিতে পারেন। তবে এই নির্দেশ প্রদান কি বাধ্যতামূলক অধিকার নাকি ঐচ্ছিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত? এ বিষয়ে শাফিঈ মাযহাবের ফকিহগণের মাঝে দুটি মত রয়েছে—এটি কি সুন্নাত নাকি ফরযে কিফায়া? যদি বলা হয় এটি সুন্নাত, তবে এর নির্দেশ দেওয়া মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হবে; আর যদি বলা হয় এটি ফরযে কিফায়া, তবে এর নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক বা বাধ্যতামূলক হবে।

(ص: 356)الأحكام السلطانية للماوردي

فأمَّا صلاة الجماعة في المساجد، وإقامة الأذان فيها للصلوات فمن شعائر الإسلام، وعلامات التعبُّد التى فرَّق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دار الإسلام ودار الشرك، فإذا اجتمع أهل بلد أو محلة على تعطيل الجماعة في مساجدهم، وترك الأذان في أوقات صلواتهم، كان المحتسب مندوبًا إلى أمرهم بالأذان والجماعة في

الصلوات، وهل ذلك واجب عليه يأثم بتركه، أو محتسب له يثاب على فعله؟ على وجهين من اختلاف أصحاب الشافعي في اتفاق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة والجماعة، وهل يلزم السلطان محاربتهم عليه أم لا؟

فأما ترك صلاة الجماعة من آحاد الناس، أو ترك الأذان والإقامة لصلاته، فلا اعتراض للمحتسب عليه إذا لم يجعله عادة وإلفًا؛ لأنها من الندب الذي يسقط بالأعذار، إلَّا أن يقترن به استرابة أو يجعله إلفًا وعادة، ويخاف تعدي ذلك إلى غيره في الاقتداء به، فيراعي حكم بشواهد حاله، كالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لقد هممت أن آمر أصحابي أن يجمعوا خطبًا وآمر بالصلاة فيؤذن لها وتقام، ثم أخالف إلى منزل أقوام لا يحضرون الصلاة فأحرقها عليهم" 1.

وأما ما يأمر به آحاد الناس وأفرادهم فكتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، فيذكر بها ويأمر بفعلها، ويراعي جوابه عنها، فإن قال: تركتها لنسيان حثه على فعلها بعد ذكره، ولم يؤدبه؛ وإن قال: تركتها لتوان وهوان أدبه زجرًا، وأخذه بفعلها جبرًا، ولا اعتراض على من أخرها، والوقت باقٍ لاختلاف الفقهاء في فضل التأخير، ولكن لو كانت الجماعات في بلد قد اتفق أهله على تأخير صلواتهم إلى آخره، والمحتسب يرى فضل تعجليها، فهل له أن يأمرهم بالتعجيل على وجهين؛ لأن اعتبار جميع الناس لتأخيرها يفضي بالصغير الناشيء إلى اعتقاد أن هذا الوقت دون ما تقدم، ولو عجلها بعضهم ترك من أخرها منهم ما يراه من التأخير.

فأمَّا الأذان والقنوت في الصلوات إذا خالف فيه رأي المحتسب فلا اعتراض له فيه بأمر ولا نهي، وإن كان يرى إذا كان ما يفعل مسوغًا في الاجتهاد لخروجه عن معنى ما قدمناه.

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب الأذان "644"، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة "651".

মসজিদে জামাতে সালাত আদায় করা এবং সালাতের জন্য আযান দেওয়া ইসলামের অন্যতম নিদর্শন এবং ইবাদতের এমন এক চিহ্ন যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল ইসলাম ও দারুল শিরকের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সুতরাং যদি কোনো জনপদ বা মহল্লার অধিবাসীরা তাদের মসজিদে জামাত বন্ধ রাখা এবং সালাতের সময়ে আযান বর্জন করার ব্যাপারে একমত হয়, তবে মুহতাসিবের জন্য তাদের আযান ও জামাতে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া বিধেয়। এটি কি তার ওপর ওয়াজিব—যার ফলে তা বর্জন করলে তিনি গুনাহগার হবেন, নাকি এটি কেবল এমন নেক কাজ যার জন্য তিনি সওয়াব পাবেন? এ বিষয়ে ইমাম শাফিঈর অনুসারীদের মাঝে দুটি মত রয়েছে যে, যখন কোনো জনপদের অধিবাসীরা আযান, ইকামাহ ও জামাত বর্জনের ব্যাপারে একমত হয়, তখন সুলতানের ওপর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যক কি না।

আর ব্যক্তিগতভাবে কোনো ব্যক্তির জামাতে সালাত বর্জন করা অথবা নিজের সালাতের জন্য আযান ও ইকামাহ না দেওয়া—এ বিষয়ে মুহতাসিবের কোনো আপত্তি করার অধিকার নেই যতক্ষণ না সে এটাকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করে। কারণ এটি এমন নফল বা মুস্তাহাব কাজ যা ওজরের কারণে মওকুফ হতে পারে। তবে যদি এর সাথে কোনো সন্দেহের উদ্রেক হয় কিংবা সে একে অভ্যাসে পরিণত করে এবং তার অনুসরণে অন্যদের মাঝে এর কুপ্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে, তবে বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে তার হুকুম বিবেচনা করতে হবে। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "আমি সংকল্প করেছিলাম যে আমার সঙ্গীদের কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দিই, অতঃপর সালাতের নির্দেশ দিই এবং তার জন্য আযান ও ইকামাহ দেওয়া হয়, এরপর আমি এমন এক সম্প্রদায়ের ঘরে যাই যারা সালাতে উপস্থিত হয় না এবং তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিই।" ১।

আর সাধারণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তিনি যা আদেশ করবেন তা হলো সালাতকে ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা; এমতাবস্থায় তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সালাত আদায়ের নির্দেশ দেবেন, আর তার উত্তরটি লক্ষ্য করবেন। যদি সে বলে: "ভুলে যাওয়ার কারণে আমি এটি পালন করিনি," তবে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর তা আদায়ের উৎসাহ দেবেন এবং তাকে শাস্তি দেবেন না। আর যদি সে বলে: "অলসতা ও অবহেলার কারণে ছেড়েছি," তবে তাকে ধমক দিয়ে অনুশাসন করবেন এবং বাধ্য করে সালাত আদায় করাবেন। কিন্তু ওয়াক্ত বাকি থাকাকালীন কেউ বিলম্ব করলে তাতে আপত্তির সুযোগ নেই, কারণ বিলম্বের ফজিলত নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে যদি কোনো জনপদের সকল মানুষ

তাদের সালাতগুলো ওয়াক্তের শেষ সময় পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে একমত হয় এবং মুহতাসিব যদি প্রথম ওয়াক্তে আদায়ের ফজিলতকে গুরুত্ব দেন, তবে কি তিনি তাদের দ্রুত আদায়ের নির্দেশ দিতে পারেন? এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে; কারণ সকল মানুষ বিলম্ব করাকে নিয়ম বানালে নতুন প্রজন্মের মনে এই ধারণা জন্মাতে পারে যে এটাই সালাতের প্রকৃত সময়, এর আগের সময়টি নয়। আর যদি তাদের কেউ দ্রুত আদায় করে, তবে যে বিলম্ব করল সে তার বিলম্বের সিদ্ধান্তের ওপর রয়ে গেল।

আর আযান ও সালাতের কুনুত বিষয়ে যদি মুহতাসিবের মতের পরিপন্থী কিছু হয়, তবে আদেশ বা নিষেধের মাধ্যমে তাঁর কোনো আপত্তি করার অধিকার নেই, যদি সেই কৃত আমলটি ইজতিহাদের ভিত্তিতে স্বীকৃত হয়, কারণ এটি আমাদের আলোচিত মূলনীতির বাইরে।

---

১ সহীহ: বুখারী, কিতাবুল আযান "৬৪৪"; মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাত "৬৫১"।

(ص: 357)الأحكام السلطانية للماوردي

وكذلك الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ يخالف فيه رأي المحتسب من إزالة النجاسة بالمائعات، والوضوء بماء تغير بالمذورات الطاهرات، أو اقتصار على مسح أقل الرأس، أو العفو عن قدر الدرهم من النجاسات، فلا اعتراض له في شيء من ذلك بأمر ولا نهي، وكان له في اعتراضه عليهم في الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء وجهان، لما فيه من الإفضاء إلى استباحته على كل حال، فإنه ربما آل إلى السكر من شربه، ثم على نظائر هذا المثال -تكون أوامره بالمعروف في حقوق الله تعالى.

فصل:

فأَمَّا الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين فضربان: عام وخاص1.

فأما العام: فكالبلد إذا تعطل شربه، أو استهدم سوره، أو كان يطرقه بنو السبيل من ذوي الحاجات فكفّوا عن معونتهم، فإن كان في بيت المال مال لم يتوجه عليهم فيه ضرر، أمر بإصلاح شربهم وبناء سورهم، وبمعونة بني السبيل في الاجتياز بهم؛ لأنها حقوق تلزم بين المال دونهم، وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم، فأما إذا أعوز بيت المال كان الأمر ببناء سورهم وإصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعيهم، ومراعاة ببني السبيل فيهم متوجهًا إلى كافة ذوي المكنة، ولا يتعين أحدهم في الأمر به، وإن شرع ذوو المكنة في عملهم، وفي مراعاة بني السبيل، وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق الأمر به، ولم يلزمهم الاستئذان في مراعاة بني السبيل ولا في بناء ما كان مهدومًا، ولكن لو أرادوا هدم ما يعيدون بناءه من المسترمّ والمستهدم لم يكن لهم الإقدام على هدمه فيما عم أهل البلد من سوره وجامعهم إلا باستئذان ولي الأمر دون المحتسب؛ ليأذن لهم في هدمه

---

1 قال الإمام النووي: الضرب الثاني: ما يتعلق بحق آدمي، وينقسم إلى عام كالبلد إذا تعطل شربه، أو انهدم سوره، أو الإشارة أبناء السبيل المحتاجون وتركوا معونتهم، فإن كان في بيت المال مال لم يؤمر الناس بذلك، وإن لم يكن أمر أهل المكنة برعايتها.

وإلى خاص: كمطل المدين الموسر، فالمحتسب يأمره بالخروج عنه إذا استعداده صاحب الدين، وليس له الضرب والحبس. [روضة الطالبين: 10/ 218] .

একইভাবে পবিত্রতার বিষয়টিও, যখন এটি এমন কোনো গ্রহণযোগ্য পন্থায় সম্পন্ন করা হয় যা মুহতাসিবের মতের পরিপন্থী; যেমন তরল পদার্থের মাধ্যমে নাপাকি দূর করা, পবিত্র কোনো বস্তু মিশ্রিত হওয়ার কারণে পরিবর্তিত পানি দিয়ে অজু করা, মাথার সামান্য অংশ মাসাহ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা, কিংবা দিরহাম পরিমাণ নাপাকি ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য করা—এসব ক্ষেত্রে আদেশ বা নিষেধের মাধ্যমে তাঁর কোনো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। তবে পানির অভাবে খেজুরের নাবিজ দিয়ে অজু করার ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি করার বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে;

কারণ এটি সব অবস্থায় একে বৈধ সাব্যস্ত করার দিকে ধাবিত করে, এমনকি এটি পান করার মাধ্যমে মাতলামি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। অতঃপর এই ধরণের উদাহরণের ভিত্তিতেই আল্লাহ তাআলার হকের ক্ষেত্রে সৎকাজের আদেশ প্রযোজ্য হবে।

পরিচ্ছেদ:

আর মানুষের হকের ক্ষেত্রে সৎকাজের আদেশ দুই প্রকার: সাধারণ এবং বিশেষ।১

সাধারণ প্রকারটি হলো: যেমন কোনো শহরের পানির ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়া, অথবা এর প্রতিরক্ষা প্রাচীর ধসে পড়া, কিংবা অভাবী মুসাফিররা সেখানে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তাদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা। এমতাবস্থায় যদি বায়তুল মালে (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) অর্থ থাকে যাতে জনগণের ওপর কোনো ক্ষতিকর বোঝা না চাপে, তবে তিনি পানির ব্যবস্থা সংস্কার, প্রাচীর নির্মাণ এবং পথচারী মুসাফিরদের অতিক্রমের সময় সাহায্য করার আদেশ দেবেন; কারণ এগুলো জনগণের পরিবর্তে বায়তুল মালের ওপর বর্তানো হক। অনুরূপভাবে যদি তাদের মসজিদ বা জামে মসজিদগুলো বিধ্বস্ত হয়। তবে যদি বায়তুল মাল শূন্য হয়, তখন প্রাচীর নির্মাণ, পানির ব্যবস্থা সংস্কার, মসজিদ ও জামে মসজিদগুলোর আবাদ করা এবং মুসাফিরদের দেখাশোনা করার আদেশটি সকল সামর্থ্যবান ব্যক্তির প্রতি নির্দেশিত হবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ওপর এই আদেশ বর্তাবে না। যদি সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা তাদের কাজ শুরু করে দেন এবং মুসাফিরদের দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও তা পরিচালনা করতে থাকেন, তবে মুহতাসিবের পক্ষ থেকে আদেশ প্রদানের আবশ্যকতা রহিত হয়ে যাবে। মুসাফিরদের দেখাশোনা কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু তারা যদি কোনো সংস্কারযোগ্য বা ধ্বংসপ্রায় স্থাপনা পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে তা ভেঙে ফেলতে চায়, তবে শহরের প্রাচীর বা জামে মসজিদের মতো জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে তারা মুহতাসিব নয়, বরং রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া তা ভাঙার পদক্ষেপ নিতে পারবে না; যাতে তিনি তাদের তা ভাঙার অনুমতি প্রদান করেন।

---

১ ইমাম নববী বলেন: দ্বিতীয় প্রকার: যা মানুষের হকের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি দুই ভাগে বিভক্ত—সাধারণ: যেমন কোনো শহরের পানির ব্যবস্থা নষ্ট হওয়া, বা প্রাচীর ভেঙে পড়া, কিংবা অভাবী মুসাফিরদের আগমন সত্ত্বেও মানুষ তাদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা। এমতাবস্থায় যদি বায়তুল মালে অর্থ থাকে তবে জনগণকে সেই আদেশ দেওয়া হবে না, আর যদি না থাকে তবে সামর্থ্যবানদের তা পালনের নির্দেশ দেওয়া হবে।

আর বিশেষ: যেমন সচ্ছল ঋণী ব্যক্তির টালবাহানা করা। এক্ষেত্রে মুহতাসিব পাওনাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে ঋণ পরিশোধের আদেশ দেবেন, তবে তার প্রহার বা কারারুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। [রওজাতুত তালিবিন: ১০/২১৮]।

(ص: 358)الأحكام السلطانية للماوردي

بعد تضميينه القيام بعمارته، وجاز فيما خص من المساجد في العشائر والقبائل ألا يستأذنوه، وعلى المحتسب أن يأخذهم ببناء ما هدموه، وليس له أن يأخذهم بإتمام ما استأنفوه، فأما إذا كف ذوو المكنة عن بناء ما استهدم وعمارة ما استرم، فإن كان المقام في البلد ممكنًا، وكان الشرب -وإن قلَّ مقنعًا تاركهم وأباه، وإن تعذَّر المقام في البلد لتعطيل شربه واندحاض سوره نظر، فإن كان البلد ثغرًا يضر بدار الإسلام تعطيله لم يجز لولي الأمر أن يفسخ في الانتقال عنه، وكان حكمه حكم النوازل إذا حدثت في قيام كافة ذوي المكنة به، وكان تأثير المحتسب في مثل هذا إعلام السلطان به، وترغيب أهل المكنة في عمله، وإن لم يكن هذا البلد ثغرًا مصرًا بدار الإسلام كان أمره أيسر وحكمه أخف، ولم يكن للمحتسب أن يأخذ أهله جبرًا بعمارته؛ لأن السلطان أحق أن يقوم به، ولو أعوزه المال فيستجده فيقول لهم: المستحب ما استدام عجز السلطان عنه أنتم مخيرون بين الانتقال عنه، أو التزام ما يصرف في مصالحه التي يمكن معها دوام استيطانه عنه، أنتم مخيرون بين الانتقال عنه أو التزام ما يصرف في مصالحه التي يمكن معها دوام استيطانه، فإن أجابوه إلى التزام ذلك كلف جماعتهم ما تسمح به نفوسهم، ولم يجز أن يأخذ كل واحد منهم ما سهل عليه وطاب نفسًا به، ومن أعوزه المال أعان بالعمل حتى إذا اجتمعت كفاية المصلحة، أو يلوح اجتماعها لضمان كل واحد من أهل المكنة قدرًا

طاب به نفسًا، شرع حينئذ في عمل المصلحة، وأخذ كل ضامن من الجماعة بالتزام ما ضمنه، وإن كان مثل هذا الضمان لا يلزم في المعاملات الخاصة؛ لأن حكم ما عم من المصالح موسع، فكان حكم الضمان فيه أوسع، وإذا عمت هذه المصلحة لم يكن للمحتسب أن يتقدم بالقيام بها حتى يستأذن السلطان فيها؛ لئلَّا يصير بالتفرُّد مفتاتًا عليه؛ إذ ليست هذه المصلحة من معهود حسبته، فإن قلَّت وشقَّ استئذان السلطان فيها، أو خيف زيادة الضرر لبعد استئذانه جاز شروعه فيها من غير استئذان.

وأما الخاص فكالحقوق إذا مطلت، والديوان إذا أخرت، فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها مع المكنة إذا استعداده أصحاب الحقوق، وليس له أن يحبس بها؛ لأن الحبس حكم، وله أن يلازم عليها؛ لأنَّ لصاحب الحق أن يلازم، وليس له الأخذ بنفقات الأقارب لافتقار ذلك إلى اجتهاد شرعي فيمن تجب له، ويجب عليه إلا أن يكون الحاكم قد فرضها، فيجوز له

তাকে এর সংস্কার ও নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করার পর; আর গোত্র ও বংশসমূহের জন্য বিশেষায়িত মসজিদের ক্ষেত্রে তাদের অনুমতি না নেওয়া বৈধ। মুহতাসিবের দায়িত্ব হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশ পুনর্নির্মাণের জন্য তাদের বাধ্য করা, তবে নতুন কোনো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাদের বাধ্য করার অধিকার তার নেই। আর যদি সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনা পুনর্নির্মাণ এবং জরাজীর্ণ অংশ সংস্কার থেকে বিরত থাকে, তবে যদি সেই জনপদে বসবাস করা সম্ভব হয় এবং পানির সংস্থান অল্প হলেও পর্যাপ্ত হয়, তবে মুহতাসিব তাদের অব্যাহতি দেবেন। কিন্তু যদি পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া বা শহরের প্রতিরক্ষা প্রাচীর ধসে পড়ার কারণে সেখানে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে বিষয়টি বিবেচনাধীন থাকবে। যদি শহরটি এমন একটি সীমান্ত এলাকা হয় যার জনশূন্যতা দারুল ইসলামের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে উলুল আমরের পক্ষে সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া বৈধ হবে না। এ ক্ষেত্রে এর বিধান হবে আকস্মিক সংকটের মতো, যা নিরসনে সকল সামর্থ্যবান ব্যক্তির এগিয়ে আসা ওয়াজিব। এমন পরিস্থিতিতে মুহতাসিবের ভূমিকা হবে সুলতানকে বিষয়টি অবহিত করা এবং সামর্থ্যবানদের এ কাজে উৎসাহিত করা। আর যদি শহরটি দারুল

ইসলামের জন্য ক্ষতিকর কোনো সীমান্ত এলাকা না হয়, তবে বিষয়টি সহজতর এবং এর বিধানও শিথিল। সে ক্ষেত্রে মুহতাসিব শহরের অধিবাসীদের জোরপূর্বক সংস্কার কাজে বাধ্য করতে পারবেন না; কারণ সুলতানই এর আঞ্জাম দেওয়ার অধিক হকদার। যদি সুলতানের তহবিলের অভাব হয়, তবে তিনি তাদের নতুন করে বলবেন: "যতক্ষণ সুলতান এ বিষয়ে অক্ষম থাকবেন, ততক্ষণ এ কাজ চালিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। আপনারা এখান থেকে চলে যাওয়া অথবা এর জনবসতি টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করার মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে পারেন; আপনারা এখান থেকে চলে যাওয়া অথবা এর জনবসতি টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করার মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে পারেন।" যদি তারা তা মেনে নিতে সম্মত হয়, তবে তিনি তাদের সামষ্টিকভাবে ততটুকু ভার অর্পণ করবেন যতটুকু তারা সানন্দে গ্রহণ করে। প্রত্যেকের ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে না যা সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিতে রাজি নয়। যার অর্থের অভাব রয়েছে সে শ্রম দিয়ে সাহায্য করবে, যতক্ষণ না জনকল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত সংস্থান হয়; অথবা যখন প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তি স্বেচ্ছায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেবে এবং পর্যাপ্ত সংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্ট হবে, তখন জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু করা হবে। এরপর প্রতিশ্রুতি দানকারী দলের প্রত্যেকের কাছ থেকে তাদের অঙ্গীকারকৃত অংশ গ্রহণ করা হবে। যদিও সাধারণ ব্যক্তিগত লেনদেনের ক্ষেত্রে এ ধরনের জামানত বাধ্যতামূলক নয়, তবে জনকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রটি ব্যাপক হওয়ায় এখানে জামানতের বিধানও প্রশস্ত। যখন এই জনকল্যাণমূলক কাজ বৃহৎ পরিসরের হবে, তখন সুলতানের অনুমতি ছাড়া মুহতাসিবের জন্য তা শুরু করা সমীচীন হবে না; যাতে তিনি নিজ সিদ্ধান্তে কাজ করে সুলতানের ওপর হস্তক্ষেপকারী না হয়ে পড়েন। কেননা এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ তার সাধারণ হিসবাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে যদি কাজটির পরিধি ছোট হয় এবং সুলতানের অনুমতি নেওয়া দুঃসাধ্য হয়, অথবা অনুমতি নিতে দেরি করলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে অনুমতি ছাড়াই তা শুরু করা জায়েজ।

আর ব্যক্তিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন: পাওনা আদায়ে টালবাহানা করা এবং পাওনা আদায়ে বিলম্ব করা—পাওনাদাররা আবেদন করলে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা পরিশোধ না করলে মুহতাসিব তাদের তা পরিশোধের নির্দেশ দেবেন। তবে এ জন্য তিনি তাদের কারারুদ্ধ করতে পারবেন না; কারণ কারাদণ্ড প্রদান একটি বিচারিক রায়। তবে তিনি তাদের ওপর নজরদারি বা চাপ সৃষ্টি করতে পারেন; কারণ পাওনাদারের সেই অধিকার রয়েছে। নিকটাত্মীয়দের

ভরণপোষণের বিষয়ে ফয়সালা দেওয়ার অধিকার তার নেই, কারণ কার ওপর ভরণপোষণ ওয়াজিব এবং কার জন্য ওয়াজিব তা নির্ধারণের জন্য শরয়ি ইজতিহাদের প্রয়োজন; তবে যদি বিচারক তা ইতিপূর্বেই নির্ধারণ করে দিয়ে থাকেন, তবে মুহতাসিবের জন্য তা কার্যকর করা জায়েজ।

(ص: 359)الأحكام السلطانية للماوردي

أن يأخذ له بأدائها. وكذلك كفالة من تجب كفالته من الصغار. والاعتراض له فيها حتى يحكم بها الحاكم. فيجوز حينئذ للمحتسب أن يأمر بالقيام لها على الشروط المستحقة فيها.

وأما قبول الوصايا والودائع. فليس له أن يأمر فيها أعيان الناس وآحادهم. ويجوز أن يأمر بها على العموم حثًّا على التعاون بالبر والتقوى. ثم على هذا المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق الآدميين.

فصل:

وأما الأمر بالمعروف فيما كان مشتركًا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامي أكفاءهن إذا طلبن. وإلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن. وله تأديب من خالف في العدة من النساء. وليس له تأديب من امتنع من الأولياء1. ومن نفى ولدًا قد ثبت فراش أمه ولحوق نسبه أخذه بأحكام الآباء جبرًا وعزره عن النفي أدبًا. ويأخذ السادة بحقوق العبيد والإماء. وأن لا يكلفوا من الأعمال ما لا يطيقون. وكذلك أرباب البهائم يأخذهم بعلوفتها إذا قصروا. وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق.

ومن أخذ لقيطًا وقصر في كفالته، أمره أن يقوم بحقوق التقاطه من التزام كفالته، أو

---

1 قال النووي: الثالث: الحقوق المشتركة كأمر الأولياء بإنكاح الأكفاء وإلزام النساء أحكام العدد، وأخذ السادة بحقوق الأرقاء، وأصحاب البهائم بتعهدها، وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق، وذكر في المنكرات أن من يغير هيئة عبادة كجهره في صلاة سرية وعكسه، وزيادة في الأذان يمنعه وينكر عليه، ومن تصدى للتدريس أو الوعظ وليس هو من أهله، ولا يؤمن اغترار الناس به في تأويل أو تحريف أنكر عليه المحتسب وشهر أمره؛ لئلَّا يغتر به، وإذا رأى رجلًا واقفا مع امرأة في شارع يطرقه الناس لم ينكر عليه، وإن كان في طريق خال، فهو موضع ريبة فينكر ويقول: وإن كانت محرمًا لك فصنها عن مواقف الريب، ولا ينكر في حقوق الآدميين كتعديه في جدار جاره باستعداء صاحب الحق وينكر على من يطيل الصلاة من أئمة المساجد المطروقة، وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم وقصروا في النظر والخصومات والسوقي، الذي يختص بمعاملة النساء تختبر أمانته، فإن ظهرت منه خيانة منع من معاملتهن وهذا باب لا تتناهي صورة. [روضة الطالبين: 10/ 218] .

যাতে তিনি সেগুলোর আদায় নিশ্চিত করেন, আর তেমনিভাবে যাদের তত্ত্বাবধান আবশ্যক সেই অপ্রাপ্তবয়স্কদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব, এবং এ বিষয়ে ওজর-আপত্তি পেশ করা যতক্ষণ না বিচারক সে বিষয়ে ফয়সালা করেন। এমতাবস্থায় মুহতাসিবের জন্য উপযুক্ত শর্তাবলির ভিত্তিতে তা পালনের নির্দেশ দেওয়া বৈধ হবে।

আর অসিয়ত এবং আমানত গ্রহণ করার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার তার নেই; তবে নেকি ও তাকওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সাধারণ নির্দেশ দেওয়া বৈধ। মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে সৎকাজের আদেশ প্রদানের বিষয়টি এই দৃষ্টান্তের অনুসারী হবে।

পরিচ্ছেদ:

আর আল্লাহ তাআলার হক এবং বান্দার হকের মাঝে যা কিছু অভিন্ন, সেগুলোর ক্ষেত্রে সৎকাজের আদেশ প্রদান; যেমন—অভিভাবকদের বাধ্য করা যেন তারা বিবাহযোগ্য নারীদের তাদের সমকক্ষ পাত্রের সাথে বিয়ে দেয় যখন তারা তা প্রার্থনা করে এবং বিচ্ছেদের পর নারীদের ইদ্দতের বিধান পালনে বাধ্য করা। ইদ্দতের বিধান লঙ্ঘনকারী নারীদের তিনি শাস্তি দিতে পারবেন, তবে বিবাহে অসম্মত অভিভাবকদের তিনি শাস্তি দিতে পারবেন না ১।

আর যে ব্যক্তি এমন কোনো সন্তানকে অস্বীকার করে যার মায়ের দাম্পত্য সম্পর্ক এবং বংশপরিচয় সাব্যস্ত হয়েছে, তবে মুহতাসিব তাকে বাধ্যতামূলকভাবে পিতার ওপর অর্পিত বিধানসমূহ পালনে বাধ্য করবেন এবং পিতৃত্ব অস্বীকারের দায়ে তাকে সতর্কতামূলক শাস্তি দেবেন। আর তিনি মালিকদের দাস-দাসীদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে বাধ্য করবেন এবং খেয়াল রাখবেন যেন তাদের ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কাজ চাপিয়ে দেওয়া না হয়। অনুরূপভাবে গবাদিপশুর মালিকরা যদি পশুকে খাদ্য প্রদানে অবহেলা করে, তবে তিনি তাদের খাদ্য দিতে বাধ্য করবেন এবং যেন তারা পশুর সাধ্যের বাইরে কাজ না করায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

আর যে ব্যক্তি কোনো কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে গ্রহণ করে তার লালন-পালনে অবহেলা করে, তিনি তাকে সেই কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর দায়দায়িত্ব তথা লালন-পালনের বাধ্যবাধকতা পালনের নির্দেশ দেবেন, অথবা

---

১ ইমাম নববী বলেছেন: তৃতীয় প্রকার: যৌথ অধিকারসমূহ; যেমন অভিভাবকদের তাদের সমকক্ষ পাত্রের সাথে বিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া, নারীদের ইদ্দতের বিধান পালনে বাধ্য করা, মালিকদের দাস-দাসীদের অধিকার আদায়ে বাধ্য করা এবং গবাদিপশুর মালিকদের তাদের পশুর প্রতি যত্নবান হওয়া এবং সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ না করানোর নির্দেশ দেওয়া। তিনি ‘মুনকারাত’ (অসৎকাজ) প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইবাদতের রূপ পরিবর্তন করে ফেলে—যেমন নিভৃত নামাজ উচ্চস্বরে পড়া অথবা এর বিপরীত করা এবং আজানে অতিরিক্ত কিছু যুক্ত করা—তবে তিনি তাকে বাধা দেবেন এবং এর প্রতিবাদ করবেন। আর যে ব্যক্তি শিক্ষকতা বা ওয়ায-নসীহতের যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও তাতে লিপ্ত হয় এবং মানুষের বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে মুহতাসিব তার প্রতিবাদ করবেন এবং তার অবস্থা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেবেন যেন কেউ বিভ্রান্ত না হয়। আর যদি তিনি কোনো ব্যক্তিকে জনবহুল রাস্তায় কোনো মহিলার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তবে তিনি প্রতিবাদ করবেন না;

কিন্তু রাস্তাটি যদি নির্জন হয় তবে তা সন্দেহের বিষয়, তাই তিনি প্রতিবাদ করবেন এবং বলবেন: সে যদি তোমার মাহরামও হয় তবুও তাকে সন্দেহের স্থান থেকে দূরে রাখো। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত হকের ক্ষেত্রে তিনি প্রতিবাদ করবেন না—যেমন প্রতিবেশীর দেওয়ালে অনধিকার প্রবেশ—যতক্ষণ না হকদার ব্যক্তি অভিযোগ না করে। আর জনবহুল মসজিদের ইমামরা যদি নামাজ দীর্ঘ করেন, তবে তিনি তাদের প্রতিবাদ করবেন। একইভাবে বিচারকরা যদি বিবাদীদের সাথে দেখা করতে বাধা দেন কিংবা বিচার ও বিবাদ নিষ্পত্তিতে অবহেলা করেন। আর যে দোকানদার শুধু নারীদের সাথে বেচাকেনা করে, তার আমানতদারী পরীক্ষা করা হবে; যদি তার খেয়ানত প্রকাশ পায় তবে তাকে নারীদের সাথে লেনদেন করতে নিষেধ করা হবে। আর এটি এমন একটি অধ্যায় যার রূপরেখা অসীম। [রওদাতুত তালিবিন: ১০/ ২১৮]।

(ص: 360)الأحكام السلطانية للماوردي

تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم بها، وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها يأخذه بمثل ذلك من القيام بها، ويكون ضامنًا للضالة بالتقصير، ولا يكون به ضامنًا اللقيط. وإذا أسلم الضالة إلى غيره ضمنها؛ ولا يضمن اللقيط بالتسليم إلى غيره، ثم على نظائر هذا المثال يكون أمره بالمعروف في الحقوق المشتركة.

فصل:

وأما النهي عن المنكرات فينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما كان من حقوقه الله تعالى.

والثاني: ما كان من حقوق الآدميين.

والثالث: ما كان مشتركًا بين الحقين.

فأَمَّا النهي عنها في حقوق الله تعالى، فعلى ثلاثة أقسام:

أحدها: ما تعلق بالعبادات.

الثاني: ما تعلق بالمحظورات.

والثالث: ما تعلق بالمعاملات.

فأما المتعلق بالعبادات: فكالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة، والمتعمد تغيير أوصافها المسنونة مثل: من يقصد الجهر في صلاة الإسرار، والإسرار في صلاة الجهر، أو يزيد في الصلاة، أو في الأذان أذكارًا غير مسنونة، للمحتسب إنكارها، وتأديب المعاند فيها إذا لم يقل بما ارتكبه إمام متبوع، وكذلك إذا أخل بتطهير جسده، أو ثوبه، أو موضع صلاته أنكره عليه إذا تحقق ذلك منه، ولا يؤاخذه بالتهم ولا بالظنون؛ كالذي حكي عن بعض الناظرين في الحسبة أنه سأل رجلًا داخلًا إلى المسجد بنعلين، هل يدخل بهما بيت طهارته، فلمَّا أنكر ذلك أراد إحلافه عليه؛ وهذا جهل من فاعله تعدّى فيه أحكام الحسبة، وغلب فيه سوء الظنة، وهكذا لو ظنَّ برجل أنه يترك الغسل من الجنابلة، أو يترك الصلاة والصيام لم يؤاخذه بالتهم، ولم يعامله بالإنكار، ولكن يجوز له بالتهمة أن يعظ ويحذر من عذاب الله على إسقاط

এটি এমন ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করা যিনি এর দায়িত্ব গ্রহণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। তদ্রূপ হারানো বস্তু প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তা রক্ষায় অবহেলা করে, তবে তাকে অনুরূপভাবে তা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিতে হবে। অবহেলার কারণে সে হারানো মালের জন্য দায়বদ্ধ হবে, তবে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর (লাকিত) ক্ষেত্রে সে একইভাবে দায়বদ্ধ হবে না।

যদি সে হারানো মাল অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করে, তবে সে তার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে; কিন্তু কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে অন্যের কাছে হস্তান্তরের কারণে সে দায়বদ্ধ হবে না। অতঃপর এই উদাহরণের সদৃশ বিষয়সমূহে যৌথ অধিকারের ক্ষেত্রে তার 'সদকাজের আদেশ' (আমর বিল মা'রুফ) কার্যকর হবে।

পরিচ্ছেদ:

আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার (নাহি আনিল মুনকার) বিষয়টি তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথমত: যা মহান আল্লাহর হকের (অধিকারের) অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত: যা মানুষের হকের অন্তর্ভুক্ত।
তৃতীয়ত: যা উভয় হকের মধ্যে যৌথভাবে বিদ্যমান।
আল্লাহর হকের অন্তর্ভুক্ত মন্দ কাজগুলো থেকে নিষেধ করার বিষয়টি আবার তিন প্রকার:
প্রথমত: যা ইবাদত সংক্রান্ত।
দ্বিতীয়ত: যা নিষিদ্ধ বা হারাম বিষয় সংক্রান্ত।
তৃতীয়ত: যা মুয়ামালাত বা লেনদেন সংক্রান্ত।
ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে: যেমন কেউ ইবাদতের শরয়ি কাঠামো লঙ্ঘন করার ইচ্ছা পোষণ করে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এর সুন্নাহসম্মত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তন করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ: কেউ যদি নিম্নস্বরের সালাতে উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করার বা উচ্চস্বরের সালাতে নিম্নস্বরে পড়ার ইচ্ছা করে, অথবা সালাত কিংবা আজানে এমন সব জিকির বৃদ্ধি করে যা সুন্নাহসম্মত নয়; তবে মুহতাসিবের (ধর্মীয় পরিদর্শক) জন্য তা প্রত্যাখ্যান করা এবং এ বিষয়ে হঠকারিতা প্রদর্শনকারীকে শাসন করার অধিকার রয়েছে, যদি না সেই ব্যক্তির কৃত কর্মটি কোনো অনুসরণীয় ইমামের মতের সপক্ষে হয়। অনুরূপভাবে, যদি কেউ নিজের দেহ, পোশাক কিংবা সালাতের স্থান পবিত্র করার ক্ষেত্রে অবহেলা করে, তবে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর মুহতাসিব তার প্রতিবাদ করবেন। তিনি কেবল সন্দেহ বা অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে পাকড়াও করবেন না; যেমনটি হিসবাহ ব্যবস্থার কোনো এক পরিদর্শক সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মসজিদে জুতা পরে প্রবেশকারী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সে কি এগুলো পরেই শৌচাগারে প্রবেশ করে? যখন লোকটি তা অস্বীকার করল, তখন তিনি তাকে এ বিষয়ে শপথ করাতে চাইলেন। এটি ছিল ওই পরিদর্শকের পক্ষ থেকে একটি অজ্ঞতাসূলভ কাজ যাতে তিনি হিসবাহর সীমানা লঙ্ঘন করেছেন এবং কুধারণাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। একইভাবে, যদি কেউ কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে এমন ধারণা করে যে সে জানাবাত (অপবিত্রতা) থেকে গোসল বর্জন করছে, কিংবা সালাত ও সিয়াম ত্যাগ করছে, তবে সে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাকে অভিযুক্ত করবে না এবং তার সাথে কঠোর আচরণ করবে না। তবে সন্দেহের প্রেক্ষিতে সে তাকে উপদেশ দিতে পারে এবং আল্লাহর ইবাদত বর্জন করার কারণে তাঁর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করতে পারে।

حقوقه، والإخلال بمفروضاته. فإن راه يأكل في شهر رمضان لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله عن سبب أكله إذا التبست أحواله، فربما كان مريضًا أو مسافرًا، ويلزمه السؤال إذا ظهرت منه أمارات الريب، فإن ذكر من الأعذار ما يحتمله حاله كف عن زجره، وأمره بإخفاء أكله؛ لئلَّا يعرض نفسه للتهمة، ولا يلزم إحلافه عند الاسترابة بقوله؛ لأنه موكول إلى أمانته، فإن لم يذكر عذرًا جاهر بالإنكار عليه مجاهرة ردع، وأدَّبه تأديب زجر، وهكذا لو علم عذره في الأكل أنكر عليه المجاهرة بتعريض نفسه للتهمة، ولئلَّا يقتدي به من ذوي الجهالة ممن لا يميز حال عذره من غيره.

وأما الممتنع من إخراج الزكاة: فإن كان من الأموال الظاهرة، فعامل الصدقة يأخذها منه جبرًا أخص، وهو بتعزيزه على الغلول إن لم يجد له عذرًا أحق، وإن كان من الأموال الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالإنكار عليه من عامل الصدقة؛ لأنه لا اعتراض للعامل في الأموال الباطنة، ويحتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخص؛ لأنه لو دفعها له أجزأه، ويكون تأديبه معتبرًا بشواهد حاله في الامتناع من إخراج زكاته، فإن ذكر أنه يخرجها سرًّا وكل إلى أمانته فيها.

وإن رأى رجلًا يتعرّض لمسألة الناس في طلب الصدقة، وعلم أنه غني إما بمال أو عمل أنكره عليه وأدّبه فيه، وكان المحتسب بإنكاره أخص من عامل الصدقة. قد فعل عمر رضي الله عنه مثل ذلك بقوم من أهل الصدقة، ولو رأى عليه آثار الغنى وهو يسأل الناس أعلمه تحريمها على المستغني عنها، ولم ينكره عليه لجواز أن يكون في الباطن فقيرًا، وإذا تعرّض للمسألة ذو جلد وقوة على العمل، زجره وأمره أن يتعرض للاحتراف بعمله، فإن أقام على المسألة عزره حتى يقلع عنها.

وإن دعت الحالة عند إلحاح من حرمت عليه المسألة لمال أو عمل إلى أن ينفق علي ذي المال جبرًا من ماله، ويؤجر ذا العمل وينفق عليه من أجرته لم يكن للمحتسب

أن يفعل ذلك بنفسه؛ لأن هذا حكم والحكام به أحق، فيرفع أمره إلى الحاكم ليتولى ذلك أو يأذن فيه.

وإذا وجد من يتصدّى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ، ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب، أنكر عليه التصدي لما ليس هو من أهله، وأظهر

তার অধিকারসমূহ এবং তার ফরয বিধানসমূহের লঙ্ঘন। যদি সে কাউকে রমজান মাসে আহার করতে দেখে, তবে তার অবস্থা অস্পষ্ট হলে আহারের কারণ জিজ্ঞাসা না করে তাকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হবে না। কারণ সম্ভবত সে অসুস্থ অথবা মুসাফির হতে পারে। তবে যদি তার মধ্যে সন্দেহের আলামত প্রকাশ পায়, তবে তাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। অতঃপর সে যদি এমন কোনো ওজরের কথা উল্লেখ করে যা তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে তাকে ধমক দেওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং আহার করার বিষয়টি গোপন রাখার নির্দেশ দেবে; যাতে সে নিজেকে অপবাদের সম্মুখীন না করে। আর তার কথার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ জাগলে তাকে শপথ করানোর প্রয়োজন নেই; কারণ বিষয়টি তার আমানতদারিতার ওপর ন্যস্ত। কিন্তু সে যদি কোনো ওজর পেশ না করে, তবে জনসমক্ষে কঠোরভাবে তাকে বাধা প্রদান করবে এবং সংশোধনমূলক শাস্তি দেবে। একইভাবে, যদি তার আহারের ওজর জানাও থাকে, তবুও জনসমক্ষে আহার করার কারণে তাকে তিরস্কার করবে যাতে সে নিজেকে অপবাদের মুখে না ফেলে এবং যাতে অজ্ঞ লোকেরা, যারা ওজরগ্রস্ত ও নিরপরাধের পার্থক্য বোঝে না, তারা তাকে অনুসরণ না করে।

আর যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে: যদি তা প্রকাশ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা (আমিল) তা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করার জন্য অধিক উপযুক্ত। আর যদি সে কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর না দেখায়, তবে যাকাত ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে তাকে দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে সেই (আমিল) অধিক হকদার। কিন্তু যদি তা অপ্রকাশ্য সম্পদ হয়, তবে সম্ভবত এই অপকর্ম প্রতিরোধের ক্ষেত্রে 'মুহতাসিব' যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তার চেয়ে বেশি উপযুক্ত; কারণ অপ্রকাশ্য সম্পদের ক্ষেত্রে কর্মকর্তার হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। আবার এমন সম্ভাবনাও আছে যে, যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তাই এ ক্ষেত্রে প্রতিরোধের জন্য অধিক উপযুক্ত; কারণ তাকে যাকাত প্রদান করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় যাকাত

প্রদানে অস্বীকৃতি জানানোর পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে তার শাস্তির বিষয়টি বিবেচিত হবে। যদি সে দাবি করে যে সে গোপনে যাকাত আদায় করে, তবে বিষয়টি তার আমানতদারিতার ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

আর যদি সে কাউকে দেখে যে সে মানুষের কাছে হাত পেতে সদকা চাইছে, অথচ সে জানে যে ব্যক্তিটি সম্পদশালী অথবা উপার্জনে সক্ষম, তবে তাকে তা থেকে নিষেধ করবে এবং তাকে শাসন করবে। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রতিহত করার জন্য যাকাত আদায়কারীর চেয়ে মুহতাসিবই বেশি উপযুক্ত। উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সদকা গ্রহীতাদের একদলের সাথে এরূপ আচরণ করেছিলেন। আর যদি তার মধ্যে সচ্ছলতার চিহ্ন দেখা যায় কিন্তু সে মানুষের কাছে সাহায্য চায়, তবে তাকে জানানো উচিত যে সম্পদশালীর জন্য সদকা গ্রহণ করা হারাম। তবে সে ক্ষেত্রে সরাসরি তাকে তিরস্কার করবে না, কারণ হতে পারে সে সংগোপনে অভাবী। আর যদি স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম কোনো ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি করে, তবে তাকে ধমক দেবে এবং নিজের পেশাগত কাজে আত্মনিয়োগ করতে নির্দেশ দেবে। এরপরও যদি সে ভিক্ষাবৃত্তি চালিয়ে যায়, তবে তাকে এমনভাবে দণ্ড দেবে যাতে সে তা ছেড়ে দেয়।

আর যদি পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, যার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করা হয়েছে (সম্পদ বা কর্মক্ষমতা থাকার কারণে), তাকে বাধ্য করতে হবে নিজের সম্পদ থেকে ব্যয় করার জন্য, অথবা কর্মক্ষম ব্যক্তিকে কাজে নিয়োগ করে তার উপার্জিত অর্থ তার ওপর ব্যয় করার প্রয়োজন হয়, তবে মুহতাসিব নিজে তা করার ক্ষমতা রাখবেন না। কারণ এটি একটি বিচারিক রায়, যা বিচারকগণের (হাকাম) আওতাভুক্ত। সুতরাং বিষয়টি বিচারকের নিকট উত্থাপন করতে হবে, যাতে তিনি নিজেই তা সম্পন্ন করেন অথবা এর অনুমতি প্রদান করেন।

আর যদি কাউকে দেখা যায় যে সে শরীআহ্ বিজ্ঞানের দায়িত্ব নিয়েছে অথচ সে তার যোগ্য নয়—চাই সে ফকীহ হোক বা ওয়াজকারী—এবং মানুষের তার মাধ্যমে বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, যেমন ভুল ব্যাখ্যা প্রদান বা উত্তরের বিকৃতি ঘটানো, তবে তার অযোগ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার বিরোধিতা করতে হবে এবং প্রকাশ করে দিতে হবে...

(ص: 362)الأحكام السلطانية للماوردي

أمره لئلَّا يغتر به. ومن أشكل عليه أمره لم يقدم عليه بالإنكار عليه إلّا بعد الاختبار. قد مرَّ علي ابن أبي طالب عليه السلام بالحسن البصري وهو يتكلم على الناس فاختبره، فقال له: ما عماد الدين؟ فقال: الورع، قال: فما آفته؟ قال: الطمع، قال: تكلّم الآن إن شئت، وهكذا لو ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم قولًا خرق به الإجماع، وخالف فيه النص، وردّ قوله علماء عصره، أنكره عليه وزجره عنه، فإن أقلع وتاب وإلا فالسلطان بتهذيب الدين أحق، وإذا تعرض بعض المفسرين لكتاب الله تعالى بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيل إلى باطن بدعة تتكلف له غمض معانيه، أو تفرَّد بعض الرواة بأحاديث مناكير تنفر منها النفوس، أو يفسد بها التأويل كان على المحتسب إنكار ذلك والمنع منه، وهذا إنما يصح منه إنكاره إذا تميز عنده الصحيح من الفاسد، والحق من الباطل، وذلك من أحد وجهين، إما أن يكون بقوته في العلم واجتهاده فيه حتى لا يخفى ذلك عليه، وإما بأن يتفق علماء الوقت على إنكاره وابتداعه فيستعدونه، فيعول في الإنكار على أقاويلهم، وفي المنع منه على اتفاقهم.

فصل:

وأما ما تعلق بالمحظورات فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" 1.

فيقدم الإنكار ولا يعجل بالتأديب قبل الإنكار.

حكي إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الرجال أن يطوفوا مع النساء، فرأى رجلًا يصلي مع النساء فضربه بالدرة، فقال الرجل: والله إن كنت أحسنت لقد ظلمتني، وإن كنت أسأت فما علمتني، فقال عمر: لا أقتص اليوم، قال: فاعف عني. قال: لا أعفو، فافترقا على ذلك، ثم لقيه من الغد فتغيّر لون عمر، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، كأنّي أرى ما كان مني قد أسرع فيك؟ قال: أجل، قال: فأشهد الله أني قد عفوت

---

1 صحيح: رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة، والرقائق "2518"، والنسائي في كتاب الأشربة "5711"، والدارمي في كتاب البيوع "2532"، وأحمد "27819"، وصححه الشيخ الألباني.

...তার কার্যকলাপ যেন তাকে প্রলুব্ধ না করে। যার বিষয়টি অস্পষ্ট, তাকে পরীক্ষা না করে তার প্রতি প্রতিবাদ জানানো বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন নয়। আলী ইবনে আবি তালিব (আলাইহিস সালাম) হাসান বসরীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যখন তিনি লোকজনের সামনে বক্তব্য রাখছিলেন। আলী (রা.) তাকে পরীক্ষা করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: "দীনের স্তম্ভ কী?" তিনি উত্তর দিলেন: "তাকওয়া বা পরহেজগারী।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন: "এর ব্যাধি কী?" তিনি উত্তর দিলেন: "লোভ।" আলী (রা.) বললেন: "এখন তুমি চাইলে কথা বলতে পারো।" একইভাবে, যদি ইলমের সাথে সম্পৃক্ত কেউ এমন কোনো নতুন মতবাদ (বিদআত) উদ্ভাবন করে যা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (ইজমা) লঙ্ঘন করে, অকাট্য ভাষ্য (নস) বিরোধী হয় এবং সমকালীন আলেমগণ তার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তার প্রতিবাদ করতে হবে এবং তাকে তা থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। যদি সে তা ত্যাগ করে তাওবা করে তবে ভালো, অন্যথায় শাসকই দীনের সংস্কার সাধনে অধিক হকদার। আর যদি কোনো মুফাসসির আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ হয়ে আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বর্জন করে এমন কোনো বিদআতী গূঢ় অর্থের আশ্রয় নেন যা অত্যন্ত জটিল ও কষ্টসাধ্য, অথবা যদি কোনো বর্ণনাকারী এমন সব অগ্রহণযোগ্য (মুনকার) হাদিস বর্ণনা করেন যা স্বভাবজাতভাবে মানুষের মন গ্রহণ করে না কিংবা যার কারণে সঠিক ব্যাখ্যা বিকৃত হয়ে যায়, তবে মুহতাসিবের (তত্ত্বাবধায়ক) কর্তব্য হলো তার প্রতিবাদ করা এবং তা নিষিদ্ধ করা। তার পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদ বা নিষেধ তখনই সংগত হবে যখন সে সঠিক ও ত্রুটিযুক্ত এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম হবে। এটি দুটি উপায়ে হতে পারে: হয় তার গভীর জ্ঞান ও গবেষণালব্ধ (ইজতিহাদি) শক্তির মাধ্যমে যাতে বিষয়টি তার কাছে অস্পষ্ট না থাকে, অথবা তৎকালীন আলেমগণ যদি তার প্রতিবাদ ও বিদআতী হওয়ার বিষয়ে একমত হয়ে তার প্রতিকার চান, তবে মুহতাসিব আলেমদের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবাদ জানাবেন এবং তাদের ঐকমত্যের আলোকে তা নিষিদ্ধ করবেন।

পরিচ্ছেদ:

নিষিদ্ধ বা গর্হিত কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো মানুষকে সন্দেহজনক স্থান ও অপবাদের ক্ষেত্রসমূহ থেকে বিরত রাখা। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে তা পরিত্যাগ করে সেই দিকে ধাবিত হও যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না।" ১

প্রথমে প্রতিবাদ বা সতর্কবার্তা প্রদান করতে হবে এবং সতর্ক করার আগে দণ্ড বিধানে ত্বরান্বিত হওয়া যাবে না।

ইব্রাহিম নাখয়ি থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পুরুষদের নারীদের সাথে তাওয়াফ করতে নিষেধ করেছিলেন। একদা তিনি এক ব্যক্তিকে নারীদের সাথে সালাত আদায় করতে দেখে তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন। তখন লোকটি বলল: "আল্লাহর কসম, আমি যদি ভালো কাজ করে থাকি তবে আপনি আমার প্রতি অবিচার করেছেন, আর যদি আমি মন্দ কাজ করে থাকি তবে আপনি তো আমাকে তা শেখাননি।" উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "আমি আজ প্রতিশোধ (কিসাস) গ্রহণ করব না।" লোকটি বলল: "তবে আমাকে ক্ষমা করে দিন।" তিনি বললেন: "আমি ক্ষমা করব না।" এই অবস্থায় তারা বিচ্ছিন্ন হলেন। পরদিন যখন তাদের সাক্ষাৎ হলো, তখন উমরের চেহারার বর্ণ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। লোকটি বলল: "হে আমিরুল মুমিনীন, আমার মনে হচ্ছে আমার বিষয়টি আপনাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, তাই।" লোকটি বলল: "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

---

১ সহীহ: তিরমিযী, কিয়ামতের বর্ণনা ও কোমলতা অধ্যায় (২৫১৮), নাসাঈ, পানীয় অধ্যায় (৫৭১১), দারেমী, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায় (২৫৩২), আহমদ (২৭৮১৯), এবং শায়খ আলবানী এটিকে সহীহ হিসেবে গণ্য করেছেন।

عنك. وإذا رأى وقفه رجل مع امرأة في طريق سابل لم تظهر منهما أمارات الريب لم يعترض عليهما بزجر ولا إنكار، فما يجد الناس بدًّا من هذا.

وإن كانت الوقفة في طريق خال، فخلو المكان ريبة فينكرها، ولا يعجل بالتأديب عليهما حذارًا من أن تكون ذات محرم، وليقل: إن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب، وإن كانت أجنبية فخف الله تعالى من خلوة تؤديك إلى معصية الله تعالى؛ وليكن زجره بحسب الأمارات.

حكى أبو الأزهر أنَّ ابن عائشة رأى رجلًا يكلم امرأة في طريقها، فقال له: إن كانت حرمتك إنه لقبيح بك أن تكلمها بين الناس، وإن لم تكن حرمتك فهو أقبح، ثم ولَّى عنه وجلس للناس يحدثهم، فإذا برقعة قد ألقيت في حجره مكتوب فيها "من الكامل":

إن التي أبصرتني ... سحرًا أكلمها رسول

أدت إليّ رسالة ... كادت لها نفسي تسيل

من فاتر الألحاظ بجـ ... ـذب خصره ردف ثقيل

متنكبًا قوس الصبا ... يرمي وليس له رسيل

فلو أن أذنك بيننا ... حتى تسمع ما تقول

لرأيت ما استقبحت من ... أمري هو الحسن الجميل

فقرأها ابن عائشة ووجد مكتوبًا على رأسها أبو نواس1، فقال ابن عائشة: ما لي وللتعويض لأبي نواس، وهذا القدر من إنكار ابن عائشة كافٍ لمثله، ولا يكون لمن ندب للإنكار من ولاه الحسبة كافيًا، وليس فيما قال أبو نواس تصريح بفجور؛ لاحتمال أن يكون إشارة إلى ذات محرم، وإن كانت شواهد حاله وفحوى كلامه ينطقان بفجوره وريبته، فيكون من مثل أبي نواس منكرًا، وإن جاز أن يكون من غيره منكرًا. فإذا رأى المحتسب في هذا

---

1 هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح، أبو علي الحكمي المعروف بأبي نواس، كان جده مولى الجراح بن عبد الله الحكمي والي خراسان. ولد أبو نواس بالبصرة، ونشأ بها، ثم خرج إلى الكوفة مع والبة بن الحبابئ، ثم صار إلى بغداد، هكذا قال محمد بن داود بن الجراح في كتاب الورقة. وقال غيره: إنه ولد بالأهواز، ونقل منها وعمر سنتان.

আপনার পক্ষ থেকে। যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো জনাকীর্ণ রাস্তায় একজন মহিলার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় এবং তাদের মধ্যে সন্দেহের কোনো লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তবে তাদের প্রতি ধমক বা আপত্তির মাধ্যমে বাধা দেওয়া যাবে না; কেননা মানুষের জন্য এ থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন।

আর যদি নির্জন পথে তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, তবে স্থানের নির্জনতা সন্দেহের উদ্রেক করে, তাই তা প্রতিহত করতে হবে। তবে তারা একে অপরের মাহরাম হতে পারে—এই আশঙ্কায় তাদের শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়ো করবে না। বরং বলবে: "যদি তিনি মাহরাম হন, তবে তাঁকে সংশয়যুক্ত স্থান থেকে রক্ষা করুন। আর যদি তিনি গায়রে মাহরাম (অপরিচিতা) হন, তবে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন এমন নির্জনতা থেকে, যা আপনাকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে ধাবিত করবে।" আর শাসনের কঠোরতা হতে হবে পরিস্থিতির লক্ষণ অনুযায়ী।

আবু আল-আযহার বর্ণনা করেন যে, ইবনে আইশাহ এক ব্যক্তিকে রাস্তার মাঝে এক মহিলার সাথে কথা বলতে দেখে তাকে বললেন: "যদি তিনি আপনার মাহরাম হন, তবে মানুষের সামনে তাঁর সাথে কথা বলা আপনার জন্য শোভনীয় নয়। আর যদি তিনি আপনার মাহরাম না হন, তবে তা আরও বেশি জঘন্য।" এরপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং লোকজনকে হাদীস শোনানোর জন্য বসলেন। হঠাৎ তাঁর কোলে একটি চিরকুট এসে পড়ল, যাতে 'কামিল' ছন্দে লিখিত ছিল:

সে নারী যাকে আপনি ভোরের আলোয় … আমার সাথে কথা বলতে দেখেছেন, সে এক দূত
সে আমার কাছে এমন এক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে … যার ব্যথায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়
এক অলস চাহনির অধিকারিণীর পক্ষ থেকে … যার কটিদেশ আকর্ষণীয় এবং নিতম্ব ভারি
সে যৌবনের ধনু কাঁধে নিয়ে … তীর নিক্ষেপ করে, যার কোনো সমকক্ষ নেই

যদি আপনার কর্ণ আমাদের মাঝে থাকত ... এবং শুনতেন সে কী বলছে
তবে যে বিষয়টিকে আপনি আমার জন্য মন্দ মনে করেছেন ... তা আপনার কাছে অত্যন্ত সুন্দর মনে হতো
ইবনে আইশাহ সেটি পড়লেন এবং চিরকুটের উপরে 'আবু নুওয়াস'১ নাম লেখা পেলেন।
ইবনে আইশাহ বললেন: "আবু নুওয়াসের সাথে বিরোধে জড়ানোর আমার কী প্রয়োজন!"
ইবনে আইশাহর এই পর্যায়ের প্রতিবাদ তাঁর মতো ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু হিসবাহ (সদাচার রক্ষা) বিভাগের দায়িত্বশীলদের জন্য এটুকু প্রতিবাদ যথেষ্ট নয়। আর আবু নুওয়াস যা বলেছেন তাতে অশ্লীলতার স্পষ্ট ঘোষণা ছিল না; কারণ এটি কোনো মাহরামের প্রতি ইঙ্গিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও তার অবস্থা এবং কথার বিষয়বস্তু তার অনৈতিকতা ও সন্দেহেরই পরিচয় দিচ্ছিল। তাই আবু নুওয়াসের মতো ব্যক্তির পক্ষ থেকে এটি নিন্দনীয় কাজ হিসেবেই গণ্য হবে, যদিও অন্য কারো পক্ষ থেকে তা নিন্দনীয় না হওয়ার সুযোগ থাকত। সুতরাং যখন মুহতাসিব এ ক্ষেত্রে দেখবেন...

---

১. তিনি হলেন হাসান বিন হানি বিন আবদিল আউয়াল বিন আস-সাব্বাহ, আবু আলি আল-হাকামি, যিনি আবু নুওয়াস নামে পরিচিত। তাঁর দাদা খুরাসানের গভর্নর আল-জাররাহ বিন আব্দুল্লাহ আল-হাকামির আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। আবু নুওয়াস বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। এরপর ওয়ালিবাহ বিন আল-হুবাব এর সাথে কুফায় যান, তারপর বাগদাদে চলে আসেন। মুহাম্মদ বিন দাউদ বিন আল-জাররাহ 'কিতাব আল-ওয়ারাকাহ'-তে এমনটিই বলেছেন। অন্যরা বলেছেন যে, তিনি আহওয়াজে জন্মগ্রহণ করেন এবং দুই বছর বয়সে সেখান থেকে স্থানান্তরিত হন।

(ص: 364)الأحكام السلطانية للماوردي

الحال ما ينكره تأنَّى وتفحص وراعى شواهد الحال، ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار، كالذي رواه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال: بينما عمر بن

الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت إذ رأى رجلًا يطوف وعلى عاتقه امرأة مثل المهاة -يعني حسنًا وجمالًا- وهو يقول [من السريع] :

قدت لهذي جملًا ذلولًا ... موطأ أتبع السهولا

أعدلها بالكف أن تميلا ... أحذر أن تسقط أو تزولا

أرجو بذاك نائلًا جزيلا

قال له عمر رضي الله عنه: يا عبد الله، من هذه التي وهبت لها حجك؟ فقال: امرأتي يا أمير المؤمنين، وإنها حمقاء مرغامة، أكول قمامة، لا يبقى لها خامة. فقال له: ما لك لا تطلقها؟ قال: إنها حسناء لا تفرك، وأم صبيان لا تترك. قال: فشأنك بها.

قال أبو زيد: المرغام المختلط، فلم يقدم عليه بالإنكار حتى استخبره، فلما انتفت عنه الريبة لان له.

وإذا جاهر رجل بإظهار الخمر، فإن كان مسلمًا أراقها عليه وأدابه، وإن كان ذميًّا أدبه على إظهارها.

واختلف الفقهاء في إراقتها عليه، فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تراق عليه؛ لأنها عنده من أموالهم المضمونة في حقوقهم، ومذهب الشافعي أنها تراق عليهم؛ لأنها تضمن عنده في حق مسلم ولا كافر.

وأما المجاهرة بإظهار النبيذ، فعند أبي حنيفة أنه من الأموال التي يقر المسلمون عليها، فيمتنع من إراقته، ومن التأديب على إظهاره. وعند الشافعي أنه ليس بمال كالخمر، وليس في إراقته غرم، فيعتبر والي الحسبة بشواهد الحال فيه، فينتهي فيه عن المجاهرة، ويزجر عليها إن كان لمعاقرة، ولا يريقه عليه إلا أن يأمره بإراقته حاكم من أهل الاجتهاد؛ لئلَّا يتوجه عليه غرم إن حوكم فيه.

وأما السكران إذا تظاهر بسكره وسخف بهجره أدبه على السكر والهجر تعزيزًا لا حدًّا؛

যে পরিস্থিতিতে আপত্তির উদ্রেক হয়, সেখানে ধীরস্থিরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি বিবেচনা করা উচিত। প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করার আগে প্রতিবাদ জানাতে তাড়াহুড়ো করা সমীচীন নয়। যেমনটি ইবনে আবী যিনাদ হিশাম ইবনে উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কাবার চারপাশ তাওয়াফ করার সময় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে তার কাঁধে এক রূপবতী নারীকে নিয়ে তাওয়াফ করছে—যার সৌন্দর্য ছিল বন্য হরিণীর ন্যায়। সে ব্যক্তি কবিতা আবৃত্তি করছিল:

এই রূপসীর তরে আমি হয়েছি এক অনুগত উট … সমতল ও সহজ পথে চলি আমি নিটুট।
হাতের তালু দিয়ে সামলে রাখি পাছে সে হেলে পড়ে … শঙ্কা জাগে মনে সে যদি পিছলে নিচে পড়ে।
এরই উসিলায় আমি এক মহান প্রতিদান আশা করি।

উমর (রা.) তাকে বললেন: হে আল্লাহর বান্দা, ইনি কে যার জন্য তুমি তোমার হজের সওয়াব উৎসর্গ করছ? সে উত্তর দিল: হে আমীরুল মুমিনীন, ইনি আমার স্ত্রী; তবে তিনি কিছুটা নির্বোধ ও উগ্র মেজাজের, অত্যন্ত পেটুক এবং কোনো কিছুই জমিয়ে রাখেন না। উমর (রা.) বললেন: তুমি তাকে তালাক দিচ্ছ না কেন? সে বলল: তিনি অত্যন্ত রূপবতী তাই তাকে ঘৃণা করা যায় না, আর তিনি সন্তানদের মা তাই তাকে ছেড়ে দেওয়াও যায় না। উমর (রা.) বললেন: তবে তুমি তার সাথেই থাকো।

আবু যায়েদ বলেন: 'মিরগাম' বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যার আচরণে ভারসাম্য নেই। উমর (রা.) প্রকৃত অবস্থা না জেনে তার ওপর কোনো আপত্তি করেননি। যখন তার সংশয় দূর হলো, তখন তিনি তার প্রতি কোমল হলেন।

যদি কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যে মদ প্রদর্শন করে, তবে সে মুসলিম হলে তার ওপর সেই মদ ঢেলে নষ্ট করে দিতে হবে এবং তাকে শাসন করতে হবে। আর যদি সে যিম্মি (অমুসলিম নাগরিক) হয়, তবে প্রকাশ্যে মদ প্রদর্শনের জন্য তাকে শাসন করতে হবে।

যিম্মিদের মদ ঢেলে দেওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) মনে করেন যে, তাদের ওপর মদ ঢেলে নষ্ট করা যাবে না; কারণ তাদের দৃষ্টিতে এটি এমন এক সম্পদ যা তাদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আর ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মাযহাব হলো, তাদের মদও ঢেলে নষ্ট করা হবে; কারণ তাঁর মতে কোনো মুসলিম বা অমুসলিমের অধিকারে থাকা অবস্থায় মদ কোনো মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য নয়।

আর যদি কেউ প্রকাশ্যে নাবীয (এক প্রকার পানীয়) প্রদর্শন করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে এটি এমন এক সম্পদ যার মালিকানা মুসলিমদের জন্য স্বীকৃত; ফলে এটি ঢেলে ফেলা যাবে না এবং তা প্রদর্শনের জন্য কোনো শাস্তির বিধান নেই। ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মতে এটি মদের মতোই কোনো সম্পদ নয় এবং এটি নষ্ট করলে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এমতাবস্থায় জনশৃঙ্খলা রক্ষা কর্মকর্তা (ওয়ালী আল-হিসবাহ) পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করবেন এবং এর প্রকাশ্য ব্যবহার বন্ধ করবেন। যদি এটি নেশা করার উদ্দেশ্যে হয় তবে তাকে ধমক দেবেন। তবে কোনো ইজতিহাদের যোগ্য বিচারক নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তা ঢেলে ফেলবেন না, যাতে পরবর্তীতে মামলার ক্ষেত্রে তাঁর ওপর কোনো জরিমানার দায় না আসে।
আর যদি কোনো মাতাল ব্যক্তি তার নেশাগ্রস্ততা জাহির করে এবং অসংলগ্ন প্রলাপ বকে, তবে তাকে তার নেশা ও প্রলাপের জন্য 'তা'যীর' বা সংশোধনমূলক শাস্তি দিতে হবে, 'হদ' বা নির্ধারিত দণ্ড নয়।

(ص: 365)الأحكام السلطانية للماوردي

لقة مراقبته وظهور سخفه.
وأما المجاهرة بإظهار الملاهي المحرَّمة، فعلى المحتسب أن يفصلها حتى تصير خشبًا؛ لتزول عن حكم الملاهي، ويؤدّب على المجاهرة بها، ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح لغير الملاهي.
وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد.
وفيها وجه من وجوه التدبير تقارنه معصية بتصوير ذوات الأزواج ومشابهة الأصنام، فللتمكين منها وجه، وللمنع منها وجه، وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره.

قد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها وهي تلعب بالبنات فأقرها ولم ينكر عليها.

وحكي أن أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي تقلّد حسبة بغداد في أيام المقتدر، فأزال سوق الدادي ومنع منها، وقال: لا يصلح إلّا النبيذ المحرم، وأقر سوق اللعب ولم يمنع منها، وقال: قد كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات بمشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليها؛ وليس ما ذكره من اللعب بالبعيد من الاجتهاد.

وأما سوق الدادي فالأغلب من حاله أنّه لا يستعمل إلا في النبيذ، وقد يجوز أن يستعمل نادرًا في الدواء وهو بعيد، فبيعه عند من يرى إباحة النبيذ جائز لا يكره، وعند من يرى تحريمه جائز لجواز استعماله في غيره، ومكروه اعتبارًا بالأغلب من حاله، وليس منع أبي سعيد منه؛ لتحريم بيعه عنده. وإنما من المظاهرة بإفراد سوقه، والمجاهرة ببيعه إلحاقًا له بإباحة ما اتفق الفقهاء على إباحة مقصده؛ ليقع لعوام الناس الفرق بينه وبين غيره من المباحات، وليس يمتنع إنكار المجاهرة ببعض المباحات، كما ينكر المجاهرة بالمباح من مباشرة الأزواج والإماء.

وأما ما لم يظهر من المحظورات، فليس للمحتسب أن يتجسس عنها، ولا أن يهتك الأستار حذرًا من الاستتار بها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: "من أتى من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله تعالى

...তার নজরদারি এবং তার নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ হওয়া।

আর নিষিদ্ধ বাদ্যযন্ত্রসমূহ জনসমক্ষে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মুহতাসিবের (তত্ত্বাবধায়ক) দায়িত্ব হলো সেগুলো এমনভাবে ভেঙে ফেলা যেন তা কাঠে পরিণত হয় এবং বাদ্যযন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত না থাকে। প্রকাশ্যে এগুলো প্রদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করা হবে। তবে যদি সেই কাঠ বাদ্যযন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের উপযোগী হয়, তবে তা সমূলে ধ্বংস করা যাবে না।

আর পুতুল বা খেলার সামগ্রীর দ্বারা কোনো পাপের উদ্দেশ্য থাকে না, বরং এর উদ্দেশ্য হলো কন্যা সন্তানদেরকে সন্তান লালন-পালনে অভ্যস্ত করে তোলা। এর মধ্যে যেমন ব্যবস্থাপনার একটি দিক রয়েছে, তেমনি এর সাথে প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি এবং মূর্তির সাদৃশ্যগত পাপের একটি দিকও জড়িয়ে আছে। তাই এটি বহাল রাখার যেমন একটি যুক্তি রয়েছে, তেমনি তা নিষিদ্ধ করারও অবকাশ আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রমাণের ভিত্তিতেই এটি নিষিদ্ধ বা অনুমোদিত হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট প্রবেশ করে তাকে পুতুল নিয়ে খেলতে দেখেছিলেন এবং তিনি তা অনুমোদন করেছিলেন, কোনো আপত্তি জানাননি।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম শাফিঈর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত আবু সাঈদ আল-ইসতাখরি খলিফা আল-মুকতাদিরের আমলে বাগদাদের 'হিসবাহ' (জনশৃঙ্খলা তদারকি) বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি 'দাদি' (মদ তৈরির উপকরণ) এর বাজার বিলুপ্ত করেন এবং তা নিষিদ্ধ করেন। তিনি বলেন: 'এটি কেবল হারাম নাবীয তৈরির জন্যই উপযোগী।' তবে তিনি পুতুলের বাজার বহাল রাখেন এবং তা নিষিদ্ধ করেননি। তিনি বলেন: 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই পুতুল খেলতেন এবং তিনি তাতে কোনো আপত্তি করেননি।' পুতুলের খেলা সম্পর্কে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা ইজতিহাদের (গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত) বিচারে মোটেও অমূলক নয়।

আর 'দাদি'র বাজারের অধিকাংশ অবস্থা হলো এই যে, এটি নাবীয তৈরি ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহৃত হয় না। তবে খুব বিরল ক্ষেত্রে এটি ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার অবকাশ থাকলেও তা অত্যন্ত ক্ষীণ। যারা নাবীয পান করাকে বৈধ মনে করেন, তাদের নিকট এর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয এবং মাকরূহ নয়। আর যারা একে হারাম মনে করেন, তাদের নিকট অন্য প্রয়োজনে ব্যবহারের অবকাশ থাকায় এর বেচাকেনা জায়েয হলেও অধিকাংশ ব্যবহারের দিকটি বিবেচনা করে তা মাকরূহ। আবু সাঈদ এটি নিষিদ্ধ করেছিলেন তার নিকট এর ক্রয়-বিক্রয় হারাম হওয়ার কারণে নয়, বরং এর জন্য বিশেষ বাজার থাকা এবং তা প্রকাশ্যে বিক্রি করাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য। কারণ এর ফলে এটিকে ওই সকল বৈধ বস্তুর পর্যায়ভুক্ত মনে হতে পারে যেগুলোর উদ্দেশ্য বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন। যেন সাধারণ মানুষ এটি এবং অন্যান্য বৈধ বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। কোনো কোনো

বৈধ বিষয় জনসমক্ষে প্রকাশ করতে নিষেধ করায় কোনো বাধা নেই, যেমন বৈধ হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী বা দাসীর সাথে ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করাকে নিষেধ করা হয়।
আর যেসব নিষিদ্ধ বিষয় জনসমক্ষে প্রকাশ পায় না, মুহতাসিবের জন্য সেগুলোর অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়া বা কারও গোপনীয়তা প্রকাশ করা বৈধ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি এই ঘৃণ্য কাজগুলোর কোনোটিতে লিপ্ত হয়, সে যেন আল্লাহর দেওয়া আবরণে তা গোপন রাখে। কেননা যে ব্যক্তি আমাদের নিকট তার অপরাধ প্রকাশ করবে, আমরা তার ওপর আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড কার্যকর করব।'

(ص: 366)الأحكام السلطانية للماوردي

عليه" 1.

فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارات دلت، وآثار ظهرت، فذلك ضربان:
أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل: أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلًا خلا بامرأة ليزني بها، أو برجل ليقتله، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسَّس ويقدم على الكشف والبحث، حذرًا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وارتكاب المحظورات، وهكذا لو عرف ذلك من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف، والبحث في ذلك، والإنكار، كالذي كان من شأن المغيرة بن شعبة.
فقد روي أنه كان تختلف إليه بالبصرة امرأة من بني هلال يقال لها أم جميل بنت محجن ابن الأفقم، وكان لها زوج من ثقيف يقال له: الحجاج بن عبيد، فبلغ ذلك أبا بكر بن مسروح، وسهل بن معبد، ونافع بن الحارث، وزياد بن عبيد، فرصدوه حتى إذا دخلت عليه هجموا عليهما، وكان من أمرهم في الشهادة عليه عند -ماهو مشهور، فلم ينكر عليهم عمر رضي الله عنه هجومهم، وإن كان حدهم القذف عند قصور الشهادة.

والضرب الثاني: ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه.

حكي أن عمر رضي الله عنه دخل على قومه يتعاقرون على شراب، ويوقدون في أخصاص، فقال: نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم، ونهيتكم عن الإيقاد في الأخصاص فأوقدتم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، قد نهاك الله عن التجسس فتجسست، ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت، فقال عمر رضي الله عنه: هاتان بهاتين وانصرف ولم يتعرض لهم. فمن سمع أصواتًا ملأة منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم أنكرها خارج الدار، ولم يهجم عليه بالدخول؛ لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عما سواه من الباطن.

---

1 صحيح: رواه مالك في الموطأ، كتاب الحدود "1562".

১.

যদি আলামত ও প্রকাশিত চিহ্নের ভিত্তিতে প্রবল ধারণা জন্মে যে, কোনো জনসমষ্টি গোপনে পাপে লিপ্ত রয়েছে, তবে তা দুই প্রকার:

প্রথমত: এমন কোনো পবিত্রতা বা মর্যাদার লঙ্ঘন হওয়া যা হাতছাড়া হয়ে গেলে আর সংশোধন করা সম্ভব নয়। যেমন: কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সংবাদ দিল যে, এক ব্যক্তি কোনো নারীর সাথে ব্যভিচার করার জন্য অথবা কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য নির্জনে একত্রিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তার জন্য গোয়েন্দাবৃত্তি করা এবং বিষয়টি উদঘাটন ও অনুসন্ধান করা জায়েয, যাতে যা পুনরায় সংশোধনযোগ্য নয় এমন কোনো পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হওয়া এবং নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে, যদি সাধারণ স্বেচ্ছাসেবীরাও এমন বিষয় জানতে পারে, তবে তাদের জন্যও অনুসন্ধান, তদন্ত এবং প্রতিবাদ করা জায়েয, যেমনটি মুগীরা ইবনে শু'বার ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

বর্ণিত আছে যে, বসরায় বনু হিলাল গোত্রের উম্মে জামিল বিনতে মাহজান ইবনুল আফকাম নামক এক নারী তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করত। সাকীফ গোত্রে আল-হাজ্জাজ ইবনে উবাইদ নামক তার এক স্বামী ছিল। বিষয়টি আবু বাকরা ইবনে মাসরূহ, সাহল ইবনে মা'বাদ, নাফে

ইবনুল হারিস এবং যিয়াদ ইবনে উবাইদ জানতে পারেন। তাঁরা ওত পেতে রইলেন এবং যখন সে নারী তাঁর নিকট প্রবেশ করল, তাঁরা তাদের ওপর চড়াও হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে তাঁদের যে ঘটনা ঘটেছে তা প্রসিদ্ধ। উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁদের এই আকস্মিক আক্রমণ বা প্রবেশকে নাকচ করেননি, যদিও সাক্ষ্যের পূর্ণতা না থাকায় তিনি তাঁদের ওপর অপবাদের দণ্ড জারি করেছিলেন।

দ্বিতীয় প্রকার: যা এই সীমার বাইরে এবং এই পর্যায়ের নিচে, সে ক্ষেত্রে গোয়েন্দাবৃত্তি করা বা গোপনীয়তা উন্মোচন করা জায়েয নয়।

বর্ণিত আছে যে, উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদল লোকের কাছে প্রবেশ করলেন যারা একত্রে মদ্যপান করছিল এবং খড়ের ঘরে আগুন জ্বালিয়েছিল। তিনি বললেন: "আমি তোমাদের মদ্যপান করতে নিষেধ করেছিলাম অথচ তোমরা তা করছ, আর আমি তোমাদের খড়ের ঘরে আগুন জ্বালাতে নিষেধ করেছিলাম অথচ তোমরা তা জ্বালিয়েছ।" তারা বলল: "হে আমিরুল মুমিনীন, আল্লাহ আপনাকে গোয়েন্দাবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন অথচ আপনি গোয়েন্দাবৃত্তি করেছেন, আর অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন অথচ আপনি প্রবেশ করেছেন।" তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "এই দুই অপরাধ ওই দুই অপরাধের সমান।" অতঃপর তিনি তাদের কোনো প্রকার পাকড়াও না করেই ফিরে এলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো ঘর থেকে উচ্চস্বরে কোনো মন্দ কাজের আওয়াজ শুনতে পায় যা ঘরের অধিবাসীরা প্রকাশ্য করে ফেলেছে, সে ঘরের বাহির থেকেই তার প্রতিবাদ করবে, কিন্তু ভেতরে ঢুকে চড়াও হবে না; কারণ পাপটি প্রকাশ্য, আর ভেতরের অপ্রকাশিত বিষয় উদঘাটন করা তার দায়িত্ব নয়।

---

১. সহীহ: মালিক মুওয়াত্তা-এ বর্ণনা করেছেন, কিতাবুল হুদুদ "১৫৬২"।

فصل:

وأما المعاملات المنكرة كالزنا والبيوع الفاسدة، وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به إذا كان متفقًا على حظره، فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه، والزجر عليه، وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر.

وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل له في إنكاره، إلّا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد، فالخلاف فيه ضعيف، وهو ذريعة إلى ربا النَّسَاء المتفق على تحريمه، فهل يدخل في إنكاره بحكم ولايته أو لا؟ على ما قدمناه من الوجهين.

وفي معني المعاملات وإن لم تكن منها عقود المناكح المحرمة ينكرها إن اتفق العلماء على حظرها؛ ولا يتعرض لإنكارها إن اختلف الفقهاء فيها، إلا ان يكون مما ضعف الخلاف فيه، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كالمتعة، فربما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا، ففي إنكاره لها وجهان، وليكن بدل إنكاره لها الترغيب في العقود المتفق عليها.

ومما يتعلق بالمعلاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان، فينكره ويمنع منه، ويؤدب عليه بحسب الحال فيه، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس منا من غش" 1.

فإن كان هذا الغش تدليسًا على المشتري ويخفى عليه فهو أغلظ الغش تحريمًا وأعظمها مأثمًا، فالإنكار عليه أغلظ، والتأديب عليه أشد، وإن كان لا يخفى على المشتري كان أخف مأثمًا وألين إنكارًا، وينظر في مشتريه، فإن اشتراه ليبيعه من غيره توجَّه الإنكار على البائع لغشه، وعلى المشتري بابتياعه؛ لأنه قد يبيعه لمن لا يعلم بغشه، فإن كان يشتريه ليستعمله خرج المشتري من جملة الإنكار، وتفرَّد البائع وحده، وكذلك القول في تدليس الأثمان.

ويمنع من تصرية المواشي، وتحفيل ضروعها عند البيع للنهي عنه، فإنه نوع من التدليس.

---

1 صحيح: رواه أبو داود في كتاب البيوع "3452"، والترمذي في كتاب البيوع "1315"، وابن ماجه في كتاب التجارات "2224"، وأحمد "7250"، وصححه الشيخ الألباني.

পরিচ্ছেদ:

ব্যভিচার এবং ফাসিদ বা অবৈধ কেনাবেচার ন্যায় নিষিদ্ধ লেনদেনসমূহ, এবং চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় সম্মত হওয়া সত্ত্বেও শরয়িভাবে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যদি সেগুলোর অবৈধতার ব্যাপারে ঐকমত্য থাকে, তবে সেগুলোর প্রতিবাদ করা, তা প্রতিহত করা এবং সে বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করা হিসবাহ্ কর্মকর্তার দায়িত্ব। অপরাধের ধরন এবং নিষিদ্ধ বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তিদানের ক্ষেত্রে তার নির্দেশ ভিন্নতর হবে।

আর যেসব বিষয়ের নিষিদ্ধতা বা বৈধতার ব্যাপারে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, সেগুলোর প্রতিবাদ করার সুযোগ তাঁর নেই। তবে যদি মতভেদটি দুর্বল হয় এবং তা সর্বসম্মতভাবে কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ের পথ প্রশস্তকারী (জরিআহ) হয়—যেমন রিবাল নকদ বা নগদ পণ্যের বিনিময়জনিত সুদ—যার অবৈধতার ব্যাপারে মতভেদটি দুর্বল এবং যা সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ রিবান নাসিয়াহ বা বিলম্বিত সুদের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়—তবে তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতার অধীনে তিনি কি এর প্রতিবাদ করবেন কি না, সে বিষয়ে আমাদের ইতিপূর্বে বর্ণিত দুটি অভিমত রয়েছে।

লেনদেন না হলেও নিষিদ্ধ বিবাহ চুক্তিগুলো লেনদেনেরই সমপর্যায়ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। ওলামাগণ যদি সেগুলোর নিষিদ্ধতার ব্যাপারে একমত হন, তবে তিনি তার প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু ফকিহগণের মধ্যে যদি সে বিষয়ে দ্বিমত থাকে, তবে তিনি তা প্রতিহত করবেন না। তবে যদি মতভেদটি দুর্বল হয় এবং তা সর্বসম্মতভাবে কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ের পথ প্রশস্তকারী হয়—যেমন মুতআহ বিবাহ—যা অনেক সময় ব্যভিচারকে বৈধতা দেওয়ার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়; এমতাবস্থায় এর প্রতিবাদ করার বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে। তবে এর প্রতিবাদ করার পরিবর্তে সর্বসম্মত বৈধ চুক্তিগুলোর প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করাই শ্রেয়।

লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বিক্রয়যোগ্য পণ্যে ভেজাল মেশানো এবং মূল্যে প্রতারণা করা। তিনি এর প্রতিবাদ করবেন, একে প্রতিহত করবেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী এ

জন্য শাস্তি প্রদান করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" ১।
যদি এই ভেজাল ক্রেতার সাথে প্রতারণাস্বরূপ হয় এবং তার কাছে গোপন থাকে, তবে এটি হবে হারাম হওয়ার দিক থেকে সবচেয়ে গুরুতর এবং গুনাহের দিক থেকে সবচেয়ে বড় প্রতারণা। তাই এর প্রতিবাদ হবে আরও কঠোর এবং এর শাস্তি হবে আরও তীব্র। আর যদি বিষয়টি ক্রেতার কাছে গোপন না থাকে, তবে তা গুনাহের দিক থেকে কিছুটা হালকা এবং প্রতিবাদের ক্ষেত্রে নমনীয় হবে। এক্ষেত্রে ক্রেতার বিষয়টিও দেখা হবে; যদি সে পণ্যটি অন্যের কাছে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে থাকে, তবে বিক্রেতার ওপর ভেজালের কারণে এবং ক্রেতার ওপর তা ক্রয় করার কারণে প্রতিবাদ করা সমীচীন হবে। কারণ, সে হয়তো এমন ব্যক্তির কাছে এটি বিক্রি করবে যে এই ভেজাল সম্পর্কে জানে না। আর যদি সে নিজের ব্যবহারের জন্য তা ক্রয় করে, তবে ক্রেতা প্রতিবাদের আওতামুক্ত থাকবে এবং কেবল বিক্রেতাই দায়ী হবে। মূল্যের ক্ষেত্রে প্রতারণার বিধানও অনুরূপ।
তিনি গবাদি পশুর ওলানে দুধ জমিয়ে রাখা এবং বিক্রির সময় ওলানকে দুধে পূর্ণ দেখানোর কৌশল অবলম্বন করা নিষিদ্ধ করবেন; কেননা এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং এটি এক ধরনের প্রতারণা।

---

১ সহিহ: আবু দাউদ 'কেনাবেচা' অধ্যায়ে (৩৪৫২), তিরমিজি 'কেনাবেচা' অধ্যায়ে (১৩১৫), ইবনে মাজাহ 'বাণিজ্য' অধ্যায়ে (২২২৪), আহমাদ (৭২৫০) এটি বর্ণনা করেছেন এবং শেখ আলবানি একে সহিহ বলেছেন।

(ص: 368)الأحكام السلطانية للماوردي

ومما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين والصنجات؛ لوعيد الله تعالى عليه عند نهيه عنه. وليكن الأدب عليه أظهر والمعاقبة فيه أكثر.

ويجوز له إذا استراب بموازين السوقة ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها، ولو كان له على ما عايره منها طابع معروف بين العامة لا يتعاملون إلا به كان أحوط وأسلم.

فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ما طبع بطابعه توجه الإنكار عليهم إن كان مبخوسًا من وجهين:

أحدهما: لمخالفته في العدول عن مطبوعه، وإنكاره من الحقوق السلطانية.

والثاني: للبخس والتطفيف في الحق، وإنكاره من الحقوق الشرعية، فإن كان ما تعاملوا به من غير المطبوع سليمًا من بخس ونقص توجَّه الإنكار عليهم بحق السلطنة وحدها لأجل المخالفة؛ وإن زوّر قوم على طابعه كان المزور فيه كالمهرج على طابع الدراهم والدنانير، فإن قرن التزوير بغش كان الإنكار عليه والتأديب مستحقًّا من وجهين:

أحدهما: في حق السلطنة من جهة التزوير.

والثاني: من جهة الشرع في الغش وهو أغلظ النكرين، وإن سلم التزوير من غش تفرَّد بالإنكار السلطاني منهما فكان أحقهما، وإذا اتسع البلد حتى احتاج أهله فيه إلى كيالين ووزانين ونقادين تخيرهم المحتسب، ومنع أن ينتدب لذلك إلا من ارتضاه من الأمناء الثقات، وكانت أجورهم من بين المال إن اتسع لها، فإن ضاق قدرها لهم حتى لا يجزي بينهم فيها استزادة ولا نقصان، فيكون ذلك ذريعة إلى الممايلة والتحيف في مكيل أو موزون.

وقد كان الأمراء يقومون باختيارهم وترتيبهم لذلك، ويثبتونهم بأسمائهم في الدواوين حتى لا يختلط بهم غيرهم ممن لا تؤمن وساطته، فإن ظهر من أحد هؤلاء المختارين للكيل والوزن تحيف في تطفيف أو ممايلة في زيادة أُدِّبَ، أخرج عن جملة المختارين، ومنع أن يتعرض للوساطة بين الناس، وكذلك القول في اختيار الدلالين، يقر منهم الأمناء ويمنع الخونة، وهذا مما يتولاه ولاة الحسبة إن قعد عند الأمراء.

وأما اختيار القسام والزراع، فالقضاة أحق باختيارهم من ولاة الحسبة؛ لأنهم قد

তাঁর (মুহতাসিব বা বাজার পরিদর্শক) প্রধান দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হলো পরিমাপ ও ওজনে কম দেওয়া এবং ওজনের বাটখারায় কারচুপি রোধ করা; যেহেতু আল্লাহ তাআলা তা নিষেধ করেছেন এবং এর ওপর কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এই বিষয়ে শাসনামূলক ব্যবস্থা হবে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দণ্ড হবে কঠোরতর। যদি তিনি সাধারণ ব্যবসায়ীদের ওজন ও পরিমাপের যন্ত্রের ব্যাপারে সন্দিহান হন, তবে সেগুলো পরীক্ষা ও যাচাই করার অধিকার তাঁর রয়েছে। যদি যাচাইকৃত যন্ত্রগুলোর ওপর তাঁর কোনো সুপরিচিত সিল বা চিহ্ন থাকে এবং জনগণ কেবল সেই সিলযুক্ত যন্ত্র ব্যবহার করে, তবে তা হবে অধিকতর সতর্কতামূলক ও নিরাপদ।

যদি তিনি এমনটি করেন এবং কোনো গোষ্ঠী তাঁর সিলমোহরযুক্ত যন্ত্র ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে লেনদেন করে, তবে যদি তাতে ওজনে কম দেওয়া বা কারচুপি থাকে, তবে তাদের ওপর দুই দিক থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

প্রথমত: সিলযুক্ত যন্ত্র পরিহার করার মাধ্যমে অবাধ্যতা প্রদর্শন করা; এই বিষয়টি রাষ্ট্রীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করার অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত: অন্যের হকে ওজনে কম দেওয়া এবং কারচুপি করা; এই বিষয়টি শরয়ি অধিকার লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি সিলহীন যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত লেনদেনে কোনো প্রকার কমতি বা কারচুপি না থাকে, তবে কেবল রাষ্ট্রীয় বিধান লঙ্ঘনের কারণে তাদের ওপর এককভাবে রাষ্ট্রীয় শাস্তির বিধান কার্যকর হবে। যদি কোনো গোষ্ঠী তাঁর সিলের জাল প্রতিলিপি তৈরি করে, তবে সে ক্ষেত্রে জালিয়াত ব্যক্তি দিরহাম ও দিনারের সরকারি মোহর জালকারীর সমতুল্য হবে। যদি জালিয়াতির সাথে প্রতারণা বা ভেজাল যুক্ত থাকে, তবে সে ব্যক্তি দুই কারণে শাস্তি ও দণ্ডের উপযোগী হবে:

প্রথমত: জালিয়াতির অপরাধে রাষ্ট্রীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করার কারণে।

দ্বিতীয়ত: প্রতারণা করার কারণে শরয়ি বিধান অনুযায়ী, যা উক্ত দুই অপরাধের মধ্যে অধিকতর গুরুতর। যদি জালিয়াতির মধ্যে কোনো প্রতারণা না থাকে, তবে কেবল রাষ্ট্রীয় শাস্তির বিধানই কার্যকর হবে এবং সেটিই হবে অগ্রগণ্য। যখন শহর বিস্তৃত হয় এবং অধিবাসীদের পরিমাপকারী, ওজনকারী ও মুদ্রাপরীক্ষকের প্রয়োজন পড়ে, তখন মুহতাসিব যোগ্য ব্যক্তিদের বাছাই করবেন। তিনি কেবল বিশ্বস্ত ও আমানতদার হিসেবে স্বীকৃত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে এই কাজে নিয়োজিত হওয়া নিষিদ্ধ করবেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পর্যাপ্ত অর্থ থাকলে তাদের পারিশ্রমিক সেখান থেকে প্রদান করা হবে। যদি কোষাগারের সামর্থ্য কম হয়, তবে তাদের

জন্য পারিশ্রমিক এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করতে হবে যেন তাতে কোনো প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি না ঘটে। অন্যথায় তা পরিমাপ ও ওজনে পক্ষপাতিত্ব ও কারচুপির অছিলা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
অতীতে শাসকগণ নিজেরাই এই কাজের জন্য লোক বাছাই ও বিন্যস্ত করতেন এবং তাদের নাম সরকারি দপ্তরে নথিভুক্ত করতেন, যাতে অবিশ্বস্ত মধ্যস্থতাকারীরা তাদের সাথে মিশে যেতে না পারে। যদি পরিমাপ ও ওজনের জন্য নির্বাচিত এই ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ ওজনে কম দেওয়া বা পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে কারচুপি করে, তবে তাকে দণ্ড প্রদান করা হবে, নির্বাচিতদের তালিকা থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা করা থেকে তাকে নিষিদ্ধ করা হবে। অনুরূপভাবে, দালাল বা পণ্য কেনাবেচাকারীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য; বিশ্বস্তদের বহাল রাখা হবে এবং খিয়ানতকারীদের নিষিদ্ধ করা হবে। যদি শাসকগণ এ ব্যাপারে দায়িত্ব পালন না করেন, তবে এটি মুহতাসিবের কর্মকর্তাদের ওপর অর্পিত হবে। আর ভূমি বণ্টনকারী ও ভূমি জরিপকারীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুহতাসিবের চেয়ে বিচারকগণ (কাযী) অধিকতর যোগ্য; কারণ তারা...

(ص: 369)الأحكام السلطانية للماوردي

يستنابون في أموال الأيتام والغيب.
وأما اختيار الحرَّاسين في القبائل والأسواق فإلى الحماة وأصحاب المعاون، وإذا وقع في التطفيف تخاصم جاز أن ينظر المحتسب إن لم يكن مع الخصم فيه تجاحد وتناكر، فإن أفضى إلى تجاحد وتناكر كان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة؛ لأنهم بالأحكام أحق، وكان التأديب فيه إلى المحتسب، فإن تولاه الحاكم جاز لاتصاله بحكمهم، ومما ينكره المحتسب في العموم ولا ينكره في الخصوص والآحاد التبايع بما لم يألفه أهل البلد من المكاييل والأوزان التي لا تعرف فيه إن كانت معروفة في غيره، فإن تراضي بها اثنان لم يعترض عليهما الإنكار والمنع، ويمنع أن يرسم بها قوم من العموم؛ لأنه قد يعاملهم فيها من لا يعرفها فيصير مغرورًا.

فصل:

وأما ما ينكر من حقوق الآدميين المحصنة، فمثل أن يتعدَّى رجل في حد لجاره، أو في حريم لداره، أو في وضع أجذاع على جداره، فلا اعتراض للمحتسب فيه ما لم يستعده الجار؛ لأنه يخصه، فينصح منه العفو عنه والمطالبة به، فإن خاصمه فيه كان للمحتسب النظر فيه إن لم يكن بينهما تنازع وتناكل، وأخذ المتعدي بإزالة تعديه، وكان له تأييبه عليه بحسب شواهد الحال. فإن تنازعا كان الحاكم بالنظر فيه أحق، ولو أن الجار أقر جاره على تعديه وعفا عن مطالبته بهدم ما تعدى فيه، ثم عاد مطالبًا بعد ذلك كان له ذلك، وأخذ المتعدي بعد العفو عند بهدم ما بناه؛ ولو كان قد ابتدأ البنا ووضع الأجذاع بإذن الجار، ثم رجع في إذنه لم يؤخذ الثاني بهدمه.

ولو انتشرت أغصان الشجرة إلى دار جاره كان للجار أن يستعدي المحتسب حتى يعديه على صاحب الشجرة؛ ليأخذه بإزالة ما انتشر من أغصانها في داره ولا تأديب عليه؛ لأنَّ انتشارها ليس من فعله، ولو انتشرت عروق الشجرة تحت الأرض حتى دخلت في قرار أرض الجار لم يؤخذ بقلعها، ولم يمنع الجار من التصرف في قرار أرضه، وإن قطعها نصب الملك تنورًا في داره، فتأذى الجار بدخانه لم يعترض عليه ولم يمنع منه، وكذلك لو نصب في

তারা এতিম ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন। আর গোত্রসমূহ ও বাজারে পাহারাদার নিয়োগের বিষয়টি গোত্রপতি এবং সাহায্যকারী কর্মকর্তাদের ওপর ন্যস্ত। ওজনে কারচুপির ক্ষেত্রে যদি কোনো বিবাদ সৃষ্টি হয়, তবে যতক্ষণ বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অস্বীকৃতি বা অস্বীকারের ঘটনা না ঘটে, ততক্ষণ মুহতাসিব বিষয়টি তদারক করতে পারেন। কিন্তু যদি বিষয়টি পারস্পরিক অস্বীকৃতি ও অস্বীকার পর্যন্ত গড়ায়, তবে এ বিষয়ে বিচারকার্য পরিচালনার অধিকার মুহতাসিবের চেয়ে বিচারকদের অধিক; কারণ তাঁরা আইনি বিধান প্রয়োগে অধিক যোগ্য। তবে এক্ষেত্রে শাস্তিদানের বিষয়টি মুহতাসিবের ওপর ন্যস্ত থাকবে; আর যদি বিচারক নিজে শাস্তিদানের

দায়িত্ব নেন তবে তাও বৈধ হবে, যেহেতু তা তাঁদের বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর মুহতাসিব সাধারণভাবে যেসব বিষয়ে আপত্তি জানাবেন কিন্তু ব্যক্তিগত ও একক ক্ষেত্রে জানাবেন না, তার মধ্যে একটি হলো এমন মাপজোখ বা ওজনের মাধ্যমে লেনদেন করা যা উক্ত জনপদের অধিবাসীদের কাছে পরিচিত নয়—যদিও তা অন্য কোথাও পরিচিত হতে পারে। যদি দুজন ব্যক্তি তা মেনে নিয়ে লেনদেন করে, তবে তাতে বাধা দেওয়া বা আপত্তি জানানো হবে না। তবে জনসাধারণের জন্য এর প্রচলন নিষিদ্ধ করা হবে; কারণ এমন ব্যক্তি তাদের সাথে লেনদেন করতে পারে যে এই মাপ সম্পর্কে জানে না, ফলে সে প্রতারিত হতে পারে।

পরিচ্ছেদ:

আর মানুষের সংরক্ষিত অধিকারসমূহের মধ্যে যা কিছু আপত্তিকর, যেমন কোনো ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর সীমানা অতিক্রম করল, অথবা তার বাড়ির আঙিনায় অনধিকার প্রবেশ করল, কিংবা প্রতিবেশীর দেয়ালে কড়িকাঠ স্থাপন করল—তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সংক্ষুব্ধ পক্ষ সাহায্য প্রার্থনা না করবে, ততক্ষণ মুহতাসিবের এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই; কারণ এটি তার ব্যক্তিগত বিষয়। তাকে এ ব্যাপারে ক্ষমা করার অথবা অধিকার দাবি করার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। যদি সে এ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়, তবে যতক্ষণ তাদের মধ্যে দাবি ও অস্বীকারের মতো কোনো জটিলতা না থাকবে, ততক্ষণ মুহতাসিব বিষয়টি তদারক করতে পারেন এবং সীমালঙ্ঘনকারীকে তার অবৈধ দখল সরিয়ে নিতে বাধ্য করতে পারেন। এছাড়া পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তিনি তাকে শাস্তিও প্রদান করতে পারেন। কিন্তু যদি তারা পারস্পরিক বিরোধে জড়ায়, তবে বিচারকই এ বিষয়ে বিচারের অধিক হকদার। যদি প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর সীমালঙ্ঘনকে মেনে নেয় এবং যা কিছু নির্মিত হয়েছে তা ভেঙে ফেলার দাবি থেকে অব্যাহতি দেয়, কিন্তু পরবর্তীতে পুনরায় দাবি উত্থাপন করে, তবে সে তা করার অধিকার রাখে। ক্ষমার পরেও সীমালঙ্ঘনকারীকে তার নির্মিত অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলতে বাধ্য করা হবে। তবে যদি নির্মাণকাজ শুরু করা এবং কড়িকাঠ স্থাপন করা প্রতিবেশীর অনুমতি সাপেক্ষে হয়ে থাকে এবং পরে প্রতিবেশী তার অনুমতি প্রত্যাহার করে নেয়, তবে নির্মাণকারীকে তা ভেঙে ফেলতে বাধ্য করা হবে না।

যদি কোনো গাছের ডালপালা প্রতিবেশীর বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে, তবে প্রতিবেশী মুহতাসিবের কাছে প্রতিকার চাইতে পারে যেন তিনি গাছের মালিককে উক্ত ডালপালা অপসারণ করতে বাধ্য করেন। এক্ষেত্রে মালিকের ওপর কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না; কারণ ডালপালা ছড়িয়ে

পড়া তার নিজস্ব কৃতকর্ম নয়। আর যদি গাছের শিকড় মাটির নিচে প্রতিবেশীর ভূখণ্ডে প্রবেশ করে, তবে তা উপড়ে ফেলতে বাধ্য করা হবে না, আবার প্রতিবেশীকেও তার নিজ ভূমিতে কাজ করা থেকে বিরত রাখা যাবে না। যদি সে সেগুলো কেটে ফেলে (তাতে তার অধিকার রয়েছে)। আর মালিক যদি নিজগৃহে তন্দুর স্থাপন করে এবং এর ধোঁয়ায় প্রতিবেশী কষ্ট পায়, তবে তার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি তোলা হবে না এবং তাকে তা থেকে বিরত রাখা যাবে না। একইভাবে যদি সে স্থাপন করে...

(ص: 370)الأحكام السلطانية للماوردي

داره رحى أو وضع فيها حدادين أو قصابين لم يمنع؛ لأن للناس التصرف في أملاكهم بما أحبوا، وما يجد الناس من مثل هذا بدًّا، وإذا تعدَّى مستأجر على أجير في نقصان أجرة أو استزادة عمل كفه عن تعديه، وكان الإنكار عليه معتبرًا بشواهد حاله، ولو قصر الأجير في حق المستأجر فنقصه من العمل، أو استزاده في الأجرة منعه وأنكره عليه إذا تخاصما إليه، فإن اختلفا وتناكرا كان الحاكم بالنظر بينهما أحق.

ومما يؤخذ ولادة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف: منهم من يراعي عمله في الوفور والقصير؛ ومنهم من يراعي في حالة الأمانة والخيانة، ومنهم من يراعي عمله في الجودة والرداءة.

فأما من يراعي في عمله في الوفور والتقصير فكالطبيب والمعلمين؛ لأن الطبيب إقدامًا على النفوس يفضي التقصير فيه إلى تلف أو سقم، والمعلمين من الطرائق التي ينشأ الصغار عليها ما يكون نقلهم عنها بعد الكبير عسيرًا، فيقر منهم من توفر عمله وحسنت طريقته، ويمنع من قصر وأساء من التصدي لما يفسد به النفوس وتخبث به الآداب.

وأما من يراعي في الأمانة والخيانة فمثل الصاغة والحاكة والقصارين والصباغين؛ لأنهم ربما هربوا بأموال الناس، فيراعي أهل الثقة والأمانة منهم فيقرهم، ويبعد من ظهرت خيانته ويشهر أمره؛ لئلَّا يغتر به من لا يعرفه، وقد قيل: إن الحماة وولاة المعاون أخصّ بالنظر في أحوال هؤلاء من ولاية الحسبة وهو الأشبة؛ لأنَّ الخيانة تابعة للسرقة.

وأما من يراعي عمله في الجودة والرداءة فهو مما ينفرد بالنظر فيه ولاة الحسبة، ولهم أن ينكروا عليهم في العموم فساد العمل ورداءته، وإن لم يكن فيه مستعد. وأما في عمل مخصوص اعتاد الصانع فيه الفساد والتدليس. فإذا استعداه الخصم قابل عليه بالإنكار والزجر، فإن تعلق بذلك غرم روعي حال الغرم، فإن افتقر إلى تقرير أو تقويم لمن يمكن للمحتسب أن ينظر فيه؛ لافتقاره إلى اجتهاد حكمي، وكان القاضي بالنظر فيه أحق، وإن لم يفتقر إلى تقدير ولا تقويم، واستحق فيه المثل الذي لا اجتهاد فيه ولا تنازع، فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام الغرم والتأديب على فعله؛ لأنه أخذ بالتناصف وزجر عن التعدي.

ولا يجوز أن يسعّر على الناس الأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء، وأجازه مالك في الأقوات مع الغلاء.

কারও বাড়িতে যাঁতা বসানো অথবা সেখানে কামার বা কসাইদের স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া যাবে না; কেননা মানুষের স্বীয় সম্পদে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে এই সকল কাজ অপরিহার্য। যদি কোনো নিয়োগকর্তা মজুরি হ্রাস করে অথবা অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে শ্রমিকের ওপর জুলুম করে, তবে তাকে এই সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখতে হবে এবং তার অবস্থার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে তিরস্কার করতে হবে। অনুরূপভাবে, শ্রমিক যদি নিয়োগকর্তার হকের ক্ষেত্রে অবহেলা করে কাজ কমিয়ে দেয় অথবা অতিরিক্ত মজুরি দাবি করে, তবে তারা বিবাদে লিপ্ত হলে তাকে বাধা দিতে হবে এবং নিন্দা জানাতে হবে। আর যদি তারা পরস্পরকে অস্বীকার করে এবং বিরোধে জড়ায়, তবে বিচারকের জন্য তাদের বিষয়টি খতিয়ে দেখা অধিক সংগত।

বাজারে পেশাজীবীদের তদারকির ক্ষেত্রে হিসবাহ কর্তৃপক্ষের তিন প্রকারের পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক: প্রথমত, যারা কাজের পরিমাণগত পূর্ণতা ও ঘাটতির ক্ষেত্রে তদারকির আওতাভুক্ত; দ্বিতীয়ত, যাদের বিশ্বস্ততা ও অসাধুতার বিষয়টি লক্ষ্য করা হয়; এবং তৃতীয়ত, যাদের কাজের গুণগত মান ও উৎকর্ষ তদারকি করা হয়।

যাদের কাজের পূর্ণতা ও ত্রুটি তদারকি করা হয় তারা হলেন চিকিৎসক ও শিক্ষকবৃন্দ। কারণ চিকিৎসকের কাজ জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেখানে গাফলতি করলে মৃত্যু বা অসুখের সম্ভাবনা থাকে। আর শিক্ষকদের পদ্ধতিসমূহ শিশুদের ওপর এমনভাবে প্রভাব ফেলে যে, পরিণত বয়সে তা পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং যাদের কাজ যথাযথ এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি উত্তম, তাদের বহাল রাখা হবে। আর যারা ত্রুটিপূর্ণ ও অযোগ্য কাজ করে তাদের এমন সব কাজ থেকে বিরত রাখা হবে যা মানুষের জীবনকে কলুষিত করে এবং নৈতিকতাকে বিনষ্ট করে।

আর যাদের বিশ্বস্ততা ও অসাধুতা তদারকি করা হয় তারা হলেন স্বর্ণকার, তাঁতি, ধোপা ও রংরেজ। কারণ তারা অনেক সময় মানুষের সম্পদ নিয়ে আত্মগোপন করতে পারে। অতএব, তাদের মধ্য থেকে আমানতদার ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে রাখা হবে এবং যাদের খিয়ানত প্রকাশ পাবে তাদের বহিষ্কার ও জনসমক্ষে চিহ্নিত করা হবে, যাতে অপরিচিত কেউ তাদের দ্বারা প্রতারিত না হয়। বলা হয়ে থাকে যে, এই শ্রেণির লোকদের অবস্থা তদারকির ক্ষেত্রে হিসবাহ কর্তৃপক্ষের চেয়ে পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বেশি এবং এটিই যুক্তিযুক্ত; কারণ খিয়ানত বা আত্মসাৎ চুরির পর্যায়ভুক্ত।

যাদের কাজের গুণগত মান তদারকি করা হয় তা মূলত হিসবাহ কর্তৃপক্ষের একক এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। সাধারণ বিচারে কোনো অভিযোগকারী ছাড়াও তারা কাজের মানহীনতা ও ত্রুটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেন। আর কোনো কারিগর যদি বিশেষ কোনো কাজে প্রতারণা ও অসাধুতায় অভ্যস্ত হয় এবং কোনো বাদী অভিযোগ করে, তবে তাকে তিরস্কার ও শাস্তি প্রদান করতে হবে। যদি এর সাথে কোনো জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ জড়িত থাকে, তবে তা খতিয়ে দেখতে হবে। যদি বিষয়টি এমন হয় যেখানে বিশেষ কোনো মূল্যায়ন বা বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন পড়ে যা মুহতাসিবের ইজতিহাদ বা বিচারিক প্রজ্ঞার বাইরে, তবে বিচারকই তা নিষ্পত্তির জন্য অধিক যোগ্য। আর যদি বিষয়টি কোনো সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন বা নির্ধারণের মুখাপেক্ষী না হয় এবং সেখানে এমন কোনো হক পাওনা থাকে যেখানে ইজতিহাদ

বা বিতর্কের অবকাশ নেই, তবে মুহতাসিব ক্ষতিপূরণ আদায় এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রাখেন; কারণ এটি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং সীমালঙ্ঘন রোধের অন্তর্ভুক্ত।
নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী কিংবা অন্য কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে বাজার সস্তা হোক বা মহার্ঘ্য হোক, দাম নির্ধারণ করে দেওয়া বৈধ নয়। তবে ইমাম মালিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময় খাদ্যের দাম নির্ধারণ করার অনুমতি দিয়েছেন।

(ص: 371)الأحكام السلطانية للماوردي

فصل:
وأما ما ينكر من الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، فكالمنع من الإشراف على منازل الناس، ولا يلزم من علا بناؤه أن يستر سطحه، وإنما يلزم أن لا يشرف على غيره، ويمنع أهل الذمة من تعلية أبنيتهم على أبنية المسلمين، فإن ملكوا أبنية عالية أقروا عليها، ومنعوا من الإشراف منها على المسلمين، وأهل الذمة بما شرط عليهم في ذمتهم من لبس الغيار، والمخالفة في الهيئة، وترك المجاهرة بقولهم في العزيز والمسيح، ويمنع عنهم من تعرض لهم من المسلمين بسبب أو أذى، ويؤدّب عليه من خالف فيه. وإذا كان في أئمة المساجد السابلة والجوامع الجفلة من يطيل الصلاة حتى يعجز عنها الضعفاء، وينقطع بها ذوو الحاجات، أنكر ذلك عليه كما أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل حين أطال الصلاة بقومه وقال: "أفتَّان أنت يا معاذ" 1.
فإن أقام على الإطالة ولم يمتنع منها لم يجز أن يؤدبه عليها، ولكن يستبدل به من يخففها.

وإذا كان في القضاء من يجيب الخصوم إذا قصدوه، ويمتنع من النظر بينهم إذا تحاكموا إليه حتى تقف الأحكام ويستضر الخصوم، فللمحتسب أن يأخذه مع ارتفاع الأعذار بما ندب له من النظر بين المتحاكمين، وفصل القضاء بين المتنازعين، ولا يمنع علوّ رتبته من إنكار ما قصر فيه.

قد مر إبراهيم بن بطحاء والي الحسبة بجانبي بغداد بدار أبي عمر بن حماد، وهو يومئذ قاضي القضاة، فرأى الخصوم جلوسًا على بابه ينتظرون جلوسه للنظر بينهم، وقد تعالى النهار وهجرت الشمس، فوقف واستدعى حاجبه وقال: تقول لقاضي القضاة: الخصوم جلوس على الباب وقد بلغتهم الشمس وتأذّوا بالانتظار، فإما جلست لهم أو عرّفتهم عذرك فينصرفوا ويعودوا. وإذا كان في سادة العبيد من يستعملهم فيما لا يطيقون الدوام عليه كان منعهم، والإنكار عليهم موقوفًا على استعداء العبيد على وجه الإنكار والعظة، فإذا استعدوه منع حينئذ وزجر.

---

1 صحيح: رواه البخاري في كتاب الأذان "705"، ومسلم في كتاب الصلاة "465".

পরিচ্ছেদ:

আর আল্লাহ তাআলা ও বান্দার হকের মাঝে সাধারণ যে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আপত্তি জানানো যায়, তা হলো মানুষের ঘরের ভেতর উঁকি দেওয়া থেকে বিরত রাখা। যার দালান উঁচুতে তাকে তার ছাদ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক নয়, বরং কেবল অন্যের ঘরে উঁকি না দেওয়া বাধ্যতামূলক। জিম্মিদের তাদের দালান মুসলমানদের দালানের চেয়ে উঁচুতে নির্মাণ করা থেকে বিরত রাখতে হবে; তবে যদি তারা আগে থেকেই উঁচু দালানের মালিক হয়ে থাকে, তবে তা বহাল রাখা হবে, কিন্তু সেখান থেকে যেন মুসলমানদের ওপর উঁকি দেওয়া না হয় সে ব্যাপারে তাদের নিষেধ করা হবে। জিম্মিদের তাদের জিম্মাচুক্তির শর্তানুসারে নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করা, বাহ্যিক বেশভুষায় ভিন্নতা রাখা এবং উযাইর ও মসীহ সম্পর্কে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রকাশ্য প্রচার থেকে বিরত রাখতে হবে। যে সব মুসলমান কোনো কারণে তাদের ওপর আক্রমণ করে বা কষ্ট দেয়, তাদেরও বিরত রাখতে হবে এবং যে এই নিয়মের লঙ্ঘন করবে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। যদি পথচারী বা সাধারণ জামাতে আসা মুসল্লিদের ইমামদের কেউ এত দীর্ঘ

সালাত আদায় করেন যে বৃদ্ধ ও দুর্বলরা তাতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং ব্যস্ত ব্যক্তিদের কাজ বিঘ্নিত হয়, তবে তার প্রতিবাদ করতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন যখন তিনি তার কওমের সাথে দীর্ঘ সালাত আদায় করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "হে মুয়াজ! তুমি কি মানুষকে ফিতনায় ফেলতে চাও?" ১।

যদি সে সালাত দীর্ঘ করতেই থাকে এবং বিরত না হয়, তবে তাকে সেজন্য শাস্তি দেওয়া বৈধ হবে না, বরং তার স্থলে এমন কাউকে নিয়োগ দিতে হবে যে সালাত সংক্ষেপ করবে।

বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে যদি এমন কেউ থাকেন যিনি বিবাদীদের দেখা দেন কিন্তু তারা বিচার প্রার্থনা করলে ফয়সালা করতে অস্বীকার করেন, ফলে বিচার প্রক্রিয়া থমকে যায় এবং বিবাদীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; তবে মুহতাসিবের অধিকার রয়েছে অজুহাত না থাকলে তাকে বিবাদীদের মাঝে বিচার পরিচালনা ও ফয়সালা করার সেই দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা যা তার ওপর অর্পিত হয়েছে। বিচারপতির উচ্চ পদমর্যাদা তার দায়িত্ব অবহেলার ব্যাপারে আপত্তি জানাতে কোনো বাধা হবে না।

বাগদাদের দুই অঞ্চলের মুহতাসিব ইব্রাহিম ইবনে বাথা প্রধান বিচারপতি আবু উমর ইবনে হাম্মাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন বিবাদীরা বিচার পাওয়ার অপেক্ষায় তার দরজায় বসে আছে, অথচ বেলা অনেক হয়েছে এবং রোদের তীব্রতা বেড়েছে। তিনি দাঁড়িয়ে তার দ্বাররক্ষীকে ডেকে বললেন: প্রধান বিচারপতিকে বলুন যে, বিবাদীরা দরজায় বসে আছে, রোদ তাদের পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং অপেক্ষায় তারা কষ্ট পাচ্ছে। হয় আপনি তাদের বিচারের জন্য বসুন, অথবা আপনার অপারগতা জানিয়ে দিন যেন তারা ফিরে যায় এবং পরে আসে। যদি ক্রীতদাসদের মালিকদের মধ্যে কেউ তাদের এমন পরিশ্রমে বাধ্য করে যা তারা সব সময় সহ্য করতে পারে না, তবে তাদের বিরত রাখা এবং শাসন করা ক্রীতদাসদের অভিযোগের ভিত্তিতে উপদেশ ও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে। যখন তারা অভিযোগ করবে, তখন তাকে বিরত রাখা হবে এবং ধমক দেওয়া হবে।

---

১. সহীহ: বুখারি, আজান অধ্যায় (৭০৫); মুসলিম, সালাত অধ্যায় (৪৬৫)।

وإذا كان من أرباب المواشي من يستعملها فيما لا يطيق الدوام عليه أنكره المحتسب عليه ومنعه منه، وإن لم يكن فيه مستعد إليه، فإن ادَّعى المالك احتمال البهيمة لما يستعملها فيه جاز للمحتسب أن ينظر فيه؛ لأنه وإن افتقر إلى اجتهاد فهو عرفي يرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، وليس باجتهاد شرعي، والمحتسب لا يمنع من اجتهاد العرف.

وإن امتنع من اجتهاد الشرع. وإذا استعداه العبد في امتناع سيده من كسوته ونفقته جاز أن يأمره بهما ويأخذه بالتزامهما، ولو استعداه من تقصير سيده فيهما لم يكن له في ذلك نظر، ولا إلزام؛ لأنه في التقدير يحتاج إلى اجتهاد شرعي، ولا يحتاج في التزام الأصل إلى اجتهاد شرعي؛ لأن التقدير منصوص عليه ولزومه غير منصوص عليه.

وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف منه غرقها، وكذلك يمنعهم من المسير عند اشتداد الريح، وإذا حمل فيها الرجال والنساء حجز بينهم بحائل.

وإذا اتسعت السفن نصب للنساء مخارج للبراز؛ لئلَّا يتبرجن عند الحاجة.

وإذا كان في أسهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى المحتسب سيرته وأمانته، فإذا تحققها منه أقره على معاملتهن، وإن ظهرت منه الريبة وبان عليه الفجور منعه من معاملتهن، وأدبه على التعرض لهن؛ وقد قيل: إن الحماة وولاة المعاون أخص بإنكار هذا والمنع منه من ولاة الحسبة؛ لأنه من توابع الزنا.

وينظرون إلى الحسبة في مقاعد الأسواق، فيقر منها ما لا ضرر فيه على المارة، ويمنع ما استضر به المارة؛ ولا يقف منعه على الاستعداء إليه، وجعله أبو حنيفة موقوفًا على الاستعداء إليه.

وإذا بني قوم في طريق سابل منع منه، وإن اتسع الطريق يأخذهم بهدم ما بنوه ولو كان المبني مسجدًا؛ لأن مرافق للسلوك للأبنية.

وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقًا؛ لينقلوه حالًا بعد حال مكنوا منه، وان لم يستضر به المارة؛ ومنعوا منه إن استضروا به، وهذا القول في إخراج الأجنحة والأسبطة، ومجاري المياه، وآبار الحشوش يقر ما لا يضر ويمنع ما ضر، ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر، وما لم يضر؛ لأنه من الاجتهاد العرفي دون الشرعي.

গবাদি পশুর মালিকদের মধ্যে কেউ যদি পশুকে এমন কাজে ব্যবহার করে যা পশুটি নিয়মিত সহ্য করতে সক্ষম নয়, তবে মুহতাসিব (জনকল্যাণ তদারককারী) তাকে তিরস্কার করবেন এবং তা থেকে বিরত রাখবেন, যদিও এ বিষয়ে কোনো অভিযোগকারী না থাকে। যদি মালিক দাবি করে যে পশুটি উক্ত কাজ সহ্য করতে সক্ষম, তবে মুহতাসিব বিষয়টি পর্যালোচনা করতে পারেন; কারণ যদিও এটি অনুসন্ধানের প্রয়োজন রাখে, তবুও এটি একটি প্রথাগত বিষয় যা মানুষের প্রচলিত অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল এবং এটি কোনো তাত্ত্বিক শরয়ি ইজতিহাদ (গবেষণা) নয়। আর মুহতাসিব প্রথাগত বিচারিক সিদ্ধান্তে বাধা দেন না। যদিও তিনি শরয়ি ইজতিহাদ থেকে বিরত থাকেন। যদি কোনো ক্রীতদাস তার মনিবের বিরুদ্ধে পোশাক ও ভরণপোষণ প্রদানে অস্বীকৃতির নালিশ করে, তবে মুহতাসিবের জন্য বৈধ হবে মনিবকে তা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া এবং তা পালনে বাধ্য করা। কিন্তু যদি ক্রীতদাসটি তার ভরণপোষণের পরিমাণের ঘাটতির বিষয়ে অভিযোগ করে, তবে এ বিষয়ে তার কোনো হস্তক্ষেপ বা বাধ্য করার ক্ষমতা থাকবে না; কারণ এর পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শরয়ি ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। মূল ভরণপোষণ প্রদানের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে শরয়ি ইজতিহাদের প্রয়োজন নেই; কারণ ভরণপোষণের বিষয়টি বিধিবদ্ধ হলেও এর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সরাসরি দালিলিক পাঠে (নস) নির্ধারিত নয়।

মুহতাসিবের অধিকার রয়েছে নৌকার মালিকদের তাদের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পণ্য বহন করা থেকে বিরত রাখা, যার ফলে নৌকাডুবির আশঙ্কা থাকে। একইভাবে তিনি প্রবল বাতাসের সময় তাদের চলাচলে বাধা দেবেন। আর যদি নৌকায় পুরুষ ও নারী একত্রে আরোহণ করে, তবে তিনি তাদের মাঝে পর্দার মাধ্যমে অন্তরাল তৈরি করবেন।

যদি নৌকা প্রশস্ত হয়, তবে নারীদের শৌচকার্যের জন্য অন্তরালের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে প্রয়োজনের সময় তাদের পর্দা বিঘ্নিত না হয়।

বাজারের সহজলভ্য স্থানগুলোতে যদি এমন কেউ থাকে যে বিশেষভাবে নারীদের সাথে কেনাবেচা করে, তবে মুহতাসিব তার আচার-আচরণ ও বিশ্বস্ততা পর্যবেক্ষণ করবেন। যদি তার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয়, তবে তাকে তাদের সাথে লেনদেন চালিয়ে যেতে দেবেন। আর যদি তার পক্ষ থেকে কোনো সন্দেহজনক আচরণ প্রকাশ পায় বা পাপাচার স্পষ্ট হয়, তবে তাকে তাদের সাথে লেনদেন করা থেকে নিষিদ্ধ করবেন এবং নারীদের উত্ত্যক্ত করার কারণে তাকে দণ্ড দেবেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, নিরাপত্তারক্ষী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ মুহতাসিবের তুলনায় এই বিষয়টি প্রতিরোধে বেশি উপযুক্ত; কারণ এটি ব্যভিচারের আনুসাঙ্গিক বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত।

তারা বাজারের বসার স্থানগুলোর শৃঙ্খলা তদারকি করবেন; সেখানে যা পথচারীদের জন্য ক্ষতিকর নয় তা বহাল রাখবেন এবং যা পথচারীদের ক্ষতির কারণ হয় তা নিষিদ্ধ করবেন। এই নিষেধাজ্ঞা কোনো অভিযোগ পাওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়; তবে ইমাম আবু হানিফা একে অভিযোগের ওপর নির্ভরশীল বলে গণ্য করেছেন।

যদি কোনো গোষ্ঠী সাধারণ চলাচলের পথে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করে, তবে তা থেকে তাদের বিরত রাখা হবে। রাস্তা প্রশস্ত হলেও তাদের নির্মিত স্থাপনা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হবে, এমনকি নির্মিত বস্তুটি মসজিদ হলেও; কারণ পথ চলাচলের উপযোগিতা স্থাপনা নির্মাণের ওপর অগ্রাধিকার পায়।

মানুষ যদি রাস্তা বা বাজারের পথে সাময়িকভাবে মালপত্র বা নির্মাণসামগ্রী রাখে যাতে তারা পর্যায়ক্রমে তা সরিয়ে নিতে পারে, তবে তাদের তা করতে দেওয়া হবে যদি তা পথচারীদের জন্য ক্ষতিকর না হয়। কিন্তু ক্ষতিকর হলে তাদের নিষিদ্ধ করা হবে। এই একই নিয়ম ভবনের বারান্দা বাড়ানো, জলপথ নির্মাণ এবং বর্জ্য নিষ্কাশন কূপ খননের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; যা ক্ষতিকর নয় তা বহাল রাখা হবে এবং যা ক্ষতিকর তা নিষিদ্ধ করা হবে। মুহতাসিব তার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে কোনটি ক্ষতিকর আর কোনটি নয় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন; কারণ এটি তাত্ত্বিক শরয়ি ইজতিহাদের পরিবর্তে প্রথাগত বিচারিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত।

والفرق بين الاجتهادين أنَّ الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع، والاجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف، ويوضح الفرق بينهما بتمييز ما يسوغ فيه اجتهاد المحتسب مما هو ممنوع الاجتهاد فيه. ولوالي الحسبة أن يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في ملك أو مباح، إلا في أرض مغصوبة، فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنه فيها بنقله منها، واختلف في جواز نقلهم من أرض قد لحقها سيل أو ندى، فجوزه الزبيري وأباه غيره.

ويمنع من خصاء الآدميين والبهائم، ويؤدب عليه، وإن استحق فيه قودًا أو دية استوفاه لمستحقه ما لم يكن فيه تناكر وتنازع.

ويمنع من خضاب الشيب بالسواد، إلا للمجاهدة في سبيل الله، ويؤدب من يصبغ به للنساء، ولا يمتنع من الخضاب بالحناء والكتم، فيمنع من التكسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. وهذا فصل يطول أن يبسط؛ لأن المنكرات لا ينحصر عددها فتستوفى، وفيما ذكرناه من شواهدنا دليل على ما أغفلناه.

والحسبة من قواعد الأمور الدينية، وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم؛ لعموم صلاحها وجزيل ثوابها؛ ولكن لما أعرض عنها السلطان، وندب لها من هان، وصارت عرضة للتكسب وقبول الرشا لان أمرها وهان على الناس خطرها، وليس إذا وقع الإخلال بقاعدة سقط حكمها، وقد أغفل الفقهاء عن بيان أحكامها ما لم يجز الإخلال به، وإن كان أكثر كتابنا هذا يشتمل على ما قد أغفله الفقهاء أو قصروا فيه، فذكرنا ما أغفلوه، واستوفينا ما قصروا فيه.

وأنا أسأل الله توفيقًا لما توخيناه، وعونًا على ما نويناه بمنِّه ومشيئته؛ وهو حسبي ونعم الوكيل.

تم بحمد الله وعونه كتاب

الأحكام السلطانية والولايات الدينية

لقاضي القضاة

أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي.

والحمد الله أولًا وآخرًا، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

এই দুই প্রকার ইজতিহাদের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, শারঈ ইজতিহাদ সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে যেখানে এমন কোনো মূলনীতি অনুসরণ করা হয় যার বিধান শরীয়ত দ্বারা সুসাব্যস্ত। আর উরফি বা প্রথাগত ইজতিহাদ সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে যেখানে এমন মূলনীতি অনুসরণ করা হয় যার বিধান প্রথা বা লোকজ আচরণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। আর এই দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয় মুহতাসিবের (হিসবাহ কর্মকর্তা) জন্য কোন ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা বৈধ এবং কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ তা নির্ণয় করার মাধ্যমে। যদি মৃত ব্যক্তিকে কোনো মালিকানাধীন বা উন্মুক্ত জমিতে দাফন করা হয়, তবে তাকে কবর থেকে স্থানান্তর করা থেকে বিরত রাখা হিসবাহর ওয়ালীর দায়িত্ব। তবে ভূমিটি যদি জবরদখল করা হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকের অধিকার থাকবে সেখান থেকে মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়ার। আর প্লাবন বা আর্দ্রতা কবলিত ভূমি থেকে মৃতদেহ স্থানান্তরের বৈধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে; জুবাইরী এটি জায়েজ বলেছেন, তবে অন্যরা তা অস্বীকার করেছেন।

তিনি মানুষ ও পশুপাখিকে খোজা করা নিষিদ্ধ করবেন এবং এর জন্য শাস্তি প্রদান করবেন। যদি এতে কিসাস বা দিয়াত আবশ্যক হয়, তবে তিনি পাওনাদারকে তা পাইয়ে দেবেন, যদি সেখানে কোনো অস্বীকৃতি বা বিরোধ না থাকে।

তিনি বার্ধক্যজনিত সাদা চুল কালো রঙ দিয়ে রাঙানো নিষিদ্ধ করবেন, তবে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্য হলে ভিন্ন কথা। আর যেসব পুরুষ মহিলাদের জন্য চুল কালো রঙে রাঙিয়ে দেয়, তাদের তিনি শাস্তি প্রদান করবেন। তবে মেহেদি বা কাতাম দিয়ে রঙ করা নিষিদ্ধ নয়। একইভাবে তিনি গণতিগরি এবং অনর্থক খেলাধুলার মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ করবেন এবং দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই শাস্তি দেবেন। এটি এমন এক পরিচ্ছেদ যা বিস্তারিত আলোচনা করলে দীর্ঘ হবে; কারণ গর্হিত কাজের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই যে সবগুলোকে একসাথে

বর্ণনা করা সম্ভব। তবে আমরা যা উল্লেখ করেছি, তা অনুল্লিখিত বিষয়গুলোর জন্য নির্দেশক হিসেবে যথেষ্ট।

হিসবাহ হলো দ্বীনি বিষয়াবলির অন্যতম মূল স্তম্ভ। প্রথম যুগের ইমামগণ এর ব্যাপক কল্যাণ ও মহান সওয়াবের আশায় স্বয়ং এটি পরিচালনা করতেন। কিন্তু যখন শাসকবর্গ এ থেকে বিমুখ হলেন এবং এর জন্য অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দিলেন, আর এটি যখন অর্থ উপার্জনের মাধ্যম ও ঘুষ গ্রহণের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ালো, তখন এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলো এবং মানুষের কাছে এর গুরুত্ব হ্রাস পেল। কোনো মূল স্তম্ভ পালনে বিচ্যুতি ঘটলেই তার বিধান রহিত হয়ে যায় না।

ফকিহগণ এর এমন কিছু বিধান বর্ণনায় অবহেলা করেছেন যা বর্জন করা সমীচীন নয়। যদিও আমাদের এই গ্রন্থের অধিকাংশ বিষয়বস্তু এমন যা ফকিহগণ এড়িয়ে গেছেন কিংবা যথাযথভাবে উপস্থাপন করেননি; তাই আমরা তাদের অনুল্লিখিত বিষয়গুলো তুলে ধরেছি এবং যে বিষয়গুলোতে তারা সংক্ষিপ্ত করেছিলেন তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যা আমরা লক্ষ্য স্থির করেছি তাতে তাওফিক প্রদানের জন্য এবং যা আমরা নিয়ত করেছি তাতে তাঁর অনুগ্রহ ও ইচ্ছায় সাহায্যের জন্য। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।

আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর সাহায্যে সমাপ্ত হলো কিতাব—

আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ ওয়াল উইলায়াতুদ দ্বীনিইয়্যাহ (রাষ্ট্রীয় শাসনবিধান ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব)

প্রধান বিচারপতি

আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল-বাসরী আল-বাগদাদী আল-মাওয়ার্দী কর্তৃক রচিত।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য আদিতে ও অন্তে, এবং তাঁর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মদ-এর ওপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর ওপর।

فهرس المحتويات:

الصفحة الموضوع
5 مقدمة التحقيق
9 ترجمة المصنف
13 مقدمة المؤلف
15 الباب الأول: في عقد الإمامة
15 هل الخلافة واجبة بالشرع أم بالعقل؟
17 فصل: [في بيان حكم الخلافة]
19 فصل: [الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة]
21 فصل: [بم تنعقد الإمامة؟]
25 فصل: [في وجوب اختيار الأصلح]
29 فصل: [في البيعة لخليفتين في وقت واحد]
30 فصل: [هل يقرع بين مرشحين للخلافة؟]
30 فصل: [هل تنعقد الخلافة بولاية العهد]
32 فصل: [في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده]
36 فصل: [في تعدي عهد الخليفة إلى من بعده]
39 فصل: في وجوب معرفة الأمة لمن تولى أمرها]
40 [مهام الخليفة ومسئولياته]
42 فصل: [واجبات الأمة نحو الخليفة]
47 فصل: [في نقصان حرية التصرف]
49 فصل: [نواب الخليفة وولاته]
50 الباب الثاني: في تقليد الوزارة
54 فصل: [في الفرق بين سلطات الوزير والإمام]

56 فصل: في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
62 الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد
69 الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد
94 الباب الخامس: في الولاية على المصالح
94 الفصل الأول: في الولاية على الحروب
100 الفصل الثاني: في قتال أهل البغي
105 الفصل الثالث: في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق
110 الباب السادس: في ولاية القضاء
117 فصل: [ما تنعقد به ولاية القضاء]
119 فصل: [ولاية القاضي بين العموم والخصوص]
128 فصل: [في أمور تتعلق بالقضاء]

সূচিপত্র:

পৃষ্ঠা বিষয়
৫ সম্পাদকের ভূমিকা
৯ গ্রন্থকারের জীবনী
১৩ লেখকের ভূমিকা
১৫ প্রথম অধ্যায়: ইমামত বা নেতৃত্বের চুক্তি প্রসঙ্গে
১৫ খিলাফত কি শরীয়ত দ্বারা আবশ্যক না কি বিবেক দ্বারা?
১৭ পরিচ্ছেদ: [খিলাফতের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে]
১৯ পরিচ্ছেদ: [খলিফার মধ্যে যেসব শর্ত থাকা আবশ্যক]
২১ পরিচ্ছেদ: [ইমামত কীসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়?]
২৫ পরিচ্ছেদ: [সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচনের আবশ্যকতা প্রসঙ্গে]
২৯ পরিচ্ছেদ: [একই সময়ে দুইজন খলিফার আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ প্রসঙ্গে]
৩০ পরিচ্ছেদ: [খিলাফতের দুই প্রার্থীর মধ্যে কি লটারি করা হবে?]
৩০ পরিচ্ছেদ: [উত্তরাধিকার বা নিয়োগপত্রের মাধ্যমে কি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়?]

৩২ পরিচ্ছেদ: [খলিফা কর্তৃক তার পরবর্তী উত্তরসূরি মনোনীত করা প্রসঙ্গে]
৩৬ পরিচ্ছেদ: [খলিফার মনোনয়ন কি তার পরবর্তী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে?]
৩৯ পরিচ্ছেদ: [উম্মাহর জন্য তাদের শাসককে চিনে রাখা আবশ্যক হওয়া প্রসঙ্গে]
৪০ [খলিফার কার্যাবলি ও দায়িত্বসমূহ]
৪২ পরিচ্ছেদ: [খলিফার প্রতি উম্মাহর কর্তব্যসমূহ]
৪৭ পরিচ্ছেদ: [খলিফার স্বাধীন কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়া প্রসঙ্গে]
৪৯ পরিচ্ছেদ: [খলিফার প্রতিনিধি ও গভর্নরগণ]
৫০ দ্বিতীয় অধ্যায়: মন্ত্রণালয় বা উজির নিয়োগ প্রসঙ্গে
৫৪ পরিচ্ছেদ: [উজির ও ইমামের ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য প্রসঙ্গে]
৫৬ পরিচ্ছেদ: ক্ষমতা অর্পিত মন্ত্রণালয় (তাফবীদ) ও নির্বাহী মন্ত্রণালয়ের (তানফীয) মধ্যে পার্থক্য প্রসঙ্গে
৬২ তৃতীয় অধ্যায়: বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসনিক নেতৃত্ব (ইমারত) প্রদান প্রসঙ্গে
৬৯ চতুর্থ অধ্যায়: জিহাদের নেতৃত্ব প্রদান প্রসঙ্গে
৯৪ পঞ্চম অধ্যায়: জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে
৯৪ প্রথম পরিচ্ছেদ: যুদ্ধ পরিচালনার কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে
১০০ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বিদ্রোহী দমনের যুদ্ধ প্রসঙ্গে
১০৫ তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বিদ্রোহী যোদ্ধা ও ডাকাতদের দমন প্রসঙ্গে
১১০ ষষ্ঠ অধ্যায়: বিচার বিভাগের (কাযা) কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে
১১৭ পরিচ্ছেদ: [বিচারিক কর্তৃত্ব কীসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়]
১১৯ পরিচ্ছেদ: [বিচারকের সাধারণ ও বিশেষ কর্তৃত্বের সীমা প্রসঙ্গে]
১২৮ পরিচ্ছেদ: [বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয় প্রসঙ্গে]

الصفحة الموضوع

---

130 الباب السابع: في ولاية المظالم
151 فصل: في توقيعات الناظر في المظالم
155 الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
160 الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات
162 فصل: [في إمامة الصلاة]
172 الباب العاشر: الولاية على الحج
179 الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات
181 [زكاة المواشي]
186 [زكاة الثمار]
188 فصل: [في زكاة الزروع]
190 فصل: [زكاة الذهب والفضة]
192 فصل: [زكاة المعادن]
195 فصل: [مصارف الزكاة]
200 الباب الثاني عشر: في قسم الفيء والغنيمة
207 فصل: [أحكام الغنيمة]
211 فصل: [في النهي عن قتل الرهبان]
221 الباب الثالث عشر: في وضع الجزية والخراج
227 فصل: [أحكام الخراج]
241 الباب الرابع عشر: فيما تختلف أحكامه من البلاد
264 الباب الخامس عشر: في إحياء الموات واستخراج المياه
275 الباب السادس عشر: في الحِمَى والأرفاق
283 الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع
297 الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه

322 الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم
328 الفصل الأول: في حد الزنا.
331 الفصل الثاني: في قطع السرقة.
334 الفصل الثالث: في حد الخمر
335 الفصل الرابع: في حد القذف واللعان
337 الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها
344 الفصل السادس: في التعزير
349 الباب العشرون: في أحكام الحسبة
375 فهرس المحتويات

পৃষ্ঠা বিষয়

১৩০ সপ্তম অধ্যায়: মাজালিম (অবিচার ও অভিযোগ প্রতিকার) সংক্রান্ত শাসন প্রসঙ্গে
১৫১ পরিচ্ছেদ: মাজালিম তত্ত্বাবধায়কের ফরমানসমূহ প্রসঙ্গে
১৫৫ অষ্টম অধ্যায়: সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের তত্ত্বাবধানের (নিকাবাত) নেতৃত্ব প্রসঙ্গে
১৬০ নবম অধ্যায়: সালাতের ইমামতির কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে
১৬২ পরিচ্ছেদ: [সালাতের ইমামতি প্রসঙ্গে]
১৭২ দশম অধ্যায়: হজ্জ ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব
১৭৯ একাদশ অধ্যায়: যাকাত সংক্রান্ত শাসন
১৮১ [গবাদি পশুর যাকাত]
১৮৬ [ফল-ফলাদির যাকাত]
১৮৮ পরিচ্ছেদ: [শস্যের যাকাত প্রসঙ্গে]
১৯০ পরিচ্ছেদ: [স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত]
১৯২ পরিচ্ছেদ: [খনিজ সম্পদের যাকাত]
১৯৫ পরিচ্ছেদ: [যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ]
২০০ দ্বাদশ অধ্যায়: ফায় ও গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বণ্টন প্রসঙ্গে
২০৭ পরিচ্ছেদ: [গনিমতের বিধানাবলী]
২১১ পরিচ্ছেদ: [ধর্মযাজকদের হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে]

২২১ ত্রয়োদশ অধ্যায়: জিযিয়া ও খারাজ ধার্যকরণ প্রসঙ্গে
২২৭ পরিচ্ছেদ: [খারাজের বিধানাবলী]
২৪১ চতুর্দশ অধ্যায়: বিভিন্ন ভূখণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রসঙ্গে
২৬৪ পঞ্চদশ অধ্যায়: অনাবাদী জমি আবাদ করা এবং পানি নিষ্কাশন প্রসঙ্গে
২৭৫ ষোড়শ অধ্যায়: সংরক্ষিত চারণভূমি ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সুবিধা প্রসঙ্গে
২৮৩ সপ্তদশ অধ্যায়: ইকতা (ভূমি বরাদ্দ) সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রসঙ্গে
২৯৭ অষ্টাদশ অধ্যায়: দেওয়ান (প্রশাসনিক দপ্তর) প্রতিষ্ঠা এবং এর বিধানাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে
৩২২ ঊনবিংশ অধ্যায়: অপরাধের দণ্ডবিধি সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রসঙ্গে
৩২৮ প্রথম পরিচ্ছেদ: ব্যভিচারের হদ (নির্ধারিত দণ্ড) প্রসঙ্গে।
৩৩১ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: চুরির অপরাধে অঙ্গচ্ছেদ প্রসঙ্গে।
৩৩৪ তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মদ্যপানের হদ প্রসঙ্গে
৩৩৫ চতুর্থ পরিচ্ছেদ: অপবাদ আরোপ (কাযফ) এবং লি'আন-এর হদ প্রসঙ্গে
৩৩৭ পঞ্চম পরিচ্ছেদ: অপরাধের কিসাস এবং দিয়াত প্রসঙ্গে
৩৪৪ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: তা'যীর (বিবেচনামূলক দণ্ড) প্রসঙ্গে
৩৪৯ বিংশ অধ্যায়: হিসবাহ (জননিরাপত্তা ও নৈতিক তদারকি) সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রসঙ্গে
৩৭৫ বিষয়সূচি